



DOI Prefix:  
10.69655

ISSN :: 2454-1508

# আত্মদীপ

আন্তর্জাতিক দ্বিমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা  
পর্ব-১, সংখ্যা-৩, জানুয়ারি ২০২৫



অতিথি সম্পাদক:  
ড. বর্ণালী ভৌমিক (ঘোষ)

সহ-সম্পাদক:  
আজিজুল সেখ

সম্পাদক:  
ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য



# আত্মদীপ

আন্তর্জাতিক দ্বিমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা

পৰ্ব-১, সংখ্যা-৩, জানুয়ারি ২০২৫

সম্পাদক:

ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য

সহ-সম্পাদক:

আজিজুল সেখ

অতিথি সম্পাদক:

ড. বর্ণালী ভৌমিক (ঘোষ)



প্রকাশক:

উত্তরসুরি, শ্রীভূমি, আসাম

# **ATMADEEP**

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

**ISSN: 2454-1508**

**Volume-I, Issue-III, January, 2025**

## **Published by:**

Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

Email: [editor@atmadeep.in](mailto:editor@atmadeep.in)

## **Editor-in-Chief**

Dr. Bishwajit Bhattacharjee

## **Associate Editor**

Azizul Sekh

## **Guest Editor**

Dr. Barnali Bhowmick Ghosh

## **Printed at:**

Scholar Publications

Sribhumi, Assam, India, 788710

## **Cover Page:**

Kajal Ganguli

Price: Rs. 600.00

© Uttarsuri

The views and contents of this Journal are solely of the authors. This Journal is being sold on the condition and understanding that its contents are merely for information and reference and that neither the author nor the publishers, Printers or Sellers of this Journal are engaged in rendering legal, accounting or other professional service.

The publishers believe that the contents of this Journal do not violate any existing copyright/intellectual property of others in any manner whatsoever. However, in the event the author has been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

Atmadeep, is a Bi-monthly electronic & Print journal of open Access Category. The Readers do not need to pay/register themselves to read and download the articles in the journal. However, it is only for scholarly/academic purpose that is non-commercial. Users while using excerpts from Atmadeep, must cite the author, content and the journal by including the link of the content. Individuals/ Companies/ Organizations intending to use contents from Atmadeep, for commercial purpose must contact the Editor-in-Chief.

## Editorial Board

### Advisor



**Dr. Tapadhir Bhattacharjee**

Former Vice-Chancellor, Assam University, Silchar, Assam  
President, Uttarsuri, Karimganj, Assam  
Mo: +919435566494



**Dr. Nirmal Kumar Sarkar**

Former Associate Professor, Karimganj College, Karimganj, Assam  
Vice-President, Uttarsuri, Karimganj, Assam  
Mo: +919435375599

### Editor-in-Chief



**Dr. Bishwajit Bhattacharjee**

Asst. Professor, Karimganj College  
Karimganj, Assam, 788710  
Mo: +919435750458, +917002548380  
Email: bishwajit@karimganjcollege.ac.in

### Associate Editor



**Azizul Sekh**

Research Scholar, Dept. of Bengali, Tripura University, Tripura  
Mo: +919126261414  
Email: azizul.bengali@tripurauniv.ac.in

### Editorial Board Member:



**Dr. Debasish Bhattacharjee**

Professor & Head, Dept. of Bengali  
Assam University, Silchar  
Email: debashish.bhattacharya@aus.ac.in



**Dr. Rupasree Debnath**

Assistant Professor, Department of Bengali  
Gauhati University, Assam, India  
Email: rupasree@gauhati.ac.in



**Dr. Malay Deb**

Assistant Professor, Dept. of Bengali  
Tripura University, Tripura, India  
Email: malaydeb@tripurauniv.ac.in



**Dr. Madhumita Sengupta**

Asst. Professor, Dept. of Bengali  
Arya Vidyapeeth College, Guwahati, Assam, India  
Email: madhumita.sengupta@avcollege.ac.in





**Dr. Debjani Bhowmick (Chakraborty)**  
Associate Professor, Dept. of Bengali,  
Sripat Singh College, Murshidabad, West Bengal, India  
Email: dbhowmick@sripatsinghcollege.edu.in



**Romana Papri**  
Lecturer, Department of Pali and Buddhist Studies  
University of Dhaka, Bangladesh  
Email: romanapapri@du.ac.bd



**Dr. Rajarshi Chakraborty**  
Assistant Professor, Dept. of History  
University of Burdwan, West Bengal, India  
Email: rchakraborty@hist.buruniv.ac.in



**Dr. Mumit Al Rashid**  
Associate Professor and chairman  
Department of Persian Language and Literature  
University of Dhaka, Bangladesh  
Email: mumitarashid@du.ac.bd



**Dr. Barnali Bhowmick Ghosh**  
Associate Professor and HOD  
Department of Bengali  
Bir Bikram Memorial College, Agartala, Tripura

প্রথম পর্ব, প্রথম সংখ্যায় যাদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে

- ১। সেলিম মুস্তাফার কবিতায় কবি সত্তার বাঁক বদল ও হাংরি প্রভাব  
শান্তনু ভট্টাচার্য, ৮-২০
- ২। বাংলা কবিতায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিভাবনার স্বতন্ত্রতা: বিষয়ে ও আঙ্গিকে  
দেবপ্রসাদ গোস্বামী, ২১-৩৬
- ৩। হাইডেগারের দর্শনে Dasein: একটি সমীক্ষা  
আসলাম মল্লিক, ৩৭-৪৭
- ৪। শোষণে এবং বৈষম্যে চা-বাগানের নারী:  
নির্বাচিত গল্পের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা  
আজিজুল সেখ, ৪৮-৫৮
- ৫। অনুরূপা বিশ্বাসের ‘নানা রঙের দিন’: অব্যক্ত ইতিহাসের গ্রহিমালা  
ড. মধুমিতা সেনগুপ্ত, ৫৯-৭২
- ৬। দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার দর্পণে ১৯৪২-৪৩ সালের কাঁথির দুর্ভিক্ষ  
মৌসুমী খাতুন, ৭৩-৮৪
- ৭। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার: একটি আলোকিত জীবন  
ড. দেবযানী ভৌমিক (চক্রবর্তী), ৮৫-৯৩
- ৮। মল্লিকা সেনগুপ্তের সীতায়ন: নারী ভাবনার নবতর ভাষ্য  
ড. অরূপা চক্রবর্তী, ৯৪-১০১
- ৯। কোশলরাজ প্রসেনজিত ও বৌদ্ধধর্ম  
রোমানা পাপড়ি ও শিরীন আক্তার, ১০২-১১৫
- ১০। দেবেশ রায়ের ‘মফস্বলি বৃন্তান্ত’ উপন্যাসের চারকেটু চরিত্র:  
নিম্নবর্গীয় চরিত্রের আধারে একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন  
জানকী প্রসাদ দেবনাথ, ১১৬-১২৯
- ১১। প্রকৃতি সচেতনতা ও পরিবেশ ভাবনা: আসামের ছোটগল্পে  
নয়ন দে, ১৩০-১৪৪
- ১২। অমিতাভ দেব চৌধুরীর গল্পে দেশভাগোত্তর সাম্প্রদায়িকতা  
প্রিয়াংকা ধর ও ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, ১৪৫-১৫৯
- ১৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে ভুবন: প্রতিবাদ ও নির্বাসিতের প্রতিবেদন  
অমিত দেব, ১৬০-১৭২
- ১৪। মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত ছোটগল্পের আলোকে নিম্নবর্গ তথা অন্ত্যজ  
আদিবাসীদের বয়ান  
অনুরাধা দাস, ১৭৩-১৮৮

প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় সংখ্যা: সূচিপত্র

- ১। ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থের সত্যাসত্যতা অনুসন্ধান  
অক্ষয় দেববর্মা, ১৮৯-২০২
- ২। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আদলে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাস্তুভিটা’  
ড. দেবযানী ভট্টাচার্য্য, ২০৩-২২১
- ৩। ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ এর শকুন্তলা ও ‘বীরাজনা’র শকুন্তলার তুলনাত্মক পর্যালোচনা  
জয়দেব পাল, ২২২-২৩৫
- ৪। ভাষা আন্দোলন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলা ভাষা  
মো: রিপন মিয়া, ২৩৬-২৫৪
- ৫। জহির রায়হানের গল্প: রাজনৈতিক চেতনার বিপ্রতীপে নিম্ন-মধ্যবিত্তের বিবর্ণ দিনলিপি  
ড. প্রতাপ ব্যাপারী, ২৫৫-২৭৫
- ৬। বাণী বসুর অন্তর্ঘাত: ‘ময়না তদন্তের হাজাক আলোকে’  
ড. প্রীতম চক্রবর্তী, ২৭৬-২৯৩
- ৭। কাকদ্বীপের ভাষা  
রিক্তা সরদার, ২৯৪-৩০৫
- ৮। সংখ্যার উদ্ভব ও সংখ্যা পদ্ধতির বিবর্তন  
মো. তাহমিদ রহমান, ৩০৬-৩২৮
- ৯। কাজী নজরুল ইসলামের ‘বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি’ : প্রেম ও প্রকৃতি চেতনার সমন্বয়  
তাপস মণ্ডল, ৩২৯-৩৩৯
- ১০। হুমায়ূন আহমেদের ‘মিসির আলি! আপনি কোথায়?’ উপন্যাসের মনঃসমীক্ষণাত্মক সমালোচনা  
ড. প্রসেনজিৎ দাস, ৩৪০-৩৫১
- ১১। কথাসাহিত্যিক আবুল বাশারের নির্বাচিত ছোটগল্পে রাজনীতি: একটি পর্যালোচনা  
মাসুদ আলী দেওয়ান, ৩৫২-৩৬৯
- ১২। অশরীরী চিন্তা-চেতনায় শীর্ষেন্দুর কিশোর উপন্যাস: ভূত ও মানুষের পারস্পারিকতায় এক স্বতন্ত্র মাত্রা  
নমিতা হালদার, ৩৭০-৩৮১
- ১৩। ঔপনিবেশিক আমলে মুর্শিদাবাদ জেলার জনস্বাস্থ্য বিষয়ক একটি পর্যালোচনা  
মেহেবুব হোসেন, ৩৮২-৩৯৯
- ১৪। বেলা বসুর ‘স্মৃতিপট’: নারীশিক্ষা ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং সমকাল  
পর্ণা মণ্ডল, ৪০০-৪১২
- ১৫। দিনাজপুরের গ্রামীণ সমাজে মনোহলী জমিদারির সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব:  
একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা  
সুরাট সরকার ও কামানুজ্জামান, ৪১৩-৪২৪
- ১৬। বাউল মতাদর্শ: উৎস, বিকাশ ও সাধক-শিল্পীদের অবদান  
নিরঞ্জন মণ্ডল, ৪২৫-৪৩৬
- ১৭। ভারতবর্ষের নাট্য-ঐতিহ্যে থার্ড থিয়েটার  
প্রশান্ত চক্রবর্তী, ৪৩৭-৪৪৪
- ১৮। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে আখ্যানের বিনির্মাণ  
ড. সেখ মোফাজ্জাল হোসেন, ৪৪৫-৪৫৫

সূচিপত্র

আমন্ত্রিত পাঠ

১। তলস্তয়ের গল্প

মানস মজুমদার, ৪৫৯-৪৬৬

২। বহির্বঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে-পার্বত্য ত্রিপুরা

ড. খেলন দাস হালদার, ৪৬৭-৪৭৪

ভাষা ভাবনা

৩। বাংলা ভাষার আলোকে কুড়মালি ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: এক ভাষাবৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন

মৌসুমী মাহাত, ৪৭৫-৪৮৭

৪। বাংলা ‘লোকভাষা’-র নানা প্রসঙ্গ: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

অদিতি দাস, ৪৮৮-৪৯৭

কবি সমন্বয়

৫। আধুনিক ভাষ্যে প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় সাহিত্য: কবি বিষ্ণু দে-র কাব্য সমগ্র

ড. অসিত বিশ্বাস, ৪৯৮-৫০৮

৬। ‘একা এবং কয়েকজন’: তরুণ কবির নিজস্ব কণ্ঠস্বর

ড. শেখ নজরুল ইসলাম, ৫০৯-৫২২

চেতনায় স্বামীজী

৭। সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় প্রেষণার ভূমিকা: স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার আলোকে একটি পর্যালোচনা

অনন্যা সরকার, ৫২৩-৫৩১

৮। স্বামী বিবেকানন্দের সংগীত প্রজ্ঞা

মো. আফতাব উদ্দিন ৫৩২-৫৩৮

লোকসংস্কৃতি

৯। বাংলার পীরসংস্কৃতি ও পীরসাহিত্য: একটি নিরীক্ষা

ড. সুদীপ্ত চৌধুরী, ৫৩৯-৫৪৭

নাট্যালোচনা

১০। আধুনিক সংস্কৃত নাটকে অন্ত্যজ জীবন

এস কে মইনুদ্দিন, ৫৪৮-৫৫৫

১১। অভিনয় জীবনের উত্থান পতনের আলোকে ‘নানা রঙের দিন’

রাজেশ সরকার, ৫৫৬-৫৬২

১২। বাস্তবের দর্পণে বীরভূমের গণনাট্য সংগঠন (১৯৬৯ - ২০২০): উত্থান ও পরিণতি

ড. অক্ষয় দাস, ৫৬৩-৫৭৫

১৩। বাংলার গণনাট্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবাম’ নাটক

সুমনা বিশ্বাস, ৫৭৬-৫৮৩

কথাসাহিত্য

- ১৪। মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত গল্পে ভাতের অভাব একটি বিশ্লেষণী পাঠ  
রাজু লায়েক, ৫৮৪-৫৯১
- ১৫। যে স্মৃতি নহে হারাবার: বিভূতিভূষণের ‘স্মৃতির রেখা’  
ড. অনুপম নস্কর, ৫৯২-৬০০
- ১৬। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের আলোকে তৎকালীন বাঙালি সমাজচিত্র  
বকুল সাহা, ৬০১-৬০৯
- ১৭। বিশ শতকে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি: প্রসঙ্গ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্প  
রাকেশ চন্দ্র সরকার, ৬১০-৬১৫
- ১৮। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্পে চিত্রভাবনা  
আদেশ লেট, ৬১৬-৬২৩
- ১৯। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্প: আটপৌরে লৌকিক জীবনের ইতিবৃত্ত  
বাবলী বর্মণ, ৬২৪-৬৩২
- ২০। শচীন দাশের গল্প: সুন্দরবনের বাঘ-বিধবা মহিলাদের জীবন সংগ্রাম  
সমরেশ বাগ, ৬৩৩-৬৪০
- ২১। অনিল ঘড়াইয়ের ছোটগল্পে প্রান্তজনের জীবনচর্যা  
সীমা সূত্রধর, ৬৪১-৬৪৮
- ২২। অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে সংস্থান  
উর্বা মুখোপাধ্যায়, ৬৪৯-৬৫৯
- ২৩। স্যাফো সই-কথা ও কয়েকটি বাংলা উপন্যাস  
ড. প্রীতম চক্রবর্তী, ৬৬০-৬৬৯
- ২৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাস: বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের আত্ম-সংকট ও আত্ম-অস্বীকার  
শুভঙ্কর দাস, ৬৭০-৬৮২
- ২৫। মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য ধারায় অন্ত্যজ নারী ও আদিবাসী জীবন জিজ্ঞাসা  
বিকাশ মন্ডল, ৬৮৩-৬৯২
- ২৬। রাভা জনগোষ্ঠীর পরিচয় এবং ‘সোঁদাল’ ও ‘বিনদনি’ উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে বাস্তব চিত্র  
ধনেশ্বর বর্মণ, ৬৯৩-৬৯৯
- ২৭। আধুনিক নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের বহুমাত্রিক সংকট: প্রসঙ্গ ‘বিষবৃক্ষ’, ‘ঘরে বাইরে’ ও ‘গৃহদাহ’  
উপন্যাস  
ড. বাপি চন্দ্র দাস, ৭০০-৭০৭
- ২৮। লোকসংস্কৃতির আলোকে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাস: একটি বিশ্লেষণ  
ড. আনন্দ ঘোষ, ৭০৮-৭১৪
- ২৯। বাংলা সাহিত্যে দলিত ও শরৎচন্দ্র  
কিরণ মন্ডল, ৭১৫-৭২৪
- ৩০। সমরেশ বসুর ‘বিবর’: নৈতিক সংকট, পাপবোধ ও আত্মদ্বন্দ্বের গল্প  
মৌমিতা হালদার, ৭২৫-৭৩৬
- ৩১। রহু চণ্ডালের (হার-না-মানা) হাড়: মানব-জমিনের সন্ধানে  
শ্রীচরণ দাস বিশ্বাস, ৭৩৭-৭৪৪
- ৩২। হুমায়ূন আহমেদের ময়ূরাক্ষী: একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন  
ড. প্রসেনজিৎ দাস, ৭৪৫-৭৫২

৩৩। নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে কর্ণ-কুন্তী কথার বিবর্তন

সঞ্চয়ী হালদার, ৭৫৩-৭৬১

৩৪। বাস্তবাত্মিকতার প্রেক্ষাপটে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’

ড. শেখ ইমরান পারভেজ, ৭৬২-৭৭১

### দার্শনিক আলোচনা

৩৫। বোধিসত্ত্বভূমি গ্রন্থনিষ্ঠ দানের ধারণা: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

প্রিয়ান্বিতা দত্ত, ৭৭২-৭৭৮

৩৬। অনুমানের প্রকার প্রসঙ্গে প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িক মত: একটি আলোচনা

সুফল দাস, ৭৭৯-৭৮৫

৩৭। মহর্ষি পতঞ্জলি ও শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে ‘যোগ’: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

রাজকুমার পণ্ডিত, ৭৮৬-৭৯৬

৩৮। সাংখ্যমতে জগতের ক্রমাভিব্যক্তিবাদ বা উৎপত্তিবাদ: একটি সমীক্ষা

রাজিবুল খান, ৭৯৭-৮০৪

৩৯। বিবরণপ্রস্থানে শব্দপরোক্ষবাদ

সন্তোষ, ৮০৫-৮১১

### বিবিধ

৪০। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও তৎকালীন কোচবিহারের সাহিত্যচর্চা

কালিপদ বসুনিয়া, ৮১২-৮১৮

৪১। শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চায় ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরীকারা

দেবরূপা সেন, ৮১৯-৮২৬

৪২। সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মকথায় কলুটোলা-সেনবাড়ির অন্তঃপুরচিত্র

সৌমী বসু, ৮২৭-৮৪২

৪৩। ভিটগেনস্টাইনের চিত্রতত্ত্ব: একটি পর্যালোচনা

ইন্দ্রজ্যোতি কর্মকার, ৮৪৩-৮৫০

৪৪। বাঙালির হিমালয়-প্রবক্তা: ভারতাত্মার সন্ধান (নির্বাচিত ভ্রমণকাহিনি অবলম্বনে)

সুস্মিতা দে, ৮৫১-৮৫৮

৪৫। শ্রী শ্রী সারদা মায়ের ব্যবহারিক বেদান্ত: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

ড. অমিত কুমার বটব্যাল, ৮৫৯-৮৬৫

Guidelines, Review Process & Publication Ethics, Page No: 866

Publication Charge, Page No: 867



## সম্পাদকীয়

মাঘ মাসে যখন আমলকীর বনে শিরশিরিয়ে ওঠা হিমেল বাতাসের পরশ মনকে উদাসীন করে তুললো, ঠিক তখনই আত্মপ্রকাশ করলো আত্মদীপের পর্ব -১, সংখ্যা -৩, জানুয়ারী ২০২৫ সংখ্যা। গবেষণাধর্মী মননের প্রকাশক্ষেত্র, উদ্দীপিত হৃদ জ্যোতি, মস্তিষ্কবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির সুচারু মেলবন্ধন। বোধ হয় সেই কারণেই গবেষণাপত্রের জন্য যখন আহ্বান করা হয়েছিল, তখন সংখ্যাধিক্য মৌলিক গবেষণাপত্র আমাদের ভাবিয়েছিল-- কীভাবে, কোন্ কৌশলে-মানদণ্ডে প্রকাশের সংকল্প বিন্দুতে পৌঁছানো যায়; ফলে মনের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও একাধিক রচনা প্রকাশ করা সম্ভবপর হলো না। স্রষ্টার কাছে তাই দুঃখপ্রকাশ করেই বলতে হচ্ছে, আগামীতে নিশ্চয়ই প্রকাশযোগ্য হয়ে উঠবে সেইসকল রচনা। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সাহিত্যের একাধিক ক্ষেত্রে বিচরণ করেছে গবেষকের চিন্তা-চেতনা, তথ্য- প্রজ্ঞা। তাই মুক্তপ্রতিম রচনাগুলিকে যথাসম্ভব বিষয়, ভাবনার সাযুজ্য রেখে নৈবেদ্য সাজিয়ে প্রকাশ করেছি আমরা। অতঃপর বিচার, সমালোচনা ও মার্গদর্শনের দায়িত্ব আপামর পাঠকের উপরই ন্যস্ত করলাম।

**ড. বর্ণালী ভৌমিক (ঘোষ)**

আমন্ত্রিত সম্পাদক

সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজ, আগরতলা, ভারত

অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে বিষয়-বৈচিত্র্য এবং উপস্থাপনায় ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের গবেষক, অধ্যাপক এবং প্রাবন্ধিকদের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে ‘আত্মদীপ’। এটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একটি আন্তর্জাতিক দ্বিমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা, যা উত্তরসূরি থেকে প্রকাশিত হয়। আত্মদীপের পথ চলার ফলস্বরূপ এই পর্বের শীতকালীন আয়োজনে, নির্বাচিত লেখাগুলোকে ভাষা, লোকসংস্কৃতি, দর্শন, কাব্য, কথাসাহিত্য ইত্যাদি নানারকম ভাগে সাজিয়ে তোলার প্রয়াস রয়েছে। যারা বাংলা ভাষায় লিখছেন, গবেষণা করছেন তাদের ভাবনাগুলোকে প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করার একটি ক্ষেত্র তৈরি করে দেওয়াই এই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য।

আত্মদীপ পত্রিকায় শুধু সাহিত্যকেন্দ্রিক নয়, বাংলা ভাষায়, যে কোন বিষয় নিয়ে লেখা গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠানো যেতে পারে। পত্রিকাটি অনলাইন এবং প্রিন্ট দুভাবেই প্রকাশিত হওয়ায় গবেষক এবং লেখকদের অনেকটা সাহায্য হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রতিটি প্রবন্ধ DOI সহকারে প্রকাশিত হয়, যা প্রবন্ধটির স্থায়ী ওয়েব ঠিকানা হয়ে থাকবে।

ভারত এবং বাংলাদেশ থেকে যারা লেখা দিয়েছেন এবং পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলী, যারা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করেছেন, সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই সংখ্যার অতিথি সম্পাদক ড. বর্ণালী ভৌমিক ঘোষ’কে আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা। পরবর্তী সংখ্যাগুলিতেও আপনাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করছি। আমাদের পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ৩১শে মার্চ, ২০২৫।

বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, সম্পাদক  
আজিজুল সেখ, সহ-সম্পাদক



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 459-466

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.033



## তলস্তয়ের গল্প

মানস মজুমদার, প্রফেসর (প্রাক্তন), বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

### Abstract

*Leo Tolstoy was born on August 28, 1828, into an aristocratic landowning family in Russia. He was the owner of a vast estate and spent his early years in luxury and indulgence. However, as he grew older, he developed a growing disillusionment with wealth, status, and social prestige. Rejecting his aristocratic background, he aspired to become one with the common people of his country. He realized that true peace does not lie in material abundance but rather in love, sympathy, self-sacrifice, and service to others. Tolstoy had immense compassion for humanity. He felt deep pain for the suffering of the oppressed, impoverished, and downtrodden and stood beside them with a heart full of kindness. He was well acquainted with human nature—its morality, sins, greed, desires, and conflicts.*

*Tolstoy freely interacted with people from all classes of Russian society. The extravagance, vanity, and power-hungry tendencies of the aristocracy repelled him. In contrast, he found a profound sense of humanity among the common people, whose simplicity, mutual support, and faith in God reassured him. He believed that the world remains habitable because of the love, kindness, and wisdom of a few noble souls.*

*The 19th century was a golden age in Russian literature. During this period, great literary figures such as Pushkin (1799-1837), Dostoevsky (1821-1881), Chekhov (1860-1904), and Gorky (1868-1936) emerged. Among them, Tolstoy (1828-1910) stood at the pinnacle. Pushkin first gave voice to the pain and struggles of neglected and marginalized people in his stories. Gogol portrayed the plight of those crushed by a ruthless bureaucratic system. Chekhov, like a literary physician, sought to diagnose and cure the deep-seated social ills, envisioning social transformation. Gorky sang the songs of revolution, filling his tales with both turbulence and human love. But Tolstoy? He was incomparable. Recognized as one of the greatest novelists of all time, Tolstoy also enriched the realm of short stories, writing nearly fifty of them. His stories exhibit remarkable breadth, diversity, and depth.*

**Keyword:** Leo Tolstoy, Russian Literature, Social Inequality, Russian Writers Pushkin, Dostoevsky.

মুচির কাজ করত সে। নাম সাইমন। বুটির দাম আগুন অথচ মজুরি সামান্যই। তাও সব সময় সবটা নগদে জোটে না। গ্রামের সাধারণ যত চাষাভূষো তার খদ্দের। অনেকটাই তাই বাকি পড়ে থাকে। কোনও রকমে দিন চালানো আর কী।

স্বামী-স্ত্রীতে ভাগাভাগি করে গায়ে দেয় শতেক তালি দেওয়া একটা মাত্র চামড়ার কোট। এদিকে শীত আসন্ন। যেভাবেই হোক, একটা কোট বানাতে হবে। সামান্য কিছু টাকা-পয়সা জমিয়েছে সে। চাষীদের কাছে পাওনা টাকাটা পেয়ে গেলে ভেড়ার একটা নতুন চামড়া কেনা যায়। আর তা হলে সাইমন ভাবে, নতুন একটা কোট বানিয়ে নিতে পারে সে।

বাড়ি থেকে বেরল সাইমন। বাকি পাওনার অতি সামান্য অংশই আদায় করতে পারল। আর জুটল মেরামতের জন্যে একজোড়া বুট। চামড়ার দোকানিও ধারে চামড়া বিক্রি করতে নারাজ হল। মনটা খারাপ হয়ে গেল সাইমনের। খানিকটা মদ খেয়ে ঘরমুখো হল। গির্জার কাছটিতে আসতেই দেখতে পেলো গির্জার গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে একটা মানুষ, গায়ে পোশাকের নামগন্ধও নেই। বেঁচে আছে কী মারা গেছে, তাও বোঝা দায়।

দরকার নেই বুট ঝামেলায় গিয়ে। সাইমন এগিয়ে চললো। কয়েক পা এগোতেই কিন্তু বিবেকের তাড়না বোধ করল সে। ফিরে এল লোকটার কাছে। দেখল, শীতে প্রায় জমে যেতে বসেছে লোকটা। অল্প বয়স, মুখের দিকে তাকালে মায়া হয়। নিজের পুরনো কোট আর মেরামতের জন্যে পাওয়া বুট জোড়াটা পরিয়ে, একটুখানি চাঙ্গা করে, তাকে নিয়ে বাড়িই ফিরল সাইমন।

অভাবের সংসার। স্ত্রী মাত্রোনা সাইমনের সঙ্গীটিকে দেখে প্রথমটা তো অসম্ভব চটে গেল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সব কথা শুনে আগস্তকের জন্যে মমতা হল তার। খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা করল। তাকে পরতে দিল সাইমনের পুরনো পোশাক।

লোকটার নাম মিখাইল। সাইমনের কাছেই থেকে গেল সে। কয়েকদিনের মধ্যেই রপ্ত করে ফেলল জুতো সেলাইয়ের কাজ। চমৎকার হাত তার। সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। সাইমনের অবস্থা ফিরে গেল। দেখতে দেখতে কেটে গেল একটা বছর। একদিন দামি চামড়া নিয়ে সেখানে এলেন এক বদমেজাজি ভদ্রলোক। তাঁর জন্যে মজবুত বুট জুতো বানিয়ে দিতে হবে। ভয়ে ভয়ে মাপ নিল সাইমন। মিখাইলকে বুট জোড়া বানানোর দায়িত্ব দিল সে।

মিখাইল কিন্তু বানাল একজোড়া চটি। সাইমন তো মিখাইলের কান্ড দেখে ঘাবড়ে গেল। ঠিক সেই সময় সেখানে এল ওই ভদ্রলোকের চাকরটি। বাড়ি ফেরার কালে মারা গেছেন ওই ভদ্রলোক। বুট জুতোর আর দরকার নেই। শবাধারে দেওয়ার জন্যে চাই চটি জুতো। মিখাইল তার হাতে চটি জোড়া তুলে দিল।

ছ বছরের মাথায় ছোট দুটি মেয়েকে নিয়ে তাদের জুতো বানানোর জন্যে সেখানে এলেন এক ভদ্রমহিলা। মারিয়া। মেয়ে দুটির জন্মের দিন কয়েক আগে বাবা মারা গেছে। আর মাকে হারিয়েছে জন্মের দিনটিতে। কোনও সম্পর্ক না থাকলেও, অসহায় ওই মেয়ে দুটিকে দেখে দয়া হয় মারিয়ার। সন্তানপ্লেহে তাদের লালন পালন করতে থাকেন।

মিখাইলের সারা দেহে ফুটে ওঠে অপরূপ জ্যোতি। সে জানায়, শাপগ্রস্ত, দেবদূত সে। কর্তব্যে অবহেলার জন্যে ঈশ্বর তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, পৃথিবীতে মানুষের জীবন কাটিয়ে তিনটি সত্য জেনে আসতে। সেই তিনটি সত্য হল ‘মানুষের কী আছে’, ‘মানুষের কী নেই’, ‘মানুষ কী নিয়ে বাঁচে।’ সাইমন আর তার স্ত্রী যেদিন নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা-অভাব সত্ত্বেও ক্ষুধার্ত, শীতর্ত, মৃতপ্রায় মিখাইলকে আশ্রয় দিল, দিল খাদ্যপানীয় আর পোশাক, সেদিন মিখাইল প্রথম সত্যের সন্ধান পেল। ‘মানুষের প্রেম আছে’, জানল সে। দাস্তিক বদমেজাজি ভদ্রলোকটি জানতেন না যে, তাঁর মৃত্যুলাগ্ন আসন্ন। মিখাইল তাঁকে দেখে বুঝল, ‘মানুষের আয়ু নেই।’ আর মারিয়াকে দেখে সে জানল, ‘মানুষ বাঁচে মানুষের জন্যে।’ অভিষাপ-পর্ব শেষ। স্বর্গে ফিরে যায় স্বর্গের দেবদূত।

তলস্তয়ের একটি বিখ্যাত গল্প এটি। নাম ‘মানুষ কী নিয়ে বাঁচে’। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে তিপান্ন বছর বয়সে এ গল্প লেখেন তিনি। মানুষের জীবনের সত্যিকার সার্থকতাতুঁকু এ গল্পে তুলে ধরেন তলস্তয়।

রাশিয়ার অন্যতম এক অভিজাত পরিবারে বনেদি জমিদার বংশে জন্ম তলস্তয়ের (জন্ম ২৮ আগস্ট, ১৮২৮)। মস্ত বড় জমিদারির মালিক ছিলেন। প্রথম জীবন কেটেছে বিলাসে, ব্যসনে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থ, প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সম্মান প্রভৃতির প্রতি ক্রমশই বিরাগ জেগেছে তাঁর। অভিজাত্যের পোশাকটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের আপনজন হতে চেয়েছেন। উপলব্ধি করেছেন, প্রাচুর্যের মধ্যে শাস্তি নেই; ভোগ সুখের মধ্যে রয়েছে গ্লানি আর অবসাদ; মানুষের আয়ু সীমিত; অর্থহীন তার দস্ত। মানুষের জীবন সার্থক হয়ে ওঠে, একের প্রতি অন্যের প্রেমে, সহানুভূতিতে: আত্মত্যাগ আর সেবার আদর্শই মানুষকে দিতে পারে শাস্তি। মানুষের প্রতি মমতার অন্ত নেই তাঁর। বঞ্চিত, লাঞ্চিত, পীড়িত মানুষ জনের দুঃখ-দুর্দশায় তিনি ব্যথা পান; মমতা-স্নিগ্ধ অন্তর নিয়ে তাদের পাশটিতে গিয়ে দাঁড়ান, তাদের ভালবাসেন, ভালবাসতে বলেন। মানুষের ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্য, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, কামনা-বাসনা ইত্যাদির সঙ্গে অপরিচয় ছিল না তাঁর। রাশিয়ার অভিজাত-অনভিজাত সমস্ত শ্রেণির মানুষের সঙ্গেই অবাধে মেলামেশা করেছেন তিনি। অভিজাত সমাজের জাঁকজমক আড়ম্বরপ্রিয়তা, বিত্ত প্রদর্শনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা, ক্ষমতা ও খ্যাতিলোলুপতা, ভড়ং-ভঙামি, স্বার্থপরতা আর দস্ত তাঁকে আহত করেছে। তুলনায় বরং সাধারণ মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধের উজ্জ্বল প্রকাশ দেখেছেন তিনি। তাদের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহযোগিতা, প্রেম ও ঈশ্বর নির্ভরতা আশ্চর্য করেছে তাঁকে। মানুষের কাছে পৃথিবী যে আজও বাসযোগ্য, তলস্তয়ের ধারণা, তার মূলে আছে কিছু সংখ্যক মানুষের প্রেম, দয়া করুণা আর শুভবুদ্ধি।

রুশ কথা সাহিত্যের ইতিহাসে উনিশ শতক এক স্বর্ণযুগ। পুশকিন (১৭৯৯-১৮৩৭), দস্তয়েভস্কি (১৮২১-১৮৮১), চেকভ (১৮৬০-১৯০৪), গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬) প্রমুখ প্রতিভাবান কথাশিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে এ শতকে। সবার ওপরে আছেন তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০)। পরম মমতার সঙ্গে অবহেলিত উপেক্ষিত সাধারণ মানুষের ব্যথা-বেদনার কথা প্রথম শোনা গেল পুশকিনের গল্পে। গোগোল তাঁর গল্পে বললেন হৃদয়হীন আমলাতন্ত্রের জাঁতাকলে পিষ্ট শোষণক্লিষ্ট মানুষের কথা। সমাজের গভীরে যে দুরারোগ্য ব্যাধি জাঁকিয়ে বসেছে, চিকিৎসক-গল্পকার চেকভ তার মূলোচ্ছেদ করতে চাইলেন; সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্ন দেখলেন বিপ্লবের। গল্পে ঝোড়ো পাখির গান শোনালেন গোর্কি; সে ঝড় বিপ্লবের। তিজ্ঞতার মধ্যেও মানব প্রেমে মুখর হয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠ। আর তলস্তয়? তুলনাহীন তিনি। পৃথিবীর

চিরকালের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের একজন তলস্তুয় গল্প সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করেছেন। প্রায় পঞ্চাশটির মত গল্প লিখেছেন তিনি। ব্যাপ্তি, বৈচিত্র্য ও গভীরতার স্বাদ পাওয়া যায় তাঁর গল্পগুলোতে।

একদা প্রথম জীবনে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৪-১৮৫৬) যোগ দিয়েছিলেন তলস্তুয়। সে অভিজ্ঞতা যেমন মহাকাব্যোপম উপন্যাস ‘যুদ্ধ ও শান্তি’-তে (১৮৬৪) ব্যবহার করেছেন তিনি, তেমনি কাজে লাগিয়েছেন ‘সেবাস্তোপল-এর কাহিনিগুচ্ছ’ তে (প্রথম অংশ রচিত হয় ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন। শেষাংশ ২৭ ডিসেম্বর)। তলস্তুয় ওই কাহিনিগুচ্ছের পাঠকদের নিয়ে যান আহত সৈনিকদের গুশ্রাষা-সদনে, বীভৎস বিষণ্ণ এক পরিবেশে। পরিচয় করিয়ে দেন মানুষের তুলনাহীন যন্ত্রণা এবং বিস্ময়কর সহ্যশক্তির সঙ্গে। নিয়ে যান অত্যন্ত বিপজ্জনক চার নম্বর দুর্গে। পদে পদে যেখানে হাতছানি দিয়ে ডাকে মৃত্যুদূত; গোলাবারুদের গন্ধে বাতাস হয়ে ওঠে উত্তাল, স্বদেশপ্রাণ সৈনিকদের দুর্গরক্ষার সংকল্প হয়ে ওঠে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর। যুদ্ধক্ষেত্রে, সৈনিকদের ছাউনিতে নিয়ে যান তিনি। দেখান, মৃত্যুশঙ্কার মধ্যে পদোন্নতি ও বীরত্ব-পদক লাভের স্বপ্নে বিভোর সৈনিককে, দেখিয়ে দেন এক দেশের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও অনভিজাত বংশীয় সৈনিকদের প্রতি অভিজাত বংশীয় সৈনিকদের অবজ্ঞাটুকু। যুদ্ধের অনুপুঞ্জ ছবি আঁকেন তিনি। বীরত্ব, সাহস, দেশপ্রেম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, লোভ, ঘৃণা, হতাশা, পাপ, অনুতাপ ইত্যাদি যে ছবিতে মূর্ত হয়ে ওঠে। আর শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন তোলেন তলস্তুয়, কেন এই যুদ্ধ? যুদ্ধ তো নিছক একটা পাগলামি। বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন জীব হিসেবে মানুষের যে বড়াই তা কী তবে অর্থহীন নয়? শুভবুদ্ধির বড়াই অভাব মানুষের। কাহিনিগুলি পড়ে অভিভূত হয়েছিলেন সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজান্ডার। ফরাসি তর্জমায় সেগুলি পড়তে পড়তে সম্রাজ্ঞীর চোখের পাতা ভিজে উঠেছিল। রাতারাতি ছড়িয়ে পড়েছিল তলস্তুয়ের সাহিত্যিক খ্যাতি।

শুভবুদ্ধির সঙ্গে অশুভবুদ্ধির দ্বন্দ্ব তাঁর একাধিক গল্পের উপজীব্য। এ ধরনের গল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ‘শয়তান’ গল্পটি। তলস্তুয়ের ব্যক্তিগত জীবনাভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত এ গল্প। প্রথম যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের কথা পরিণত বয়সে নানা সময়ে নানাভাবে অকপটে স্বীকার করেছেন তিনি। মৃত্যুর তিন মাস আগেও গুণমুগ্ধ ভক্ত বিবুভকে তিনি বলেছেন: ‘আমার সম্বন্ধে সব সময় ভাল কথাই শুধু লেখো কেন? তা কি ঠিক? তাতে কি আমাকে সম্পূর্ণ জানা হল? মন্দ কথাগুলোও তো জানানো উচিত? আমার যৌবনে আমি খুব বাজে জীবন কাটিয়েছি, বিশেষ করে দুটি ব্যাপার এখনো আমাকে নাড়া দেয়। ... বিয়ের আগে আমাদের গ্রামের এক চাষী বউয়ের সঙ্গে একটা ব্যাপার ছিল আমার, যার উল্লেখ রয়েছে ‘শয়তান’ গল্পে। তারও আগে আমার পিসির এক পরিচারিকা মাশার সঙ্গে গড়ে ওঠে অবৈধ সম্পর্ক। মাশা ছিল কুমারী, আমি তার কুমারীত্ব নষ্ট করেছিলাম। চাকরি যায় তার, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।’ ‘শয়তান’ গল্পটি সেই স্বীকারোক্তির অন্যতম এক দলিল। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ নভেম্বর এ গল্প লেখেন তলস্তুয়। গল্পের নায়ক এক জমিদার। ইউজেন তার নাম। বিয়ের আগে বিবাহিতা এক চাষি রমণী স্তেপানিদার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয় সে। এক সময় শিক্ষিতা শহুরে লিজাকে বিয়ে করে ইউজেন। স্তেপানিদার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখে না। লিজা তাকে সুখী জীবনের স্বাদ দেয়। বেশ কয়েকটি বছর কেটে যায় লিজার উষ্ণ সান্নিধ্যে। কিন্তু ভুলতে পারে না হাস্যলাস্যময়ী, জীবন চাঞ্চল্যে ভরপুর স্তেপানিদাকে। স্তেপানিদার প্রতি দুর্নিবার এক আকর্ষণ ক্রমশই প্রবল হয়ে ওঠে। আত্মসংযমের সমস্ত চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হয়, তখন আত্মহত্যা করে চিত্তজ্বালা থেকে চিরকালের জন্যে মুক্তি পায় ইউজেন। দ্বন্দ্বিত ইউজেন এ ভাবেই অশুভ বুদ্ধিকে প্রতিহত করে। তলস্তুয়



বেঁচে থাকতে অবশ্যি এ গল্প প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর (মৃত্যু: ৭ নভেম্বর, ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ) পর, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে।

চোদ্দ বছর বয়সে কাজান-এ পিসির বাড়িতে বেড়াতে যান তলস্তয়। এক বন্ধুর সঙ্গে নিষিদ্ধ পল্লিতে গেলেন। কিছু অভিজ্ঞতা হল। সেই অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে লিখলেন ‘বিলিয়ার্ড হিসাব রক্ষকের জবানি।’ শুভ-অশুভ বোধের দ্বন্দে রক্তাক্ত চিত্ত নেখলয়ুদব এ গল্পের নায়ক। উচ্ছ্বল এই নায়কটি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে অনুশোচনা আর গ্লানির হাত থেকে রেহাই পায়।

‘সের্গেইবাবা’ (রচনা ১৮৯৮ খ্রিঃ, প্রকাশ মৃত্যুর পরে) ঋষি-প্রতিম এক মানুষের নৈতিক অধঃপতন ও অধঃপতন প্রতিরোধের প্রাণপণ প্রয়াসের কাহিনি। অভিজাত বংশীয়, সুদর্শন স্তেপান কাসাৎস্কি সংসার জীবনে বিতৃষ্ণ হয়ে প্রথম যৌবনে সন্ন্যাস নেয়। সেগেই তার সন্ন্যাস জীবনের নাম। একের পর এক অনেকগুলি মঠে ঈশ্বর-চিন্তায় কেটে যায় তার জীবনের অনেকগুলি বছর। উনপঞ্চাশ বছর বয়সে নির্জন মঠে গভীর রাতে ধনী-কন্যা, স্বভাব-চঞ্চল, ইন্দ্রিয়পরায়ণা সুন্দরী মাভকিনার আবির্ভাব ঘটল। সন্ন্যাসী সের্গেইকে প্রতারণা করাই তার উদ্দেশ্য। ছলনাময়ী মাকিনার সমস্ত ছলনাই কিন্তু সের্গেইয়ের কঠোর আত্মসংযমে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হল। অনুতাপের আগুনে দন্ধ হল মাকিনা। তার জীবনে ঘটল বিরাট পরিবর্তন। সংসার ত্যাগ করল, বেছে নিল সন্ন্যাসিনীর জীবন। ঘটনাটি চাপা থাকল না। সের্গেইয়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল দূরে দুরান্তরে। লোকে তাকে জানল অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে। মঠ কর্তৃপক্ষ এই খ্যাতিকে অর্থাগমের কাজে ব্যবহার করতে লাগল। প্রতিদিন চারদিক থেকে নানা প্রলোভন হাতছানি দিতে লাগল সের্গেইকে। সের্গেইয়ের জীবন অশান্তিতে ভরে উঠল। গোপনে মঠ থেকে পালাল সে। চাষির পোশাকে তীর্থযাত্রীর মত গ্রামে-গঞ্জে ঘুরতে লাগল। অসংখ্য মানুষের দরজায় গেল সে। কেউ কেউ উপেক্ষা দেখালেও, অনেকেই দেখাল দয়া ও করুণা। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি সমস্ত রিপুকে জয় করল সে। এক সময় দেশের আইনরক্ষকদের বিচারে শাস্তি পেল সেগেছি। অপরাধ তীর্থযাত্রীর কোনও পাসপোর্ট ছিল না তার সঙ্গে। সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হল তাকে। সেখানে তার দিন কাটতে লাগল চাষির বাগানে কাজ করে, গ্রামের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে, আর রোগীর সেবা শুশ্রূষা করে। ঈশ্বর-সেবার যথার্থ পথ খুঁজে পেল সে। তলস্তয় মনেপ্রাণে ছিলেন ঈশ্বর বিশ্বাসী। ঈশ্বর মঙ্গলময়, প্রেমময়, একথা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন তিনি। কিন্তু ধর্মের নামে ভড়ং-ভঙমি ছিল তাঁর অসহ্য। ঈশ্বর মঠে থাকেন না, সাধারণ মানুষের মধ্যেই রয়েছেন তিনি। সাধারণ মানুষের সেবাই হল সত্যিকার ঈশ্বরসেবা, এই ছিল তাঁর ধারণা। এই ধারণার কথাই নানাভাবে তিনি শুনিয়েছেন ‘সের্গেই বাবা’, ‘মানুষ কী নিয়ে বাঁচে’, ‘দুই তীর্থযাত্রী’, ‘যেখানে প্রেম, সেখানেই ঈশ্বর’ প্রভৃতি গল্পে।

জেরুজালেম-পথিক দুই বন্ধুকে নিয়ে গড়ে উঠেছে ‘দুই তীর্থযাত্রী’ (১৮৮৫) গল্পটি। তলস্তয় বলেন, সত্যিকার তীর্থ পুণ্য ঘটে মানুষের সেবা আর কল্যাণে। ভক্তি এবং মানবতাবোধ হাত ধরাধরি করে চলেছে এ গল্পে। ভক্তি-বিশ্বাস লাভ করেছে নবতর তাৎপর্য।

‘যেখানে প্রেম, সেখানেই ঈশ্বর’ (১৮৮৫) গল্পের নায়ক এক মুচি। নাম: মার্তিন আভদিচ। খুবই গরিব সে। একতলার একটি ছোট ঘরে বসে জুতো বানায় সে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে দেখতে পায় পথ-চলতি মানুষের পা। রাতের বেলা ঘুমোতে যাওয়ার আগে বেশ কিছুক্ষণ বাইবেল পড়ে মার্তিন। অভ্যাস মত এক শীতের রাতে সে পড়ছিল বাইবেল। সে রাতে পড়ছিল বাইবেলের একটি বিশেষ অংশ, সেন্ট লুকের পর্ব-১, সংখ্যা-৩, জানুয়ারি, ২০২৫

সপ্তম অধ্যায়। সেখানে খ্রিস্ট ধনী ফারিসিকে বলছেন, ধনীর কাছে যান না তিনি, গরিবেরাই তাঁর প্রিয়। কেন না তারাই অকাতরে তাঁকে সব কিছু দিতে পারে। পড়তে পড়তে চোখে ঘুম নেমে আসে মার্তিনের। হঠাৎ যেন কার কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে সে, ‘মার্তিন, কাল সকালে তোমার কাছে আসবো আমি। রাস্তা পানে নজর রেখো।’ চঞ্চল হয়ে ওঠে মার্তিন। সকাল থেকে ব্যাকুল চিণ্ডে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

আসে এক বুড়ো সৈনিক। স্তেপানোভিচ্। রাস্তার বরফ পরিষ্কার করে করে যে ক্লাস্ত আর অবসন্ন। মার্তিন তাকে গরম চা দেয়, ছোট্ট ঘরটিতে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিতে বলে। স্তেপানোভিচ্ চলে যায়। শিশুকোলে এক দীন দুগ্ধিনী মাকে দেখতে পায় মার্তিন। ডাক দেয় তাকে। দেয় ক্রটি আর গরম চা। ঠান্ডা থেকে বাঁচবার জন্যে দেয় পুরনো পোশাক। শিশুকে নিয়ে চলে যায় মা-টি। এমন সময় চোখে পড়ে, এক ফলওয়ালি পুলিশের হাতে তুলে দিতে চলেছে রাস্তার একটি ছেলেকে। ছেলেটির অপরাধ, ক্ষিধের জ্বালায় সে ওই ফলওয়ালির ঝুড়ি থেকে আপেল চুরি করেছে। খ্রিস্টের ক্ষমা করণার বাণী শুনিয়া ফলওয়ালি আর ছেলেটির মনের পরিবর্তন ঘটায় মার্তিন। এরপর ব্যাকুল প্রতীক্ষায় সমস্ত দিনটা কেটে যায় তার। কিন্তু খ্রিস্ট তো আসেন না। রাতের বেলা আবার বাইবেলের পাতা খোলে মার্তিন। ঘরের কোণ থেকে কে যেন ডাক দেয় ‘মার্তিন,’ ‘কে-কে তুমি?’ চমকে ওঠে মার্তিন। উত্তর আসে ‘আমি।’ তারপর একে একে তার সামনে দিয়ে মৃদু হেসে চলে যায় সকালবেলার সেই অতিথিরা স্তেপানোভিচ্, শিশুকোলে দীনদুগ্ধিনী মা, ফলওয়ালি ও রাস্তার ছেলেটি। বাইবেলের খোলা পাতাটির দিকে চোখ যায় মার্তিনের। দেখে, সেখানে লেখা রয়েছে, আমার ক্ষিধে পেয়েছিল, তুমি আমাকে খাবার দিয়েছ; আমার তেষ্টা পেয়েছিল, তুমি আমার তেষ্টা মিটিয়েছ। আমার মত অচেনাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ।’ পাতা উল্টে যায়। মার্তিন পড়ে, ‘আমার ভাইয়েদের জন্যে যা করেছে তা তো আসলে করেছে আমারই জন্যে।’ ঈশ্বরকে পেতে চাও? দুস্থ মানুষের সেবা করো। একথাই বলতে চান তলস্তুয়। অনেক অনেকদিন আগে এমনি কথাই শুনিয়াছিলেন গৌতম বুদ্ধ (তাঁর জীবনবাণীর সঙ্গের পরিচয় ছিল তলস্তুয়ের)। তলস্তুয় সমকালীন স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) এবং পরবর্তীকালের গান্ধীজিও (১৮৬৯-১৯৪৮) বলেছেন ওই ধরনের কথা।

লোভ হল মানুষের এক বড় শত্রু। লোভ জয় করতে বলেন তলস্তুয়। ‘মানুষের কতখানি জমি দরকার’ (১৮৮৬) নামক গল্পে লোভের মর্মান্তিক পরিণামটি দেখিয়ে দেন। গল্পটি এক চাষিকে নিয়ে। পাখোম তার নাম। সামান্য কিছু জমি ছিল তার। একদিন সে তার স্ত্রীকে বলল: ‘আরও যদি কিছুটা জমি পেতাম, তাহলে কাকেও তোয়াক্কা করতাম না, এমনকি শয়তানকেও না।’ শয়তানের কানে গেল কথাগুলো। অল্পদিনের মধ্যেই পাখোমকে আরও খানিকটা জমি পাইয়ে দিল শয়তান। যে জমি পাখোমের হাতে এল, তাতে খাওয়া-পরার ভাবনা থাকে না। দিব্যি চলে যায়। পাখোমের মনে কিন্তু শান্তি নেই। তার লোভ বেড়ে গেল। অনেক-অনেক জমি চাই তার। মস্ত বড়লোক হতে হবে তাকে। শয়তানের কারসাজিতে পুরনো জমি-জায়গা মোটা দামে বেচে নতুন জায়গায় গিয়ে কম দামে অনেক জমি কেনে সে। কিন্তু তাতেও তার জমির ক্ষিধে মেটে না। আরও জমি চাই, আরও অনেক জমি। সে শুনতে পায়, বাসকিরদের দেশে খুব সস্তায় পাওয়া যায় অঢেল ভাল জমি। সোনা ফলানো যায় তাতে। ছুটে যায় সে। বাসকিররা তাকে জমি দিতে রাজি হয়। শর্ত হয়, একটি বিশেষ স্থান থেকে রওনা দিয়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের মধ্যে যতখানি জমি সে পায়ে হেঁটে ওই বিশেষ স্থানটিতে ফিরে আসতে পারবে ততোখানি, জমিরই মালিক হবে সে। লোভে চকচক করে ওঠে পাখোমের চোখ দুটো। যথা সময়ে সে ছুটতে শুরু করে। জোরে জোর অনেক জোরে। অনেক অনেক জমির

মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখে। দিন শেষ হয়ে আসে। যাত্রা গুরুর স্থানটিতে ফিরতে থাকে সে। একসময় ফিরেও আসে। কিন্তু ক্লান্ত অবসন্ন পাখোম মুখ খুবড়ে মাটিতে পড়ে যায়। মারা যায় পাখোম। সেখানেই কবর দেওয়া হয় তাকে। আর এজন্যে মাত্র সাড়ে সাত হাত জমির দরকার হয়।

তলস্তয় তাঁর রূপক-গল্পের মাধ্যমে এভাবেই আমাদের সতর্ক করে দেন। অসংখ্য পাংখানকে অপঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে চান।

লোভের আর এক ছবি পাই ‘মনিব ও চাকর’ গল্পে। সস্তায় একটি বড় জঙ্গল কেনার জন্যে বরফ ঝড়কে তোয়াক্কা না করে রাস্তায় বের হয়েছিলো ভাসিলি। বিভবান সে। কিন্তু তার প্রচণ্ড লোভ তাকে আরও বিভোর কাঙাল করে তুলল। বরফ ঝড়ে রাস্তা হারাল ভাসিলি। রাস্তার মাঝখানটিতেই মৃত্যু ঘটল তার। অথচ আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেল নিকিতা, তার বিশ্বস্ত ভূতটি, যে বহু কষ্ট সহ্য করেও প্রভুকে আরাম দিতে চেয়েছে, বাঁচাতে চেয়েছে। তার সেবা আর মমতাই রক্ষা করল তাকে।

কিন্তু লোভ তো শুধু জমি আর জঙ্গলের জন্যেই নয়। সুন্দরী পরশ্রীর প্রতি লোভের পরিণামও দেখিয়েছেন তলস্তয়। ভল্লা অঞ্চলে প্রচলিত একটি লোককথা অবলম্বনে রচিত ‘ফাঁকা ঢাক’ (১৮৯১) তার উদাহরণ। মজুর এমেল্যানের রূপসী স্ত্রীকে দেখে লোভ হয়েছিল রাজামশায়ের। ছলে বলে কৌশলে রাজামশায় তাকে লাভ করতে চেয়েছিলেন। ফলে তাঁকে কী নাকালটাই না হতে হল।

লাঞ্ছিত উৎপীড়িত গরিব দুঃখী মানুষের জন্যে অপার মমতা তলস্তয়ের। শ্রমজীবী সাধারণ মানুষেরা তাই তাঁর গল্পগুচ্ছের আঙিনায় বারংবার এসে দাঁড়ায়। কৃষককুলের দুঃখ দুর্দশাও ব্যথিত করেছে তাঁকে। নিজে জমিদার হয়েও তাই জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছেন। বারংবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন, তাঁর সমস্ত জমিজমা তাঁর গরিব চাষি প্রজাদের বিলিয়ে দেবেন। কিন্তু নিকট পরিজনের বিরোধিতায় সে ইচ্ছে পূর্ণ হয়নি তাঁর। চেয়েছেন গরিব চাষির মত সাদাসিধে জীবন যাপন করতে। রাশিয়ায় এক সময় ভূমিদাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। বংশ-পরম্পরায় ক্রীতদাসের মত জীবন যাপন করতে হত তাদের। ওই প্রথার বিরুদ্ধে তাই ক্রমশ বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। পুশকিন ও তলস্তয়ের মত আরও অনেকেই সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ‘পলিকুশকা’-র (১৮৬২) মত গল্পে পাই সেই প্রতিবাদপ্রবণতার পরিচয়। গল্পটি ভূমিদাস প্রথার ভয়াবহতার একটি মূল্যবান দলিল হিসেবেই বিবেচিত হবে। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে অবশ্য আইন করে ভূমিদাস প্রথা তুলে দেওয়া হয়।

‘বল নাচের পরে’ (১৯০৩) গল্পে আর এক ধরনের নৃশংস অত্যাচারের ছবি এঁকেছেন তিনি। দুটি সৈন্য আড়াআড়ি ভাবে ধরে রয়েছে একটি বন্দুক। তার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা হয়েছে এক তাতারকে। কোমর পর্যন্ত কোনও পোশাক নেই তার। গলা বরফের ওপর দিয়ে তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে একদল সৈনিক। আর দুপাশ থেকে অনবরত তার ওপর হচ্ছে ঘুমিষ্টি। রক্ত ঝরছে তার শরীরে। টলছে তার পা দুটো। তার দয়া প্রার্থনায় কেউ কান দিচ্ছে না। অপরাধী (অপরাধ সামান্যই) ওই তাতারের ওপর নৃশংস অত্যাচারের নির্দেশ দিচ্ছে যে কর্নেলটি তারই সুন্দরী কন্যার প্রেমে পড়েছিল আইভান ভাসিয়েভিচ। ওই নির্ধূর দৃশ্যে সে এত বিচলিত হয়ে পড়ে যে, কর্নেল-কন্যার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কটিই চুকিয়ে দেয়।

তলস্তয়ের কোনও কোনও গল্প আকারে বেশ বড়। যেমন, ‘দুই হুজুর’ (১৮৫৬), ‘আইভান ইলয়ি এর মৃত্যু’ (১৮৮৬), ‘শয়তান’ (১৮৮৯), ‘সেগেইবাবা’ (১৮৯৮) প্রভৃতি গল্প। এগুলি নভেলা জাতীয়। আবার

‘চীনা মাটির পুতুল’ (রচনা ১৮৬৩; প্রকাশ মৃত্যুর পরে), ‘ভালুক শিকার’ (১৮৭২), ‘ঈশ্বর সত্যদ্রষ্টা কিন্তু অপেক্ষাপ্রবণ’ (১৮৭২), ‘ইলিয়াস’ (১৮৮৬), ‘তিন সাধু’ (১৮৮৬), ‘অনুতপ্ত পাপী’ (১৮৮৬), ‘ক্রীসাস ও সোলন’ (১৮৮৬), ‘ফাঁকা ঢাক’ (১৮৯১), ‘আসিরিয়ার রাজা এসারইডাদন’ (১৯০৩), ‘কাজ, মৃত্যু ও ব্যাধি’ (১৯০৩), ‘তিনটি প্রশ্ন’ (১৯০৩), ‘আলেশা ভাঁড়’ (রচনা ১৯০৬ প্রকাশ ১৯১১) প্রভৃতি ছোট আকারের গল্পও লিখেছেন তিনি। সার্থক ছোটগল্প হিসেবে অবশ্য ‘মানুষ কী নিয়ে বাঁচে’ (১৮৮১), ‘দুই তীর্থযাত্রী’ (১৮৮৫), ‘যেখানে প্রেম, সেখানেই ঈশ্বর’ (১৮৮৫), ‘মানুষের কতখানি জমি দরকার’ (১৮৮৬) ইত্যাদি গল্প বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর বেশ কয়েকটি গল্পে পাই লোককথার চঙে। উত্তম পুরুষের জবানিতে যেমন গল্প শুনিয়েছেন তিনি, তেমনি শুনিয়েছেন প্রথম পুরুষের জবানিতে। ডায়েরির ধরনটিও কোনও কোনও গল্পে দেখা যায়। সন্দেহ নেই, গল্প-কথনে তিনি রীতি-বৈচিত্র্যের সাহায্য নিয়েছেন।

গল্পকার তলস্তয় উদ্দেশ্যপ্রবণ। বিশেষ কোনও বক্তব্য প্রতিপাদনই তাঁর অভিপ্রায়। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যে কলম ধরেননি তিনি। মানুষের মঙ্গল-কল্যাণের সঙ্গে যোগ আছে এমন কোনও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়বস্তুই তাঁর গল্পের উপজীব্য। মানুষের আত্মাকে স্পর্শ করতে চান তিনি। সন্দেহ নেই, তলস্তয় নীতিবাদী। কিন্তু সেই নীতিবাদ প্রায়শই জাতশিল্পীর কলমে হয়ে উঠেছে অপূর্ব শিল্পশ্রীমণ্ডিত। বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে তাঁর গল্প।

মানুষকে ভালবাসেন তিনি। মানুষের কল্যাণ চান। অত্যাচার নয়, উৎপীড়ন নয়, মানুষ মানুষকে ভালবাসুক, এটাই কাম্য তাঁর। মানুষের স্থূল বস্তুগত উন্নতিটুকুই তাঁর কাম্য নয়, আধ্যাত্মিক উন্নতিও ঘটতে চান তিনি। যুগপৎ ব্যক্তি ও সমষ্টির ক্ষণিক ও চিরন্তন উন্নতি তাঁর লক্ষ্য। আর এজন্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের ভ্রাতৃত্ব-সম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষপাতী তিনি স্বার্থজর্জর মানুষের কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা, দম্ভ ও কপটতার কথা ভুলে যাননি তলস্তয়। কিন্তু আস্থা হারাননি মানুষের শুভবুদ্ধিতে। মানুষ এগিয়ে যাবে, এ বিশ্বাস ছিল তাঁর। ভবিষ্যতের এক মহৎ, উজ্জ্বল, শোষণহীন, সুখী ও সমৃদ্ধ পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন তলস্তয়। সেই স্বপ্নেরই স্বর্ণফসল তাঁর গল্পগুচ্ছ।



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 467-474

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.034



## বহির্ভঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে পার্বত্য ত্রিপুরা

ড. খেলন দাস হালদার, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা, আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত

### Abstract

*For centuries now, Bengali language and literature has flourished in Tripura and has become an integral part of its society and cultural identity. During monarchy, from around 5th-6th century AD the influx of Bengali speaking people began in Tripura which has had a profound impact on the Kingdom of Tripura, its Royal family and also on its literature and culture.*

*In 14th century AD, Maharaja Ratna Manikya settled a large population of Bengalis from Bengal Province into Tripura with the assent of Bengal's then ruler. Along with the spread of Bengali language, from 15th century AD onwards Bengali literature also started to flourish in Tripura.*

*In late 15th century AD, on the instructions of Maharaja Dhanya Manikya, Chantai Durlabhendra and poets Baneshwar and Shukreshwar compiled a chronicle of the Kings of Tripura, known as Rajmala (Pratham Lahar), which is considered to be one of the oldest examples of Bengali literature and composition. Thus, during the time Boro Chandidas's "Shree Krishna Kirtan" Kabya, Krittibas's "Shree Ram Panchali" Kabya & Chandidas and Bidyapati's 'Baishnab Padabali' were being composed in Bengal, a historical chronicle of the Kings of Tripura in Bengali was written in Tripura. Between 15th & 18th century, three more Lahar(parts) were subsequently added to it.*

*Since Medieval times till the recent years, the Kings of Tripura have supported and encouraged Bengali language and literature, including translation of Sanskrit Purana into Bengali, Vaishnab Padabali, poetry and prose and other forms of Bengali literature, with some of these even created by members of the Tripura Royal family.*

*In the 20th century, post India's independence, monarchy come to an end in Tripura, with it being integrated into India and a democratic system of government was established here. Since then, Bengali language and literature has developed immensely in the state. At present, the Bengali literary community of Tripura through their writing, research & craft has been contributing greatly to the enrichment of the already vast and rich Bengali literary repository.*

*Outside Bengal, the tiny north-eastern state of Tripura has made significant contributions to the enrichment, growth and development of Bengali language and literature. Its literary community has left a lasting and ever evolving impression on Bengali literature.*

**Keyword:** Tripura, Rajmala, Maharaja Dhanya Manikya, Vaishnav Padabali, Medieval Bengali Poetry, Bengali Literary History

বহির্বঙ্গে বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে বঙ্গ সংলগ্ন ত্রিপুরার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বহু প্রাচীন কাল থেকে ত্রিপুরা রাজ্য বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার সংস্রবে এসেছে এবং রাজন্য যুগে ত্রিপুরেশ্বরগণের বিশেষ আগ্রহ ও প্রয়াসে বাঙালি প্রজা সমাবেশ ঘটেছে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত হয়েছে।

প্রাচীনকালে ত্রিপুরা ছিল রাজন্য শাসিত। তবে ত্রিপুরার রাজবংশ প্রতিষ্ঠা তথা আর্ষ উপনিবেশ গড়ে উঠার আগে তা ছিল পার্বত্য ভোটচিনীয়া গোষ্ঠীর অন্তর্গত কিরাত<sup>১</sup> জাতি অধ্যুষিত কিরাত দেশ। ত্রিপুরার রাজবংশের প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ ‘শ্রীরাজরত্নাকরম’ অনুসারে সুপ্রাচীন কালে, পৌরাণিক যুগের কোন এক সময় গঙ্গাসাগরস্থিত ত্রিবেগ রাজ্যে অধিষ্ঠিত দ্রুহ্য<sup>২</sup> বংশীয় রাজা প্রতর্দন কর্তৃক কিরাত দেশ জয় ও উত্তর কাছাড়ে আদি রাজ্যের নামানুসারে কিরাতদেশে নতুন ‘ত্রিবেগ’ নামক রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

“চতুর্দশদিনান্তে তু ঘোরে সাংখ্যে প্রতর্দনঃ। বিজিগ্যে বহুকষ্টেন কিরাতিধিপতি নৃপ।।”<sup>১</sup>

অর্থাৎ চৌদ্দদিনের ঘোরতর যুদ্ধে প্রতর্দন বহুকষ্টে কিরাতিধিপতিকে পরাজিত করেছিলেন। বেশ কয়েক পুরুষ পর প্রতর্দন প্রতিষ্ঠিত দ্রুহ্য বংশে ত্রিপুর নামক প্রতাপশালী রাজার আবির্ভাব ঘটে এবং পরবর্তী কালে তাঁর নামানুসারে রাজ্যটি ত্রিপুর রাজ্য ও রাজবংশটি ত্রিপুর বংশ নামে অভিহিত হয়।

দ্রুহ্য বংশে দৈত্য রাজা কিরাত নগর। অনেক সহস্রবর্ষ হইল অমর।।

বহুকাল পরয়ে তান পুত্র উপজিল। ত্রিবেগেতে জন্ম নাম ত্রিপুর রাখিল।।”<sup>২</sup>

ত্রিপুর পুত্র ত্রিলোচন মহাভারতীয় যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক বলে ‘রাজমালা’র দাবি। ত্রিপুর রাজার কয়েক পুরুষ পরবর্তী মহারাজ দক্ষিণ-এর রাজত্বকালে উত্তর কাছাড় থেকে দক্ষিণ কাছাড়ের তথা বরাক উপত্যকার খলজায়<sup>৩</sup> ত্রিপুরার রাজপাট স্থানান্তরিত হয়। দক্ষিণ কাছাড় অঞ্চলটি বঙ্গদেশের শ্রীহট্ট সংলগ্ন। একটা সময় শ্রীহট্টেরও অনেকাংশ ত্রিপুর-রাজের অধিকারে এসেছিল, এমনকি ত্রিপুরার রাজপাটও একসময়, আনুমানিক খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে, মহারাজ প্রতীতের রাজত্ব কাল থেকে তৎকালীন শ্রীহট্টের অন্তর্গত ধর্মনগর, কৈলাসহর ইত্যাদি স্থানে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং দীর্ঘকাল তথায় অবস্থিত ছিল। এপ্রসঙ্গে ‘শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থে লেখক উল্লেখ করেছেন,

“ত্রৈপুর রাজগণের রাজধানী বহুকাল কৈলারগড়ে ছিল বলিয়া ইহা এক সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হইয়াছিল। কৈলারগড় বহুকাল হইতেই শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ প্রাচীনকালে শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশ ত্রৈপুর রাজহট্টের ছায়াতলে অবস্থিত ছিল।”<sup>৩</sup>

খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত কৈলাসহরে তথা উত্তর ত্রিপুরায় রাজপাট অবস্থিত ছিল বলে জানা যায়। ‘শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থে লেখক অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি বলেছেন জানিয়েছেন যে গিয়াস-উদ্দীনের সময় (খ্রিষ্টীয় ১২১২ অব্দ) শ্রীহট্টের পুণ্যভূমি প্রথম মুসলমান দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, সেই সময় কৈলারগড়ও আক্রান্ত হয়েছিল এবং মহারাজ কীর্তিধর শ্রীহট্টের সমতল ক্ষেত্রে অতঃপর রাজধানী রাখা নিরাপদ মনে করেন নাই। তখন রাজধানী কৈলাসহর থেকে কসবায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। লেখক আরও জানিয়েছেন,

“কসবা শ্রীহট্ট জিলাধীন নহে, সুতরাং কীর্তিধরের রাজত্বকাল পর্যন্তই শ্রীহট্টের ইতিহাসের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ।”<sup>৪</sup>



ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে ত্রিপুরার রাজপাট রাঙামাটি তথা দক্ষিণ ত্রিপুরার উদয়পুর স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয়, ক্রমশ মেহেরকুল, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ইত্যাদি অঞ্চল ত্রিপুরার অধিকারে আসে এবং অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজপাট উদয়পুর অবস্থিত থাকে। অতঃপর পুরাতন আগরতলা এবং সর্বশেষে আগরতলায় রাজপাট স্থানান্তরিত হয়।

খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত প্রায় সাত শত বৎসরের বেশি সময় ধরে ত্রিপুরার রাজপাট শ্রীহট্ট অঞ্চলে অবস্থিত ছিল, আর শ্রীহট্ট ছিল বৃহৎ বঙ্গের অন্তর্গত বাঙালি অধ্যুষিত একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল। বৃহত্তর বঙ্গের অন্তর্গত শ্রীহট্টেও বঙ্গদেশের পাশাপাশি একই সময় বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিকশিত হয়ে সমৃদ্ধ ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন বঙ্গদেশের সীমান্ত রাজ্য সমূহে এই বঙ্গ ভাষার ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। ধারণা করা যায় শ্রীহট্টের সূত্রে সুদীর্ঘ কাল ধরে বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার সান্নিধ্যে থাকার ফলে ত্রিপুরার রাজপরিবারের ভাষা ও সংস্কৃতিতে এই ভাষার ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। এই প্রসঙ্গে ‘রাজমালা’য় বঙ্গ নামে এক রাজার আমলে সর্বপ্রথম বাঙালি প্রজা স্থাপনের সংকেত রয়েছে, যিনি আনুমানিক পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে কোন এক সময় বর্তমান ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন মহারাজা যশ -

“তান পুত্র হইলেক বঙ্গ মহারাজা //আপনার নামে রাজা স্থাপিলেক প্রজা।”<sup>৬</sup>

মহারাজ বঙ্গ আপনার নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বঙ্গ জাতি তথা বাঙালি জাতির প্রজা স্থাপন করেছিলেন, এই কথা এখানে প্রকাশিত। মহারাজার বঙ্গ নামকরণের মধ্যেও বঙ্গদেশ ও বঙ্গ ভাষার সাহচর্যের ইঙ্গিত রয়েছে এবং সেই সাহচর্য শ্রীহট্টের মাধ্যমে ঘটেছিল বলে অনুমান করা যায়।

চতুর্দশ শতাব্দীতে রত্ন মাণিক্যের শাসনামলে, রাজার প্রয়াসে ত্রিপুরায় বিশেষ ভাবে বাঙালি উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। ‘শ্রীরাজমালা’ অনুসারে রত্ন মাণিক্য গৌড়েশ্বর সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের শাসনামলে (১৩৪৫-১৩৫৭ খ্রিঃ), তাঁর সৈন্য সহায়তায় ভ্রাতাদের বিতাড়িত করে রাজ্যলাভ করেছিলেন চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে। রাজ্য লাভের পর কৃতজ্ঞতা জানাতে বহু হস্তী উপঢৌকন রূপে নিয়ে গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। রত্ন মাণিক্য রাজ্য পরিচালনায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছিলেন। রাজ্যলাভের পূর্বে চার বৎসর গৌড়ে বসবাস কালে সেখানকার উন্নত প্রশাসনিক ব্যবস্থা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। ত্রিপুরায় বঙ্গের অনুরূপ প্রশাসন ব্যবস্থা প্রচলন ও পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে রত্ন মাণিক্য গৌড়েশ্বরের নিকট বাঙালি প্রজা প্রাপ্তির অনুরোধ করেছিলেন -

“গৌড়েশ্বর স্থানে পুনঃ কহিলেক আর।/বঙ্গলোক কত পাইলে রাজ্যেতে নিবার।।

পুনঃ দশ হস্তী দিল গৌড়েশ্বর তরে।/তুষ্ট হইয়া আজ্ঞা দিল বঙ্গ অধিকারে।।”<sup>৭</sup>

‘ত্রিপুরার জন্য গৌড়েশ্বরের নিকট বঙ্গলোক’ অর্থাৎ বাঙালি লোকজন প্রাপ্তির অনুরোধ রেখেছিলেন রত্ন মাণিক্য, কারণ বিদ্যা, বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা, ভাষা ও সংস্কৃতিতে বাঙালি জাতি যে অগ্রগণ্য, তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বঙ্গে বসবাস কালে। রত্ন মাণিক্যের প্রতি ছিল গৌড়েশ্বরের স্নেহ দৃষ্টি। অতএব প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছিলো -

“পরয়ানা করি দিল বার বাঙ্গালাতে।/ নবসেনা যতেক মিলানি করি দিতে।।

দশ হাজার ঘর বঙ্গ দিতে আজ্ঞা হৈল।/ বঙ্গে আসি সেনা চারি হাজার পাইল।।

ভদ্রলোক প্রভৃতি যতেক নবসেনা।/ স্বর্ণগ্রামে পাইল শ্রীকর্ণ কতজনা।।”<sup>৮</sup>

গৌড়েশ্বর পরয়ানা তথা আদেশপত্র করে দিলেন বার বাঙ্গালাতে। বার বাঙ্গালা বলতে বোঝানো হয়েছে বার ভূঁইয়ার শাসনাধীন বঙ্গদেশ। এককালে দ্বাদশজন ভৌমিক বা জমিদার কর্তৃক বঙ্গদেশ শাসিত হতো। মুসলমান নবাব বা সম্রাটগণ তাঁদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করতেন।

‘নবসেনা’ বলতে বোঝানো হয়েছে নবশাক জাতি, যেমন - গোপ, মালাকার, তিলি, তাঁতি, মোদক, বারুই, কুম্ভকার, কৰ্মকার, নাপিত ইত্যাদি নবসেনা মধ্যে গণ্য। শ্রীকর্ণ বা শ্রীকরণ কায়স্থ জাতির শাখা বিশেষ। লিপির ব্যবসায়ী বলে তারা এই রূপ আখ্যা পেয়েছে। ‘শ্রীরাজমালা’ অনুসারে ত্রিপুরায় রত্নমাণিক্যের রাজত্ব কালের বহু আগে থেকেই বাঙালি বসতি স্থাপিত হয়ে থাকলেও, পেশাভিত্তিক নানা জাতির বাঙালি বসতির সূচনা রত্ন মাণিক্যের রাজত্ব কালে শুরু হয়েছিল। রত্ন মাণিক্য চার বৎসর লক্ষণাবতীতে অবস্থান কালে তিন জন বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন চিকিৎসা ব্যবসায়ী, বৈদ্য বংশোদ্ভূত, ধনন্তরী গোত্রজ জয়নারায়ণ সেন; অপর দুই জন কায়স্থ জাতীয়। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম বড়খাণ্ডব ঘোষ, অপরজনের নাম পণ্ডিতরাজ। রত্ন মাণিক্য সিংহাসন লাভ করার পর এই তিনজনকে বিশেষ প্রস্তাব দ্বারা ত্রিপুরায় নিয়ে আসেন এবং তাদের সহায়তায় গৌড়ের মুসলমান শাসনের অনুকরণে রাজ্যের শাসন প্রণালী প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁরা ত্রিপুরেশ্বরের অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসেবে ‘বিশ্বাস উপাধি লাভ করেছিলেন। প্রশাসনিক দপ্তর থেকে শুরু করে নানা রকম শিল্প দ্রব্য ও জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, জিনিসপত্র উৎপাদনে, কৃষি ও মৎস্য চাষে বাঙালি প্রজারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছিল। কিরাত জাতি অধ্যুষিত, পার্বত্য, জঙ্গলাকীর্ণ একটি অনুন্নত রাজ্যকে সুসংস্কৃত, সভ্য, উন্নত রাজ্যে পরিণত করার লক্ষ্যে সেই চতুর্দশ শতকে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় সাতশত বৎসর পূর্বে রত্ন মাণিক্য গৌড়েশ্বরের নিকট রীতিমতো আবেদন জানিয়ে ত্রিপুরায় বিশাল সংখ্যক বাঙালি জাতি আনিয়েছিলেন এবং রাঙ্গামাটি সহ ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করিয়েছিলেন।

“সর্বজন মিলিলেক আর মিলে কুকি।/ প্রজা লোক সুখে বসে নাহি কেহ দুঃখী।।”<sup>৮</sup>

বাঙালি জাতি ও জনজাতির সম্মিলিত ধারা ত্রিপুরায় প্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি স্বাভাবিক গতিতে বয়ে চলেছে। বাঙালি জাতির সংস্রবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব পড়েছে ত্রিপুর রাজ পরিবার ও রাজ্যের উপর। বাংলা ভাষা চর্চা ও বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য ত্রিপুরেশ্বরগণ প্রাচীন কাল থেকেই ছিলেন যত্নশীল। যার ফলে পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে মহারাজ ধর্ম মাণিক্যের রাজত্ব কালে (১৪৩১-১৪৬১ খ্রিঃ), মহারাজের অনুজ্ঞায় বাংলা ভাষায় রাজবংশের ইতিহাস ‘শ্রীরাজমালা’র প্রথম লহর রচিত হয়। ধর্ম মাণিক্যের আদেশে চন্ডাই<sup>৯</sup> দুর্লভেন্দ্র এবং বানেশ্বর ও শুক্রেস্বর নামক রাজার সভাকবিদ্বয়(শ্রীহট্টের অধিবাসী) ‘রাজমালা’ প্রথম লহর রচনা করেছিলেন। রাজমালা রচনা কালে দুর্লভেন্দ্র বেদব্যাসের আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন এবং গণেশরূপী শুক্রেস্বর ও বাণেশ্বর, দুর্লভেন্দ্রর উক্তি বাংলা ভাষায় কবিতায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন। প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে ত্রিপুরায় বাংলা ভাষায় ইতিহাস ভিত্তিক কাব্য গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, বাংলা ভাষার জন্য তা কম গৌরবের বিষয় নয়। যখন বঙ্গদেশে বঙ্গ ভাষায় বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্য, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য, কৃত্তিবাস ওঝার অনুবাদ গ্রন্থ ‘শ্রীরাম পাঁচালি’ ইত্যাদি জনপ্রিয় সাহিত্য রচিত হচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা ভাষায় ‘শ্রীরাজমালা’ নামক অসাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ কাব্যাকারে রচিত হয়েছিল। বঙ্গদেশের বাইরে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে ত্রিপুরার এই অবদান অবিস্মরণীয়।

পরবর্তী কালে মহারাজ ধন্য মাণিক্য (১৪৯০-১৫১৫খ্রিঃ) পঞ্চদশ শতকের অন্তিম পর্বে বঙ্গ ভাষায় ‘উৎকল খণ্ড পাঁচালী’ এবং ‘যাত্রা রত্নাকরনিধি’ নামক গ্রন্থ রচনা করিয়েছিলেন। মহারাজ ধন্য মাণিক্য রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যাপারে বাংলা ভাষার ব্যবহার প্রচলন করেছিলেন যা অদ্যাবধি প্রচলিত।

মহারাজা অমর মাণিক্যের রাজত্ব কালে (১৫৭৭ খ্রিঃ -১৫৯১ খ্রিঃ), তাঁর আদেশমতে সেনাপতি রণচতুরনারায়ণের সহায়তায় ‘রাজমালা’র দ্বিতীয় লহর রচিত হয়।

মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য ও তৎপুত্র মহারাজ রামদেব মাণিক্যের অনুজ্ঞায় রাজপুরোহিত ও সভাপণ্ডিত গঙ্গাধর সিদ্ধান্তবাগীশ কর্তৃক খৃঃ সপ্তদশ শতকে ‘রাজমালা’র তৃতীয় লহর রচিত হয়েছে। খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্যের অনুজ্ঞায় ‘রাজমালা’র চতুর্থ লহর রচিত হয়। চতুর্থ লহরের বক্তা জয়দেব ঠাকুর, রচয়িতা বক্তার পুত্র দুর্গামণি ঠাকুর। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ‘শ্রীরাজমালা’র চারটি লহর বা খণ্ড বাংলা ভাষায় রচিত হয়। বঙ্গ ভাষায় ‘রাজমালা’ রচনার মাধ্যমে বঙ্গদেশের বাইরে বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য চর্চার এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করেছে ত্রিপুরা। প্রাচীন কাল থেকেই ত্রিপুরার রাজাগণ যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব থেকে ধারাবাহিকভাবে রচিত এই ‘রাজমালা’ গ্রন্থ।

ত্রিপুরার পাশাপাশি আরাকান, চট্টগ্রাম, কাছাড়, জয়ন্তীয়া, কোচবিহার ইত্যাদি প্রান্তীয় রাজ্য সমূহে রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্য রচনার সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। আরাকানের রোসাঙ্গ রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যযুগের(সপ্তদশ শতক) বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে দৌলত কাজীর ‘লোর চন্দ্রানী বা সতী ময়না’, সৈয়দ আলাওলের ‘পদ্মাবতী’। চট্টগ্রামের সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত (ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে) অনুবাদ কাব্য ‘পরাগলী মহাভারত’, ‘ছুটিখানী মহাভারত’। কাছাড়ের ডিমাছা রাজমাতা চন্দ্রপ্রভা দেবী অষ্টাদশ শতকে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন ‘বৃহন্নারদীয় পুরাণ’। ডিমাছা রাজ্যের রাজাগণ বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন। বাংলায় রচিত হয়েছে ডিমাছা রাজ্যের দণ্ডবিধি। প্রাচীন জয়ন্তীয়া রাজ্যেও একসময় বাংলা ছিল রাজভাষা। সেখানেও রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের চর্চা হয়েছে। জয়ন্তীয়ার শেষ রাজা রাজেন্দ্র সিং নিজেও একজন বৈষ্ণব কবি ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষকতা হয়েছে কোচবিহার রাজসভাতেও। ষোড়শ শতকে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ অহোম রাজা চুকাম্ফা স্বর্গদেবকে যে পত্র লিখেছিলেন - তা প্রাচীনতম বাংলা গদ্য রচনার প্রথম প্রামাণ্য দলিল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের এইসব বঙ্গদেশের প্রান্তীয় রাজ্যে বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে ত্রিপুরার ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত ‘শ্রীরাজমালা’ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে ধারাবাহিক ভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার সমৃদ্ধ ইতিহাস। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত ‘ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস’ গ্রন্থে শীতল চক্রবর্তী ‘রাজমালা’ প্রসঙ্গে বলেছেন -

“ইহা বাঙ্গালা ভাষায় বিরচিত এবং বঙ্গসাহিত্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা চৈতন্য চরিতামৃত’ ও কৃষ্ণিবাসের ‘রামায়ণে’র পূর্ববর্তী।”<sup>৯</sup>

অতএব লক্ষ্য করা যায়, মধ্যযুগের পঞ্চদশ শতক থেকে বঙ্গদেশের প্রান্তীয় রাজ্য ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা মর্যাদার সঙ্গে সাহিত্য চর্চায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

‘রাজমালা’ ব্যতীত আরও প্রচুর গ্রন্থ প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান যুগে ত্রিপুরায় বাংলা ভাষায় রচিত হয়ে চলেছে। ত্রিপুরার মহারাজা ধন্য মাণিক্য (১৪৯০-১৫২৯খ্রিঃ) বাংলা ভাষায় ‘উৎকল খণ্ড পাঁচালী’ ও ‘যাত্রা রত্নাকরনিধি’ নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করিয়েছিলেন। ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে কল্যাণ মাণিক্য (১৬২৬-১৬৬০খ্রিঃ) প্রথম বাংলা ভাষায় তাম্রশাসন প্রদান করেছিলেন। মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্য (১৬৬০-১৬৭৩খ্রিঃ) বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন ‘বৃহন্নারদীয় পুরাণ’। মহারাজা দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্যের রাজত্ব কালে (১৬৮৫-১৭১২খ্রিঃ) বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে ‘চম্পক বিজয়’ নামক একটি সুন্দর ঐতিহাসিক কাব্য। জগৎ মাণিক্য ১৭২৬ খ্রিষ্টাব্দে অনুবাদ করিয়েছিলেন পদ্মপুরাণের অন্তর্গত ‘ক্রিয়াযোগসার’ গ্রন্থ।

রাজধর মাণিক্যের রাজত্ব কালে (১৭৮৫-১৮০৬খ্রিঃ) বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের (১৭৬০-১৭৮৩ খ্রিঃ) সংঘাতময় জীবন ও বীরত্বের কাহিনী অবলম্বনে ‘কৃষ্ণমালা’ নামক একটি ঐতিহাসিক কাব্য। মহারাজা কাশীচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্ব কালে (১৮২৬-১৮২৯খ্রিঃ) বাংলা ভাষায় রচিত অপর একটি ঐতিহাসিক কাব্য ‘শ্রেণীমালা’।

কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৮২৯-১৮৪৯খ্রিঃ) মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় সমগ্র রাজমালাকে সংশোধিত ও পরিমার্জিত করে সংকলন করেছিলেন দুর্গামণি উজির।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য (১৮৬২-১৮৯৬খ্রিঃ) রাজ্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার অবশ্য প্রয়োজনীয় করে তুলেছিলেন। তাঁর রাজত্ব কালে রাজকীয় আইন কানুন বাংলা ভাষায় লিখিত রূপে প্রচারের সূচনা ঘটে এবং ত্রিপুরার সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূচনা হয় বীরচন্দ্রের আমল থেকেই। ‘ভগ্নহৃদয়’ কাব্য পাঠ করে কিশোর কবির মধ্যে ভুবনজয়ী কবি প্রতিভা আবিষ্কার করেছিলেন প্রথম বীরচন্দ্র মাণিক্য। তিনি নিজেও ছিলেন একজন বৈষ্ণব কবি। তাঁর রচিত কাব্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ‘হোরি’, ‘বুলন’, ‘প্রেম মরিচিকা’, ‘উচ্ছ্বাস’, ‘অকাল কুসুম’, ‘সোহাগ’ ইত্যাদি। শ্রীমঙ্গাগবত গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন তিনি। দীনেশ চন্দ্র সেন রচিত ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থটি মহারাজার অর্থানুকূলে প্রকাশিত হয়েছিল। মহারাজ বীরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ কন্যা রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবীর কবি প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তাঁর রচিত কাব্য গ্রন্থ গুলোর মধ্যে রয়েছে ‘কণিকা’, ‘শোকগাথা’, ও ‘প্ৰীতি’।

রাধাকিশোর মাণিক্যের রাজত্ব কালে (১৮৯৬-১৯০৯খ্রিঃ) সরকারি মুখপত্র রূপে বাংলা ভাষায় ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় ‘ত্রিপুরা স্টেট গেজেট’। বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের রাজত্ব কালে (১৯০৯-১৯২০খ্রিঃ) বাংলা ভাষা রাজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। তদানীন্তন মন্ত্রী বাহাদুর মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর অফিস আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে একটি সার্কুলারে স্পষ্ট লিখেছেন – “সর্ববিধ রাজকার্যে বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ এবং তদুপলক্ষ্যে ভাষার উৎকর্ষ বিধান করা শীশী যুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের একান্ত অভিপ্রেত।” (রাজ্য ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা, পান্না লাল রায়)। বীরচন্দ্র মাণিক্যের পুত্র বড় ঠাকুর সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মাও একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। তিনি ‘ভারতীয় স্মৃতি’, ‘ত্রিপুরার স্মৃতি’ ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেছেন। রাজ আমলের অপর একজন খ্যাতিমান লেখক কর্ণেল মহিম ঠাকুর। বীরচন্দ্র এবং রাধা কিশোর – দুই আমলে তিনি রাজ সরকারের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর রচিত ‘দেশীয় রাজ্য’ একটি বিখ্যাত গদ্য গ্রন্থ। এর ভাষা ভঙ্গিমা ও রচনা শৈলী অত্যন্ত উন্নত মানের।

বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য(১৯২৩-১৯৪৭খ্রিঃ) পূর্বতন রাজাদের মতোই বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নিজে একজন কবি, নাট্যকার ও সঙ্গীতকার ছিলেন। তিনি একটি ঐতিহাসিক নাটক ‘জয়াবতী’ এবং হোলি বিষয়ক একটি সংগীত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি ‘ভারতভাস্কর’ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। বীরচন্দ্র থেকে বীরবিক্রম - চার জন মাণিক্য রাজার সঙ্গে দীর্ঘ কাল ব্যাপী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হৃদয়তার সম্পর্ক ছিল, যার ভিত্তি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যানুরাগ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবন প্রভাতে কবি হিসেবে প্রথম সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য থেকে, আবার জীবন সায়াহ্নে শেষ সম্মান লাভ করেছিলেন বীরবিক্রম মাণিক্যের কাছ থেকে। ত্রিপুরায় জন্য তা পরম গৌরবের বিষয়।

ব্রিটিশ যুগে ত্রিপুরার সমতল অঞ্চলের কর্তৃত্ব ব্রিটিশের হস্তগত হয়। ক্রমশঃ সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরায় সরকারি কাজে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার শুরু হয়। মহারাজগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, নিতান্ত প্রয়োজন স্থল ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার গতিরোধ করতে। কিন্তু ক্রমশঃ তা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে এবং ত্রিপুরার ভারত ভুক্তির পর থেকে বর্তমান কালে ক্রমশঃ ইংরেজির ব্যবহার বাড়তে থাকে। প্রশাসনিক ক্ষেত্র থেকে শুরু করে সর্বত্র ইংরেজির প্রবল প্রতাপ। বাংলা ভাষার ব্যবহারও চলছে, ক্ষীণ ধারায়। সুখের বিষয় হলো স্থানীয় ককবরক ভাষাও সরকারি কাজের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এবং পত্র পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদি মাধ্যমে বাংলা ভাষা ত্রিপুরায় এখনো সাদরে ব্যবহৃত হচ্ছে। হাল আমলে ত্রিপুরার প্রাবন্ধিক, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার প্রমুখের সংখ্যা এবং কৃতিত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মূল কথা হলো প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে ত্রিপুরার আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে এবং উত্তরোত্তর ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হচ্ছে। ত্রিপুরায় আবহমান কাল ধরে প্রচলিত এই বাংলায় পূর্ব বঙ্গীয় ভাষা ভঙ্গি নয়, পশ্চিম বঙ্গীয়ও নয়, ত্রিপুরার নিজস্ব এক বাংলা ভাষা ভঙ্গি গড়ে উঠেছে যা এখানকার মাটি, জল, হাওয়ায় পরিপুষ্ট হয়েছে, বিকশিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্ধ অনুকরণ, অনুসরণে ত্রিপুরায় বাংলা সাহিত্য রচিত হয় না। সুদীর্ঘ কালের সাধনায় ত্রিপুরায় বাংলা সাহিত্যের এক নিজস্ব ভাষারূপ ও শৈলী গড়ে উঠেছে, যার মাধ্যমে উত্তর পূর্ব ভারতের এই ছোট্ট রাজ্যটি বহির্বঙ্গে বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য চর্চার এক সমৃদ্ধ ইতিহাস রচনা করেছে।

### বিষয় সূচক/মুখ্য শব্দ:

- ১। কিরাত; প্রাচীন কালে হিমালয়ের পূর্বভাগস্থ স্থান এবং বর্তমান ভূটান, আসামের পূর্বাংশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, ব্রহ্মদেশ, এবং চীন সমুদ্রের তীরবর্তী কম্বোজ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বসবাসকারী চীনা-তিব্বতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত আদিম পার্বত্য জাতির নাম কিরাত।
- ২। দ্রুহ্য; তিনি প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত রাজা যযাতির পুত্র। রাজা যযাতি শুক্রাচার্যের অভিষাপে জরাগ্রস্ত হয়ে নিজ পুত্রদের নিকট জরাভার গ্রহণ করার প্রস্তাব রেখেছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র পুরু ব্যতীত অন্য চার পুত্র তাতে অসম্মত হওয়ায় তিনি তাদের আর্ষাবর্তের বাইরে বর্বর অনার্য অধ্যুষিত অঞ্চলে নির্বাসিত করেছিলেন। দ্রুহ্য দুর্গম, সাগরজল বেষ্টিত, সুন্দরবন অঞ্চলে নির্বাসিত হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ আর্ষাবর্তের বাইরে আর্ষ প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই জাতীয় নির্বাসন পরিকল্পিত হয়েছিল, যার সূত্র

ধরে প্রাচীন কালে কিরাত দেশের মতো দুর্গম, জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলেও আৰ্য শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল।

- ৩। খলংমা; এককালে বরাক উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ত্রিপুরার রাজধানী। বরবক্র নদীর অংশ বিশেষকে ত্রিপুরগণ খলংমা নামে অভিহিত করেছিল। সেই নদীর তীরবর্তী অঞ্চলকেও বলা হতো খলংমা।
- ৪। চন্তাই; ত্রিপুর রাজবংশের কুলদেবতা হলো চৌদ্দদেবতা। চৌদ্দদেবতা মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে বলা হয়ে থাকে চন্তাই। চন্তাইর মূল কাজ পূজার্চনা হলেও প্রাচীন কালে তাদের একটা বিশেষ দায়িত্ব ছিল রাজবংশের ইতিহাস কর্তৃক রাখা এবং প্রয়োজনে তা বিবৃত করা। পঞ্চদশ শতকে মহারাজ ধর্মমাণিক্যের নির্দেশে চন্তাই দুর্লভেন্দ্র রাজবংশের ইতিহাস বিবৃত করেছেন এবং কবি শুক্রেস্বর ও বানেশ্বর বাংলা ভাষায় ‘রাজমালা’ নামে তা লিপিবদ্ধ করেছেন।

### তথ্যসূত্র:

- ১। নাথ, জ্যোতিষ (সম্পাদিত), ‘শ্রীরাজরত্নাকরম’ (পূর্ববিভাগ), দ্বাদশ সর্গ, ত্রিপুরা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংসদ, আগরতলা, ২০০৩, পৃ. ১৭৯।
- ২। সেন, শ্রী কালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ (সম্পাদিত), ‘শ্রীরাজমালা’, প্রথম লহর, উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৬।
৩. চৌধুরী, অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি, ‘শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত’, পূর্বাংশ, দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়, উৎস প্রকাশন, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৮২।
- ৪। তদেব, পৃ. ২০১।
- ৫। সেন, শ্রী কালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ (সম্পাদিত), ‘শ্রীরাজমালা’, প্রথম লহর, উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা কর্তৃক প্রকাশিত, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৪।
- ৬। তদেব, পৃ. ৬৭।
- ৭। তদেব, পৃ. ৬৮।
- ৮। তদেব, পৃ. ৬৯।
- ৯। গুপ্ত, পূর্ণেন্দু (সম্পাদিত), , শীতল চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত, ‘ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস’, নবচন্দনা প্রকাশনী, প্রথম নবচন্দনা সংস্করণ, ২০১৭, পৃ. ১৭।





# ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume- I, Issue- III, January, 2025, Page No. 475- 487

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.035



বাংলা ভাষার আলোকে কুড়মালি ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: এক ভাষাবৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন  
মৌসুমী মাহাত, স্বাধীন গবেষিকা মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 15.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## Abstract

*One of the mediums of human communication is language. Indo- European is the world's largest language family. According to the evolution of time, many rich languages of the world have been born from this language family. My discussion is a linguistic study of the morphological features of the Kurmali language as a distinctive and rich language of the Chotanagpur region. In this discussion, I have tried to review the main points of morphological features - noun, pronoun, adjective, verb, tense, case ending, compound, gender, person, prefix, suffix etc. Naturally, there has been a revival of comparative thought with respectable Bengali language. In many cases, the use of Kurmali words and their translation into Bengali clarify the subject. This, on the one hand, paves the way for comparative language review in the field of linguistics. On the other hand, to a large extent Kurmali facilitates the course of linguistic discussion.*

**Keywords:** Indo- European, Linguistic Study, Morphology, Kurmali Language, Bengali Language, Comparative Language.

মানুষ সংঘবদ্ধ সামাজিক জীব। জীবজগতের একমাত্র মানুষই কথা বলতে পারে। এই কথা বলা বা মানুষের ভাববিনিময়ের অন্যতম মাধ্যম হলো ভাষা। যা মানুষের স্বেচ্ছাকৃত আচরণ, অভ্যাসের সমষ্টি। তাই পৃথিবীর সব মানুষই নিজ নিজ পরিবেশ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ভাষা সৃষ্টি করে। ভাষার মাধ্যমেই মানুষ তার সমগ্র জীবনের উত্থান - পতনের স্মৃতিলাখ্য পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তর হয়। ভাষাতাত্ত্বিক আচার্য দেবেন্দ্রনাথ শর্মা অনুভূতি বা চিন্তার প্রকাশক হিসেবে ভাষাকে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন- ‘যে ভাষা হল কথ্য শব্দ সংকেতের সাহায্যে অনুভূতি বা চিন্তার সম্পূর্ণ প্রকাশ।’ (Introduction to Linguistics) ভাষার ব্যবহারিক সংজ্ঞায় বলা যায়, ভাষা মানুষের মস্তিষ্কজাত একটি মানসিক ক্ষমতা যা অর্থবাহী বাকসংকেতে রূপায়িত হয়ে মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করতে এবং একই সমাজের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে সাহায্য করে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত সহজভাবে ভাষা বলতে বুঝিয়েছেন, ‘মনের ভাব- প্রকাশের জন্য, বাগ্ যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনও বিশেষ জন- সমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্র- ভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দ- সমষ্টিকে ভাষা বলে।’ ভাষা সহজাত বলেই যেকোনো

শিশুই নিজের সম্প্রদায় থেকে সহজেই নিজের মাতৃভাষা শিখে নেয়। যা স্কুল- কলেজ, অফিস, আদালতে ব্যবহৃত ভাষার সঙ্গে মেলে না। অর্থাৎ, সরকারি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষা হল সংবিধান স্বীকৃত যাকে আদর্শ ভাষা (Standard language) বলে। আবার, কোনো ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছোটদলে বা অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত ভাষাকে উপভাষা বলে। এই উপভাষার মধ্যে আবার গড়ে ওঠা আঞ্চলিক পার্থক্যকে বিভাষা বলে। এছাড়াও, একই পরিবারের মধ্যে বসবাসকারী ব্যক্তিবিশেষের ব্যবহৃত ভাষার তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিনিষ্ঠভাবে ব্যবহৃত এই ভাষাকে নি- ভাষা বলে। আদর্শ ভাষা (Standard language) হিসেবে মান্য চলিত বাংলা ভাষারও ব্যবহারের ক্ষেত্রবিশেষে নানা তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। অঞ্চল বিশেষের প্রচলনের ভিত্তিতে বাংলা ভাষার পাঁচটি উপভাষার (রাঢ়ী, বঙ্গালী, ঝাড়খন্ডী, বরেন্দ্রী, কামরূপী) স্বাতন্ত্র্যতা পরিলক্ষিত। অনেকের অনুমিত যে, ঝাড়খন্ডী উপভাষার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্যযুক্ত একটি বিশেষ ভাষা হলো কুড়মালি ভাষা। কুড়মি জনজাতির নামকরণের উপর নির্ভর করে এই ভাষার নাম হয়েছে কুড়মালি ভাষা। কুড়মালি ভাষা এক জাতিসূচক ভাষা। সাঁওতালি, বাংলা, ওড়িয়া, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষার মতোই কুড়মালিও একটি সমৃদ্ধতম ভাষা। প্রকৃতপক্ষে, কুড়মালি ছোটনাগপুর অঞ্চলের এক স্বতন্ত্র ও সমৃদ্ধ ভাষা। কুড়মালি শব্দের ব্যুৎপত্তি হয়েছে ‘কুড়ম’ শব্দের সঙ্গে ‘আলি’ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে। ‘কুড়মি’ শব্দটি ‘কুড়ুম’ শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ ‘কচ্ছপ’। কচ্ছপকে কুড়মি বংশের প্রধান ‘টোটম’ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পুকুর, বাঁধ, নদী, জলাশয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোথাও কচ্ছপ পাওয়া গেলে তার পূজা করা হয়। অনেকে এই জাতিকে আবার নাগা বর্ণের একটি গোষ্ঠী বলে দাবী করেন। মূলতঃ একাশি টোটম যুক্ত এই কুড়মি উপজাতির ভাষায় কুড়মালি ভাষা বলে পরিচিত। এই ভাষার অপর নাম মাহাত ভাষা। এই ভাষার ক্ষেত্র সুবিস্তৃত- পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং বীরভূম জেলার বেশিরভাগ অংশে কুড়মালি ভাষায় কথা বলা হয়। এই ভাষাটি ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ কেওনঝড়, সুন্দরগড়, এবং বাগরা জেলাতেও প্রচলিত রয়েছে। একইভাবে, ছত্তিশগড়ের রায়গড় এবং সুরগুজা জেলার বেশিরভাগ অংশে কুড়মালি ভাষাও ব্যবহৃত হয়। এর সাথে সম্পর্কিত একটি প্রবাদ আছে, ‘শিখ- শিখর, নাগপুর, অর্ধ- অর্ধেক খড়গপুর’ অর্থাৎ, এটি উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর এবং পশ্চিমবঙ্গের খড়গপুরের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে। ঝাড়খন্ডের ছোটনাগপুর ভৌগলিক প্রকৃতির মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যটি ইতিহাসকেও প্রকাশ করে, শুধু তাই নয়, ভাষা ও সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকেও ছোটনাগপুরের বৈশিষ্ট্যও প্রতিফলিত হয়। নন্দকিশোর সিং- এর মতে, - ঝাড়খন্ডে কুড়মালি ভাষার প্রসার হল ধানবাদ, রাঁচি, সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা এবং হাজারীবাগ। ড. গ্রিয়ারসন কুড়মালিকে পূর্ব মাগধী একটি রূপ হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এটি পঞ্চপারগানিয়া, তামাদিয়া, সাদ্রি, কোল এবং খন্তাই ইত্যাদির নামের জন্য দায়ী করা হয়েছে। কুড়মালির শব্দভান্ডার মাগধী ভাষার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। গ্রিয়ারসন হয়তো কুড়মালির ভাষা গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট করতে পারেননি। এ কারণেই তিনি কুড়মালি ভাষাকে মাগধীর অপভ্রংশ বলে মনে করেন। কিন্তু কুড়মালি মাগধী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, কারণ কুড়মালি এবং মাগধীর বাক্য গঠন ভিন্ন। এসব দেখে ড. জর্জ গ্রিয়ারসন কুড়মি এবং কুড়মালি ভাষা সম্পর্কে বলেছেন, -

‘কুড়মালি হল অদ্ভুত দেশের অদ্ভুত মানুষের ভাষা।’<sup>২</sup> মান্যচলিত বাংলা ভাষার মতোই কুড়মালি ভাষাতেও আঁগা (বিশেষ্য), অউজি (সর্বনাম), গুনিন (বিশেষণ), মূলরূপের সাহায্যে সাড়া গড়নেক ধঁচর (শব্দগঠনের প্রক্রিয়া), সরান (ক্রিয়াপদ), সরান বেরা (ক্রিয়ার কাল), পরিক(কারক), একুন (সমাস),

লেখা (বচন), লিঙ্গ (লিঙ্গ), বন (পুরুষ), তামান (অব্যয়), পাইন (প্রত্যয়), পেঁওদা বা মুহাইন (উপসর্গ) প্রভৃতি মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিম্নে সবিস্তারে আলোচনা করা হলো।

**১. আংগা (বিশেষ্য)°:** সাধারণভাবে যে সমস্ত পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝানো হয়, তাদের বিশেষ্য বলে। কুড়মালি ভাষায় বিশেষ্যকে আংগা বলে। কুড়মালিতে আংগা পাঁচ প্রকার—

**১.১ ঝনগী বাচী (ব্যক্তিব্যচক):** পাহাড়, জেঠু, পাঁচু প্রভৃতি।

**১.২ গঠ বাচী (জাতিব্যচক):** গরু, গাছ, ডাংগর, নঅদী।

**১.৩ ডিংগবাচী (সমষ্টিব্যচক):** আইসর, ডিংগ, মেলা, ঘউদ, গাদা, হাট।

**১.৪ দেরিববাচী (পদার্থব্যচক):**— দুধ, চাউর, রুপা, তেল, ধান।

**১.৫ খেইর বাচী (ভাবব্যচক):** ঠাংড়া, লুইর, ফেদান, চজ, খমা।

**২. অউজি (সর্বনাম):** যে সকল শব্দ নামের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়, তাকে সর্বনাম বলে। সর্বনামকে কুড়মালি ভাষায় অউজি বলে। অউজি প্রধানত ছয়ভাগে বিভক্ত। যথা—

**২.১ বনবাচী অউজি (ব্যক্তিব্যচক সর্বনাম)—** হামি(আমি), হামরা(আমরা), তহরা(তোরা), অখরা(ওরা)।

**২.২ আপনবাচী অউজি (আত্মব্যচক সর্বনাম)—** আপন, খুদ, নিজ।

**২.৩ ঠউকাবাচী অউজি (প্রদর্শনব্যচক সর্বনাম)—** ইঁ, উঁ।

**২.৪ আনসাঠী বাচী অউজি (অনির্দিষ্টব্যচক সর্বনাম)—** কেঁউ, কনৎ(কোনো), কিঁছু।

**২.৫ নাতাবাচী অউজি (সম্বন্ধব্যচক সর্বনাম)—** জেংহ, তেংহ, জাহরা, তাহরা।

**২.৬ খংচবাচী অউজি (প্রশ্নব্যচক সর্বনাম)—** কিনা, কন, কুখা, কেইসে।

**৩. গুনি (বিশেষণ)°:** যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, সংখ্যা, অবস্থা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে; তাকে বিশেষণ পদ বলে। কুড়মালি ভাষায় বিশেষণ কে গুনি বলে। গুনি কে মূলত চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

**৩.১ আংগাক গুনি (গুণব্যচক বিশেষণ)—** লেলহা, ডিগর, সিয়ান, লেদা, ঝাঁপড়া, ঝাইল, লেখা।

**৩.২ গনতীবাচী গুনি (সংখ্যাব্যচক বিশেষণ)—** একই, আঠেক, কতেক, কিঁছু, বীস।

**৩.৩ জখানবাচী গুনি (পরিমাণব্যচক বিশেষণ)—** বেজাইং, দমেং, চেইর, রিচিক।

**৩.৪ অউজিআংগা বাচী গুনি (সার্বনামিক বিশেষণ)—** আংয়, ইঁ, জেংই, কন, অহে।

**৪. কুড়মালি সাড়া গড়নেক ধঁচর (শব্দগঠনের প্রক্রিয়া):** কুড়মালি ভাষাতে রূপমূলের সাড়া গড়নেক ধঁচর প্রধানত দু'ভাবে সম্পন্ন হয়—

**৪.১ একটি মাত্র রূপমূলের সাহায্যে:** কঁকা (বোবা), ধব (সাদা) প্রভৃতি।

৪.২ একাধিক রূপমূলের সাহায্যে: একাধিক রূপমূলের সাহায্যে মূলত: চারটিভাবে শব্দগঠন করা যায়-

### ৪.২.১ মুক্ত রূপমূল + বদ্ধ রূপমূল:

দকানী=দকান + ঈ (মুক্ত রূপমূল+ বদ্ধ রূপমূল)  
হাতা=হাত+ আ (মুক্ত রূপমূল +বদ্ধ রূপমূল) প্রভৃতি।

### ৪.২.২ বদ্ধ রূপমূল + মুক্ত রূপমূল:

অ + চেঠা= অচেঠা (অচেৎ, চেতনাহীন)  
অ+ ছুইৎ=অছুইৎ (অচ্ছুৎ, অস্পর্শ্য)  
ব্যা(বে) +সামাল =ব্যাসামাল প্রভৃতি।

### ৪.২.৩ বদ্ধ রূপমূল + বদ্ধ রূপমূল:

হামা + কে =হামাকে (আমাকে)

### ৪.২.৪ মুক্ত রূপমূল + মুক্ত রূপমূল:

চৈত+ বৈশাখ=চৈতবৈশাখ (চৈত্রবৈশাখ)  
ঠাড় +ভাষা=ঠাড়ভাষা (খরভাষা)

৫. সরান (ক্রিয়াপদ)<sup>৫</sup>: বাক্যের অন্তর্গত যে পদের দ্বারা বিশেষ্যের যাওয়া, আসা, করা, থাকা, খাওয়া ইত্যাদি কোন কাজ করা বুঝায় সেই পদকে ক্রিয়াপদ বলে। কুড়মালি ভাষায় ক্রিয়াপদকে সরান বলে।

• গঠনগত (সিরজন বা গড়নেক) দিকথেকে কুড়মালিতে সরান দুই প্রকার —

১. গড়া সরান (মূল ক্রিয়া)- খা, জা, লেগ, ইড়কা, অনা, পড়হা, দেইখ্যা ।

২. জড়াল/মেসাল সরান (যৌগিক ক্রিয়া)- খাব, খেলব, জাব, জাম, জাইহ, জাহাত ।

জড়াল/মেসাল সরান(যৌগিক ক্রিয়া) আবার তিন প্রকার-'

(ক) হুড়ন সরান (প্রেরণার্থক ক্রিয়া): সঁপড়া> সঁপড়ও/ সঁপড়াউ, লেগ> লেগাআউ/লেজাবাউ/লেগআউ  
(খ) আংগা/সিরজন সরান (নাম ধাতু): ডহর> ডহরাও/ ডহরাউ/ ডহরাওল, চটকা> চটকাও/ চটকাউ/  
চটকাওল

(গ) বে- সরান (অনুকরণ ধাতু): ঠকঠক> ঠকঠকাও /ঠকঠকাউ, হিরহিরী>হিরহিরীও/হিরহিরীউ

• কর্ম অনুযায়ী কুড়মালিতে সরান আবার দুই প্রকার:

(১) করমিক সরান (সকর্মক ক্রিয়া): উ চেইড় ভাত খাইছে।

(২) বেকরমিক সরান (অকর্মক ক্রিয়া): রিতু গিজড়েছে।

৬. বেরা (ক্রিয়ার কাল)<sup>৬</sup>: যে সময়ে ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়, তাকেই ক্রিয়ার কাল বলে। শুধুমাত্র সমাপিকা ক্রিয়ারই কাল নির্ণয় করা হয়। কুড়মালি ভাষায় ক্রিয়ার কালকে বেরা বলা হয়। বাংলা ভাষার মতো কুড়মালি ভাষাতেও ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার; কিন্তু তাদের প্রত্যেক প্রকারের শ্রেণিবিভাগে স্বাতন্ত্র্যতা রয়েছে-

৬.১ চলতী বেরা (বর্তমান কাল): কুড়মালি ভাষায় চলতী বেরা ছয় ভাগে বিভক্ত-

ক্রিয়ার কাল	উপবিভাগ	উদাহরণ
চলতী বেরা (বর্তমান কাল)	টুকু চলতী বেরা (সামান্য বর্তমান কাল)	মগলু সংড়গেইস
	ঠাওনি চলতী বেরা( তৎকালিক বর্তমান কাল)	তঁয় কুখা জাইসলা
	পূরন চলতী বেরা (পূর্ণ বর্তমান কাল)	রাম আওল
	পূরন- অপূরন চলতী বেরা (পূর্ণ তৎকালিক বর্তমান কাল)	বুধা বিহান লে খেলতে রহেঁ
	দগধা চলতী বেরা (সন্দ্বিধ্ব বর্তমান কাল)	চুনা ধান কাটেইত হেত
	আড়হান চলতী বেরা (বর্তমান অনুজ্ঞা)	তরা জা

৬.২ বিতী বেরা (অতীত কাল): কুড়মালি ভাষাতে বিতী বেরাকে সাত ভাগে ভাগ করা যায়-

ক্রিয়ার কাল	উপবিভাগ	উদাহরণ
বিতী বেরা (সাধারণ অতীত কাল)	টুকু বিতী বেরা (সামান্য অতীতকাল)	রামু গেলাক
	ঠাওনি বিতী বেরা (আসন্ন অতীত কাল)	হামিএঁ পখি পঢ়ল আহোঁ
	পূরন বিতী বেরা (পূর্ণ অতীতকাল)	হামিএঁ পখি পঢ়ল রহো
	বে- পূরন বিতী বেরা(অপূর্ণ অতীতকাল)	ঘনা জাই হেলাক
	পূরন- অপূরন বিতী বেরা(পূর্ণ তৎকালিক অতীত কাল)	তঁই জনহাইর খাতে রহে হেলীস
	দগধা বিতী বেরা (সন্দ্বিধ্ব অতীতকাল)	পাচু গেল হেত
	হেইবগেইবগত বিতী বেরা (শর্তসাপেক্ষ অতীতকাল)	বেইরসা হেইতেলেইক তঅ ধান নেজগেতেলেইক

৬.৩ আওতী বেরা (ভবিষ্যৎ কাল): কুড়মালি ভাষাতে আবতী বেরাকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়-

ক্রিয়ার কাল	উপবিভাগ	উদাহরণ
আওতী বেরা (ভবিষ্যৎ কাল)	টুকু আওতী বেরা (সামান্য ভবিষ্যৎ কাল)	হামরা পঢ়ব
	অপূরন আওতী বেরা(তৎকালিক ভবিষ্যৎ কাল)	হামরা পঢ়তে রহব
	পূরন আওতী বেরা (পূর্ণ ভবিষ্যৎ কাল)	তরা টাকা জগাড় করল হেবেহে
	পূরন- অপূরন আওতী বেরা (পূর্ণ তৎকালিক ভবিষ্যৎ কাল)	তহরা টাকা জগাড় করতে রহবেহে
	আড়হান আওতী বেরা (ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা)	তহরা কাইল জাবেহে
	দগধা আওতী বেরা (সন্দ্বিধ্ব ভবিষ্যৎ কাল)	ঘনু বাজার জাই পারেহেঁ

৭. **পরিক (কারক)**<sup>৭</sup>: বাক্যের অন্তর্গত বিশেষ্য বা সর্বনামপদের সঙ্গে ক্রিয়ার যে সম্পর্ক, তাকে কারক বলে। কুড়মালি ভাষায় কারককে ‘পরিক’ বলে। কুড়মালিতে আট প্রকার পরিক(কারক) পাওয়া যায়-

পরিক (কারক)	চিহ্ন (বিভক্তি)	জেসন (উদাহরণ)
করমি পরিক (কর্তৃকারক)	এ, ইং, এঁ, ০	রাম খাইস (রাম খাই)
করনিপরিক (কর্মকারক)	কে, ০	অকে কহিহি (ওকে বলো)
দারাইজ পরিক (করণ কারক)	লে, দারা	তর দারা কনহ নি হেতেহক (তোর দারা কিছু হবে না)
দানিন পরিক (সম্প্রদান কারক)	লাই, লাগিন, খাতির, তেহেং, লেল	হামার খাতির কনঅ কিছু আনি দে (আমার জন্য কিছু এনে দে)
বেলগ পরিক (অপাদান কারক)	লে, সে	গাছ লে আম পড়ল্যা (গাছ থেকে আম পড়লো)
নাতা পরিক (সম্বন্ধ কারক)	ক, কর, এক	রামেক ঘর (রামের বাড়ি)
ঠেঘান পরিক (অধিকরণ কারক)	এঁ, উপর, মাহান	মুসা বিল মাহান রহঅত (ইঁদুর জমিতে বাস করে)
বধান পরিক (সম্বোধন কারক)	হেং, এগো, এরে, হেং, রে, এহো, অরে	এ বাবু কুথা জাহবেঁ (বাবু, কোথায় যাবেন)

৮. **একুন (সমাস)**<sup>৮</sup>: সমাস শব্দের অর্থ হল সংক্ষেপ। দুই বা তার বেশী অর্থযুক্ত পদের একটি পদে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে সমাস বলে। কুড়মালি ভাষাতে সমাস কে ‘একুন’ বলে। কুড়মালিতে একুন (সমাস) ছয় প্রকার -

### ৮.১ তামানি একুন (অব্যয়ীভাব সমাস):

জেসন(উদাহরণ)-

- (ক) ভইরপেট= ভইর পেট
- (খ) বেয়াকুল=বে আকুল
- (গ) হরদম=দমে দমে

### ৮.২ দাসা একুন (তৎপুরুষ সমাস):

- (ক) ধানকুটা= ধানকে কুটা
- (খ) লুগাকাচা= লুগাকে কাচা

(গ) টেকিছাঁটা= টেকি দারা ছাঁটা

**৮.৩ করনি ধারেই একুন (কর্মধারয় সমাস):**

(ক) বিটিছানা= বিটি যে ছানা

(খ) জাগাগাঁছ= জেগে পাহারা দেওয়া হয় যে গাছকে

(গ) গেরুমাটা= গেরু যে মাটা

**৮.৪ লেখা একুন( দ্বিগু একুন):**

(ক) সাতঘোরিয়া= সাত ঘরের সমাহার

(খ) বারমাসিয়া=বার মাসের সমাহার

(গ) পাঁচমুড়া= পাঁচ মুড়ার সমাহার

**৮.৫ রংদ একুন (দ্বন্দ্ব সমাস):**

(ক) মাঁঞ- বাপ= মাঁঞ আরহ বাপ

(খ) ভাত ডাইল= ভাত আরহ ডাইল

(গ) রাঁধা- বাঁটা= রাঁধা আরহ বাঁটা

**৮.৬ খামিদ একুন (বহুব্রীহি সমাস):**

(ক) বাঁদরমুহা= বাঁদর লেখেন মুহ যাঁহার

(খ) চিরুনদাঁতী= চিরুন লেখেন দাঁত যাঁহার

(গ) বিলাইচখী= বিলাই লেখেন চইখ যাঁহার

**৯. লেখা( বচন):** যার দ্বারা ব্যক্তি, বস্তু, গুণ ইত্যাদির সংখ্যা বোঝায়, তাকে বচন বলে। কুড়মালি ভাষায় বচন কে ‘লেখা’ বলে। কুড়মালিতে লেখা (বচন)কে দুভাগে ভাগ করা যায়—

**৯.১ এক লেখা (একবচন):** লকটা, ছানাটা, তঁঞ প্রভৃতি।

**৯.২ সাঁগি লেখা(বহুবচন):** কুকুরগিলা, গরুগিলা, অরা, হামরা প্রভৃতি।

**১০. লিংগ( লিঙ্গ):** যে সকল শব্দ দ্বারা পুরুষ, স্ত্রী ও অচেতন বস্তুকে চিহ্নিত করা যায়, তাকে লিংগ (লিঙ্গ) বলে। কুড়মালি ভাষাতে লিংগ চার প্রকার—

**১০.১ নর লিংগ (পুংলিঙ্গ):** মরদ (যুবক), কাড়া (মহিষ), দামড়া (বলদ) প্রভৃতি।

**১০.২ মাদা লিংগ (স্ত্রীলিঙ্গ):** গাই(গাভী), চাইড়(প্রসূতি), বাঘিন (বাঘিনী), বিটি (মেয়ে) প্রভৃতি।

**১০.৩ দুজি লিংগ (উভয়লিঙ্গ):** ছানা (বাচ্চা), পাইখ (পাখি), খুকড়া প্রভৃতি।

**১০.৪ লেহরা লিংগ (ক্লীবলিঙ্গ):** ভুঁই(ভূমি), পখইর (পুকুর), বাড়হন (বাঁটা) প্রভৃতি।

**১১. ঝন (পুরুষ):** যে বিশেষ্য এবং সর্বনাম পদ দ্বারা কোন বক্তা, শ্রোতা অথবা অন্য কোন উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝায়, তাকে পুরুষ বলে। কুড়মালি ভাষায় পুরুষ কে ‘ঝন’ বলে। কুড়মালিতে ‘ঝন’ তিন প্রকার; নিম্নে লেখা (বচন) অনুযায়ী ঝনের উদাহরণ দেওয়া হোল:

বন (পুরুষ)	এক লেখা (একবচন)	সাঁগি লেখা (বহুবচন)
মিরবান (উত্তমপুরুষ)	হামি/হামিএঁ, হাঁমকে, হামকই	হামরা, হামরাকে, হামরাকঁউ
পিঠিআবান (মধ্যমপুরুষ)	তঁই, তঁএ, তঁকে, তকহঁ	তরা, তহরা, তরাকে/তহরাকে,
আনবান (প্রথমপুরুষ)	অঁই, উ, অকে, অকর,	অরা, অহরা, অরাকে, অরাকর,

**১২. তামান (অব্যয়)**<sup>১১</sup>: বাক্যে বা শব্দের সাথে ব্যবহৃত যে সকল ধ্বনি- বিভক্তি, বচন, লিঙ্গ ও কারকভেদে কোন পরিবর্তন হয় না, সে সকল পদকে অব্যয় বলে। কুড়মালি ভাষায় অব্যয়কে ‘তামান’ বলে। কুড়মালিতে অব্যয় চারপ্রকার-

**১২.১ গুনি সরান (ক্রিয়া বিশেষণ)**: চাঁড়ে(তাড়াতাড়ি), আচকাই(হঠাৎ), টুকু(কম), বেজাইং(প্রচুর), জেসন(যেমন), তেসন(তেমন)প্রভৃতি।

**১২.২.নাতা বাচিক (পদাধরী অব্যয়)**: ভিনু(ছাড়া), কে, , বাটে, দারা, তড়িক(পর্যন্ত) প্রভৃতি।

**১২.৩জড়ন বাচিক (সংযোজক অব্যয়)**: আর, এবং, জে, বা, ন, কিংবা, চাহে, কাহেকি, লাই, জদি, মানে প্রভৃতি।

**১২.৪ বধান বাচিক (ভাবসূচক/বিস্ময়কর অব্যয়)**: বাহহ, সাবাসঁ, ব্যাস, হায়- হায়, বাপ গো, হায় রে, হেঁ, কিনা, আছা, হঁ, ঠীক, ছি- ছি, ধ্যাট, এই, অরে প্রভৃতি।

**১৩. পাইন (প্রত্যয়)**<sup>১২</sup>: মূল শব্দের শেষে যা যুক্ত হয়ে , নিজের প্রকৃতি অনুসারে শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে নতুন শব্দ গড়ে ওঠে;তাকে পাইন (প্রত্যয়) বলে।কুড়মালি ভাষায় প্রত্যয় কে পাইন বলে। জেসন (উদাহরণ)-

আউ- মেটাউ, সিটকাউ, সিজাউ,

আত- ভিনাত

আইন- দুখাইন

আক- ডাকলাক, খালাক, ভেচকলাক

আল- লুকাল, বুঢ়াল, ডাংডাল, রিঠাল, সেংখিয়াল, লরুআল

আক- জাতাক, ভরসাক, বুতাক

আলা- পেতিয়ালা, গঠালা

আহী- মরলাহি, ছছড়াহী, গাগালাহি

অহত- ডাকএহত, মারএহত, মরএহত

আউলেইক- মাথাবলেইক, কাংদাবলেইক, ঠনকাবলেইক

আন- সাএংথান, সেএংকান, ফেদান

আরি- সেএংঝিয়ারী

আহে- মরেসাহে, জাইসাহে, কাএংদেসাহে

ইয়া- উপরিয়া, গনগনিয়া, উপাসিয়া



ইএঃ- পেছুইএঃ, আণ্ডইএঃ  
এক- রামেক, ঘারেক, গাএঃবেক  
ঈ- হাগলী, লাগলী, সুতলী, মারলী, গেলী, খাটালী, ফাটালী  
কহন- ধরিকহন, নাএঃভিকহন, খাইকহন  
কুহন- ঠেসাইকুহন, ফাএঃডীকুহন, হাএঃকাইকুহন  
গিলা- পাখনগিলা, ছবাগিলা, গরুগিলা, ঘুঁসুরগিলা, পাইকগিলা  
টা- খয়রহিটা, গাছটা, গরুটা, ছবাটা  
টী- খুখড়ীটা, ছবাটি, হাইলাটি  
টাক- ছবাটাক, ঘারটাক, গরুটাক  
টাকে- গরুটাকে, মানুষটাকে, বাঘটাকে, হাইলাটাকে  
টীকে- ছবাটিকে, খুখড়ীটিকে, গায়টিকে  
টাএঃই- ঘারটাইএঃ, কুআএঃটাই, ঘারটাএঃ  
গানী- হেলেগানী, তবেগানী, আইজগানী  
টাউ- সেটাউ, উটাউ, ইটাউ  
টেক- খুড়ীটেক, কুড়ীটেক  
টাকর- কাখাটাকর, গাছটাকর, ঘারটাকর  
ঠীন- মামাঠীন, কএঃনঠীন, অকরঠীন, তরঠীন  
ডুল- তরডুল, বিডুলডুল, অকরডুল  
ত- জাত, খাত, খেলত, খাত, হেএঃটন, পারত, ডেগত  
তড়িক- এখনতড়িক, ঘারতড়িক, জখনতড়িক  
তাক- কাএঃদতাক, মারতাক, ঘরতাক  
তর- গাছতর, কুঅলিহতক, ছাঁছাতক  
তেলা- খেলেতেলা, জাইতেলা, ইডকতেলা, পারেতেলা,  
হেড়াতলা  
তেলি- খাইতেলি, রাএঃধেতেলি, জাইতেলি, খাইটেতেলই  
তেন- জাইতেন, ধরতেন, করতেন, দেতেন, খাইতেন  
থিক- লেখিক, কথিক, গেলথিক, খালথিক  
থিন- লেবথিন, দেবথিন, করবেথিন  
থুন- খাবথুন, দেবথুন, লেবথুন  
ঘাইর- একঘাইর, ঘারঘাইর, চাইরেঘাইর  
পুরতি- আজুকপুরতি, রাইতপুরতি, ঘারপুরতি  
নি- মাথানি, ছাবানি, মলকনি  
নিয়ার- অকরনিয়ার, বেটানিয়ার, তরনিয়ার  
ব- জতব, খেদব, বসব, খাবব  
বহন- পিটবহন, মারবহন, কহবহন

বেহে- আউবেহে, জাবেহে, পাববেহে  
 বাটে- খেওতবাটে, বাড়ীবাটে, গাঁববাটে, মাঠবাটে  
 ম- ঘুরম, খাম, রহম, পারম, জাম, খাম  
 মুওড়ি- হেওঠমুড়ি, কুআওমুড়ি, গাওবমুড়ি  
 মানি- সুনামানি, ভাইগমানি, চাওমুনি  
 মুওড়া- কুহলিমুওড়া, গাওমুওড়া  
 মাহান- ছাইনমাহান, অহেমাহান, সেইমাহান  
 ল- গুচল, ঘুচল, থকল, বসল, মরল  
 বেসিক- লেজবেসিক, টানবেসিক, মারবেসিক  
 লাক- মারলাক, হেওটলাক, ইড়কলাক  
 লাই- খাইলাই, মরেলাই, আনেলাই  
 লাহা- আদিখলাহা, কুটলাহা, মটলাহা  
 লেখে- কনতলেখে, অকরলেখে, তরলেখে  
 লেহে- ভাওগলেহে, হেওটলেহে, মারলেহে, করলেহে,  
 খালেহে, জাইলেহে  
 লে- গাদাসলে, পীঢ়াজাপালে, খাপলে, খাঅলে  
 লেন- মারলেন, কহইলেন, দুদহেলেন, খাইলেন  
 সিক- খাবসিক, লেবসিক, দেবসিক, মানঅসিক  
 সার- কুআওসার, হেওড়সার, মাওরসার  
 হান- আনলাহান, বাওচালহান, ছাড়ীহান, খড়িহান  
 হেলী- খেলেহেলী, মারহেলী, জাইহেলী, কাওদেহেলী, নাচওহেলী  
 হার- মরতাহার, ভাতাহার, খরতাহার, করতাহার  
 হেলাক- জাইহেলাক, চরেহেলাক খাইহেলাক, ঘুমাহইলইক  
 হারী- বস্তাহারী, তুলিনহারী, মায়হারী, বাপহারী  
 হাত- নিদাহাত, দেখাহাত, জাহাত, খাহাত

**১৪. পেংউদা/মুহাইন (উপসর্গ)**<sup>১১</sup>: মূল শব্দের শুরুতে যা যুক্ত হয়ে নতুন অর্থবহ শব্দ সৃষ্টি করে, তাকে উপসর্গ বলে। কুড়মালি ভাষায় উপসর্গকে পেংউদা বা মুহাইন বলে। কুড়মালি ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গগুলি হল -

অ- অচেঠা, অচিনহা, অদেইখা, অপহড়া, অদিশা, অভাগীঅবুঝহা, অপাওইত, অগনতী, অখহড়  
 আ- আছাড়, আকাঠা, আখাউ, আবস, আকাট, আজাড়, আউলা, আছিল্লা  
 আন- আনদিন, আনমনি, আনখাই, আনচান, আনঝন,  
 আদি- আদিখলাহা, আদিখিতা  
 আপ- আপজাঁচী, আপখাউকী, আপখোরাকী, আপগাড়ি  
 আড়- আড়বেড়া, আড়হান, আড়ছেঁড়া  
 আসাও- আসাওভাড়, আসাওদেখা

অন- অনধন, অনলাইন, অনদেখা, অনচিনহা, অনপেটা  
 আধ- আধপুরবা, আধপেটা, আধপাকা, আধমাখা  
 উ- উরিন, উলবুধিয়া, উতলা, উগলা, উমাখা  
 কে- কেজান, কেঠান, কেতার, কেসার  
 কাঠ- কাঠপিঁপড়, কাঠবাপ, কাঠপেটা, কাঠমাফ  
 দর- দরপাকা, দরফাড়া, দরবুড়া, দরপাকা, দরকুচা,  
 দরসীঝা, দরপড়া, দরকাইচা, দরখাবা, দরপুরবা, দরছুলা, দরমুহা, দরপুহুতা  
 না- নাপাতা, নাখাড়া, নাছাড়া, নাফাড়া, নাডরা  
 নি- নিচুত, নিরদংদী, নিফিকির, নিসহা, নিছাড়, নিখউকা, নিঘাত,  
 নিকামিয়া, নিঝুম, নিচাল, নিখাইদ, নিআলিস, নিজালা  
 নীম- নীমজুবান, নীমরাজিঞ  
 পর- পরদুয়ারী, পরভাতারী, পরখাউকী, পরসাঁওতি  
 বদ- বদনাম, বদজাইত, বদচলন, বদভাব, বদচাউনি  
 বি- বিজড়, বিকল, বিটিছানা  
 বে- বেলস, বেপাতা, বেহয়া, বেভরম, বেচারা, বেগনতী,  
 বেঘাইত, বেয়ারাম, বেয়াকুল, বেমানী, বেজাইড়, বেসরম, বেলুরিয়া, বেহাল, বেদার,  
 বেচপ, বেকায়দা, বেজড়, বেছংদ, বেবহন, বেজুইত  
 স- সখল, সমামন, সতমাঞ, সঠিন, সবল, সপেটা, সঠান, সকান, সথান।

কুড়মালি ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি স্বাতন্ত্র্যতার সঙ্গে ভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হলো। পুরো প্রবন্ধে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় স্বতন্ত্রভাবে কুড়মালি শব্দের ব্যবহার রয়েছে। সেই শব্দের ব্যবহারের পাশাপাশি সকলের বোধগম্যতার জন্য মান্য চলিত বাংলা শব্দের উল্লেখ বিষয়গুলি কে আরো বেশি সুস্পষ্ট করে। নব নব অনুভবকে আরো বেশি প্রাঞ্জল ও জীবন্ত করে উপস্থাপনে এই ভাষার অগ্রগণ্যতা অপরিসীম।

**শেষকথা:** ভাষার প্রবহমানতার গতিপ্রকৃতি এতো অল্প পরিষরে তুলে ধরা অসম্ভব। ছোটোগল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতৃপ্ততার কথাই প্রবন্ধের শেষে বার বার মনে পড়ে “অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাজ করি মনে হবে, শেষ হইয়াও হইল না শেষ।”<sup>২২</sup> সীমিত পরিষরের কারণে অনেকক্ষেত্রেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যৎ- এ কোনো বৃহৎ পরিষরে আরো সুবিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারে। তবে, এই প্রবন্ধে অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের অনেক গুলি আলোচনার ক্ষেত্র তৈরী করে দিয়েছে। জার্মানির কিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবৈজ্ঞানিকদ্বয় Dr. Netra P. Paudyal এবং Dr. John Peterson কুড়মালি ভাষা সম্পর্কে বলেছেন, - “There are also a number of grammatical markers and categories in kurmalī which are not found in other Sadani languages. For example, the plural marker for nouns is =gila/=gili for male and female, respectively, which is not unusual for Indo Aryan languages of this region. However, unlike in other Sadani languages there is also a separate enclitic marker for the associative plural, =nikha, of unknown origin. Kurmalī (like Panchparganiya, see Section 3.4) also marks the locative case with the enclitic =mahan, which does not appear to be of Indo- Aryan origin. It thus appears that the Kurmi people once spoke a distinct

পর্ব-১, সংখ্যা-৩, জানুয়ারি, ২০২৫

language, neither Munda nor Dravidian but also not Indo- Aryan, and at some point switched to the regional Indo- Aryan lingua franca of that time, leaving a distinct substrate in their new language”<sup>১৩</sup>

কুড়মালি ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্যতা পর্যালোচনায় কুড়মালি ও বাংলা ভাষার তুলনাত্মক ভাবনা অন্বেষণের নবধারাকে সূচিত করে। অন্যদিকে ভোজপুরি, সাঁওতাল, মারাঠী, ওড়িয়া, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে তুলনামূলক অধ্যয়নের গতিপথকে ত্বরান্বিত করে। কুড়মালি ভাষার সুবিশাল শব্দভাণ্ডার সুদূর ভবিষ্যৎ- এ সাহিত্যের নানান ধারাকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

### তথ্যসূত্র:

১. চট্টোপাধ্যায়, ড.সুনীতিকুমার, ‘ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ’, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত, ১৯৪২, পৃ.২।
২. সিংহ, ড.এইচ.এন, ‘কুরমালী ব্যাকরণ’, ঝাড়খণ্ড ঝারোখা, রাঁচী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৭, পৃ.৫১।
৩. মহতো, শশি ভূষণ, ‘কুড়মালি ভাঙঅর’, সুদর্শন প্রেস, রাঁচী, প্রথম সংস্করণ, ২০০৭, পৃ.২৩।
৪. সিংহ, ড.নন্দ কিশোর, ‘কুরমালী কা ভাষা বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন’, রাঁচী, প্রথম সংস্করণ, ২০০৮, পৃ.২৭৭-৩০৪।
৫. মহতো, শশি ভূষণ, ‘কুড়মালি ভাঙঅর’, সুদর্শন প্রেস, রাঁচী, প্রথম সংস্করণ, ২০০৭, পৃ.৩৫।
- ৬.সিংহ, ড.এইচ.এন, ‘কুরমালী ব্যাকরণ’, ঝারখণ্ড ঝারোখা, রাঁচী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৭, পৃ.৪৫-৪৯।
- ৭.সিংহ, ড.এইচ.এন, ‘কুরমালী ব্যাকরণ’, ঝারখণ্ড ঝারোখা, রাঁচী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৭, পৃ.৩৭-৩৯।
- ৮.মহতো, শশি ভূষণ, ‘কুড়মালি ভাঙঅর’, সুদর্শন প্রেস, রাঁচী, প্রথম সংস্করণ, ২০০৭, পৃ.৪৯।
- ৯.সিংহ, ড.নন্দ কিশোর, ‘কুরমালী কা ভাষা বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন’, প্রথম সংস্করণ, ২০০৮, পৃ.৪০১-৪০৯।
- ১০.সিংহ, ড.এইচ.এন, ‘কুরমালী ব্যাকরণ’, ঝারখণ্ড ঝারোখা, রাঁচী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৭, পৃ.৫৬-৬০।
- ১১.সিংহ, ড.নন্দ কিশোর, ‘কুরমালী কা ভাষা বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন’, প্রথম সংস্করণ, ২০০৮, পৃ.২২১-২২৯।
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘বর্ষাযাপন’ (সোনার তরী), রচনাকাল-১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।
- ১৩ . Paudyal, Dr. Netra P. & John Peterson-DE GRUYTER MOUTON, JSALL(Journal of south Asian languages and linguistics)-published online may 4,2021

### গ্রন্থপঞ্জি:

- (১) ঘোষাল, ছন্দা, ‘ঝাড়খণ্ডী বাংলার ঝাড়গায়ী রূপ’, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ২০০৪।

- (২) চক্রবর্তী, ড. উদয়কুমার, চক্রবর্তী, নীলিমা, 'ভাষাবিজ্ঞান', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬।
- (৩) দাশ, ড. নির্মল, 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ', রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৪০৭।
- (৪) দে, ড. বাণীরঞ্জন, 'ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষা', বইমেলা, এস.এস.পাবলিকেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০২২।
- (৫) বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচরিতা, 'আধুনিক বাংলা ভাষাতত্ত্ব', প্যাপিরাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫।
- (৬) মজুমদার, পরেশচন্দ্র, 'বাঙলা ভাষা পরিক্রমা' (দ্বিতীয় খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০।
- (৭) মাইতি, ড. প্রকাশ কুমার, 'আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে বাংলা ভাষা', আরামবাগ বুক হাউস, কলকাতা, ২০০৪।
- (৮) শ, ড. রামেশ্বর, 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৪।
- (৯) শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ, 'বাঙলা ভাষার ইতিবৃত্ত', মাওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ঢাকা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১১।
- (১০) সরকার, পবিত্র, 'ভাষা দেশ কাল', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি., কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ কার্তিক, ১৪৩০।



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 488-497

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.036



## বাংলা ‘লোকভাষা’-র নানা প্রসঙ্গ: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

অদিতি দাস, গবেষক, বাংলা বিভাগ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 13.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*The Bengali folk language is an integral part of Bengali folk culture. To comprehend the theoretical identity of Bengali folk language, it is essential to understand the reciprocal relationship between folk culture and folk language. In 1846, William John Thoms introduced the term "folklore," sparking a cultural movement worldwide. Breaking down the word "folklore" yields two components: "folk" and "lore." According to folk culture researchers, "folk" refers to people, while "lore" denotes the traditional, pre-scientific knowledge and life philosophy of these individuals. The Bengali equivalent of "folklore" is "lokoshongskriti" (Folk Culture). Studying folk culture is, in fact, a scientific pursuit, adhering to the principles of social science. Folk culture researchers identify various elements, including oral literature, folk art, festivals, folk religion, folk language, customs, superstitions, and folk science. Focusing on Bengali folk language, an essential component of Bengali folk culture, the term "lokobhasha" (Folk Language) refers to the language of the people. Every individual possesses language and the ability to create it. People can construct an infinite number of sentences using a limited number of words. Despite this, debate surrounds the definition and nature of "lokobhasha." Through our research, we aim to analyze and resolve this debate by exploring the theoretical identity of Bengali folk language.*

**Keywords:** Folk Language, Folklore, Man, Performance, Code Switching.

বাংলা লোকভাষা বাঙালির লোকসংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই বাংলা লোকভাষার তাত্ত্বিক পরিচয়টি জেনে নেবার আগে আমাদের বুঝে নিতে হবে লোকসংস্কৃতি ও লোকভাষার পারস্পরিক সম্পর্ককে। জানা যায় ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম জন্ থমস্ ‘ফোকলোর’ শব্দটি প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রবর্তিত এই ‘ফোকলোর’ শব্দটি সেইদিন সমগ্র বিশ্বে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। আমরা ‘ফোকলোর’ শব্দটিকে ভাঙলে দুটি শব্দ পাবো, একটি ‘ফোক’ আর অন্যটি ‘লোর’। লোকসংস্কৃতিবিদদের মতে এই ‘ফোক’ শব্দ বলতে ‘লোক’ অর্থাৎ মানুষজনকে বোঝায় আর ‘লোর’ শব্দ বলতে ঐ মানুষজনের ঐতিহ্যনুগ, প্রাক্ বৈজ্ঞানিক স্তরের লোকজ্ঞানকে যেমন বোঝায় তেমনই অন্যদিকে এই মানুষদের পর্ব-১, সংখ্যা-৩, জানুয়ারি, ২০২৫

অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনদর্শন, সৃজনশীল কৃৎকৌশলকেও বোঝায়। ইংরেজি ‘ফোকলোর’ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে বাঙালি লোকসংস্কৃতিবিদগণ ‘লোকসংস্কৃতি’ শব্দটি গ্রহণ করেছেন। লোকসংস্কৃতির চর্চা আসলে বিজ্ঞানচর্চা। কেননা এই লোকসংস্কৃতির চর্চা করা হয়ে থাকে সমাজবিজ্ঞানের যথার্থ সূত্রকে অবলম্বন করেই। লোকসংস্কৃতিবিদগণ লোকসংস্কৃতির উপাদান হিসেবে যেগুলির কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল মৌখিক শ্রুতিবাহী লোকসাহিত্য, লোকশিল্পকলা, লোকউৎসব, লোকধর্ম, লোকভাষা, লোকাচার, লোকসংস্কার, লোকবিজ্ঞান ইত্যাদি। এখন আমরা খুব সহজেই বুঝে নিতে পারছি যে বাংলা লোকভাষা বাঙালির লোকসংস্কৃতির একটি উপাদান। ‘লোকভাষা’ এর ‘লোক’ শব্দের অর্থ হল ‘মানুষ’। প্রত্যেক মানুষেরই ভাষা আছে, ভাষাসৃজন ক্ষমতাও আছে। প্রত্যেকটি মানুষই তার সীমিত সংখ্যক শব্দ দিয়ে অসীম সংখ্যক বাক্য নির্মাণ করতে সক্ষম। কিন্তু তবুও ‘লোকভাষা’-র সংজ্ঞা, স্বরূপ নিয়ে যথেষ্ট তর্ক রয়েছে।

ভাষাতাত্ত্বিক রামেশ্বর শ-র মতে যেহেতু লোক-সাধারণের সাহিত্য হল লোকসাহিত্য তাই লোক-সাধারণের ভাষাই হল ‘লোকভাষা’। তাঁর মতে আমরা লোক-সাধারণ বলে সমাজের যে স্তরকে বুঝি সেটি আসলে একটি আপেক্ষিক ধারণা। আপেক্ষিক কারণ সমাজের দুই স্তরের মধ্যে লেনদেন, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলতে পারে। তিনি আরও মনে করেছেন আমরা সাহিত্যকে যেমন ‘লোকসাহিত্য’, ‘শিষ্টসাহিত্য’ এই দুই ভাগে ভাগ করে নিই তেমনই ভাষাকেও ‘লোকভাষা’, ‘শিষ্টভাষা’ এইরকম দুটি ভাগ করে নিতে পারি। যদিও এই ভাগও তাঁর মতে আপেক্ষিক, কেননা এই দুই ভাষার মধ্যেও লেনদেন, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। দুই ভাষার এই আদান-প্রদান একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। আসলে লোকসমাজ আর শিষ্টসমাজ সমাজের দুটি শ্রেণি নয়, সমাজের দুটি স্তর। ‘লোক’ শব্দের অর্থ খুঁজতে খুঁজতে আমরা যদি অতীতের দিকে পিছিয়ে যায় তবে দেখতে পাবো প্রথমে ‘লোক’ বলতে সব মানুষকে, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল তিনটি লোককের সঙ্গে সঙ্গে ভুঃ, ভূর্বঃ, স্বরঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য সপ্তলোককেও বোঝানো হত। পরবর্তীতে যখন ‘লোক’ শব্দের অর্থ সঙ্কোচ ঘটে তখন এই শব্দ নিম্নবর্গের মানুষকে বোঝাতে ব্যবহার করা হত। ‘লোক’ শব্দের অর্থের সঙ্কোচ সংস্কৃত ভাষাতেই সূচিত হয়েছিল। ভাষাবিজ্ঞানী রামেশ্বর শ-র মতে ‘লোকভাষা’ শব্দের অর্থের এই সঙ্কোচের ফলে পরবর্তীতে এই শব্দের দ্বারা সমাজের অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত সাধারণ মানুষের ভাষাকে বোঝায়। এই ‘লোকভাষা’ অনেকটা ‘প্রাকৃত ভাষা’ তার প্রথম স্তরে যেমন ছিল তেমন আর এইখানে ‘প্রকৃতি’ বলতে জনগণের ব্যবহার করা ভাষাকে বোঝানো হয়েছে। ‘প্রাকৃত ভাষা’র দ্বিতীয় স্তরে যখন ‘সাহিত্যিক প্রাকৃত’-র সৃষ্টি হয় তখন এই ভাষা আর নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষের ভাষা থাকে না। তাই এখনকার দিনে ‘লোকভাষা’ বলতে যা বোঝানো হয় তার ধারণা প্রথম স্তরের ‘প্রাকৃত ভাষা’র মধ্যেই নিহিত রয়েছে। পাশাপাশি সেই সময় যে ভাষা উচ্চবর্গের শিক্ষিত মানুষের ভাষা ছিল সেই ভাষা ঐ যুগের ‘শিষ্ট’-জনের ভাষা অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের সঙ্গে তুলনীয় ছিল। শিষ্ট ভাষা আর লোকভাষা ভাষার এই দুটি স্তরের ধারণা অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ অর্থাৎ সবযুগেই রয়েছে। আসলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাতেই এই দুটি স্তর সব যুগেই বর্তমান থাকে। ‘লোকভাষা’ ভাষার প্রাণশক্তির মূল উৎস। এই ভাষা জীবন্ত ভাষার মূলভিত্তি। এই ভাষায় যে অপেক্ষাকৃত অমার্জিত গ্রাম্যতা আর আঞ্চলিক রূপ বৈচিত্র্য থাকে তা উল্লেখ্য হয়ে ভাষার আদর্শ মান্য রূপটি গঠিত হয়। এই ভাষায় যেমন এককালিক আঞ্চলিক বৈচিত্র্য গড়ে উঠতে দেখা যায় তেমনই কালক্রমিক পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেন-র মতে লোকসাহিত্যের ভাষা আর সাধারণ সাহিত্যের ভাষা বাহ্যিক ভাবে এক কারণ উভয়ের ভাষায় বাংলা। তবুও আমরা লোকসাহিত্যের ভাষাকে ‘লোকভাষা’ বলে থাকি এই কারণে যে দুটি ভাষা বাংলা হলেও তা সব সময় একই

ছাঁচে গঠিত হয় না। সরাসরি লোকমুখ থেকে কোনরকম পরিবর্তন ছাড়া যদি লোকসাহিত্যের খাঁটি উপাদান সংগ্রহ করা যায় তাহলে সেই ‘লোকভাষা’ বাংলা ভাষায় কথা বলা প্রত্যেকটি মানুষ বুঝতে নাও পারতে পারে। সুকুমার সেন মনে করেছেন ‘লোকভাষা’ উপভাষা অনুসারী আর এতে নিভাষারও ছাপ রয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানী রামেশ্বর শ এই বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট ভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি উপভাষার দুটি দিকের উল্লেখ করেছেন এক আঞ্চলিক উপভাষা, দুই সামাজিক উপভাষা আর মনে করেছেন যদিও ‘লোকভাষা’-য় আঞ্চলিক রূপভেদ আছে তবুও এই ভাষা আসলে সামাজিক উপভাষা।

ভাষাতাত্ত্বিক নির্মল দাশ-এর কথায় ‘লোকভাষা’ শব্দের অর্থ ব্যঞ্জনা নিয়ে অস্পষ্টতা থাকলেও প্রত্যেক ভাষাতাত্ত্বিকই ‘লোকভাষা’ বলতে ভাষার একটি বিশেষ রূপভেদের কথায় বলেছেন। তাঁর মতে উপভাষা ভাষার ভগ্নাংশ কেননা ভাষা হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ একক। তাই উপভাষা মর্যাদায় ভাষার চেয়ে ছোটো। বর্তমান সময়ের ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে ভাষা হচ্ছে তাই যার মাধ্যমে সমাজে ভাব-বিনিময়ের একটি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই ব্যবস্থার কোনোরকম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব চেহারা পাওয়া না গেলেও যখন সমাজে ভাব-বিনিময়ের জন্য এই ব্যবস্থাকে ব্যবহার করা হয় তখন এর ব্যবহারিক রূপ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে বিমূর্ত ভাষার এই যে ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ রূপটি পাওয়া যাচ্ছে এইটিই হল উপভাষা। উপভাষা-র ‘উপ’ উপসর্গ এখানে প্রত্যক্ষতার ভাবকেই প্রকাশ করছে। প্রত্যেকটি উপভাষা-র প্রয়োগক্ষেত্র অনুযায়ী দুটি প্রাথমিক রূপ পাওয়া যায় এক ‘কথ্য’ ও অন্যটি ‘লেখ্য’। লেখ্য উপভাষার মধ্যে পাওয়া যায় মাত্র একটি অঞ্চল নিরপেক্ষ আদর্শ বা ছাঁচ, অন্যদিকে কথ্য উপভাষা অনেকগুলি অঞ্চলের অনেকগুলি সামাজিক, দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে যুক্ত। তাই লেখ্য উপভাষার চেয়ে কথ্য উপভাষায় বৈচিত্র্য ও সজীবতা বেশি লক্ষ্য করা যায়। ভাষাবিজ্ঞানীরা এই কথ্য উপভাষাকে যখন আরও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলেন তখন তাঁরা এর মধ্যে দুটি ভাগ লক্ষ্য করলেন। এই দুটি ভাগের মধ্যে একটি প্রধান দ্বিতীয়টি অপ্রধান। ভাষাবিজ্ঞানীরা দেখলেন কথ্য উপভাষার যে অংশটি সমাজের প্রত্যেক দিনের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত সেখানে সমসাময়িক সময়ের প্রসঙ্গ প্রধান। কথ্য উপভাষার এই অংশটি জনগণের প্রত্যেক দিনের ভাব-বিনিময়ের ভাষা মাধ্যম হওয়ায় ভাষাবিজ্ঞানীরা একে ‘জনভাষা’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আর কথ্য উপভাষার যে অংশে সমসাময়িক সময়ের পরিবর্তে অতীতের ঐতিহ্যবোধ অর্থাৎ পেছনে ফেলে আসা সামন্ত জীবনের গোষ্ঠীভাবুক পিছু টান বাগ্যবহারের মধ্যে স্থান পেয়েছে সেখানে প্রত্যেক দিনের সমসাময়িক সময়ের শব্দভাণ্ডার, বাক্যবন্ধের পরিবর্তে কতগুলি বাঁধাধরা শব্দ, শব্দগুচ্ছ, বাক্যের বিন্যাস গুরুত্ব লাভ করেছে। কথ্য উপভাষার এই অংশে অতীতকে মনে করার ফলে তার ঐতিহ্যকে অনুসরণ করার ফলে এরমধ্যে নানারকম লোকায়ত প্রবণতা কাজ করে। তাই ভাষাবিজ্ঞানীরা কথ্য উপভাষার এই অংশের নাম দিয়েছেন ‘লোকভাষা’। ‘জনভাষা’ দৈনন্দিনতার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এর সীমা ও পরিধি পূর্বনির্ধারিত থাকে না, এই ভাষার মধ্যে সম্প্রসারণশীলতার সম্ভাবনা রয়ে যায় তাই প্রয়োজন মতো ইচ্ছা মতো বক্তা শব্দভাণ্ডার, বাক্যের বিন্যাস পরিবর্তন করে নিতে পারে। ‘জনভাষা’ অনেক বেশি মুক্ত ও ব্যক্তি সাপেক্ষ। কিন্তু ‘লোকভাষা’ ব্যক্তিগত ভাবে ও গোষ্ঠীগত ভাবে অতীত স্মৃতির সূত্রে ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তার শব্দভাণ্ডার, বাক্যের বিন্যাসক্রম ইত্যাদি উপাদানগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপরিবর্তনীয় হয়ে যায়। ‘লোকভাষা’-র মধ্যে যেহেতু যৌথ জীবনের সঙ্কল্প, আশা-আকাঙ্ক্ষা-সংস্কার কাজ করে তাই এই ভাষা প্রথাবদ্ধ ও ঐতিহ্যসাপেক্ষ। সাধারণভাবে প্রথাবদ্ধ হলেও এই ভাষা প্রয়োগক্ষেত্র অনুযায়ী রূপগত বৈচিত্র্যে ভরপুর। ‘লোকভাষা’-র প্রয়োগক্ষেত্রের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় কিছু ‘লোকভাষা’ সমাজের কতগুলি



লোকাচার ও সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। এইধরনের 'লোকভাষা'-র দৃষ্টান্ত হল মন্ত্র, ব্রতকথা, বিয়ের ছড়া ইত্যাদি। আবার কিছু 'লোকভাষা' আনুষ্ঠানিকতা বহির্ভূত, এইগুলি শুধুমাত্র মানুষের বাক্য ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত তাই এতে একধরনের স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বতঃস্ফূর্ততা দেখতে পাওয়া যায়। এইধরনের 'লোকভাষা'-র দৃষ্টান্ত হল ধাঁধা, প্রবাদ, মেয়েলি ভাষা ইত্যাদি। এতক্ষণ আমরা 'লোকভাষা'-কে কথ্য উপভাষার অংশ হিসেবে জানলাম ঠিকই কিন্তু কথ্য উপভাষা হলেই যে তা 'লোকভাষা' হবে এইরকম মনে করেন না ভাষাবিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে কথ্য উপভাষার কেবলমাত্র যে অংশে লৌকিক বাক্যভঙ্গীর ঐতিহ্যগত ছাঁচ থাকবে সেই অংশই 'লোকভাষা' বলে বিবেচ্য, আবার 'লোকভাষা' কথ্য উপভাষা হলেও বক্তার ইচ্ছার অধীন নয় বরং তা লোকায়ত বাক্যভঙ্গীর যে ঐতিহ্য রয়েছে সেই ঐতিহ্যের ছাঁচের অধীন। পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি 'লোকভাষা' লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এইখানেও ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেছেন লোকসাহিত্যের বর্ণনা, বিবরণ অংশে যেহেতু বাগভঙ্গীর ঐতিহ্যগত ছাঁচের পরিবর্তে ভাষার সাধারণ রীতি অনুসৃত হয় তাই এই অংশকে আমরা 'লোকভাষা'-র অংশ বলতে পারবো না কারণ এখানে এই ভাষার লোকায়ত বাগভঙ্গীর ঐতিহ্যগত ছাঁচের বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। যদিও 'লোকভাষা' লোকায়ত ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত তবুও তা গ্রাম, শহর নির্বিশেষে আসলে একটি ভাষাগোষ্ঠীর সর্বজনীন সম্পদ। এই ভাষা প্রাচীন, ঐতিহ্য অনুসারী হলেও জাদুঘরের প্রত্ন সামগ্রীর মতো নয় অর্থাৎ সমকালের জীবন থেকে বিযুক্ত নয়। এই ভাষা সমকালের ভাষাচর্চাকেও সুনির্দিষ্ট মাত্রা দিতেও সক্ষম। এইজন্য ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে 'লোকভাষা' যদিও জন্মসূত্রে পুরাতন তবুও প্রয়োগের দিক থেকে সমসাময়িক জীবনের সমান্তরাল সঙ্গী হয়ে থাকে।

ভাষাতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র মজুমদারের কথায় আমরা জানতে পেরেছি ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিনান্দ সোস্যুর আমাদের ভাষাবোধের তিনটি স্তরের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন, এক Langage অর্থাৎ Language, দুই Langue অর্থাৎ Speech আর তিন Parole অর্থাৎ Act of Speaking। Langage-কে মানুষ তার সহজাত সৃজনশীল ক্ষমতারূপে জৈবিক বিবর্তন ধারায় আত্মস্থ করে আর Langue হল ঐ নির্বিশেষ তত্ত্বের মানুষের ঐ সার্বভৌম সৃজনী সামর্থ্যের সবিশেষ প্রকাশ। আসলে Langue হল একটি ভাবনাবিগ্রহ, Langue হল একটি স্মৃতিবাহী পদ্ধতি বিশেষ। এটি কিছু বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা এবং তথ্যের পর পর সঞ্চয়ের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে ব্যক্তির মস্তিষ্কে তৈরি হয়। যে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে Langue নির্মিত হচ্ছে সেই অভিজ্ঞতা ব্যক্তি অর্জন করে নিজের সামর্থ্যে এবং বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। ব্যক্তির এই বাচন প্রক্রিয়াকে ফার্দিনান্দ সোস্যুর Parole বলে অভিহিত করেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন আমরা যদি ভাষার এই তত্ত্বের ব্যাপারে ফার্দিনান্দ সোস্যুর-এর পাশাপাশি চমস্কি-র বক্তব্যের দিকে লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাবো তিনি বলেছেন Langue আসলে আমাদের বাচন প্রক্রিয়ার Competence-এর দিকটি প্রকাশ করে এবং অন্যদিকে Parole-এর কাজ হল আমাদের বাচন প্রক্রিয়ার Performance-এর প্রকাশ ঘটানো। সমাজ ভাষাতাত্ত্বিকেরা ভাষার এই ধারণার সঙ্গে একটি নতুন দিক যুক্ত করতে চান। তাঁদের মতে Langue যেহেতু একটি বিশেষ ভাষাভাষীর উচ্চারণ পদ্ধতি, ঐ ভাষার ব্যাকরণ, শব্দভাণ্ডার ইত্যাদি সম্পর্কিত বাচকতার নির্দিষ্ট বিন্যাসের দিকটি প্রকাশ করে তাই Langue-র সামাজিক গুরুত্বকে না মেনে আমাদের উপায় নেই। ভাষিক সম্প্রদায়ের ভাষা তার গোষ্ঠী বা বর্গ বিভেদ, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক ও যোগাযোগ, পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সংগঠনের পাশাপাশি তাদের অর্জিত ধ্যান-ধারণার দ্বারা সব সময় নিয়ন্ত্রিত হয়। বাচকতা যেহেতু Langue-র প্রকাশের অর্থাৎ Performance-এর দিকটি উন্মোচন করে তাই এই প্রকাশের সঙ্গে জুড়ে থাকে বক্তা, শ্রোতার সামাজিক সংস্কার। এই বক্তা, শ্রোতার ভাষার আঞ্চলিক ব্যবধান

থাকতে পারে আবার সামাজিক ব্যবধানও থাকতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় পরিবেশ ও প্রসঙ্গ এই আঞ্চলিক ও সামাজিক স্থিতাবস্থার বিচ্যুতি ঘটায়। ফলে একই সামাজিক বক্তা এক একটি পরিস্থিতিতে এক এক ধরনের ভাষা ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার মুখোমুখি হন। ভাষাতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন এইরকম পরিস্থিতিতে বক্তার Code Switching-এর প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি সমাজ ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে Performance কোনো একমুখী প্রক্রিয়া নয় বরং ভাষার ব্যবহারগত প্রকার, ভাষার প্রাসঙ্গিক বা প্রসঙ্গ বহির্ভূত প্রয়োগ বা পরিবেশ অনুযায়ী ভাষার নানাচারী সংকেতধর্মিতা। বাচিক প্রকাশের এই যে সামাজিক দিকটি পাওয়া গেল এইটিকে মনে রেখে আধুনিককালে সমাজ ভাষাবিজ্ঞানীরা প্রত্যেক ভাষার তিনটি স্তরের কথা মনে নিয়েছেন এবং ম্যাক ডেভিড, গ্লিসন সমেত অন্যান্য ভাষাবিজ্ঞানীরা এই তিনটি স্তরকে চিহ্নিত করেছেন 'শিষ্টভাষা', 'জনভাষা' ও 'লোকভাষা' হিসেবে। আমরা পূর্বেই এই তিনধরনের ভাষার সম্পর্কে জেনে নিয়েছি।

আমরা ভাষাতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র মজুমদারের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পেরেছি একটি আঞ্চলিক ভাষার কীভাবে মান্যভাষায় উত্তরণ ঘটে বা একটি মাতৃভাষা থেকে শিষ্টভাষার উত্তরণ সম্ভব হয় এই চলমান প্রক্রিয়াকে, এর আপেক্ষিক তারতম্য নির্ধারণ করতে ভাষাবিজ্ঞানী হগেন্ সবচেয়ে আগে চারটি মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন। এই মানদণ্ডগুলি হল - সূত্রীভবন অর্থাৎ Codification, বিশদীভবন অর্থাৎ Elaboration, নির্বাচন অর্থাৎ Selection, আর সবশেষে স্বীকৃতি অর্থাৎ Acceptance। শিষ্টভাষার সঙ্গে লোকভাষার তারতম্য বোঝার ক্ষেত্রে এই মানদণ্ডগুলি আমাদের সাহায্য করবে। ভাষিক রূপ অথবা উপাদানের সংকোচনশীল ধর্মই হল সূত্রীভবন। এই সূত্রীভবনের ফলে ভাষিক রূপের একমুখীনতা, তার বৈচিত্র্য হ্রাস তৈরি হয়। আসলে অভিধান, ব্যাকরণে যেকোনো ভাষার বৈচিত্র্য এই হ্রাসতম কাঠামোতে নির্দিষ্ট থাকে। কোনো ভাষাতেই একই রকমের বাচনভঙ্গী কখনই স্থির থাকে না। এই পরিবর্তনের হার অন্যের থেকে কম হলেও কোনোভাবেই স্থিরবিন্দুতে পৌঁছায় না। তাই আদর্শ সূত্রায়িত ভাষা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। সাধারণত জনভাষা, শিষ্টভাষার তুলনায় মান্যভাষায় এই সূত্রায়ণ কিছুটা বেশি। সাধারণ ভাষার মধ্যে যে আঞ্চলিক বা সামাজিক বিভেদ রয়েছে, যে ঔপভাষিক প্রভাব রয়েছে, প্রয়োজন হলে বিদেশী উপাদান আত্মস্থ করার সক্রিয়তা রয়েছে আর রয়েছে আনুষ্ঠানিক বৈচিত্র্য এই সমস্ত কিছুকে বিশ্লেষণ করে একটি স্থির আদর্শে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা ভাষার ক্ষেত্রে সবসময় চলতেই থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায় জনভাষার সূত্রায়ণ প্রক্রিয়া একদিকে শিষ্টভাষার অভিমুখী হলেও কিছু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তা লোকভাষা অভিমুখীও বটে। ভাষার সম্প্রসারণশীল ধর্ম হল বিশদীভবন। আসলে কোনো ভাষায় স্বাণু অবয়বমাত্র নয়। তাই আঞ্চলিক উপভাষাতে টানাপোড়েন চলতেই থাকে, কখনও প্রয়োজন হলে বিভিন্ন ভাষিক স্তরের উপাদান গৃহীত হয় আবার কখনও বিদেশী ভাষার প্রভাবে নতুন শব্দ তৈরির কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। আবার এই আঞ্চলিক উপভাষা লিখন পদ্ধতির সাহায্যে শব্দভাণ্ডারের অফুরান ভাণ্ডার নির্মাণ করতেও সক্ষম সর্বোপরি সরকার চাইলে এই ভাষাকে অধিক গুরুত্বও দিতে পারে। ভাষার এই সম্প্রসারণশীল ক্রিয়াশীলতাই হল বিশদীভবন। ক্রিয়াশীলতাকে মানদণ্ড করে ভাষাবিজ্ঞানী বের্নস্টাইন ভাষার ভাষিক প্রতীককে Elaborated Code অর্থাৎ বিশদ প্রতীক আর Restricted Code অর্থাৎ সংকীর্ণ প্রতীক এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। একদিকে যেমন বিশদ প্রতীকের গ্রহণযোগ্য অর্জন ক্ষমতা বহুমুখী এবং প্রসারণধর্মী সেখানে অন্যদিকে সংকীর্ণ প্রতীকের আবেদন হল সবিশেষে ও অনেকবেশি প্রসঙ্গবদ্ধ সেইসঙ্গে এর ব্যবহার ব্যক্তি আশ্রয়ী।

এতক্ষণ ধরে আমরা সূত্রীভবন আর বিশদীভবন প্রক্রিয়ার বিষয়ে জানলাম। এবার আমরা এই দুটি প্রক্রিয়ার মানদণ্ড গ্রহণ করে শিষ্টভাষা আর লোকভাষার মধ্যের প্রভেদগুলি বুঝে নেবার চেষ্টা করবো। ভাষাতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেছেন ভাষিক স্তর উন্নয়নের উর্ধ্বযাত্রায় শিষ্টভাষা লোকভাষার থেকে একটি পর্যায়ে এগিয়ে রয়েছে। তাঁর মতে আমাদের এই অগ্রগতি বিচার করতে হবে সূত্রীভবন আর বিশদীভবনের আপেক্ষিক তারতম্যের বিচারের মধ্যে দিয়ে। আমরা যদি আদর্শায়নের মাপকাঠি অনুযায়ী ভাবি আর শিষ্টভাষাকে উচ্চতর ও লোকভাষাকে নিম্নতর সোপান বলে মনে করি তবে দেখতে পাবো প্রত্যেকটি ভাষার স্তরেই সূত্রায়ণ প্রক্রিয়া সমান ভাবে সক্রিয় থাকলেও ক্রিয়াশীলতার বিচারে শিষ্টভাষায় বিশদীভবন যেখানে একটু বেশি সেখানে লোকভাষায় তা অপেক্ষাকৃত কম। এইজন্য শিষ্টভাষায় ভাষিক উপাদানে ক্রিয়াশীলতা বহিঃপ্রকাশিত, মুক্ত হলেও লোকভাষায় তা বদ্ধ। আবার লোকভাষায় ভাষিক প্রতীক যেখানে সংকীর্ণ সেখানে শিষ্টভাষায় তা অনেকবেশি সম্প্রসারিত। শিষ্টভাষার ভাষিক প্রতীকগুলিতে যেখানে যথেষ্ট পরিবর্তনের বীজ লুকিয়ে আছে সেখানে লোকভাষার শাব্দিক উপাদানে এই নমনীয়তা লক্ষ্য করা যায় না।

এবার আমরা নির্বাচন আর স্বীকৃতি এই দুটি বিষয়ে আলোকপাত করবার চেষ্টা করবো। নির্বাচন হল সামাজিক স্বীকৃতির গোড়ার কথা। ভাষার মধ্যে থাকা বিভিন্ন আঞ্চলিক ভেদগুলির মধ্যে যদি কোন একটি ভেদ নির্বাচিত আদর্শরূপে সকলের মান্যতা পাই তখন তাকে শিষ্টভাষা বলে অভিহিত করা হয়। এই আদর্শায়নের পেছনে থাকতে পারে ঐতিহাসিক কারণ, থাকতে পারে সম্ভ্রান্ত মানুষের পদমর্যাদা। কিন্তু যদি এই নির্বাচন প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়, বিশেষ করে যখন কোনো ভাষাভাষী নিজেকে এর থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে তখন এই প্রতিরোধকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক অথবা সাংস্কৃতিক সংহতি গড়ে ওঠে। আসলে লোকভাষা এই সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের প্রকাশ মাধ্যম। এই ব্যাপারে শিষ্টভাষা ও লোকভাষার মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। মূলত এই ক্ষেত্রে দেখা যায় শিষ্টভাষায় কথা বলা ব্যক্তিদের সামাজিক প্রতিপত্তির বিরুদ্ধাচরণ প্রবণতা হিসেবেই লোকভাষীদের সংহতি গড়ে ওঠে। এই সংহতির বন্ধন দৃঢ় না হলেও ভাষার মধ্যে ফুটে ওঠে বিচ্ছিন্নতাবোধ। এই জন্য লোকভাষার উপাদান নির্বাচন সাপেক্ষ হলেও প্রতিক্রিয়াধর্মী। ফলে শিষ্টভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগ থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে লোকসাহিত্যের ভাষার মধ্যে এক বিশেষধরনের নির্বাচনধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে আমরা যদি শিষ্টভাষার স্বীকৃতির দিকটি লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাবো যেহেতু এই ভাষা পরিশীলিত সমাজের গণ্যমান্য মানুষের কাছে আদর্শস্থানীয় হয়ে ওঠে তাই তা প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য। এই ভাষা অর্জন করতে হয় বিশেষ শিক্ষা প্রণালীর সাহায্যে। এই ভাষার আবেদনও শিক্ষিত জনগণের সচেতন প্রয়াসে পুষ্ট। স্বীকৃতির প্রসঙ্গে লোকভাষা কেবল একটি সামাজিক বা সাংস্কৃতিক স্তরের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত। এই ভাষার প্রতীক সংকীর্ণ এই কারণে যে তা গোষ্ঠী অথবা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য সূত্রে আবদ্ধ। এটি তাদের সামাজিক অবচেতন ধারণায় আগে থেকেই অন্তর্লীন থাকে।

আমরা দেখতে পাই নানা কারণে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় অথবা উপজাতির মধ্যে যেহেতু লোকভাষা ধারাবাহিক সূত্রে জীবিত থাকে তাই সমাজ-ভাষাবিজ্ঞান অনুযায়ী লোকভাষাও একধরনের সমাজ উপভাষা। লোকভাষা মাঝে মাঝে কখনও শহুরে সংস্কৃতির প্রভাবে আবার কখনও মান্যভাষার চাপে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও একদিকে লোকভাষাভাষীদের সমাজ আনুগত্য আর অন্যদিকে গোষ্ঠীসত্তা তাদের জীবনবোধের সংঘবদ্ধতার কারণে এই ভাষা উচ্চতর সমাজের পরিশীলিত সামর্থ্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও গড়ে তুলতে

সক্ষম। তাই এই ভাষার গোষ্ঠী অনুভব ভাষিক ঐক্য গড়ে তোলে যত না তার থেকে বেশি সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলে। তাই লোকভাষার Unit আসলে সমাজগত, ভাষাগত নয়। আলোচনার এই সূত্র ধরে আমরা উপভাষার সঙ্গে লোকভাষার কিছু পার্থক্য জেনে নেবার চেষ্টা করবো। উপভাষা ও লোকভাষার পার্থক্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রথমেই আমাদের চোখে যে বিষয়টি পড়ে তা হল ভাষিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে উপভাষার আঞ্চলিক গণ্ডী থাকলেও লোকভাষার এইধরনের কোনো গণ্ডীবদ্ধতা নেই। এর পরিবর্তে লোকভাষায় সামাজিক প্রসার লক্ষ্য করা যায়। লোকভাষার এই সামাজিক প্রসার যেমন তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীচেতনা পুষ্ট তেমনই সামাজিক শাসন ও অনুশাসনে সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল উপভাষার একটি ব্যক্তিক রূপ থাকলেও লোকভাষার ক্ষেত্রে এইরকম কোনো ব্যক্তিক রূপ থাকতে পারে না। লোকভাষায় যদি তা থেকে থাকে তবে তা উপভাষাগত উপাদানের পরিবর্তন ছাড়া আর কিছু নয়। উপভাষার ব্যক্তিক রূপকে বলা হয় নিভাষা বা Idiolect। এরফলে কোনো বিশেষ ভাষাভাষী আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব মেনে নিলেও তার নিজের ভাষিক বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে এবং এমনকি তার দীর্ঘ জীবনে এই বিষয়টির পরিবর্তনও ঘটতে পারে। তৃতীয় যে বিষয়টির উল্লেখ করবো তা হল সামাজিক স্তরে উপভাষার কোনো মর্যাদা না থাকলেও কোনো কোনো উপভাষার সঙ্গে লোকভাষার আপাতিক যোগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আমাদের এই কথা ভুললে চলবে না যে ভাষার ক্রমস্তরীয় বিন্যাসের দিক থেকে লোকভাষা উপভাষার থেকে এক ধাপ নীচে অবস্থান করে। আসলে আঞ্চলিক ভাষার মধ্যের ব্যাপ্তি ও প্রসার কখনই একই অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রত্যাশা করা যায় না। মাঝে মাঝে এমন ঘটনাও ঘটতে দেখা যায় যে অধস্তলের ভাষার চলমানতা প্রবল বিরুদ্ধতার পড়েও উর্ধ্বমুখী হতে সক্ষম হয়। যার ফলে উপরিতলের ভাষায় মধ্যে উক্ত লোকভাষার প্রভাব মিশে গেলেও যেতে পারে কিন্তু তা আসলে চূর্ণস্মৃতি (Relics) হিসেবেই থাকে। অন্যদিকে আরও একটি ঘটনা ঘটতে দেখা যায় যেখানে প্রতি মুহূর্তে উচ্চবর্গের ভাষার চাপে নিম্নবর্গের লোকভাষার মধ্যের উপাদানগুলি ক্রমশই লুপ্ত হতে থাকে। আবার লোকসাহিত্যে যেমন ইংরেজি শব্দের ক্রমাগত প্রসার ঘটতে দেখা যায় তেমন উপভাষার ক্ষেত্রে কিন্তু এতখানি বিষমধর্মী প্রতিপক্ষতা লক্ষ্য করা যায় না। উপভাষা ও ভাষাভেদগুলির মধ্যের এই চলমান ধর্ম আসলে পারস্পরিক এবং ভাষিক সংকেতগুলি হল জীবন্ত। এইজন্য এদের প্রভাব উভয়মুখী এবং উভয়ত গ্রহণমুখী। চতুর্থ যে বিষয়টি উপভাষা ও লোকভাষার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, লোকভাষার মধ্যে উপভাষার চলমানতার সবগুলি ধর্ম স্পষ্ট নয়। উপভাষার চলমানতা নির্ভর করে চারটি প্রবণতার কমবেশি তারতম্যের উপর, এই চারটি প্রবণতা হল মান্যায়ন (Standardisation), স্বয়ংভরতা (Autonomy), ঐতিহাসিকতা (Historicity) এবং সজীবতা (Vitality)। মূলত মান্যায়ন-বিরোধী প্রতিক্রিয়ার তাগিদে লোকভাষাভাষীরা নিজেদের ঐতিহ্যপুষ্ট ভাষাবিধিকে আঁকড়ে থাকার প্রয়াস চালিয়ে যায়। লোকসমাজের অনেক অবচেতন স্মৃতিই লোকভাষায় ধরা না পড়ায় এর ভাষিক কাঠামো অসম্পূর্ণ এবং অসংলগ্ন হয়, তাই এই কারণে লোকভাষাকে 'স্বয়ংভর' ভাষা বলাও যুক্তিযুক্ত নয়। অন্যদিকে লোকভাষার বাচন-প্রক্রিয়াও বিশেষ কোনো মাধ্যমকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে। আমরা এইরকম দৃষ্টান্ত দেখতে পাই ধাঁধা, ছড়া, লোককথা জাতীয় লোকসাহিত্যের মধ্যে।

এইবার আমরা বাংলা লোকসাহিত্যের ভাষা-ভাবনা সম্পর্কে জেনে নেবার চেষ্টা করবো। লোকসাহিত্যের ভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনা করা হলেও তা সমাজ নিরাসক্ত হতে বাধ্য। এই কারণে লোকভাষাবিদদের কাজ হল এই ভাষার গভীরে যে লোক-অভিজ্ঞতা, সামাজিক প্রতিবেশ এবং সাংস্কৃতিক

উত্তরাধিকারীরা অনেক দিন ধরে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয়েছে তাদের পুনরুদ্ঘাটন ঘটানো। এটি করতে গেলে তাঁদের লোকসাহিত্য থেকে প্রথমেই উদ্ধার করতে হবে লোকভাষার মধ্যে লুকিয়ে থাকা গুড় ভগ্নাংশগুলিকে এবং একই সঙ্গে আবিষ্কার করতে হবে লোকভাষার Unit-গুলিকেও। লোকভাষার Unit-গুলিকে বলা হয় Motif বা অভিপ্রায় আর এই ভাষিক প্রকরণগুলি হল Folk-register বা লোকপ্রকরণ। আমরা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেবার চেষ্টা করবো, যদি আমরা একটি বিশেষ Motif হিসেবে নিদ্রা-উদ্বেককারী নিদ্রাদেবীর মূর্ত ধারণা পাই তবে Folk-register বা লোকপ্রকরণ হিসেবে পাবো 'ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি অথবা ঘুমনি মাসি ঘুমনি পিসি অথবা নিদ্রালি মা' জাতীয় ভাষিক Code বা সংকেতগুলিকে। এর মূল কারণ হল এদের ব্যবহার-বিধি সুনির্দিষ্ট আর এগুলি ছড়াতেই বিশেষ করে ব্যবহৃত হয়েছে। সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের অন্যান্য সম্পর্কের দিক হল লোকভাষার সংজ্ঞাপন প্রক্রিয়ার বা Communicative Process-এর আরও একটি দিক। এক্ষেত্রে সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানীরা অনেকগুলি পরিস্থিতির সম্ভাবনাকে লক্ষ্য করেছেন। ভাষা কেবলমাত্র প্রতিবেদন নয়, এর যে প্রয়োগগত প্রতিবেশ আছে তা আমরা বুঝতে পারি ভাষাভাষীদের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখে। এক্ষেত্রে লিঙ্গ, ধর্ম, ঐতিহ্য ও প্রথা, বয়স, বৃত্তি, ঔপজাতিক বন্ধন ইত্যাদি যেমন আছে তেমন আঞ্চলিক সমাজবন্ধনও আছে। একই ভাবে লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন সামাজিক সংযোগের ফলে লোকসাহিত্যে অনেকগুলি বিভাগ চিহ্নিত হয়েছে, যেমন - লিঙ্গধারণা শাসিত মেয়েলি ছড়া, ব্রতকথা, আঞ্চলিকতাপ্রধানী মৈমনসিংহ গীতিকা-পূর্ববঙ্গ গীতিকা ইত্যাদি। আমাদের একথা স্বীকার করতেই হয় যে বাংলা লোকসাহিত্যে এই সমাজবন্ধন-নির্ভর যৌথ আবেগের ফলেই অনেক ধরনের Folk-register বা লোকপ্রকরণ সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলা লোকসাহিত্যের ভাষার সাধারণ প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা এইবার জেনে নেবার চেষ্টা করবো। প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে বাংলা লোকসাহিত্যের ভাষার চারটি বিভাগ অর্থাৎ ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও শব্দভাণ্ডারের মধ্যে বাক্যরীতি ও শব্দভাণ্ডারের আলোচনায় প্রধান হওয়া উচিত কারণ লোকসাহিত্যের ভিত্তি আঞ্চলিক হওয়ায় এতে যেমন ধ্বনিতত্ত্বগত বিভেদ বৈচিত্র্য থাকা স্বাভাবিক তেমনই রূপতত্ত্বগত সরলতা অর্জনের প্রবণতা থাকাও স্বাভাবিক। লোকসাহিত্যের ভাষায় বাক্যরীতি ও শব্দ ভাণ্ডারের পরিবর্তন হল দ্বিমাত্রিক, এক আঞ্চলিক আর দুই সমাজ মনস্তাত্ত্বিক। আমাদের মনে রাখতে হবে এখানে 'সমাজ' বলতে লোকসমাজের কথায় বলা হয়েছে। আবার লোকসাহিত্যের ভাষা প্রধানত কথ্য ভাষাভঙ্গিকেই অবলম্বন করে থাকে। এই ভাষা চলমান জীবনের সঙ্গে সংগতি রেখে খুব সহজেই পাল্টে যায়। এছাড়াও নিজস্ব শক্তিবলে এই ভাষা অর্জন করে নেয় নানা উপাদান, যেমন- অর্ধতৎসম শব্দ, ধ্বন্যাত্মক বা অনুকারবাচক শব্দ। এই ভাষায় অতীতের শব্দসম্ভার অথবা ব্যাকরণিক প্রয়োগ অল্প পাওয়া গেলেও তার পরিমাণ খুব বেশি নয়। উপভাষা আর লোকভাষা এক অর্থে ব্যবহৃত না হলেও কথ্য ভাষারীতিকে আশ্রয় করার জন্য বাংলার নানা অঞ্চলের উপভাষার সঙ্গে লোকভাষার একটা যোগ অনুভব করা সম্ভব হয়। যদিও আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে লোকভাষার গভীর যোগ রয়েছে তবুও এই ভাষায় লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির প্রভাব সক্রিয়ভাবে কাজ করে। মূলত এই ভাষা শুধুমাত্র সমাজ আশ্রয়ী নয়, এটি একটি সামাজিক ক্রিয়াশীলতাও। তাই লোকসংস্কৃতিবিদগণ লোকভাষার ক্রিয়াশীলতা বিচারের ক্ষেত্রে নিষেধ (Tabu), সংস্কার (Superstition), লোকনিরুক্ত (Folk-etymology) প্রভৃতি প্রক্রিয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অনেক সময় ভাষার অবয়ব ও সমাজের সাংগঠনিক রূপের মধ্যে দ্বন্দ্বিক সম্পর্ক স্পষ্ট হওয়ায় লোকসাহিত্যের ভাষায় একদিকে যেমন আঞ্চলিক লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় তেমন অন্যদিকে

জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ-বৃত্তি ইত্যাদি জনিত সামাজিক পার্থক্যও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এইদিক থেকে দেখতে গেলে লোকভাষায় আঞ্চলিক ও বিশেষ সমাজ আশ্রিত গণ্ডীবদ্ধতা থাকা স্বাভাবিক হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে লোকসাহিত্যের ভাষায় একটি নির্বিশেষ ও সেই সঙ্গে সার্বিক সংকল্প ফুটে ওঠে। এই কারণেই এর ভাষা শুধুমাত্র Dialectal বা Sociolectal নয় বরং তা Universal-ও। আসলে লোকভাষা যদিও একটি বিশেষ সম্প্রদায় অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত তবুও এই ভাষার মধ্যে একটি সর্বজনীন মনস্তত্ত্ব ফুটে উঠতে দেখতে পাওয়া যায় যা এই ভাষাকে বিশ্বজনীন লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করে রাখে। লোকসাহিত্যের ভাষায় লোকভাষার উপাদানগুলি চিহ্নিত করবার জন্য লোকপ্রকরণই হবে মূল Unit। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই জাতীয় লোকপ্রকরণে অবশ্যই লোকভাষা সম্পর্কিত নানান বিষয় যেমন ভাষিক উপাদান, অর্থগত তাৎপর্য এবং সামাজিক অন্তর্য অবশ্যই অন্যান্য নির্ভর হয়ে থাকবে। লোকসাহিত্যের ভাষিক সংকেতে যাই পরিবর্তন ঘটুক না কেন তা যথার্থ লোকপ্রকরণ হয়ে উঠতে গেলে কিছু শর্ত মানতে হয়। এই শর্তগুলি হল— অবশ্যই ভাষিক উপাদানে লোকভাবনা ও সমাজসংস্কার এবং সেই সঙ্গে সমাজ মনস্তত্ত্ব স্পষ্ট ভাবে থাকা চাই। আবার জনভাষায় ব্যবহৃত কোডগুলির সাথে লোকভাষার কোডগুলির সমান্তরাল, বিকল্প প্রয়োগে যেমন ক্রিয়াশীল বৈপরীত্য সৃষ্টি করে তেমন কোডের স্থানচ্যুতি লোকমানসে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সংজ্ঞাপনের মূল্যমানও নির্ধারণ করে। অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় লোকভাষার উপাদানগুলি শিষ্ট বা মান্যভাষায় তেমনভাবে স্বীকৃতি পাই না। মাঝে মাঝে প্রয়োগের দিক থেকে এই ভাষা ‘অপভাষা’ হিসেবে মান্য বা শিষ্ট ভাষায় চিহ্নিত হয়। লোকসাহিত্যে লোকভাষিক উপাদানগুলির বিন্যাসগত সাধর্ম্য লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত লোকসাহিত্যের একইধরনের আদর্শগুলির তুলনা করলেই আমরা দেখতে পাই এই ধরনের বাচিক প্রকাশ অনেক বারই পুনরুক্ত হচ্ছে।

সর্বোপরি লোকভাষা একটি ভাষা ঠিকই কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেছেন এটি কোনো পূর্ণাঙ্গ ভাষা নয়। তাঁরা এটিকে চিহ্নভাষা বলে চিহ্নিত করেছেন। এইজন্য শিষ্টভাষা, জনভাষার মতো লোকভাষার সামগ্রিক ব্যাকরণ কাঠামো নির্মাণ করা সম্ভব নয়। কিছু চূর্ণ বিক্ষিপ্ত উপাদানের মধ্যে দিয়ে লোকভাষার প্রকাশ। কতগুলি বিশিষ্ট শব্দাবলী, কিছু পদগুচ্ছ, কিছু বাক্যরীতি আশ্রিত রূপবন্ধ দেখে লোকভাষার ক্রিয়াশীলতা নির্ধারণ করতে হয়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে Performance স্তরে নয় পরিবর্তে Competence স্তরেই এই ভাষার যথার্থ স্বরূপ নিহিত আছে। মূল কথা হল ক্রমিক সূত্রায়ণ অর্থাৎ Codification লোকভাষাকে একটি বিশেষ সাংকেতিক অবয়বে চিহ্নিত করেছে।

### সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

- ১। চাকলাদার, স্নেহময়, ‘ভারতের ভাষা সমস্যা ও রাষ্ট্রনীতি’, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৮১।
- ২। চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার (মুখ্য সম্পাদক), বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুমহান, চক্রবর্তী, ড. কোয়েল (সহযোগী সম্পাদক), বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, দে বুক স্টোর, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুন, ২০১৯।
- ৩। চক্রবর্তী, শ্রী বরুণকুমার ও অন্যান্য (সম্পাদকমণ্ডলী), ‘লোকভাষার নানা দিগন্ত’, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০১৯।
- ৪। চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুনীতিকুমার, ‘বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা’, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, নবম সংস্করণ, ১৯৯৬।

- ৫। চৌধুরী, ড. দুলাল, সেনগুপ্ত, ড. পল্লব (সম্পাদক), 'লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংযোজন, ২০১৩।
- ৬। দাশ, ড. নির্মল, 'লোকভাষা থেকে ভাষালোক', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ২০১০।
- ৭। দাশ, শিশিরকুমার, 'ভাষাজিজ্ঞাসা', প্যাপিরাস, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৪।
- ৮। নাথ, মৃগাল (সম্পাদনা), 'ভাষা', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৮।
- ৯। নাথ, মৃগাল, 'ভাষা ও সমাজ', নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯৯।
- ১০। বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ (সম্পাদনা), 'বাঙলায় সমাজভাষাচর্চা', নির্ঝর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০২২।
- ১১। মিত্র, শ্রীসনৎকুমার (সম্পাদিত), 'বাঙলা লোকভাষা বিজ্ঞান', লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০০১।
- ১২। সরকার, পবিত্র, 'লোকভাষা লোকসংস্কৃতি', চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, এপ্রিল, ২০০৩।
- ১৩। হালদার, গোপাল, 'ভারতের ভাষা', মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩।

#### সহায়ক পত্র-পত্রিকা

- ১। বসু, ব্রাত্য (প্রধান সম্পাদক), 'শিক্ষা দর্পণ', প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, নভেম্বর, ২০২৩।



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 498-508

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.037



## আধুনিক ভাষ্যে প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় সাহিত্য: কবি বিষ্ণু দে-র কাব্য সমগ্র

ড. অসিত বিশ্বাস, ডালখোলা, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 23.12.2024; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*The evolution of poetry draws inspiration from ancestral traditions, embracing both heritage and innovation. Modern Bengali literature reflects a fusion of ancient and medieval Indian literary archetypes, shaped by the implementation of the Charter Act on one hand and the emergence of modern sensibilities on the other. This adaptation was pioneered by Michael Madhusudan Dutt and continues to evolve, even in the era of artificial intelligence.*

*The poetry of Bishnu Dey, spanning from the 1930s to the 1980s, exhibits traces of literary imitation. His early works, particularly the first three collections—before the influence of Rabindranath Tagore's Purana and Marxian philosophy—are deeply rooted in Vedic and Upanishadic sources. From the 1940s to the 1960s, his poetry increasingly reflects the influence of the Vedas, Upanishads, Ramayana, Mahabharata, and classical Sanskrit literature. However, by the 1970s, this tendency towards imitation appears to decline.*

*This essay examines Dey's poetry through the lens of alliteration theory, offering a brief introduction to its sources and stylistic patterns. Special attention is given to identifying his creative tendencies while minimizing redundant references to the same literary influences.*

**Keyword:** Poetry Emancipation, Ancient Archetypes, Medieval Indian Literature, Bishnu Dey, Imitation in Poetry, Vedic and Upanishadic Influence.

যা আধুনিক নয়, সেই আখ্যান আধুনিক যুগে কেন পুনরাবৃত্ত হবে? রবীন্দ্রনাথ আধুনিকের পরিচয়ে যে 'মর্জি'র কথা বলেছিলেন সেই নির্দেশ মেনে কীভাবে অনাধুনিক হয়েও আধুনিক সাহিত্যে অন্তর্গত হয়? কবে থেকে, কীভাবে, কেন, কোন ভাষ্যে এই অনুসৃজন - এসব কূটাভাস স্মরণে রেখে 'আধুনিক ভাষ্য' সন্ধান করা বাঞ্ছনীয়। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে একটি অভিব্যক্তি করে বলেছিলেন যে পূর্বজন্দের নিকট থেকে কৃতাজ্জলিপুটে ঋণ গ্রহণেই কাব্যের সমৃদ্ধি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ মেনে সেই ঋণের অনুসৃজন হতে হবে আধুনিক চেতনায়। কেবল আখ্যানের সূত্র হতে পারে অনাধুনিক কালের। একবিংশ শতকে যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-র সঙ্গে মানব সভ্যতার অসম লড়াই শুরু হয়েছে তখন অনাধুনিক বিষয়ের অনুবর্তন কতখানি প্রাসঙ্গিক



হতে পারে? আসলে ‘মর্জি’র ভাষ্য বলে দেয় বিষয়টি কালের নয়, ভাবের কথাই আধুনিকতার স্বীকৃতি। বাংলা সাহিত্যে এই অনাধুনিকের অনুবর্তন শুরু হয়েছিল অনুবাদ সাহিত্যের সূত্রে এবং আধুনিক যুগে সামাজিক এবং প্রশাসনিক উদ্যোগে। উনিশ শতকের নবজাগরণে একদিকে সামাজিক প্রয়াস এবং ‘সনদ আইন’ প্রয়োগ করে প্রশাসনিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে এই অনুবর্তন-অনুসৃজনের শুরু হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে এই ধারাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

ভারতীয় সংস্কৃতির দুটি ধারা:

- ক) প্রাগার্য,
- খ) আর্য-ব্রাহ্মণ্য।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সাহিত্য বিকাশের ধারায় আর্য-সংস্কৃতিতে আর্যের উপাদান ক্রমশঃ মিশ্রিত হয়েছে। দর্শনে ও পুরাণে এই মিশ্রণ একটি পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত রূপে প্রতিষ্ঠিত। আবার তন্মধ্যে বিপরীত ধারা দেখা যায় - আদিম সংস্কৃতির উপর ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়েছে আর্য সংস্কৃতির প্রভাব। প্রাগার্য বাংলাদেশ অর্থাৎ পুণ্ড্র-সুভদ্র-বঙ্গ-রাঢ় পুলিন্দ-শবরাদির আদি ভূমি এবং ধর্ম-কর্ম-সাহিত্যের মূলে ছিল লৌকিক সংস্কার। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভাব এদেশের মর্মমূলে প্রসারিত। এই লৌকিক সংস্কার একদিকে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে বাঙালির সংস্কৃতিকে একটি বিশিষ্ট রূপে রূপায়িত করেছে। এই লৌকিক ভাবের উপর আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব-প্রতিষ্ঠাই বাংলার ধর্ম ও সাহিত্য (প্রাচীন ও মধ্য এবং অংশত আধুনিক বাংলা সাহিত্য) বিকাশের মূলসূত্র।

সংস্কৃতি ও সাহিত্যে প্রভাব গ্রহণের দুটি মূল প্রবণতা দেখা যায়:

- ক) গতানুগতিক পথে পুরাতনের ভাব গ্রহণ এবং
- খ) সমন্বয়ের পথে আত্মীকরণ।

এই দ্বিতীয় পদ্ধতির প্রভাব গ্রহণেই মৌলিকতা অধিক। অনুবাদ সাহিত্যে মৌলিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে একটি বহিরাগত ভাব যখন স্রষ্টার মর্মস্থান অধিকার করে কবির রচনা-ভাবনাকে অন্তর থেকে প্রভাবিত করে থাকে এবং তার ফলে কবির সৃষ্টি স্বতঃপ্রফুল্ল ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়, তখন সেই প্রভাব স্থায়ী ভাবের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তার ফলে নবাগত ভাবের স্পর্শে স্রষ্টার ‘অপূর্ববস্তনির্মাণক্ষমা’ প্রজ্ঞার নব নব প্রকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে। প্রতিভাবান কবি-চিত্তে এই ধরণের প্রভাবই গৃঢ়সঞ্চরী ও সার্থক।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য - ক) হিন্দুর অষ্টাদশ বিদ্যা - বেদ, বেদাঙ্গ, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি এবং খ) সংস্কৃত রসসাহিত্য ও মধ্য ভারতীয় অন্যান্য ভাষার সাহিত্য (পালি, বৌদ্ধ, সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্টট)। এই দ্বিতীয় ভাগই প্রকৃত রস-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এই দ্বিতীয় ভাগেই প্রভাব বাংলা সাহিত্যে গুরুতর। তবে বিস্ময়ের বিষয় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মূলত দেবায়ত প্রেমকবিতার ধারা ব্যতীত অন্য ধারার সাহিত্য রক্ষিত হয়নি বা সৃজিত হয়নি।

কবি বিষ্ণু দে-র কবিতায় পুরাকল্পের অনুসৃজন প্রধানত তিনটি ধারায় ঘটেছে - লোকায়ত, গ্রিক রোমানসহ বহু পুরাকল্প এবং ভারতীয় বিশেষত সংস্কৃত পুরাণ ও মহাকাব্যে ব্যবহৃত পুরাকল্প। তাঁর প্রথম কাব্যের শিরোনাম ‘উর্বশী ও আর্টেমিস’ নামের এই উর্বশী কোন কবিকল্পিত চরিত্র নন। উর্বশী-র<sup>1</sup> পূর্বসূত্র পরিচয়ে জানা

<sup>1</sup> উর্বশী - অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌরাণিকা (১), ২য় সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ), কলকাতা, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৫ (২০০১), পৃ ২৩৮-২৪১।

যায় - স্বর্গের এক রূপবতী অঙ্গরা। সমুদ্র মন্থনে যে অঙ্গরারা উঠেছিল, উর্বশী তাদের মধ্যে অন্যতমা। উর্বশীর উল্লেখ পাওয়া যায় ‘ঋগ্বেদ’, ‘শতপথ ব্রাহ্মণ’, ‘মহাভারত’ ও ‘পদ্মপুরাণে’। মহাকবি কালিদাসের ‘বিক্রমোর্বশী’ নাটকে উর্বশী এবং রাজা পুরুরবার প্রণয় কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। কবি বিষ্ণু দে-র প্রতিটি কাব্যেই চরিত্র-ঘটনা কিংবা শব্দ, ব্যঞ্জনা বা রূপকের অনুবর্তন ঘটেছে। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে কাব্যবিশ্লেষণ রীতি এবং পূর্বসূত্রের পরিচয় সাপেক্ষে কবি বিষ্ণু দে-র কাব্যে কীভাবে প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় প্রসঙ্গ এসেছে বা আধুনিক ভাষ্যে অনুসৃজিত হয়েছে তার সন্ধান করা হবে। পূর্বসূত্রের প্রেক্ষিতে কবি বিষ্ণু দে-র কাব্যের পর্যালোচনা করা হল।

**ক. বেদ:** ‘উর্বশী ও আর্টেমিস’ কাব্যের প্রথম কবিতা ‘পলায়ন’-এ কবি লিখেছেন ‘উর্বশী আর উমাকে পেয়েছি এ প্রেমপুটে’<sup>2</sup>। উর্বশীর প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। ‘বেদের মতে মিত্রাবরণ আদিত্য যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে অঙ্গরা উর্বশীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়ায় ঙ্গদের রোতপাত হয়। রোতের যে ভাগ কুস্ত্রে পড়ে, সে ভাগ হতে বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। এতে এই দুই দেবতা ক্রুদ্ধ হয়ে উর্বশীকে অভিশাপ দেন যে, তাঁকে পৃথিবীতে নির্বাসিত হতে হবে। এখানে এসে উর্বশী পুরুরবার স্ত্রী হ’ল।’<sup>3</sup>

‘পূর্বলেখ’ কাব্যের উৎসর্গ পত্রে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে। আসলে এই মন্ত্রের প্রসঙ্গটি এসেছে সদ্য প্রয়াত কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সূত্রে। অথর্ব বেদের দুটি ভিন্ন সূক্তের অংশ একত্রিত করে কবি উদ্ধৃত করেছেন -

‘ছয়ামি মে মনসা মন ইহেমান্ গৃহান্ উপজুজুষণ এহি।  
সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সংযমেন স্যোনাস্ত্বা বাতা উপবাস্তু শন্মাঃ।  
ইহৈবৈধি ধনসনিরিহ চিত্ত ইহক্রতুঃ।  
ইহৈধি বীর্যবত্তরো বয়োধা অপরাহতঃ।’<sup>4</sup>

মন্ত্রটির অর্থ - ‘হে প্রেত পুরুষ, তোমার মন আমাদের মনের সাথে এ লোকে আস্থান করছি। আমাদের গৃহে তোমার উদ্দেশ্যে যে ঔর্ধ্বদেহিক কর্ম করা হচ্ছে, তাতে প্রীত হয়ে এস। সংস্কারের পর পিতৃ, পিতামহ, প্রপিতামহদের সাথে এবং পিতৃগণের অধিপতি যমের সাথে মিলিত হও। পিতৃলোক গমনকালে তোমার যে পথশ্রম হয়েছে, তা অপোনদনের জন্য নিরন্তর সুখকর বায়ু তোমার কাছে প্রবাহিত হোক।’<sup>5</sup> পরবর্তী ছত্র দুটির অর্থ - ‘হে দীপ্ত পাংসুতে আহিত, উন্মুক্ত তুমি পাংশুরূপ প্রদেশেই থাক, আমাদের ধনদাতা হও, এখানে প্রজ্ঞাতা হও, এখানে আমাদের কর্ম সম্পাদক হও এখানে বলবান অঙ্গের বিধাতা হও ও শত্রুর দ্বারা অপরাধিত হয়ে অবস্থান কর।’<sup>6</sup>

<sup>2</sup> পলায়ন, কবিতা সমগ্র, ১ম অখণ্ড সংস্করণ, কলকাতা, সিগনেট প্রেস, ২০১৫, পৃ ৫।

<sup>3</sup> উর্বশী - সুধীরচন্দ্র সরকার, পৌরাণিক অভিধান, নবম সংস্করণ, কলকাতা, এম সই সরকার অ্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, পৌষ, ১৪১২, পৃ ৬৪।

<sup>4</sup> কাব্যপরিচয়, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৬৩।

<sup>5</sup> অথর্ববেদ ১৮/২/৩/১, বিজনবিহারী গোস্বামী (অনু. ও সম্পাদনা), অথর্ববেদ, ১ম প্রকাশ, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৮, পৃ ৪৭৬।

<sup>6</sup> অথর্ববেদ ১৮/৪/৪/৮, তদেব, পৃ ৪৯৮।

খ. উপনিষদ: ‘উর্বশী ও আট্টেমিস’ কাব্যের প্রথম কবিতা ‘পলায়ন’-এ কবি লিখেছেন ‘উর্বশী আর উমাকে পেয়েছি এ প্রেমপুটে’। উমার<sup>7</sup> উল্লেখ পাওয়া যায় ‘কেনোপনিষৎ’-এর তৃতীয় খণ্ড দ্বাদশ মন্ত্বে। তিনি ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী।

‘সোহবিভেত্তিস্মাদেকাকী বিভেতি’ কবিতার নামটি ‘বৃহদারণ্যকোপনিষৎ’-এর প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণ ‘কণ্ডিকা’ থেকে গৃহীত হয়েছে। স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত উপনিষৎ গ্রন্থাবলী তৃতীয় ভাগে বলা হয়েছে - ‘(সেই প্রজাপতি) তিনি ভয় পাইলেন। এই জন্য (আজও) লোকে একাকী থাকিতে ভীত হয়।’<sup>8</sup> এই কবিতায় কবি জনারণ্যের মধ্যে নিঃসঙ্গতা অনুভব করেছেন। ত্রিশঙ্কুকে<sup>9</sup> স্বর্গ থেকে অধঃশির হয়ে পড়ে যাওয়ার সময় বিশ্বামিত্র তাঁর পতন রোধ করে উর্ধ্বলোকে স্থান দেন। আধুনিক মানুষের মনে ভয় জাগিয়েছে অবলম্বনহীন পরিস্থিতি, যা ত্রিশঙ্কু-র সদৃশ। কবিতার ভাষ্যে -

‘নিত্যকাল ধরে এই - দিন কাটে নিত্য তৃপ্তিহীন,  
রাত্রিও প্রশান্তিহীন - ত্রিশঙ্কু এ আমার হৃদয়।’<sup>10</sup>

‘চোরাবালি’ কাব্যের ‘পঞ্চমুখ’ কবিতায় পথের দুর্গমতা বোঝাতে ‘স্কুরধার’ শব্দটির অর্থ ‘কঠোপনিষৎ’ থেকে গৃহীত হয়েছে। ‘স্কুরধার’ হল - ‘স্কুরস্য ধারা নিশিতা দূরতয়া দুর্গং পথস্তাৎ’<sup>11</sup>। কবিতার ভাষ্যে -

‘স্কুরধার পথ দুর্গম দূরদেশ -  
তীর্থযাত্রী খুঁজছে ভাবচ্ছবি।’<sup>12</sup>

তবু তাঁর পরিণতি, ‘প্রায়োপবেশনে শশবিষাণ গোনা!’<sup>13</sup> প্রসঙ্গত এই ‘শশবিষাণ’ শব্দটি অত্যন্ত অসম্ভব বা অলীক বস্তুর উদাহরণ। সংস্কৃতে লেখা ভারতীয় দর্শনে শব্দটি ভুল ব্যবহৃত। শব্দটি কবি বিষ্ণু দে-র আরও দুটি কবিতায় পাওয়া যায় - ‘উন্মনা’ এবং ‘সন্দীপের চর’। এই কবিতায় ‘স্ত্রীপ্রজ্ঞা’ ও ‘মহাশ্বেতা’র প্রসঙ্গ এসেছে -

‘জানি সে স্ত্রীপ্রজ্ঞা মাত্র, মানি যে সে সাধারণই মেয়ে,  
মহাশ্বেতা নয়, তবু তার কথা মনে লাগে ভালো।’<sup>14</sup>

‘বৃহদারণ্যকোপনিষদে’ যাজ্ঞবল্কের অন্যতম স্ত্রী কাত্যায়নীর প্রসঙ্গে ‘স্ত্রীপ্রজ্ঞা’ বলতে নারীজনোচিত সাংসারিক মনোভাব বোঝান হয়েছিল।

‘সন্দীপের চর’ কাব্যের ‘সমুদ্র স্বাধীন’ কবিতায় লিখেছেন -

<sup>7</sup> উমা - অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌরাণিকা (১), ২য় সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ), কলকাতা, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৫ (২০০১), পৃ ২৩৫।

<sup>8</sup> বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১/৪/২। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, উপনিষদ গ্রন্থাবলী (৩), সম্পা. স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৫সং, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮০ ব. পৃ ৫৬।

<sup>9</sup> ত্রিশঙ্কু - অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌরাণিকা (১), প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫৫-৬৫৮।

<sup>10</sup> সোহবিভেত্তিস্মাদেকাকী বিভেতি, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮।

<sup>11</sup> কঠোপনিষৎ ১/৩/১৪ ‘কঠোপনিষদ’। উপনিষদ গ্রন্থাবলী (১), প্রাগুক্ত, পৃ ৯২।

<sup>12</sup> পঞ্চমুখ, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮।

<sup>13</sup> তদেব।

<sup>14</sup> পঞ্চমুখ, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯।

‘.. .. কিংবা ভাবোঃ  
শ্বস্তু বিশ্বৈ অমৃতস্য পুত্রাঃ  
চল্লিশশতাব্দী ধরে চল্লিশকোটি এক বাণী  
গায় জু সুরে জু স্বরব্যঞ্জনের ভিন্ন ভিন্ন  
বিন্যাসে বিন্যাসে কত ধ্বনি ব্যঞ্জনায়ে কত না মৃত্যুর  
হয়ামি তে মনসা মন’<sup>15</sup>

‘শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে’র (২/৫) মন্ত্রে উল্লেখিত হয়েছে - ‘শ্বস্তু বিশ্বৈ অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থঃ’। - কবিতায় চল্লিশ কোটি মানুষ সকলেই অমৃতের সন্তান।

‘বৃহদারণ্যকোপনিষদে’র (৫/১/১) মন্ত্রে উচ্চারিত প্রার্থনা ছিল -  
‘পূর্ণমদ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।  
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।’<sup>16</sup>

কবির অনুভবে সেই মন্ত্র হয়েছে -  
‘সে পূর্ণে পূর্ণের যোগে পূর্ণ রয় পূর্ণের বিয়োগে  
পূর্ণই একাকী।’<sup>17</sup>

‘অষ্টি’ কাব্যের নাম কবিতার ‘জবাকুসুমসঙ্কশ’ শব্দের ব্যবহার সূর্য প্রণামের মন্ত্রকে স্মরণ করায় -  
‘জবাকুসুমসঙ্কশঙ কাশ্যপেয়ঙ মহাদ্যুতিঙ।  
ধ্বান্তারিঙ সর্কপাপায়ঙ প্রণতোহস্মি দিবাকরং।’<sup>18</sup>

এই শ্লোকের ‘জবাকুসুমসঙ্কশ’ শব্দটি সূর্যের লাল রঙের বিশেষণ ছিল। বর্তমান কবিতায় ঐ শব্দটি কবির কাছে লাল পতাকার বৈপ্লবিক আহ্বানকে সূচিত করে।

‘স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ’ কাব্যের নামকবিতা আছে -  
‘রৌদ্র হানো, বান দাও, হে সূর্য, হে চৈতন্যআকাশ  
এই নিত্য অপঘাত দূর করো’<sup>19</sup>

‘ঈশোপনিষদে’র পঞ্চদশ মন্ত্রের ‘তত্ত্বঙ পুষ্পপাবুণ সত্যধর্মায়ে দৃষ্টয়ে’ অংশের কাব্যিক অনুবাদ।

‘ঈশাবাস্য দিবানিশি’ কাব্যের ‘ঈশাবাস্য’ শব্দটি ‘ঈশোপনিষদে’র প্রথম মন্ত্র ‘ঈশা বাস্যমিদং সর্বং’<sup>20</sup> থেকে গৃহীত হয়েছে। ‘ঈশা’ শব্দের অর্থ পরমেশ্বর এবং ‘বাস্যম্’ শব্দের অর্থ আচ্ছাদনীয়।

<sup>15</sup> সমুদ্র স্বাধীন, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ২১০।

<sup>16</sup> বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৫/১/১, বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, উপনিষদ গ্রন্থাবলী (৩), প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫৯।

<sup>17</sup> সমুদ্র স্বাধীন, প্রাগুক্ত, পৃ ২১২।

<sup>18</sup> শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি, আঙ্কিককৃত্য (১) [সংস্করণ অনুল্লিখিতা, কলকাতা, বেণীমাধব শীল’স লাইব্রেরী, [প্রকাশকাল অনুল্লিখিতা], পৃ ১১২।

<sup>19</sup> স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৫০৮।

<sup>20</sup> ঈশোপনিষৎ ১, ঈশোপনিষদ, উপনিষদ গ্রন্থাবলী (১), প্রাগুক্ত, পৃ ৩।

গ. রামায়ণ: ‘চোরাবালি’ কাব্যের ‘বেকারবিহঙ্গ’ কবিতায় ‘রামায়ণে’র ত্রিশঙ্কু এবং জটায়ু-র কথা এসেছে। ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গ থেকে অধঃশির হয়ে পড়ে যাওয়ার সময় বিশ্বামিত্র তাঁর পতন রোধ করে উর্ধ্বলোকে স্থান করে দিয়েছিলেন। আলোচ্য কবিতায় বেকার যুবক-যুবতীর নিরালম্ব দশা বোঝাতেই ত্রিশঙ্কুর প্রসঙ্গটি কবি ব্যবহার করেছেন। ‘রামায়ণে’ জটায়ু সীতাহরণ আটকাতে চেষ্টা করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। জটায়ুর সেই কাহিনিকে রবীন্দ্রনাথের ‘কল্পনা’ কাব্যের ‘দুঃসময়’ কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে কবি বিষ্ণু দে লিখেছেন -

‘তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর  
কোরো না অন্ধ বন্ধ জটায়ুপাখা।’<sup>21</sup>

কবি বিষ্ণু দে পুরাকল্পটিকে প্রাণপণ চেষ্টার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

‘পূর্বলেখ’ কাব্যের ‘বিভীষণের গান’ কবিতার প্রসঙ্গ গৃহীত হয়েছে ‘রামায়ণ’ থেকে। বিভীষণ, রাক্ষসদের পক্ষ ত্যাগ করে মানুষদের পক্ষভুক্ত হয়েছে এবং স্বধর্মের প্রতি তাঁর মনে সন্দেহ জেগেছে। কবিতার ভাষ্যে -

‘আহা! আজ যদি পুষ্পকে হানো অগ্নিবান  
মস্ত্রিয়া নীল অগ্রচক্রঘর্ষরে  
লুকাব না কেউ প্রাকার ছায়ার গহ্বরে।  
স্বাগত গেয়েছি স্বগতে নাচার দীর্ঘকাল,  
হে বজ্রপাণি! স্বধর্মে মোরা সন্দিহান।’<sup>22</sup>

বিভীষণের এই অবসন্নতার কারণ স্বর্ণলঙ্কার অবক্ষয় -

‘আত্মহনের আত্মরতিতে স্বর্ণহীন,  
অতিপুষ্টির অতিসাররোগে বর্ণহীন  
স্বর্ণলঙ্কা শোখাতুর, সব ধূমলকায়।  
ভর্গে তোমার, বরণ্য! করো খড়াহত।’<sup>23</sup>

এই ‘শোখাতুর’, ‘ধূমলকায়’রাই স্বার্থান্ধ মানুষের প্রতীক। তাদের ‘খড়াহত’ করতে বরণ্য ভর্গ-এর শরণাপন্ন। এই ভর্গ প্রসঙ্গ গায়ত্রী মন্ত্র স্মরণ করায় - ‘তৎসবিতুর্বরণ্যঙ ভর্গোদেবস্য ধীমহি’।

রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে রাবণ পুষ্পকরথে চড়ে এসে সীতাহরণ করেছিল। কবির স্মৃতিতে পুষ্পকরথও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্কের দিনে বিদেশি শত্রু-বিমানের প্রতীক হয়ে উঠেছে। কবিতা ভাষ্যে -

‘পূর্ণিমার ভয়াবহ চন্দ্রালোক! শত্রুদের পুষ্পকচালক  
শুনেছি হৃদিশ পায় গৃহস্থ এ পূর্ণিমায়’

সীতাহরণের সময় বৃদ্ধ জটায়ু পাখি রাবণকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং রাবণের হাতে নিহত হয়। ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রামে বিশ্বব্যাপী যে প্রাণান্তিক প্রয়াস চলেছে, কলকাতাও তার সামিল হয়েছে, সেই তিমির হননকারী আলোকবর্ষী প্রতিরোধে সেও জটায়ু হয়ে উঠেছে।

<sup>21</sup> বেকার বিহঙ্গ, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৬২।

<sup>22</sup> বিভীষণের গান, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৭।

<sup>23</sup> বিভীষণের গান, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৮৭।

ঘ. মহাভারত: ‘উর্বশী ও আর্টেমিস’ কাব্যের প্রথম কবিতা ‘পলায়ন’-এ কবি লিখেছেন ‘উর্বশী আর উমাকে পেয়েছি এ প্রেমপুটে’। মহাভারতে উর্বশী চরিত্রটি-

‘চোরাবালি’ কাব্যের ‘ওফেলিয়া’ কবিতায় দেবযানী-র প্রসঙ্গ এনে কবি লিখেছেন -

‘দেবযানী! সাঁঝে তোমার প্রণাম মাঝে  
ক্লিষ্ট আমার দিবসের ক্ষমা বাজে  
শাপমোচনের সুরভি সুরের পাকে পাকে এই সাধনা আমার’<sup>24</sup>

ওফেলিয়া ও দেবযানী এই দুই নারীর প্রেমের বিপর্যয় আর যন্ত্রণাকে এইভাবে কবি স্পর্শ করেছেন।

‘চোরাবালি’ কাব্যের ‘উলুপী’ কবিতায় মগ্নচৈতন্যের সমুদ্রকে কবি ধরতে চেয়েছেন। কবিতা ভাষ্যে -

‘সগরসন্তান সব জেগে ওঠে মনের গহ্বরে;  
গন্ধর্ব কিন্নর সিদ্ধ যারা করে স্বপ্নশৈলে বাস,  
উলুপীর জ্ঞাতি তাঁরা চেতনায় হাত ছুঁয়ে যায়,  
সংখ্যাহীন বহু মূর্তি পরোক্ষ ছায়ায় পায় শ্বাস।’<sup>25</sup>

উলুপী হলেন কৌরব নাগের কন্যা। তাঁর জ্ঞাতি বলতে নাগকূলকে বোঝান হয়েছে। এই বিষন্ন সন্ধ্যায় কবির মনের গভীর জটিলতাকে সংস্কৃত সাহিত্যের রূপকল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

‘চোরাবালি’ কাব্যের ‘যযাতি’ কবিতাটির নামকরণ হয়েছে ‘মহাভারতে’র আদিপর্বে উল্লেখিত চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষের পুত্র যযাতির<sup>26</sup> নামে। এই কবিতায় অপরিমিত ভোগতৃষ্ণার পরিচায়ক হিসেবে তাঁর নাম বিশেষণে উল্লেখিত হয়েছে -

‘বসুন্ধরা অগ্নিউদরে লেগেছে দোলা,  
শতসর্পিল ধূমকেতু তার অস্ত্র টানে।  
মরণ আহরি আহারে বিবশ দিবশনিশা,  
অশনায়াত্র ধমনীশিরার পরমতৃষা  
নিদ্রাহীনের রজনীতে চায় চরম ভোলা  
স্নায়ুদাবদাহে যযাতি-শিরার প্রবল টানে।’<sup>27</sup>

‘অশনায়াত্র’ শব্দটির উৎস ‘ছান্দোগ্যপনিষৎ’ এবং অর্থ ক্ষুধা। ‘মহাভারতে’ শুক্লাচার্যের শাপে বিগতযৌবন যযাতি ছোট ছেলে পুরুর কাছ থেকে যৌবন নিয়ে হাজার বছর ভোগ করার পর বুঝেছিলেন - তৃষ্ণা জীর্ণ হয় না। এই প্রসঙ্গেই ‘অশনায়াত্র’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কবি এই যযাতি পুরাকল্পের মাধ্যমে আধুনিকতার বিপুল লোভকে ইঙ্গিত করেছেন।

<sup>24</sup> ওফেলিয়া, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫।

<sup>25</sup> সন্ধ্যা, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬।

<sup>26</sup> যযাতি - অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌরাণিকা (২), ১ম প্রকাশ, কলকাতা, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৯, পৃ ১৭৭-১৭৮।

<sup>27</sup> যযাতি - কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬।

‘অপস্মার’ কবিতায় উগ্র কামবাসনা প্রসঙ্গে বিচিত্রবীর্য ও দশরথের প্রসঙ্গের অবতারণা করে কবি লিখেছেন:

‘কোন বিচিত্রবীর্য কি  
পূর্বজ কোনো দশরথ  
রাজযক্ষ্মার ক্ষয়ভার  
জায়ুজ ব্রণের ক্ষয়পথ  
দায়ভাগে নির্লজ্জ কি  
রেখে গেছে পিছে উপহার?’<sup>28</sup>

‘মহাভারতে’র আদিপর্বে আছে শান্তনু আর সত্যবতীর পুত্র বিচিত্রবীর্য অতিরিক্ত যৌনাচারের ফলে বিয়ের সাত বছরের মধ্যে যক্ষ্মা রোগে মারা যান। কৃত্তিবাস ওঝার ‘শ্রীরামপাঁচালী’ অনুসারে দশরথের জের মধ্যে ব্রণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

‘পূর্বলেখ’ কাব্যের ‘নিরাপদ’ কবিতায় মহাভারতীয় প্রেক্ষিতে কবি লেখেন ‘অন্ধকার ইন্দ্রপ্রস্থের কথা’ -

‘অন্ধকার ইন্দ্রপ্রস্থ  
বনানীর বৈদেহী মর্মরে  
ভরে ওঠে রোমাঞ্চ-কন্টকে।’<sup>29</sup>

‘মহাভারতে’র সভাপর্বে ইন্দ্রপ্রস্থের অধিপতি পাণ্ডবদের কপট পাশাখেলায় শকুনির কাছে পরাজয় হয়েছিল আর দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে ‘অন্ধকার ইন্দ্রপ্রস্থ’কে পরিত্যক্ত হিসেবে চিনিয়ে দেয়। আর কবিতার কথক সেই বিপর্যয়ের দিনে সঙ্গহীন হয়েও ‘নিরাপদে সুখে দুঃখে শান্তিতে বা শোকের’ প্রাত্যহিক যাপনে সেই ‘নৈমিষকাল’ কাটিয়ে দেন। কোন প্রতিকারের চেষ্টা না করেই। সাংখ্যদর্শনে পুরুষকে নিষ্ক্রিয় বলা হয়েছে। কথক নিজেকে ‘দীনহীন সাংখ্যের পুরুষ’ বলে উল্লেখ করে নিজের কাপুরুষতাকে আড়াল করতে চেয়েছেন।

‘সাত ভাই চম্পা’ কাব্যের ‘প্রতিরোধ’ কবিতায় দধীচি-র প্রসঙ্গ এসেছে। মহাভারতের আদিপর্বের কাহিনি অনুযায়ী দধীচি আত্মত্যাগের পর তাঁর হাড় দিয়ে ইন্দ্রের বজ্র তৈরী হয়েছিল। সেই পুরাকথা ব্যবহার করে কবি লিখেছেন:

‘অমর প্রাণের অবজ্ঞা হেনে আমাদের জয়হাস্য,  
ভাঙা ছুরি জানি অকর্মণ্য, অসহায় হাতিয়ার,  
তবু জানি এই দধীচির হাড়ে এই ভাঙা হাতিয়ারে  
ইতিহাসে আজ পাতা কেটে দেবে, লিখব প্রাণের ভাষ্য।’<sup>30</sup>

অন্যায়ের প্রতিরোধে আত্মদানকারী মানুষই কবির চোখে দধীচি হয়ে উঠেছে। ‘সন্দীপের চর’ কাব্যের ‘আইসায়ার খেদ’ কবিতায় পুনরায় দধীচির প্রসঙ্গ এসেছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের দিনে খাদ্যের অভাবে মৃত মানুষের হাড় প্রসঙ্গে দধীচিকে স্মরণ করে কবি লিখেছেন:

<sup>28</sup> অপস্মার, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৬।

<sup>29</sup> নিরাপদ, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৮।

<sup>30</sup> প্রতিরোধ, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৫।

‘নরকে জানে না শুনি আছে তারা দুরন্ত নরকে,  
রৌরব প্রাসাদে হাসে শাদাকালো গৌরব-প্রহরে!  
দধীচির হাড় জ্বলে, কী দেয়ালি বিবস্ত্র মড়কে!’<sup>31</sup>

**ঙ. সংস্কৃত ধ্রুপদী সাহিত্য:** ‘উর্বশী ও আর্টেমিস’ কাব্যের প্রথম কবিতা ‘পলায়ন’-এ কবি লিখেছেন ‘উর্বশী আর উমাকে পেয়েছি এ প্রেমপুটে’। মহাকবি কালিদাসের ‘বিক্রমোর্বশীয়’ নাটকে উর্বশী এবং পুরুরবার প্রণয়ের কাহিনি রয়েছে। উমা, কালিদাসের ‘কুমারসম্ভব’ কাব্যের নায়িকা। প্রসঙ্গত কবি বিষ্ণু দে, রবীন্দ্রনাথের ‘উর্বশী’ এবং ‘তপোভঙ্গ’ কবিতার দ্বারা বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এই চরিত্র দুটি সৃজনে।

‘সাগড়উখিতা’ কবিতায় উর্বশীকে বালিয়াড়ি পার হয়ে দেখেছেন। এই উর্বশী সমুদ্রমহুনে নয়, সমুদ্রের বালিয়াড়ি পার হয়ে ‘অকস্মাৎ আবির্ভূত চোখে / রৌদ্রে ও সুবর্ণে মেশা পরিপূর্ণ তনু বলীয়ান’<sup>32</sup>। আলোচ্য প্রথম কাব্যের ‘আর্টেমিস’ প্রতীচ্যের চরিত্র নন, পুরুরবার অনুসৃজন। মর্ত্যের রাজা পুরুরবার সঙ্গে শাপগ্রস্ত উর্বশীর কিছু সময়ের জন্য মিলন হয়েছিল। শাপ মুক্তির পরে উর্বশী স্বর্গে ফিরে যায়, আর পুরুরবাকে খুঁজতে থাকে। কবি জানেন তাদের প্রেম ক্ষণিক, তাই লিখেছেন -

‘আমি নহি পুরুরবা, হে উর্বশী,  
আমরণ আসঙ্গলোলুপ,  
আমি জানি আকাশ-পৃথিবী  
আমি জানি ইন্দ্রধনু প্রেম আমাদের।’<sup>33</sup>

‘উর্বশী ও আর্টেমিস’ কবিতায় কবি, ভবভূতির ‘মালতীমাধব’-এর প্রস্তাবনার অনুকরণে লিখেছেন ‘বিপুলা পৃথিবী আর নিরন্ধি কাল’ (কালো হয়ং নিরবধিবিপুলা চ পৃথ্বী<sup>34</sup>)। ‘মহাভারতে’র শকুন্তলার কাহিনির কন্বমুনির আশ্রম এবং অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার উল্লেখ করে কবি বিষ্ণু দে লিখেছেন -

‘আজো তবু উর্বশীর স্তন  
উর্বশীর পাণ্ডু উরু শুভ্র বাহু উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের চোখ  
আমাদের করে রাখে তৃপ্তিহীন একাগ্র বৈরাগী।’<sup>35</sup>

‘চোরাবালি’ কাব্যের বিশিষ্ট কবিতা ‘ঘোড়সওয়ার’। কবিতাটিতে ‘মৃগতৃষ্ণিকা’র প্রসঙ্গ এসেছে - ‘মৃগতৃষ্ণিকা দূরদিগন্তে ডাকি?’<sup>36</sup> এই শব্দটি মরীচিকা অর্থে অপ্রচলিত শব্দের কাব্যিক সুষমাময় ব্যবহার করেছেন। শব্দটির পুনর্ব্যভার ঘটেছে এই কাব্যেরই ‘কবিকিশোর’ কবিতায়। তবে ‘জন্মাষ্টমী’ কবিতায় প্রচলিত বাংলা শব্দ

<sup>31</sup> আইসায়ার খেদ, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৯।

<sup>32</sup> সাগর উখিতা, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪।

<sup>33</sup> উর্বশী, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯।

<sup>34</sup> মালতীমাধব ১/৬, মালতীমাধবম, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (১৭), ১ম প্রকাশ, কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮৪, পৃ ৩৫৪।

<sup>35</sup> উর্বশী ও আর্টেমিস, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ২১।

<sup>36</sup> ঘোড়সওয়ার, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৩১।



‘মরীচিকা’ ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপ সংস্কৃত শব্দ যা বাংলা প্রায় নেই বললেই চলে - ‘বিবমিষা’, ‘বেকারবিহঙ্গ’, ‘অপস্মার’ (মৃগী) ইত্যাদি।

‘চোরাবালি’ কাব্যের ‘ওফেলিয়া’ কবিতায় দ্যাভাপৃথিবী অর্থে ‘ক্রন্দসী’ শব্দ ব্যবহার করে লিখেছেন - ‘ক্রন্দসী বুঝি তোমাকেই ঘিরে ছড়ালো ধারা’। বলাবাহুল্য দুরূহ সংস্কৃত শব্দের (যা তৎসম শব্দরূপে গৃহীত হয়নি) সাবলীল ব্যবহার কবিকে বিশিষ্ট দক্ষতায় সম্মানিত করেছে।

‘চোরাবালি’ কাব্যের ‘পঞ্চমুখ’ কবিতার একটি অংশের শিরোনাম হিসেবে ‘কুমারসম্ভব’ কাব্যের তৃতীয় সর্গের ৩৬ নং শ্লোকের উল্লেখ দেখা যায় - ‘শৃঙ্গেন চ স্পর্শ নিম্নীলিতাক্ষীণ্ড মৃগীমকণ্ডুয়তঃ কৃষ্ণসার’। অকাল বসন্তের এই শিরোনামটি কবির লিলির সঙ্গে কথোপকথনের পূর্বাভাস -

‘অকাল দখিনা, ভেঙেছি কাজের কারা,

ছাতে চলো লিলি, সংসার যাক খসে।

হৃদয় পাখির মতো যে বন্ধহারা -

অকাল দখিনা, ভেঙেছি কাজের কারা -<sup>37</sup>

অকাল বসন্তে অসময়েই সমস্ত প্রাণির মধ্যে যেমন রতির সঞ্চর হয়েছিল, লিলির প্রতি আবেগে তাকেই কবি স্মরণ করেছেন। তাই লিলির প্রতি তাঁর প্রেমকে ‘অভ্যাস, শুধু অভ্যাস’ বলেও শেষ পর্যন্ত বলেন -

‘আমাদের ভালোবাসা প্রাকৃতিক, লিলি।’<sup>38</sup>

‘পূর্বলেখ’ কাব্যের ‘মুদ্রারাক্ষস’ কবিতার শিরোনাম গৃহীত হয়েছে বিশাখদত্তের প্রসিদ্ধ নাটক ‘মুদ্রারাক্ষস’ নাম থেকে। এই নাটকটি সংস্কৃত সাহিত্যের একমাত্র রাজনৈতিক নাটক। ক্ষুরধারবুদ্ধি, কুটিল বিষুগুপ্ত চারণ্য নামান্তরে কৌটিল এই নাটকের নায়ক। এই কবিতার শুরুতেই কবি বলেছেন -

‘আমাকে আজ বিদায় দাও ভাই

চুকেছে যত কৌটিল্য ঘেঁষা

মারণাচারে ইষ্ট অশ্বেষা।’<sup>39</sup>

আসলে এখানে ধনতন্ত্রের প্রতীক মুদ্রা, আর ধনতন্ত্র তথা ভোগবাদের কুটিল কদর্য মূর্তিই কবির কাছে রাক্ষসদের মতো প্রতিভাসিত হয়েছে। তাই তাঁর লেখায় অর্জুনের অভিশপ্ত পুরুষত্বহারা অজ্ঞাতবাসের ছদ্মবেশ বৃহন্নলার বেশ ধরেন যুগাবতার কঙ্কি। এখানে কঙ্কিকে অবমিত করা হয়েছে। সমস্ত কবিতা জুড়ে কৌতুকের সুরে এই অবনমনকে তুলে ধরা হয়েছে।

‘নাম রেখেছি কোমল গান্ধার’ কাব্যের শিরোনাম নির্বাচিত হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় সাংগীতিক অনুষ্ঙ্গ থেকে। ‘কোমল গান্ধার’ ভারতীয় সংগীতের রাগ বিশেষ। এই রাগ বিষন্নতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে কাব্যের নাম নির্বাচনে ভিন্ন একটি সূত্র বেশি গুরুত্বপূর্ণ - রবীন্দ্রনাথের ‘পুনশ্চ’ কাব্যের ‘কোমল গান্ধার’ কবিতা থেকে এই নামটি নির্বাচিত হয়েছে।

<sup>37</sup> গার্হস্থ্যশ্রম, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯-৪০।

<sup>38</sup> তদেব।

<sup>39</sup> মুদ্রারাক্ষস, কবিতা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫৪।

কবি বিষ্ণু দে-র প্রথম তিনটি কাব্যে বৈদিক এবং ঔপনিষদিক উল্লেখের প্রাচুর্য দেখা যায়। পরবর্তী কাব্যগুলিতে উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, সংস্কৃত ধ্রুপদী সাহিত্য (বিশেষত কালিদাস, ভবভূতি ও বানভট্ট) নানা অনুষ্ণে ব্যবহৃত হয়েছে। কবির সৃজনে ত্রিশঙ্কু আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গ জীবনকে ইঙ্গিত করেছে। নহ্ষ উদ্ধত নব্য-ধনী সমাজের প্রতীক হয়ে উঠেছে। কবির শব্দচয়ন, পুরাকল্প, উদ্ধৃতি বা অনুবাদের ব্যবহারে পুনরাবৃত্তির প্রবণতা দেখা যায়।

### গ্রন্থপঞ্জি:

- ১। ঋগ্বেদ সংহিতা (১), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৬।
- ২। গন্তীরানন্দ, স্বামী (সম্পাদক) - উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৮০।
- ৩। গুহ, অনিন্দ্যবন্ধু - সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব-অনুগ্রহঃ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে-র কবিতায়, গবেষণা সন্দর্ভ।
- ৪। চক্রবর্তী, জাহ্নবী - প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার (১ম খণ্ড), ডি. এম লাইব্রেরী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০০৪।
- ৫। চক্রবর্তী, জাহ্নবী - প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার (২য় খণ্ড), ডি. এম লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭১।
- ৬। দে, বিষ্ণু - কবিতা সমগ্র, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১ম অখণ্ড সংস্করণ, ২০১৫।
- ৭। দে, বিষ্ণু - প্রবন্ধ সংগ্রহ (১), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৭।
- ৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলকুমার - পৌরাণিকা (১), ফার্মা কে এল প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২য় সংস্করণ (পুনর্মুদ্রণ), ১৯৮৫।
- ৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ ও বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতীম - বিষ্ণু দেঃ কালে, কালোত্তরে, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, এবং মুশায়েরা পরিবর্ধিত সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯।
- ১০। বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ - বঙ্গীয় শব্দকোষ, (১,২) সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ১ম সংস্করণ, (৬ষ্ঠ মুদ্রণ), ১৯৬৬।
- ১১। বেদব্যাস - মহাভারতম্ (১১), বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৪।
- ১২। শাস্ত্রী, গৌরীনাথ - সংস্কৃত সাহিত্য সন্ডার (১০, ১৭), নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৪।
- ১৩। সরকার, সুধীরচন্দ্র - পৌরাণিক অভিধান, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৯ম সংস্করণ, ১৪১২।

### পত্রিকা:

- ১। অনর্ঘ - ক্রোড়পত্রঃ বিষ্ণু দে জন্মশতবর্ষ, সম্পাদক মৃগালচন্দ্র হালদার, বইমেলা, ২০০৯।
- ২। আত্মবিকাশ - বিষ্ণু দে জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর, ২০০৯।
- ৩। কোরক - বিষ্ণু দে সংখ্যা, সম্পাদক তাপস ভৌমিক, বইমেলা, ১৪১৬।
- ৪। চান্দ্রমাস - বিষ্ণু দে সংখ্যা, সম্পাদক গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, নভেম্বর, ২০০৯।
- ৫। বঙ্গদর্শন - বিষ্ণু দে স্মরণ-সমীক্ষণ, সম্পাদক সত্যজিৎ চৌধুরী, জানুয়ারি ২০০৮ - ডিসেম্বর ২০০৯।
- ৬। শিলীক্স - কবি বিষ্ণু দে সংখ্যা, সম্পাদক কমল মুখোপাধ্যায়, এপ্রিল-জুন, ২০০৯।



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 509-522

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.038



## ‘একা এবং কয়েকজন’: তরুণ কবির নিজস্ব কণ্ঠস্বর

ড. শেখ নজরুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, আকুই কমলাবালা উইমেন্স কলেজ, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 31.12.2024; Accepted: 24.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*Sunil Gangopadhyay's first poetry collection is 'Eka Ebong Koyekjon' (Alone and a few). It was published in 1958. The publisher of the book was poet Sameer Roychowdhury. The cover was by Purnendu Patri. There are forty-eight poems in this collection. The poems in 'Eka Ebong Koyekjon' show the young poet's irresistible urge to find his own voice. In the pursuit of this urge, he is trying his best to reach a different path in a light that is gradually independent of his contemporary poets. The reader is surprised by the way he breaks all kinds of conventional thoughts and consciousness and dedicates himself to a new literary experiment. The poet does not want to accept submission anywhere; in fact, he seems to have no bonds anywhere! He wants to go beyond the boundaries and give language to the newly emerging consciousness in the poems of 'Eka Ebong Koyekjon'.*

*From the poems in the 'Eka Ebong Koyekjon', we get a glimpse of one of the foremost poets of Bengal after Jibanananda. The poems in this book are coherent in theme, beautiful in imagery, and enjoyable to read.*

*We have found numerous confessions from Sunil about his own poetry – “I am extremely hesitant about my own poetry. I have not yet reached the level of perfection at which a poem becomes complete or, one might say, transcendental.” Yet Sunil had the intention of transcending poetry to that level. His efforts are evident in the poems of his 'Eka Ebong Koyekjon' collection. The foundation of Sunil's sacrifice for 'words', which we have seen throughout his life's poetic practice, is laid in this collection. As a result, a strange intoxication pervades the body of the poems in this collection. There is also a sense of intoxication.*

**Keywords:** Eka Ebong Koyekjon, Voice, Consciousness, Intoxication, Perfection, Sacrifice, Independent, Boundaries, Transcendental.

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘একা এবং কয়েকজন’। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। বইটির প্রকাশক ছিলেন কবি সমীর রায়চৌধুরী। প্রচ্ছদ করেন পূর্ণেন্দু পত্নী। এই কাব্যে মোট কবিতার সংখ্যা আটচল্লিশ।

‘একা এবং কয়েকজন’ কাব্যগ্রন্থের কবিতায় দেখা যায়, একজন তরুণ কবির নিজস্ব কণ্ঠস্বর খোঁজার অসম্ভব তাগিদ। যে তাগিদের তাড়নায় তিনি তাঁর সমসাময়িক কবিদের থেকে ক্রমশ স্বাতন্ত্র্য আলোক-বর্তিকায় ভিন্ন মার্গে পৌঁছানোর আশ্রয় চেষ্টা করছেন। যতরকমের প্রথাগত চিন্তা-চেতনা সব কিছুকে ভেঙে এক নতুন খেলায় আত্মনিয়োগ পাঠককে এখানে বিস্মিত করে। কোথাও কবি বশ্যতা স্বীকার করতে চান না; বস্তুত কোনো খানেই যেন তাঁর বন্ধন নেই! সীমানার বাইরে বের হয়ে নব উদ্ভিত চেতনাকে তিনি ভাষারূপ দিতে চেয়েছেন ‘একা এবং কয়েকজন’ কাব্যের কবিতার মাঝে।

‘একা এবং কয়েকজন’ কাব্যের কবিতাগুলি থেকে আমরা জীবনানন্দ-পরবর্তী বাংলার প্রথম সারির অন্যতম কবিকে পাওয়ার আভাস পেতে থাকি। এই কাব্যের কবিতাগুলি সংহত, সুন্দর, এবং সুখপাঠ্য। যদিও এই সময়ের কবিরাজ (পঞ্চাশের দশকের) রবীন্দ্র-প্রভাব থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে নিজেদের সরিয়ে রাখতে পারেননি। লিরিকের প্রভাবও পঞ্চাশের দশকের কবিদের মধ্যে আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘একা এবং কয়েকজন’ কাব্যের বেশ কিছু কবিতায় অন্ত্য মিল রয়েছে। একদম শুরু দিকে লেখা কবিতা। তখন সেই সময়ের কবিদের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বেশি ছিল। সে সময়ের কবিতা ছিল লিরিকধর্মী – গানের মতো কবিতা লেখা হত। একটা আবর্তে আবদ্ধ হয়ে পড়াটা ছিল স্বাভাবিক।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্বীকারও করেন তা। এই ধরনের স্বীকারোক্তি সুনীলের পক্ষেই সম্ভব! তিনি নিজের দুর্বলতা, স্ব-চরিত্রের অত্যন্ত গোপনীয়তা ইত্যাদি নানা লোক-নিন্দিত বিষয় প্রকাশ্যে আনতে পারেন অবলীলায়। সরস্বতীর মূর্তি দেখে নিজের যৌন-চেতনা জাগ্রত হবার কথা সুনীলই তো আমাদের শুনিয়েছিলেন তাঁর ‘অর্ধেক জীবন’ বইয়ের পাতায় –

“প্রতিমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় সর্বাস্থে শিহরণ হল। কী অপূর্ব সুন্দর মুখ এই শ্বেতবসনা রমণী! আয়তচক্ষু, স্ফুরিত গুণ্ড, ভরাট, বর্তুল দুটি স্তন। সরু কোমর, প্রশস্ত উরুদ্বয়। ...তার অভিঘাতে তছনছ হয়ে যেতে লাগল আমার কৈশোর, জেগে উঠল পুরুষার্থ, অল্প অল্প শীতেও উষ্ণ হয়ে উঠল শরীর। ...চোরের মতন সতর্কভাবে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে আমি হাত রাখলাম দেবী মূর্তির বুকে। ...সেই কুচযুগে আমার আঙুল, আমার শরীর আরও রোমাঞ্চিত হল, কানদুটিতে আঙুলের আঁচ। আমি প্রতিমার গুণ্ড চুম্বন করলাম, আমার জীবনের প্রথম চুম্বন।”<sup>১</sup>

পরবর্তী পর্যায়ে এই স্বীকারোক্তিই হয়ে ওঠে সুনীলের সাহিত্যের একটি অন্যতম প্রধান ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য। সুনীলের এই স্বীকারোক্তি কিন্তু কোনো ভাবেই তাঁর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের মৌলিক সংশোধনের প্রয়াস বলা যাবে না। তবে এর মধ্য দিয়েই তিনি ‘এক আমি’ থেকে ‘অপর আমি’র উত্তরণের সন্ধান করেন। এই ‘এক আমি’ থেকে ‘অপর আমি’র সত্তার সম্বন্ধ দ্বিমাত্রিক; কখনো তা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, কখনো তা বৈপরীত্যে বিচ্ছিন্ন। এ-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধায় রণজিৎ গুহ অত্যন্ত মূল্যবান কয়েকটি কথা বলেছেন –

“অনেকের রচনাতেই কবিসত্তার এই দ্বিধাবিভক্ত রূপ কিছুটা প্রচ্ছন্ন থাকে। বস্তুত, সেই প্রচ্ছন্নতা ও তার ব্যঞ্জনা সাধারণত এই কবিদের কৃতিত্ব বলেই বিবেচিত হয়। এদিক থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একেবারেই অন্য জাতের কবি। তাঁর কাব্যে, স্বচ্ছতার দাবিতে, স্বীকারোক্তির মধ্যে কোনো ফাঁক

বা ফাঁকি নেই। বরং এই চিড়-খাওয়া অস্তিত্ব যে তাঁর কবিসত্তার মৌলিক উপাদান, সেকথা অসংকোচে কবুল না করলেই যেন তাঁর অস্বস্তি লাগে। তাঁর অস্তিত্ব ঐতরিকতায় আক্রান্ত এবং মরিয়া হয়ে তার অভাববোধের প্রতিকার খোঁজ ফাটল-ধরা আমির দুই খন্ডের পারস্পরিকতায়।”<sup>২</sup>

নিজের কবিতা নিয়েও সুনীলের অসংখ্য স্বীকারোক্তি আমরা পেয়েছি -

“নিজের কবিতা সম্পর্কে আমার সঙ্কোচ দুর্মর। যে পরিপূর্ণতায় পৌঁছালে একটি কবিতা স্বয়ং সম্পূর্ণ কিংবা বলা যায়, অতিজীবিত হয়ে ওঠে, সেই স্তরে আমি আজও পৌঁছাতে পারি নি।”<sup>৩</sup>

অথচ কবিতাকে সেই স্তরে অতিজীবিত করার অভিপ্রায় সুনীলের মনেপ্রাণে ছিল। তারই চেষ্টা আছে তাঁর ‘একা এবং কয়েকজন’ কাব্যের কবিতাগুলিতে। ‘শব্দ’ নিয়ে সুনীলের যে যজ্ঞ তাঁর সারা জীবনের কাব্যচর্চায় আমরা দেখেছি, তার ভিত্তি স্থাপন আছে এই কাব্যে। ফলে এই কাব্যের কবিতাগুলির শরীরে এক অদ্ভুত মাদকতা ছড়িয়ে আছে। আছে নেশা লাগার ঘোরও।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘একা এবং কয়েকজন’ কাব্যের প্রথম কবিতা ‘প্রার্থনা’। এই কবিতায় কালের ভয়াবহতায় আবদ্ধ এক কবির মুক্তির প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে অপরূপ কিছু শব্দে। এখানে আছে স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের নিদারুণ হাহাকার -

‘আমারও আকাজক্ষা ছিল সূর্যের দোসর হবো তিমির শিকারে  
সপ্তাশ্ব রথের রশি টেনে নিয়ে দীপ্ত অঙ্গীকারে।  
অথচ সময়াহত আপাত বস্তুর দ্বন্দ্বে দ্বিধান্বিত মনে  
বর্তমান-ভীতু চক্ষু মাটিতে ঢেকেছি সঙ্গোপনে।’<sup>৪</sup> (প্রার্থনা)

‘সময়াহত’ অবশ্যই যুগচেতনার ফসল। এই যুগচেতনা সুনীলের বহু কবিতার মূল ভাব। ‘প্রার্থনা’ কবিতায় সুনীলের ব্যক্তিজীবনও কেমন ভাবে যেন ঢুকে গেছে! হয়ত তা অবচেতন ভাবেই। কারণ তাঁর বহু কবিতায় অবচেতন ভাবে এমন কিছু এসে যায়, যা তিনি হয়ত বলতে চাননি। সুনীলের বাল্য-কৈশোরকাল গ্রাম ও শহর দু’জায়গাতেই কেটেছে। এর সুদূরপ্রসারি প্রভাব পড়েছে তাঁর সাহিত্যে। গ্রামের উদার প্রকৃতির সান্নিধ্য যেমন তিনি পেয়েছেন, সেই সঙ্গে শহরের নাগরিক জীবনের ব্যস্ততাও তাঁকে সমৃদ্ধ করেছিল। সুনীল বলেছেন -

“কলকাতার শান বাঁধানো পথে আছাড় খেয়ে আমার মাথা ফেটেছে, আবার গ্রামের আদিগন্ত পাটখেতের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে আমি চলে গেছি সূর্যাস্তের দিকে।”<sup>৫</sup>

অভিনিবেশের সঙ্গে যদি লক্ষ করি, তাহলে দেখব সুনীলের জীবনযাপনের মধ্যে বাল্য-কৈশোরের এই গ্রাম ও শহরের সম্মিলিত ধারা কিন্তু মিলছে। এই কবিতার মধ্যেও অজ্ঞাতসারেই হয়ত এই গ্রাম ও শহরের প্রচ্ছন্ন সম্মিলন দেখতে পাচ্ছি-

‘ঋজু শাল অশ্বথের শিকড়ে শিকড়ে যত ক্ষুধা  
সব তুমি সয়েছ’, বসুধা।  
স্তব্ধ নীল আকাশের দৃশ্য অন্তহীন পটভূমি  
চক্ষুর সীমানা প্রান্তে বেঁধে দিয়ে তুমি  
এঁকে দিলে মাঠ বন বৃষ্টিমগ্ন নদী - তার দূরাভাস তীর

আমাকে নিঃশেষে দিলে তোমার একান্ত মৃদু মাটির শরীর।”<sup>১৬</sup> (প্রার্থনা)

কবির চোখে ‘মাঠ বন বৃষ্টিমগ্ন নদী’ গ্রামের দোসর হতে বাধা নেই; কিন্তু ‘তার দূরাভাস তীর’- অবশ্যই শহরের ইঙ্গিত। ‘মাটির শরীর’ও এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ হতেই পারে। মাটি কিন্তু সহনশীল, সমস্ত কিছুকে শোষণ করার শক্তি রাখে। কবির শরীরকে মাটির উপাদানে গঠিত করে গ্রাম ও শহর জীবনকে ধারণ করার ক্ষমতার কথা এসে গেছে কবিতার এই অংশে।

প্রেমভাবনার নতুন অনুভূতি আছে ‘ঝর্ণা-কে’ কবিতায়। এক প্রেম-পূজারি বাউলের ট্রাজেডি যেন এই কবিতাটি। এই বাউল মরেও তার প্রেমকে অঙ্কুতভাবে বাঁচিয়ে রেখে গেছে -

‘সেই যে এক বাউল ছিল সংক্রান্তির মেলায়  
গানের তোড়ে দম বাধলো গলায়  
হারানো তার গানের পিছে হারালো তার প্রাণ,  
আহা, ভুলে গেলাম কি তার গান!

প্রাণ দিয়েছে দেয় নি তার হাসি  
গানের মতো প্রাণ ছেড়েছে খাঁচা।  
সেই যে তার মরণাহত হাসি  
ঝর্ণা, জানো, তারই নাম তো বাঁচা।’<sup>১৭</sup> (ঝর্ণা-কে)

‘সপত্নী’ কবিতায় এসেছে প্রেম ও কবিতা- এই দুইয়ের পরস্পরের মধ্যকার এক সম্পর্ক। কোনো পুরুষের জীবনে যেমন দুটি সতীন একসঙ্গে থাকলে তার বিড়ম্বনার অন্ত্য নেই; তেমনি এই কবিতাতেও সুনীল প্রেম ও কবিতাকে সমগোত্রীয় স্থানে রেখে লিখেছেন-

‘তুমি কবিতার শত্রু- কবিতার মন্দির সৌরভ  
মুহূর্তেই মুছে যায়- তুমি এলে আমার এ ঘরে  
থাকে শুধু যৌবনের যন্ত্রণার তীব্র অনুভব  
বৃষ্টির মতন ঝরে অন্ধকার- সমস্ত অন্তরে।’<sup>১৮</sup> (সপত্নী)

‘কবিতার শত্রু’ এখানে যৌবন-উদ্দীপ্ত কবির প্রেমভাবনার প্রকাশ। যৌবনে পদার্পণ করা কবির হৃদয়ে এই প্রেমের জোয়ার এলে ‘কবিতা’ যেন কোথায় হারিয়ে যায়! কবির অকপট স্বীকারোক্তি-

‘আমাকে নিষ্ঠুর হাতে ছিন্ন করে নাও তুমি এসে  
সমস্ত পৃথিবী থেকে তোমার আপন পৃথিবীতে’<sup>১৯</sup> (সপত্নী)

কিন্তু কবিতা চলে গেলেও কবি সুখি থাকেন তাঁর যৌবন-উদ্দীপ্ত প্রেমভাবনা নিয়ে। এই প্রেমভাবনা প্রেমিক কবিকে আনন্দের স্বাদে সিক্ত করে। ‘নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে সাধ হয় ভালোবেসে’- এও এক ধরনের আত্মলীন চেতনা। যার পরতে পরতে মিশে রয়েছে প্রেমের প্রতি কবির দুর্বীর আকাঙ্ক্ষা। এবার প্রেম ও কবিতা কেমন অসাধারণ চেতনায় অঙ্গঙ্গীভাবে মিশে যায়-

‘কাব্যের স্বপত্নী তুমি, তুমি তাঁকে চাও না অন্তরে  
সে তবু আমার মনে তোমারই স্বপ্নের মূর্তি গড়ে।’<sup>২০</sup> (সপত্নী)

‘প্রেম’ থেকেই ‘কবিতা’ জন্ম নেয় - এই সত্য ‘সপত্নী’ কবিতায় উদ্ভাসিত।

এই কাব্যের ‘বিবৃতি’ কবিতায় রয়েছে এক বিধবা নারীর জীবন-ট্রাজেডির কথা। যে নারী তার উনিশ বছর বয়সেই স্বামীকে হারিয়ে বিধবা হয়েছে। তারপর দীর্ঘ একাকীত্বে অসহায়া এই নারী তার দেহক্ষুধার যন্ত্রণায় কাটিয়েছে বেশ কয়েকটা বছর। তারপর একদিন জানা যায়, সেই বিধবা মেয়েটি গর্ভবতী! বাতাসে ছড়িয়ে যায় নানান সন্দেহের কানাকানি। সামাজিক লজ্জায় মেয়েটির অবস্থা এখন মরণাপন্ন।

‘উনিশে বিধবা মেয়ে কায়ক্লেশে উনতিরিশে এসে  
গর্ভবতী হল, তার মোমের আলোর মত দেহ  
কাঁপালো প্রাণান্ত লজ্জা, বাতাসের কুটিল সন্দেহ  
সমস্ত শরীরে মিশে, বিন্দু বিন্দু রক্ত অবশেষে  
যন্ত্রণায় বন্যা এলো, অন্ধ হলো চক্ষু, দশ দিক,  
এবং আড়ালে বলি, আমিই সে সচতুর গোপন প্রেমিক।

... ..  
বাঁচাতে পারবে না তাকে উনবিংশ শতাব্দীর বীরসিংহ শিশু  
হবিষ্যান্ন পুষ্ট দেহ ভবিষ্যের ভারে হল মরণসম্ভবা  
আফিম, ঘুমের দ্রব্য, বেছে নেবে আগুন, অথবা  
দোষ নেই দায়ে পড়ে যদি বা ভজনা করে যীশু।” (বিবৃতি)

এই কবিতাটি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় মঞ্জুভাষ মিত্র বলেছেন -

“কবি তাঁর নিজস্ব কণ্ঠস্বর আবিষ্কার করেছেন- বিদ্রোহ, স্বীকারোক্তি বা confession। ভঙ্গিমির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভঙ্গিমা, দেহ ও যৌনতাকে কবিতায় স্বপ্রতিষ্ঠ করে তাকে প্রকৃত অর্থেই রক্তমাংসের করে তোলার জোরালো প্রস্তাবনা ইতিহাসচেতনা- বিশেষত উনিশ শতকের রেনেসাঁস-মর্মরিত বৃত্তে সময়ের শিকড়, খোঁজার বাসনা- এইসব মূল প্রবণতাগুলি স্বচ্ছভাবে দেখা দিয়েছে।”<sup>১২</sup>

এই কবিতা সম্পর্কে বিদগ্ধ মঞ্জুভাষ মিত্রের উক্ত বিশ্লেষণ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অবশ্যই কবিতায় ব্যবহৃত ‘কণ্ঠস্বর সাহসী’। কিন্তু কবিতাটির সার্বিক পর্যালোচনা করতে গেলে এর পটভূমি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কবিতাটির পটভূমি বুঝতে আমাদের একটু পিছনে যেতে হবে; চল্লিশের দশকে। এই সময় বালক সুনীল তাঁর মা মীরাদেবীর সঙ্গে কিছুকাল কাশীতে অবস্থান করেছিলেন। এখানের (কাশী) বিধবাদের করুণ দশা বালক সুনীলের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

আসলে কাশীতে বিধবারা ছিলেন প্রকৃত অর্থেই অসহায়া। বাংলা থেকেও হাজার হাজার বিধবাদের তখন বাবা-কাকারা কাশীতে পাঠিয়ে দায়মুক্ত হতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং দুর্ভিক্ষ-এই দুইয়ের প্রভাব পড়েছিল কাশীর বিধবাদের ওপরেও। কেননা, বাড়ি থেকে যে সামান্য টাকা আসত, তাতে প্রাসাচ্ছাদন সম্ভব ছিল না। এই নিয়ে অবশ্য মাথা ঘামাতেন না অভিভাবকেরা! ফলে নিরুপায় হয়ে কাশীর বিধবাদের ভিক্ষা পর্যন্ত করতে হয়েছে, এমনকি অসহায় হয়ে তারা দেহব্যবসার কাজেও লিপ্ত হয়েছিল।

এদের অবস্থা সুনীলের মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তীতে সুনীলের বিধবা মেয়ে বিয়ে করার বাসনা (‘আমি বিয়ে করব কোনও বিধবা কিংবা কোনও মুসলমান মেয়েকে’<sup>১৩</sup>) কিন্তু এই ঘটনারই

প্রতিফলন বলা যায়। এই বাসনা থেকেই ‘বিবৃতি’ কবিতার ‘আড়ালে বলি, আমিই সে সচতুর গোপন প্রেমিক’-র মতো দুঃসাহসিক চরণ। এই কবিতা আসলে কবি সুনীলের ইচ্ছা পূরণের স্বপ্নের মোহাচ্ছন্নতা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বহু কবিতা বুঝতে গেলে ব্যক্তিসুনীলকে জানা অত্যন্ত জরুরি। কেননা, সুনীলের ব্যক্তিজীবনের নানা টুকরো টুকরো ঘটনা তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে। সুনীল নিজেও বলেছেন তা -

“আমার কবিতাগুলি অতিশয় ব্যক্তিগত বা স্বীকারোক্তিমূলক। কোনো স্থির কাব্য-আদর্শ আমার নেই। নারীর ভিতরে নারী, রূপের ভিতরে বিষাদ, জলের মধ্যে জল রং, গাড়ি বারান্দার নীচে উপবাসী মানুষ, শ্রেণী বৈষম্যের বীভৎস প্রকাশ আমাকে যে-কোনো সময় বিচলিত করে- এই সব বিষয়ই কখনো প্রশ্নে, কখনো বিষাদে, কখনো ব্যাকুলতায়, চিৎকারে আমি নানারকম ভাষায় প্রাকশের চেষ্টা করি।”<sup>১৪</sup>

সুনীলের ব্যক্তিজীবনের এই নানা টুকরো টুকরো ঘটনা তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে- কোনোটার প্রকাশ প্রত্যক্ষভাবে, কোনোটার প্রচ্ছন্ন। এমনই একটি কবিতা ‘মিনতি’। কবিতারটির মূল ভাবনা প্রেম। আর এই প্রেম যে বিশেষ নারীকে কেন্দ্র করে, সেটা জানতে হলে সুনীলের ব্যক্তিজীবনে ঊঁকি দিতেই হয়।

দশম শ্রেণিতে পড়ার সময়েই সুনীলের হৃদয়ে অপর্ণা নামের এক কিশোরীর প্রতি প্রথম প্রেমের উন্মেষ ঘটে। এই প্রেমের প্রভাব সুনীলের কবি হওয়ার পিছনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেননা, এই অপর্ণা নামের কিশোরী কবিতা শুনতে খুব ভালোবাসতো। সুনীল তাঁর আত্মজীবনীতে জানাচ্ছেন -

“অপর্ণা যদি খেলোয়াড়দের ভক্ত হত, আমি নিশ্চিত খেলায় মন দিতাম, যদি গায়কদের পছন্দ করত, আমি গলা সাধতাম, তাকে খুশি করার একমাত্র উপায় নতুন নতুন কবিতা মুখস্ত বলা, তাই আমার কবিতা পাঠ শুরু হল নতুন উদ্যমে।”<sup>১৫</sup>

যাই হোক, এই অপর্ণা প্রাথমিক পর্যায়ে প্রেমের কবিতা রচনায় সুনীলের কবিহৃদয়কে রসদ জুগিয়েছে।

‘ঝড় দিসনে, আকাশ, সেই সুন্দরীর ঘরে  
থিরথিরিয়ে কাঁপতে থাকুক ভীরা দীপের শিখা  
আঁচল পেতে মাটিতে বুক চেপে থাক সে শুয়ে,  
একা ঘরের প্রতীক্ষিতা, আকাশ-কনীনিকা।’<sup>১৬</sup> (মিনতি)

কিশোরীর এই প্রতীক্ষা নিশ্চিত সুনীলের জন্যই। নির্জন দুপুরে একাকি ঘরে বসে অপর্ণা অপেক্ষা করে তার প্রেমিকের। তাই সুনীল কলেজে না গিয়ে দুপুরবেলা চলে আসেন অপর্ণার ঘরের কাছে (‘কলেজে না গিয়ে ঘোর দুপুরবেলা কোথায় যাওয়া যায়? কফি হাউসে তিনটে-চারটের আগে কেউ যায় না। তখন যেতাম সেই মেয়েটির কাছে’<sup>১৭</sup>)।

‘ঝড় দিসনে, আকাশ, তবু বিরহিণীর ঘরে  
আঁচল পেতে মাটিতে বুক চেপে থাকুক শুয়ে  
ঝিকঝিকিয়ে উঠুক কেঁপে ভীরা দীপের শিখা  
প্রেমিক যেন নেভায় এসে একটি দ্রুত ফুঁয়ে।।’<sup>১৮</sup> (মিনতি)

এই ‘মিনতি’ কবিতাটি বুদ্ধদেব বসু তাঁর ‘ঐতিহাসিক কাব্যসংকলন’ ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’য় (পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৭৩) স্থান দিয়েছেন।



‘তুমি’ নামক কবিতায় এই প্রেমের আরো গাঢ়রূপ আমরা দেখতে পেয়েছি।

‘আমার যৌবনে তুমি স্পর্ধা এনে দিলে  
তোমার দু’চোখে তবু ভীরুতার হিম!  
রাত্রিময় আকাশের মিলনান্ত নীলে  
ছোট এই পৃথিবীকে করেছো অসীম।

তোমার শরীরে তুমি গেঁথে রাখো গান  
রাত্রিকে করেছো তাই ঝঙ্কার মুখর  
তোমার সান্নিধ্যের অপরূপ স্রাণ  
অজান্তে জীবনে রাখে জয়ের স্বাক্ষর।’<sup>১৯</sup> (তুমি)

সুনীলের রুদ্ধ যৌবনে যে কিশোরি প্রেমের স্পর্ধা এনেছিল, তার সান্নিধ্যে স্পর্শের ভাষা অনুভব করা শুরু করেছিলেন তিনি। মাঝখানে জানালার গরাদ - দু’দিকে হাতে হাত রেখে রোমিও-জুলিয়েটের যেন দেশি সংস্করণ!

অপর্ণার সঙ্গে সুনীলের এই প্রথম প্রেম অবশ্য সার্থক হয়নি, অর্থাৎ এই প্রেমের পরিণতি ট্রাজেডিতে সমাপ্ত হয়েছিল। এর দায় অবশ্য সুনীল নিজেই নিয়েছেন - “একদিন খুবই বিপন্ন অবস্থায় অপর্ণা আমাকে জানাল যে, আমি ডাক দিলে সে যে-কোনওদিন এক বস্ত্রে তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গে থাকতে রাজি আছে। আমি সেই ডাক দিতে পারিনি।”<sup>২০</sup>

এই কাব্যের ‘শেষ প্রণয়’ কবিতায় এই প্রত্যাখান সুনীল মরমি বেদনায় তুলে ধরেছেন -

‘-ফিরে যাও হে রমণী, আপন আঁচল ঢেকে মুখ।  
সামান্যের বাসনায় তাকে পেতে হয়ো না উন্মুখ।  
সে থাক আপন দুর্গে অন্ধকার স্বেচ্ছা নির্বাসিত  
তোমার আশ্বাসে যেন হরিণের মতন চকিত।’<sup>২১</sup> (শেষ প্রণয়)

অপর্ণার সঙ্গে এই বিচ্ছেদ সুনীলের মনে বেশ গভীর রেখাপাত করেছিল। এই কাব্যের অন্তত তিনটি কবিতায় তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। অপর্ণাকে প্রত্যাখান করে সুনীলের ‘বুক জুড়ে শুধু রৌদ্র দহন’।

‘তোমাকে দিয়েছি চির জীবনের বর্ষা ঋতু  
এখন আমার বর্ষাতে আর নেই অধিকার  
তবুও হৃদয় জলদমন্দ্রে কাঁপে যেহেতু  
চোখ ঢেকে তাই মনে করি শুধু ক্ষণিক বিকার।’<sup>২২</sup> (বিচ্ছেদ)

অন্য আর একটি কবিতায় এই ব্যর্থ প্রেমের অন্ত্যহীন যন্ত্রণা অপরূপ ভাষারূপ পেয়েছে -

‘তুমি কথা বলো, তুমি গান করো, আমি  
শুধু পাই যন্ত্রণা  
তোমার শরীরে বর্ণবাহার  
অথচ আমি যে পাইনে একটু কণা;  
নীল যৌবন আকাশে হারাবে, তাই বুঝি এই

চুপি চুপি দিন রাত্রির মন্ত্রণা।<sup>২০</sup> (ব্যর্থ)

আর একটি কবিতায় এই বিচ্ছেদ প্রসঙ্গ এসেছে এই ভাবে -

‘ফিরে যাবো, শীত শেষে অবিশ্বাসী মরালের মতো  
অন্ধকার শুভ্র হলে, ফিরে যাবো, হে সখি নিরাল্লা,  
উরসে নন্দন গন্ধ, বিন্দু বিন্দু রক্ত ইতস্তত  
তোমার শিশির-স্বাদ মুখ আর দৃষ্টিপাত মালা-  
ফেলে আমি চলে যাবো, নির্বাসনে, হে সখি নিরাল্লা।’<sup>২৪</sup> (অনির্দিষ্ট নায়িকা)

‘একা এবং কয়েকজন’ কাব্যের ‘একা’ কবিতার মধ্য দিয়ে জীবনের একাকীত্ব এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়ার মানবগাথা রচনা করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কবিতার প্রথমার্শে রয়েছে সেই একাকীত্বের প্রসঙ্গ-

‘একা গৃহকোণে আছি, তোমরাও এসো কয়েকজন  
অন্ধকার চিতাকুণ্ডে পা ছড়িয়ে বসো হে আরামে  
কয়েকটি উজ্জ্বল স্মৃতি সময়কে করি সমর্পণ  
অনন্তের হাত থেকে কিছুক্ষণ অনিত্যের নামে।’<sup>২৫</sup> (একা)

কিন্তু আমি কবিতাটিকে নেহাতই উক্ত বিষয়ভাবনার আলোকে দেখতে রাজি নই; তা হলে কবিতাটির প্রতি অবিচার হবে বলে অন্তত আমি মনে করি! কবিতার কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার পটভূমি কিন্তু চল্লিশের দশকের দুর্ভিক্ষ। চল্লিশের দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা এবং অন্ন হাহাকারের ক্লেশ সুনীলের বালক বয়সে যে-প্রভাব পড়েছিল, তা থেকে তিনি সারাজীবন বের হতে পারেননি। এই ভয়াবহ স্মৃতি তাঁর অবচেতন মনকেও ক্রমাগত তাড়া করে বেরিয়েছে। তার একটা প্রমাণই যথেষ্ট। সুনীল তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে লিখেছেন- “এখনও আমি ডাল-ভাত এমন চেটেপুটে খাই যে খাওয়ার শেষে থালাটা ঝকঝক করে, অনেকে ঠাট্টা করে বলে, তোমার এঁটো থালা তো না ধুলেও চলে! নেমন্তন্ন বাড়িতে গিয়ে আমি যতটুকু নিই, তার এক বিন্দু খাবারও নষ্ট করি না। সেই দুর্ভিক্ষের আমলের স্মৃতি!”<sup>২৬</sup>

সেই দুর্ভিক্ষের আমলের স্মৃতি সুনীল তাঁর কবিতার শরীরেও বয়ে বেরিয়েছেন-

‘কাল রাত্রে ঘুম হয় নি, একা এক দ্বিতীয় জগতে  
বৃষ্টিহীন, নিষ্পাদপ, আদিগন্ত রুক্ষ তপ্ত বালি  
পায়ে ঠেলে ঠেলে হেঁটে নিজের বানানো সরু পথে  
ভেবেছি নিজেরই ছায়া সত্যি নয় নিষ্ঠুর হেঁয়ালি;  
জীবন বা মৃত্যুও নয়, সে এক অদ্ভুতভাবে বাঁচা  
চোখে জ্বলছে তীক্ষ্ণ রোদ, মগজে রাত্রির কারুকাজ  
বাঁচার একটাই চিন্তা তবু তার নানান আগাছা  
জড়ায় প্রাণের কেন্দ্র সঙ্গী সাথী আত্মীয় সমাজ।’<sup>২৭</sup> (একা)

এখানে দুর্ভিক্ষের সরাসরি কোনো চিত্র দেখতে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ‘বৃষ্টিহীন’, ‘তপ্তবালি’, ‘নিষ্ঠুর হেঁয়ালি’, ‘এক অদ্ভুতভাবে বাঁচা’, ‘তীক্ষ্ণ রোদ’ শব্দ বা শব্দগুচ্ছ কি চল্লিশের অন্ন-হাহাকারের আর্তের ভাষা

নয়? আসলে ‘একা’ কবিতায় যুগযন্ত্রণায় গ্রস্থ এক কবিকে আমরা পাই। যাঁর মনে হয়েছে, এই বিশ্ব থেকে তিনি ক্রমাগতই দূরে সরে যাচ্ছেন, ক্রমশই একাকীত্ব তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে বাঁধছে। কিন্তু কবি সুনীল এই একাকীত্বের নিগড় থেকে মুক্তি চান; ফিরে যেতে চান মানবের মাঝে। কবিতাটির সিদ্ধি এখানেই -

‘স্বস্তিহীন এই রাত্রি,- তোমরাও এসো কয়েকজন  
(তোমাদেরও ভিন্ন ভিন্ন দ্বিতীয় জগত ঘিরে সূর্যের মন্ডলী)  
এখানে চিন্তার কুন্ডে- ভুলে যাই অসহ নির্জন  
কিছুক্ষণ পা ছড়িয়ে এসো হে স্মৃতির কথা বলি।’<sup>২৮</sup> (একা)

এ-ও সুনীলের মানবিকতার ভিন্ন এক স্তর। কিন্তু এসবই অজান্তেই; হ্যাঁ, হয়ত বা অজান্তেই সুনীলের কলম থেকে এই সমস্ত শব্দ বেরিয়ে এসেছে, যা দুর্ভিক্ষের অন্ন-হাহাকারের দ্যোতক।

সুনীল ও তাঁর সহযোগি ‘কৃষ্ণিবাস’-গোষ্ঠীর কবিরা যা কিছু প্রচলিত, যা কিছু সুন্দর তাকে ধ্বংস করতে চেয়েছে তাঁদের অদম্য আগ্রাসি মননধর্মীতায়। আবার যা কিছু কুৎসিত, অসুন্দর তাকেই সাদরে বরণ করে এঁরা হয়ে উঠেছিলেন সবার কাছে বোধগম্যের বাইরে। তাই সহজেই সুনীলের মননচেতনায় ‘রোদ্দুর’-এর চেয়ে ‘ক্লান্ত অন্ধকার’ মহৎ মনে হয়! এই যে একধরনের বিপরীত narrative, তা সুনীলের কবিতাভাষ্যকে বিশেষ দৃষ্টি-আকর্ষণীয় করে তুলতে বাধ্য করে। পাঠকের দিক থেকে আকৃষ্ট হওয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো পথ থাকে না। এখানেই সুনীল অনন্য। এ-প্রসঙ্গে তাঁর ‘দুপুর’ নামক কবিতাটি দৃষ্টান্তযোগ্য। এই কবিতায় কবি সুনীল ‘আলো’ নয়, ‘অন্ধকার’-এর জয়গান গেয়েছেন অসাধারণ চিত্রকল্পের সাহায্যে।

কবিতাটির প্রথমভাগে রয়েছে কবির রোমান্টিক মনের উদ্ভাস।

‘রৌদ্রে এসে দাঁড়িয়েছে রৌদ্রের প্রতিমা  
এ যেন আলোরই শস্য, দুপুরের অস্থির কুহক  
অলিন্দে দাঁড়ানো মূর্তি ঢেকে দিল দু চক্ষুর সীমা  
পথ চলতে থমকে গেলো অপ্রতিভ অসংখ্য যুবক।  
  
ভিজে চুল খুলেছে সে সুকুমার, উদাস আঙুলে  
স্তনের বৃন্তের কাছে উদ্বেলিত গ্রীষ্মের বাতাস  
কি যেন দেখলো চেয়ে আকাশের দিকে চোখ চেয়ে  
কয়েকটি যুবক মিলে একসঙ্গে নিল দীর্ঘশ্বাস।’<sup>২৯</sup> (দুপুর)

এরপর একজন বেকার যুবকের ক্লান্ত দেহের অনুভাষণ আমাদের সচকিত করে। কবিতাটির এই অংশের চিত্রকল্প সত্যিই চোখে আঁটকে থাকে। আমরা স্থির দৃষ্টিতে দেখি-

‘একজন যুবক শুধু দূর থেকে হেঁটে এসে ক্লান্ত রুম্ব দেহে  
সিগারেট ঠোঁটে চেপে শব্দ করে বারুদ পোড়ালো  
সম্বল সামান্য মুদ্রা করতলে গুনে গুনে দেখলো সন্নেহে  
এ মাসেই চাকরি হবে, হেসে উঠলো, চোখ পড়লো  
অলিন্দের আলো।

এর চেয়ে রাত্রি ভালো, নির্লিপ্তের মত চেয়ে বললো মনে মনে

কিছুদূর হেঁটে গিয়ে শেষবার ফিরে দেখলো তাকে  
রোদ্দুর লেগেছে তার ঢেকে রাখা যৌবনের প্রতি কোণে কোণে  
এ যেন নদীর মত, নতুন দৃশ্যের শোভা প্রতি বাঁকে বাঁকে।”<sup>১০</sup> (দুপুর)

এরপর উচ্চারিত হয় কবির নিজস্ব আরাধ্য সেই সত্যভাষণ-

‘এর চেয়ে রাত্রি ভালো, যুবকটি মনে মনে বললো বারবার  
রোদ্দুর মহৎ করে মন, আমি চাই শুধু ক্লান্ত অন্ধকার।।’<sup>১১</sup> (দুপুর)

এই সত্যভাষণই সুনীলের কবিতার স্মারক। ‘সিগারেট ঠোঁটে চেপে শব্দ করে বারুদ পোড়ালো’-  
আমাদের চোখের সামনে ব্যক্তি সুনীল কেমন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

অন্ধকারকে আপন করার প্রয়াস রয়েছে ‘তামসিক’ কবিতাতেও। চলমান জীবনের সব কিছুই তো আর সার্থক-আনন্দে উদ্বেলিত হয় না; অনেক সময় ব্যর্থতাও জীবনের মূল স্রোতে মিশে যায়। এই ব্যর্থতার চিহ্নকে ধারণ করার বিপরীতমুখী অভিপ্রায় সকলের থাকে না, থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু পঞ্চাশের সুনীল তাঁর গোষ্ঠী-বৈশিষ্ট্যের স্বাভাবিক প্রবণতাবশত এই ব্যর্থতার চিহ্নকে সর্গর্বে বৃকে ধারণ করেছেন, দু’হাতে চেপে ধরেছেন অন্ধকারকে-

‘পায়ের নিচে শুকনো বালি একটু খুঁড়লে জল  
গভীরে যাও, গভীরে যাও বৃকের হলাহল  
আলো চায় না, হাওয়া চায় না, স্তব্ধতার সুখ  
দেখ জ্বলছে আকাশ ভ’রে, তবু ফেরাও মুখ  
গভীরে যাও গভীরে যাও দু’হাতে ধরো আঁধার  
পায়ের নিচে বালি খুঁড়লে অতল পারাবার।’<sup>১২</sup> (তামসিক)

‘মৌমাছির চাক ভাঙা’র দুঃসাহসিকতায় হৃদয় জুড়ে বিষ ধারণ করতে হয়েছে। ব্যক্তি সুনীলকে এই অংশে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। বেহিসেবি জীবনযাপনের কলহাস্যে কবিতার শব্দতরঙ্গ আমরা গুনতে পাই-

‘তীব্র নীল বাঁচার স্বাদ, -অন্ধকার জলে  
আমি হয়ত ডুবে যেতাম আলোর কৌতুহলে।  
একি অবাধ হাওয়া বইছে বাসনা চঞ্চল  
আলো চাই নি, হাওয়া চাই নি, বৃকের হলাহল  
নিচে টানছে অন্ধকার, চোখ ঢাকছে আঁধার  
হয়তো শুকনো বালি খুঁড়লে অতল পারাবার।।’<sup>১৩</sup> (তামসিক)

এই অন্ধকার সুনীলের প্রেমভাবনার মধ্যেও এসে সদর্পে বিকশিত হয়েছে। যৌবনের দীপ্ত অহংকারে অন্ধকারের রঙ হয়ে উঠেছে নীল। ‘নীল’ আর ‘অন্ধকার’ আবার অনেক আধুনিক কবিদের মননে মৃত্যুর দ্যোতক হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু ব্যতিক্রমিচেতা সুনীল মনে হয় না এমন কোনো কিছুই দ্যোতনা দিতে চেয়েছেন। আসলে আগেই যে বলেছি, যা কিছু কুৎসিত, অসুন্দর বা অমঙ্গল তাকেই সাদরে বরণ করে সুনীলের কবিমানসিকতা বিপরীত ভাবনায় ভাস্বর। ‘সমুদ্র এবং মধ্যবয়স’ কবিতায় রয়েছে এরই অভিভাষণ-

‘সমুদ্রে সে ডুবেছিল, সমস্ত যৌবন-কাল, রত্নের সন্ধানে-  
রত্ন নয়, পেয়েছে সে বুক ভরে নীল অন্ধকার  
বরং সমুদ্র-স্বাদ কয়েকটি শিশির-বিন্দু ছিল তার প্রাণে  
দু’চোখে নীলের নেশা, যৌবনের দৃষ্ট অহংকার।

যদিও সময় ছিল বাউলের মত তৃপ্তিহীন  
পার্থিব আলোয় খুঁজে জীবনের বিস্ময়ের ভাষা  
সামান্য স্বপ্নের মত, চেয়েছিল, শোধ করে মুহূর্তের ঋণ  
বিষের মতন তীব্র যুবতীর স্থির ভালোবাসা।’<sup>৪৪</sup> (সমুদ্র এবং মধ্যবয়স)

যুবতীর ভালোবাসার তীব্রতায় বিষের উপমা নিঃসন্দেহে গভীরতার স্পর্শ এনে দেয়।

স্বপ্ন-ভাষণে কবিতাকে কীভাবে হৃদয়গ্রাহী করতে হয়, তা রবীন্দ্র-উত্তর পর্বের কবিদের সহজাত বৈশিষ্ট্য। অতিকথন এড়িয়ে এঁরা কবিতার অন্য এক সেতু নির্মাণে সিদ্ধহস্ত। ভাব বা রস কোনো দিক দিয়েই এ-সমস্ত কবিতাগুলি অসফল বলা না। প্রেমের কবিতাতেও একই কথা প্রযোজ্য। সুনীলের ‘সগুপদী এবং আরো এক লাইন’ কবিতাতেও আমরা স্বপ্নকথনে প্রেমের সগুপদী রচনার সংযত প্রকাশ দেখি-

‘এত ছোট হাতে কি করে ধরেছ বিশ্ব  
কি করে নিজেকে সাজালে আকাশ নীলে?  
অথচ আমি যে কত দীন কত নিঃস্ব  
শুধু লুকোচুরি খেলেছি কথার মিলে।

তোমার স্বপ্ন, সুখের অমরাবতী  
আমার হৃদয়ে অতল অন্ধ পাতাল,  
তবুও দুজনে মিলে হলো সম্প্রতি-

ফর্সা দেয়ালে শিকারী- কীটের জাল।।’<sup>৪৫</sup> (সগুপদী এবং আরো এক লাইন)

সুনীলের এই প্রেম, সুখের অমরাবতী সাজানোর ঐকান্তিক ব্যাকুলতা তাঁর আজন্ম কবিতাকে নিয়ে। কবিতার টানেই সুনীলের প্রেমের এই সগুপদী রচনা।

‘একা এবং কয়েকজন’ কাব্যের বেশ কিছু কবিতায় বিচ্ছিন্নভাবে ব্যর্থতার চিহ্ন বয়ে বেরিয়েছেন সুনীল। তবে তাঁর এই ব্যর্থতার চিহ্ন বহন তাঁর ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থ দিক ভাবলে ভুল হবে। আসলে এই ব্যর্থতার চিহ্ন উৎকীর্ণ হয়ে আছে সমকালীন প্রেক্ষিতে। বিশেষত উত্তাল চল্লিশের পটভূমিই যেন এই ব্যর্থতার চিহ্নের প্রতিনিধি! ব্যক্তিবিশেষকে ছাড়িয়ে নির্বিশেষের অভিমুখে সুনীল তাঁর কবিতার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন অনায়াসেই। রণজিৎ গুহ জানাচ্ছেন - “মানবিকতার নৈর্ব্যক্তিক, নির্বিশেষ আদর্শগুলি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে আখ্যান-কাহিনীর সামগ্রী হয়ে ওঠে সুনীলের কবিতায়, আর ব্যক্তিগত বা আঞ্চলিক বিশেষও সে-আখ্যানে সংসারযাত্রার ক্ষুদ্র ও খন্ড দৈনন্দিনের পরিধি ডিঙিয়ে উৎক্রান্ত হয় মনুষ্যত্বের বৃহত্তর নিখিল মূল্যবোধে। নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তিগত, নির্বিশেষ ও বিশেষ আদর্শ ও অভিজ্ঞতার পারস্পরিকতায় যে টানা পোড়েনের সৃষ্টি হয় ভাবে ও ভাবনায়, তাকে রসগ্রাহী করে তোলার কাজই এখানে কবিত্বের চেষ্টা।”<sup>৪৬</sup>

আগেই বলেছি, এই ব্যর্থতার চিহ্নকে ধারণ করার বিপরীতমুখী অভিপ্রায় সকলের থাকে না, থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু পঞ্চাশের সুনীল তাঁর গোষ্ঠী-বৈশিষ্ট্যের স্বাভাবিক প্রবণতাবশত এই ব্যর্থতার চিহ্নকে সগর্বে বুকে ধারণ করতে পেরেছেন। সুনীল নিজেও স্বীকার করেছেন- “আমার এই সব কবিতার মধ্যে বহুরকম ব্যর্থতার চিহ্ন ছড়ানো।”<sup>৩৭</sup> এ-প্রসঙ্গে ‘তামসিক’ কবিতার আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। এই কাব্যের ‘অবিশ্বাস’ কবিতার সুনীপুন বুনন প্রতিভায় উঠে এসেছে ব্যর্থতার চিহ্নের স্বাক্ষর।

‘যদিও জীবনে অনেক মাধুরী করেছি হরণ  
কৃপণ আঙুলে খুঁজেছি বাঁচার অনেক অর্থ  
বারে বারে তবু অবুঝের মত বলে ওঠে মন  
ব্যর্থ, ব্যর্থ।’<sup>৩৮</sup> (অবিশ্বাস)

উত্তাল চল্লিশের কঠিন সময়কে একদল যুবক অবহেলায়, অহংকারে তুচ্ছ করেছে, করেছে চূর্ণ। নতুন জীবনবেদ রচনার অদম্য বাসনা নিয়ে এঁরা ছুটে চলেছে ‘এক আমি’ থেকে ‘অপর আমি’র সন্ধানে। ভয়কে দুহাতে আঁকড়ে কখন যে পরাভূত করেছে, তা প্রত্যক্ষ দর্শনে এক অপার উপলব্ধি ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। সুনীলের এই আশ্চর্য জীবনদর্শন প্রত্যক্ষে নির্বাক বিস্ময় ছাড়া আর আমাদের তেমন কিছু অভিব্যক্তি থাকে না। রণজিৎ গুহ জানাচ্ছেন - “তাঁর জীবনদর্শনে অস্বচ্ছ বলে যেন কিছু নেই। যে-পৃথিবীকে তিনি খোলা চোখে দেখে বর্ণনা করে যাচ্ছেন শত শত কবিতায়, সেটা তাঁর ভালোবাসার দেশ। একটিও জানলা-কবাট সেখানে অর্গলিত নয়, এবং কবি যেন অতিথি-বৎসল গৃহকর্তার মতো উৎসুক আগ্রহে পাঠককে দেখাচ্ছেন কী আশ্চর্য সে দেশ! কারণ সেখানে প্রতিনিয়তই কিছু না কিছু ঘটছে, আর প্রতিটি ঘটনাই কবির কাছে অফুরন্ত বিস্ময়ের বিষয়।”<sup>৩৯</sup> ব্যর্থতাও মনে হয় যেন স্বাভাবিক একটা ব্যাপার।

‘কঠিন সময় তুচ্ছ করেছি হারিয়ে ছড়িয়ে  
অহংকারকে অবহেলা ভরে করেছি চূর্ণ  
অন্ধ বাসনা, ভয় ফিরিয়েছি দুই হাত দিয়ে  
খুশির খেয়ালে স্মৃতির মৌন করেছি পূর্ণ।’<sup>৪০</sup> (অবিশ্বাস)

তবুও সময়ের দাবির এই ব্যর্থতার চিহ্ন বহন করতে হয়েছে কবি সুনীলকে -

‘কত শতবার স্মরণ করেছে এই যৌবন  
ভেদাভেদা নেই জলের রেখায় নারীর চিহ্নে  
তবু কেন আজ অবুঝের মত বলে ওঠে মন  
মিথ্যে, মিথ্যে?’<sup>৪১</sup> (অবিশ্বাস)

সুনীলের স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা কপটতা ও চপলতার বিপরীত আদর্শে গঠিত বলা চলে। সুনীল এটা মনে প্রাণে মানেন, যে-লেখক নিজের জীবনের উপলব্ধিগুলি গভীর ও অকপটভাবে ব্যক্ত করতে না পারেন, তাঁর রচনা কৃত্রিম ও চপল হতে বাধ্য। আমার মনে হয় পঞ্চাশের কবিদের কবিতায় এই কৃত্রিমতা খুব একটা পাওয়া যাবে না। কারণ এই সময়ের কবিরা সব দিক দিয়েই নিজের কণ্ঠ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তুলে ধরতে আগ্রহী। প্রতিটি মুহূর্তে জীবনের উপলব্ধিকে অকপটভাবে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করতে বদ্ধপরিকর এই সময়ের কবিরা। ফলে এঁদের স্বীকারোক্তিমূলক কবিতায় একধরনের স্বতঃস্ফূর্তি ভাব দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রতিটি কবিতায় তিনি নিজের পাপ-পুণ্য, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের কথায় নিজের জীবনকে ভেঙে ভেঙে যেন বলে যাচ্ছেন। সুনীল নিজেও চতুরের কথা কেমন অবলীলায় বলে চলেন -

‘কিছু উপমার ফুল নিতে হবে নিরুপমা দেবী  
যদিও নামের মধ্যে রেখেছেন আসল উপমা  
ক্ষণিক প্রশয়-তুষ্টি চায় আজ সামান্য এ কবি  
রবীন্দ্রনাথেরও আপনি চপলতা করেছেন ক্ষমা।’<sup>৪২</sup> (চতুরের ভূমিকা)

### তথ্যসূত্র:

- ১। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘অর্ধেক জীবন’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১২, পৃ. ৯১।
- ২। গুহ, রণজিৎ, ‘তিন আমির কথা’, তালপাতা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৩৫-৩৬।
- ৩। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ’, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, ভূমিকা অংশ।
- ৪। তদেব, পৃ. ৩।
- ৫। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘অর্ধেক জীবন’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১২, পৃ. ১৮।
- ৬। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ’, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, পৃ. ৩।
- ৭। তদেব, পৃ. ৪।
- ৮। তদেব পৃ. ৪।
- ৯। তদেব পৃ. ৪।
- ১০। তদেব পৃ. ৫।
- ১১। তদেব পৃ. ৫-৬।
- ১২। মিত্র, মঞ্জুভাষ, ‘সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য’, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩, পৃ. ১৬।
- ১৩। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘অর্ধেক জীবন’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১২, পৃ. ১৮।
- ১৪। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ’, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, ভূমিকা অংশ।
- ১৫। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘অর্ধেক জীবন’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১২, পৃ. ১১০।
- ১৬। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ’, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, পৃ. ৬।
- ১৭। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘অর্ধেক জীবন’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১২, পৃ. ১২০।
- ১৮। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ’, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, পৃ. ৬।

- ১৯। তদেব, পৃ. ১৪।  
২০। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘অর্ধেক জীবন’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১২, পৃ. ১৯০।  
২১। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ’, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, পৃ. ২৮।  
২২। তদেব, পৃ. ১৫।  
২৩। তদেব, পৃ. ২৩।  
২৪। তদেব, পৃ. ৪৬।  
২৫। তদেব, পৃ. ১৯।  
২৬। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘অর্ধেক জীবন’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১২, পৃ. ৪৯।  
২৭। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ’, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, পৃ. ১৯।  
২৮। তদেব, পৃ. ১৯।  
২৯। তদেব, পৃ. ৭।  
৩০। তদেব, পৃ. ৭।  
৩১। তদেব, পৃ. ৭।  
৩২। তদেব, পৃ. ৮।  
৩৩। তদেব, পৃ. ৮।  
৩৪। তদেব, পৃ. ৩১।  
৩৫। তদেব, পৃ. ১১।  
৩৬। গুহ, রণজিৎ, ‘তিন আমির কথা’, তালপাতা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২৩।  
৩৭। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ’, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, ভূমিকা অংশ।  
৩৮। তদেব, পৃ. ১৫।  
৩৯। গুহ, রণজিৎ, ‘তিন আমির কথা’, তালপাতা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২১।  
৪০। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ‘সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ’, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪, পৃ. ১৫।  
৪১। তদেব, পৃ. ১৬।  
৪২। তদেব, পৃ. ১০।





# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 523-531

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.039



## সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় প্রেষণার ভূমিকা: স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার আলোকে একটি পর্যালোচনা

অনন্যা সরকার, গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 10.01.2025; Accepted: 24.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*The role of employees is extremely important in the smooth running of any organisational management. The organisation has to make arrangement to meet their expectations and demands to increase the initiative of these workers. Reasons for employee needs and in order to find the ways to increase the motivation of employees Maslow's 'Need Hierarchy Theory', Herzberg's 'Two Factor Theory', Victor H. Vroom's 'Expectancy Theory', Douglas McGregor's Theory X and Theory Y, all these theories arise.*

*However, due to the different social, economic, political and cultural environment of the East and the West the needs and expectations of the people living in both places are different. As a result, it is not possible to find out the reason for the motivation of the people living in the Eastern Countries with the help of Western Centric Theory.*

*Swami Vivekananda did not give any theory or model like western thinkers in managing the organisation. Based on the social problems of India, he focused on the demands, needs of the people of homeland.*

*Both public and private organisations are formed in order to fulfill the needs and supply of the people. As the workers working in the organisation are part of the society, various issues arising from the socio-economic environment and situation influence their thoughts and based on this their expectations, needs and demands are developed. The existing socio-economic problems that existed during Swami Vivekananda's time are still present but the style has changed a bit. Even today, the discrimination mentality among people is present on the basis of cast, religion, gender and wealth. Employees can give importance to contemporary education, character building, dignity of women, elimination of social discrimination, increase self-confidence and self reliance in any organisation. As expectations, demands will be met their motivation to work will also increase. Which will have a positive impact on the organisation.*

**Keywords:** Swami Vivekananda, Organization, Motivation, Employees, Demand.

সাংগঠনিক ব্যবস্থাকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিদের প্রেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পাদন করে। এই প্রেষণা জাগরণের ক্ষেত্রে সংগঠন হতে এমন কিছু সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় যা মানুষের স্বাভাবিক চাহিদার অন্তর্গত। এগুলি পূরণ হলেই মানুষের উৎপাদনশীল মানসিকতা বৃদ্ধি পায়, যার ফলে সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নিজ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথ সহজতর হয়। মানুষের প্রেষণা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণালাভের প্রয়োজনে প্রেষণা তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে যেমন- আব্রাহাম মাসলোর 'চাহিদা-সোপান তত্ত্ব' (Need Hierarchy Theory), ফ্রেডরিখ হারজবার্গের 'দ্বি-উপাদান তত্ত্ব' (Two Factor Theory), ডগলাস ম্যাকগ্রেগরের 'এক্স তত্ত্ব ও ওয়াই তত্ত্ব' (Theory X & Theory Y), ডিক্টর এইচ. ড্রুমের 'প্রত্যাশা তত্ত্ব' (Expectancy Theory) প্রভৃতির কথা বলা যায়, যেগুলির মাধ্যমে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের আচরণ সম্পর্কে ধারণা ও সেই ভিত্তিতে তাদের প্রেষণা জাগরণের জন্য সংগঠন বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে ভারতীয় দার্শনিক স্বামী বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষভাবে সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদদের মতো তথাকথিত কোন প্রেষণা তত্ত্ব বা সূত্র উপস্থাপিত করেননি। তবে তাঁর বিভিন্ন রচনা, বক্তৃতা, কথোপকথন ও কর্মকাণ্ডের মধ্য থেকে আমরা তাঁর চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হই। পরিব্রাজক অবস্থায় ভারত তথা পাশ্চাত্য ভ্রমণের মাধ্যমে জনজীবনের সংস্পর্শে এসে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, প্রত্যাশা-প্রাপ্তি সম্পর্কে অবগত হন। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাই সংগঠনের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল এবং মানবিক আচরণকে সদর্শক দিকে পরিচালিত করে তিনি ধর্মপ্রচার ও সমাজসেবামূলক কার্যকলাপ পরিচালনা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। মানুষের বিভিন্ন প্রত্যাশা, মানুষের জীবনে আগত বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের নিরিখে প্রেষণা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনা ও সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় তার প্রয়োগ সম্পর্কে আমরা একটি ধারণা পাই।

স্বামী বিবেকানন্দ একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সমাজ তথা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত মানবসম্পদের বিকাশ। মানুষ যখন ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত, ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করে নিজ ভাবনাকে সদর্শক দিকে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে; ক্রোধ, ঈর্ষা, ঘৃণা, জড়তা, স্বার্থপরতার উপর নিয়ন্ত্রণ রেখে সমগ্রের কল্যাণের জন্য নিজেেকে নিয়োজিত করতে সমর্থ হবে সেদিন সমাজ তথা দেশের সামগ্রিক উন্নতিসাধন সম্ভব হবে। একই কথা সংগঠনের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। কোন কোন বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করলে সংগঠনের সর্বস্তরের সমস্ত কর্মী নিজেদের প্রেষণা জাগরিত করতে সক্ষম হবে এবং স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে নিজেদের কার্যসম্পাদনে অগ্রণী হবে এবং সংগঠনের লক্ষ্য পূরণে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারবে সেই সম্পর্কিত দিকগুলি এখানে আলোচনা করা হলো---

**১) প্রকৃত শিক্ষার ভূমিকা:** মানুষের জীবনে পার্থিব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা ও চেতনা জাগরণের জন্য শিক্ষার মূল্য অপরিমিত। মানুষের অল্প-বস্ত্র-বাসস্থানে চাহিদা সুনিশ্চিতকরণের জন্যই অর্থনৈতিক কার্যকলাপ প্রয়োজন। অর্থোপার্জনের জন্য স্বাবলম্বী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষাই মানুষকে স্বাবলম্বী হওয়ার উপায় অনুসন্ধানের সহায়তা করে। স্বামী বিবেকানন্দ এ প্রসঙ্গে বলেন-- 'যে বিদ্যার উন্মেষে ইতরসাধারণকে জীবনসংগ্রামের সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থতৎপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে

শিক্ষা...বর্তমান শিক্ষায় তোদের বাহ্যিক হাল-চাল বদলে দিচ্ছে অথচ নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তির অভাবে তোদের অর্থাগমের উপায় হচ্ছে না।<sup>১</sup>

প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে যা মানুষের শ্রেণণা জাগরণেও সহায়ক হয়। তিনি বলেন ‘Education is the manifestation of the perfection already in man’।<sup>২</sup> প্রকৃত শিক্ষা হলো সেই যা মানবপ্রকৃতির আবরণ উন্মোচন করে তার পূর্ণতা বিকাশের সহায়তা করে। স্বামীজি মনে করেন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে উপার্জনের জন্য প্রচলিত পছার বাইরেও নিজেদের চিন্তাভাবনাকে নিয়ে যেতে হবে। দেশীয় শিক্ষার সাথে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, কারিগরি-প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। দেশীয় ভাষা, ইতিহাস, ভূগোলের সাথে পাশ্চাত্যের ভাষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, কারিগরি-প্রযুক্তি সম্পর্কেও সমানভাবে ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন, যাতে মানুষ যুগোপযোগীভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে। তিনি বলেন--- ‘আমাদের চাই কি জানিস--- স্বাধীনভাবে স্বদেশীবিদ্যার সাথে ইংরেজি আর সায়েন্স পড়ানো, চাই টেকনিক্যাল এডুকেশন, চাই যাতে ইন্ডাস্ট্রি বাড়ে, লোকে... দু পয়সা করে খেতে পায়’।<sup>৩</sup>

শিক্ষা মানুষের অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তোলে। তিনি ইউরোপ ভ্রমণের সময় সেখানকার দরিদ্র মানুষদের সাথে ভারতের দরিদ্র মানুষদের পার্থক্য লক্ষ্য করলেন এবং অনুভব করলেন যে শিক্ষার অভাবে ভারতে দরিদ্রদের দুরবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন--- ‘ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দারিদ্র্যেরও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে পরিয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা--- জবাব পাইলাম। শিক্ষাবলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন; আর আমাদের ---ক্রমেই তিনি সংকুচিত হইতেছেন’।<sup>৪</sup>

তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষাকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষদের মধ্যে প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন--‘জ্ঞান কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তির একচেটিয়া সম্পত্তি থাকিবে না, উচ্চশ্রেণী হইতে ক্রমে নিম্নশ্রেণীতে বিস্তৃত হইবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে চেষ্টা চলিতেছে, পরে বাধ্য করিয়া সকলকে শিক্ষিত করিবার বন্দোবস্ত হইবে। ভারতীয় সর্বসাধারণের মধ্যে নিহিত অগাধ কার্যকরী শক্তিকে ব্যবহারে আনিতে হইবে। ভারতের অভ্যন্তরে মহতী শক্তি নিহিত আছে, উহাকে জাগাইতে হইবে’।<sup>৫</sup>

কৃষি শিল্প সহ যে কোন সংগঠনের অগ্রগতি তখনই সম্ভব যখন সেখানের কর্মচারীগণ অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তিগত বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। বিবেকানন্দ সেই কারণে কারিগরি ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে অজ্ঞতা দূর করার কথা বলেন। ব্যক্তি যখন দেশীয় শিক্ষার সাথে বিদেশী ভাষা ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে তখন তার কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় ও কর্মস্থলে নিজের দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। আবার সংগঠনেও যুগোপযোগী বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় যাতে কর্মচারীগণ নতুন বিষয়গুলি আয়ত্ত করে আরও ভালোভাবে নিজ কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হন।

**২. চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্বদান ও মানবসম্পদ গঠন:** মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র দূরীকরণ, কর্মসংস্থান, আয়-বৈষম্য হ্রাস এগুলির প্রয়োজনীয়তা সমাজ তথা সংগঠনে থাকলেও এগুলি উন্নতির একমাত্র মাপকাঠি নয়। উপযুক্ত মানবসম্পদের মাধ্যমেই যে কোন দেশের সামগ্রিক বিকাশসাধন হয়। এ প্রসঙ্গে স্বামী

বিবেকানন্দ বলেন ---‘টাকা-ফাকা সব আপনা-আপনি আসবে। মানুষ চাই, টাকা চাই না। মানুষ সব করে, টাকায় কী করতে পারে? মানুষ চাই-- যত পাবে ততই ভালো’।<sup>৬</sup>

একথা অনস্বীকার্য যে বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন মানুষের ভোগের উপকরণ বৃদ্ধি পাক, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে সকলের জীবন ভরে উঠুক, জীবনের মান উন্নত হোক, কিন্তু বাইরের সম্পদ অর্জনের সাথে সাথে মানুষকে নিজে অন্তরের সম্পদ বৃদ্ধি করতে হবে। সত্যানুরাগ, প্রেম, প্রীতি, ক্ষমা, নিঃস্বার্থপরতা, উদারতা এগুলি হল অন্তরের সম্পদ। এই অন্তরের সম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে তিনি বলেন ---‘আমি ধর্মকে শিক্ষার ভিতরকার সার জিনিস বলিয়া মনে করি। এটি কিন্তু মনে রাখিবেন যে, আমি আমার নিজের বা অপর কাহারও কর্ম সম্বন্ধে মতামতকে ধর্ম বলিতেছি না। যে ভাবধারা পশুকে মানুষের ও মানুষকে দেবতার পরিণত করে তাহাই ধর্ম’।<sup>৭</sup> ধর্ম মানুষকে সৎ, সুন্দর, উদার, প্রেমপরায়ণ, নিঃস্বার্থ, সাহস ও চরিত্রবান হতে সহায়তা করে। স্বামী বিবেকানন্দ মনে করেন দেশের সামগ্রিক বিকাশসাধনের জন্য প্রয়োজন মানুষ তৈরি করা। ব্যক্তি চরিত্রগঠনের মাধ্যমে নিজ মর্যাদা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। তিনি যুবসমাজকে প্রেরিত করার উদ্দেশ্যে বলেন-- ‘বীরের মতো এগিয়ে চলো। একদিন বা এক বছরের সফলতা আশা কোরো না। সবসময় শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ধরে থাকো, দৃঢ় হও, ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা বিসর্জন দাও.... সত্য, স্বদেশ ও সমগ্র মানবজাতির কাছে চিরবিশ্বস্ত হও, তাহলেই তুমি জগত কাঁপিয়ে তুলবে। মনে রাখবে-- ব্যক্তিগত ‘চরিত্র’ ও ‘জীবন’ই শক্তির উৎস, অন্য কিছু নয়’।<sup>৮</sup> তবে তাঁর কাছে নিঃস্বার্থভাবে সমাজের তথা দেশের মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার ভাবনা প্রাধান্যলাভ করেছে। কোন মান-সম্মান, পুরস্কার বা নামযশের চাহিদার উর্ধ্বে উঠে সেবা মনোভাব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ রেখে সেবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার ভাবনাই তাঁর চিন্তাধারায় স্থানলাভ করেছে। তিনি বলেন---‘বড় বড় কাজ কেবল খুব স্বার্থত্যাগ দ্বারাই হতে পারে। স্বার্থের প্রয়োজন নাই, নামেরও নয়, যশেরও নয়--- তা তোমারও নয়, আমারও নয় বা আমার গুরুর পর্যন্ত নয়। ভাব ও সংকল্প যাতে কাজে পরিণত হয়, তার চেষ্টা করো, হে বীরহৃদয় মহান বালকগণ! উঠে পড়ে লাগো! নামযশ বা অন্য কিছু তুচ্ছ জিনিসের জন্য পিছনে চেয়ো না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জন দাও ও কাজ করো’।<sup>৯</sup> মানুষ নিজস্ব চরিত্রকে গঠন করতে পারলে ও নৈতিকতাকে গুরুত্ব দিতে শিখলে সমাজ তথা সংগঠন থেকে অসাধুতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দুর্নীতি প্রভৃতি দূর করা সম্ভব হবে এবং সংগঠনের সকল বিষয় স্বচ্ছতা বজায় থাকবে। এভাবে ব্যক্তি নিজস্ব আচরণের সদর্থক প্রয়োগ ঘটিয়ে সংগঠনকে উপকৃত করতে সক্ষম হবে। সংগঠনের কর্মীগণ যদি ব্যক্তিগত রেষারেষি ও সংকীর্ণ মানসিকতাকে দূরে সরিয়ে পুরস্কার, নাম যশের চাহিদার উর্ধ্বে উঠে নিঃস্বার্থ মানসিকতা ও সেবাভাব নিয়ে কর্ম সম্পাদন করার প্রেরণা পান তবে সেটি নিঃসন্দেহে এই প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থার কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে।

**৩. নারীশক্তির মর্যাদা:** স্বামী বিবেকানন্দের মতে, সীমিত সামাজিক ও আইনগত সংস্কার আন্দোলনের থেকে ভারতে নারীজাগরণের প্রয়োজনীয়তা অধিক। স্ত্রী জাতির অভ্যুদয় না হলে ভারতের কল্যাণের সম্ভাবনা নাই সেটি তিনি উপলব্ধি করেন। তিনি এ বিষয়ে মন্তব্য করেন--- ‘ভারতের দুই মহাপাপ--- মেয়েদের পায়ে দলানো, আর জাতি জাতি করে গরীবগুলোকে পিষে ফেলা’।<sup>১০</sup>

নারী ও পুরুষ --উভয়েই সমাজ তথা দেশের অংশ। দেশের সামগ্রিক উন্নতি তখনই সম্ভব যখন পুরুষের সাথে নারীরাও কর্মক্ষেত্রে নিজেদের বিকশিত করতে সক্ষম হবে। তিনি আমেরিকা ভ্রমণ করে লক্ষ্য

করেন, সেখানে মহিলারা পুরুষদের মতই শিক্ষলাভের সুযোগ পায়, স্বাবলম্বী হয়ে উপার্জন করে। সর্বত্র তাদের অবাধ বিচরণ। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন ---‘বাজার-হাট, রোজগার, দোকান, কলেজ, প্রফেসর--- সব কাজ করে... যাদের পয়সা আছে তারা দিনরাত গরিবদের উপকারে ব্যস্ত।’<sup>১১</sup> ভারতেও পুরুষদের মতই নারীদের শিক্ষা দিতে হবে। তাদেরও কর্মস্থলে পুরুষদের অনুরূপ সুযোগ প্রদান করতে হবে। কর্মস্থলে তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। কেবলমাত্র নারী বলে কোন বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে কখনোই তার সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা উচিত নয়। ‘আমরা যেন না ভাবি যে, আমরা পুরুষ বা স্ত্রী; বরং আমরা যেন ভাবি যে, আমরা মানুষ মাত্র জীবনকে সার্থক করার জন্য এবং পরস্পরকে সাহায্য করবার জন্যই আমাদের জন্ম।’<sup>১২</sup> যে কোনো প্রতিভা নিহিত থাকে মানুষের মধ্যে ---সে নারী বা পুরুষ যেই হোক না। কেন সংগঠনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় নারীরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাদের কার্য সম্পাদিত করে চলেছে। নারীরা পরিবার সমাজ উভয়ের কাছ থেকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হলে, কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ পরিবেশ পেলে তখন তারাও কার্যক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা পায় এবং তার ফলে সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান লাভবান হয়।

**৪. সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ:** স্বামী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেন ভারতে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতির মানুষের বসবাস। সামাজিক ও ধর্মীয় ভাবধারা সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার, কুপ্রথা ও আচারসর্বস্বতার ফলস্বরূপ মানুষের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয়। সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষজন অপমানিত, লাঞ্ছিত ও শোষিত হয় এবং সমাজের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। বিবেকানন্দ মনে করেন সামাজিক পশ্চাৎপদতার শিকার দরিদ্র নিম্নজাতির মানুষদের জীবনের উন্নতিসাধনের প্রয়োজনে শিক্ষাদানের পাশাপাশি তাদের হৃতমর্যাদা ফিরিয়ে দিতে হবে। তিনি বলেন ---‘সমস্ত ক্রটির মূলই এইখানে যে, সত্যিকারের জাতি, যাহারা কুটিরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে.... তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদের শিক্ষিত করিতে হইবে... আসুন, আমরা তাহাদের মাথার ভাব প্রবেশ করাইয়া দিই--- কার্যটুকু তাহারা নিজেরাই করিবে।’<sup>১৩</sup> এই দরিদ্র অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের শিক্ষার পাশাপাশি সমাজের মূলস্রোতে আসার সুবিধার্থে বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা প্রয়োজন। যার ফলে তারাও নিজেদের বিকশিত করার প্রেষণা লাভ করে এবং আরো ভালোভাবে নিজেদের কার্য সম্পাদন করতে পারে। তিনি বলেন---‘প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহারও অবশ্যক, যাতে গরিব লোকের জন্য নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি হয়।... প্রত্যেক লোক যাতে আরও ভালো করে খেতে পায় এবং উন্নতি করবার আরও সুবিধা পায় তা করতে হবে।’<sup>১৪</sup> বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য ও ভারতের দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষদের অবস্থার পার্থক্য উপলব্ধি করে বলেছেন---‘যদি কারুর আমাদের দেশে নীচুকুলে জন্ম হয়, তার আর আশা ভরসা নাই, সে গেল। কেন হে বাপু? কি অত্যাচার! এদেশে [পাশ্চাত্যে] সকলের আশা আছে, ভরসা আছে, সুবিধা আছে। আজ গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান হবে, জগৎ মান্য হবে। আর সকলের দরিদ্রের সহায়তা করতে ব্যস্ত।’<sup>১৫</sup>

একজন মানুষের পক্ষে একাধিক কাজ সমান দক্ষতার সাথে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। সেজন্য বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত মানুষ করে থাকেন। সেই ভিত্তিতে জাত ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। সমাজে প্রতিটি কাজের জন্য দক্ষ ব্যক্তির প্রয়োজন, সেটি জুতো সেলাই হোক বা চণ্ডীপাঠ। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেন---‘Cast is a natural order, I can perform one duty in social life, and you another; you can govern a country and I can mend a pair of old shoes, but that is no reason why you are

greater than I, for can you mend my shoes? Can I govern the country? I am clever in mending shoes, you are clever in reading the Vedas, but that is no reason why you should trample on my head'.<sup>১৬</sup>

যে কোনো সংগঠনে বিভিন্ন কাজের ধরণ ও ক্ষেত্র অনুসারে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ,ভাষা সংস্কৃতির মানুষের আগমন ঘটে। তারা একসাথে কাজ করার সুযোগ পায়।যেমন-- একটি শিল্পকারখানায় সাফাইকর্মী, দ্বাররক্ষীর উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি শ্রমিক,প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, ম্যানেজার, ডিস্ট্রিবিউটারের উপস্থিতিও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। এতে সমাজের ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ নিজেদের যোগ্যতা অনুসারে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পায়। এর ফলে পারস্পরিক নির্ভরতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এতে প্রত্যেকেই সুষ্ঠুভাবে কাজ করার প্রেরণালাভ করে।

**৫. আত্মবিশ্বাসের জাগরণ ও আত্মশক্তির উপলব্ধি :** স্বামী বিবেকানন্দ মনে করেন মানুষকে নিজে লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে নিজের উপর আস্থা স্থাপন করতে হবে এবং নিজের হীনমন্যতাকে দূর করতে হবে। আত্মবিশ্বাসের অভাবে নিজের কর্মও সঠিকভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে না। তাই আত্মবিশ্বাসের জাগরণ সম্পর্কে তিনি বলেন---‘পৃথিবীর ইতিহাস কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী মানুষেরই ইতিহাস। সেই বিশ্বাসই ভিতরের দেবত্ব জাগ্রত করে। তুমি সবকিছুই করতে পারো। অনন্ত শক্তিকে বিকশিত করতে যথোচিত যত্নবান হও না বলেই বিফল হও। যখনই কোনও ব্যক্তি বা জাতি আত্মবিশ্বাস হারায়, তখনই তার বিনাশ হয়’।<sup>১৭</sup> তাঁর মতে---‘লক্ষ্যবস্তুর প্রতি অবিচল থেকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে মানুষ নিজ কাজিত লক্ষ্যকে অর্জন করতে সক্ষম হয়। তিনি বলেন---‘ওঠো, জাগো, যতদিন না লক্ষ্যস্থলে পৌঁচছ, থেমো না। জাগো, জাগো, দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। দিনের আলো দেখা যাচ্ছে। মহাতরঙ্গ উঠেছে। কিছুতেই তার বেগ রোধ করতে পারবেনা’।<sup>১৮</sup>

আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য পরিশ্রমের সাথে মনের একাগ্রতার ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বামীজি মনে করেন। তিনি বলেন---‘অর্থোপার্জনই হউক অথবা ভগবদারাধনাই হউক--- যে কাজে মনের একাগ্রতা যত অধিক হইবে কাজটি ততই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে’।<sup>১৯</sup> আত্মশক্তির যথাযথ উপলব্ধির ফলে মানুষ আত্মপূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়। এর জন্য মন থেকে নেতিবাচক ভাবনা দূর করে আত্মবিশ্বাসের জাগরণ ঘটালে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত হল---‘যদি জড়-জগতে বড় হতে চাও, তবে বিশ্বাস করো-- তুমি বড়। আমি হয়তো ছোট্ট একটা বুদ্ধ, আর তুমি হয়তো পাহাড়ের মত বিশাল ঢেউ, কিন্তু জেনো আমাদের উভয়েরই পিছনে অনন্ত সমুদ্র রয়েছে; অনন্ত ঈশ্বর আমাদের সকল শক্তি ও বীর্যের ভাণ্ডারস্বরূপ, আর আমরা উভয়েই সেখান থেকে যত ইচ্ছা শক্তি সংগ্রহ করতে পারি। অতএব নিজের উপর বিশ্বাস করো’।<sup>২০</sup> সুতরাং বলা যায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে নিজ অসীম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা করলে অবশ্যই সফল হওয়া যায়। সংগঠনে কর্মরত কর্মীগণ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং একাগ্রভাবে আত্মবিশ্বাসের সাথে কার্য সম্পাদন করে তাহলে সংগঠনও নিজ নির্ধারিত লক্ষ্যপূরণে সফল হয়। এখানে বিবেকানন্দের ভাবনার প্রাসঙ্গিকতাই প্রমাণিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশগুলি ভ্রমণের মাধ্যমে সেখানকার জনজীবনের সংস্পর্শে এসে তাদের প্রত্যাশা, চাহিদা, অভাব, অভিযোগ সম্পর্কে অবগত হন এবং তারা কিভাবে নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে বা কোন কোন বিষয়গুলি

গুরুত্ব সহকারে বিচার করলে সমাজ তথা দেশের বিকাশসাধন হবে সেই সম্পর্কে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। বিবেকানন্দের ভাবধারার সাথে আমেরিকান চিন্তাবিদ আব্রাহাম মাসলোর 'চাহিদা যোগান তত্ত্ব' (Need Hierarchy Theory)-এর অনেকাংশে মিল লক্ষ্য করা যায়। এই তত্ত্ব অনুসারে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পাঁচটি চাহিদা সোপান বিদ্যমান। এগুলো যথাক্রমে--- জৈবিক চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, সামাজিক চাহিদা, আত্মমর্যাদার চাহিদা, আত্মপূর্ণতা চাহিদা। এগুলোর মধ্যে প্রথম চাহিদাপূরণ হলে মানুষ দ্বিতীয় চাহিদাপূরণে তৎপর হয়। এভাবে ক্রমানুসারে চাহিদাপূরণ হতে থাকলে মানুষ চাহিদার অন্তিম স্তরে পৌঁছায়। স্বামী বিবেকানন্দ মনে করেন মানুষের জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন অন্ন- বস্ত্র- বাসস্থানের চাহিদাপূরণ হলে, সামাজিক নিরাপত্তা ও আত্মমর্যাদা রক্ষিত হলে মানুষ আত্মপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়।

স্বামীজি দেখেছেন, পাশ্চাত্যের মানুষের জীবনে বাহ্যিক সম্পদের অভাব প্রাচ্যের মানুষদের তুলনায় কম। কিন্তু তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার প্রয়োজনীয়তা আছে, আবার প্রাচ্যে বিশেষত ভারতের জনগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার অভাব সেভাবে লক্ষ্য করা না গেলেও পার্থিব সম্পদের অভাব রয়েছে। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে বসবাসকারী মানুষদের চাহিদার মধ্যে কিছুটা হলেও ভিন্নতা রয়েছে। তিনি বলেন -- 'আমরা চাই বা না চাই পাশ্চাত্যের সংঘবদ্ধ কার্যপ্রণালী ও বাহ্য সভ্যতার ভাব আমাদের দেশে প্রবেশ করে গোটা দেশকে খেয়ে ফেলার উপক্রম করেছে।...আমরাও জড়বাদী সভ্যতার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করতে পারবো না। সম্ভবত কিছু কিছু বাহ্য সভ্যতা আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর, পাশ্চাত্য দেশের পক্ষে আবার সম্ভবত একটু আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন।'<sup>১১</sup> তবে তিনি পাশ্চাত্যের দেশ গুলি থেকে ভাষা যুগোপযোগী জ্ঞান-বিজ্ঞান কারিগরিব প্রযুক্তিবিদ্যা কে গ্রহণ করার কথা বলেছেন তিনি পাশ্চাত্যের সঙ্গবদ্ধ ভাবে কাজ করার প্রবণতার প্রশংসা করেছেন তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন--'সম্ভবত অন্য জাতির কাছ থেকে আমাদের কিছু বহির্বিজ্ঞান শিখতে হবে, কিভাবে সংঘ গঠন করে পরিচালনা করতে হয়, বিভিন্ন শক্তিকে প্রণালীবদ্ধভাবে কাজে লাগিয়ে কিভাবে অল্প চেষ্টায় ফললাভ করতে হয়, তাও শিখতে হবে'<sup>১২</sup>

সমাজে বাস করা ব্যক্তিদের বিভিন্ন চাহিদা ও যোগান সুচারুরূপে মেটানোর লক্ষ্য নিয়েই সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন গড়ে উঠেছে। সেখানে কর্মরত কর্মীরা সমাজেরই অংশ। তাই তাদের প্রত্যাশা, দাবি, চাহিদা কিরূপ হবে সেটি সংগঠনের ব্যবস্থাপনা, আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সহ সমসাময়িক প্রচলিত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের উপর নির্ভর করে। সেক্ষেত্রে সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত কর্মীদের প্রেষণা জাগরণের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত সেই সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের দিকনির্দেশগুলি অনুধাবন করা প্রয়োজন। আর্থিক সুবিধাদানের সাথে সংগঠনের কর্মীগণের অন্যান্য দিকগুলিও বিবেচনা করা উচিত। যেকোনো সংগঠনের কাজগুলি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব। তাই সাবেকী পদ্ধতির সাথে আধুনিকতার সমন্বয় ঘটিয়ে সংগঠনের কার্যপ্রণালীকে গড়ে তুলতে হবে। এ সম্পর্কে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সংগঠনের তরফে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যাতে কর্মীগণ প্রচলিত প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়। কর্মীগণ যাতে নিজেদের চারিত্রিক মর্যাদা বজায় রেখে কর্মস্থলে কর্মসম্পাদনা করেন, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন প্রকার দুর্নীতি, অসাধুতা, চোরাকারবারীর সাথে আপোস না করেন সেজন্য সংগঠনে নিয়মাবলী প্রণয়নের সাথে শাস্তির বন্দোবস্ত করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে যাতে কোন কর্মচারীর সাথে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, অঞ্চলভেদে বৈষম্যমূলক আচরণ না করা হয়

সেদিকে সংগঠনের কর্তৃপক্ষকে সজাগ থাকতে হবে। সর্বোপরি, কর্মীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে মাঝে মাঝে বিভিন্ন এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করার সুযোগ প্রদান করা, সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ যাতে বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সংগঠনের কর্মীগণ কর্মক্ষেত্রে কি ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে, কোন কোন বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিলে সংগঠনের ব্যবস্থাপনা আরো উন্নত হবে সেই সম্পর্কে সংগঠনের কর্মীদের কাছে সময়ে সময়ে ফিডব্যাক নিতে হবে এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এর ফলস্বরূপ সংগঠনের কর্মীগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজ নিজ কার্য বিনা প্রতিবন্ধকতায় সম্পন্ন করতে পারবে ও কর্মে নিজেদের নিয়োজিত করার প্রেরণা লাভ করবে। তবেই একটি সংগঠনের পক্ষে নিজের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথ সুগম হবে।

#### তথ্যসূত্র :

1. স্বামী, বিবেকানন্দ, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (নবম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১০৭।
2. স্বামী, বিবেকানন্দ, 'শিক্ষা প্রসঙ্গ', উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ১।
3. স্বামী, বিবেকানন্দ, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (নবম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ২৬০।
4. স্বামী, বিবেকানন্দ, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (সপ্তম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২৫৪।
5. স্বামী, বিবেকানন্দ, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (নবম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৪৫০।
6. স্বামী বিবেকানন্দ, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (সপ্তম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২৯৫।
7. স্বামী, বিবেকানন্দ, 'শিক্ষা প্রসঙ্গ', উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৫৫।
8. স্বামী, বিবেকানন্দ, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (সপ্তম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৯২।
9. স্বামী, বিবেকানন্দ, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (ষষ্ঠ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৩৩৭।
10. স্বামী, বিবেকানন্দ, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (সপ্তম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৭২।
11. স্বামী, বিবেকানন্দ, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (ষষ্ঠ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৩৮৮-৩৮৯।



12. স্বামী, বিবেকানন্দ, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (দশম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২০৭-২০৮।
13. স্বামী, বিবেকানন্দ, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (ষষ্ঠ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৪৩৫-৪৩৬।
14. স্বামী, বিবেকানন্দ, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (সপ্তম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২৬-২৭।
15. স্বামী, বিবেকানন্দ, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (ষষ্ঠ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৩৮৯।
16. Swami, Vivekananda, 'The Complete Works of Swami Vivekananda' (Vol-III), Advaita Ashrama, Calcutta, 1962, P. 245.
17. স্বামী, বিবেকানন্দ, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (প্রথম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১৩২।
18. স্বামী, বিবেকানন্দ, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (ষষ্ঠ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৩৩৭।
19. স্বামী, বিবেকানন্দ, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (তৃতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১৬৭।
20. স্বামী, বিবেকানন্দ, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (পঞ্চম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২৫৮।
21. স্বামী, বিবেকানন্দ, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (ষষ্ঠ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২৭-২৮।
22. স্বামী, বিবেকানন্দ, 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (পঞ্চম খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৩১।

#### সহায়ক গ্রন্থ:

1. দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ, 'স্বামী বিবেকানন্দ', নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০০।
2. মুখোপাধ্যায়, জীবন, 'স্বামী বিবেকানন্দ ও যুবসমাজ', ওরিয়েন্টাল বুক এম্পোরিয়াম, কলকাতা, ১৯৭২।



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 532-538

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.040



## স্বামী বিবেকানন্দের সংগীত প্রজ্ঞা

মো: আফতাব উদ্দিন, গবেষক, সংগীত ভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 14.01.2025; Accepted: 24.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*Throughout human history, every civilization that has risen and fallen has built a rich foundation of music. The contribution of music's silent hum to everyday life is immeasurable. Spiritual seekers have chosen this music as a means of achieving closeness to God. The practice of achieving this closeness to God through music is ancient in the Indian subcontinent. As a continuation of this tradition, a spiritual practitioner named Narendra Nath Dutta was born in the nineteenth century, who later became Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was a devoted practitioner of music. However, he did not follow the path of earlier music practitioners. Swamiji was simultaneously a vocal sadhak, music expert, and interpreter. Through his dedication, sacrifice, rigorous practice, and extraordinary talent, he elevated his music to unparalleled heights. By acquiring spiritual knowledge of Eastern and Western music, he became a versatile musician. This research paper will discuss in detail how Swami Vivekananda became a guide in modern spiritual music, the depth of his knowledge in music philosophy and above all, the influence of world music on his life and the high position he occupied in composing spiritual music.*

**Keywords:** Spiritualism, Music Philosophy, Music Interpreter, Sangeet kalpataru, Western Philosophers, Eastern Spiritual Practitioners.

**ভূমিকা:** উনিশ শতকে ইংরেজ শোষণে পিষ্ট পরাধীন ভারতবর্ষে সমাজ সংস্কারক এবং নব জাগরণ পর্বে যে কয়েকজন প্রাচ্য দার্শনিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব দেবদূত হয়ে আবির্ভূত হন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন প্রজ্ঞাবান, উদার দৃষ্টিসম্পন্ন, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজসেবক এবং সরকারি উকিল। বিশ্বনাথ দত্তের আরও একটি বিশেষ পরিচয়; তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব। শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস এবং রাগ সঙ্গীতের প্রতি ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান। একসময় তিনি কলাবতের অধীনে সংগীত চর্চা শুরু করলেও পরবর্তীতে তা আর ধারাবাহিক ভাবে চালিয়ে যেতে পারেন নি। তবে তিনি ছিলেন আজন্ম সঙ্গীতপ্রেমী। তৎকালীন সময়ে তাঁর শিমুলিয়ার বাড়িতে প্রতি সপ্তাহে শনি এবং রবিবারে গানের আসর বসত। সে আসরে অনেক গুণী

সঙ্গীতজ্ঞের সমাগম ঘটতো শিমুলিয়ার ওই বাড়িতে। রায়পুরে থাকাকালীন সময়ে কিশোর বয়সে নরেন্দ্রনাথ দত্তের সংগীত শিক্ষা শুরু হয়েছিল পিতা বিশ্বনাথ দত্তের কাছে। এ সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ‘Swami Vivekananda Patriot-Prophet’ বইতে তাঁর ভাই নরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং পিতা বিশ্বনাথ দত্তের সংগীত শিক্ষা সম্পর্কে লিখেছেন:

“Narendra was an expert singer in classical music. He inherited that taste from his father who practised it for sometime in his youth.”<sup>১</sup>

নরেন্দ্রনাথ দত্তের মাতা ভুবনেশ্বরী ছিলেন শিমুলিয়া বসুবংশের নন্দলাল বসুর একমাত্র মেয়ে। তিনি ছিলেন অপার্থিব ধ্যান জ্ঞানে সমৃদ্ধ সুকণ্ঠী এবং স্বশিক্ষিত এক মহীয়সী। নরেন্দ্রনাথ দত্তের ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর মাতা ভুবনেশ্বরী সম্পর্কে ‘স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী’ বইতে লিখেছেন:

“মাতা শব্দেয় ভুবনেশ্বরীর কণ্ঠস্বরও খুব মিষ্ট ছিল। কৃষ্ণ-যাত্রার গান তিনি আপন মনে বেশ গাইতেন, ইহা আমরা শুনিয়াছি। এইরূপ নানা দিক হইতে শক্তি আসায় স্বামীজীর সঙ্গীতের ইচ্ছা খুব প্রবল হইয়াছিল এবং তিনি কলিকাতায় ধ্রুপদ-গায়ক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।”<sup>২</sup>

এমনই এক সমৃদ্ধ পরিবারে ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি প্রত্যুষ বেলায় নরেন্দ্রনাথ দত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। শিশু এবং কিশোর বয়সে তিনি একে একে রঙ করেন: উপনিষদ, বিজ্ঞান শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্যচর্চা, ধর্মীয় দীক্ষা এবং মায়ের কাছ থেকে লাভ করেন আধ্যাত্ম সংগীতের গভীর জ্ঞান। বাল্যকালেই নরেন্দ্রনাথ দত্ত বিশেষত সংগীত শিক্ষার ধ্যানে ও জ্ঞানে প্রবল আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ধীরে ধীরে তাঁর মাঝে উন্মেষ ঘটে সংগীতের প্রতি গভীর প্রেম। পিতা এবং মাতার পারিবারিক সংগীত আবহের বাইরে তিনি কণ্ঠ সংগীতের নিয়মিত তালিম নিয়েছিলেন বেণীমাধব অধিকারী এবং পরবর্তী সময়ে আহম্মদ খাঁ এর কাছে। শুধু কণ্ঠ সংগীতই নয়, তিনি অমৃতলাল এবং সুরেন্দ্রনাথের সাহচর্যে যন্ত্রসংগীতেও গভীর জ্ঞান লাভ করেন। এভাবেই কিশোর নরেন্দ্রনাথ দত্তের মাঝে মাত্র তিন চার বছরের নিয়মিত সংগীত সাধনায় তাঁর পারদর্শিতা ফুটে উঠে। তিনি একাধারে উচ্চাঙ্গ সংগীতের ধ্রুপদ, ধামার, ভজন, খেয়াল, ঠুমরি, টপ্পা, গজল ও ব্রহ্মসংগীতে শিক্ষা লাভ করেন। পাশাপাশি তিনি সংগীত প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন পাখেয়াজ, এস্রাজ, তবলা এবং সেতারের মত যন্ত্র সংগীতেও। বালক নরেন্দ্রনাথ দত্তের এই বহুমুখী প্রতিভার সংগীত সাধনের মাধ্যমেই পরিচয় ঘটে শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে। অতঃপর কোন এক শুভক্ষণে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে বালক নরেন্দ্রনাথ দত্ত গাইতে আরম্ভ করলেন অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর রচিত একতালে নিবন্ধ সুরট মল্লার রাগাশ্রিত ব্রহ্মসংগীত:

“মন চলো নিজ নিকেতনে,  
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে,  
ভ্রম কেন অকারণে?  
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ,  
সব তোর পর কেহ নয় আপন,  
পর-প্রেমে কেন হয়ে অচেতন,  
ভুলিছ আপন জনে?”<sup>৩</sup>

সেই সাথে শ্রীরামকৃষ্ণ আবিষ্কার করলেন বালক নরেন্দ্রনাথ দত্তের আধ্যাত্ম সংগীতের ধ্যান ও গভীরতা। এভাবেই জীবনের নানা ঘটনা পরিক্রমায় বালক নরেন্দ্রনাথ দত্ত এক সময় হয়ে উঠেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সব বিষয়ে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। তবে তিনি অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন কণ্ঠ সংগীতে। তৎকালীন বিভিন্ন স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল সুমিষ্ট, সুরেলা, প্রাণবন্ত, গম্ভীর এবং চিত্তাকর্ষক। স্বামীজী তাঁর জীবদ্দশায় বাংলা এবং সংস্কৃত দুই ভাষাতে সংগীত রচনা করেছিলেন। বাংলা ভাষায় মাত্র ৬ টি গান রচনার মাধ্যমে তিনি মার্গ সংগীতের উচ্চতর আসন লাভ করেন। স্বামীজীর গান রচনার সংখ্যাস্বল্পতা থাকলেও গানের গুণগত মান, ভাব, ছন্দ, ভাষা, কাব্য প্রতিভা এবং গঠনের সৌন্দর্য অসামান্য। তবে এইসব গানের বেশকিছুর রচনাকাল সম্পর্কে সঠিক দিন তারিখ জানা যায় না। কেবল তিনটি গানের সময়কাল সম্পর্কে জানা যায়। যেমন,

“নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ শশাঙ্ক সুন্দর  
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর॥  
অক্ষুট মন-আকাশে, জগৎ সংসার ভাসে,  
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর॥”<sup>৪</sup>

আনুমানিক ১৮৮৭ সালে বরানগর মঠের প্রথম দিককার সময়ে এই গান স্বামীজী রচনা করেন। এই গানটি বাগেশ্রী রাগে এবং আড়া ঠেকা তালে নিবদ্ধ আধ্যাত্মবাদের করুণ রসে সমৃদ্ধ এক অসামান্য গান। স্বামীজীর রচিত আরেকটি গান হল:

“তাইয়া তাইয়া নাচে ভোলা, বম্ বব বাজে গাল।  
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে, দুলিছে কপাল মাল।  
গরজে গঙ্গা জটামাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে,  
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ, জ্বলে শশাঙ্কভাল॥”<sup>৫</sup>

এই গানটিও কর্ণাটি রাগে একতালে নিবদ্ধ এবং বরানগর মঠের প্রথম দিককার সময়ে রচিত। স্বামীজীর রচিত আরও চারটি গান হল:

খাস্বাজ - চৌতাল।

“একরূপ, অরূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামী-কাল-হীন,  
দেশহীন, সর্বহীন, 'নেতি নেতি' বিরাম যথায়।  
সেথা হতে বহে কারণ-ধারা ধরিয়ে বাসনা বেশ উজলা,  
গরজি গরজি উঠে তার বারি, অহমহমিতি সর্বমিতি সর্বক্ষণ॥”<sup>৬</sup>

কর্ণাটি-সুর ফাঁকতাল

“হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি।  
যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিনাক পাণি।  
উর্ধ্ব' জ্বলন্ত জটাজাল, নাচত ব্যোমকেশ ভাল,  
সগু ভুবন ধরত তাল, টলমল অবনী॥”<sup>৭</sup>

মূলতান-টিমা ত্রিতাল

“মুঝে বারি বনোয়ারী সৈঁইয়া যানেকো দে।

যানেকো দে রে সেইয়া  
যানেকো দে (আজু ভাল)।”<sup>৮</sup>

মিশ্র-চৌতাল

“খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।  
নিরঞ্জন, নররূপধর, নিৰ্গুণ, গুণময়।  
মোচন-অঘদূষণ, জগভূষণ, চিদঘনকায়।  
জ্ঞানাজ্ঞান-বিমল-নয়ন বীক্ষণে মোহ যায়।”<sup>৯</sup>

স্বামীজীর রচিত খণ্ডন-ভব-বন্ধন গানটি বেলেড় মঠে প্রতি সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের আরাত্রিক রূপে গাওয়া হলেও সুরের ভিন্নতায় তা জনসাধারণের কাছে কঠিন হয়ে ওঠে। যার ফলে তিনি এই গানের গীতিরূপ পরিবর্তন করে এই গানেরই আরেকটি রূপ পুনঃনির্মাণ করেন। গানটি হল:

“খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন, বন্দি তোমায়।  
নিরঞ্জন, নররূপধর নিৰ্গুণ গুণময়।  
নমো নমো প্রভু বাক্য-মনাতীত মনোবচনৈকাধার,  
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর  
তুমি তমভঞ্জনহার।”<sup>১০</sup>

তাঁর লেখা উপর্যুক্ত ৬ টি গানেই প্রকাশ পেয়েছে গম্ভীর কবিসত্তা এবং সংগীতের অপার কৃতিত্ব। এ সম্পর্কে সংগীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সংগীত কল্পতরু বইয়ের ভূমিকায় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখেছেন: “স্বামীজীর সংগীত-সাধনা ও সংগীত প্রতিফলনের মধ্যে ছিল ঐ আধ্যাত্মভাবেরই বিচ্ছুরণ, আর তারই জন্য তাঁর গান বা সংগীত সাধনা মিলন সাধন করিয়েছিল ঊনবিংশ শতকের মহামানব দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থবাসী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে। তাঁর সংগীত শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ হতেন সমাধিমগ্ন।”<sup>১১</sup> তিনি কেবল সুদক্ষ গায়কই ছিলেন না, ছিলেন সংগীতের সুদক্ষ ব্যাখ্যাকার। স্বামীজি তাঁর রচিত গানগুলোতে ভাবের উপরই বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় এই গুরুত্বারোপের বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশকিছু গানে সহজাত দৃশ্যমান। তবে সংগীতে স্বামীজীর সবচেয়ে বড় অবদান তাঁর রচিত ‘সঙ্গীতকল্পতরু’ গ্রন্থ। স্বামীজীর সঙ্গীতকল্পতরু বইটি মাত্র ২৩ বছর বয়সে রচনা করেছিলেন। স্বামীজি তাঁর সঙ্গীতকল্পতরু বইতে: সংগীত ও বাদ্য, সংগীত পরিমাপক, স্বরগ্রাম, নাম প্রকরণ, যন্ত্র বাধার নিয়ম, তত বাদ্য, গীত, তাল, বাদ্য বাজানোর নিয়ম, ধ্বনির ব্যবহার, স্বর সাধনা, রাগ-রাগিনী, সংগীতের নানাধিক এবং সাধক ও কবিগণের জীবনী সংগ্রহ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি এসব বিষয় আলোচনার মধ্য দিয়ে ‘সংগীত দর্শন’ বিষয়টিরও আলোকপাত করেছেন। আর এতেই প্রমাণিত হয় তিনি কত কম বয়সে, সংগীত সাধনায় কতটা পরিশ্রমী এবং প্রতিভাবান ছিলেন। এই বইতে মোট ৬৪৭ টি গান সংকলিত আছে। যার অনেকগুলো গানের গীতিকারের সন্ধান পাওয়া যায়নি। সংগ্রাহক হিসেবে তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। শুধু ভারতীয় সংগীতেই নয়, বিশ্ব সংগীত সম্পর্কেও তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। সংগীতের স্থান হিসেবে তিনি ধর্মমত নির্বিশেষে সকল গীতিকারকে স্থান দিয়েছেন। যদিও এই বইটি বাংলা ভাষায় সংকলিত হলেও এতে যেমন মার্গ সংগীত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তেমনি মৈথিলী পদ, হিন্দি ভজন, সংস্কৃত পদ, ওড়িয়া গান, অসমীয়া গান এবং সাঁওতালি গানও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে দেশি সংগীত হিসেবে

কীর্তন, বাউল, চৈতী স্থান পেলেও গ্রাম্য গীতি এই বইতে স্থান পায়নি। এই বইতে মোট ১৭৯ জন গীতিকারের গান স্থান পেয়েছে। যা মূলত আধ্যাত্মবাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। স্বামীজী সব সময় অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি শ্যামাসংগীতের পাশাপাশি পারস্যের গজল, ইসলামি ভক্তিগীতি এমনকি পাশ্চাত্যের খ্রিস্টীয় ভাবধারার গানকেও তিনি সংযোজিত করেছেন। পারস্য সুফিবাদের সাথে উত্তর ভারতীয় সংগীতের এক গভীর যোগসূত্র রয়েছে। মধ্যযুগের অনেক সংগীত এবং সাহিত্যে সুফিবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ তৎকালীন সময়ে হিন্দু এবং মুসলিম উচ্চ বংশে ফার্সি সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা এবং জনপ্রিয়তা ছিল। এ সম্পর্কে শ্রী বিবেকানন্দ কাব্যগীতি বইতে উল্লেখ আছে: স্বামীজীর পিতা বিশ্বনাথ ছিলেন “হাফেজী কবিতা-প্রিয়, সঙ্গীতানুরাগী।”<sup>১২</sup> সঙ্গীতকল্পতরু বইয়ের সংযোজিত গানগুলোর পর্যায় যদি বিন্যস্ত করা যায়, তবে সে পর্যায়গুলোতে পাব: ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক, ধর্ম, জাতীয়, প্রণয় ও বিবিধ সঙ্গীত। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আরেক সঙ্গীতজ্ঞ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ স্বামীজীর সংগীত মানস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন- “স্বামীজী ছিলেন না শুধুই সঙ্গীত শিল্পী, সঙ্গীত তত্ত্বানুসন্ধান ও সঙ্গীতকল্পতরু গ্রন্থখানির ঔপপত্তিক আলোচনা শৈলীই তাঁর সঙ্গীত জ্ঞান ও বিচক্ষণতার কথা প্রমাণ করে।”<sup>১৩</sup> সংগীত সাধনা হল ঈশ্বর সাধনার এক অন্যতম অঙ্গ। আমরা যদি ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাস পর্যালোচনা করি তবে দেখতে পাব, আধ্যাত্ম সংগীত সেখানে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। মধ্যযুগের একাধিক বিশিষ্ট সাধক-সাধিকা বিশেষত: নানক, কবির, দাদু, মীরাবাই ও তুলসী দাস সংগীতের মাধ্যমে ঈশ্বরের আরাধনা করেছেন। এমনকি ভারতীয় মার্গ সংগীতের ইতিহাসে আধ্যাত্ম সংগীত সাধনায় ঋষি নারদ এবং ভরতমুনির নামেরও উল্লেখ পাই, যারা পূর্বে ভারতীয় মার্গ সংগীতের সাথে আধ্যাত্মবাদের গভীর যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। তাছাড়া ভরত নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে মার্গ সংগীতের বিস্তার এবং রূপরেখা সম্পর্কে যে মতবাদ প্রচলিত আছে সেগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, কেন প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রকারেরা মার্গ সংগীতকে ঈশ্বর অনুধ্যানের অন্যতম পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তবে স্বামীজী প্রাচীন পন্থায় মধ্যযুগের সাধক সাধিকাদের মত সংগীতের মাধ্যমে ঈশ্বর আরাধ্যের বিষয়টি অনুসরণ করলেও সবটুকু অনুকরণ করেননি। এর কারণ, স্বামীজী ছিলেন সংস্কারহীন প্রাচ্য আধ্যাত্ম সংগীতের আধুনিক সংস্করণ। সংগীত সাধনায় স্বামীজীর এই ঈশ্বরের প্রতি আধ্যাত্ম নিবেদন বৌদ্ধ ধর্মের সাধন সংগীতের সাথে যেমন মেলবন্ধন বিনির্মাণ করেছে তেমনি এর প্রভাব স্পর্শ করেছে প্রাচীন চৈনিক ধর্ম ‘তাওবাদ’কেও। তাওবাদ হল: জগতের প্রাকৃতিক উপায়, পথ বা নীতি অনুসরণ। স্বামীজীর সংগীত মূল্যবোধ শুধু প্রাচ্য সংগীতেই নয়, পাশ্চাত্যের পিথাগোরাস, প্লেটো, সক্রেটিসের মত মহান দার্শনিকের সংগীত চিন্তার সাথে যেমন এর সাদৃশ্য রয়েছে তেমনি রয়েছে পারস্যের সুফিবাদ প্রতিষ্ঠাতা কবি ওমর খৈয়াম, হাফিজ ও জালাল উদ্দিন রুমির সুফি দর্শনেও। স্বামীজী ছিলেন প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক ইরাটোশ্চেনিসের মত ‘ফিল লোকোস’ অর্থাৎ যিনি শিখতে ও জানতে ভালোবাসেন। এজন্যই স্বতন্ত্রতার বিচারে স্বামীজী সর্বদা এক এবং অনন্য। শুধু তাই নয়, স্বামীজীর সংগীত দর্শনের গভীরতা এবং প্রজ্ঞার অনুধাবন ক্ষমতা ধ্যান ও যোগ সাধনায় ছিল ‘সমাধি’ তুল্য। অর্থাৎ স্বামীজী ছিলেন বিশ্ব সংগীতের আরেক অনুবিশ্ব। কিন্তু তীব্র পরিতাপের বিষয়ে এই, প্রতিটি মানুষের জীবনেই কিছু প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি হয়ে যায়। আর এই অপ্রাপ্তি হল: স্বামীজীর কণ্ঠস্বর। স্বামীজীর কণ্ঠস্বরের রেকর্ড আজ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায়নি। প্রযুক্তির কল্যাণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাধ্যমে স্বামীজীর কণ্ঠস্বরের অডিও রেকর্ডিং শোনা গেলেও, আদৌতে সেগুলো স্বামীজীর নিজ কণ্ঠের রেকর্ডিং নয়। এ বিষয়ে ২০১২ সালে ‘দ্য হিন্দু’ পত্রিকায় একটি রিপোর্ট প্রকাশ পায়। এই রিপোর্ট

অনুযায়ী এই বিতর্কের স্থায়ী সমাধান করে রামকৃষ্ণ মিশন। মিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, স্বামীজীর গলার স্বরের রেকর্ডিং কোথাও সংরক্ষিত নেই। তাছাড়া অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বোধসরানন্দ অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানান যে, ১৮৯৩ সালে শিকাগোতে স্বামীর কণ্ঠস্বর কোথাও রেকর্ড করা হয়নি। তবে ফরাসি নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক রম্যাঁ রলাঁ স্বামীজীর কণ্ঠস্বর সম্পর্কে যা উল্লেখ করেন তা হল: “...বক্তৃতা আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ঐশ্বর্যময়, গভীর কণ্ঠস্বর অধিকার করে ফেলল বিপুল মার্কিনী এ্যাংলো-স্যাক্সন শ্রোতৃমণ্ডলীকে, যারা তাঁর বর্ণের জন্যে প্রথমে তাঁর প্রতি বিরাগ পোষণ করেছিল।... ”<sup>১৪</sup> এমনকি এন্না কালভে তাঁর কণ্ঠ স্বরকে বর্ণনা করেছেন: “খাদ ও তীব্র স্বরের চমৎকার মধ্যবর্তী এবং চীনা কাঁসরের মতন কম্পনময়”<sup>১৫</sup> স্বামীজীর কণ্ঠস্বর যেন ভ্রমরের গুঞ্জন অর্থাৎ ষড়্জের মাঝে লুকায়িত সগুসুর। তাঁর কণ্ঠ ‘জোয়ারীদার’। যাকে বলে পুরুষোচিত গম্ভীর কণ্ঠ। তবে বিশ্ব সংগীতের বঙ্গীয় সংস্করণ এবং সংগীতের অনুবিশ্ব হিসেবে স্বামীজীর সাধন-সংগীত, সংগীতের ইতিহাসে এক অনন্য দান। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সংগীত শিক্ষায় স্বামীজীর সংগীতের গুরুত্ব এবং তাৎপর্যের বিষয়টি যতটা বিশদে আলোচনা প্রয়োজন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে বোধ করি তার যৎসামান্যই চর্চিত হচ্ছে। ফলে অনালোচিত রয়ে যাচ্ছে তাঁর মূল্যবান সংগীতের অনেককিছুই। পরিশেষে অকুণ্ঠ প্রত্যাশা; বর্তমান প্রজন্ম এবং ভবিষ্যতে স্বামী বিবেকানন্দের সংগীত দর্শন সবার মাঝে আরও বেশি প্রতিফলিত হোক। সংগীতের আলো, সুগন্ধী ধূপ ছড়িয়ে পড়ুক সারা বিশ্বে। বিশ্বের সকল মানুষের কাছে।

### তথ্যসূত্র:

- ১। Datta, Bhupendranath, ‘Swami Vivekananda Patriot-Prophet’, Nababharat Publishers, Calcutta, 1954, Page: 155.
- ২। দত্ত, মহেন্দ্রনাথ, ‘স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী’, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, প্রকাশ কাল: (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৮ ই আষাঢ় ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ৫৪-৫৫।
- ৩। গুপ্ত, প্রদ্যোৎ, ‘স্বামী বিবেকানন্দ’, চক্রবর্তী এণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ১৯৫৯, পৃ. ১৭
- ৪। সাহা শ্রীপূর্ণ চন্দ্র, সাধন সঙ্গীত, প্রকাশক: ঢাকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, প্রথম প্রকাশ: ২৮ শে আষাঢ় ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ঢাকা, পৃষ্ঠা: ২৫৮
- ৫। দাশগুপ্ত শ্রীমানদাশঙ্কর, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রকাশক: শ্রীমতি বিজয়া দাশগুপ্ত, দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, প্রথম প্রকাশ: ২১ শে পৌষ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১৯০
- ৬। মুখোপাধ্যায় দিলীপকুমার, সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কম্পতরু, প্রকাশক: জিজ্ঞাসা, প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১২১
- ৭। তদেব, পৃষ্ঠা: ১২২
- ৮। বিবেকানন্দ স্বামী, বীরবাণী, প্রকাশ কাল: ১৩১২ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ৭

- ৯। মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার, 'সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু', জিজ্ঞাসা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২২।
- ১০। বিবেকানন্দ, স্বামী, 'বীরবাণী', বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলিকাতা, ১৩১২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫।
- ১১। মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার, 'সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু', জিজ্ঞাসা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬।
- ১২। স্বামী, শ্যামানন্দ, 'শ্রী বিবেকানন্দ কাব্য গীতি', স্বামী শ্যামানন্দ কর্তৃক, কলিকাতা, প্রকাশ কাল: ১৪ ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ২৩।
- ১৩। সেন, পৃথ্বীরাজ, 'চিন্তনে মননে বিবেকানন্দ সঙ্গীত', পুনশ্চ, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১১।
- ১৪। মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার, 'সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু', জিজ্ঞাসা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৭।
- ১৫। তাদেব, পৃ. ২৭।

### গ্রন্থস্বর্ণ:

- ১। গুপ্ত, প্রদ্যোৎ, স্বামী বিবেকানন্দ, চক্রবর্তী এণ্ড কোম্পানী, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ১৯৫৯, কলকাতা।
- ২। দত্ত, মহেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, প্রকাশ কাল: ১৯৯০, কলকাতা।
- ৩। দত্ত, শ্রী নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ স্বামী) ও বসাক, শ্রীবৈষ্ণবচরণ, সঙ্গীতকল্পতরু, প্রকাশক: রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, প্রকাশিত সংস্করণ: ১২ জানুয়ারি ২০০০, কলকাতা।
- ৪। দাশগুপ্ত, শ্রীমানদাশঙ্কর, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রকাশক: শ্রীমতি বিজয়া দাশগুপ্ত, দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, প্রথম প্রকাশ: ২১ শে পৌষ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।
- ৫। বিবেকানন্দ, স্বামী, বীরবাণী, বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলিকাতা প্রকাশ কাল: ১৩১২ বঙ্গাব্দ।
- ৬। মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার, সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।
- ৭। শ্যামানন্দ, স্বামী, শ্রী বিবেকানন্দ কাব্য গীতি, স্বামী শ্যামানন্দ কর্তৃক ১নং উমেশ দত্ত লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, প্রকাশ কাল: ১৪ ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।
- ৮। সেনগুপ্ত, প্রদ্যোত (সম্পাদনা), স্মরণে মননে বিবেকানন্দ (দ্বিতীয় খন্ড), প্রকাশক: বর্ণালী, প্রথম প্রকাশ: মাঘ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।
- ৯। সেন, পৃথ্বীরাজ, চিন্তনে মননে বিবেকানন্দ সঙ্গীত, প্রকাশক: পুনশ্চ, প্রকাশ কাল: ৯ ই আগস্ট, ২০১৭, কলকাতা।
- ১০। সাহা, শ্রীপূর্ণ চন্দ্র, সাধন সঙ্গীত, প্রকাশক: ঢাকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, প্রথম প্রকাশ: ২৮ শে আষাঢ় ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ঢাকা।
- ১১। Datta, Bhupendranath, Swami Vivekananda Patriot-Prophet, Nababharat Publishers, first published in 1 October 1954, Calcutta.





# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 539-547

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.041



## বাংলার পীরসংস্কৃতি ও পীরসাহিত্য : একটি নিরীক্ষা

ড. সুদীপ্ত চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, খড়্গপুর কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 09.01.2025; Accepted: 24.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*The influence of Sufism in medieval Indian history is a significant cultural phenomenon, with its reach extending to various regions, including Bengal. In Bengal, Sufi traditions merged with local folk practices, giving rise to Peer culture or Peerism. This unique cultural synthesis resonated deeply within the folk society, leading to the development of an independent body of Peer literature, which incorporated elements of folk traditions.*

*One of the most notable examples of this literary tradition is the Pala of Banabibi. This popular Peer-poem occupies a special place in Bengal's cultural landscape, blending religious, social, and ecological themes into a cohesive narrative. By utilizing Stith Thompson's Motif-Index of Folk-Literature as an analytical tool, this article seeks to explore the recurring motifs within the Pala of Banabibi. The aim is to understand the cultural significance of Peer literature and demonstrate how the motif-index method can offer insights into the narrative structures and thematic concerns of such texts.*

*This study not only highlights the integration of Sufi culture into Bengal's folk traditions but also sheds light on how these influences created a distinctive literary tradition that continues to hold cultural relevance.*

**Keywords:** Middle Ages, Culture, Sufism, Peerism, Folklore and Folk literature, Motif Index.

বাংলা শব্দভাণ্ডারে 'পীর' শব্দটি একটি কৃতঞ্চণ শব্দ হিসেবে গৃহীত, যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'বৃদ্ধ'। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এই শব্দটির উৎস ফারসি 'পীর' বলে জানিয়েছেন; যার অর্থ 'মুসলমান সিদ্ধ পুরুষ'। ইসলামের সুফি মতবাদ থেকে এই পীরবাদের উদ্ভব। সেখানে 'পীর' অর্থে এই বিশেষ অধ্যাত্ম সাধনার পরম গুরুকে বোঝানো হয়ে থাকে। এদের উদ্ভবের আদি ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বঙ্গে সুফী প্রভাব'-এ জানিয়েছেন -

‘প্রাচ্য ভূখণ্ডের,- বিশেষতঃ বোখারা, সমরকন্দ, তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান ও প্রাচ্য পারস্যের বৌদ্ধধর্ম ত্যাগী মুসলমানদের মধ্যে কালক্রমে বৌদ্ধ-হিন্দু মানসিকতা ক্রিয়াশীল হইয়া উঠার ফলে, প্রাচীন সূফী-মতবাদের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে “পীর”-বাদ জন্মলাভ করে। ঐতিহাসিক ও ইতিহাস-অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন, এই দেশগুলি যে শুধু কণিকের (সিংহাসনারোহণ-কাল ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) সময় হইতে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ তথা হিন্দু সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তাহা নহে, মুসলমান অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত ইহারা বৌদ্ধপ্রভাবে ভরপুর এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল...

... “পীর”-বাদ প্রধানতঃ পারস্য-পূর্ববর্তী বিশাল ভূখণ্ডের ইসলামিক খিচুড়ী। এই খিচুড়ী পাকাইবার ব্যাপারে তুর্কি তাজিক, আফগানী, ফারসি প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম ত্যাগী মুসলমানগণ প্রধানতঃ পাচকের কাজ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই খিচুড়ীতে যে বৌদ্ধ মাল-মসলাই অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? তাই দেখিতে পাই ফারসি “পীর” শব্দটি পর্যন্ত “থের” (সং= হুবীর) শব্দের হুবহু অনুসরণ মাত্র; উভয় শব্দ সমভাবে “বুদ্ধ ব্যক্তি” এই অর্থ জ্ঞাপন করে। বৌদ্ধদের “চৈত্য পূজা” প্রথা, অর্থাৎ “থের” সমাধি পূজার প্রথা, “পীর” দিগের কবর-সেবা করিবার প্রথা প্রবর্তিত করার মূলে ক্রিয়া করায়, বৌদ্ধধর্মত্যাগী খ্রীষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রাচ্য মুসলমানদিগকে যে “পীর”-বাদের সর্বতোমুখী বিকাশে সাহায্য করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।”<sup>১</sup>

বঙ্গদেশের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাই খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক গোড়-লক্ষণাবতী অধিকারের পূর্ব থেকেই কিন্তু বঙ্গদেশের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের সুফি সংস্কৃতির যে যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল তার নেপথ্যের কারণ ছিল বাণিজ্য। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকেই আরবের সঙ্গে বঙ্গদেশের নৌ-বাণিজ্যের সম্পর্কের সূত্রপাত। মূলত চট্টগ্রাম বন্দর এই সময় থেকেই আরব বণিক অধ্যুষিত হয়ে উঠতে থাকে। এই বণিকদের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু সুফি সাধকরা ধর্ম প্রচারের স্বার্থে এখানে আসতে থাকেন এবং দেখা যায় যে মোটামুটি খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে চট্টগ্রামে ইসলাম ধর্ম এদের মাধ্যমে বিস্তৃতি লাভ করেছে। অতঃপর ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি বিজয়ের পর রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে পড়তে থাকে এমনকী রাজশক্তির প্রতিভূ হয়ে উঠতে থাকে। অধ্যাপক সনৎকুমার নস্কর এ প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন -

রাজনৈতিক অধিকার পাকা হওয়ার পর বোধহয় এবার আহূত হলেন পীর দরবেশ, আউলিয়া প্রমুখ ধর্ম প্রচারকের দল। তারা কখনো তর্কাতীত কেরামতীর দ্বারা, কখনো জ্ঞানগর্ভ প্রবচনের দ্বারা কিংবা অনারম্বর জীবনযাত্রার দ্বারা প্রভাবিত করতে চাইলেন হিন্দু জনচিন্তকে। কোনরকম ব্যবহারিক জ্ঞান শিক্ষা নয়, সম্পূর্ণ ধর্মীয় শিক্ষাদান ছিল এদের প্রধান উদ্দেশ্য। আর তার ফলেই বাংলার বিভিন্ন শহরে ও গ্রামাঞ্চলে সূফীরা দরগা ও তাকিয়া নির্মাণ করে বিনা রক্তপাতে জয় করে নিচ্ছিলেন এর বিশাল ভূখণ্ড আর মানবহৃদয়। অবশ্য কোথাও কোথাও ধর্মীয় উন্মাদনা প্রকাশের জন্য মঠ-মন্দির ধ্বংস করা হচ্ছিল।<sup>২</sup>

বাংলায় যে-সব সুফি খানদানের প্রভাব সর্বাঙ্গিকভাবে পড়েছিল সেগুলি হল:

১. **সুহরবরদীয়হ্ খানদান** - ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম এই খানদানেরই সাধকগণ বিস্তার লাভ করেছিল। এই সম্প্রদায়ের আদি গুরু বলে বিবেচিত হন মুলতানের শেখ বাহারউদ্দিন ধকারিয়া মুলতানি। বাংলায় এই খানদানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাধন ছিলেন শ্রীহট্টের শাহজালাল মুজররদ-ই-য়মনী। শ্রীহট্ট-পশ্চিম আসাম অঞ্চলে তার প্রভাব ব্যাপক হয়ে ওঠে।

২. **চিশতীয়হ্ খানদান** - চিশতিয়া সম্প্রদায়ের ভারতীয় আদি গুরু হলেন আজমীরের খাজা মইনুদ্দিন চিশতী। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গে বিশেষত চট্টগ্রাম ও ফরিদপুর অঞ্চলে এই খানদানের বিশেষ প্রভাব ছিল। এই খানদানের অন্যতম সুফি সাধক নুরুদ্দিন কুতুব-ই-আলাম ছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর হিন্দু রাজা গণেশের বিপক্ষের মূল চক্রান্তকারী।

৩. **কুলন্দরীয়হ্ খানদান** - এই সম্প্রদায়কে চিশতীয়হ্ খানদানেরই শাখা বলে মনে করা হয়। বাংলায় এই মতের আদি গুরু হলেন পাণ্ডুয়ার সাহ শফিউদ্দিন শাহী। ষোড়শ শতকে রচিত মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে এই সম্প্রদায়ের উল্লেখ রয়েছে। পাশাপাশি এই সময়েই আরবি হরফে লেখা ‘যোগ কলন্দর’ পুথি পাওয়া গেছে চট্টগ্রামে।<sup>৭</sup>

৪. **মদারীয়হ্** - পূর্ব বাংলার পাবনা, ফরিদপুর এবং ভারতের ত্রিপুরা জেলাতে এদের প্রভাব ছিল। এই সম্প্রদায়ের সাধনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা যাদুবিদ্যা ও অলৌকিক কর্মকাণ্ড।

৫. **অহ্মীয়হ্** - এই সম্প্রদায় ভারতে খিদ্দরহ্ নামে পরিচিত। মুহাম্মদ ইনামুল হক এদের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন “বাঙ্গালী মুসলমানদের নিকট “খিদ্দর” প্রধানত হিন্দু জল দেবতা “বরুণেরই” প্রতিনিধি রূপে সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালার বিখ্যাত বিখ্যাত নদীতটবাসী মুসলমানগণ এখনও অনেক স্থানে “খিদ্দর” প্রীতি মানসে প্রতি বৎসর “বেরা ভাসান” উৎসব সম্পন্ন করিয়া থাকেন। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও এই “বেরা ভাসান” উৎসব বাংলাদেশে প্রবল ছিল..”<sup>৮</sup>

৬. **নক্শবন্দিয়হ্ খানদান** - বাংলার মঙ্গলকোট, রাজশাহী ইত্যাদি অঞ্চলে এদের প্রভাব ছিল। বাংলায় ইমতের প্রবক্তা শেখ হামিদ দানিশমন্দ। এরা তাদের সাধনাকে হিন্দু যোগ চর্চার খুব কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিলেন। তন্ত্রের কুলকুন্ডলীন শক্তি এদের পরিভাষায় পরিণত হয় ‘লতিফা’-য়।

৭. **ক্বাদিরীয়হ্ খানদান**- এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল কাদের জিলানী। এই সম্প্রদায়ভুক্ত সুফি সাধকরাই সর্বশেষে বাংলায় প্রবেশ করেন। মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি সৈয়দ আলাওল ছিলেন এই সম্প্রদায়ভুক্ত।

এই সাতটি সুফি সম্প্রদায়ের উপরে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সংস্কৃতিরই এক মিশ্র প্রভাব পড়েছিল। আর সেই মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব যে কতখানি সুদূরপ্রসারী হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় রচিত বিভিন্ন সুফি পুথিগুলিতে। সৈয়দ সুলতানের লেখা ‘জ্ঞানচৌতিশা’ অথবা ‘জ্ঞানপ্রদীপ’, শেখ চান্দেদর লেখা ‘হরগৌরী সম্বাদ’ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এখানে তাত্ত্বিকভাবে শিব ও শক্তির যুগলনীলাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যায়। এবং হিন্দু দর্শনের পাশাপাশি এখানে বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাব লক্ষণীয়। পাশাপাশি উল্লেখ্য হাজী মুহাম্মদের ‘সুরতনামা’, মোহাম্মদ শরিফের ‘নূরনামা’ গ্রন্থের প্রসঙ্গ। আবার আলী রাজার রচিত ‘জ্ঞানসাগর’ নামক পুস্তকে মুসলিম মরমীয়াবাদের উপর সরাসরি তন্ত্রের প্রভাব পড়েছে। তিনি আবার রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বেশ কিছু পদেরও রচয়িতা। বাংলা সুফি তত্ত্বে, তাত্ত্বিক পদ্ধতির যে

প্রভাব পড়েছিল, তার ফলে কায়াসাধনার একটা বিকল্প রূপ পরিগৃহীত হয়েছিল এর অন্তর কাঠামোয়। বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে আহমেদ শরীফ বলেছেন -

প্রথমে দেহের সাধন- মূলাধার থেকে শক্তির (অনলের) উর্ধ্বায়ন লতিফা তথা জ্যোতির উন্মেষ সাধন। দ্বিতীয় স্তরে মণিপুরে তথা নাভি দেশে বায়ুর নিয়ন্ত্রণ ও নাসিকা লক্ষ্যে ধ্যান। এই স্তরে আত্মার দর্শন ঘটে। তৃতীয় স্তরে, কলিজা-স্থিত অমৃতরূপ জলকুণ্ডে শশী দর্শন। এখানে আত্মা ও নূর-মুহাম্মদের মিলন। নূর মুহাম্মদ পরমাত্মার প্রতীক। চতুর্থ স্থানে দেহস্ত সহস্রদল পদ্যের উপর জ্যোতির্ময় আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। এভাবে ঘটের মধ্যে চিনে নিতে হয় ‘প্রভু নিরঞ্জন’।<sup>৫</sup>

পরবর্তীকালে সুফি সংস্কৃতির এই মিশ্র প্রভাব থেকেই বাংলার লোকায়তস্তরে আত্মপ্রকাশ লাভ করে ‘পীর সংস্কৃতি’। আর তা থেকে তৈরি হয় পীরকেন্দ্রিক বিভিন্ন সংস্কার, যেমন -

১. জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভক্ত পীরের দরগাহ্ অর্থাৎ সমাধিস্থানে বা নজবগাহে অর্থাৎ কল্পিত দরগায় মানত ও শিরনি প্রদান করেন।
২. মুসলমান ভক্তগণ পীরের আত্মার শান্তি কামনা করে জিয়াবত করেন। অন্যদিকে হিন্দু ভক্তগণ পীরের প্রতি ভক্তি নিবেদন করতে নানাবিধ অর্ঘ্য প্রদান করেন।
৩. মুসলিম আদর্শে দরগায় কুরআন পাঠ হয় কিন্তু নামাজ অনুষ্ঠান হয় না। হিন্দু আদর্শে লুট প্রদত্ত হয়।
৪. সন্তান কামনায় বা রোগ নিরাময় জন্য অথবা অন্য কোন কামনার পরিপূরণার্থে দরগায় ইট বাঁধা হয়।
৫. পীরগণের জন্ম বা মৃত্যুবার্ষিকীতে হিন্দু মুসলিম সেবায়ত ও জনসাধারণ দরগায় সম্বৎসর মেলা অনুষ্ঠান উদযাপন করেন।
৬. হিন্দু মুসলিম ভক্তগণ পীরের নানা অলৌকিক কীর্তি কথা প্রচারমূলক কাহিনী বিশ্বাস করেন এবং তা প্রচারও করে থাকেন। মূলত এইখান থেকেই পীর সাহিত্যের উদ্ভব।

আরো ভালো করে বলতে গেলে মধ্যযুগের দ্বিতীয় অর্থ থেকে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে এইসব পীর-পীরানীদের (পীরানী = মহিলা পীর) অলৌকিক কীর্তিকলাপূর্ণ আখ্যান নির্ভর যে সাহিত্য শাখার বিকাশ ঘটতে থাকে, তাকেই সামগ্রিক অর্থে বাংলা ‘পীর সাহিত্য’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে দেখতে গেলে এগুলি বেশিরভাগই কিংবদন্তি বা Legend-এর সমতুল্য।<sup>৬</sup> জার্মানিতে এই ধরনের কাহিনীকে বলা হয় ‘Sage’ এবং ইংরাজিতে একে Local Tradition-ও বলা হয়ে থাকে। ‘লিজেড’ শব্দটির মাধ্যমে আদিতে কোনো ভোজ বা উৎসবে কোনো সন্ন্যাসী বা ধর্মগুরুর জীবন-আখ্যান শ্রদ্ধা করে গীত বা কথিত হওয়াকে বোঝাতো। কিন্তু পরবর্তীকালে এর অর্থ বিস্তৃতি প্রাপ্ত হয়েছে। নানা প্রকার সংস্কার, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, ঐতিহাসিক নানা ঘটনা বা ব্যক্তিত্ব ও স্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এগুলি এক চিত্তাকর্ষক আখ্যানে পরিণত হয়েছে। কাহিনী যতই অলৌকিক হোক না কেন, কিংবা সেখানে অযৌক্তিক তথ্য থাকুক না কেন, এর প্রতি সংশ্লিষ্ট সমাজের সর্বজনীন বিশ্বাস ও চিরন্তন শ্রদ্ধা, প্রজন্ম পরম্পরায় বাহিত হয়ে থাকে। Sitth Thompson এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন -

This form of tale purports to be an account of an extraordinary happening believed to have actually occurred. It may recount a legend of something which happened in ancient times at a particular place.<sup>9</sup>

বিশিষ্ট গবেষক গিরীন্দ্রনাথ দাস বাংলার পীর সাহিত্যকে তার প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মোট চারটি বিভাগে ভাগ করেছেন;<sup>৮</sup> যথা -

১. **পীর লোককথা** - আল্লাহর শক্তিতে বলিয়ান হয়ে বিভিন্ন পীরের নামে অসংখ্য যেসব অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রচারমূলক কিংবদন্তিকে কেন্দ্র করে যেসব সংক্ষিপ্ত মৌখিক কাহিনী প্রচলিত আছে; এগুলি তারই নিদর্শন।
২. **পীর জীবনী** - বিভিন্ন ঐতিহাসিক পীরদের বংশ পরিচয় জীবনী এবং অন্যান্য অলৌকিক কিংবদন্তিমূলক কর্মকাণ্ডের সংকলন। এগুলি সাধারণত গদ্যতে রচিত।
৩. **পীর নাটক** - নারী-পুরুষের প্রণয় অথবা দুইটি পরস্পর বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব দিয়ে নাট্যরস সৃষ্টিকারী আঞ্চলিক পালাগানমূলক রচনা এটি। এর মধ্যে দিয়ে আসলে পীর বা প্রাণীর মাহাত্ম্য কথাই বিবৃত করা হয়।
৪. **পীর কাব্য** - খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক অথবা কাল্পনিক পীর চরিত্রকে কেন্দ্র করে পীরকাব্য রচিত হতে শুরু করে। এদের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল-

**ক) ঐতিহাসিক পীর** - ইসমাইল গাজী, মসলন্দী, শাহ সুফি সুলতান, সুলতান বলখি, শেখ ফরিদ, মনসুর হাল্লাজ, পীর একদিল শাহ, পীর গোরাচাঁদ প্রমুখ।

**খ) কাল্পনিক পীর তথা ছদ্ম পীর** - সত্যপীর, মানিকপীর, গাজী সাহেব, কালু পীর, বনবিবি, ওলা বিবি প্রমুখ।

এদের মাহাত্ম্য বিষয়ক যে প্রচারমূলক গাথা কাব্যগুলি পাওয়া গিয়েছে তার প্রধান আদলটি রচিত হয়েছিল বাংলা মঙ্গলকাব্যকে কেন্দ্র করে। পাশাপাশি মঙ্গলকাব্য পাঠে ও শ্রবণে মানুষের কল্যাণ হয়, সেই সমান বিশ্বাসই, এই পীর গাথাগুলির রচনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। কাহিনী যতই অলৌকিক বা অযৌক্তিক হোক না কেন, তার মূল আবেদন ছিল এক বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষের ভক্তির কাছে। আর তাই এইসব কাব্যগুলির মধ্যে দিয়ে সেই গোষ্ঠীচেতনারই চূড়ান্ত প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করে থাকি। তবে এ কথাটাও মনে রাখতে হবে যে, এই ধরনের কাব্যগুলির মাধ্যমে পীরদের মাহাত্ম্য প্রচার করা হলেও সেই মাহাত্ম্যের নেপথ্যের ইসলাম আদর্শকেই প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এই শ্রেণীর কাব্যের একটা প্রধান তফাৎ হল; মঙ্গলকাব্যে অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবী চেয়েছেন নিজেদের মাহাত্ম্য প্রচার করতে। কিন্তু এইসব পীরগণ চেয়েছেন নিজেদের পরিবর্তে আল্লাহর প্রচার। আসলে এই গাথাকাব্যগুলিতে মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিকটাই গ্রহণ করা হয়েছে, তার মেজাজটাকে নয়। যেহেতু মঙ্গলকাব্য ছিল মধ্যযুগের অত্যন্ত একটি জনপ্রিয় মাধ্যম, সেই জন্যেই সেই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে এবং মিশ্র জনজাতির মধ্যে এই নতুন ধরনের কাব্যকে ছড়িয়ে দেওয়ার অভীপ্সা থেকেই মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিককে ব্যবহার করা হয়েছিল বলে মনে হয়। আসল ঝাঁকটা ছিল মাহাত্ম্য প্রচারের দিকে। তাই দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই কাহিনীর পরস্পরা

সেভাবে রক্ষা করার প্রয়াস নেই। অথবা অন্য পীরকে কেন্দ্র করে রচিত কাব্যের মধ্যেও সঞ্চারণিত হয়ে উঠতে দেখি। বিশিষ্ট গবেষক সা'আদুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলেছেন -

পীরগাথা বিশ্লেষণে আরো দেখা যায়- একজন পীরের কীর্তিকলাপ অন্য পীরের মাহাত্ম্য কাহিনীতে অবলীলায় মিলে গেছে। পীর গোরাচাঁদ (আব্বাস উদ্দিন রহঃ) নরবলি গ্রহণের জন্য আকানন্দ-বাকানন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, 'রায়মঙ্গল' কাব্যে দক্ষিণরায়ের নরবলির বিরুদ্ধে বড় খাঁ, বনবিবি ও শাহ-জঙ্গলি ('বনবিবির জহুরনামা) যুদ্ধ করেছিলেন—তা সত্যপীর কাহিনীর 'মালধগ পালা'তে সঞ্চারণিত হয়েছে। এইভাবে ছদ্ম ঐতিহাসিক, ঐতিহাসিক উভয় শ্রেণীর পীর গাথার মধ্যে পীরদের মাহাত্ম্য-কাহিনী বাংলার লোকমানস দ্বারা পরিশ্রুত হয়ে এক বিমিশ্র ও অখণ্ড পীর সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে।

তাই পীরগাথাগুলির মধ্যে সংশ্লিষ্ট গাজী বা দরবেশদের ব্যক্তি জীবনের ঐতিহাসিকতা মুখ্য নয় বরং লোকমনের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়-চেতনাজাত সমাজবোধের ঐতিহাসিকতাই এখানে প্রধান।<sup>১</sup>

বোঝাই যাচ্ছে যে, এখানে সমাজ বলতে এক বিশেষ গোষ্ঠীবদ্ধ কৌম সমাজকেই বোঝানো হয়েছে। যার সাংস্কৃতিক ইতিহাসচেতনার বিশেষ অভিমুখটির সঙ্গে সেই সমাজের বিশ্বাস-সংস্কার, প্রথা-পার্বণের দিকগুলিও পরস্পর সম্পৃক্ত। সুতরাং পীরসংস্কৃতি ও সাহিত্যের মধ্যে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যতটা না পাথুরে প্রমাণ খতিয়ে দেখা প্রয়োজন, তার চেয়েও বেশি Stith Thompson প্রবর্তিত 'মোটیف ইনডেক্স'<sup>২</sup>-এর প্রয়োগ করা দরকার বলে মনে হয়। আর তাহলেই আমরা এই কাহিনীগুলির মধ্যে থাকা আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক বর্ণনাগুলির সঠিক ব্যাখ্যা যেমন পেতে পারি, তেমনভাবেই মোটিফ ইনডেক্সে এদের চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে এদের বিশ্বজনীনতা/ আন্তর্জাতিকতা বুঝতে সক্ষম হতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ জনপ্রিয় বাংলা পীরসাহিত্যগুলির মধ্যে বনবিবির পালা থেকে প্রাপ্ত নির্বাচিত কিছু অংশের মোটিফ বিশ্লেষণ করে আমরা এই পর্যালোচনার ইতি টানব। বনবিবির এই পালা 'জহুরনামা' নামে পরিচিত। এর তিনটি ভাগ, ক) জন্মখণ্ড, খ) নারায়ণী জঙ্গ এবং গ) দুখে যাত্রা। আরবি 'জহুরা' শব্দের অর্থ কৃতিত্ব বা অলৌকিক শক্তি, আর ফারসি 'নামহ' শব্দের অর্থ হল পুথি বা পুস্তক। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই এই 'জহুরনামা'য় মূলত বনবিবির আবির্ভাব ও তাঁর বিভিন্ন অলৌকিক কর্মকাণ্ড প্রচারিত হয়ে থাকে। অরণ্যানী এই লোকায়ত দেবীর আরাধনায় খুব সঙ্গতভাবেই বৈদিক মন্ত্রের বা আচারের প্রভাব চোখে পড়ে না। বরং হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর মানুষের কাছে পূজিত হওয়ার কারণে এখানে এক মিশ্র সংস্কৃতিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু প্রধান অঞ্চলে এই বনবিবির বর্ণ হরিদ্রা, মাথায় মুকুট, গলায় হার ও বনফুলের মালা। সর্ব অঙ্গ নানা রকম অলংকারে ভূষিত। কোলে থাকে তার একটি শিশু। কোন কোন স্থানে আবার শিশু থাকে না। তবে এই দেবী ব্যাঘ্র বাহন। অন্যদিকে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে এই দেবীর আদল তৈরি করা হয় মুসলমান ঘরের কিশোরী বালিকার ন্যায়। পরনে থাকে পিরান বা ঘাগড়া পাজামা, মাথায় থাকে টুপি, চুল-বিনুনি করা, গলায় নানারকম হার ও বনফুলের মালা। পায়ে জুতো মোজা ও পাতলা ওড়না ব্যবহার করা হয় প্রসাধনে। কোন কোন স্থানে দেবীর হাতে থাকে 'আশাবাড়ি' বা দন্ড এবং ঝাড়া। বাহন কোথাও বাঘ, আবার কোথাও মুরগি। কোন কোন স্থানে বনবিবির কোলে একটি বালক মূর্তিও দেখা যায়।<sup>৩</sup> 'বনবিবির পালা'-র কাহিনীতে প্রথমেই আমরা যেসব মোটিফ দেখতে পাই তা হল, ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণরায় (মোটیف - এ ১৩২.১০ ব্যাঘ্র দেবতা), ও বনবিবি (মোটیف - এ ২৮৯.১ বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা), এছাড়াও কথাবলা বাঘ (মোটیف - বি২১১.২.২.১)। এর পাশাপাশি আর যেসব মোটিফ বনবিবির পালায় দেখতে পাওয়া যায় তা

হল, সৃষ্টিকর্তা বিধাতার (মোটফ - এ০ সৃষ্টি কর্তা) কাছে ইব্রাহিম ও তার প্রথম স্ত্রী ফুলবিবি সন্তান কামনায় বহু প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাদের সন্তান হয় না অবশেষে বিধাতার ভবিষ্যৎবাণী হয় (মোটফ - এম ৩১১.০.৩ ভবিষ্যৎবাণী: সন্তানের জন্ম হবে) যে সন্তানের জন্য ইব্রাহিমকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে হবে। সেই মতো ইব্রাহিম গোলাবিবি বা গুলালকে বিবাহ করেন। কিন্তু ফুল বিবি এই বিবাহে মত দিয়েছিলেন একটি শর্তের পরিবর্তে। গুলাল যখন দশমাসের গর্ভবতী তখন ফুলবিবি ইব্রাহিমকে সেই শর্তের কথা মনে করিয়ে দিয়ে জানান যে, গুলালকে এই অবস্থাতে বনবাস পাঠাতে হবে। ইব্রাহিমকে বাধ্য হয়ে তাই করতে হয়। এমতাবস্থায় বনের মধ্যে একাকী নিয়ে গুলাল কাঁদতে কাঁদতে অচেতন হয়ে পড়লে, পরমেশ্বরের মেহেরবানী হয়। তিনি বেহেস্ত থেকে চারজন নারীকে দেখাশোনার জন্য প্রেরণ করেন (মোটফ : এ ১৬৫ ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত দূত)। অতঃপর গুলাল নির্বিঘ্নে যমজ সন্তানের জন্ম দিলে (মোটফ: জেড ৭১.০.২ সংকেত সংখ্যা ২) সেই নারীরা অদৃশ্য হয়ে যায় (মোটফ: ডি ১৮৮০ অদৃশ্য হওয়া)। এই যমজ সন্তান হল বনবিবি ও তাঁর ভাই শাহজঙ্গলী (মোটফ: পি ২৫৩ একভাই ও একবোন)। এরপর গুলাল বনমধ্যে বনবিবিকে ফেলে রেখে শাহজঙ্গলীকে নিয়ে সেই স্থান পরিত্যাগ করে। বনবিবিকে বড়ো করে তুলতে থাকে জঙ্গলের পশুপাখি (মোটফ: এস ৩৫২.১ পরিত্যক্ত শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করে পশু এবং মোটিফ: এস ৩৫২.২ পরিত্যক্ত শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করে পাখি)। বনবিবিকে দুধ পান করায় হরিণ (মোটফ: বি৪৪৩.১ উপকারী হরিণ)। অতঃপর সাত বছর পরে ইব্রাহিম ফিরে এসে (মোটফ: জেড ৭১.৫.০.১ সংকেত সংখ্যা ৭) ভাইবোনকে ফিরিয়ে নিয়েছে যাওয়ার কথা বললে, বনবিবি রাজি হন না। বরং আল্লাহ যে তাদের আঠারো ভাটিতে ‘জহুরা জাহের’ করার জন্যই প্রেরণ করেছেন পৃথিবীতে; সে কথা ভাইকে স্মরণ করিয়ে দেন (মোটফ: পি ২৫৩.৬ বোন ভাইকে স্মরণ করিয়ে দেয়)। অতঃপর শুরু হয় দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনী। সেখানে আঠারো ভাটির বাদাবনে দক্ষিণরায় (মোটফ - এ ১৩২.১০ ব্যাঘ্র দেবতা), ও তার মাতা নারায়ণীর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন বনবিবি ও শাহজঙ্গলী। নারায়ণী সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বনবিবির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেন। বনবিবি আঠারো ভাটির মালিক হন। তৃতীয় খণ্ডের কাহিনীতে দেখা যায় ধনাই ও মনাই নামক দুই মৌলে ভাই (মোটফ - পি ২৫১.৫ দুইভাই) বাধাবনে মধু সংগ্রহ করতে যাবে বলে বিধবা রমনীর সন্তান দুখে সঙ্গে নিল। কিন্তু বাধাবনে মধু সংগ্রহ করতে গেলে দক্ষিণরায়ের পূজো না দিয়ে সেখানে প্রবেশ করা নিষেধ। তারা এই নিষেধ ভঙ্গ করে দক্ষিণ রায়ের কোপে পড়লো (মোটফ - সি ৯০০ নিষেধ ভঙ্গ করে শাস্তি)। দক্ষিণরায় দুখে নরবলি দিতে বললেন (মোটফ: এস ২৬৯.১ মানুষ বলি)। অবশেষে দুখের কাতর আহ্বানে বনবিবি সেখানে এসে তাকে রক্ষা করলেন ও বড়খাঁ গাজীর মধ্যস্থতায় বনবিবি ও শাহজঙ্গলীর সঙ্গে দক্ষিণরায়ের চূড়ান্ত সমঝোতা সাধিত হল।

আমাদের আলোচ্য বনবিবির পালাটি থেকে প্রাপ্ত মোটিফগুলিকে মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী কেমনভাবে সাজিয়ে নেওয়া যায় তা নিচে দেখানো হল -

১. এ০ সৃষ্টি কর্তা
২. এ ১৩২.১০ ব্যাঘ্র দেবতা
৩. এ ১৬৫ ঈশ্বর দ্বারা প্রেরিত দূত
৪. এ ২৮৯.১ বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা
৫. বি ২১১.২.২.১ কথাবলা বাঘ
৬. বি ৪৪৩.১ উপকারী হরিণ

৭. সি ৯০০ নিষেধ ভঙ্গ করে শাস্তি
৮. ডি ১৮৮০ অদৃশ্য হওয়া
৯. এম ৩১১.০.৩ ভবিষ্যৎবাণী : সন্তানের জন্ম হবে
১০. পি ২৫১.৫ দুইভাই
১১. পি ২৫৩ একভাই ও একবোন
১২. পি ২৫৩.৬ বোন ভাইকে স্মরণ করিয়ে দেয়
১৩. এস ২৬৯.১ মানুষ বলি
১৪. এস ৩৫২.১ পরিত্যক্ত শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করে পশু
১৫. এস ৩৫২.২ পরিত্যক্ত শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করে পাখি
১৬. জেড ৭১.০.২ সংকেত সংখ্যা ২
১৭. জেড ৭১.৫.০.১ সংকেত সংখ্যা ৭

পীর সাহিত্যের কেবলমাত্র একটি নিদর্শনকে সমীক্ষা করে প্রাপ্ত এই মোটিফের সংখ্যাই আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে এই বিষয়ে একটি সামগ্রিক গবেষণা অপেক্ষমান।

#### তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য, আনন্দ (সম্পা.), 'মুহম্মদ এনামুল হক বিরচিত বঙ্গে সূফী প্রভাব', কলা কেন্দ্র সংস্করণ, কলকাতা, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ২০১২, পৃ. ১৩৫।
২. সনৎকুমার নস্কর, 'মুঘল যুগের বাংলা সাহিত্য', রত্নাবলী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃ. ১২।
৩. তদেব, পৃ. ৮০।
৪. ভট্টাচার্য, আনন্দ (সম্পা.), তদেব গ্রন্থ, পৃ. ৬৫।
৫. নস্কর, সনৎকুমার, তদেব গ্রন্থ, পৃ. ৮১।
৬. Leach, Maria সম্পাদিত 'Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend' - গ্রন্থে Legend সম্পর্কে বলা হয়েছে,--

Legend - originally, something to be read at religious service or at meals, usually a saint's or martyr's life-legend has since come to be used for a narrative supposedly best in fact, with an intermixture of traditional materials, told about a person, place, or incident. The line between myth and legend is often vague. The myth has as its principle actor the gods and as its purpose explanations...the legends is told as true the myth's veracity is best on the belief of its hearers in the gods who are its characters (see : Maria Leach(ed.), 'Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend'(vol. 1), New York, Funk and Wagnalls, 1950, pg 612).

৭. Thompson, Stith, 'The Folktale', New York, Berkeley, University of California Press, Reprinted, 1977, p. 8.
৮. দাস, গিরীন্দ্রনাথ, 'বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা', শেহিদ লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৬, পৃ. ১১।



৯. ইসলাম, সা'আদুল, 'বাংলার হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মিশ্রণ', সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ১৯৪।
১০. 'মোটিফ ইনডেক্স' - অ্যান্টি আর্নের 'টাইপ ইনডেক্স'-এর সম্প্রসারণ ঘটানোর সময় ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে লোক কথার মত ইন্ডেক্সের তালিকাটি প্রস্তুত করতে শুরু করেছিলেন। অতঃপর ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর Motif Index Of Folk Literature প্রথম খণ্ড। ১৯৫৮ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে যায় এই শিরোনামাঙ্কিত গ্রন্থমালার মোট ছ'টি খণ্ড। বিপুল অধ্যবসায়ের তিনে বিশ্বের নানা ভাষায় প্রচলিত বিশাল সংখ্যক লোককথার সমীক্ষা করে তৈরি করেন 'মোটিফ মোটিফ ইনডেক্স'। মোটিফের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেন-- A motif is the smallest element in the tale having a power to persist in tradition. In order to have this power it must have something unusual and striking about it. লোককথার প্রায় ২৫ হাজারের বেশি মোটিফের সন্ধান দেন। এছাড়াও এই ইন্ডেক্সের একটি অন্যতম দিক হল পরবর্তী গবেষণায় নতুন মোটিফের সন্ধান পাওয়া গেলে, অতি সহজেই এখানে সেটিকে সংযুক্ত করা যায়। (দ্রষ্টব্য: Stith Thompson, The Folktale, p. 419)
- ১১। বনবিবির কাহিনীর জন্য দ্রষ্টব্য: বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, 'বাংলার লৌকিক দেবতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৫, পৃ. ২৯-৩৪ এবং দাস, শশাঙ্কশেখর, 'বনবিবি', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৮।
- ১২। মোটিফ ইনডেক্সের জন্য দ্রষ্টব্য: মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, 'বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স' প্রথম গাণ্ডচিল সংস্করণ, কলকাতা, গাণ্ডচিল, ২০১২ এবং [https://ia600301.us.archive.org/18/items/Thompson2016MotifIndex/Thompson\\_2016\\_Motif-Index.pdf](https://ia600301.us.archive.org/18/items/Thompson2016MotifIndex/Thompson_2016_Motif-Index.pdf)



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 548-555

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.042



## আধুনিক সংস্কৃত নাটকে অন্ত্যজ জীবন

এস কে মইনুদ্দিন, সিধো কানহো বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 11.01.2025; Accepted: 24.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*This paper explores the depiction of the "depressed classes" in modern Sanskrit dramas. The discussion begins with references from the Ramayana, Mahabharata, Smritishastra, and Dharmashastra, which describe these communities as the lowest caste, born from the bodies of deities of the three main castes. The term Antyaja refers to individuals considered lowly, despicable, and untouchable. Their dwelling places are depicted as being far from civilized society—at the foot of mountains, in slums, and in dusty, remote areas—symbolizing their marginalized status. However, the meaning of "depressed class" was not always devoid of dignity.*

*Several renowned playwrights in modern Sanskrit drama, such as Shrijiva Nyaytirtha, Nityananda Smrititirtha, Haridas Siddhantabagis, S.B. Belankar, Ram Kishore Mishra, and Motinath Mishra, have portrayed these marginalized groups in their works. Notable dramas include Daridraturdoibom, Chipitak-Carvanam, Mashakdhani, and Valmikitalavam, among others. These plays feature characters from the Antyaja or depressed classes, such as Bakreswar, Mandodari, Lombodar, and Kapali.*

*The plays highlight the exploitation and oppression of these characters by the capitalist elite. Through them, society's most devious and immoral actions are carried out, reinforcing their position as outcasts. In essence, these dramas critique the systemic marginalization of lower-class communities and expose the socio-economic structures that have left them behind.*

**Keywords:** Antyaja, caste system, socialism, economic hardship, housing, capitalism.

আধুনিক সংস্কৃত নাটকে অন্ত্যজদের জীবন সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে প্রাচীন সাহিত্যে অন্ত্যজ জীবন সম্পর্কে কী আলোচনা করা হয়েছে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ঋগ্বেদের একটি মাত্র সূক্ত পুরুষসূক্ত, সেখানে এই শূদ্রদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে বিরাট পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহুদয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ থেকে শূদ্রদের সৃষ্টি। সূক্তটি নিম্নরূপ -

“ব্রাহ্মণোগোহস্য মুখমাসীদ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।  
উরু তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।।”<sup>১</sup>

আবার মনুস্মৃতিতে জাতি ভেদ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে -

“লোকানাস্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখ বাহুরূপাদতঃ।  
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্যয়ৎ।।”<sup>২</sup>

মহাভারতেও এই জাতি বা বর্ণ সৃষ্টির সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে -

“পুরুরবা উবাচ। কুতশ্চিৎ ব্রাহ্মণো জাতো, বর্ণাশ্চাপি কুতস্তুয়ঃ। কস্মাচ্চ ভবতি শ্রেষ্ঠ স্তন্মে ব্যাখ্যাত  
মর্হসি। মাতরিশ্চোবাচ। ব্রাহ্মণো মুখতঃ সৃষ্টো ব্রহ্মণো রাজসত্তম্। বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ সৃষ্ট উরুভ্যাং  
বৈশ্য এব চ। বর্ণানাং পরিচর্যার্থং ত্রয়ানাং ভরতর্ষভ বর্ণশ্চতুর্থঃ সম্ভূতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো বিনির্মিতঃ।।”<sup>৩</sup>

অর্থাৎ পুরুরবা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ব্রাহ্মণ কোথা হইতে সৃষ্টি হল বা অন্য তিনটি বর্ণই বা কীভাবে সৃষ্টি হল। এর উত্তরে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মের মুখ থেকে, বাহুদ্বয় থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং ব্রহ্মার পাদদ্বয় থেকে শূদ্র জাতির আবির্ভাব।

আবার মহাভারতের শান্তি পর্বেও বলা হয়েছে -

“ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।  
ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কর্মভিঃ বর্ণতাং গতম্।।”<sup>৪</sup>

অর্থাৎ জগতে বর্ণ, জাতি বলে বিশেষ কিছু নেই, সমস্ত জগতে একটি মাত্রই ব্রহ্ম কর্তৃক ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হয়েছিল, তারপর কর্মের উপর ভিত্তি করে বর্ণের বিভাজন করা হয়েছিল।

অতএব বর্তমানে ‘অন্ত্যজ’ শব্দের যে সাধারণতঃ অর্থ দাঁড়ায় তা হল অধম নীচাশয় অস্পৃশ্য ব্যক্তি অন্ত্যজ নামে পরিচিত। যে সমস্ত জাতি বেদের নিয়ম পালন করেন না, যাদের উচ্চতর সংস্কৃতি বলতে কিছুই নেই। যেমন - কোল, কিরাত, কুরকু, শবর, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি এবং বৈদিক সময়কালের দস্যু, ব্রাত্য এবং নিষাদদেরও সমাজে ‘অন্ত্যজ’ বা শূদ্র জাতি মনে করেন। সমাজে অন্ত্যজ বা নিম্নবর্ণের মানুষ বলতে বোঝায় শূদ্র জাতিকে। শূদ্র বলতে বোঝায় যারা সমাজে পিছিয়ে পড়া এক ধরনের শ্রেণী, বর্তমানে যাদের আদিবাসী বা দলিত বলে চিহ্নিত করা হয়। এই আদিবাসীদের ইংরাজী প্রতিশব্দ হল ‘tribe’। অনেক বিদ্বান আবার এদের হিন্দু বলে স্বীকার করেননি। আদিবাসীদের ধর্ম আলাদা। তাদের সংস্কৃতি স্বতন্ত্র। আদিবাসীদের ধর্ম ইংরাজীতে ‘Animism’ সর্বপ্রাণবাদ, আর হিন্দুদের ধর্ম ‘Hinduism’ হিন্দুধর্ম। দুটিই পৃথক ধর্ম। “এই বাংলায় যখন হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান কেউ ছিল না, তখন বাঙ্গালীর পূর্বপুরুষেরা দ্রাবিড়, নিষাদ আর কিরাতের আদিম ধর্ম পালন করত।”<sup>৫</sup> আবার অন্নদাশংকর আদিবাসীদের সম্পর্কে বলেছেন - “ভারত আর হিন্দু সমার্থক নয়, ভারত হিন্দুর চেয়ে বড়ো, হিন্দুর চেয়ে পুরাতন, আর্যের চেয়েও প্রাচীন, বেদের চেয়েও আগেরকার। অগ্রাধিকার কারো যদি থাকে তা আদিবাসীদের। তারাই এদেশের বড় ইণ্ডিয়ান। তারাই আদি ভারতীয়।”<sup>৬</sup> এই আদিম মানুষরাই ভারতের মূল সম্পদ বা মূল ভারতীয়।

কিন্তু গবেষণা পত্রের সুবিধার্থে অন্তর্নিহিত ভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় লেখকের লেখনীতে, সরকারি কাগজে তারা আদি ভারতীয় হলেও বর্তমান সমাজে তাদের অবস্থান খুব একটা শোচনীয় নয়। সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির প্রতিদিন তাদের উপর নানান রকম অত্যাচার করে চলেছে।

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে ‘অন্ত্যজ’ শ্রেণী বিষয়টি নির্বাচন করার পূর্বে প্রাচীন বা আদি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন কালিদাস রচিত নাটক ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’ থেকে ধীবরের বৃত্তান্ত, শূদ্রকের ‘মুচ্ছকটিকম্’ থেকে চেট ও বিটের বর্ণনা অন্ত্যজ বা সমাজে পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিদেরই বোঝানো হয়েছে।

এই অন্ত্যজ বিষয়ে অনেক আধুনিক পণ্ডিত আলোচনা করেছেন যেমন - পঞ্চানন তর্করত্ন , চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কালীপদ তর্কচার্য, রমা চৌধুরী, তারা পদ ভট্টাচার্য, এস.বি. বেলঙ্কর, রাম কিশোর মিশ্র, মতিনাথ মিশ্রা, রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী প্রমুখ। আমি তাঁদের রচিত নাটক নিয়ে গবেষণা পত্রটিতে আলোচনা করেছি। এই ‘অন্ত্যজদের’ নিয়ে আধুনিক সংস্কৃত বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ কতটুকু আলোচনা করেছেন সেই বিষয়টি পত্রিকার মূল আলোচ্য বিষয়।

এখানে যে শব্দটি রয়েছে নিম্ন বর্ণের মানুষ বা পিছিয়ে পড়া বলতে এক কথায় বোঝায় ‘অন্ত্যজ’। কিন্তু সাধারণভাবে এর অর্থ যদি করা হয় , তা হল সমাজের নিম্ন স্তরের, অস্পৃশ্য, অবজ্ঞাত। মূলতঃ এক কথায় যদি এর অর্থ করা হয়, তা হল দরিদ্র। সবার পিছে সবার নিচে এদেরকেই বোঝানো হয়। কিন্তু এই ‘অন্ত্যজ’ শব্দের অর্থ আগে গরিমাহীন ছিল না।

পরবর্তী সময়ে তার অর্থকে সংকীর্ণ ব্যঞ্জনা পর্যবেশিত করা হয়েছে। অর্থগতভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় অন্ত্য = অন্ত+জ= জন্মা (যে জন্মে)। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ বিরাট পুরুষের দেহ থেকে জন্মানোর পর শেষ জাত বলা হয় এদের। চতুর্থ বর্ণ হল শূদ্র। এই শূদ্রদের বলা হয় পিছিয়ে পড়া বা অন্ত্যজ। এই শূদ্র অর্থে কোনো ঘৃণা নেই। কারণ পবিত্র বিরাট পুরুষের অঙ্গ থেকেই এরা জাত। সুতরাং সকল বর্ণই পবিত্র। সমস্যা সৃষ্টি হয় পরবর্তীকালে। শূদ্রদের ঔরসে উচ্চবর্ণের রমণীর গর্ভে প্রতিলোমজ সন্তানদের বলা হতে লাগল নিম্ন বর্ণের মানুষ। আর তখন থেকেই এদের প্রতি সমাজের অন্য তিন বর্ণের অবজ্ঞা তৈরী হল। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে সমাজের চিত্রগুলি তুলে ধরেছেন যথা - চৌরচাতুরীয়ম্, নষ্টহাসম্, সাম্যসাগর-কল্লোলম্ ,ভারতলক্ষ্মী, অথ কিম্, ননাবিতাড়নম্, মাতৃহননম্, মশকধানী, গণেশপূজনম্, সোমপ্রভম্, কুর্যাৎ সদা মঙ্গলম্ প্রভৃতি। এই সব নাটক গুলিতে যেসব চরিত্রের বর্ণনা করেছেন সেই সব চরিত্রগুলিকে দেখে মনে হয় এরা সমাজে পিছিয়ে পড়ার জন্য তাঁদের এই করুণ অবস্থা, অবহেলিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত হতে হয়। তাই শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয় বলেছেন “মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে”<sup>১</sup>। অর্থাৎ এই সব কথার দ্বারা কবিরা বলতে চেয়েছেন, তোমরা শোষিত হইওনা, কেনো সমাজ তোমাদের বঞ্চিত করলেও সততার পথে থাকলে জয় অবশ্যম্ভাবী। এই ভাবে বিভিন্ন গ্রন্থে নানান রকম উপদেশ গ্রন্থকাররা দিয়েছেন। যেমন একটি গ্রন্থ হল - সাম্যসাগর-কল্লোলম্। এখানে তিনি আমাদের একটি শিক্ষা দিয়েছেন, তা হল সকল জীবকে যে সমান দৃষ্টিতে দেখে, সেই প্রকৃত সাম্যবাদী। সাম্যবাদী হওয়ার জন্য বিশেষ কোনো মর্যাদার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ সমাজে ধনবাদীরা যে শুধু ধনীদেরই সম্মানের চোখে দেখবে তা নয়। তারা তাদের মনুষ্যত্বের বিচারে সমাজের পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিদের বা অন্ত্যজদের সমান চোখে দেখবে। এই কথাটি যেন বারবার গ্রন্থকারিকরা তাঁদের রচনার মধ্যে দেখাতে চেয়েছেন। শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের দরিদ্রদুর্দৈবমে পাওয়া যায় -

“নান্যৎ কিমপি! কিম্ অহং হতভাগ্যং করোমি?

দ্বারি দ্বারি নিবারিতোহপি বিচরন্ হা! সারমেয় যথা

দণ্ডং কুত্র চ তণ্ডুলং কিল লভে মুষ্ঠ্যা মিতং কষ্টতং।  
 প্রত্যাখ্যানপরং গৃহস্থনিকরং দুঃশ্রব্যশাপাক্ষরৈঃ।  
 রুক্ষৈরুর্ধ্বরবৈঃ করোমি বিধুরং ত্বাস্থালনং নিষ্ফলম্”<sup>৮</sup>।

এখানে এক হতদরিদ্রের করুণ অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, সে এক মুঠো ভাতের জ্বালায় দুয়ারে দুয়ারে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে, গালি গুনতে হয়েছে ইত্যাদি। এই অবহেলিত অথচ অমূল্য সম্পদের দিকটি সাহিত্যের গবেষকদের দ্বারা বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়নি। অন্ত্যজদের বাসস্থান সম্পর্কে যদি বলা হয় তা হলে বলা যায় সভ্য সমাজ থেকে দূরে অর্থাৎ বন, জঙ্গল, শশ্মান, পাহাড় পর্বতের পাদদেশে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছাদহীন, ধূলোবালি মিশ্রিত পরিবেশে বেড়ে ওঠা এই অন্ত্যজ বা সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের। এদের বাসস্থান, সংস্কার ইত্যাদি দেখে তাদের আদিবাসী নামে আখ্যায়িত করা হয়। তাই তাদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে - “the most exploited section of the pluralist Indian society”<sup>৯</sup> অর্থাৎ তাঁরা বহুত্ববাদী ভারতীয় সমাজ কাঠামোর সবচেয়ে শোষিত জনগোষ্ঠী। রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষ যারা তাদের অর্থাৎ শূদ্রদের যে আদি বাসস্থান তা থেকে অন্যত্র সরিয়ে যেমন -বনজঙ্গল, পাহাড়, পর্বত অধিগ্রহণ করে চাকরি দেওয়ার নাম করে জমিগুলি অধিকার করে নিচ্ছে।

সামাজিক প্রেক্ষিতে আলোচনা করে দেখা গেছে যে সমাজের ‘অন্ত্যজ’ শ্রেণীর মানুষরা কুসংস্কার বাঁধনে বেশি আগ্রহী। অনেক সময় গাছ, নদী, পাহাড়-পর্বতকে দেবী-দেবতা মনে করে পূজো করেন।

আধুনিক নাটকগুলিতে সাম্যবাদ কী সে বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। ন্যায়তীর্থের সাম্যসাগর-কল্লোলম্ নাটকে সাম্যবাদ সম্পর্কে বলতে দেখা গেছে। সূত্রধার যখন বিদূষককে জিজ্ঞাসা করেছেন যে সাম্যবাদী কাকে বলে, তখন বিদূষক এক কথায় সুন্দর ভাবে এর উত্তর দিয়েছেন যে সকল জীবকে যে সমান দৃষ্টিতে দেখে, সেই প্রকৃত সাম্যবাদী। সাম্যবাদী হওয়ার জন্য বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতের সম্পর্ক হওয়ার প্রয়োজন নেই।

সাম্যবাদী কী? সাম্যবাদ বা Communism (ইংরেজি শব্দ), Communis (লাতিন শব্দ) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ সাধারণত চিরন্তন হল শ্রেণীহীন, শোষণহীন, ব্যক্তি মালিকানাহীন এমন একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবাদর্শ বা ধর্ম যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা হলে উৎপাদনের সকল মাধ্যম এবং প্রাকৃত সম্পদ (ভূমি, খনি, কারখানা) রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। সাম্যবাদ হল সমাজতন্ত্রের একটি উন্নত এবং অগ্রসর রূপ, তবে এই বিষয়ে অনেক মতপার্থক্য আছে। উভয়েরই মূল লক্ষ্য হল ব্যক্তিমালিকানা এবং শ্রমিক শ্রেণীর উপর শোষণের হাতিয়ার পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার অবসান ঘটানো। কোন দেশে সাম্যবাদ থাকলে সেখানে ধনী গরিবের ব্যবধান থাকবে না। নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকার নেবে। সাম্যবাদ হল স্বাধীন, সামাজিক ভাবে সচেতন শ্রমজীবী মানুষের উচ্চ মাত্রায় সুসংগঠিত সমাজ, তাতে কায়েম হবে সকলের স্বশাসন। সেই সমাজ সমাজের কল্যাণের জন্য শ্রম হয়ে উঠবে প্রত্যেকের মুখ্য অপরিহার্য প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন উপলব্ধি করবে প্রত্যেকেই। প্রত্যেকের সামর্থ্য নিয়োজিত হবে সর্বসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণের জন্য। সাম্যবাদ ব্যক্তিকে ব্যাপক সামাজিক স্বাধীনতা দেয়। এছাড়াও সাম্যবাদের অন্তর্গত অনেক কিছুই আছে, সাম্যবাদ হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণীর একটা পূর্ণাঙ্গ মতাদর্শে ব্যবস্থা এবং একই সময়ে একটা নতুন সমাজ ব্যবস্থা।

অন্ত্যজদের দিশা ও দশার বর্ণনা করতে গিয়ে অন্ত্যজ বা সমাজে পিছিয়ে পড়ার মুখ্য যে কারণ সেটি হল অর্থনৈতিক অবস্থা। এই অর্থের অভাবে তাদের স্বপ্ন গুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। এদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি লোকগান আছে যা হল নিম্নরূপ -

“মুলুকে নাহি মিলে কাম  
কৈসে বাঁচে প্রাণ? সাঁঝে খালে বিহানে হয় টান।  
পরের ঘর পর খাটালী সকাল হলেই যায় বাগালীরে  
খ্যাটে খ্যাটে পিঁঠে বহে ঘাম  
কৈসে বাঁচে প্রাণ?  
নওয়াগড়ের কুটুম অ্যাল  
খাওয়া - দ্যাওয়া স্যারে গেল  
মাড়ভাতে রাখলই মান  
কৈসে বাঁচে প্রাণ।।”<sup>১০</sup>

অন্ত্যজদের দুর্দশার দিকটি পরিস্ফুটিত করার জন্য আধুনিক নাটকগুলি থেকে কয়েকটি চরিত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন শ্রীজীব ন্যায়াতীর্থের নাটক দরিদ্রদুর্দৈবম্ থেকে বক্রেশ্বর, মন্দোদরী ও তাঁর দুই পুত্রের বর্ণনা। নাটকটিতে দেখা গেছে -

‘কুটিরসম্মুখস্য গ্রাম্যপথ।  
ততঃ প্রবিশতি ক্লেবে ভিক্ষাপাত্র্য বহন যথোক্তো বক্রেশ্বরশর্মা।’<sup>১১</sup>

অতঃপর দেখা গেছে সে বলেছে দারে দারে ঘুরে আমার মতো দারিদ্রের শুধুমাত্র দুর্দশাই আছে। শহরের যে সব ধনী ব্যক্তি রয়েছে তাদের কাছে ভিক্ষে চেয়েও আশানুরূপ ভিক্ষা অর্জন করতে পারিনি। সেই সব সমাজের উচ্চবিত্তদের খিকার জানাই। হরে রাম্।

এই রূপ অনেক দুর্দশার বৃত্তান্ত বক্রেশ্বরের জীবনে নাট্যকার নাটকের মধ্যে দেখিয়েছেন। যেমন - নিজের ভিক্ষালব্ধ চাল নিজে খাওয়ার জন্য লুকিয়ে রেখেছেন, নিজের স্ত্রী পুত্রদের না দিয়ে। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় সে অন্ত্যজ নিপীড়িত একজন দারিদ্র ব্যক্তি।

‘হরে রাম্’। (ইতি কচ্ছবদ্রম্ আকৃষ্য তভুলান্ বধ্নাতি) মন্যে গৃহিণী তনয়ৌ চ কুটিরাদ্ বহিরেব মমাগমানং প্রতীক্ষ্যমাণাস্তিষ্ঠন্তি। যাবৎ পশ্যামি তেষাম্ আচরণম্।’<sup>১২</sup> দ্বিতীয়ত বক্রেশ্বরের স্ত্রী মন্দোদরী নাটকে প্রবেশ করে, দেখা গেছে সে প্রবেশ করেই নিজের দুই পুত্রকে অভাবের তাড়নায় দুই কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন। তাই তিনি বলেছেন - ‘আ হতভাগ্যো!’ ‘কুকুরশাবকোবিব কথং মিথঃ যুধ্যতাম্।’<sup>১৩</sup> অতঃপর দেখা গেছে বক্রেশ্বরকে সে গোষ্ঠীপালক বলে সম্বোধন করলেও বক্রেশ্বরের কিন্তু কোন রূপ চিন্তা নেই পরিবার পরিচালনা করার।

সে নিজের পুত্রদের খাদ্যের জোগান না জিতে পারলেও শাসন করার ক্ষেত্রে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। তাই সে নিজের পুত্রদের গর্দভীর বাচ্চা বলে সম্বোধন করেছেন। ‘(সহসোপসৃত্য) আঃ গর্দভীতনয়ৌ তিষ্ঠতং যাবৎ এতেন ছত্রদণ্ডেন যুবয়োঃ শাসনং করোমি।’<sup>১৪</sup>

কিন্তু দেখা গেছে মন্দোদরী খিদের জ্বালায় ব্যাকুল। তাই বক্রেশ্বরকে কিছুটা ব্যঙ্গ করেই বলেছে যে তুমি তো অনেক খাবার আমাদের দিয়ে গিয়েছিলে। আমরা সেগুলি খেয়ে পেট ভর্তি করে বসে আছি। পুত্র লম্বোদর কিছু আম পাতা খেয়ে বসে আছে। তোমার জন্য কিছু রেখে দিয়েছে।

শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ রচিত অন্য একটি নাটক হল ‘চিপিটক-চর্বণম্’ সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সমাজে যে প্রচলিত নিয়ম কানুনের রূপ পরিবর্তন হয়েছে তা দেখিয়েছেন, দেখানো হয়েছে মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের নিয়ম পরিবর্তন হয়েছে, মানুষ এখন খুব ব্যক্তি কেন্দ্রিক বা আত্মকেন্দ্রিক নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা তাকে তার মমত্ববোধ, ভালোবাসা থেকে কত সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।। রূপকটিতে কয়েকটি চরিত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা - কপালী, রঙ্গিনী, মম্বরা, ভৃত্য, পঙ্গু প্রমুখ। এদের কথোপকথন এবং জীবনযাপনের কাহিনী রূপকটিকে শ্রেষ্ঠ করে তুলেছে।

প্রথমত ‘কপালী’ নামক চরিত্রটি ধনী হওয়ার পরেও সে কিন্তু ধনলোভী, তার মানসিক চিন্তাধারা নিকৃষ্ট মানের। সে একটা ছেঁড়া ছাতা, ছেঁড়া জুতোর জন্য নিজের স্ত্রী-ভৃত্যদের গালিগালাজ করেছেন। ভৃত্যদের লাঠি নিয়ে মারার জন্য উদ্যত হয়েছেন। তাই কপালীকে বলতে শোনা গেছে - ‘অরে সর্বস্বনাশিনি! পতিদ্বেষিণি ! বাচং সংযচ্ছ নোচেত্ত্ব কঠরোধং করিষ্যামি। (ইতি হস্তমুদ্রাং প্রদর্শ্য রঙ্গিনীং প্রতি ধাবতি।)’<sup>৫</sup>

দ্বিতীয়ত ‘রঙ্গিনী’ তার কথাবার্তাতে বোঝা গেছে যে তার স্বামী ধনী হলেও মানসিক দিক থেকে নিকৃষ্ট। সংসার পরিচালনায় তার সহধর্মিনীকে অনেক দুঃখ কষ্ট দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় নারীকে তিনি সবসময় পিছিয়ে রাখতে চান। তাই রঙ্গিনী বলেছেন - আমি সধবা থেকেই আমি কোন স্বর্গে বাস করছি। এই কথার দ্বারাই অনুমান করা যায় যে সে নিজের সহধর্মিনীকে দুঃখ কষ্ট দেন। তাই রঙ্গিনী বলেছেন - ‘জানামি বিধবা স্যামিতি। সধবাপি কিমধুনা স্বর্গে বসামি, বিধবা ভূত্বা কিং পাতালং যাস্যামি?’<sup>৬</sup>

তৃতীয়ত মম্বরা, পঙ্গু প্রভৃতি ভৃত্যদের উপর কপালী নানান রকম অত্যাচার, গালিগালাজ করার পরেও তার কাছে কাজের জন্য রয়ে গেছে। কোন সময়ে তারা প্রাণভয়ে লুকোছে কখনও আবার কপালীকে বাবু বলে সম্বোধন করেছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে তারা সমাজে খুব পিছিয়ে থাকার জন্য বা অর্থাভাবের জন্য অত্যাচারিত শোষিত হওয়ার পরেও দু-মুঠো খাবার আশায় তার কাছেই থেকে গেছে। শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের এই রূপকটি অবশ্যই মম্বরা, পঙ্গুরাম্ প্রমুখ চরিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে সমাজে বেঁচে থাকার জন্য সাহেবদের কাছে অত্যাচারিত, অপমানিত, শোষিত হয়েও সংগ্রাম মুখর হয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

এইরূপ অন্য একটি নাটক হল রাধবল্লভ ত্রিপাঠী দ্বারা রচিত ‘মশকধানী’। মশকধানী নামক গ্রন্থটির সাধারণতঃ অর্থ করলে দাঁড়ায় মশারি অর্থাৎ যেখানে সমাজের উচ্চপ্রতিষ্ঠিত ধনীদের আশ্রয়ের স্থান যেখানে অন্ত্যজদের কোন স্থান নেয়। এখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে সমাজের পূঁজীবাদীরা অন্ত্যজ অর্থাৎ গরিবদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে চলেছে। নাটকটিতে একজনকে বলতে শোনা গেছে যে কোন এক ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীয় তাই যেন তার ওপর রাগ বা অত্যাচার যেন না করা হয়। কারণ তার অনুরোধে শ্রেষ্ঠী নামক একজনের চাকর চাকরিটা পেয়েছে।

অপর অন্য একজন নাট্যকার হলেন নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়। তাঁর নাটকগুলিতেও সমাজে অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চিতদের অনেক লেখালেখি আছে। তার রচিত নাটকের মধ্যে কয়েকটি নাটকের বিষয়বস্তু আলোচনা করা হল। যেমন - নাট্যকার দ্বারা রচিত ‘বাল্মীকিতুলাভম্’ নাটকে কয়েকটি চরিত্রের

উল্লেখ রয়েছে যেমন - পারিপার্শ্বিক, সূত্রধার এবং রত্নাকর প্রমুখ। তাদের মধ্যে রত্নাকরের ভূমিকা নাটকটিতে অপরিহার্য। ‘রত্নাকর’ সমাজের করুণ অবস্থার দিকটি তুলে ধরেছেন। সে সমাজের উচ্চশ্রেণীর কাছে বা মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছেন। হে মহারাজ! আপনি সমাজের এই দৃশ্যগুলি কি দেখতে পারছেন না। চারিদিকে সকলেই খাদ্যের অভাবে রয়েছে। অন্নের অভাবে প্রতিটি গৃহে তারা ভিক্ষা করে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি করতে গেলে সমাজের কাছে এই অসহায় মানুষদের তিরস্কৃত হতে হয়। এই অন্নের অভাবে মাতা পিতা সন্তান সকলেই ক্ষুধার্ত পীড়িত। তাই রত্নাকর প্রথমেই বলেছেন, ধনীদের এই সমাজ কীসের জন্য, যেখানে দরিদ্রদের জন্য অন্ন জোগাড় করতে পারে না। তাই রত্নাকর বললেন -

“ভো ভো অনুচরাঃ! শৃণুত যুয়ম্।

নিহত্য সৰ্বান্ ধনিনো বলেন

নিপাত্য ভূমৌ ধনলুককাংস্তান্।”

“মহারাজ! কথং ন পশ্যামঃ

দিশি দিশি সকলাস্তে খাদ্যপানৈর্বিহীনাঃ

ধনচয়রহিতা ভো মানবাঃ সৰ্বতোহদ্যা।।”

“স্বেষাং পূর্বাভা চিন্তনীয়েব।

প্রতিগ্রহং বয়ং যাতা ভিক্ষাহেতোঃ পুরৈব হি।

তিরস্কৃতাঃ সৰ্বতো হি খাদ্যং নাশুং কথঞ্চন।।”<sup>১৭</sup>

আধুনিক সংস্কৃত নাট্যকারদের মধ্যে আরেকজন হলেন হরিদত্ত শর্মা। তার রচিত অন্যতম একটি নাটক হল - ‘বধূদহনম্’। নাটকটিতে পণপ্রথার মতো একটি সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে নাট্যকার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই পণপ্রথার জন্য দেখা গেছে সমাজে কত দরিদ্র শ্রেণীর অন্তর্গত মানুষ নিজেদের মেয়ের বিবাহ সম্পন্ন করতে না পারার জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছেন। তাই এই কুপ্রথা নাট্যকার নিজের চোখে চাক্ষুস করে খুব ব্যথিত হয়েই নাটকটি রচনা করেছিলেন। সেখানে দেখা গেছে প্রমীলা ও নন্দিতা নামের দুই বোনের গল্প। এক বোনের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরেও শাস্তি নেয়। নন্দিতা অন্য এক ধর্মের ছেলেকে পছন্দ করেন। কিন্তু পাত্রের পিতা কিছুতেই রাজি নেয়, কারণ মেয়ে অন্ত্যজ শ্রেণীর অন্তর্গত। নাট্যকার এইভাবে সমাজের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে সমাজ এখনও অন্ত্যজদের বঞ্চিত করে রেখেছে।

এইরূপ অনেক আধুনিক নাটক আছে যেখানে অন্ত্যজদের জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে অনেক বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে। পরিশেষে বলা যায় প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে কালিদাস, শূদ্রক তথা আধুনিক লেখকদের লেখনীতেও অন্ত্যজদের কঠোর জীবন সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার বর্ণনা পাওয়া যায়। অন্ত্যজদের সামাজিক রীতি-নীতি থেকে আরম্ভ করে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সবদিক দিয়েই সমাজ বঞ্চিত করে রেখেছে। এই সুবিশাল নাট্যগ্রন্থের মধ্যে অনেক ঘটনাই হয়ে উঠেছে ‘কালের দর্পণ’ হিসাবে। সেখানে আলোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রবল প্রতিক্রিয়া, ভয়াবহ বেকার সমস্যা, কদর্য প্রবঞ্চনা, সন্ত্রাসবাদ, নকশাল আন্দোলন, উদ্ভাস্ত সমস্যা, রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি, বিধবাদের বিপন্নতার করুণ অবস্থা, পরিবেশ দূষণ, মনুষ্যত্বের অবক্ষয়, জাতপাতের সমস্যা, মূল্যবোধের সংকট এছাড়াও আরও অনেক সমস্যা নাটকগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে।



**সহায়ক গ্রন্থ:**

১. শাস্ত্রী, শিবনাথ, ‘জাতিভেদ’, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজযন্ত্রে, কলিকাতা, ১২৯১ সাল, পৃ.৪।
২. তদেব, পৃ.৮।
৩. তদেব, মহাভারত / শান্তিপর্ব, পৃ. ৮।
৪. তদেব।
৫. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ‘বাঙালীর সংস্কৃতি’ (৪র্থ মুদ্রণ), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলিকাতা, পৃ.২৮।
৬. বন্দোপাধ্যায়, শৈলেশকুমার, ‘জিন্মা-পাকিস্তান: নতুন ভাবনা’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮৯, ভূমিকা।
৭. চট্টোপাধ্যায়, ঋতা, ‘আধুনিক সংস্কৃত কাব্য: বাঙালী মনীষা শতবর্ষের আলোকে’ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ২০২০, পৃ.২০।
৮. ভট্টাচার্য, পরমেশ ও মাইতি, খোকন (সম্পা.), ‘দরিত্রদুর্দৈবম্’, কলিকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০২১, পৃ.১০৬।
৯. মণ্ডল, অমল কুমার, ‘ভারতীয় আদিবাসী (সমাজ-সংস্কৃতি-সমস্যা-সংগ্রহ-সংকল্প)’, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, দেশ প্রকাশন, ২০২২, পৃ. ২৬।
১০. তদেব, পৃ.২৯।
১১. ভট্টাচার্য, পরমেশ ও মাইতি, খোকন (সম্পা.), ‘দরিত্রদুর্দৈবম্’, কলিকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০২১, পৃ.১০৩।
১২. তদেব, পৃ. ১০৪।
১৩. তদেব, পৃ. ১০৫।
১৪. তদেব, পৃ. ১০৫।
১৫. চট্টোপাধ্যায়, ঋতা ও সেন, সৌম্যজিৎ (সম্পা.), ‘শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ও চিপটক-চর্চনম্’ সংস্কৃত বুক ডিপো, কলিকাতা, ২০১৮, পৃ.৬৮।
১৬. তদেব, পৃ.৬৭।
১৭. মুখোপাধ্যায়, নিত্যানন্দ, ‘দৃশ্যকাব্যসঙ্কলনম্’ প্রথমভাগম্ (শ্রীবাণ্মীকিত্বলাভম্), সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, পৃ.১১-১২।



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 556-562

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.043



## অভিনয় জীবনের উত্থান পতনের আলোচ্য 'নানা রঙের দিন'

রাজেশ সরকার, গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 12.01.2025; Accepted: 24.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*In the tradition of Bengali drama and theatre, playwright Ajitesh Bandopadhyay shines as a pioneering figure. Among the many intellectual and creative dramatists in the long history of Bengali theatre, he stands out for his unique contributions. His play Nana Ronger Din (The Days of Many Hues) is a Bengali adaptation of Anton Chekhov's The Swan Song and is a one-act drama.*

*A work of deep emotional resonance, Nana Ronger Din revolves around the wistful nostalgia that emerges from the fading brilliance of youthful talent, inevitably eroded by time. The protagonist, a once-famous actor, is exhausted by the weight of his past glories. Although the play is based on Chekhov's Swan Song, Bandopadhyay leaves his own distinct artistic imprint on the adaptation.*

*The play asserts that true talent never perishes. Even in the declining years of Rajanikanta, the central character, his artistic essence transcends age and mortality. By embracing emptiness, he surpasses death, dissolving into the vastness of the universe while leaving behind his creative legacy. Nana Ronger Din captures the essence of artistic immortality, ensuring that the multifaceted colors of life continue to shine in the hearts of its audience.*

**Keywords:** Original drama, Nandimukh, Prompter, Chekhov, Bertolt Brecht Arnold Wesker.

বিংশ শতাব্দীর শেষপর্বে বাংলা নাটকের যে স্বর্ণযুগের উত্থান হয়েছিল, তার অন্যতম সৈনিক হিসাবে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর আদি নাম ছিল অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ৩০ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ সালে মানভূম জেলার রোপো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবের জীবনমুখী চেতনা তাঁর মানসপটে ব্যাকুলতা ও প্রবল বাসনা জাগিয়ে তুলেছিল। তার ফলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনকে গ্রহণ করা এবং বিচিত্রমুখী অনুভবকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই ছাত্রজীবন থেকে তিনি নাটক রচনা ও অভিনয় আগ্রহী ছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের মধ্যে যেটুকু পরিচয় আমরা পাই, তা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি

যে, জ্ঞানের চাহিদা বিশেষত জানার মধ্য দিয়ে শেখা অর্থাৎ তাঁর জানবার ইচ্ছাশক্তি কখনো কোন সীমায়িত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। ফলে জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তই ভাবনা, নির্মাণ ও প্রকাশে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। কালক্রমে তাঁর অন্তর্নিহিত অভিব্যক্তিকে নানাক্ষেত্রে সফলভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর স্বল্প জীবনকালের মধ্যেই আমরা নানা প্রতিভাধর বা নানামুখী ব্যক্তিত্বের মানুষ হিসাবে তাঁকে পেয়েছি। কোন একটি পরিচয়ে তাঁর পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিস্ফুটিত হয় না, তা অনেকটা খণ্ডিত রূপ মাত্র। প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা, নাট্যকার, কবি, কথা সাহিত্যিক, অনুবাদক, সুরকার, গীতিকার, নাট্য সমালোচক, ফিচার রচয়িতা ও ব্যঙ্গরসিক-প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বমহিমায় তাঁকে বিচরণ করতে দেখা গেছে। তাই তাঁকে কোন একটি খণ্ডিত রূপের দ্বারা দেখার চেষ্টা করলে তা শুধু পরিমাণগত ভাবে নয়, গুণগতভাবেও আংশিক হয়ে পড়ে। স্বাধীনোত্তর বাংলা থিয়েটারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য নট, নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এর প্রত্যক্ষ অভিনয় নতুন প্রজন্মের কারোরই দেখার সুযোগ হয়নি। চলচ্চিত্রে তাঁর অভিনয় যাঁরা দেখেছেন অথবা দেখবেন তাঁরা অনুভব করবেন অল্পবয়সে এমন এক শক্তিসম্পন্ন শিল্পীর অকাল মৃত্যু কত দুঃখজনক। তিনি মানভূমের মাটি থেকে উঠে আসা লোকায়ত অন্ত্যজ জীবনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি যাঁর ভাষার মধ্যেও মানভূম-সিংভূমের ভাষার স্মৃতি উজ্জ্বল ছিল। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এর নাট্যরচনা মূলত অভিনয়ের প্রয়োজনে, কিন্তু একই সঙ্গে সেসব নাটক শিল্পসার্থকও। নাট্যকার নাট্যনির্দেশক নাট্য প্রযোজক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা আধুনিক নাটক তথা থিয়েটারের একজন স্মরণীয় ব্যক্তি। বাংলা নাট্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী প্রমুখ বাংলা নাটক তথা থিয়েটারের যে অভিমুখ নির্দেশ করেছিলেন পরবর্তী সময়ে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পথেরই পথিক হয়েছিলেন। দীর্ঘ প্রায় ২৫ বছর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা থিয়েটারের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন এবং জীবনের অন্তিম লগ্নেও অভিনয় ছিল তার একমাত্র নেশা ও পেশা। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থিয়েটারের জন্য নিবেদিত প্রাণ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন চরিত্রে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করে গেছেন। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের ক্ষেত্রে 'গণনাট্য সংঘ' থেকে শুরু করে তার নিজস্ব নাট্যদল 'নান্দীকার' ও পরবর্তী সময়ের 'নান্দীমুখ' এ তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর সমগ্র নাট্য সৃষ্টিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়-মৌলিক নাটক এবং রূপান্তরিত নাটক। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু একজন থিয়েটার দল প্রতিষ্ঠাতা বা দক্ষ নির্দেশকই ছিলেন না, তিনি একজন সফল নাটক রচয়িতাও ছিলেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মোট ৩২-টি নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত মৌলিক নাটকের সংখ্যা ৯-টি, অনুবাদ মূলক নাটকের সংখ্যা ১৮-টি এবং ৫-টি নাটক অপ্রকাশিত ছিল। তার রচিত বিখ্যাত নাটক গুলির মধ্যে 'বিদেহী', 'সেতুবন্ধন', 'নানা রঙের দিন', 'বদনাম', 'মঞ্জুরী আমের মঞ্জুরি', 'সওদাগরের নৌকা', 'পাপ-পুণ্য', 'পুতুলের ঘর', 'তামাকু সেবনের অপকারিতা', 'শরতের মেঘ', 'পাছশালা', 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যকৃতির একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে তাঁর রূপান্তরিত নাটক। চেখভে মুগ্ধ অজিতেশ চেখভ ছাড়াও লুইজি পিরানদেল্লো, ব্রেটোল্ট ব্রেখট, আর্নল্ড ওয়েস্কার, কেসার লিং প্রমুখের রচিত নাটক এর সফল নাট্যরূপান্তর করেছেন। বিশিষ্ট নাট্যকার নাট্যপরিচালক, নাট্যসংগঠক অশোক মুখোপাধ্যায় সঠিকভাবেই লিখেছেন-

“এরপর বাদল সরকার, উৎপল দত্ত হয়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র পর্যন্ত এসে পড়েছে বাংলা নাটকের বিস্তারের ঢেউ। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের সমকালের বহু মানুষের চর্চায় বেগবান হয়েছে সেই ধারা।”<sup>১</sup>

আন্তন চেখভ ছিলেন রুশ নাট্যকার। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নানা রঙের দিন' নাটকটি চেখভের 'সোয়ান সং' নাটকের বাংলা রূপান্তর। এটি একটি একাক্ষ নাটক। নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৬-শে ডিসেম্বর। ১৯৬৯ সালে মুম্বাই-এ রবীন্দ্রসদন মঞ্চে 'নাট্যকারের সন্মানে ছটি চরিত্র', 'শের আফগান', 'যখন একা'-এই নাটকগুলির সঙ্গে 'নানা রঙের দিন' নাটকটিও মঞ্চস্থ হয়েছিল। ১৯৭৭ সালে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'নান্দীকার' নাট্যদল ছেড়ে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নান্দীমুখ' গড়ে তোলেন। টলস্টয়ের 'পাওয়ার অফ ডার্কনেস' অবলম্বনে 'পাপপুণ্য' মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত হলেও তাৎক্ষণিক ভাবে মূলত যে নাটকগুলি নিয়ে 'নান্দীমুখ' চলার সিদ্ধান্ত নেয়, তার মধ্যে অন্যতম ছিল 'নানা রঙের দিন'।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নানা রঙের দিন' নাটকটির বেশিরভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে কেন্দ্রীয় চরিত্র আটমট্রি বছরের বৃদ্ধ অভিনেতা রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের স্বগতোক্তি। আর এই স্বগতোক্তির সূত্র ধরেই বেশ কিছু অংশে রজনীকান্তের দুটি সত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কখনও ব্যক্তি রজনীকান্ত, কখনও অভিনেতা রজনীকান্তের জীবন উঠে এলেও শেষপর্যন্ত একই সুতোয় গাঁথা হয়েছে এই দুটি জীবন। রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় পারিবারিক সূত্রে রাঢ় বাংলার সদৃশজাত ব্রাহ্মণ। যৌবনে সুপুরুষ রজনীকান্ত শুধুমাত্র অভিনয়ের নেশায় পুলিশের চাকরিতে ইস্তফা দেন। অভিনয়ের কারনেই প্রেমিকার সঙ্গেও তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে তিনি বুঝতে পারেন তিনি একজন রিক্ত, একাকী মানুষ।

“পৃথিবীতে আমি একা। আমার আপনজন কেউ নেই- বউ নেই, ছেলেমেয়ে নেই, সঙ্গীসাথী নেই, কেউ কোথাও নেই আমি একদম একা, একেবারে নিঃসঙ্গ, কেমন জানো? ধূ ধূ করা দুপুরে জ্বলন্ত মাঠে বাতাস যেমন একা, যেমন সঙ্গীহীন, তেমনি আদর করে একটা কথা বলে, এমন কোন লোক আছে আমার? মরবার সময় মুখে দু-ফোঁটা জল দেয় এমন কেউ নেই আমার।”<sup>২</sup>

বিশাল পৃথিবীতে কোনো স্বজন না থাকার মানসিক যন্ত্রনায় ক্রমাগত বিদ্ধ হতে থাকেন তিনি। গভীর রাতে শূন্য প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চে উপরে সম্পূর্ণ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তার অন্তর সত্তার জাগরণ ঘটে। সেই সত্তাই রজনী বাবুকে অর্থাৎ নিজেকেই শরীরের দিকে নজর দিতে বলে, নিজের বয়সের কথা ভেবে মদের নেশা ছেড়ে দিতে বলে। যখন অন্য প্রবীন মানুষেরা সংযত জীবন কাটান, পরিমান মতো খাওয়া দাওয়া করেন, ঈশ্বরের নাম করেন - তখন মাঝরাতে দিলদারের পোশাক পরে রজনীবাবুর 'পেট ভর্তি মদ গিলে' থিয়েটারি ভাষায় 'আবোল তাবোল' বকা একেবারেই যুক্তিযুক্ত মনে হয় না তাঁর।

পঁয়তাল্লিশ বছর থিয়েটারে জীবন কাটানোর পর রজনীকান্ত জীবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে পুরোনো স্মৃতির মধ্যেও আনন্দকে খুঁজেছেন। 'রিজিয়া' নাটকের বক্ত্রিয়ার কিংবা 'সাজাহান' নাটকের ঔরঙ্গজেবের সংলাপ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তিনি যেন অভিনেতা রজনীকান্তকে জীবিত রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই আবার হতাশা গ্রাস করছে তাকে। ক্রমশ ক্ষয়ে যাওয়ার যন্ত্রনা, জীবন ফুরিয়ে যাওয়ার বা তার অভিনয়ের দিন শেষ হতে চলার যন্ত্রনা তাকে ক্ষত- বিক্ষত করেছে। তার মনে হয়েছে যে, তিনি আসলে একা, কারন সমাজজীবনে অভিনেতার কোনো স্বীকৃতি নেই, সম্মান নেই। বয়সের ভারে ক্রমশ জীর্ণ হয়ে আসা বৃদ্ধ অভিনেতার গলার একদিকে শোনা যায় ব্যক্তিজীবনের একাকিত্বের হাহাকার, অন্যদিকে থাকে অভিনেতা হিসেবে ক্রমশ নিজের ক্ষমতা হারানোর যন্ত্রনা। সেই যন্ত্রনা থেকেই রজনীকান্তবাবু স্মৃতির পথে হাঁটেন। নিজের অভিনয় জীবনের স্বর্ণযুগে অভিনীত উল্লেখযোগ্য চরিত্ররা ভিড় করে তার মনে। পেশাগত

জীবনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনেও সব হারানোর এই হতাশাই চূড়ান্ত হয়ে ওঠে অভিনেতা রজনীকান্তের বাহ্যিক চেতনায়।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নানা রঙের দিন' নাটকটি হল বৃদ্ধ অভিনেতা রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতির স্মৃতি সরণী ধরে অভিনয় জীবনের ফেলে আসা দিনগুলিতে পথ হাঁটা। দিলদারের পোশাক পরে শূণ্য প্রেক্ষাগৃহে মধ্যরাতে যে মানুষটিকে মঞ্চের উপরে দেখা যায় তিনি আপাতভাবে নেশার ঘোরে আছেন; কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি রয়েছেন স্মৃতির ঘোরে। তার অভিনয় জীবনের স্বর্ণযুগ চলে গেছে, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ -এই অবস্থায় স্মৃতির উত্তাপে নিজেকে সঞ্জীবিত করতে চেয়েছেন রজনীকান্ত। মঞ্চের উপরে ফেলে আসা জীবনের পয়তাল্লিশটা বছর তাঁকে নাড়া দিয়ে গেছে। মনে পড়েছে একদিন এই অভিনয়ের জন্যই ছেড়ে আসা জীবনের একমাত্র প্রেমকে। অভিনেতার সামাজিক স্বীকৃতি না থাকা তাকে বেদনা দিয়েছে।

“ও কী বলল জানো? ‘হ্যাঁ, আমি তোমাকে ভালোবাসি, চলো বিয়ে করি, কিন্তু তার আগে তুমি ওই থিয়েটার করা ছেড়ে দাও’ থিয়েটার করা ছেড়ে দেব?... কেন ও যে বড়োলোকের সুন্দরী মেয়ে, থিয়েটারের লোকের সঙ্গে জীবনভর প্রেম করতে পারে, কিন্তু বিয়ে? নৈব নৈব চ! আমার মনে আছে, সে রাত্তিরে কী যে পার্ট করছিলুম, কী যেন কী একটা... বাজে হাসির বই- স্টেজে দাঁড়িয়ে পার্ট করতে করতে হঠাৎ যেন আমার চোখ খুলে গেল। সেই রাতেই জীবনে প্রথম মোক্ষম বুঝলুম যে যারা বলে ‘নাট্যাভিনয় একটি পবিত্র শিল্প’ তারা সব গাধা-গাধা। তারা মিথ্যে কথা বলেন।”<sup>৩</sup>

কিন্তু জীবনের সায়াহ্নে সেই অভিনয়েই অহংকারের উপাদান খোঁজেন রজনীকান্ত। ‘শিল্পকে যে-মানুষ ভালোবেসেছে-তার বার্ষিক্য নেই কালীনাথ, একাকীত্ব নেই, রোগ নেই, মৃত্যুভয়ের ওপর সে তো হাসতে হাসতে ডাকাতি করতে পারে-’<sup>৪</sup>— এ কথা বলেও দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন— ‘আমাদের দিন ফুরিয়েছে।’<sup>৫</sup> দর্শকরা অভিনেতাকে দেখে হাততালি দেয়, কিন্তু সমাজীবিতে সে অভিনেতার কোনো জায়গাই নেই, জীবনপথে তিনি যে ক্লান্ত তাঁর যে এবার অবসরের পালা এসেছে তা তাঁর বুঝতে দেয় না। যতই প্রতিভা থাক আর যতই শিল্পকে ভালোবাসুক না কেন, একদিন প্রত্যেককে তাঁর জায়গা ছেড়ে দিতে হয়। বাস্তবে পদার্পণ করে রজনীকান্তবাবু সেটা উপলব্ধি করলেন, তাঁর চোখে আসল সত্য ধরা পড়েছে। তাইতো তাকে নায়কের অভিনয় থেকে দিলদারের পার্ট করতে হচ্ছে, তাঁর দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, সত্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তিনি কালীনাথকে বলছেন;-

“হ্যাঁ কালীনাথ, আমাদের দিন ফুরিয়েছে। হায়রে প্রতিভা। কোথায় গেল বলো তো? জীবনের পাত্র শূন্যতায় রিক্ত করে দিয়ে, কোথায়, কার কাছে, কোন দেশে গেল প্রতিভা?”<sup>৬</sup>

রজনীকান্ত বাবু বাস্তবকে ভালোভাবে চিনেছিলেন। পাবলিকের মানসিকতা আর অভিনেতাদের জীবন মনভিন্ন পাবলিক মনের খোরাক পেতে অভিনয় দেখতে আসে, আর অভিনেতার আনন্দ দেন। অভিনয় চলাকালীন প্রশংসা পেলেও অভিনয় শেষে তাঁদের কথা আর কেউ মনে রাখে না।

“আজকের শো-তে আমি সাতটা ক্ল্যাপ পেয়েছি দু-বার তো স্পষ্ট শুনেছি, ‘মাইরি, এই না হলে অ্যাকটিং’ কে যেন একবার বললে, ‘দেখেছ, রজনী চাটুজ্জ ইজ রজনী চাটুজ্জ-মরা হাতি সোয়া লাখ।’ তাহলেই বুঝলে কালীনাথ, পাবলিক এখনও কীরকম ভালোবাসে আমাকে? আসলে যতক্ষণ

স্টেজে দাঁড়িয়ে থাকি ততক্ষণ কদর। তারপর যে যার ঘরে যায়, তখন কে কার। কে-ই বা এই বুড়ো মাতালটার খোঁজ করে, বলে, 'উঠুন রজনীবাবু, চলুন, বাড়ি যাবেন?' কেউ বলে না।"<sup>১</sup>

কালীনাথ পুরোনো দিনের কথা ভুলে যেতে বলেন, রজনীবাবু তখনও ভুলতে পারছেন না মনের জ্বালা। যে জীবনটাকে আলাতে ভরিয়ে দেবেন ভেবেছিলেন তা অন্ধকারের পরিপূর্ণ। শক্তিও নেই মনে বল নেই। অতীতের দিকে তাকিয়ে হতাশায় ভরে ওঠে রজনীবাবুর মন। রজনীকান্তের স্মৃতিতে ভেসে ওঠে তাঁর অতীত। অভিনয় করা চরিত্রসমূহ-কখনও 'রিজিয়া' নাটকের 'বক্তার', কখনও বা 'সাজাহান' এর 'ঔরঙ্গজেব' আর তা রোমন্থন করতে করতে রজনীকান্ত ভুলে যান তাঁর আটষট্টি বছরের শোক। তিনি অনুভব করেন প্রতিভার মৃত্যু হয় না। প্রতিভার কাছে বয়স কোনো বাধা নয়।

কালীনাথকে রজনীবাবু বলেন, যে মানুষ শিল্পকে ভালোবেসেছে তাঁর কাছে বার্ধক্য নেই, একাকিত্ব নেই, অসুখ নেই, মৃত্যুভয়কেও সে উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু পরমহুঁর্তে বিষাদ আবার গ্রাস করে ফেলেন রজনীকান্তকে জীবনের পাত্রকে শূন্যতায় রিক্ত করে দিয়ে প্রতিভা বিদায় নিল-এই আক্ষেপই ঝরে পড়ে রজনীকান্তের গলা থেকে কালীনাথ বলতে থাকেন, রজনী চাটুজ্যে চিরদিন বেঁচে থাকবে মরবে না, তিনি পুরোনো দিনের মতোই থাকবেন চিরদিন। রজনীবাবু বুকে টেনে নেন কালীনাথকে আর বলেন, তাঁদের দিন শেষ কালীনাথ জীবনের পাত্রও শূন্য। স্টেজে দাঁড়িয়ে রং মেখে ছেলে ছোকরাদের মতো চং করতে পারেন, কিন্তু ভুললে হবে না তিনি জীবনের আটষট্টি বছর পার করে এসেছেন - এক পা এক পা করে এগিয়ে চলেছেন মৃত্যুর দিকে। সামাজিক জীবনে, ব্যক্তিগত জীবনে যার এত আধিপত্য, এত প্রতিভা এবং সম্মান তাকে তিনি ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন সাধারণ নাট্যরঙ্গমঞ্চে। মানুষকে আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যে, তাদের মনে একটু শান্তি পাইয়ে দিতে, প্রথমে তিনি সাফল্যও পেয়েছিলেন, চারিদিকে কত নাম ডাক কি প্রতিপত্তিই না ছিল তার। কিন্তু এখন তিনি বুঝতে পারলেন সবই মিথ্যা। জীবন সায়াহ্নে এসে তিনি উপলব্ধি করলেন বাস্তব সত্যটাকে। তিনি উপলব্ধি করলেন আর জীবনে ভোর নেই, সকাল নেই, দুপুর নেই, সন্ধ্যাও ফুরিয়েছে এখন শুধু মাঝরাত্রির অপেক্ষা। তিনি নিজেই নিজেকে বলতে লাগলেন;- "আমি লাস্ট সিনে প্লে করব না ভাই, আমাকে ছেড়ে দিন।"<sup>২</sup> ব্যঞ্জনধর্মী এই উক্তিটির মধ্য দিয়ে তিনি মৃত্যুকে বোঝাতে চেয়েছেন। রজনীকান্তবাবু ভাবছেন আর সময় নেই, যেন যমদূত তাকে নিতে চলে এসেছে। মৃত্যুর মুখে যেন দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

প্রেমের ব্যর্থ পরিণতি তাকে জ্ঞানের চোখ খুলে দিয়েছে। তিনি উপলব্ধি করলেন, যারা বলে নাট্যাভিনয় একটি পবিত্র শিল্প, তারা সব গাধা, অভিনেতা মানে চাকর, একটা জোকার, একটা ক্লাউন- এই চরম সত্যের মধ্যে তিনি উপনীত হলেন। তিনি আরও বুঝতে পারলেন এইসব ফাঁকা হাত তালি, খবরের কাগজের প্রশংসা, মেডেল, সার্টিফিকেট এইসব বাজে কথা। রজনীকান্তের কথায় দর্শক যেটা ভাবে তা হলো;- "তুমি তাঁদের কেউ না- তুমি থিয়েটারওয়ালো- একটা নকল নবীশ - একটা অস্পৃশ্য ভাঁড়,-"<sup>৩</sup> তিনি বুঝতে পারলেন দর্শকরা তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করবেন, হাসবেন, চা-সিগারেট খাওয়াবেন কিন্তু এদের সামাজিক সম্মান দেবে না। তাই দর্শকদের, যারা শিল্পকে কদর দিতে জানে না তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন;

জানো, তোমার ওই পাবলিক, মানে থিয়েটারের টিকিট কেনা খদ্দেরদের আমি, কাউকে বিশ্বাস করি না। যাঁরাই পিছনে দুর্নাম করে ঘৃণা করে, তাঁরাই সামনে সাবাশ ও বাহবা জানায়। রজনীকান্তের কথায়,-

“লোকের মুখে শুনলাম, জ্ঞানী ব্যক্তিদের মতে, এইসব দেখেটেখেই নাকি দেশের ছোঁড়াগুলো গোল্লায় যাচ্ছে। তবু যেই স্টেজে নেমেছি, তখন ওইসব জ্ঞানী ব্যক্তিরাই বলেছেন, বাঃ বাঃ দারুণ। কী ট্যালেন্ট।”<sup>১০</sup> থিয়েটারের প্রতি এত দুর্বলতা, ঘৃণা সত্ত্বেও থিয়েটারই তাঁর সব, তার প্রতি ভালোবাসা, স্নেহ, মমত্ব সেটা আজও বিরাজমান। তিনি এখন উপলব্ধি করতে পারছেন, তাঁর প্রতিভা সহজাত আমৃত্যু তার উপস্থিতি।

নাটকের দ্বিতীয় প্রধান চরিত্র হল কালীনাথ সেন। তিনি হলেন থিয়েটারের প্রম্পটার, যার বয়স ষাটের কাছাকাছি। নাটকটিতে কালীনাথবাবু ছোটো ছোটো কিছু ডায়লগ রয়েছে তবে সংলাপ ছোটো হলেও তারই উপস্থিতিতে প্রধান চরিত্র রজনীকান্তের চরিত্রের ভাব উজ্জ্বল হয়েছে। থিয়েটারে প্রম্পটারের দায়িত্ব নিলেও কালীনাথ বাবুর প্রতি থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের তেমন যত্ন ছিল বলে মনে হয় না। কালীনাথ সেন একজন কর্মচারী হলেও তিনি কোথায় রাত কাটাবেন, কীভাবে তাঁর পরিবার চলে, তার খোঁজ কেউ নেননা, তাই তো তিনি নাটকের শেষে রোজ লুকিয়ে গ্রিনরুমে ঘুমান। তাঁর এই আশ্রয় টুকু যাতে চলে না যায় সেজন্য মালিকের কানে বিষয়টি না তোলার জন্য তিনি রজনীকান্তকে অনুরোধ করেন। কালীনাথ বলেন-

“আমি রোজ লুকিয়ে গ্রিনরুমে ঘুমোই চাটুজ্জেশমশাই - কেউ জানে না- আপনি বামুন মানুষ, মিছে কথা বলব না- আপনার পায়ে ধরছি, এ কথাটা মালিকের কানে তুলবেন না চাটুজ্জেশমশাই, আমার শোয়ার জায়গা নেই, একেবারে বেঘোরে মারা পড়ব তাহলে-”<sup>১১</sup>

ভাবতে অবাক লাগে যে এত করুণ দুর্দশার মধ্যে দিয়ে এদের জীবন কাটে। যারা আড়ালে থেকে থিয়েটার পরিচালনায় সাহায্য করে তারাই বঞ্চিত, অসহায়, সহায় সম্বলহীন।

কালীনাথের চরিত্রের প্রধান গুণ হল তাঁর মানুষের দুঃখ অনুভব করার শক্তি ও মানসিকতা। তাঁর সহমর্মিতাবোধ অত্যন্ত গভীর বলেই রজনীকান্তের জীবনের দুঃখের কাহিনী শুনে মনকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন। রজনী চাটুজ্যেকে বলেছেন ‘পুরনো দিনের কথা ভুলে যান চাটুজ্যে মশাই। শুধু শুধু মন খারাপ করে কী হবে’<sup>১২</sup>। ঈশ্বর বিশ্বাসী এই মানুষটি রজনী চাটুজ্যেকে শুধু মুখের সান্ত্বনা শুধু নয়, ঈশ্বরের প্রতিআস্থা রেখে নির্ভরতার কথা বলেছেন। কালীনাথের চরিত্রে মানবিকতার প্রকাশ দেখা যায়। কালীনাথের একটি বিশেষ গুণ মানুষকে উৎসাহ অনুপ্রেরণা দিয়ে দুঃখকে ভুলে থাকার জন্য শক্তি জোগান দেওয়ার ক্ষমতা। হতাশা এবং অবসাদগ্রস্ত রজনীকান্তের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। সেই গভীর রাতে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিতেও চেয়েছেন। ‘আপনার প্রতিভা এখনো মরে নি...’<sup>১৩</sup> এই কথার মাধ্যমে তিনি হতাশ রজনীকান্তকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছেন এককথায় বৃদ্ধ অভিনেতা রজনীকান্তের চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার পার্শ্বচরিত্র হিসাবে প্রম্পটার কালীনাথ সেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। কালীনাথ যে একজন প্রকৃত মানবিক চিন্তের মানুষ নাটকে তার পরিচয়টুকু সুন্দর ও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

অদম্য প্রতিভাবলে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আন্তর চেষ্টার ‘সোয়ান সং’ অবলম্বনে ‘নানারঙের দিন’ রচনা করেন, যার ভাষা ও শিল্পনৈপুণ্য খুবই চমৎকার এবং নাটকের আঙ্গিক ও গঠন খুবই সুন্দর। আসলে এই নাটকটি যেন তাঁর জীবনের প্রতিচ্ছবি, কারণ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নাটক রচনা, অভিনয় ও পরিচালনা করতে গিয়ে নানান বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। নাট্যকার মন্মথ রায় এ প্রসঙ্গে সার্থক মন্তব্য করেছেন-

“অজিতেশ সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা নাট্যচর্চার কোন দেওয়াল আছে বলে সে মনে করতো না। দেশ নয় জাতি নয়, সমাজ নিয়ম ভাষাও নয়। আমি মনে করি নাটক- তার কোন আটক নেই। যেখানে যা ভাল পাব আনব নেব, কুপমন্ডুক হয়ে থাকবো না কখনও। চাই আলো সে যেখান থেকেই আসুক। আদর করে বরণ করবো। অজিতেশও তাই করে গেছে। এবং তা করেই আমাদের নাটককে সমৃদ্ধ করে গেছে।”<sup>১৪</sup>

‘নানা রঙের দিন’ নাটকটিতে রজনীকান্তের চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাঁরই ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নানান বাধাকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেছেন, এবং সাফল্য পেয়েছেন। ‘নানা রঙের দিন’ সেরকমই মঞ্চ সফল অসাধারণ নাটক যা সমস্ত শিল্পগুণ অর্জন করেছে।

### তথ্যসূত্র:

- ১) চ্যাটার্জী, সৌমিত্র কুমার (সম্পাদক), ‘অজিতেশ নাট্য আলোচনা’, নাট্যকথা প্রকাশন বিভাগ, প্রথম প্রকাশ ২০১৮, পৃ. ১৩৪।
- ২) দে, ড. সন্ধ্যা (সম্পাদনা), ‘অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নাটক সমগ্র’ প্রথম খণ্ড, প্রতিভাস প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০২১, পৃ. ৩৪৯।
- ৩) তদেব, পৃ. ৩৫৪।
- ৪) তদেব, পৃ. ৩৫৭।
- ৫) তদেব, পৃ. ৩৫৭।
- ৬) তদেব, পৃ. ৩৫৮।
- ৭) তদেব, পৃ. ৩৫১।
- ৮) তদেব, পৃ. ৩৫২।
- ৯) তদেব, পৃ. ৩৫২।
- ১০) তদেব, পৃ. ৩৫৭।
- ১১) তদেব, পৃ. ৩৫৬।
- ১২) তদেব, পৃ. ৩৫৭।
- ১৩) তদেব, পৃ. ৩৫৬।
- ১৪) চ্যাটার্জী, সৌমিত্র কুমার (সম্পাদক), ‘অজিতেশ নাট্য আলোচনা’, নাট্যকথা প্রকাশন বিভাগ, প্রথম প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ১৩৯।





# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 563-575

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.044



## বাস্তবের দর্পণে বীরভূমের গণনাট্য সংগঠন (১৯৬৯ - ২০২০) : উত্থান ও পরিণতি

ড. অক্ষয় দাস, স্বাধীন গবেষক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 15.01.2025; Accepted: 24.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*In Birbhum district, modern theatre practice was started at the beginning of the last century at the hands of zamindars. Gradually, this new trend emerged from the dead bodies of the district's folk theatre. Initially, the control of this new theatrical genre was in the hands of the zamindars or the rich. However, due to changing socio-economic conditions, within the next few decades, this control started to shift to the hands of people from different strata of society.*

*After independence, district theatre practice started from adolescence to adulthood. The growing influence of the Left movement during this period created a fertile ground for Gananatya (IPTA—Indian People's Theatre Association) in the district. As early as the sixties, the first Gananatya branch, 'Rupantar Gosthi,' sprouted in Birbhum with a short life span.*

*After about ten years, the tide of Gananatya Sangha came to Birbhum district. Many Birbhum branches and preparation branches of the Gananyatya Sangha emerged one by one in the rural and urban areas of the district. Although branches also died prematurely at various times. Apart from the political influence, the changing social order of the last century and the following decades has played an important role in creating the context of this breakdown.*

*The Gananyatya Sangha's nearly forty-year footprint remains in the theatre practice of the entire Birbhum district. In this context, this separate article was written first on the beginning and consequences reasons for Birbhum's Gananatya Sangha will give a clear idea. An informative discussion of the political influence on the district Gananatya also reflects the West Bengal Gananatya Sangh.*

**Keywords:** Theatre of Birbhum, Indian People's Theatre Association, IPTA of Birbhum Political Influence in West Bengal Theatre.

বাম সরকার ১৯৭৭ সালের এলেও উত্তাল সত্তরের দশকের প্রেক্ষাপটে ১৯৬৯ সালেই বীরভূম জেলার প্রথম গণনাট্যের শাখা ‘রূপান্তর গোষ্ঠী’ বোলপুরকে কেন্দ্র করে আত্মপ্রকাশ করে। তবে এই রূপান্তর গোষ্ঠীর রাজ্য কমিটির অনুমোদন ছিল কিনা বা থাকলেও শাখা হিসাবে নাকি প্রস্তুতি শাখা হিসাবে ছিল তা তথ্যাভাবে বলা মুশকিল। এই গোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুজাতা লুনাবৎ ওরফে ফিনকি, বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অঙ্কনের শিক্ষক প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় ও প্রতিভা সিংহ রায়। সুজাতা দেবীর বাড়িতেই রূপান্তরের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হত। কৃষক আন্দোলনের উপর ‘রক্তে বোনা ধান’ হল এই গোষ্ঠীর একপ্রকার প্রথম প্রযোজনা। নির্বাচনী প্রচারমূলক এই প্রযোজনা একাধিক গ্রামে উপস্থাপিত হয়। একবার পাঁচশোয়ার পালপাড়ায় ‘রক্তে বোনা ধান’ অভিনীত হওয়ার পরে ফেরার পথে সমাজবিরোধী বা দুষ্কৃতীদের ছোড়া বোমার আঘাতে মারাত্মক জখম হন। বোমার আঘাতে গাড়ি চালকের একটি কান উড়ে যায়। এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে খুব সম্ভবত এটিই ছিল বীরভূম জেলায় নাট্যকর্মীদের উপর প্রথম রাজনৈতিক আক্রমণ। রূপান্তরের অন্যতম সারা জাগানো প্রযোজনা ১৯৬০ সালে প্রকাশিত মাক্সিম গোর্কি-র উপন্যাস ‘দ্য মাদার’ অবলম্বনে ‘মা’, যা প্রথম মঞ্চস্থ হয় বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে। মুখ্য চরিত্রে ছিলেন সুজাতা লুনাবৎ। এছাড়াও এই রূপান্তরের অন্যান্য প্রযোজনাগুলি হল- জুলিয়াস ফুচিক (১৯৭০), কঙ্গোর কারাগারে (১৯৭০), রক্তাক্ত রোডেসিয়া (১৯৭৫) প্রভৃতি। সত্তরের দশকের প্রারম্ভে প্রবল রাজনৈতিক অস্তিরতায় এই নাট্যদলের নাট্যচর্চা বিবিধ কারণে বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে। নাট্যকর্মীদের উপর রাজনৈতিক আক্রমণের ঘটনাও ঘটতে থাকে। রাজনৈতিক সন্ত্রাসের আবহে ১৯৭৪-৭৫ সাল নাগাত রূপান্তরের নাট্যচর্চা স্তিমিত হতে হতে বন্ধ হয়ে যায়।

রাজ্যে বাম সরকার আসার পরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল হলে জেলায় গণনাট্য সংগঠনের কর্মকাণ্ড ধীরে ধীরে শুরু হয়। সেই সূত্রেই ১৯৮১ সালে ভারতীয় গণনাট্যের বীরভূম জেলার বোলপুর শাখা ‘উত্তরণ’ আত্মপ্রকাশ করে।<sup>১</sup> ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত উত্তরণই তখন জেলার একমাত্র অনুমোদিত গণনাট্যের শাখা। ১৯৮৬ সালে গণনাট্যের জেলা সভাপতি হন পাইকরের দুর্গাপদ ঘোষ, সম্পাদক হন দিব্যেন্দু চ্যাটার্জী ও জেলা কমিটির সদস্য হন দুবরাজপুরের মধুসূদন কুণ্ডু। মূলত এর পর থেকেই জেলায় গণনাট্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুসারে বীরভূমে ১৯৮৭ সালে ১ থেকে শাখা/দল সংখ্যা বেড়ে হয় ৪টি (উত্তরণ, রুদ্রবীণা, কস্তুরী, দুন্দুভি), প্রস্তুতি শাখা সংখ্যা হয় ৩টি (নলহাটি, মল্লারপুর ও দুবরাজপুর) এবং মোট সদস্য সংখ্যা হয় ১২৭টি।<sup>২</sup> মনে রাখতে হবে এই বছর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২৫১টি পেয়ে তৃতীয় বার ক্ষমতায় আসে।<sup>৩</sup> ১৯৮৮ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর সিউড়ী শহরে প্রথম গণনাট্যের জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই বছর সেপ্টেম্বর হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত জেলা কমিটি ৪টি সভা করে। ১৯৮৮ সালে শাখা সংখ্যা বেড়ে হয় ৫ টি (দুবরাজপুরের ভিক্টরজারা প্রস্তুতি শাখা থেকে শাখা পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়), প্রস্তুতি শাখা সংখ্যা হয় ৩টি (নতুন সংযোজন- মল্লারপুর) এবং মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১৮৩টি (শাখাগুলির সদস্য সংখ্যা ১৩০ জন)।<sup>৪</sup> ১৯৮৮-৮৯ সাল নাগাত গণনাট্যের জেলা কমিটির সভাপতি হন দুর্গাপদ ঘোষ ও সম্পাদক হন মধুসূদন কুণ্ডু (শ্রী কুণ্ডু ২০০৯ পর্যন্ত এই পদে ছিলেন)। ১৯৮৯ সালে দুর্গাপদ ঘোষ, মধুসূদন কুণ্ডু ও দিব্যেন্দু চ্যাটার্জী গণনাট্যের রাজ্য কমিটির সদস্য হন। এই বছর সহ ১৯৯০ এবং ১৯৯১ সালে জেলা কমিটি প্রতি বছর ৯টি করে সভা করে। ১৯৯২ সালে হয় ৫টি সভা। ১৯৯৩

সালে সিউড়ীতে নভেম্বর মাসের ৩ ও ৪ তারিখ গণনাট্যের দ্বিতীয় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই বছর অক্টোবর পর্যন্ত ৬টি সভা হয়। এই সময় গণনাট্যের শাখা ছিল ৮টি (নতুন-অনির্বাণ, কেতন, মাদল) ও প্রস্তুতি শাখা ছিল ১টি (ঘুড়িমা) এবং মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ২২১ জন (শাখাগুলির সদস্য সংখ্যা ১৮০ জন)। উল্লেখ্য এই সময়ে দুন্দুভি শাখা এবং মল্লাপুত্র, আমোদপুর, লাভপুর, নানুর ও রাজনগর প্রস্তুতি শাখাগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। পরিসংখ্যানের বাইরে বেরিয়ে আমরা এই সময়ে বীরভূমের গণনাট্যের প্রকৃত অবস্থার দিকে একবার চোখ রাখার চেষ্টা করি। এই বিষয়ে ২য় সম্মেলনের জীর্ণ ও কীটদষ্ট প্রতিবেদনের মূল্যায়ন সর্বাপেক্ষা সহযোগী হয়ে উঠেছে। এই প্রতিবেদনে যে কপি উদ্ধার হয়েছে তার বেশ কিছু স্থান জীর্ণ ও কীটদষ্ট হওয়ার ফলে কিছু শব্দ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। প্রতিবেদনে থেকে জানা যাচ্ছে সেই সময়ে (১৯৯৩) বীরভূমে গণনাট্য সংঘের এমন অনেক শাখা ছিল যারা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সাহায্য বা সহযোগিতা না পেলেও নিজেদের উদ্যোগে প্রশংসনীয় কাজ করছিলেন। কিন্তু সেই সাথে তখনকার একাধিক সক্রিয় শাখাগুলির কাজ যে মোটেও আশানুরূপ ছিল না তাও স্পষ্টতই জানা যায়। প্রতিবেদনে লেখা হচ্ছে- ‘এ ঘটনাও সত্য যে অনেক শাখা ও সদস্য ধারাবাহিক ভাবে সক্রিয় নয়। এঁদের কাজকর্ম অনেকটা দায়সারা গোছের। আর এক অংশের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার অভাব নেই বটে; কিন্তু উন্নতমানের নাটক-গান সৃষ্টিতে কিংবা গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক শিবিরে অগ্রণী ভূমিকা পালনে এরা নিজেদের উন্নীত করতে পারছে না। এইভাবে হিসাব করলে দেখা যাবে সামগ্রিক ভাবে উন্নতমানের শাখার সংখ্যা কম’<sup>৬</sup>। পাশাপাশি শাখাগুলি পরিচালনাতেও এই সময় যে খামতি ছিল সেটিও প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট হয়েছে- ‘শাখাগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষায়, শাখা সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে জেলা নেতৃত্বের বেশী ভাগ সদস্যদের নিষ্ক্রিয়তার অভাবে ২-৩ জনের উপর সমস্ত বোঝা চাপে। ফলতঃ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের পর শাখায় সিদ্ধান্তগুলি অবহেলিত হয়’<sup>৭</sup>। এখান থেকেই স্পষ্ট যে ১৯৯৩ সালে জেলায় গণনাট্যের বিস্তার ঘটলেও সংগঠনের তৃণমূল স্তরে পরিকাঠামো মোটেও খুব একটা শক্তপোক্ত ছিল না। সাংগঠনিক সমস্যা বা খামতি নিয়ে জেলায় গণনাট্যের তৎকালীন সাব-কমিটিগুলির প্রসঙ্গে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। নিম্নে সাব-কমিটিগুলি নিয়ে সেই সময় করা পর্যালোচনার অংশবিশেষ তুলে ধরা হল-

‘রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত মত নাটক-গান অন্যান্য আঙ্গিক ও পত্রিকা এই চারটি সাব-কমিটির মধ্যে। নাটক-গান এই দুই সাব-কমিটি ছাড়া জেলা স্তরে আর কোন সাব-কমিটি গঠন করা সম্ভব হয়নি। বাস্তব কতগুলি অসুবিধা এজন্য দায়ি। নাটক-গান ইত্যাদি রচনার প্রাথমিক অনুমোদন দেওয়ার দায়িত্ব জেলা কমিটির। শাখা কমিটিগুলোকে বারবার নাটক-গানের দুটি করে কপি পাঠিয়ে অনুমোদন নিতে বলা হয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে শাখা নিজেসই অনুমোদনের কাজটা করে ফেলে। ফলতঃ গুণগত মান নিয়ে আলোচনা করার পূর্বেই নাটক-গান প্রযোজনা হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে জেলা সাব কমিটি গঠন হবার পর আজ পর্যন্ত একটি সভাও হয় নি। শাখা থেকে নাটক-গানের অনুমোদন দেবার জন্য মাঝে মাঝে এলেও যথা সময়ে আসে না এবং সাব-কমিটির ফাংসানিং এর অভাবে অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্বলতা থেকে যায়। আন্দোলনের পটভূমিতে আমাদের নাটকগুলি সাধারণতঃ লেখা হয়, ফলে অনুমোদন ঠিক সময়ে না হলে আন্দোলনে অংশগ্রহণের গুরুত্ব আর থাকে না। অনেক সময় ১-২ জন জেলা নেতৃত্বকে দেখিয়ে অনুমোদন নেওয়া হয়। যান্ত্রিকভাবে শুধু অনুমোদন হল বা হল না এটুকু জানিয়ে দিলে নতুন সম্ভবনাময় উৎসাহী নাট্যকার

গীতিকাররা কিছুই লাভবান হন না। আমাদের দরকার নাট্যকার গীতিকারদের রচনার ত্রুটি দুর্বলতা নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করা।...'<sup>৭</sup>

উপরোক্ত অংশবিশেষ থেকে আরও একটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়, সেটি হল নিজেদের তৈরি নাটক ও গানগুলির অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়ে শাখাগুলির তীব্র অনীহা। এটা কি নিছকই সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য সমন্বয়ের অভাব? নাকি নেতৃত্বের কাছে নিজেদের তৈরি শিল্প বা শিল্পচর্চার তথা গান-নাটকের অনুমোদনের বিষয়টি নিয়ে প্রথম থেকেই শাখাগুলির মধ্যে তৈরি হওয়া প্রশ্ন, সংশয়, আপত্তির ও চোরা ক্ষোভের গোপন প্রতিফলন?

সেই সময় বীরভূম জেলার গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বদের সক্রিয়তা ও যোগ্যতা নিয়েও কি আভ্যন্তরীণ সমস্যা বা প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল! আমরা ২য় সম্মেলনের প্রতিবেদনের 'জেলা সংগঠন' ও 'নাটক সম্পর্কে মূল্যায়ন' নিয়ে পর্যালোচনা অংশে তারই যেন ইঙ্গিত পায় হয়ত। সেখানে বলা হয়েছিল-

'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং এলাকাগত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে গণনাট্য সংঘ হিসাবে আমাদের নিজস্ব কর্মসূচী নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্বলতা আছে। নিজস্ব কর্মসূচী গ্রহণের অন্যতম তাৎক্ষণিক(?) নাটক-গান ইত্যাদি নিয়ে প্রচারে অংশগ্রহণ করা। এজন্য নাট্যকার গীতিকারদের রচনাকর্মে \_\_\_\_\_(পড়া যাচ্ছে না) করতে হয়, এবং ভালো রচনাগুলিকে শাখার দ্বারা প্রযোজনা ও পরিবেশনার উদ্যোগ নিতে হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে নেতৃত্বের প্রত্যেককে বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। শুধুমাত্র সার্কুলার দিলেই সব সময় কাজ হয় না। নাট্যকার গীতিকার শিল্পীদের যেমন নিজস্ব উদ্যোগ ও সৃষ্টির জন্যে বিপ্লবী আবেগ থাকা দরকার তেমনি তাদের মধ্যে উদ্যোগ ও আবেগ সৃষ্টির জন্যে আমাদের মত সংগঠনে নেতৃত্বেরও ভূমিকা থাকা দরকার।...সামগ্রিক ভাবে নাটক প্রযোজনার ব্যাপারে আমরা যে ত্রুটিগুলি লক্ষ্য করেছি-

- ১) নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে সামগ্রিক শিল্প ভাবনার অভাব। যেমন- অভিনয়, আলো, মঞ্চ, দৃশ্যসজ্জা, আবহ ইত্যাদির ঠিকমত ব্যবহার।
- ২) নাটক প্রযোজনা করতে অনুশীলনের অভাব।
- ৩) নাটকের বিষয় উপলব্ধি করতে না পারা।
- ৪) রাজনৈতিক ডাক এলেই নাটকের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া, মহলা কক্ষে যাওয়া। তার মাঝে আর কিছু অন্য কাজ সেরে নিয়ে দায়সারা গোছের একটা প্রযোজনা মঞ্চস্থ করতে পারলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সফল হল বলে মনে করা। এ ধারণা ভ্রান্ত। অনুশীলন, চর্চা, পড়াশুনা ইত্যাদি করার ধারাবাহিকতা নেই। এসবের জন্য ধারাবাহিক ভাবে নাটক প্রযোজনাও করা যায় না।
- ৫) নিজেদের গণ্ডির মধ্যে অনুষ্ঠান প্রচার করার প্রবণতা। এবং এই ভাবে অনুষ্ঠান করাকেই মনে করি জনগণের মধ্যে আদর্শ প্রচারের দায়িত্ব পালিত হল। জনগণের পছন্দ অপছন্দ বিষয় দেখি না। এই কারণে নতুন সৃষ্টির তাগিদও অনুভব করি না।'<sup>৮</sup>

অর্থাৎ বোঝায় যাচ্ছে ১৯৯৩ সাল নাগাত বীরভূম জেলায় গণনাট্যের বিস্তার হলেও সাংগঠনিক দুর্বলতা বা খামতি, সমন্বয়ের অভাব, শাখা ও প্রস্তুতি শাখার কর্মীদের সার্বিক সক্রিয়তার অভাব, গণনাট্যের আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে জেলার প্রেক্ষিতে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ঘাটতি, সার্বিক ভাবে নাটকের গুণগত মানের অভাবের মত ফালাভমেন্টাল কতগুলি সমস্যা ছিলই। কিন্তু ১৯৯৩ সালের পরবর্তী সময়কালে জেলায় গণনাট্যের অবস্থা বিচার করলে আমরা দেখতে পাবো যে, এই সমস্যাগুলি নিরসনের বদলে তা জেলার গণনাট্য

সংগঠনের অন্দরমহলে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েই থেকে গিয়েছে শুধু তাইই না - উত্তরোত্তর সেগুলির শাখা প্রশাখা প্রসারিত হয়ে সংগঠনের ভিত্তি নড়বড়ে করে দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ১৯৯১ সালে শাখা কমিটির অনুমোদন পাওয়া রামপুরহাটের গণনাট্যের শাখা ‘কেতন’ থেকে দলেই প্রতিষ্ঠাতা অমিতাভ হালদার জেলা স্তরের নেতৃত্বের সাথে মতানৈক্যের কারণে দল থেকে সরে এসে ১৯৯৮ সালে রামপুরহাটে নাইয়া দলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৯৯ সালের ২২শে মার্চ রেলমঞ্চে প্রথম প্রযোজনার প্রথম অভিনয়।<sup>৯</sup> এবং যে প্রযোজনা দিয়ে নাইয়ার আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ হয়েছিল সেই ‘হাজার চুরাশির মা’ দেখার জন্য দর্শক ব্ল্যাকে টিকিট পর্যন্ত কেটেছিলেন।<sup>১০</sup> ব্ল্যাকে টিকিট কেটে নাটক দেখার নজির এখনও পর্যন্ত বীরভূমে বিরল। সন্দেহ নেই সংগঠনের আভ্যন্তরীণ একাধিক সমস্যার কারণে অমিতাভ হালদারের মত একাধিক যোগ্য নাট্যজনকে বীরভূম জেলার গণনাট্য হারিয়েছিল।

৯৩ সালের পরে ১৯৯৯ সালে হওয়া ৩য় সম্মেলনের প্রতিবেদন না পাওয়া গেলেও আমরা এই সময়ে বীরভূমে গণনাট্যের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পেতে ২০০২ সালে নলহাটিতে অনুষ্ঠিত ৪র্থ জেলা সম্মেলনের প্রতিবেদনের সাহায্য নিতে পারি। উক্ত প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে ৩য় জেলা সম্মেলনে ১৯ জনকে নিয়ে মঞ্চ থেকেই জেলা কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তী সভায় একজনকে কো-অপ্ট করে জেলা কমিটির সদস্য সংখ্যা হয় ২০ জন। কিন্তু সম্মেলনের পরে ধারাবাহিক নিষ্ক্রিয়তার জন্য শাখা স্তরে চলে যান ২ জন সদস্য। এছাড়াও শারীরিক অসুস্থতার জন্য ১ জন ও আরও ১ জন কারণ না দেখিয়ে পুনঃনবীকরণ করেন নি। রাজ্য কমিটির ২ জন সদস্য ছাড়া ১৪ জন জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন ২০০২ সালে। উল্লেখ্য এই সময় (২০০২-০৩) গণনাট্যের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হন মধুসূদন কুণ্ডু। ৪র্থ জেলা সম্মেলনে জেলা কমিটির জন্য ২৩ জন সংখ্যার অনুমোদন হয়। সম্মেলন থেকে ২১ জন নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে সক্রিয়তা দেখে আরও দুজনকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। উল্টে নিষ্ক্রিয়তার জন্য দুজন শাখা স্তরে চলে যান এবং একজনের আদর্শগত বিচ্যুতির কারণে পুনঃনবীকরণ করা হয়নি। ফলে পরবর্তী সম্মেলন (২০০৭ সালের ৫ম সম্মেলন) এলে দেখা যায় রাজ্য কমিটির তিনজন সদস্য বাদে জেলা কমিটির সদস্য ১৫ জন।

২০০২ সালের জেলায় গণনাট্যের অনুমোদিত শাখার সংখ্যা ও প্রস্তুতি শাখা/কমিটির সংখ্যা ১০টি করে।<sup>১১</sup> এই সময়ের নতুন শাখা হল- চিনপাইয়ের ‘একতারা’, পাঁড়ুইয়ের ‘ঐক্যতান’ ও খয়রাশোলের ‘নির্মাণ’। ১৯৯৩ সালে প্রস্তুতি শাখার সংখ্যা যেখানে ছিল মাত্র ১টি সেখানে ২০০২ সালে নতুন প্রস্তুতি শাখা হয় ১০টি। সেই প্রস্তুতি শাখাগুলি হল- নগরীর ‘কোরক’, রূপপুরের ‘গণনিশান’, কাপিলার ‘ছায়ানট’, কুরুমগ্রামের ‘ঝঙ্কার’, বক্রেস্বরের ‘রাঙামাটি’ (বক্রেস্বর থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্ট), ইলামবাজারের ‘প্রয়াস’, বড়রা, মহম্মদবাজার, রাজনগর ও হেতমপুর। ১৯৯৩ সালে ঘুড়িষা প্রস্তুতি শাখা হিসেবে থাকলে ২০০২ সালে শাখা বা প্রস্তুতি শাখা হিসেবে তার নাম নেই। এক্ষেত্রেও শাখা হিসাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়াই মূল কারণ আশা করি। এই সময়ে প্রস্তুতি শাখাও অনেকগুলিই বেড়েছে। যা থেকে এই সময়ের গণনাট্যের বিস্তার বোঝা যায়। কিন্তু বিস্তার তুলনামূলক ভালো হলেও প্রশ্ন থেকেই যায় শাখা ও প্রস্তুতি শাখা/কমিটিগুলির স্বাস্থ্য কেমন ছিল? ২০০২ সালে সম্মেলনের প্রতিবেদনে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। সেখানে বলা হচ্ছে - ‘কয়েকটি শাখা/প্রস্তুতি কমিটি নিয়মিত কাজ করেছে, কাজগুলির মান সম্পর্কে সমালোচনা হয়ত আছে কিন্তু আন্তরিক ভাবে, ভাল কাজ করার প্রচেষ্টা তারা চালিয়ে যাচ্ছে। আবার এটাও

লক্ষ্য করা যাচ্ছে বেশ কিছু শাখা প্রস্তুতি কমিটি ধারাবাহিক ভাবে নিষ্ক্রিয়। নির্বাচনের সময় এদের মধ্যে খানিকটা সচলতা দেখা যায়। স্থূলমানের প্রোডাকশন নিয়ে কিছু অনুষ্ঠান এবং কিছু দেওয়াল লিখনের মধ্যে দিয়ে গণনাট্য সংঘের কর্তব্য পালন করছেন বলে মনে করেন। সারাবছর কোন শিল্পকর্ম করেন না বললেই চলে।...সময়ের দাবির তুলনায় পর্যাপ্ত না হলেও বিগত বছরগুলিতে রুদ্রবীণা/ভিক্টরযারা/উত্তরণ/মাদল/অনির্বাণের মত শাখাগুলির গান, নাটকের ক্ষেত্রে কয়েকটি উন্নতমানের প্রোডাকশন জেলার গর্ব বলে আমরা মনে করি। নাটকের ক্ষেত্রে রুদ্রবীণা শাখার ‘রোশনারার বন্দুক’, ‘একবচন বহুবচন’, ভিক্টরজারা-র ‘দ্বাদশ ভক্ত্যা চাডুম’, ‘অথ কৃষ্ণ কথা’ ঘোষণা পত্রের মূল সূত্র ও সুরকে ধরে প্রযোজনা উৎকর্ষতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এই প্রযোজনাগুলি নির্মাণের জন্য যে উদ্দীপনা, শ্রম শাখার সদস্যদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তার ধারাবাহিকতা থাকেনা<sup>২১</sup> অর্থাৎ হাতেগোনা পরিচিত কয়েকটি শাখা ছাড়া গুণগত মানের বিচারে কোন শাখাই যে সেভাবে প্রযোজনা নির্মাণ করতে পারেনি তা স্পষ্ট। বীরভূমে গণনাট্যের সাংগঠনিক অবস্থার কথাও আমরা জানতে পারি এই প্রতিবেদন থেকে। বলা হচ্ছে- ‘বিগত সম্মেলনের পরে প্রযোজনা ও পরিবেশনার উত্কর্ষ সাধনের জন্য আমরা সংগীত, নাটক, পত্রিকা এবং পরবর্তীকালে প্রচার ও প্রকাশনা মোট চারটি উপসমিতি গঠন করেছিলাম। প্রথমদিকে সংগীত ও নাটক উপসমিতি দুটি কিছুটা সক্রিয় হলেও ধারাবাহিকতা থাকেনি। সার্থক পরিকল্পনা রচনা ও শিল্প সৃজনের গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে উপসমিতিগুলির সক্রিয়তা জেলা কমিটির কর্মসূচী রূপায়নে উল্লেখযোগ্য সহায়তা করতে পারে। কিন্তু জেলাকমিটি ও শাখাগুলির সাথে উপসমিতিগুলির পারস্পরিক যোগাযোগের ভিত্তি স্থাপিত না হওয়ায় উপসমিতিগুলি গঠনের উদ্দেশ্য সার্থক হতে পারে নি।’<sup>২০</sup>...’ তাহলে ১৯৯৩ সালে জেলা সম্মেলনের প্রতিবেদনে বীরভূম জেলার গণনাট্য সংঘের সংগঠনে যে যে দুর্বলতাগুলি ছিল সেগুলি নয় বছর পরেও ২০০২ সালেও বর্তমান ছিল। বিশেষত সংগঠনের অভ্যন্তরে সমন্বয়ের অভাব যার প্রভাব কোথাও গিয়ে শাখাগুলির উপরেও পড়ে ছিল নিশ্চই। বলা বাহুল্য এই অভাব বা সমস্যা পরবর্তী দশ বছরে নিরসন হওয়ার পরিবর্তে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল।

২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে গণনাট্যের বীরভূম জেলার ৫ম সম্মেলনে মুদ্রিত খসড়া সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের পর্যালোচনায় (নাকি আত্মসমালোচনা?) বলা হয়েছে- ‘উদ্বেগের বিষয় হলো সম্মেলন আসে, সম্মেলন যায়। সম্মেলনের আগে, ভোটের আগে আমরা একটু বেশী নড়েচড়ে উঠি। সম্মেলনে গৃহীত প্রতিবেদন বাস্তবে কতটুকু কার্যকরী হয়। আমরা যদি পিছনের দিকে তাকাই, দেখবো একই কথা - একই আলোচনা - একই সিদ্ধান্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় আমরা বারংবার করে চলেছি। কেউ কেউ গৃহীত প্রতিবেদন অনুযায়ী চলার চেষ্টা করছেন। ঘোষণা পত্রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নতুন করে ভাবছেন, কিন্তু সামগ্রিক চেহারা তা নয়। ঘোষণাপত্রকে সামনে রেখে একসাথে ভাবার, একসাথে কাজ করার দৈন্যতা যদি আমাদের থেকে যায়। সর্বোপরি সঙ্কীর্ণ গণ্ডির বাইরে পা ফেলার সত্যিকারের কোন সদিচ্ছা যদি আমাদের না থাকে গুলিয়ে দেওয়া সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মানুষের কাছে আমরা পৌঁছতে পারবো কি।’<sup>২৪</sup> উপরোক্ত এই অংশেই বোধ করি জেলা গণনাট্যের তৎকালীন অবস্থা ফুটে উঠেছে যেখানে দেখা যাচ্ছে পুরানো ব্যাধি নিরাময়ের বদলে ব্যাধির প্রকোপ বেড়েছে। এমনকি ৫ম সম্মেলনের প্রতিবেদনে পূর্ব প্রতিবেদনগুলির মত শাখা বা প্রস্তুতি শাখা সৃষ্ট নাটক ও গানের কোন তালিকা তো নেইই উল্টে নাটক ও গান নিয়ে কোন পর্যালোচনাও করা হয়নি। ৫ম সম্মেলনের প্রতিবেদনে নাটক ও গানের এমন অনুপস্থিতি কি কেবলই অসচেতনতাবশত বা অনিচ্ছাকৃত? নাকি জেলা কমিটির সাথে শাখাগুলির দুর্বল যোগাযোগের ফলে অথবা অধিকাংশ শাখার

সক্রিয়হীনতার ফলে শাখা বা প্রস্তুতি শাখা অভিনীত নাটকের তালিকা জেলা কমিটির কাছে না পাঠানো? এরই উত্তর আমরা পাই উক্ত প্রতিবেদনে। সেখানে বলা হয়েছিল-

‘সংখ্যার বিচারে আমরা কিছুটা এগিয়েছি। কিন্তু ভালো সংগঠন শুধু সংখ্যার বিচারে হয়? ভালো সংগঠন গড়তে গিয়ে আমরা কোন কোন সমস্যার মুখে পড়ছি - এই প্রশ্নের উত্তর সেদিনও যা ছিল আজও তাই আছে।

- ১) সম্পাদকমণ্ডলী - জেলা কমিটি - শাখা কমিটির যোগাযোগ দুর্বল।
- ২) উপসমিতিগুলি সক্রিয় নয়।
- ৩) শাখাগুলি শাখার সভার রিপোর্ট বা কাজ কর্মের রিপোর্ট জেলা কমিটিতে দেন না।
- ৪) অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাখার শিল্পীদের রচিত নাটক-গান জেলায় জমা পড়ে না।
- ৫) জেলা কমিটির অধিকাংশ সদস্য দায়িত্ব পালনে অজুহাত খোঁজেন। সভা কম হয়, হলেও গড় উপস্থিতি ৬ থেকে ৮ জন। সম্পাদক মণ্ডলী ভাল ভাবে হয় নি নিয়মিত উপস্থিতি না থাকায়।
- ৬) অধিকাংশ সদস্য অন্যান্য সংগঠনের কাজে ব্যস্ত থাকায় গণনাট্য সংঘে সময় দিতে পারছেন না।
- ৭) অধিকাংশ শাখার সভা প্রায় হয় না। হলেও দায়সারা গোছের। জেলার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার ক্ষেত্রেও উদাসীনতা দেখা যায়।
- ৮) সংগঠনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কর্মসূচী সম্পর্কে অধিকাংশ সদস্যের ধারণা পরিষ্কার নয়।
- ৯) অধিকাংশ শাখায় জেলা থেকে দেওয়া ইস্যু ভিত্তিক অর্থকোটাও দেন না।
- ১০) সমস্ত স্তরের তহবিলের অবস্থা খুবই খারাপ।<sup>২৫</sup>

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে দেখা যাচ্ছে সূচনার দিনগুলি থেকে বীরভূমের গণনাট্য সংঘ যে সকল সমস্যায় জর্জরিত সেগুলি ২০০৭ সালে এসেও প্রাসঙ্গিক - বরং বেশী করে প্রাসঙ্গিক হয়ে বোধ হয় মহামারীর আকার নিয়েছিল। কিন্তু যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল জেলাতে গণনাট্যের দীর্ঘ প্রায় কুড়ি বছরের যাত্রা পথের পরেও যখন মূল সমস্যাগুলির মধ্যে গণনাট্যের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মসূচী সম্পর্কে অধিকাংশ সদস্যদের পরিষ্কার ধারণার অভাব দেখা দিচ্ছে তখন বিস্মিত হতে হয়। উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মসূচী সম্পর্কে ধারণা না থাকলে আদর্শগত ভাবে কি করে একটি কর্মকাণ্ডের সাথে সার্বিক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল? বা আদেও সম্পর্ক সর্বক্ষেত্রে স্থাপিত হয়েছিল কি না? নাকি হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া (সম্ভবত যাদের জন্য এত খামতি থাকার পরেও সংগঠন সচল ছিল) সিংহভাগ সদস্যই গণনাট্যের সাথে হুজুগে পড়ে বা অস্বচ্ছ ধারণা নিয়ে ভিড়েছিল? তার জন্য সংগঠন ও শাখা স্তর ছাড়াও প্রয়োজনার গুণগত মানেও কি প্রভাব পড়েছিল? এর উত্তরও লুকিয়ে আছে ৫ম সম্মেলনের প্রতিবেদনেই। সংগঠন নিয়ে পর্যালোচনায় সেখানে বলা হচ্ছে-

‘আমাদের সংগঠনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেউই প্রায় প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার বা গীতিকার এমনটা নয়। লড়াইয়ের ময়দানে অংশ গ্রহণের জন্য চাপে পড়ে গান বা নাটক লেখেন, অভিনয় করেন, সংগীত পরিবেশন করেন। তাতে কাজও চলে যায়। ইস্যু ভিত্তিক প্রয়োজনটুকু হয়ত মিটেও যায়। কিন্তু যে আক্রমণের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে তাকে কি এইভাবে মোকাবিলা করা যায়।... একজন শিল্পী যদি

নিজেকে গড়ে তোলার তাগিদ প্রতিনিয়ত নিজের ভিতর থেকে না অনুভব করেন তাহলে তাঁকে কি কোন ছাঁচে ফেলে শিল্পী করে দেওয়া সম্ভব। আর শিল্পকর্মের প্রতি রাজনৈতিক ভাবেই দায়বদ্ধতা না থাকলে ভাল শিল্পকর্মও সম্ভব না।... শিল্পী নয় আবার ঘোষণাপত্রের মর্মবস্তুও অনুধাবন করতে পারে না এরকম কিছু সংগঠকরা কারণে অকারণে ছড়ি ঘোরালে যেমন সহ্য করা যায় না তেমনি দুচারটে গান অথবা দু একটা নাটকে নেতৃত্বের প্রশংসা পাওয়া শিল্পীর ধরাকে সড়া জ্ঞান করার ঔদ্ধত্যও গণনাট্য আন্দোলনের বিকাশের পরিপন্থী। মতাদর্শগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে না তুলতে পারলেও এ ঝোঁক কাটানো সম্ভব নয়।<sup>১৬</sup>

তাহলে একদা জোয়ারের সময় গণনাট্যে কি বেনোজল প্রবেশ করেছিল? ২০০৭ সালে সেই জলেই কি বীরভূমের গণনাট্যের তরী কার্যত বেসামাল হয়ে পড়ে? সেই বেসামাল তরীর পালেই কি আদর্শ সম্পর্কে অপরিষ্কার ধারণা দমকা হাওয়ার মত আছড়ে পড়ে? উত্তর যাইহোক না কেন এই সময়েই জেলার গণনাট্যে যে গভীর সঙ্কটের চোরাস্রোতের মুখোমুখি হয়েছিল সে বিষয়ে বোধহয় সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

এখন প্রশ্ন ওঠে যে, জেলার গণনাট্য আদেও আক্ষরিক অর্থে আপাদমস্তক গণনাট্য সংঘের আদর্শে বিশ্বাসী এক নাট্য তথা সাংস্কৃতিক সংগঠন হয়ে উঠতে পেরেছিল কিনা? নাকি রাজনৈতিক আদর্শের আড়ালে তা হয়ে উঠেছিল স্রেফ বাম সরকারের এক সাংস্কৃতিক সংগঠন? যে সংগঠন দলীয় রাজনীতির চক্রব্যূহে নিজেদের সত্তা বিকশিত করার বদলে অচিরেই নিজেদের ইজ্জত খুয়িয়েছে! যদি তা নাহয়ে থাকে তাহলে ২০১১ সালে রাজ্যে বাম সরকারের পতনের সাথে সাথেই বীরভূমে গণনাট্যের শাখাগুলি দ্রুত নিষ্ক্রিয় হতে হতে কেন মুখ খুবড়ে পড়ল? দলীয় রাজনীতি যখন স্বাধীন শিল্প চর্চার উপরে নিয়ন্ত্রণ কায়েমে সাফল্য পায়, রাজনৈতিক ব্যক্তির যখন নাট্য বিশেষজ্ঞের মত পাণ্ডুলিপির অনুমোদন সহ প্রয়োজনাকে ময়নাতদন্তের টেবিলে শোয়ায় তখন অলখ্যে চিতা সাজাতে থাকে সময়। সেই সাজানো চিতা অপেক্ষা করে কেবলমাত্র একটি স্ফুলিঙ্গের। ২০১১ সালের ৩৪ বছরের বাম সরকারের পতন সেই স্ফুলিঙ্গের কাজটাই করেছিল বোধহয়। যদিও ২০১১ সালের আগে ২০০৭-০৮ সাল থেকেই যখন বাম বিরোধী আন্দোলন তীব্র হতে হতে ক্রমে পাড়ার চায়ের দোকান পর্যন্ত পৌঁছে যায় তখন থেকেই মনে হয় বীরভূমে গণনাট্যের শাখাগুলিতে দ্রুত ধস নামতে শুরু করে। ২০১২ সালের ২রা ডিসেম্বর বোলপুর টাউন লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত হওয়া গণনাট্যের বীরভূম জেলা কমিটির ৬ষ্ঠ জেলা সম্মেলনের প্রতিবেদনের ‘সাংগঠনিক পর্যালোচনা’-তে বিভিন্ন স্তরকে তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে। ‘সাংগঠনিক পর্যালোচনা’-র ‘শাখা সংগঠন’ উপবিভাগের প্রথম স্তরকেই বলা হয়েছে-

‘শাখার অনেক সদস্য ধারাবাহিক সক্রিয় নন। এঁদের কাজকর্ম অনেকটা দায়সারা গোছের। আর একটা অংশ আছেন যাদের মধ্যে নিষ্ঠা বা আন্তরিকতার অভাব নেই ঠিকই কিন্তু উন্নতমানের নাটক - গান সৃষ্টিতে কিংবা গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালনে এরা নিজেদের সেভাবে উন্নীত করতে পারছে না। গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব শর্ত হ’ল আমাদের প্রত্যেকটি কর্মীকে হতে হবে একাধারে শিল্পী, শিল্পবোধ সম্বন্ধে সচেতন ও সৃজনশীল সংগঠক হতে হবে। আমাদের কর্মীরা এদিক থেকে অনেকটা পিছিয়ে। এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমাদের কিছু বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে।’<sup>১৭</sup>



অর্থাৎ ২০১২ সালে বীরভূমের গণনাট্য শাখার সদস্যদের ধারাবাহিক সক্রিয়তার অভাবের যে প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে তা নিশ্চই হঠাৎ করে ২০১১ সালের পালা বদলের সাথে সাথেই হয়নি। নিঃসন্দেহে তার সূচনা আগে থেকেই হয়েছিল। সেই সাথে উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে ‘গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হবার...’ যে শর্তাবলীর কথা বলা হয়েছে তা বীরভূমে কতটা প্রযোজ্য ছিল বা আদেও ছিল কিনা? ভেবে দেখার মত বিষয় যে, অন্তত শিল্পবোধ সম্বন্ধে সচেতন ও সৃজনশীল হওয়ার জন্য যে চর্চার প্রয়োজন তা কতজন গণনাট্যের কর্মী অথবা যাদের হাতে নাটক ও গান অনুমোদনের ক্ষমতা ছিল তাদের সবার মধ্যে প্রকৃত অর্থে বর্তমান ছিল কিনা - সে বিষয়ে সংশয় থেকে যায়না কি! অন্তত যাদের ভিতরে শিল্পবোধ সম্বন্ধে সচেতনতা ও সৃজনশীলতা আছে তারা নিজেদের শিল্পের অনুমোদনের জন্য কেনই বা অপরকে অনুমোদন দেবেন বা অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করবেন? অপর দিকে যাদের মধ্যে প্রকৃত শিল্পবোধ সম্বন্ধে সচেতনতা ও সৃজনশীলতা বর্তমান তারা নিজেরাই বা কেন শিল্প অনুমোদনকারী হবেন? শিল্পচর্চা বা বিশেষত নাট্যচর্চার প্রতি নেতৃত্বের অনুমোদন সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণের ফলে শাখাগুলির কর্মীরা যে মোটেও স্বচ্ছন্দ নন বা নিজেদের স্বাধীন ভাবে পারতেন না তার ইঙ্গিত মিলেছে পূর্বোক্ত ‘শাখা সংগঠন’ উপবিভাগেই। প্রতিবেদনের এই অংশের দ্বিতীয় স্তবকে বলা হয়েছে-

‘যে সব শাখা পুনর্নবীকরণ করে নি তার কারণ এলাকার নেতৃত্বের অভাব, নেতৃত্ব সময় দিতে না পারা। সাধারণ সদস্য ও কর্মীরা গণনাট্য সংঘের কাজ করার চাইতে গণনাট্যের বাইরে সংঘের ভাবাদর্শ অনুযায়ী সংস্কৃতির কাজ করতে বেশী স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। এবং সেখানে তাঁরা নিজেদের স্বাধীন শিল্পী মনে করেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তির কাছে তাদের কোনরকম কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। গুরুত্ব থাকে। কোন চাপ থাকে না।’<sup>১৮</sup>

নেতৃত্বে চাপে অথবা নাটক ও গানের অনুমোদন সংক্রান্ত বেড়াজালে গণনাট্যের বীরভূম জেলার শাখাগুলির সদস্যদের সমস্যার কথা ভেবে এটা কি আত্মসমালোচনা? নাকি জেলায় গণনাট্যের সঙ্কটের সময় ব-কলমে সদস্যদের রাজ আদর্শ মনে করিয়ে দেওয়া? কারণ যাই হয়ে থাকুক না কেন এটা স্পষ্ট যে, সে সময়ে (২০১২ সাল) বীরভূমের গণনাট্যের সাধারণ সদস্য ও কর্মীদের মধ্যে যে স্বাধীন শিল্পী মনোভাব, স্বচ্ছন্দ বোধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তির (বাস্তবে জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব?) কাছে কৈফিয়ৎ না দিয়ে চাপমুক্ত হওয়া প্রাসঙ্গিক হয় বা গুরুত্ব পায়। তাহলে এতদিন ধরে শাখাগুলি হতে সৃষ্ট নাটক ও গানের অনুমোদন পাওয়া বা নেওয়া সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে জেলার গণনাট্যের কর্মীদের একাংশের মধ্যে কি ক্ষোভ বা অসন্তোষের জন্ম হচ্ছিল? যে ক্ষোভ বা অসন্তোষকে এতদিন সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি! পালা বদলের ধাক্কায় সংকটকালীন পরিস্থিতিতে সেই ক্ষোভ বা অসন্তোষকেই কি গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করতে বাধ্য হয় তৎকালীন নেতৃত্ব? একি ছিল বিলম্বিত বোধোদয়? তারই ইঙ্গিত কি প্রতিবেদনের উপরোক্ত অংশে ছিল? ২০১২ সালের ৬ষ্ঠ জেলা সম্মেলনের প্রতিবেদনে আমরা দেখতে পাচ্ছি বীরভূমে গণনাট্যের বেহাল দশা। কেবলমাত্র রুদ্রবীণা (সিউড়ী), গণকণ্ঠ (সিউড়ী) ও উত্তরণ (বোলপুর) শাখাই বাস্তবে সক্রিয়। বস্তুত বাম সরকার পতনের ধাক্কা সামলে এই তিনটি শাখাই তখন বাস্তবে কিছুটা হলেও সক্রিয় ছিল। জেলার আরও এক গুরুত্বপূর্ণ গণনাট্যের সক্রিয় শাখা দুবরাজপুরের ‘ভিষ্টরজারা’ প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে -

‘দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ শাখা খুবই নিষ্ক্রিয়। শাখায় কাজ করেন এমন জেলা কমিটির সদস্য ৫ জন। ২ জন শুধুমাত্র জেলার মিটিং-এ আসা ছাড়া কোন কাজ করেন না। কোন কোন সময় জেলা কমিটির

মিটিং এ সকলে এলেও শাখায় কোনরকম কাজে তাঁরা থাকেন না।... প্রাক্তন জেলা সম্পাদক এই শাখায় নাটক পরিচালনার কাজ করতেন এবং শাখার প্রতিটি আন্দোলন কর্মসূচীতে তার উদ্যোগ ও উপস্থিতি শাখার কাজে গতি আনতো। বর্তমানে জেলা কমিটির সদস্য সহ শাখার পুরানো সদস্যরা নিষ্ক্রিয়।<sup>১৯</sup>

এখানে প্রাক্তন জেলা সম্পাদক হিসেবে কারুর নাম উল্লেখিত না হলেও তিনি যে দুবরাজপুরের মধুসূদন কুণ্ডুই ছিলেন সে বিষয়ে নিশ্চিত। প্রতিবেদনের বয়ান অনুসারে শ্রী কুণ্ডু ২০০৯ সালে ‘তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কারণ জানিয়ে জেলা সম্পাদকের পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে জেলা কমিটিকে চিঠি লেখেন। জেলা কমিটির সভায় তাঁর অব্যাহতির কারণকে বিবেচনা করে সর্বসম্মতভাবে অব্যাহতির আবেদনকে গ্রহণ করা হয়’। তবে বাস্তবে নেতৃত্বের সাথে মনোমালিন্যের জন্যই মধুসূদন কুণ্ডু যে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা অনুমান করাই যায়। বস্তুত ওই সময় থেকেই বীরভূম জেলার গণনাট্য সংগঠন সম্পাদকহীন হয়ে যায়। তখন থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সংগঠনের সহ সম্পাদকই সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেন। সম্ভবত সেই সময় সহ সম্পাদক ছিলেন অনিরুদ্ধ ঘোষাল (উত্তরণ, বোলপুর)। ভেবে দেখার মত বিষয় ২০০৬ সালে যেখানে বীরভূম জেলায় ১৩টি শাখা এবং ৯টি প্রস্তুতি শাখা ছিল এবং ২০১২ সালে খাতায় কলমে যেখানে ১২টি শাখার ১৭৬ জন সদস্য ছিল সেখানে ২০০৯ সালে জেলা সম্পাদকের পদটি শূন্য হওয়ার পরে অন্তত তিন বছরেও তা পূরণ করার জন্য কোন নেতৃত্বের সন্ধান মেলেনি। নেতৃত্ব নিয়ে অনুযোগ প্রতিবেদনেও প্রকাশ পেয়েছে। বলা হয়েছে-

‘সভাপতি পার্ট টাইমার। তিনি কলকাতায় থাকেন। মাঝেমধ্যে মিটিং ও অন্যান্য সাংগঠনিক প্রোগ্রামে থাকেন। সুভাষ ব্যানার্জী, দেবীদাস আচার্য, মানিক পাণ্ডে ও অর্ক সেন এই ৪ জন জেলা কমিটি সদস্য পুনর্নির্বাচন করেন নি।’<sup>২০</sup>

যতদূর জানা গেছে সেই সময় সভাপতি পদে ছিলেন দিব্যেন্দু চ্যাটার্জী। এছাড়াও কোরক (নগরী), অঙ্গীকার (বড়রা), পূর্বকোণ (রাজনগর), অনির্বাণ (নলহাটি), ঐক্যতান (পাঁড়ুই), নিতীক (কীর্ণাহার), মাদল (খুজুটিপাড়া), খোলাচোখ (সাঁইথিয়া) শাখাগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ নিষ্ক্রিয় ছিল। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে ২০১২ সালেই বীরভূম জেলার গণনাট্যের অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছিল। ২০১২ সালের ৬ষ্ঠ জেলা সম্মেলনের পরে এই পরিস্থিতি যে আরও দ্রুত ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল তার জন্য ৭ম জেলা সম্মেলনের কোন প্রতিবেদন এখনও পর্যন্ত না পাওয়া গেলেও ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসের ৮ হতে ৯ তারিখ পর্যন্ত নদীয়ার কল্যাণীতে হওয়া ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পশ্চিমবঙ্গের ১৫তম রাজ্য সম্মেলে মূল্যায়নের জন্য প্রকাশিত একটি ক্ষুদ্র সংকলনে দেখা যায় বীরভূম জেলা থেকে গানের কোন তালিকা বা মূল্যায়ন সম্ভবত পাঠানো হয়নি অথবা সে বছর ৭ম বীরভূম জেলা সম্মেলনে প্রকাশিত প্রতিবেদনে গান তৈরি সম্পর্কে কোন তথ্য দেওয়া হয়নি বা দেওয়া যায়নি। তাই কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া ও আলিপুরদুয়ার ছাড়া বাকি জেলাগুলির মত বীরভূমের গণনাট্যের শাখা হতে সৃষ্টি নির্বাচিত কোন গান রাজ্য সম্মেলনের প্রতিবেদনে বা মূল্যায়নে স্থান পায়নি। অবশ্য বীরভূমের গণনাট্য সংগঠনের পক্ষ থেকে পাঠানো মাত্র ৪টি প্রয়োজনা রাজ্য সম্মেলনের প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছিল। প্রয়োজনাগুলি হল- মরাচাঁদ, ধনপতি উপাখ্যান, জলদেবতা ও রঙিনের ঠাম্মি ও সন্ধ্যাতারা।<sup>২১</sup> কিন্তু প্রয়োজনাগুলি জেলার কোন কোন শাখা হতে অভিনীত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন তথ্য নেই। আরও একটি

পরিসংখ্যান ২০১৭ সালে বীরভূমে গণনাট্য সংগঠনের অবস্থা বোঝাতে সহায়ক হবে। ২০১২ সালে জেলায় গণনাট্য পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা যেখানে ছিল ১২৫টি সেখানে মাত্র চার বছরের মাথায় ২০১৬ সালে সেই সংখ্যা শূন্যতে গিয়ে ঠেকেছিল। অর্থাৎ সার্বিক ভাবে বলাই যায় ২০১২ সালে জেলার গণনাট্যের যেকটি শাখা আশঙ্কাজনক ভাবে ধুঁকছিল তারা ২০১৭ সালের মধ্যেই বাস্তবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় অথবা প্রাসঙ্গিকতা হারায়।

পশ্চিমবঙ্গে বামেদের ভয়াবহ রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যায় ২০০৭-০৮ সালেই। সেই বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে বিপর্যয় শুরু হয় তা আর ঠেকানো যায়নি। বাম সরকারের উত্থানের সাথে সাথে বীরভূম জেলায় গণনাট্য সংঘের উত্থান ও বিস্তারের সে সমানুপাতিক সম্পর্ক তৈরি হয় সেই সমানুপাতিক সম্পর্কের সমীকরণের পথেই বাম সরকারের পতনের সাথে সাথেই বীরভূম জেলায় গণনাট্য সংঘের পতনের পথ প্রশস্ত হয়। তথাপি গণনাট্য সংঘের জন্য জেলা বীরভূমের নাট্যচর্চা বেশ কিছু ক্ষেত্রে উপকৃত হয়েছিল। আশির দশক থেকে প্রচলিত মঞ্চ ভাবনার বাইরে নাট্য উপস্থাপনা নিয়ে যে ভাবনাচিন্তা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয় তাতে গণনাট্যের শাখা ও প্রস্তুতি কমিটিগুলির মাঠে ময়দানে অভিনয় করা নাটকগুলির অবদান অস্বীকার করা যায়না। জেলার পথ নাটকের ক্ষেত্রেও কোথাও গিয়ে গণনাট্যের এই প্রভাব পড়েছিল। এছাড়াও বাজার চলতি বা কলকাতায় মঞ্চ সফল প্রয়োজনাগুলি যখন নিয়মিত জেলায় অভিনীত হচ্ছে তখন এই আবর্তের বাইরে বেরিয়ে জেলায় নাট্যরচনার যে জোয়ার আশির দশকে লক্ষ্য করা যায় তাতে গণনাট্যের কর্মীদের দ্বারা রচিত নাটকগুলির অবদান অস্বীকার করা যায় না। এই নাটকগুলির গুণগত মান নিয়ে পর্যালোচনার অবকাশ থাকলেও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, সেই সময় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ তাদের সাধ্যমত নাট্যরচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। জেলায় নাট্যরচনার আঙিনায় এত সংখ্যক মানুষের বিভিন্ন স্তর থেকে আগমন ইতিপূর্বে বীরভূম দেখেনি। নতুন নাট্যকারদের আগমনের এই ধারায় জেলার গণনাট্যের স্মরণীয় অবদান ছিলই। এবং সেই অবদান কোথাও গিয়ে একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। পাশাপাশি প্রচলিত গ্রুপ থিয়েটার যখন জেলার শহর, শহরাঞ্চল ও গঞ্জগুলোতেই ঘুরপাক খাচ্ছে তখন রাজনৈতিক প্রভাব ও বিস্তারের ফলে সহজেই গণনাট্য পৌঁছে গেছে বীরভূম জেলার গ্রামীণ এলাকাগুলিতে। বস্তুত জেলার এমন অনেক এলাকা আছে যেখানে ধারাবাহিক ঐকান্তিক (সিরিয়াস) নাট্যচর্চা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে গেছে গণনাট্য। হতে পারে তারা একাধিক স্থানে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেনি, হতে পারে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, হতে পারে রাজনৈতিক কারণেই তারা সেই চেষ্টা চালিয়েছিল, হতে পারে বিভিন্ন কারণে সেই সব এলাকাগুলিতে একটি সম্ভবনার অপমৃত্যুও হয়েছে - কিন্তু তাই বলে তাদের সেই উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাকে খাটো করে দেখার কোন কারণ নেই। বরং তাদের সেই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ প্রশংসার দাবি রাখে। মহম্মদবাজার, খয়রাশোল, রাজনগর, ময়ূরেশ্বরের মত প্রভৃতি এলাকাগুলিতে যেখানে স্বাধীনতার আগে ও পরে নাট্যচর্চা সেভাবে বিকশিত হওয়ার কোন তথ্য সংগৃহীত হয়নি বললেই চলে সেই এলাকাগুলিতে গণনাট্য অন্তত ধারাবাহিক নাট্যচর্চা তথা সাংস্কৃতিক চর্চার চেষ্টা চালিয়ে ছিল।

বীরভূম জেলার গণনাট্য প্রসঙ্গে আর দু একটি কথা বলে এই প্রবন্ধের ইতি টানবো। যে বাম সরকারের উত্থানের সাথে সাথে বীরভূমের গণনাট্যের একাধিক শাখার জন্ম বা উত্থান হয় এবং সেই সরকার পতনের সাথে সাথে যখন শাখাগুলিও মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে অথবা অপ্ৰাসঙ্গিক হয়ে যায় তখন এই প্রেক্ষিতে

প্রশ্ন থেকেই যায় আগামী দিনে বামেরা রাজ্যপাটে প্রত্যাবর্তন করলে বীরভূমেও গণনাট্যের প্রত্যাবর্তন হবে কিনা? যদি হয় তাহলে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে সংগঠন তৈরি ও পরিচালনার নীতিমালার কোন পরিবর্তন হবে কিনা? নাকি পূর্বের মতই সঙ্গীত ও নাট্যচর্চার মত স্বাধীন শিল্পকে আদর্শের ঘুঙুর পরিয়ে অনুমোদন দেওয়া বা না দেওয়া পথে হেঁটে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে!

### তথ্যসূত্র:

- ১) রায়, স্বপন; 'নাটক ও নাট্যচর্চায় বীরভূম-একটি অনুসন্ধান', পশ্চিমবঙ্গ (বীরভূম জেলা সংখ্যা); সম্পা. সুখেন্দু দাস; ১৪১২ বঙ্গা., মাঘ; পৃ. ২৩৬।
- ২) সম্পাদকীয় প্রতিবেদন (খসড়া), ২য় সম্মেলন, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, বীরভূম, নভেম্বর, ১৯৯৩; পৃ. ৫।
- ৩) Statistical Report on General Election 1987 to The Legislative Assembly Of West Bengal; Election Commission Of India (New Delhi).
- ৪) সম্পাদকীয় প্রতিবেদন (খসড়া), ২য় সম্মেলন; ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, বীরভূম, সিউড়ী, নভেম্বর, ১৯৯৩, পৃ. ৫।
- ৫) তদেব, পৃ. ৫।
- ৬) তদেব, পৃ. ৮।
- ৭) তদেব, পৃ. ১০।
- ৮) তদেব, পৃ. ৮-১৩।
- ৯) 'নাইয়া-র নাটক', গণশক্তি, ২৮শে মার্চ (রবিবার) ১৯৯৯, পৃ. ৫।
- ১০) 'হাজার চুরাশির মা ও বে-নজীর ঘটনা', দিনান্ত, ৮ই এপ্রিল (বৃহস্পতি) ১৯৯৯, পৃ. ৩।
- ১১) সম্পাদকীয় প্রতিবেদন (খসড়া), ৪র্থ সম্মেলন, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, বীরভূম, নলহাটী, নভেম্বর, ২০০২, পৃ. ১৬।
- ১২) তদেব, পৃ. ১৭।
- ১৩) তদেব, পৃ. ২২।
- ১৪) সম্পাদকীয় প্রতিবেদন (খসড়া), ৫ম সম্মেলন, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, বীরভূম, চিনপাই, জানুয়ারি, ২০০৭, পৃ. ৫।
- ১৫) তদেব, পৃ. ৮।
- ১৬) তদেব, পৃ. ৫-৬।
- ১৭) সম্পাদকীয় প্রতিবেদন (খসড়া), ৬ষ্ঠ সম্মেলন, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, বীরভূম, বোলপুর, ডিসেম্বর, ২০১২, পৃ. ৪।
- ১৮) তদেব।

১৯) তদেব, পৃ. ৫।

২০) তদেব, পৃ. ৬।

২১) মূল্যায়ন, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের (পঃ বঃ) রাজ্যের ১৫তম সম্মেলন, কল্যাণী, নদীয়া, এপ্রিল, ২০১৭, পৃ. ৯।

### সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

- ১) চৌধুরী, অরুণ, 'বীরভূম জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলন: গঠন ও ব্যক্তিত্ব', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি. (কলকাতা), ২০১৪।
- ২) মিশ্র, শৈলেন, 'সত্তরের ডায়েরি', বীরজাতীয় (বীরভূম), জানুয়ারি, ২০২০, ৯৭৮৮১৯৪৪৩৫২২৮।
- ৩) মজুমদার, অর্ণব, 'বীরভূম: ইতিহাস ও সংস্কৃতি', আশাদীপ, কলকাতা, ২০১৯, জানুয়ারি; ৯৭৮৮১৯০৮২৩০৮১।
- ৪) জিন্না, জুলফিকার, 'থিয়েটারচেতনা যুক্তি-তর্কো-অভিমুখ', বীরজাতীয়, বীরভূম, ২০২৩, জানুয়ারি; ৯৭৮৯৩৯১৭৩৬৩৪৭।
- ৫) রায়, শিবনারায়ণ, 'শান্তিনিকেতন: অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ', মূঢ়তা থেকে মানবতন্ত্রে; রেনেসাঁস পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিঃ, কলকাতা, ২০০৬, জানুয়ারি।
- ৬) সরকার, সলিল, 'কলকাতার নাট্যমঞ্চ বাংলার নাট্যকথা', বইওয়ালার বুক ক্যাফে, শান্তিনিকেতন, ২০২৩।
- ৭) সাহা, কমল, 'বাংলা নাট্যকোষ' (১ম খণ্ড), বাংলা নাট্যকোষ পরিষদ ও গুপ্তি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৪, ডিসেম্বর, ৯৭৮৯৩৮২৭০৬৬১৮।
- ৮) কুমার, দাস, অপূর্ব; গণনাট্য সংঘ, 'কেতন শাখা প্রযোজনা মা', গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকা, ১৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৯৭।
- ৯) ঘোষ, মলয়, 'বীরভূম জেলার নাট্যচর্চা: একটি অসম্পূর্ণ আলোচনা', ১৮তম নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, সম্পা. শেখর সমাদ্দার, ২০২১।
- ১০) চট্টোপাধ্যায়, গনেশগোপাল, 'কড়িধ্যার নাট্যচর্চা', সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক সংখ্যা, সরস্বতী সমিতি, কড়িধ্যা, সম্পা. সুভাষ দত্ত, ১৩৯২।

### তথ্যদাতা:

- কামদেব গোস্বামী, মধুসূদন কুণ্ডু, অনিরুদ্ধ ঘোষাল, মলয় ঘোষ, জুলফিকার জিন্না, অধ্যাপক অসীম চট্টোপাধ্যায় বিশ্বজিৎ দাস, তাপস দত্ত, স্বপন রায়, সংঘমিত্রা ঘোষ, অধ্যাপক তারক সেনগুপ্ত, অতনু বর্মণ প্রমুখ।



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 576-583

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.045



## বাংলার গণনাট্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক

সুমনা বিশ্বাস, স্বাধীন গবেষক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 13.01.2025; Accepted: 29.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*Bijan Bhattacharya is one of the most significant figure in the history of Bengali drama literature. It can be said that he started his theater career in the 1940. There was a group of anti-fascism writers who started the independent theatrical movement on going beyond the reach of commercial theatre. Their cultural branch was the Indian People's Theatre Association. The most influential and unforgettable event in the world of Bengali theater literature is the 'Gananatto movement'. Bijan Bhattacharya was one of the proverbial personality of this theatrical movement. However, this movement of the 1940s was not born in one day. The play 'Nabanna' was born out of this unstable political context. Most of the plays of that time were mainly stories of kings and queens, stories of the people of the upper class society, the stories about various mythology and history. No other writer portrayed the life of middle class people as truly as Bijan Bhattacharya portrayed their lives in his play 'Nabanna'. The backdrop of this play was the turmoil of World War II, August movements of 1942, the Bengal famine and natural disasters. In this play Bijan Bhattacharya depicted those people who could barely afford food at that time. Throughout this play, he showed the pathetic situations of the farmers. Famine, depression, brutal British rules, the plight of people of Aminpur caused by blackmarketing and at the end, the eventual protest of the people which gave them the freedom from all these misery have been perfectly illustrated in the play. At the end of the famine, all of them were united and celebrated the New Rice Festival. It seemed the joy was sounding everywhere at the end of the play 'Nabanna'.*

**Keywords:** গণনাট্য আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মন্বন্তর, কালোবাজারি, নারীর আত্মসম্মান, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ।

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন বিজন ভট্টাচার্য। বলা যায় তিনি নাট্যজীবনে পদার্পণ করেন ১৯৪০ এর দশকে। কিছু ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখকগোষ্ঠী ছিলেন যারা স্বতন্ত্র নাট্য আন্দোলনের সূচনা করেন প্রচলিত বাণিজ্যিক থিয়েটারের ধরার বাইরে গিয়ে। এদেরই সাংস্কৃতিক শাখা ছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। বাংলা নাট্য সাহিত্যের জগতে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী ও অবিস্মরণীয়

ঘটনা হলো 'গণনাট্য আন্দোলন'। আর এই নাট্য আন্দোলনের একজন প্রবাদপ্রতিম মানুষ ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য। তবে বিশ শতকের চল্লিশের দশকের এই আন্দোলন এক দিনে গড়ে ওঠেনি। এই অস্থির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে দিয়ে 'নবান্ন' নাটকের জন্ম হয়। তৎকালীন সময়ে বেশিরভাগ নাটকের কাহিনী ছিল মূলত রাজা রানীদের কাহিনী, উচ্চবিত্ত সমাজের মানুষের কাহিনী, পুরান ও ইতিহাসের নানান কথা। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবন চিত্র সেইভাবে ফুটে ওঠেনি কোন নাট্যকারের হাতেই নবান্ন নাটকের মতো। এই নাটকটির পটভূমিকা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থিরতা, ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সাধারণ খেটে খাওয়া নিম্নবিত্ত মানুষের ঘরে যেদিন কোন অন্ন ছিল না সেই নিরন্ন মানুষের মুখের দিকে চেয়ে বিজন ভট্টাচার্য এই নবান্ন নাটক লিখেছিলেন। নাটকের মধ্যে দিয়ে কৃষক সমাজের করুণ জীবন চিত্র ফুটে উঠেছে। দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, বিদেশি শাসনের অত্যাচার, স্বার্থান্বেষী মানুষের কালোবাজারি জনিত আমিনপুরের কৃষকদের দূরবস্থা এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হয়ে দুর্দশা থেকে মুক্তির চিত্র নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে এই নাটকে এবং দুর্ভিক্ষ পীড়নের শেষে নতুন ধানের উৎসবে একত্রিত হয়ে নবজীবন লাভের আনন্দধ্বনিত হয়েছে নবান্ন নাটকে।

ভারতবর্ষে যখন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে গিয়ে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সূচনা ঘটে তখন ধীরে ধীরে জমিদার শ্রেণীর অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামগঞ্জে গড়ে ওঠা সৌখিন নাট্যশালাগুলি তার পুরনো গৌরব হারাতে থাকে। অপরদিকে নাটক ও নাট্য মঞ্চের ওপরে চলচ্চিত্রের প্রভাব বাড়তে থাকায় বাংলার মঞ্চ পরিবেশ অনেকটা বিমিয়ে পড়ে। এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে নাট্য উৎসাহী একদল যুবক চল্লিশ এর দশক থেকে বাংলার রঙ্গমঞ্চে একটা নতুন ভাবাবেশ নিয়ে আসেন। এই ভাবাবেশ ক্রমে আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে এবং সেটিই নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে গণনাট্য আন্দোলন হিসেবে পরিচিত। গণনাট্য আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে তার ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করা এবং তাদের ইচ্ছা, স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সহায়তা করা। এই গণনাট্য আন্দোলনেরই ফল হিসেবে নবনাট্য ও বর্তমান যুগের গ্রুপ থিয়েটারের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। নবান্ন নাটকই প্রথম, যেটির মাধ্যমে দেখানো হয়েছিল যে সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে গিয়েও সাধারণ মানুষের জন্য নাটক রচনা করা যায়। এর পাশাপাশি বিজন ভট্টাচার্যের দেবীগর্জন, মরাচাঁদ, কলঙ্ক, ছায়াপথ, অবরোধ, প্রভৃতি নাটকে গণসংস্কৃতির বোধকে তিনি আরো সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়-

“গতানুগতিক পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের আওতায় থেকেই তার সংস্কারের প্রচেষ্টা এদেশের গণনাট্যের উদ্ভব নয়, তার উদ্ভব হয়েছে সমাজ মানুষের এক রাজনৈতিক ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকারণে।”<sup>১</sup>

এই আন্দোলন শুধুমাত্র নাট্যসাহিত্যের উপরই প্রভাব বিস্তার করেনি পাশাপাশি বাংলার আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক দিকেরও বিকাশ ঘটিয়েছে। এই প্রসঙ্গে মন্দিরারাই লিখেছেন-

“গণনাট্য আন্দোলন শব্দটি একটি বিশেষ সময়ের সন্ধিক্ষণের দলিল। মঞ্চ পরিবেশের গতানুগতিকতা যখন বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল সেই মুর্মূর্ষু নাট্যরঙ্গনে একরাশ তাজা বাতাসের সুগন্ধ নিয়ে এসেছিল এই আন্দোলন। গণনাট্যের অর্থ শুধু জনতা বা গনের নাটক নয় সেই সঙ্গে একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক তথা নাট্য আন্দোলনও বটে।”<sup>২</sup>

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতি, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, বন্যা, ঝড় অন্যদিকে কালোবাজারি ইত্যাদি ভারতীয় গণনাট্য সংঘকে জনগণের সামনে এগিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়েছিল। সাধারণ মানুষের এই বিপদের কথা সকলকে জানানো, অন্যান্য জায়গার মানুষের কাছে বার্তা পাঠানো এইভাবে নানান কাজের মাধ্যমে এই সংঘের ক্রিয়াকলাপ শুরু হয়। সারা দেশবাসীর মনোবেদনা ও প্রতিরোধের ছবি এরা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে থাকে।

“শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, অত্যাচারী মুখোশ খুলে ধরা, মুনাফাখোর, মজুতদারের বদমায়েশি প্রকাশ করা, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক অবক্ষয়ের পরিণাম এবং এর সঙ্গে মুক্তিকামী মানুষের জীবন সংগ্রাম প্রতিরোধ ও বাঁচার লড়াইকে সামনে এনে, মানুষের মুক্তি ও শ্রেণিহীন সমাজ গঠনের উপস্থিতি সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করা - এই ছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সকল সাংস্কৃতিক কাজের অনুপ্রেরণা।”<sup>৩</sup>

চল্লিশের দশকের গোড়ায় গণনাট্য আন্দোলন ও বিজন ভট্টাচার্যের নামটি সমর্থক হয়ে উঠেছিল। পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ সাধারণ মানুষ যখন স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাণপণ চেষ্টা করছিল ঠিক তখনই ১৩৫০ বঙ্গাব্দে সারা বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে বাংলার সমস্ত মানুষ বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। দু-মুঠো অন্নের জন্য মানুষের হাহাকার, অভাব, অনাহার, মানুষের করুণ অবস্থার কথা উঠে এসেছে এই নবান্ন নাটকে। এই নাটকে একদিকে যেমন উঠে এসেছে স্বার্থপর ও প্রতারক শ্রেণীর মানুষের চক্রান্তের কথা, অন্যদিকে তেমনি উঠে এসেছে নির্যাতিত, নিপীড়িত সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের কথা। সাধারণ মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে নিতে বন্ধপরিকর হয়ে উঠেছে। তাই এ প্রসঙ্গে বলা যায়-

“নবান্ন নাটকে প্রথম থেকে দুর্গতি ও দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সম্ভাবনা গড়ে তোলা হয়েছে। নাটক শেষও হয়েছে প্রতিরোধের মাধ্যমেই। নবান্ন নাটক তাই শুধু দুর্গতির নাটক নয় প্রতিরোধেরও নাটক।”<sup>৪</sup>

চল্লিশের দশকের এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে বাংলার রাজনৈতিক জীবনের ঘনঘন পট পরিবর্তন হতে থাকে। শাসক সমাজে নির্মম অত্যাচার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, মন্বন্তরের অভিঘাত, ফ্যাসিবাদের খবরদারি, পৃথিবীর জুড়ে তীব্র হাহাকারের রোল ওঠে, বেঁচে থাকার তাগিদে একটা ছেড়া রুটি নিয়ে মানুষ ও কুকুরের মধ্যে লড়াই, ভূমিহীন কৃষকদের দুর্দশা, মহাজনের অকথ্য অত্যাচার ইত্যাদি বাঙালি সমাজ জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছিল। এই অরাজকর পরিস্থিতিতেই বাংলায় গণনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। আশুতোষ ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে লিখেছেন-

“এই আন্দোলনকে আকস্মিক উত্তেজনার ফলে সৃষ্ট একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গণ-আন্দোলন বলিয়া মনে করা হইলে ভুল করা হইবে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ইহার পশ্চাতেও জাতির একটি সুদীর্ঘ তপস্যা অলক্ষিতে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে।”<sup>৫</sup>

বিজন ভট্টাচার্য যখন স্কুলে পড়তেন অর্থাৎ ছাত্রাবস্থা থেকেই তার জীবনে সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত ঘটে। ১৯৪২ সালের পর থেকে শুরু হয় তাঁর নাট্যজীবনের পথ চলা। তাঁর নাটকগুলি ছিল বাস্তবতার প্রত্যক্ষ দলিল। গ্রামগঞ্জের অনুন্নত, অশিক্ষিত, নামপরিচয়হীন হতদরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষগুলি তাঁর নাটকের প্রধান চরিত্রের আসন লাভ করতেন। নবান্ন নাটকটিকে গণনাট্য আন্দোলনের মাইলস্টোন বলা চলে।



নাটকটি প্রথম ১৯৪৪ সালে 'অরণি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে নবান্ন নাটকটি রচিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাংলা নাট্য আন্দোলনের ধারা, চেতনা প্রবাহের ভাবধারা, পরাবাস্তবতাবাদ, অ্যাবসার্ড ভাবনা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, সলিল সেন, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, আজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদল সরকার, মনোজ মিত্র প্রমুখ কৃতিমান নাট্যকাররা এই গণনাট্য আন্দোলনের ধারাকে সক্রিয় করে তুলেছিলেন তাদের নাট্যসৃজন ও অভিনয়ের দ্বারা।

গণনাট্য সংঘ বাংলার রঙ্গক্ষেত্র নবনাট্য আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত করে। অন্যান্য সব আন্দোলনের মতো নবনাট্য আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায় ছিল চাঞ্চল্যের, উদ্দীপনার ও উত্তেজনার। বাংলাদেশে তথা ভারতে বহু যুগ আগে থেকে গ্রামের মানুষজনের আনন্দ উপভোগের উপকরণ ছিল লোকনাট্য। গণনাট্য নামকরণটিতে লোকনাট্য প্রভাবের কথা অবশ্যই উল্লেখ্য, এছাড়া ভাব-সদৃশ্য যথেষ্ট রয়েছে। গণনাট্যের ভিত্তি হলেও সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ আঘাত ও সংঘাতের ইতিকথা। ধীরে ধীরে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে মানুষের মুষ্টিমদ্র হাত আকাশ স্পর্শ করে। অসম অবিচারের বিরুদ্ধে জনগণ চায় সজ্জবদ্ধ হতে। ভীষণতাকে উপেক্ষা করে মানুষের পৈশাচিক লোভ ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে একের পর এক কাহিনী চিত্রিত হয়েছে গণনাট্যে। এই দুর্ভিক্ষ, অনাহার, কালোবাজারি সবকিছুর বিরুদ্ধে গিয়ে গ্রামবাংলার মানুষ তাদের জয় ছিনিয়ে নিতে সকলে মিলে একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। গ্রাম বাংলার পুরুষদের সাথে সকল নারীরাও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সামিল হয়েছিল। পুরুষদের সঙ্গে থেকে তাদের শক্তি, সাহস, উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে সমাজকে রক্ষা করতে তারা সচেষ্ট হয়েছিল। তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত পঞ্চগননী, রাধিকা, বিনোদিনীর মতো গ্রাম বাংলার সহস্র সংগ্রামী নারীরা। এই দুর্ভিক্ষ, অনাহার, সাধারণ মানুষের জীবনকে কতটা দুর্বিষহ করে তুলেছিল তা উঠে এসেছে নাটকের প্রধান, কুঞ্জ, নিরঞ্জন, দয়াল প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। রাধিকার কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই-

“দেখছো কি, কিছু কি থাকলো! হুঃ উজোর হয়ে গেল গাঁ। উত্তর পাড়ায় তো সেই একেবারে, থাক আর নাম করবো না একেবারে ছেয়ে গেছে। এমন অবস্থা হয়েছে যে একবিন্দু জল যে গালে দেবে তা পর্যন্ত কেউ নেই। কি যে সব হবে! এমন আকালও দেখিনি এমন মৃত্যুও দেখিনি কোনদিন।”<sup>৬</sup>

মৃত্যুর ভয়াবহতা সাধারণ মানুষকে শিহরিত করে তোলে। দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিতে অনাহারে মৃত্যুই ছিল সাধারণ মানুষের অনিবার্য পরিণতি আর সেই চরম পরিণতির স্বীকার হতে হয়েছিল অমিনপুরের সকল গ্রামবাসীদের।

১৯৪২ এর আগস্ট মাসে ভারতছাড়ো আন্দোলন সারাদেশ জুড়ে ভয়ংকর রূপে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। দেশ জুড়ে আন্দোলন এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির নির্মম দমন পীড়ন হিংস্র রূপ নেয়। এই আন্দোলনে প্রধান সমাদ্দারও তার দুই পুত্রকে হারিয়েছে। বিয়াল্লিশ এর আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিতে পুলিশের অত্যাচারে গ্রামবাসী ভীত হয়ে ওঠে। সন্তান হারানোর ব্যথায় এবং তিন গোলা ধান নষ্ট হওয়ার বেদনায় প্রধান রুখে দাঁড়াতে চায়। গ্রামবাসীর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে নেপথ্যে শাসক শ্রেণীর অকথ্য অত্যাচার চলতে থাকে। মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট হচ্ছে বলে প্রধানের স্ত্রী পঞ্চগননী সবাইকে এর প্রতিকার করতে বলে-

“কুঞ্জ- (ক্ষোভের সুরে) ইজ্জত! ইজ্জত দেখছে! জীবনটাই সেখানে বেইজ্জতের সেখানে আবার মেয়ে মানুষের ইজ্জত! কিন্তু কিন্তু।

প্রধান- ওই হয়েছে এক কিন্তু, সব কথার ভেতরে ঐ কিন্তু! ঐ কিন্তুটার টুটি একবারে (মরিয়া ভাবে) কিন্তু টারে একেবারে শেষ করে ফেলে দেই। একেবারে শেষ করে...”<sup>৭</sup>

আগস্ট আন্দোলন এবং পঞ্চাশের মন্বন্তরের আকালের অশুভ ছায়া দেশ থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে পরিবারের মধ্যে সংকট সৃষ্টি করেছে। যার ফল হিসেবে দেখা দিয়েছে অনাহার, অত্যাচার, ক্ষুধা, মানুষের পারিবারিক সম্পর্কে ফাটল প্রভৃতি। বছরের শেষ সম্বল ধানটুকু রোদে শুকোতে দিয়ে দৃশ্যের সূচনা।

“রাধিকা- (উঠোনে ধান ছড়িয়ে পা দিয়ে নাড়তে নাড়তে) নাও, এই কটাই সম্বল ছিল, কত করে রেখে দিছলাম, গেল।

কুঞ্জ - কেন মাচার ওপরে সেই যে কালো জালার ভিতরি যে পুরনো আউশ কতগুলো ছিল?

রাধিকা- (মুখ ঝামটা দিয়ে) হ্যাঁ বসে রয়েছে এখনও তোমার জন্য সেই ধান।”<sup>৮</sup>

খাদ্যাভাবের করুণ চিত্র প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায় আলোচ্য উক্তির মধ্যে দিয়ে। এছাড়াও আমরা প্রধানের মুখে শুনি-

“প্রধান- হুঁ, সে কথার আর কী বলবো বল! এই তো দ্যাখো না, সকালবেলার থেকে এই এতক্ষণ পর্যন্ত চাঁচামেচি খুনোখুনি করে, শেষ সম্বল দুখানা পেতলের কাঁসি আর ঘটবাটি বেচে সের দুয়েক চাল নিয়ে এসেছে কুঞ্জ, পাঁচজনের সংসার, বলতো কার মুখে দিই এই চাল কটা।”<sup>৯</sup>

তীব্র অভাব, অন্নসংকট, ক্ষুধার্ত মাখনের বায়না, খেতে চাওয়া, কুঞ্জ ও প্রধানের কিছু করতে না পারার অসহায়তা এই সঙ্কটাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে নাটকটি এগিয়ে গেছে।

নবান্ন নাটকটি গণনাট্য আন্দোলনে নতুন জোয়ার এনেছিল। নবান্ন হলো গ্রামবাংলা নতুন অন্নের উৎসব। সমস্ত প্রতিকূলতা পেরিয়ে পুরুষের সাথে নারীরা ও সামিল হয়েছে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে। বাংলার এই দুর্ভিক্ষের চরম মুহূর্তে সাহসী নারীর প্রতিমূর্তি হিসেবে আমরা দেখতে পাই প্রধানের স্ত্রী পঞ্চগননীকে। দারিদ্রতা নিত্যসঙ্গী হলেও পঞ্চগননীর মতো নারীদের কাছে আত্মসম্মানটাও জীবন যাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। পঞ্চগননীর কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই-

“প্রধান - সহ্য করতে এয়েছ সহ্য করে যাও। মুখ বুজে সহ্য করে যাও, কোন কথা কয়ো না। কোন কথা কয়ো না, অধর্ম হবে। মুখ বুজে...

পঞ্চগননী - তার আর বলবে কি। আজ তিনদিন দাঁতে এটা কুটো কাটিনি, বুঝলে! শরীরের কষ্ট আমরা সহ্য করতে পারি। সে কোন কথা না। কিন্তু শরম! লজ্জা! তোমাদের দেশের মেয়ে মানুষের অপেক্ষে ভূষণ! যা নিয়ে তোমরা গর্ব কর! আর তারপর সব চাইতে বড় কথা ইজ্জত! মেয়ে মানুষের ইজ্জত! কী কথা বলিস না যে! চুপ করে থাকিস কেন, হ্যাঁরা কুঞ্জ, কুঞ্জ, কুঞ্জ!”<sup>১০</sup>

অভাব অনাহারের মধ্যেও পঞ্চগননী আত্মসম্মান রক্ষার লড়াইয়ে নিজে সামিল হয়েছে এবং গ্রামবাসীদের উৎসাহ দিয়েছে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য। নাটকে পঞ্চগননীর কণ্ঠে শোনা যায়-

“পঞ্চগননী - আমিনপুরের কলঙ্ক, আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পিছু হটছিস। পেছসনে, এগিয়ে যা। এগিয়ে যা তোরা সব, এগিয়ে যা।”<sup>১৯</sup>

পঞ্চগননী প্রতিবাদী তার সঙ্গে সঙ্গে নাটকের অন্যতম নারী চরিত্র রাধিকা এবং বিনোদিনী তারাও সমান প্রতিবাদী। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে শাসক সম্প্রদায়ের মুখোশ উন্মোচন করে দিতে তারা পিছু হটেনি। তারা অভাব, অনাহার, নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থেকেও আত্মসম্মানের লড়াইয়ে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যবাহিনীর অত্যাচারে আমিনপুরের কৃষক সমাজ যখন অতিষ্ঠ এছাড়াও প্রতিকারের আন্দোলনে যখন প্রধানের দুই ছেলে নিহত এবং গ্রামের নারীদের মান সম্মান নিয়ে টানাটানি সেই সেই সময়ে পঞ্চগননী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসে। আমরা সম্মিলিত সেই প্রতিরোধের ছবি দেখতে পাই এই 'নবান্ন' নাটকটিতে।

এরপর আমিনপুরে দুর্ভিক্ষ মহামারিতে কৃষক সমাজ দিশাহারা হয়ে যায়, সাথে ভয়াবহ বন্যা, সাইক্লোনের ফলে ঘরবাড়ি, ফসলের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। আন্তে আন্তে মহামড়কের ফলে গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়ে। এত কিছুর পরেও হারু দত্তের মতো স্বার্থপর সর্বগ্রাসী মানুষের দৃষ্টি পরে সাধারণ খেঁটে খাওয়া মানুষের ওপর। তিনি মুখে মিষ্টি কথা বলে, আর পাছে সাধারণ মানুষের শেষ সম্বল জমিটুকু কেড়ে নিতে আসে। তার কাছে কুঞ্জ এবং প্রধান জমি বিক্রি করতে চায় না। কুঞ্জ বলে ওঠে-

“টাকার লোবানি দিয়ে দেশশুদ্ধ লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে, এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েছে। ও জমি বিক্রি হবে না বলে দ্যাও।”<sup>২০</sup>

রাষ্ট্রের অত্যাচার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মড়ক ও মন্বন্তরে বিপর্যস্ত মানুষের নিদারুণ অবস্থা ফুটে উঠেছে এবং তারই সহযোগী হয়ে উঠেছে হারু দত্ত। আকালের সুযোগ নিয়ে হারু দত্ত গোপনে মেয়ে পাচার এবং নারী ব্যবসা চালাতে থাকে, এক গোষ্ঠীর মানুষের বিপদের দিনে আর এক গোষ্ঠীর মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিয়ে যে মনুষ্যত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে তার এই ছবি এখানে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। মহাজনের কাছে সর্বস্ব হারিয়ে ও অত্যাচারের স্বীকার হয়ে গ্রামবাসীদের নিঃস্ব হয়ে চলে যেতে হয় নগর কলকাতায়। সেখানে গিয়ে তারা পেট ভরে দুটো খেতেও পায় না। বেঁচে থাকার তাগিদে ভাত তো দূরের কথা সামান্য ফ্যানও তাদের কপালে জোটে না। মানুষে কুকুরে লড়াই করে ডাস্টবিন থেকে খাবার পেতেও তারা অসমর্থ হয়, অথচ একই শহরের সমাজের বড় বাবুরা স্বার্থপর লোকেদের নিমন্ত্রণ করে খাবার খাওয়াচ্ছে আর ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর মানুষের আর্তনাদ সেই নিষ্ঠুর মানুষদের কানে পৌঁছাচ্ছে না। প্রধান সমাদ্দার ক্ষোভে, দুঃখে, ঘৃণায় উঁচু তলার মানুষগুলোর প্রতি চিৎকার করে বলতে থাকে-

“আর কত টেঁচাব বাবু দুটো ভাতের জন্যে! তোমরা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু - কিছু কানে শোন না? অন্তর কি সব তোমাদের পাষণ হয়ে গেছে বাবু।”<sup>২১</sup>

ধীরে ধীরে এই সমস্ত কালোবাজারির প্রকোপ, নির্যাতন, মহামারীর যন্ত্রনা সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা থেকে মানুষের উত্তরন ঘটে, আমিনপুরের মানুষেরা পুনরায় গ্রামে ফিরে এসে জোট বাঁধে এবং নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। তারা ধানের গোলা তৈরি করে তাতে ধান জমা করে নবান্ন উৎসবের আয়োজন করে। কিন্তু তারা তাদের প্রতিকূল অবস্থার কথাও ভোলে না, তারা বুঝতে পারে যে শুধু ফসল ফলালেই সমস্যার সমাধান হবে না বরং একসঙ্গে থেকেই অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব।

গণনাট্য আন্দোলনে লোকজ মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি এবং খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও বিপ্লব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গণনাট্য সংঘ সমকালীন নাট্য আন্দোলনে এই জাতীয় নাটককেই সাদরে গ্রহণ করেছিল। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য এই নাটকটির মাধ্যমে গণনাট্য আন্দোলন কে যেমন জোরদার করেছিলেন তেমনি নিরন্ন, নির্যাতিত, নিপীড়িত কৃষক সমাজের মুক্তির পথটিও দেখিয়েছেন। চন্দন খাঁ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন-

“আমাদের দেশের অসংগঠিত কৃষক সমাজ সংঘবদ্ধ শক্তি নিয়ে বিপ্লবের সামিল হলে একদিন স্বপ্নের ভোর আসবেই। কমিউনিস্ট বিজন বাবুও এই স্বপ্ন পথের অভিযাত্রী ছিলেন। তার এই স্বপ্ন কিন্তু রোমান্টিক কল্পনা বিলাস নয়, এ স্বপ্নের মধ্যে মিশে আছে ঘাম, অশ্রু, আর রক্তের নোনতা স্বাদ। কোন পথে কৃষক মুক্তি সম্ভব, নাট্যকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেই দিক চিহ্নটি আলোচনা নাটকে তুলে ধরেছেন।”<sup>১৪</sup>

বিজন ভট্টাচার্য সমাজের অবহেলিত, নির্যাতিত, শোষিত, বঞ্চিত নানাশ্রেণীর মানুষের জীবন সংগ্রামের করুণ চিত্র তার বেশ কয়েকটি নাটকেই তুলে ধরেছেন। গণনাট্য আন্দোলন মূলত গণের আন্দোলন অর্থাৎ জনগণের একত্রিত হয়ে লড়ার আন্দোলন, এখানেই ব্যক্তি কেন্দ্রিক ভাবধরার কোন স্থান নেই। সমবেত হওয়ায় এখানকার মূল সুর। পরবর্তীকালে মতাদর্শগত কারণে নাট্যকার এই গণনাট্য সংঘ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন কিন্তু তিনি পুরোপুরি এই আবহের বাইরে যেতে পারেননি এ প্রসঙ্গে পবিত্র সরকার বলেছেন- “যাঁরা নাটক দিয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘকে উজ্জীবিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য নানা কারণে গণনাট্য ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তাঁর নাটকে গণনাট্যের মূল লক্ষ্য অধিকাংশত বজায় ছিল।”<sup>১৫</sup> গণনাট্যের প্রচলিত ধারণায় এই গণ কথাটি বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। গণনাট্যে জনগণের আশা - আকাঙ্ক্ষা, সুখ- দুঃখ, আনন্দ -বেদনা এবং সর্বোপরি তার সংগ্রাম উপজীব্য হয়ে দেখা দেয়। তাই একসময় জননাট্য কথাটি চালু ছিল। শুধুমাত্র জনগণের সুখ ও দুঃখের লড়াই নয় তাদের সামগ্রিক জীবনকে দেখা ও তাদের প্রয়াসগুলোকে মার্কবাদের দৃষ্টি দিয়ে দেখা এবং দেখানোটাই ছিল গণনাট্যের মূল উদ্দেশ্য।

### তথ্যসূত্র:

- ১) চৌধুরী, দর্শন, ‘গণনাট্য আন্দোলন’, দ্বিতীয় প্রকাশ, অনুষ্ঠিত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা. ১।
- ২) রায়, মন্দিরা, ‘গণনাট্য এবং নবনাট্য: একটি বিতর্ক’, বামা পুস্তকলয়, কলকাতা, ২০০৪ পৃষ্ঠা ৪।
- ৩) চৌধুরী, দর্শন, ‘গণনাট্য আন্দোলন’, অনুষ্ঠিত প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৩৩।
- ৪) চৌধুরী, দর্শন, ‘গণনাট্যের নবান্ন: পুনর্মূল্যায়ন’, বামা পুস্তকলয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ১০৬।

- ৫) ভট্টাচার্য, আশুতোষ, 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রা. লি ., কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৪৪।
- ৬) নবারুণ, ভট্টাচার্য ও শমিক, বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'বিজন ভট্টাচার্য রচনাসংগ্রহ', দেজ পাবলিশিং কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৫, জুলাই ২০০৮, পৃ. ৫৪।
- ৭) দর্শন, চৌধুরী, 'গণনাট্য আন্দোলন', অনুষ্ঠাপ প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ১৯৯৪, পৃ. ১৮৪।
- ৮) নবারুণ, ভট্টাচার্য ও শমিক, বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), বিজন ভট্টাচার্য রচনাসংগ্রহ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৫ জুলাই ২০০৮, পৃ. ৩৯।
- ৯) তদেব, পৃষ্ঠা ৪৬।
- ১০) নবারুণ, ভট্টাচার্য ও শমিক, বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'বিজন ভট্টাচার্য রচনাসংগ্রহ', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১৫, জুলাই ২০০৮, পৃ. ৩৫।
- ১১) তদেব, পৃষ্ঠা ৩৮।
- ১২) তদেব, পৃষ্ঠা ৫৮।
- ১৩) তদেব, পৃষ্ঠা ৭৭।
- ১৪) খাঁ, চন্দন, 'দেবীগর্জন : পুনর্মূল্যায়ন', ঘোষ এন্ড কোং, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৩৮।
- ১৫) সরকার, পবিত্র, 'নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ', প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ , ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২২৯।



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 584-591

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.046



## মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত গল্পে ভাতের অভাব একটি বিশ্লেষণী পাঠ

রাজু লায়েক, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উইমেন্স কলেজ, তিনসুকিয়া, আসাম, ভারত

Received: 19.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*Mahasweta Devi's work is not only a treasure trove of Bengali literature, but has also earned her the status of one of the greatest Indian authors. She was involved in various movements and initiatives during the second half of the 20th century. Based on this experience, she undertook numerous projects aimed at supporting the lower classes and tribal communities across several states in India, including West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, and Chhattisgarh. She connected with their lives, feeling their happiness, sorrow, hopes, aspirations, livelihoods, exploitation, and deprivation. This empathy is also reflected in her literary work and the characters she created. Therefore, it is said that Mahasweta's pen acted as their representative.*

*In her various novels and stories, such as "Bhat," "Sanjh-Sakaler Maa," and "Jatudhan," the issue of food shortages, along with other pressing problems, is particularly evident. The analysis of these three stories illustrates how people's mindsets have changed regarding the scarcity of food and highlights the helplessness experienced by individuals facing these shortages.*

**Key Words:** Rice, Livelihood, Common man, Scarcity, Food.

পৃথিবীর সব সাহিত্যে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি একান্তভাবেই লক্ষণীয়। প্রায় সব ভাষার সাহিত্যে সমাজ ও বাস্তবতা মুখ্য বিষয়। নিম্নবর্ণের সাধারণ থেকে অতি সাধারণ মানুষ ও জনজাতিকে কেন্দ্র করে যারা সাহিত্য রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর জন্ম ১৪ই জানুয়ারি ১৯২৬ সালে বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকায়। পিতা সাহিত্যিক মনীষ ঘটক। মাতার নাম ধরিত্রী দেবী। মহাশ্বেতা দেবীর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'ঝাঁসীর রাণী' ও প্রথম উপন্যাস 'নটী'। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় শতাধিক। কথাসাহিত্য থেকে আরম্ভ করে অনুবাদ ও জীবনীসহ সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় তিনি অবদান রেখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাকর্মগুলি হল— 'হাজার চুরাশির মা', 'অরণ্যের অধিকার', 'কবি বন্দ্যঘটি গাঞির জীবন ও মৃত্যু', 'অগ্নিগর্ভ', 'স্তনদায়িনী এবং অন্যান্য গল্প', ও 'চোড়ি মুঞ্জা এবং তার তীর' ইত্যাদি। আদিবাসী মানুষদের নিয়ে কাজ করার জন্য ১৯৮৬ সালে তিনি 'পদ্মশ্রী' পুরস্কার লাভ করেন। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর

রচিত গল্পে তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে অন্যতম বিষয় হল খাদ্যের অভাব। তাঁর রচিত তিনটি গল্প ‘ভাত’, ‘সাঁঝ-সকালের মা’ ও ‘জাতুধান’ নির্বাচিত করে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অন্ন বা ভাতের অভাবের চিত্র ফুটে উঠেছে তা এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমাজ, মানুষের মন, জীবন-জীবিকা, অভাব-অনটন, মানুষের সরলতা, শোষণের চিত্র ইত্যাদি বিভিন্ন দিক গল্পগুলির মধ্যে দেখা দিয়েছে। খাদ্য ও অভাবের তাড়না মানুষকে কীভাবে বিচলিত করেছে তা তৎকালীন সময়ের বাস্তবতাকেই ব্যক্ত করে। মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য রচনার উৎস সম্পর্কে জানা যায়—

“I have always believed that the real history is made by ordinary people. I constantly come across the reappearance, in various forms, of folklore, ballads, myths and legends, carried by ordinary people across generations. ... The reason and the inspiration for my writing are those people who are exploited and used, and yet do not accept defeat. For me, the endless source of ingredients for writing is in these amazingly noble, suffering human beings. Why should I look for my raw materials elsewhere, once I have started knowing them? Sometimes it seems to me that my writing is really their doing.”<sup>১</sup>

## ১

সাধারণ মানুষের বাস্তব সত্যকে মহাশ্বেতা দেবীর বহু গল্পে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এইরকমই একটি বাস্তব সত্য হল খাদ্যের অভাব বা ভাতের অভাবের চিত্র। তাঁর যে গল্পগুলিতে ভাতের অভাব চোখে পড়ে তার মধ্যে ‘ভাত’, ‘সাঁঝ-সকালের মা’ ও ‘জাতুধান’ এই তিনটি গল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত গল্পগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে কীভাবে গল্পের চরিত্রগুলিকে ভাতের অভাব প্রভাবিত করেছে।

**‘ভাত’:** ‘ভাত’ গল্পের নায়ক বা প্রধান চরিত্র উৎসব নাইয়া, গল্পে যাকে ‘উচ্ছব’ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সে আবাদ অঞ্চলের মানুষ। উচ্ছবের সংসারে রয়েছে স্ত্রী, ছেলে ও এক মেয়ে। সতীশ মিস্তিরির জমিতে উচ্ছব কাজ করে বছরের কয়েকটি মাস কোনোভাবে কষ্টের মধ্যদিয়ে জীবন-যাপন করে। গল্পে দেখা যায়, তার মনিবের ধানের ফলন এবার আশানুরূপ হয়নি, কারণ ‘ধানে মড়ক’ লেগেছে। যার ফলে দুশ্চিন্তায় উচ্ছবের কান্নায় চোখে জল আসে। তারপর ধান ক্ষেতে লাগে আগুন। উচ্ছবের বাড়ি মাতলা নদীর তীরে। সন্ধ্যার পর প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মাতলা নদী উত্তাল হয়ে ওঠে। এইসব দুশ্চিন্তার মধ্যে সেই দিন সন্ধ্যার সময় উচ্ছব পেট ভরে খেয়েছিল হিঞ্জে আর গুগলি সেদ্ধ নুন লক্ষা পোড়া দিয়ে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঘরবাড়ি সমেত পুরো পরিবারকে হারিয়ে উচ্ছবের জীবন ছন্নছাড়া হয়ে উঠেছে। একটি গাছকে আঁকড়ে ধরে নিজের জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়েছে ঠিকই। কিন্তু পর পর কয়েকদিন পরিবারের সন্ধান করে তার পেটে কিছুই পড়েনি। এত বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর উচ্ছবের মনিব তাকে নানা অজুহাত দেখিয়ে ভাত দিতে অস্বীকার করে।

গল্পের আরেক চরিত্র বাসিনী, উচ্ছব নাইয়ার গ্রামের মেয়ে। দুর্যোগের পর বাসিনীর বোন ও ভাজ কলকাতা যাচ্ছিল। আর এই গ্রামের সকলেই অবগত বাসিনী কলকাতায় যে বাড়িতে কাজ করে, সেখানে ভাতের বিন্দুমাত্র অভাব নেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উচ্ছবের সংসারে আজ আর কেউ জীবিত নেই, সে এখন দিশেহারা। তাই উচ্ছবের মনে হঠাৎ করে চিন্তা আসে কয়েকদিন কলকাতায় থেকে খেয়ে মেখে আসবে।

অপর দিকে বাসিনীর কাজের বাড়িতে কর্তা বিরামি বছর বয়সে লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত। কর্তার সুস্থ কামনা করে হোম-যজ্ঞ-এর সাথে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্তে বাসিনীর সূত্রে উচ্ছবের কাজ জুটে যায় একটা। খালি পেটে উচ্ছবের উপর আধ মণ করে ওজনের পাঁচ রকমের কাঠ দেড় হাত মাপ করে কাটার দায়িত্ব বর্তায়। উচ্ছব খিদের চোটে বাসিনীর কাছে সামান্য চাল প্রার্থনা করে, শুধু জল দিয়ে চাল খেয়ে নেবে। বাসিনীর চালের বর্ণনা শুনে উচ্ছবের চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে ওঠে—

“ঝিঙেশাল চালের ভাত নিরামিষ ডাল তরকারির সঙ্গে। রামশাল চালের ভাত মাছের সঙ্গে। বড়বাবু কনকপানি চাল ছাড়া খান না, মেজ আর ছোটোর জন্য বারোমাস পদ্মজালি চাল রান্না হয়। বামুন চাকর ঝি-দের জন্য মোটা সাপটা চাল। বাদার লোকটি কাঠ কাটতে কাটতে চোখ তুলে দেখে। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে তার।”<sup>২</sup>

উচ্ছব কর্মঠ মানুষ, নিজের কাজের প্রতি একনিষ্ঠ। কাঠ কাটার কাজ শেষ করে, সে ভেবেছিল ভাত পাবে। কিন্তু তান্ত্রিক বিধান দেন হোম-যজ্ঞ শেষ হলে খাওয়া-দাওয়া হবে। ঘটনাচক্রে বাড়ির কর্তা পূজা শেষ হওয়ার পূর্বেই স্বর্গ লাভ করেন। যার ফলে রান্না করা নানা রকমের খাদ্য অশুচি হয়ে পড়ে। মৃত কর্তার শ্মশান যাত্রার পর অশুচি খাদ্য সামগ্রী বাইরে ফেলে দেওয়ার দায়িত্ব বাসিনীর উপর পড়লে কাজের সাহায্যের জন্য উচ্ছবের ডাক পড়ে। অভাবগ্রস্ত ও উপবাসী উচ্ছব, যার কাছে ভাত হল লক্ষ্মী। ভাত বাড়ির বাইরে ফেলতে গিয়ে উচ্ছব স্থির করে—

“মোটা চালের ভাতের বড়ো ডেকচি নিয়ে সে বলে, দূরে ফেলে দে আসি।

--হ্যাঁ হ্যাঁ লয়তো কুকুরে ছেটাবে, সকালে কাকে ঠোক দেবে— বামুন বলে।

বেরিয়ে এসে উচ্ছব হনহনিয়ে হাঁটতে থাকে। খানিক হেঁটে সে আধা দৌড় মারে।

ভাত, বাদার ভাত তার হাতে এখন। পথে ঢেলে দেবে? কাক—কুকুরে খাবে?

--দাদা। --ব্রহ্ম বাসিনী প্রায় ছুটে আসে, অশুচি বাড়ি ভাত দাদা খেতে নি দাদা।...

উচ্ছব ফিরে দাঁড়ায়। তার চোখে এখন বাদার কামটের মতো হিংস্র। দাঁতগুলো বের করে সে কামটের মতোই হিংস্র ভঙ্গি করে। বাসিনী থমকে দাঁড়ায়।

উচ্ছব দৌড়তে থাকে। প্রায় এক নিশ্বাসে সে স্টেশনে চলে যায়। বসে ও খাবল খাবল ভাত খায়।

ভাতে হাত ঢুকিয়ে দিতে সে স্বর্গ সুখ পায় ভাতের স্পর্শে। চুম্বীর মা কখনো তাকে এমন সুখ দিতে

পারে নি। খেতে খেতে তার যে কি হয়। মুখ ডুবিয়ে দিয়ে খায়। ভাত, শুধু ভাত। বাদার ভাত।

বাদার ভাত খেলে তবে তো সে আসল বাদাটার খোঁজ পেয়ে যাবে একদিন। ... আরো ভাত খেয়ে

নি। চুম্বীরি রে! তুইও খা, চুম্বীরি মা খাও, ছোটো খোকা খা, আমার মধ্যে বসে তোরাও খা! আঃ!

এবার জল খাই, জল! তারপর আরো ভাত।”<sup>৩</sup>

**‘সাঁঝ-সকালের মা’:** মহাশ্বেতা দেবীর অন্যতম একটি ছোটগল্প হল— ‘সাঁঝ-সকালের মা’। উক্ত গল্পের মূল চরিত্র জটেশ্বরী ও তার ছেলে সাধন কান্দোরী। সাধনের বাল্যকালেই পিতার মৃত্যু ঘটে। তার মা বহু কষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষ করেছে তাকে। ঘটনাসূত্রে তার মা নিজের ও সন্তানের নিরাপত্তার খাতিরে জটেশ্বরী থেকে জটি ঠাকুরনী হয়েছে। কিন্তু ঠাকুরনী হলেও অতিরিক্ত লোভ বা লালসা তার ছিল না। ভক্তের কাছে শুধু সামান্য চালের দানেই তাদের জীবন চলে যায়। জটির হৃষ্টপুষ্ট সন্তান সাধন তার কাছে তিরিশ বছর



বয়সেও ‘দুধের ছিলা’। সাধনের বউ পালিয়ে গিয়ে বাপের বাড়িতে রয়েছে। জটি তার সন্তানের সাঁঝ ও সকালের মা। এবং দিনের বেলা জটি ঠাকুরনী অগণ্য ভক্তের আশ্রয়স্থল। ঠাকুরনীর পোশাক বলতে লাল রঙের চেলি, দিনে তার খাদ্য বস্তু— গঙ্গা জল, চা ও গাঁজা। জটি সারাদিনে ভক্তদের কাছ থেকে যে চাল পেয়ে থাকে, সেটাই সাধনকে রাত্রে ভাত রান্না করে দেয়। তার নিজের পেটে তেমন কিছু পড়ে না। গল্পে দেখা যায়, সাধন মায়ের উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। সাধনের প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা দেবী তাঁর গল্পে লিখেছেন—

“মা ছাড়া সাধন কান্দারী কিছু জানে না। সাধন নির্বোধ, তিরিশ বছর বয়সেও ওর বুদ্ধিসুদ্ধি অপরিণত। মোষের মত শরীরে ওর পাকস্থলী ছাড়া আর কিছু নেই। ... আর আছে খিদে। শুধু খেতে দেবার লোভ দেখিয়ে ওকে দিয়ে ওর মনিবের যুবতী বউ কাঠ চ্যালা করায়, টিউবকলের জল টানায়। মণ মণ কয়লা ভাঙিয়ে নেয়।”<sup>৪</sup>

উক্ত গল্পের প্রারম্ভেই দেখা যায় সাধনের মা অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তিন দিন পর ডাক্তার জটির রোগ নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। সাধনের মা ‘অনাহার’ রোগে আক্রান্ত। যে রোগের চিকিৎসা, চিকিৎসকের কাছে নেই। জটির ইচ্ছানুসারে নিজের বাড়ির উঠোনেই তার জীবনের অন্তিম অধ্যায় সমাপ্ত হয়। সাধনের প্রথম এবং একমাত্র ভরসার শেষ আশ্রয়স্থল জটি স্বর্গলাভ করে। জটির শিষ্য অনাদি ডাক্তারের অর্থানুকূলে সাধনের মায়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সাধন আজ বড় একা, তাকে ভাত দেওয়ার কেউ নেই। মায়ের শ্রাদ্ধের চাল সাধন পুরোহিতকে দান করতে অনিচ্ছুক। কারণ তার হাতে টাকা নেই, বাড়িতে চালও নেই। ‘ভাত’ প্রিয় সাধন বাড়িতে গিয়ে কী খাবে? তাই সে চাল নিয়ে শ্রাদ্ধের শেষে পুরোহিতের সাথে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে—

“মত্ত হাতীর মতো চেষ্টিয়ে উঠল সাধন। বলল, ঘরে কানাকড়ি লাই যে কিনে আঁধব। ই চাল আমি হাত ছাড়া করি!... পুরুত নিষ্ফল আক্রোশে বলল, ‘শ্রাদ্ধের চাল নিয়ে রেঁধে খাওয়া? এই শ্রাদ্ধ তোর নষ্ট হল ব্যাটা!’”<sup>৫</sup>

মানুষ অভাবের কাছে অসহায়। তা সাধনের চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। গল্পের শেষাংশে সাধনের একাকী জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্পকার জানিয়েছেন, যে—

“বুকের কাছে চালের পোঁটলা, সাধন হেলে দুলে বাড়ি যায়। সাধন বাড়ি যাবে, উনোন ধরাবে ভাত রাঁধবে। ভাতের গন্ধ বড় ভালো গন্ধ। ভাতের গন্ধে সাধন তার মাকে খুঁজে পায়। যতদিন ভাত রাঁধবে সাধন, তপ্ত ভাত খাবে, তত দিন ওর কাছে সাঁঝ-সকালের মা বাঁধা থাকবে।”<sup>৬</sup>

পেটের ক্ষুধা বড় বালাই, সামান্য চাল, তাও আবার শ্রাদ্ধের চাল, যেটি শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য সেটিও সাধন হাত ছাড়া করতে চায় না। অভাব, অনাহার, অনটন মানুষকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে সাধন তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তার কৃত কর্মের জন্য সে অনুশোচনা করেছে ঠিকই কিন্তু বর্তমান অবস্থা তাকে নিরুপায় করে তুলেছে। তাই মায়ের কথা মনে করতে গিয়ে দুঃখের স্বরে সাধনের উক্তি—

“মায়ের কথা মনে করতে গিয়ে পুরুতের ওপর দুর্ব্যবহারের অনুতাপে সাধনের চোখ জলে ভেসে গেল। মা তুমি যেমন তেমন করে স্বর্গে যাও। সাধন এখন ভাত রেঁধে খাবে। তুমি দোষ নিও না।”<sup>৭</sup>

**‘জাতুধান’:** ‘জাতুধান’ গল্পের নায়ক সাজুয়া তিওর। ‘ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত ‘সেমি শহর’ বেলেটি। আর এই বেলেটির তিওর পাড়াতেই সাজুয়ার বাসস্থান। এই অঞ্চলের জমিদার রাম সিংগি এবং তার প্রজা হল তিওর সম্প্রদায়ের মানুষ। তবে বর্তমানে রাম সিংগির জমিতে তিওরা বর্গাদার। সাজুয়াকে গল্পকার রাম সিংগির মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দিনে গল্পের অন্যান্য চরিত্র এবং পাঠকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন—

“সাজুয়ার সামনে এসে রাম সিংগি অন্যদের বলে, ‘এর কথাই বলছিলাম। মা ওকে বসে খাইয়ে গেছে। পাকা দু কিলো চালের ভাত জলপান খাবে, আবার বিকেলে আড়াই কিলো চালের ভাত।’ সাজুয়া না বলে খেয়ে যাচ্ছিল। ওদের বেলা ভাত-ডাল-কুমড়োর ঘ্যাঁট ও মাছের টক। ভাতের পাহাড় উড়িয়ে দিচ্ছিল ও কথা না কয়ে। ওর রান্ধুসে খাওয়া লোকে দেখে ও জানে। ও তাতে বিচলিত হয় না।”<sup>৮</sup>

সাজুয়ার খাওয়া শেষ হওয়ার পর শ্রাদ্ধের পুরোহিত মশায় ও সাজুয়ার কথোপকথন থেকে তার নামকরণের ইতিহাস জানা যায়। এবং এই নামটি সে সানন্দে গ্রহণ করেছে। সেই সাথে তার সংসারের অভাবের চিত্রও পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না—

“দেখতে দেখতে পুরুরত বললেন, ‘এটা বেটা জাতুধান। মানে রান্ধুস।’ সাজুয়া খেয়ে সে বামুনকে প্রণাম ঠুকল। বলল, ‘কি বলছিলে হে ঠাকুর? খাওয়া দেখছিলে? খাওয়ার লেগে রান্ধুস বলে মোরে সবাই। উ পরিবারও বলে। লামে কি হয়? ...পুরুরত বললেন ‘রান্ধুস কি হে। তুমি বাবা জাতুধান! ‘রান্ধুস’ নামে জাঁকজমক নাই। জাতুধান বলে বেশ মানাচ্ছে।’ ‘তা ভাল’। ‘তা বাবা, পেটটি করেছ বড়। পেটের অন্ন জুটাতে তো মুশকিল।’ জুটে কই? জুটে না ত? যেদিন জুটেবে, খুব খাব। না জুটলে পেটে কিল।’ সেই থেকে সাজুয়া জাতুধান। আর সবাই ভোজ পেয়েছে, ও একটা সম্মানী খেতাবও পেয়েছে। জাতুধান! নামটি ওর পছন্দ হয়েছে উচ্চারণ করতে ওর জিভেও এড়ে না।”<sup>৯</sup>

ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত বেলেটির চরে কৃষিকাজের উপর সাজুয়া নির্ভরশীল। কোনো বছর চাষ হয়, আবার কোনো বছর নদীর জলে ফসল ভেসে যায়। যখন চাষের কাজ হয়, তখনই সাজুয়ার ঠিক মতো পেট ভরে না। এবং গল্পে দেখা যায়, সাজুয়ার বউ তাকে কম খাওয়ার পরামর্শ দিলে, সে তা রাখতে পারে না। তখন সে তিওরদের নেতা মাতং-এর নেতৃত্বে বেলেটির বাইরে কখনও ঠিকামজুরের কাজে, কখনও চাষের কাজে চলে যায়। সে পেটচুক্তি ভাতে কাজ করে, মজুরী নেয় ধানে। একবার কাটোয়াতে চাষের কাজের সময় কুণ্ড বাড়িতে তার কাকা মারা গেলে অশুচি ভাত দুদিন ধরে সাজুয়া খেয়ে ছিল। আবার কখনও রাম সিংগির বাড়িতে কাজ করে দুবেলা পেটচুক্তি ভাতে।

গল্পে দেখা যায়, ফারাক্কা জলাধারে জল ছাড়ার খবর রাম সিংগির কাছে এলে সে তার গরু মহিষের বাথান উচ্চস্থানে সরিয়ে নিয়ে যায়। এবং সাজুয়া তার গৃহপালিত পশুদের জন্য গোয়াল ঘর বাঁধে পেটচুক্তি ভাতে। কিন্তু রাম সিংগি জল ছাড়ার সংবাদটি গ্রামবাসীদের কাছে গোপন রাখে। দুদিন পর গ্রামে বন্যার জল এসে পড়ে। অপর দিকে রাম সিংগি, সাজুয়া ও তিওরদের চাষের ফসল রয়েছে বেলেটির চরে। মাতং তখন রাম সিংগির কথা মতো সাজুয়া ও অন্যান্য কৃষকদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ে চরে সোনার ফসল বাঁচাতে। আর সাজুয়া ফসল বাঁচাতে গিয়ে বন্যার জলে তলিয়ে যায়। গ্রামের মানুষ ও সাজুয়ার পরিবারভাবে তার মৃত্যু হয়েছে। কারণ জলের মধ্যে পুলিশ তার চেহারার সাদৃশ্য একটি পচাগলা লাশ উদ্ধার করে।

মাতং নিজেও তিওর সম্প্রদায়ের মানুষ এবং তাদের নেতা। সে এই কঠিন অবস্থায় সাজুয়ার পরিবারের পাশে দাঁড়ায়। সাজুয়ার কুশ পুতুল দাহ করা হয়। তার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জন্য রাম সিংগির কাছ থেকে মাতং চাপ দিয়ে এক বস্তা চাল আদায় করে নিয়ে আসে। এবং বাকি সব ব্যবস্থা করে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ঘটনাসূত্রে সেদিন রাত্রে মাতং-এর বাড়িতে হঠাৎ করে সাজুয়া এসে উপস্থিত হলে সে অবাক হয়ে যায়। তারপর সাজুয়া নিজের বাড়িতে এলে তার মা ও বউ তাকে দেখে ভাবে ভূত এসেছে। সাজুয়া তার পরিবার ও মাতংকে জানায় বন্যার জলে কীভাবে সে বেঁচে ফিরে এসেছে, তার কাহিনি। মাতং ও সাজুয়ার পরিবার সিদ্ধান্ত নেয় যে, শুদ্ধ করে সাজুয়াকে ঘরে তুলবে। এবং চাল রাম সিংগিকে ফিরিয়ে দেবে। সাজুয়া বাড়িতে বস্তা ভর্তি নিজের শ্রাদ্ধের জন্য আনা চাল দেখে আনন্দে উল্লাসিত হয়ে ওঠে। সে ভাবে মাতং ব্যতীত বাইরের কোনো ব্যক্তি তার জীবিত থাকার সংবাদ জানে না। তাই মাতংকে অনুরোধ করে সংবাদটি চেপে যেতে। তারপর সাজুয়া বস্তা ভর্তি চাল ও তার পরিবারকে নিয়ে রাত্রের অন্ধকারে ঘর ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়—

“সাজুয়া হাসে। বলে, ‘আমি তো রাক্ষস, জাতুধান, আমার ছরাদের চাল আমি খাব না? আরে এমন ছরাদ হয় নাই! যার ছরাদ সে এসে ভাত খায়, কেউ এমন ছরাদ দেখেছে?’... ‘শুদ্ধি হল না, দাহ হল, দেও-দেবতার রিষে পড়বি।’ ‘পড়লে পড়ব। পেটে ভাত রলে বুড়া, সকল দেবতার বেরখা যায়।’”<sup>১০</sup>

## ২

মহাশ্বেতা দেবী বিংশ শতকের সত্তর ও আশির দশকে বাংলা, বিহার, মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জনজাতিদের নিয়ে কাজ করেছেন। তাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবন-জীবিকার সাথে পরিচিত হয়েছেন। এবং সাহিত্যে তাদের কথা তুলে ধরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ‘মহাশ্বেতা দেবীর গল্পসঙ্কলন’-এর ভূমিকাংশ থেকে জানা যায়—

“1984 সালে প্রকাশিত তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’-এর ভূমিকায় মহাশ্বেতা দেবী লিখেছিলেন, ‘সাহিত্যকে শুধু ভাষা, শৈলী, আঙ্গিক নিরিখে বিচার করার মানদণ্ডটি ভুল। সাহিত্য বিচার ইতিহাস প্রেক্ষিতে হওয়া দরকার। লেখকের লেখার সময় ও ইতিহাসের প্রেক্ষিত মাথায় না রাখলে কোনো লেখককেই মূল্যায়ন করা যায় না। পুরাকথাকে, পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনাকে আমি বর্তমানের প্রেক্ষিতে ফিরিয়ে এনে ব্যবহার করি অতীত ও বর্তমান যে লোকবৃত্তে আসলে অবিচ্ছিন্ন ধারায় গ্রথিত তাই বলার জন্য।’ এই ‘অবিচ্ছিন্ন ধারা’টিও বায়বীয় কিছু নয়, বরং জাতপাত, জমিজঙ্গলের অধিকার, এবং সর্বোপরি ক্ষমতাসীন শ্রেণীর ক্ষমতার আক্ষফালনের তথা কায়েম রাখার পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে নিম্নবর্গীয় মানুষের শোষণের ক্রমান্বয়িক ইতিহাস।”<sup>১১</sup>

‘ভাত’ গল্পে উৎসব নাইয়া, ‘সাঁঝ-সকালের মা’ গল্পে সাধন কান্দোরী ও ‘জাতুধান’ গল্পে সাজুয়া তিওর এই তিনটি চরিত্র তফসিলী উপজাতি ও তফসিলী জাতির প্রতিনিধি স্বরূপ। চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে খাদ্য সুরক্ষার অভাব গল্পকার যেভাবে তুলে ধরেছেন তা তৎকালীন সময়ের ইতিহাসকেই ব্যক্ত করে। ভারতের মতো কৃষি প্রধান দেশের সাধারণ মানুষের প্রধান খাদ্যগুলির মধ্যে অন্যতম ‘ভাত’। কিন্তু উক্ত গল্পগুলিতে ভাতের অভাবের তাড়না চরিত্রগুলির মন-প্রাণ বিচলিত করে তুলেছে। যার ফলে শ্রাদ্ধের

চাউল হোক, বা দানের চাউল, বা অশুচির ভাত খাদ্যের তাড়না যেখানে দেখা দেয়, সেখানে শাস্ত্র, নিয়ম-নীতির কোন বাঁধন মানে না। কথায় আছে খালি পেটে ধর্ম হয় না।

‘ভাত’ গল্পে সতীশের অধীনে কৃষিকাজ করা কৃষক উচ্ছবের ভাতের অভাব দেখা যায়। কিন্তু সতীশের বা কলকাতার বাবুদের ‘বাদা’ থেকে আসা চালের অভাব হয় না। সমাজের কৃষক শ্রেণির এই দুর্দশার চিত্র শুধু ‘ভাত’ গল্পেই নয়, ‘জাতুধান’ গল্পের মধ্যেও দেখা দিয়েছে। ‘জাতুধান’ গল্পে শুধু নামের বদল হয়েছে, ‘সতীশ’-এর স্থানে রাম সিংগি দ্বারা সাজুয়ার একই শোষণের চিত্র ফুটে উঠেছে। উচ্ছব এবং সাজুয়া দুজনেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়েছে। উচ্ছব তার সমগ্র পরিবারকে হারিয়েছে আর সাজুয়া একা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে মৃত্যুকে জয় করে ফিরে এসেছে। অভাবের তাড়নায় উচ্ছব হোক, সাজুয়া হোক বা সাধন তিনটি চরিত্রই শ্রাদ্ধের অশুচি ভাত ও চাল খেতে দ্বিধাবোধ করেনি। উচ্ছব খেয়েছে কলকাতার বাড়ির কর্তার মৃত্যুর পর অশুচি ভাত আর সাজুয়া কাটোয়াতে কৃষিকর্ম করতে গিয়ে অশুচি ভাত দুদিন ধরে খেয়েও ক্ষান্ত হয়নি। তার নিজের শ্রাদ্ধের জন্য আনা চাল সে নিজে খাবে এই নিয়ে গর্ব করেছে। সাধন মায়ের শ্রাদ্ধের চাল একরকম জোরপূর্বক পুরোহিতের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে রান্না করে ভাত খেয়েছে। বাসিনী উচ্ছবকে, মাতং সাজুয়াকে, আর পুরোহিত সাধনকে অশুচি ভাত, দেবতার রোষ আর মায়ের শ্রাদ্ধ পণ্ড হওয়ার কথা বললেও অভাবের তাড়না চরিত্রগুলিকে একরকম বাধ্য করেছে। আবার ‘সাঁঝ-সকালের মা’ গল্পে যুবতী জটেশ্বরী একদিন সমাজের দুষ্কৃতিদের হাত থেকে বাঁচার জন্য ও পেটের তাগিদে নিজের রক্ষাকবচ হিসেবে ধর্মের আশ্রয় নিয়েছিল। তেমনি তার অন্যতম একজন শিষ্য অনাদি ডাক্তার চিকিৎসা ব্যবসায় অন্যায় কাজ করে জটি ঠাকুরনীর আশ্রয়ে এসে পাপমুক্ত হয়ে অন্নদান করেছে। কিন্তু সমাজে শোষিত, অবহেলিত ও বঞ্চনার শিকার উচ্ছব, সাজুয়া আর সাধন শাস্ত্র বা ধর্মের বাঁধন মানে না। সামান্য ‘ভাত’-এর জন্য এই মানুষগুলিকে দিয়ে সহজে বঙ্কাজ করিয়ে নিয়েছে গল্পের অন্যান্য চরিত্রগুলি। যেমন— উচ্ছবকে সতীশ ও কলকাতার কাজের বাড়ির পিসিমা, সাজুয়াকে দিয়ে রাম সিংগি আর সাধনকে দিয়ে তার মনীষের যুবতী স্ত্রী। কর্মের বিনিময়ে একবেলা পেটচুক্তি ভাত। এই ছিল তৎকালীন সময়ের ব্যবস্থা। সমাজের সাধারণ থেকে অতি সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার প্রতিচ্ছবি। উচ্ছবকে ভাত চুরির অপরাধে নয়, পিতলের ‘ডেকচি’ চুরির অপরাধে পুলিশ ধরেছে। সাধন মায়ের মৃত্যুর পর অসহায়। ভাতের কথার মধ্যে দিয়ে মাকে মনে পড়বে তার। আর সাজুয়া অভাবের তাড়নায় গৃহত্যাগ করেছে। এবং এক বস্তা চালের জন্য রাম সিংগিকে ফাঁকি দিয়ে সে নিজেকে ভাগীরথী নদীর থেকে শক্তিমান মনে করেছে।

মহাশ্বেতা দেবী উক্ত তিনটি গল্পে একটি সাধারণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তা হল ভাতের অভাব। একমাত্র ‘সাঁঝ-সকালের মা’ গল্পে সাধনের মা জটি নিজে অনাহারে থেকে তার নির্বোধ ছেলের জন্য ভাতের ব্যবস্থা করে। এখানে জটির শুধুমাত্র সকাল ও সন্ধ্যার মা হওয়ার পিছনে যে রহস্য রয়েছে তা হল সন্তানের খাদ্যের আপূর্তি। আবার অন্য দুটি গল্পের মুখ্য চরিত্র উচ্ছব ও সাজুয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার। ভাতের কারণেই অন্যায় করার অপরাধে শেষ অবধি উচ্ছবকে পুলিশ ধরেছে। এবং সাজুয়ার অতিরিক্ত আহ্বারের জন্য তার নামের পরিবর্তন হয়ে ‘রাফস’ থেকে ‘জাতুধানে উন্নীত হয়। এই দুটি চরিত্র ভাতের অভাবের জন্য নিজ নিজ বাসভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

তাই বলাবাহুল্য মহাশ্বেতা দেবী যে সময়ে গল্পগুলি রচনা করেছেন, সেই সময়ে সমাজের সাধারণ মানুষের মূল সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম ‘ভাত’ বা খাদ্যের অভাব। তিনি সুকৌশলে তাঁর গল্পে সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবন সমস্যাকে সাহিত্যের পাতায় চিত্রিত করেছেন। এর মধ্যে লেখিকার শৈল্পিকগুণের প্রকাশ ঘটেছে। এবং একজন সমাজ সচেতন গল্পকাররূপে সাহিত্যের ইতিহাসে সার্থকতা লাভ করেছেন।

### তথ্যসূত্র:

1. Bardhan Kalpana, (Edited) ‘Of Women, Outcastes, Peasants, and Rebels: A Selection of Bengali Short Stories’. University of California Press, California, 1990. P. 24
2. দেবী মহাশ্বেতা, ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ২১০।
3. তদেব, পৃ. ২১৬।
4. দেবী মহাশ্বেতা, ‘মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন’, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, পৃ. ৬১।
5. তদেব, পৃ. ৮০।
6. তদেব, পৃ. ৮০।
7. তদেব, পৃ. ৮০।
8. দেবী মহাশ্বেতা, ‘বেহুলা’, অন্যধারা, কলিকাতা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৬।
9. তদেব, পৃ. ৫৭।
10. তদেব, পৃ. ৭৫।
11. দেবী মহাশ্বেতা, ‘মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন’, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, ভূমিকাংশ, পৃ. ৭।

### গ্রন্থপঞ্জি:

1. মহাশ্বেতা দেবী, ‘বেহুলা’, অন্যধারা, কলিকাতা, ১৩৬৮।
2. মহাশ্বেতা দেবী, ‘মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন’, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া।
3. মহাশ্বেতা দেবী, ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৪।



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 592-600

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.047



## যে স্মৃতি নহে হারাবার : বিভূতিভূষণের ‘স্মৃতির রেখা’

ড. অনুপম নস্কর, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়, সাঁইথিয়া, বীরভূম

Received: 12.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*Curiosity, mysticism, questioning all these make the great thing called life the subject of the artist. Therefore, when the level of ordinary thought runs out everyday for the artist, it becomes a leisure for new construction. Although diary is initially meant as a daily routine, in many cases, it becomes a wonderful world of selfconsciousness in the creation of the writer. Bibhutibhusan Bandopadhyay's 'Smriti Rekha' is one search memory. What is private, what is unauthorised access to the artist, gives rise to the inquiry of the literary reader. Abandoning hope, memory, nature excitement of joy, understanding of eternity, these things have come up under the shelter of the diary. This work, which was often written while staying in areas like Bhagalpur, far away from the heart of Bengal, cannot therefore be called a mere diary. Apart from that, when the author did not sit in the court of character creation in his imagination, when no literary style is his goal, he said where he is in private. This is his self - reflection.*

**Keywords:** Memories, Sense of Joy, Infinity, Introspection.

নাম-পরিচয়ে ডাক দেবার রীতি অনেকটাই সুবিধাজনক। ইনি ঔপ্যনাসিক, উনি গল্পকার, আবার কেউ সর্বগ্রাসী প্রতিভাশুনে সমস্ত কিছু। কিন্তু লেখন-বিশ্বে এমন কিছু নির্মিতি সম্ভবপর হয়ে ওঠে যাকে কোনোভাবেই দেগে দেওয়া যায় না। তখনই প্রশ্ন ওঠে, এটা কি নিছকই গল্প, এটি কি কেবলই গান! শিল্পের পাশাপাশি শিল্পীর ক্ষেত্রেও এ কথা চলবে বৈকি। আমরা বলছি আমাদের পরিচিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪ - ১৯৫০ খ্রীঃ) কথা। তাকে আমরা ঔপ্যনাসিক হিসাবেই দেখেছি, জেনেছি গল্পকার হিসাবেও। কিন্তু এমন কিছু নির্মাণ তিনি করেছেন যা তার ওই পরিচিতির পরিধিকে আরও একটু বাড়িয়ে দেবে। তখনই মনে হবে তাকে হয়তো সম্পূর্ণত জানা হয়নি সেভাবে ও।

দিনগত পাপক্ষয়ের মত সাধারণের অভিজ্ঞতায় প্রত্যেকটি দিন যখন বিনষ্টির বার্তা নিয়ে আসে, তখন কেউ আড়ালে আবড়ালে বসে দিনলিপি লিখে চলেন। তাঁর কাছে প্রতিটি মুহূর্তক্ষণ উপভোগ্য, ধীর সংবেদনে মধুর, স্মৃতি রোমছনে কখনও তা ‘স্মৃতির রেখা’। এতক্ষণে স্পষ্ট যে আমরা বিভূতিভূষণের

ডায়েরি বা দিনলিপি আলোচনায় ব্রতী হয়েছি। যা ছড়িয়ে রয়েছে ‘তৃনাকুর’, ‘উর্মি মুখর’, ‘উৎকর্ণ’, ‘হে অরণ্য কথা কও’ এর মত নানা নির্মাণের মধ্যে। এ অবসরে অবশ্য আমাদের আলোচ্য কেবলমাত্র ‘স্মৃতির রেখা’। সন - তারিখ চিহ্নিত এই দিনলিপিটি প্রকাশের সম্ভাব্য কালসীমা - ২৭শে অক্টোবর ১৯২৭ থেকে ২৬শে এপ্রিল ১৯২৮।

কি আছে ‘স্মৃতির রেখা’য়? এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই মনে আসে প্রথিতযশা প্রাবন্ধিক প্রমথনাথ বিশীর সেই প্রাসঙ্গিক উক্তি - ‘বিভূতিভূষণ আর একশ্রেণীর গ্রন্থ লিখেছেন সেসব মিশ্র উপাদানে গঠিত বলে তাদের কি নামকরণ হয় ভেবে পাইনি। ‘স্মৃতির রেখা, তৃনাকুর, উর্মিমুখর, উৎকর্ণ, হে অরণ্য কথা কও’ প্রভৃতি এক দেহে রোজনামচা, ভ্রমণকাহিনী, গল্প, আত্মচিন্তা।’

নিছক কাকতালীয় হলেও এখানে একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে পারা যায় না। আর সেটি হলো রবীন্দ্র অনুষ্ণ। আমরা জানি ‘স্মৃতির রেখা’ বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন। আবার এটি যখন তিনি লিখেছেন (১৯২৪ থেকে ১৯২৮) তখন তিনি ত্রিশ - উর্ধ্ব যুবক, এইরকমই ত্রিশ - উর্ধ্ব বয়সের সীমানায় জমিদারি পরিদর্শনের দায়ভার নিয়ে শিলাইদহ, সাজাদপুর পতিসরে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ‘ছিন্নপত্রাবলী’ এই সময়কালের ফসল। এ পর্বে সমগ্র রবীন্দ্র চেতনায় একটি গতিময় সচল রূপছবি ধরা পড়েছে, বিভূতিভূষণও কিন্তু এ বয়সপর্বে ভ্রাম্যমাণ জীবন-পথিক। ‘স্মৃতির রেখা’ তারই রূপছবি। ছিন্নপত্রাবলী যেমন নিছক পত্র নয় ‘স্মৃতির রেখা’ তেমনি নিছক রোজনামচা নয়। তাতে আছে শিল্পীর নানা mood এর ভাস্বরচনা।

স্মৃতির রেখার মতো দিনলিপিগুলির রচনাকালে লেখক যতই তার ব্যক্তি চিন্তায় মগ্ন থাকুন না কেন অনাগত কালের পাঠকবর্গ তাতে আড়ি পাতবে এটা খুব স্বাভাবিক। কেননা বিভূতিভূষণ নিজেই বলেছেন তিনি আজন্ম - পথিক; কাজেই তার শরিক হতে পাওয়া হয়তো বা দোষের নয়। বেশ কয়েকটি পর্যায়ে ‘স্মৃতির রেখা’ -র সারসত্যকে বিশ্লেষণে ব্রতী হব আমরা। যার খাঁচা কতকটা এরকম -

- ক. প্রকৃতির নিভৃত ভুবনে
- খ. স্মৃতিমেদুরতা -য়
- গ. আনন্দের বার্তায়
- ঘ. সাহিত্যের কথায়
- ঙ. প্রযত্নে ও প্রজন্মে

বলাবাহুল্য নিজের সময় নিজের মতো করে যখন ব্যয় করেছেন বিভূতিভূষণ তখনও তার আত্ম-অন্বেষণ চলেছে। এই প্রত্যেকটি পর্যায়ে আমরা তার আশ্চর্য হৃদিশ খুঁজে পাব। যা আমাদের চমকিত করবে ভাবিয়ে তুলবে।

**ক. প্রকৃতির নিভৃত ভুবনে:** কোনও কোনও সমালোচক বিশ্ব - প্রকৃতিকে বিভূতিভূষণের শিল্পী সত্তার মূল চালিকাশক্তি বলেন আবার কেউ বা বিশ্ব - মানুষকে প্রাধান্য দিতে চান। আসলে কে বড় কে ছোট কিংবা কার সঙ্গ দিতে কে এসেছে এসব প্রশ্নের সরল সমাধান তখনই উঠে আসবে যখন আমরা বিভূতিভূষণের একান্ত নিজস্ব দিনলিপিগুলি পাঠ করবো। তিনি নিজেই বলেছেন আমি ‘আজন্ম পথিক’। এ পথ জীবনেরই পথ। আর বিশ্ব - প্রকৃতি এই জীবনের আধার স্বরূপ। সৃষ্টির প্রারম্ভ- লগ্ন থেকে এই বিশ্ব-প্রকৃতির অনুধ্যান চলেছে।

'স্মৃতির রেখায়' প্রকৃতির নিভৃত ভুবন দ্বিবিধভাবে প্রতীয়মান অ. প্রকৃতির বিশুদ্ধ রূপবিভঙ্গ বর্ণনায় আ. স্মৃতির পটে প্রকৃতির রূপ চিত্রণে। ২১শে আগস্ট, ১৯২৫, ভাগলপুরে বসে লেখা দিনলিপিতে বর্ষাসন্ধ্যার স্পষ্ট ছবি

‘অন্ধকার সন্ধ্যা। বর্ষার মেঘে আকাশ ছাওয়া। জলারধারে বনে বড় বড় তাল গাছগুলো অল্প অল্প বার হওয়া তুঁতে রঙের আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষার জলে সতেজ ঘন সবুজ ঝোপঝাড়, গাছপালায় বর্ষণক্ষান্ত ভাদ্র - সন্ধ্যায় মেঘান্ধকার ঘনিয়ে আসছে। এখানে ওখানে জোনাকির দল জ্বলছে, জলের ধারে কচুবনে ব্যাঙ ডাকছে, আকাশে এক ফালি চাঁদ উঠেছে, চারদিক নীরব, কোনদিকে কোন শব্দ নেই।’<sup>২</sup>

শব্দ, গন্ধ, বর্ণ নিয়ে এক সংবেদনশীল শিল্পীর চোখে প্রকৃতির এমন বর্ণনা কোন প্রথাগত শিল্পাঙ্গিকে নয়, তা দিনলিপিতে পাওয়া যাবে। এরকম উদাহরণ অনেক রয়েছে ‘স্মৃতির রেখা’-য়।

কখনও বিহার কখনো ভাগলপুরের নির্জন প্রকৃতির ভুবনে ঘুরে বেড়িয়েছেন বিভূতিভূষণ। মুখোমুখি হয়েছেন নিজের সঙ্গে মাঝে ছিল একমাত্র প্রকৃতি, সেই যেন সাক্ষী, সেই যেন দোসর। আর এই প্রকৃতি কেবলমাত্র যে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে এসেছে তাও নয়। কখনো তা স্মৃতি পথকে জাগিয়ে তুলেছে। ভিন্ন প্রান্তে অবস্থান করে শিল্পীর তুলিতে বাংলার প্রকৃতি ফুটে উঠেছে। যেমন ২২শে মার্চ ১৯২৮ চৌধুরীটোলার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন -

‘তারপর চৌধুরীটোলা। সেইখানটা গিয়ে পথের ডানধারে একটা শুধু মাটির পথ - দুধারে ঘন শিশু গাছের শ্রেণী - ছায়াভরা মাটির গন্ধ। রাস্তা ছেড়ে দিয়ে সেই পথ ধরলাম। একটু দূরে গিয়ে একটা পোড়া ভিটা মত - যেটু ফুলের একেবারে জঙ্গল। যেটু ফুলের গন্ধে একেবারে ভরপুর। ওদিকে আর একটা বাঁশঝাড়, একটা পাড়া। সেইখানটা গিয়ে মনে পড়ল অনেকদিন আগে সেই যে গিয়েছিলাম বাগান - গাঁয়ে রাখালী পিসিমার বাড়ি, ওদিকে কোদলার ধারে একটা পুরানো ভিটেতে - সেই কথা মনে পড়ল। - এই স্থানটা ঠিক যেন বাংলাদেশ’<sup>৩</sup>

বাংলা থেকে দূরে অবস্থান করলেও বাংলার নদী-মাঠ, বাংলার পথ-ঘাট, বাংলার আনাচ-কানাচ যে তার স্মৃতিতে কতটা সজাগ আছে তা এই দিনলিপি থেকে স্পষ্ট হবে।

**খ. স্মৃতিমেদুরতা-য়:** সমগ্র বিভূতি - সাহিত্য এবং সৃজনকর্মকে যদি দেখা যায় তবে স্মৃতিমেদুরতাকে একটি স্বতন্ত্র স্থান দেওয়া যাবে। সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন শিল্পীর কাছে এত যে মহনীয় হয়ে উঠেছে তা প্রায়শঃ ধরা দিয়েছে এক সুতীর nostalgia-য়। আশৈশব যে জীবন যাপন করেছেন তা যেন তার সমস্ত শব্দ-গন্ধ-বর্ণ নিয়ে স্ফুট - অস্ফুট আবেদন নিবেদন নিয়ে সংবেদনশীল শিল্পীমনে উপস্থিত থেকেছে। বিভূতিভূষণ তাকে এড়াতে পারেননি, হয়তো বা চাননি। তাকে তারিয়ে তারিয়ে অনুভব করেছেন। তাইতো সচেতন শিল্প - প্রয়াসের বাইরে যখন তিনি একান্তে নির্জনে নিজের প্রত্যেকদিনের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন সেই মৌতাতে - ও তার সঙ্গী হয়েছে স্মৃতি - রোমন্থন। যেমন, ২৯ এপ্রিল, ১৯২৫, ভাগলপুর থেকে -

‘হঠাৎ পুরনো দিনগুলো মনে এলো। মনে এলো কতকগুলি ছায়াভরা বৈকাল, কতকগুলি সুন্দর জ্যোৎস্নাভরা রাত্রির সন্ধ্যা সবগুলিই কেমন গভীর অনন্ত, রহস্যময়’<sup>৪</sup>



এখানে স্মৃতিমেদুর হওয়ার জন্যই কবির আয়োজন। কেবলমাত্র প্রকৃতি চিত্রনই মুখ্য নয়, কেননা ছায়াভরা বিকাল, সুন্দর জ্যোৎস্না, রাত্রির সন্ধ্যা এ সব বিষয় তো শাস্বত। তা আগেও ছিল আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে কিন্তু যে সময়, যে বয়স তিনি যাপন করেছেন, সে সমস্ত অনুষ্ণ কেবল স্মৃতিতেই ফিরে ফিরে আসে। এ প্রবণতা শিল্পীর মনে এমনই এক ভাব কল্পনার জন্ম নিয়েছে কোথাও কোথাও -

‘হঠাৎ যেন মনে হল হাজার বছর আগে যেসব পাখি বনে বনে গান গেয়ে চলে গিয়েছে, আজ এই ছায়াভরা সন্ধ্যায় তারাই যেন আবার কোথা থেকে গেয়ে উঠলো। যেসব ছেলে মেয়েরা হাজার বছর আগে মা-বাবার কোলে মিষ্টি হাসি হেসে কতদিন হলো ছেলেবেলায় দেখা স্বপ্নের মতো কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে আজ সন্ধ্যায় সেই সব অস্পষ্ট দূর অতীতের ছেলেপিলের মিলিয়ে যাওয়া হাসিরাশি - নদীর ধারে বনে বনে মাঠে মাঠে ঝোপে ঝোপে - ফুল হয়ে ফুটে গোধূলির আঁধার আলো করে আছে।’<sup>৫</sup>

প্রকৃতি এবং মানুষের এই আত্যন্তিক বিজড়ন আসলে বিভূতিভূষণকে সংবেদনশীল করে তুলেছে স্মৃতিসজ্জায়। যখন তিনি চেনা - পরিচিত স্থান অতিক্রম করে বিহার - ভাগলপুরে দিনাতিপাত করেছেন তখন দূরবিসপী রোমান্সের মতো স্মৃতির অতল থেকে যেন জেগে উঠেছে সেসব অনুষ্ণ। সেখানে কত নূতনের সংযোজন হবে, কত তুচ্ছ প্রসঙ্গ মুখ্য হয়ে উঠবে তা কেবল শিল্পীই জানেন।

**গ. আনন্দের বার্তায়:** সমগ্র বিভূতি সাহিত্যপাঠক জানেন বিভূতিভূষণের সাহিত্য রচনায় প্রকৃতি যেমন তার স্ববৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত, তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর মানবজীবনও তেমনি মুখ্য। এই দ্বিবিধ বোধই তাকে জীবনের প্রতি সংবেদনশীল করেছে, কখনো করেছে প্রশ্নাভিত। তাইতো নির্জনে, একাকীত্বে যখন ভাগলপুরে দিনাতিপাত করছেন তখন তার মনে হয়েছে -

‘সকলে আনন্দকেই খুঁজছে’<sup>৬</sup>

কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে আনন্দ? ৩০ এপ্রিল ১৯২৫, ভাগলপুর থেকে লিখছেন -

‘জগতের অসংখ্য আনন্দের ভান্ডার উন্মুক্ত আছে গাছপালা, ফুল, পাখি, উদার মাঠঘাট, সময়, নক্ষত্র, সন্ধ্যা, জ্যোৎস্নারাত্রি, অস্ত সূর্যের আলোয় রাঙা নদীতীর অন্ধকার নক্ষত্রময়ী উদার শূন্য ... এসব জিনিস থেকে এমন সব বিপুল অবজ্ঞব্য আনন্দ অনন্তের উদার মহিমা প্রাণে আসতে পারে - সহস্র বৎসর ধরে তুচ্ছ জাগতিক বস্তু নিয়ে মত্ত থাকলেও সে বিরাট, অসীম, শান্ত-উল্লাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই কোন জ্ঞান পৌঁছায় না।’<sup>৭</sup>

এ সমস্ত কথা কোন আবেগের জিনিস নয়। বিভূতিভূষণ নামক শিল্পী মানুষটি স্থির সংবেদনে স্থির বিশ্বাসে তার জীবনে ও কর্মে এই সমস্ত কথার প্রতিষ্ঠা। তাই জাগতিক বস্তু বা material সংগ্রহে সেখানে কেবল প্রয়োজন মেটে, তা কোন আনন্দ দিতে পারে না। আনন্দের সামগ্রিক রূপঅনুধ্যান ছিল তার অস্থিষ্ট। তাই সে দুঃখের হা হতাশে মানুষের জীবন নিরন্তর পাক খায় তাকে তিনি দেখেছেন এভাবে -

‘Sadness জীবনের একটা অমূল্য উপকরণ - sadness ভিন্ন জীবনের profundity আসে না - যেমন গাছে অন্ধকার রাত্রি আকাশের তারা সংখ্যায় ও উজ্জ্বলতায় অনেক বেশি হয়, তেমনই বিষাদবিদ্ধ প্রাণের গহন গভীর গোপন আকাশে সত্যের নক্ষত্রগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ও জ্যোতির্মান হয়ে প্রকাশ পায়।’<sup>৮</sup>

দুঃখ আছে বলেই সুখের উপলব্ধি মধুর হয়ে ওঠে, না হলে তা হতো একঘেয়ে এবং বহু ব্যবহারে মলিন। এ কথা শিল্পী তার ভাব কল্পনায় জেনেছেন; তাইতো বারংবার তার হয়েই সওয়াল করেন-

‘চোখের জল, কান্না অত্যাচার না থাকলে বিশ্বের সৌন্দর্য থাকত না। সব সুখ, সব পরিপূর্ণতা, সব ঐশ্বর্য, সব সন্তোষ শান্তি কেবল মরুভূমির মতো ভয়ানক খাঁ খাঁ করত। মাঝে মাঝে আর্তদের চোখের জলের শ্যামশান্তিভরা ওয়েসিস আছে বলেই তা করুন মধুর হয়েছে।’<sup>১০</sup>

এই যে উপলব্ধির জগৎ তা ফলপ্রসূ হয়ে উঠতো না যদি না দিনানুদিনের পাকে, তুচ্ছতায় মন আটকে যেত তা ওই সীমানাকে ছুঁয়েই সীমানা অতিক্রম। ভূয়োদর্শী এভাবে কখন যে সত্যের সন্ধানী হয়ে ওঠেন, তার অসিষ্ট, অভীষিত জগত হয়ে যায় আরো গভীর, বিস্তৃত -

‘এই নির্জন রাত্রিতে মনে হয় সুখ আছে এক জিনিসে। কি সে? মনকে প্রসারিত করে এই অনন্তের অসীমতার সঙ্গে এক করে দেবার চেষ্টা করবো। মনে ভাবো অনন্ত আকাশের এই ছোট্ট একরঙি পৃথিবীটার মতো শত শত লক্ষ লক্ষ অজানা জগত - তার মধ্যে অজানা প্রাণীদের সেসব কত অজানা অদৃষ্ট ভয়ানক জীবনযাত্রা কত সুখ দুঃখ, কত আনন্দ। সেসব কি অজানা উচ্ছ্বাস - তোমার মন অসীমতার রহস্যে ভরে উঠবে। ক্ষুদ্রত্ব ভেসে যাবে অনন্তের অমৃত জোয়ারে।’<sup>১১</sup>

আনন্দের পরিপূর্ণ বোধই শিল্পীকে অনন্তের ইশারা দিয়েছে কিংবা অনন্তের উপলব্ধিতেই আনন্দ হয়েছে বাজয়। উভয়ই পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। আত্যন্তিক জীবনপ্রীতিই এর মূল কথা -

‘অনন্ত যে তোমার চারিধারে প্রসারিত, তোমার পায়ের তলার তৃণদলের শ্যামলতায়, তোমার কোলের শিশুর মুখের হাসিতে, তোমার আঙিনায় পাখির ডাকে, সন্ধ্যায় ঝাঁঝির সুরে, নৈশপাখির পাখার আওয়াজে। কিন্তু আমি শুনব না, আমি দেখব না, আমি চোখ বুজে আছি - কার এত স্পর্ধা আমার চোখ খোলে।’<sup>১২</sup>

দুঃখবোধ, sadness এর কথা দিনলিপিতে শিল্পীর আখরে যেমন ভাষাময় হয়েছে তেমনি মৃত্যুবোধও জেগেছে। ২৮শে নভেম্বর ১৯২৭ এর দিনলিপির পাতায় রয়েছে -

‘এসব চলে যাবে জানি। আবার নূতন আসবে জীবনে আরও কত কত আসবে। এও ঠিক একদিন সব বন্ধ হয়ে যাবে। একদিন স্নিগ্ধ অপরাহ্নে, বাবলাবনের ছায়ায়, ইছামতির তীরে বনঝোপের বিহঙ্গ তানের মধ্যে নীরব শান্তির কোলে এই জীবনের দেওয়া নেওয়া সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে কি? মানুষ অনন্তের যাত্রী। তার পথ ঐ দূর ক্ষীণ নক্ষত্রের পাশ কাটিয়ে দূর কোন অনন্তলোক অনন্তকালের পথিক, যাত্রী সে ... আমি এই যাওয়া আসার স্বপ্নে ভোর হয়ে বড় আনন্দ পাই।’<sup>১৩</sup>

কি অপূর্ব দার্শনিকতা, এ ভাষা কি কেবল গদ্যের ভাষা। প্রথিতযশা কোন কবির মতো ভাবকল্পনায় তন্ময়, লাভণ্যে উজ্জ্বল।

**ঘ. সাহিত্যের কথায়:** ডায়েরি বা দিনলিপি কোন প্রথাগত শিল্পাস্টিক নয় এখানে তাই সরাসরি শিল্পচর্চা চলবে সেই আশা না করাই শ্রেয়। তাছাড়া সে অবকাশও কোথায়! ভ্রাম্যমাণ শিল্পীর তুলিতে নিজের সময় নিজের মতো করে ব্যয়িত হচ্ছে সেখানে যতটুকু যা মিলবে তা উপরি পাওনা। নানা প্রসঙ্গে নানান কথার ভাঁজে ভাঁজে স্বগত ভাষণের মতো লেখক অনেক কথা বলে থাকেন যা কখনো কখনো হয়ে ওঠে মূল্যবান। যেমন -

‘সাহিত্যে এই ভাবজীবন ফোটানোর প্রচেষ্টাই আসল। সাধারণ মানুষের ভাব জীবন খুব গভীর নয় - অনেকের মন এমন ভাবে তৈরি যা কিনা কোন বিষয়েই গভীরত্বের অভাবে জীবন বড় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মনের এই দৈন্য অর্থে পূর্ণ হয় না, ঐশ্বর্যে নয়, সাংসারিক বা বৈষয়িক সাফল্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। এইসব অপূর্ণ অনুভূতি আসে অনেক সময় বিচিত্র জীবন প্রবাহের ধারার সঙ্গে উপযুক্ত গড়ে ওঠা মনের সঙ্গ’।<sup>১০</sup>

এই জীবনসম্বৃত ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভূতিভূষণের সাহিত্য মধ্যে। এছাড়া সাহিত্য কিভাবে জন্মায়, শিল্পীদের কাজ কি? এসব নিয়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভূতিভূষণ তার দিনলিপিতে মন্তব্য করেছেন। যেমন ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ এ সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের মধ্যে সম্বন্ধের কথা বলতে গিয়ে জানালেন -

‘সাহিত্য শিল্পীদের জীবনের প্রতিবিম্ব। যে যুগে তারা জন্মেছে তাদের চেষ্টা হয় সকল দিক থেকে সে যুগের একটা স্থায়ী ইতিহাস লিখে রেখে যাওয়া’।<sup>১১</sup>

রবীন্দ্রনাথ এ কারণেই বোধহয় তার আত্মস্মৃতিমূলক রচনা ‘ছেলেবেলা’ - র শুরুতেই লিখেছেন ‘আমার জন্ম হয়েছিল সেকলে কলকাতায়।’ স্থানিক ভূগোল, সময়, বৃহত্তর ভাবে সেই যুগের সাধনায় সাহিত্যিক শিল্পীর সাধনা হয়ে ওঠে। কিন্তু কেবল যুগের সাধনাকেই চরিতার্থ করবেন শিল্পী? বিভূতিভূষণ লিখলেন -

‘প্রত্যেক মানুষই নতুন চোখে দেখে। প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন। তাই সকলেরই কথা কৌতুহল জাগায়। সাহিত্য শুধু জগৎ টাকে কে কি চোখে দেখছে তারই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী। বর্ণিত নায়ক - নায়িকার পেছনে শিল্পী তার আবালায় দীর্ঘ জীবনের সকল সুখ - দুঃখ, হাসি-কান্না নিয়ে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন। কল্পনাও কিছু না কিছু অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে তবে শূন্য ভর করে - সেসব সনেটের পিছনে হ্যামলেটের পিছনে শেক্সপিয়ার গুপ্ত থেকে ধরা দিয়েছেন’।<sup>১২</sup>

একই বিষয় নিয়ে লেখা সাহিত্য কিভাবে অভিনব হয়ে ওঠে তার উত্তর বোধহয় এখানে মিলবে।

‘স্মৃতির রেখা’ -য় স্বরচিত সাহিত্যের অনেক সংবাদ মিলবে। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যই আমাদের অস্বিষ্ট, যেমন -

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ ‘আরণ্যক’ উপন্যাসের রচনার ইঙ্গিত

১ লা মার্চ ১৯২৮ ‘ইছামতী’ উপন্যাস রচনার প্রসঙ্গ

এভাবে মূলত আরণ্যক এবং ইছামতী উপন্যাস রচনার সংবাদ আমরা ‘স্মৃতির রেখা’ -তে পাব। একটি রচনা প্রকাশের বহুদিন পূর্বেই তার নির্মাণ যে লেখকের মধ্যে চলতে থাকে। সাধনার মতো একটু একটু করে সে বিশ্ব - সৃজন চলে নীরবে নিভূতে; দিনলিপিতে ‘আরণ্যক’ কিংবা ‘ইছামতী’ র প্রসঙ্গ তা প্রমাণ করে।

দিনলিপির স্বল্প - আয়াসে বিভূতিভূষণকে আমরা কেবল রোজনামচা লিখিয়ে হিসাবে পাই না। সাহিত্যকে তিনি কোনভাবে এড়িয়ে যেতে পারেননি তার প্রমাণ অবশ্য পেয়েছি। সাহিত্যের বিশুদ্ধ আলোচনা তার অনেক টুকরো কথায় উঠে এসেছে, সেগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে বলে আমাদের মনে হয়। বিশেষত তত্ত্বের গান্ধীর্থ থেকে বের হয়ে নানা সরল অনাড়ম্বর উদাহরণ সহযোগে সাহিত্যিকের চোখে সাহিত্য যখন ধরা পড়ে তখন তা অন্য মাত্রা পায়। আবার নিজস্ব সৃজনকর্মের সম্পর্কেও বলেছেন। শেষাবধি এই প্রথিতযশা শিল্পী তার সাহিত্যের স্বীকৃতি বিষয়ে কি জানালেন -

‘হয়তো একাল্প বছর পরে আমার কোন চিহ্ন পৃথিবীতে খুঁজে মিলবে না, কিন্তু আমার এই লেখা হয়তো থেকে যাবে। হয়তো কত লোকের মনে আশা সান্ত্বনা দেবে। হয়তো পাঁচশত বছর পরে যদি আমার লেখা বেঁচে থাকে তবে.... অনেক প্রাচীনকালের এক লেখক হয়ে যাব ... অনাগত ভবিষ্যতের সেসব বংশধরগণের মধ্যে আমি আলো জ্বেলে, তেল খরচ করে আমার যথাযোগ্য বুদ্ধির অর্ঘ্য, যতই সামান্য হোক যতই অকিঞ্চিৎকর হোক তবু ওদের দিতেই হবে। মনের মধ্যে সে প্রেরণা যেন অনুভব করছি, তারপরে তা বাঁচুক আর না বাঁচুক। আমি আর দেখতে আসবো না।’<sup>১৬</sup>

এই নিরাসক্তি একজন শিল্পীর মূল শক্তি। যা তাকে আবহমান কালে বাঁচিয়ে রাখবে।

**ঙ. প্রযত্নে ও প্রজন্মে:** বস্তু বিশ্বের মধ্যে উপস্থিত থেকে শিল্পী সাহিত্যিক তার ‘অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞায়’ ভাববিশ্ব সৃজন করেন। দ্রষ্টা থেকে স্রষ্টা হয়ে ওঠেন। এ এক আশ্চর্য উপলব্ধির জগৎ। যা কোনোভাবেই সুলভ এবং সহজ নয়। প্রায় ক্ষেত্রেই আত্যন্তিক জীবনপ্রীতি থেকে এমনতর বোধের জগৎ সৃজিত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এমনই এক জগতের অধিপতি হতে পেরেছেন বলে আমরা মনে করি। কিন্তু শুধুই কি সাহিত্য রচনার মধ্যে দিয়ে তা ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছে। একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে, ভাবপথিক হিসাবে তিনি অনাগত মানব - প্রজন্মের কথা ভেবেছেন, তাকে প্রযত্নে লালন করেছেন। যখন একা থেকেছেন, নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলেছেন, তখন কি কেবল নিজের কথা ভাবছেন।

২২ শে জুন ১৯২৫, ভাগলপুর থেকে লিখেছেন -

‘আজ বসে বসে অনাগত দূর ভবিষ্যতের ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ছে। ... অনাগত শিশু ও প্রপৌত্র ও অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্রদের জন্য কি রেখে যাব তাহা ভাবছি।’<sup>১৭</sup>

আবার কখনো লিখছেন -

‘জীবনটা ছেলে খেলার জিনিস নয় এটা একটা serious জিনিস। যারা হেসে খেলে তুচ্ছ আমোদে প্রমোদে ফুর্তি করে কাটালে তাদের কথা ধরি না, কিন্তু যারা জীবনটাকে serious ভাবে নিতে যায়, নিঃস্বার্থভাবে নিজের সুখ না দেখে, তাদের উচিত এই উত্তরকালের শিশু বৃদ্ধ পৌত্র, অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রগণের জন্যে কিছু সঞ্চয় করে যাওয়া।’<sup>১৮</sup>

এই যে সঞ্চয়ের কথা বিভূতিভূষণ বলেছেন তাকে material জগতের ধন - সম্পদ সঞ্চয় নয় তা জীবনকে ফলপ্রসূ করে তোলার একটি সুউন্নত ধারণা। যাকে তিনি নাম দিয়েছেন ‘জনসেবা’। ৬ই জানুয়ারি ১৯২৬ ভাগলপুর থেকে লিখেছেন -

‘এই তাসের ঘরের মধ্যে, এই মেঘের প্রাসাদ দুর্গের মধ্যে আসল জিনিসটা কি? জনসেবা - এ জীবনের নয়। যুগযুগের জনসেবা। বিশ্বকে উপলব্ধি করে, সত্যকে উপলব্ধি করে, শাস্ত্রত সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করে ধ্যানে কল্পনায় ছবিতে তাকে ঐক্যে যাওয়া শিক্ষকতা নয়, জনসেবা দীন নিরহঙ্কার অথচ দৃঢ় পবিত্র হয়ে অবহিত মনে এই অতি মহৎ সার্থক সেবা।’<sup>১৯</sup>

সমগ্র বিভূতিসাহিত্যে ‘স্মৃতির রেখা’ দিনলিপি হিসাবে পরিচিত হলেও তা একইসঙ্গে স্রষ্টা এবং তার সৃষ্টির ন্যূনতম পরিচয়। কেবলমাত্র দিনলিপি হলেও রোজনাচায় ক্ষান্ত হতে পারতেন বিভূতিভূষণ; কিন্তু তিনি সেখানে কোথায় থেমেছেন। এমনকি তার সাহিত্য এবং সাহিত্য জীবনের কথাতেও ‘স্মৃতির রেখা’ ফুরায় কোথায়? তা যেন বিভূতিভূষণের নিভৃত ভাবজীবনের ধ্যানের সম্পদ। যা বারংবার জানান দেয় তিনি

শুধু কেবল ঔপন্যাসিক, কেবল গল্পকার নন, তিনি কবি এবং নির্জন জীবন - সেবক। তাইতো তার গদ্যের প্রকাশ হয় লাভগ্যময়, ভাবকল্পনায় দীপ্ত। অকিঞ্চিৎকর, সামান্য, তুচ্ছ বারংবার শব্দ গন্ধ বর্ণ নিয়ে ধরা দেয়। কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা যাবে এই অবসরে -

অ. 'ছোট্ট ছেলে তার কচি মুখ দিয়ে ভুরভুরে কচি গন্ধ' [২৯ এপ্রিল ১৯২৫, ভাগলপুর]

আ. 'জনহীন মাঠের ধারে গ্রাম্য ফুলের দল যখন ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে অকারণে হাসে।' [২৯ এপ্রিল ১৯২৫, ভাগলপুর]

ই. 'অজস্র খইয়ের মত ফোটা ঘেঁটুফুলের দলের মত' [২২ শে জুন ১৯২৫, ভাগলপুর]

ঈ. 'শান্ত, আঁধার অপরাহ্নে বাড়ির পিছনের বন যখন সন্ধ্যায় অন্ধকারে ঢেকে আসে' [৯ই অক্টোবর ১৯২৫]

উ. 'এই রহস্য ভরা বিশ্বের বুক স্পন্দনটা কান পেতে শুনতে ইচ্ছা হয় - আরো কত নক্ষত্র, কত জগৎ, কত প্রেম, কত মহিমা, কত সৌন্দর্য, অব্যক্ত, বিশাল, বিপুল, অসীম চারধারে দাঁড়ানো' [৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯২৬]

ঊ. 'সব সুখ, সব পরিপূর্ণতা, সব ঐশ্বর্য, সব সন্তোষ, শান্তি কেমন মরুভূমির মতো ভয়ানক খাঁ খাঁ করত।' [৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯২৬]

ভাব - কল্পনায় এভাবে গদ্যস্রষ্টা বিভূতিভূষণের প্রকাশ হয়েছে কবিত্বময়। কখনো তুলনায়, কখনো অনুপ্রাসিক ছন্দময়তায় এই গদ্য তাই কাব্যসম্ভবনাকে জাগিয়ে তোলে।

বিভূতিভূষণ হয়ে ওঠেন তাই নিভৃত কবি - শিল্পী। তবে, মনে রাখতে হবে, এই জীবনের প্রতি, পৃথিবীর প্রতি আত্যন্তিক বিজড়িত তার চেতনা। কোন পলায়নপর মনোবৃত্তির তার মধ্যে আমরা সে কারণে খুঁজে পাই না। যখন তিনি বলেন -

'ভগবান আমি তোমার অন্যস্বর্গ চাই না - তোমার দৈবলোক, পিতৃলোক, বিষ্ণুলোক তোমার বিশাল অনন্ত নক্ষত্র জগৎ তুমি পূন্যাত্মা মহাপুরুষের জন্য রেখে দিও। যুগে যুগে তুমি এই মাটির পৃথিবীতে আমাকে নিয়ে এসো। এই ফুল ফল, এই শোক দুঃখের স্মৃতি, এই মুগ্ধ শৈশবের মায়াজগতের মধ্যে দিয়ে বারবার যেন আসা-যাওয়া পথ তোমার আশীর্বাদে অক্ষয় হয়'।<sup>২০</sup>

যুগপৎ 'স্মৃতির রেখা' কবি বিভূতিভূষণের আত্মদর্শনও বটে। জীবনকে তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছেন সত্যের অনুষ্কানে। আনন্দের কথা বলেছেন, বলেছেন অনন্তের কথা। সন্ধান করেছেন জীবন রহস্যের। তার বাক্য তাই যেন হয়ে উঠেছে আশুবাক্য। তা যেন উপলব্ধিতে সিদ্ধ, সত্য বিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরবো আমরা -

অ. 'তরল আনন্দ অধ্যাত্ম জীবনের পরিপন্থী' [২৮ এপ্রিল ১৯২৫]

আ. 'জীবনটা ছেলেখেলার জিনিস নয়। এটা একটা serious জিনিস।' [৯ই অক্টোবর ১৯২৫]

ই. 'লেখাপড়া একটা খুব বড় মানসিক দুঃসাহসিকতা' [১২ই ডিসেম্বর ১৯২৫]

ঈ. কুল আঁকাড়ে তো সকলেই পড়ে রইল। দিক্ দিশাহারা অকুল রহস্য মহাজলধিতে কে 'বাচ' খেলতে চলবে - কোথায় সে বীর ব্রাত্য মুক্ত আত্মা [১২ ডিসেম্বর ১৯২৫]

উ. 'অতিমানব সেই, যে চিন্তায় বড়, অনন্তের সঙ্গে যে নিজের আত্মাকে এক করতে পেরেছে' [২২ সেপ্টেম্বর ১৯২৭]

এই অবসরে, আপাত পরিচিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্মৃতির রেখা' -কে যেভাবে জানা গেল তা আর যাই হোক কেবলমাত্র রোজনামচা নয়। ভ্রমণের স্বাদুতা মেশানো, স্মৃতিমেদুরতায় আচ্ছন্ন একইসঙ্গে অতীতে ও ভবিষ্যতে চলাচল করেছেন। তার লক্ষ্য কেবলমাত্র প্রতিদিনের হিসাব রাখছে কই, উপলক্ষ্যই সেখানে অনেক ক্ষেত্রে বড় হয়ে ধরা পড়েছে। নিভৃতচারী, নির্জনতা - পিয়াসী একজন কবির সঙ্গসুখ যেমন কোন কাব্য পাঠে উঠে আসে 'স্মৃতির রেখা' -র সঙ্গ করলে তেমনি উপভোগ সম্ভব হয়ে উঠবে। কি ভাব - সম্পদে, কি শব্দ - সম্ভাবনায়, কি আত্ম - দর্শনে এই নির্মিতি বাংলা সাহিত্যে অনন্য এবং স্বতন্ত্র।

### তথ্যসূত্র:

১. বিশী, প্রমথনাথ, 'বিভূতি-রচনাবলী' (প্রথম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৩৬১, পৃ. ৫৭।
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'স্মৃতির রেখা', ক্যালকাটা পাবলিশার্স, কলিকাতা ১২, প্রথম প্রকাশ ১৩৬২, পৃ. ১৫।
৩. তদেব, পৃ. ৯৭।
৪. তদেব, পৃ. ১১।
৫. তদেব, পৃ. ১১।
৬. তদেব, পৃ. ২৩।
৭. তদেব, পৃ. ১১।
৮. তদেব, পৃ. ১৮।
৯. তদেব, পৃ. ২৬।
১০. তদেব, পৃ. ৩৬ - ৩৭।
১১. তদেব, পৃ. ৩৭।
১২. তদেব, পৃ. ৪৬।
১৩. তদেব, পৃ. ৪০।
১৪. তদেব, পৃ. ৪১।
১৫. তদেব, পৃ. ৪১।
১৬. তদেব, পৃ. ২১।
১৭. তদেব, পৃ. ১২।
১৮. তদেব, পৃ. ১৯।
১৯. তদেব, পৃ. ২৮।
২০. তদেব, পৃ. ৬৮।



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 601-609

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.048



## বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের আলোকে তৎকালীন বাঙালি সমাজচিত্র

বকুল সাহা, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জলঙ্গী মহাবিদ্যালয়, জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 15.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*Bibhutibhushan Mukhopadhyay emerged in the middle of the 20<sup>th</sup> century. He was born in Pandul in Dwarbhanga district of Bihar. Although he was born in Bihar, his ancestors lived In Chatra region of Srirampur, Bangladesh. So he had to stay in Shivpur, Chatra and other areas of Bangladesh for his studies during his childhood and adolescence. He was able to establish contact with the rugged environment of Bihar and the Crop green desert of Bangladesh. Therefore, he got the opportunity to observe the social environment of Bihar and Bangladesh very well. He was the live-witness of the anti-British movement in pre-independence India, the Second World War and the great Bengal Famine of 1943. Also, he observed the effect of World War II and Bengal Famine on the society of Bihar and Bangladesh very closely. As a socially conscious writer, he was able to portray this social context in his short stories in a realistic manner. Although he was a humorous writer but his social studies beautifully Placed in the short stories behind the humours. As a writer, he has also protested by pen for Bengalis, who lost their homes and became completely destitute refugees due to the partition of India in 1947. In his short stories, perfectly described the Riot of Hindu and Muslim, along with the caste system and British flunkey bengalis. In short, the short stories of Bibhutibhushan Mukhopadhyay become a living document of the Bengali social environment of the middle of the 20<sup>th</sup> century.*

**Keywords:** Bibhutibhushan Mukhopadhyay, Consciousness, Pre-independence society, Humorous writer, Bengal Famine, Partition of India.

সাহিত্য সমাজের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সমকালীন সমাজকে উপেক্ষা করে কোন সাহিত্যিকই তার রচনাকে রূপ দিতে পারেন না। সমাজের প্রসঙ্গ সমকালীন জীবনের জীবন্ত বাস্তব রূপ তাদের রচনার মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই জায়গা করে নেয়। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যেও ছিল এই সমাজ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি। বিভূতিভূষণ যে পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছেন যে মানুষজনের সাহচর্যে তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় গুলো কাটিয়েছেন, যে পারিবারিক জীবনের পরিমণ্ডলকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে, কিংবা তাঁর সমসাময়িক সমাজ তথা জাতীয় জীবনে ঘনিয়ে আসা রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সেই সঙ্গে

রাজনৈতিক কার্যাবলি সমাজ তথা মানুষের জীবনে যে উত্থান পতন ঘটিয়েছে সেই সমস্ত কিছুকে তিনি তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয় করে তুলেছেন। লেখকের চারপাশকে বেষ্টিত করে থাকা সামাজিক জীবনের ঘটনাবলি এবং একান্ত পরিচিত পারিবারিক সামাজিক মানুষজনকে নিয়েই তাঁর কথাসাহিত্যের কাঠামো তথা বিষয়কে নির্মাণ করেছেন। তাঁর শৈশব কৈশোর যে মানুষগুলির সঙ্গে অতিবাহিত হয়েছে, পরিবার-স্কুল-কলেজ খেলার মাঠে যে সমাজকে মানুষজনকে তিনি দেখেছেন, যে সমাজ পরিবেশের সাথে তিনি জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত করেছেন সেই সমস্ত কিছু তার কথাসাহিত্যের মধ্যে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ভাবে চিত্রণ করেছেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এর আবির্ভাব হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। জীবিকা অর্জনের তাগিদে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হলেও শেষ পর্যন্ত সমস্ত কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ থেকে পুরোপুরি ভাবে সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যে সময় পর্বে তিনি সাহিত্য সাধনা শুরু করলেন তখন সমগ্র ভারতবর্ষ এক উত্তাল সময় পর্বের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। দীর্ঘকাল ব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একেবারে শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছিল দেশ; তাই সমগ্র সমাজ জুড়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে, এই রাজনৈতিক উত্তেজনা সমগ্র সমাজ তথা সমাজের মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। সামাজিক জীবনধারা, ন্যায়নীতি, মূল্যবোধ সবকিছু পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। বিভূতিভূষণ সেই সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেই সময় একদিকে ছিল বিয়াল্লিশের অগাস্ট আন্দোলন, ১৯৪৩ এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, এমবিধ্বস্ত গ্রাম বাংলার মানুষের অসহায় করণ আর্তনাদের চিত্র, ১৯৪৬ এর ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৭ এ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ এবং সেই স্বাধীনতার পথ বেয়েই দেশভাগের মতো এক বেদনাবাহী পরিবেশের সাক্ষী হয়েছিলেন লেখক। একজন সমাজ সচেতন শিল্পী হিসাবে এই সময় পর্ব কে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন লেখক। তিনি দেখেছিলেন গ্রামবাংলার অসংখ্য মানুষের এই দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে অনাহারে মৃত্যুবরণের ছবি। দুমুঠো অন্নের জন্য মানুষের হাহাকারের চিত্র। সমগ্র বাংলাদেশের বুকে নেমে আসা শাশান এর শূন্যতা। সেই সঙ্গে স্বাধীনতার পথ বেয়ে আসা দেশভাগের ফলে অসংখ্য বাস্তবহারা মানুষের ঘরবাড়ি, জমি-জায়গা ছেড়ে, উদ্বাস্তু হয়ে ঘুরে বেড়ানোর চিত্র। আত্মীয় পরিজন হারিয়ে তাদের দুর্দশার এক জীবন্ত বাস্তব রূপকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই সমাজ প্রেক্ষিতকে বাদ দিয়ে তিনি তার সাহিত্যকে রূপ দিতে পারেননি। তাঁর ছোটগল্পে এই সমস্ত সামাজিক বিষয়ের অত্যন্ত নিপুণ বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে বিংশ শতাব্দীতে এসেও সমাজে যে কুসংস্কার, আদিম বিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে পারেনি। সমাজ যে কতটা অনগ্রসর থেকে গেছে, সেই সমাজের অভ্যন্তরের বিশ্লেষণও তার সমাজবীক্ষার মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে সরোজ দত্ত তাঁর বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ‘জীবন ও সাহিত্য সাধনা’ গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন- “তাঁর চোখে ধরা দেয় এমন এক সমাজের রূপ, প্রগতিশীল চলনের আড়ম্বরের নামে যা অসহায় ভাবে আঁকড়ে রেখেছে তার স্থানত্বকে। এমনকি স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও অনড় স্ববিরত্ব থেকে সে মুক্তি পায় নি।”<sup>(১)</sup> সেখানে সমাজে পনপ্রথার নিষ্ঠুর কবলে পড়ে অসহায় মেয়ের করণ আত্মত্যাগের ঘটনা যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি মদমত্ত জমিজমিদারের মূঢ় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ছবিও রয়েছে। সেই সঙ্গে সমাজে নারী-সমাজের মধ্যে অন্ধ-বিশ্বাস যে কতখানি বাসা বেঁধে আছে তার পরিচয় রেখেছেন লেখক; আবার সমাজে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতার অভিশাপ বিংশ শতাব্দীতে এসেও কতখানি ভয়ঙ্কর মূর্তিতে বিরাজিত তারও অত্যন্ত নিপুণ বাস্তবসম্মত চিত্র অঙ্কন করেছেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে।



তাই একদিকে রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে সমাজের ভগ্নরূপ অন্যদিকে কুসংস্কারগ্রস্ত সমাজের স্থবিরতার পরিচয় এই সবই তার গল্পের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। তাঁর ‘বীরুর প্রশ্ন’ ‘স্বাধীনতা ডিনার’, ‘স্বরাজ ছেলে’, প্রভৃতি গল্পে সমকালীন পঞ্চাশের মনস্তর তার ফলশ্রুতিতে সমগ্র বাংলা জুড়ে চরম অশ্রাব, বজ্রাভাব প্রভৃতির চিত্র যেমন আছে তেমনি সাতচল্লিশ এ ভারতের স্বাধীনতা লাভ যে প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের কাছে প্রকৃতই স্বাধীনতা বয়ে আনতে পারেনি তার পরিচয়ও লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেই সঙ্গে ‘কলকাতা নোয়াখালী বিহার’ শীর্ষক গল্পগ্রন্থের তিনটি গল্প ‘বিশ্বাস’, ‘প্রায়শ্চিত্ত’, এবং ‘সত্যগ্রহী’ নামক গল্পগুলির মধ্যে দেশভাগ সমগ্র বাংলা বিহার নোয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চল জুড়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করেছিল তার পরিচয় আছে। এই দাঙ্গার বলি হয়েছিল হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অসংখ্য নিরীহ মানুষ। মানুষে মানুষে বিশ্বাস, দীর্ঘদিন ধরে পাশাপাশি বন্ধুভাবে বসবাস করা মানুষের পারস্পরিক প্রীতি, ভালোবাসা, সৌহার্দ্যের সম্পর্ক, মানবিক মূল্যবোধ সমস্ত কিছু ভেঙে গিয়ে পরস্পর পাশবিক হিংস্রতায় মেতে উঠেছিল। সমাজের সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিচয় উঠে এসেছে এই গল্পগুলির মধ্যে। আবার ‘কুইন অ্যান’, ‘দ্রব্যগুণ’, ‘ভারত উদ্ধার ও পাঁঠা’ প্রভৃতি গল্পেও সমকালীন সমাজের রাজনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা রয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে সমস্ত বাংলা জুড়ে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মনস্তরের সৃষ্টি হয়েছিল তা সমগ্র বাংলাদেশে নিদারুণ বজ্রাভাব এর সৃষ্টি করেছিল তারই মধ্যে একজন কালোবাজারি, মজুতদার শ্রেণীর মানুষের অতিরিক্ত বস্ত্র মজুত করে রাখার পরিচয় পাওয়া যায় তার ‘দুঃশাসন’ গল্পটির মধ্যে। ট্রেনের মধ্যে এক মাড়োয়ারি ভদ্রলোক স্ত্রী সাজে সজ্জিত করে বেশ কয়েকজন সঙ্গিনীকে নিয়ে ওঠেন। হিন্দুস্তান থেকে পাকিস্তানের আমনোড়া যাচ্ছেন বলে পরিচয় দেন। রাধাকান্ত আচার্য নামে একজন পুলিশ ছদ্মবেশে ট্রেনে উঠে মাড়োয়ারি ভদ্রলোককে নানা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করে শেষপর্যন্ত আসল পরিচয়টি উদ্ঘাটন করে নেন। তল্লাশি করে দেখতে পান সঙ্গিনী বলে পরিচয় দেওয়া স্ত্রী সাজে সজ্জিত, তারা আসলে কেউই নারী নয়, সকলেই পুরুষ এবং এক অদ্ভুত দৃশ্য সামনে এসে পড়ে- “এক একজনের গায়ে দশখানা বারোখানা করিয়া ধুতি, শাড়ি, জামার কাপড়। এ ধরনের ভেলকি জীবনে দেখি নাই, একে একে একবস্ত্রে বাহির হইয়া আসিতে লাগিল, শুকাইয়া একেবারে চুপসাইয়া গেছে যেন কতদিনের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী”<sup>(২)</sup> আপাত হাস্যরসের অন্তরালে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালে কালোবাজারি চোরাচালানকারীদের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে বস্ত্র সংকট সৃষ্টি করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

‘স্বাধীনতা ডিনার’ এই গল্পটির মধ্যেও স্বাধীনতা পরবর্তীকালের দেশের সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পীড়িত লেখকমনের প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। দীর্ঘকাল ব্যাপী ইংরেজ শাসন ও শোষণে জর্জরিত ভারতবাসীকে পরাধীনতার গ্লানি ও অপমান থেকে মুক্ত করতে জীবনপণ করেছিলেন সেকালের স্বাধীনতা সংগ্রামী তরুণেরা। ইংরেজ শাসনের কবল থেকে মুক্ত করে এক নতুন দেশ ও সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন তারা সেখানে প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে আসবে স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রনেতাদের চক্রান্তে তাদের সেই আশা পূরণ হয়নি। স্বাধীনতার যে রূপ তারা প্রত্যক্ষ করে সেই স্বাধীনতা তারা চায়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামী গঙ্গাধরের চোখ দিয়ে বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করেন লেখক। স্বাধীনতা প্রাপ্তির এক বছর পর সেই স্বাধীনতা লাভের উৎসব উদ্যাপনে মেতে ওঠে দেশ যা দেখে গঙ্গাধর তার অতীতের স্মৃতিচারণায় মগ্ন হন। তারা যখন যুবক তখন এই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তারাও স্বাধীনতা লাভের জন্য

আন্দোলন করেছিলেন তাদের সেই দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন যা ছিল তাদের সাধনা, তা আজকের যুবকদের কাছে সিদ্ধিতে পরিণত হয়। কিন্তু সিদ্ধি আজ হাতের মুঠোর মধ্যে এলেও এই সিদ্ধির জন্য তাদের মৃত্যুপণ সাধনা ছিলনা। কেননা দেশমাতার হৃদয়কে খন্ড-বিখন্ড করে এসেছে এই স্বাধীনতা, দেশভাগ স্বাধীনতার অভিশাপ হয়ে গেছে। পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় ছিন্নমূল হয়ে পড়েছে। ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-পরিজন হারিয়ে তারা উদ্বাস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের জীবনে নেমে এসেছে অশেষ দুর্গতি ও দুর্ভোগ। সরকারের পক্ষ থেকে এই সমস্ত মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য সেরকম কোন তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি। তাদের প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে কোনোরকম সহমর্মিতা প্রকাশ পায়নি, সেইসঙ্গে মন্ত্রী রাজনৈতিক নেতাদের চক্রান্তে খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে সমস্ত জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি দেখা যায়, ভেজাল জিনিসে বাজার ছেয়ে যায়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সামাজিক জীবনের এই চিত্র দেখে গঙ্গাধর গভীরভাবে মর্মান্বিত হয়। যে স্বাধীনতা লাভের জন্য তারা জীবনের সবটুকু ত্যাগ করেছিলেন, সেই স্বাধীনতার এরকম বীভৎস অমানবিক রূপ দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয় গঙ্গাধর - “এইজন্যই কি ছিল তাহাদের সেই মৃত্যুপণ সাধনা? -অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, রোগে ঔষধ নাই, তাহাও যে অভাবে নাই এমন নয়, থাকিতেও নাই, অর্থপিশাচদের লালসা দিনদিনই বাড়িয়া মানুষকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করিতেছে। প্রতিকার নাই, কে করিবে? যাহাদের হাতে শাসন তাহাদের টিকি ওই পিশাচদের মুঠোর মধ্যে, মাঝে মাঝে এক একটি ফাঁকা হুংকারে ঠাট বজায় রাখে—তাহাতে প্রজারা হয় ক্ষণিকের জন্য আশ্বস্ত, ওদিকে পিশাচেরা হাসে কেননা ওটা ওদের উভয়ের মধ্যে একটা চুপি চুপি বন্দোবস্ত।”<sup>(৩)</sup> তাই যুবকেরা যখন রাস্তা দিয়ে ‘ভারত মা কি জয়’, এই স্লোগান দিতে থাকে তখন তা গঙ্গাধরের কাছে বিদ্রোপের মতো শোনাতে থাকে। দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠায় চোখ পড়লেই দেখতে পাওয়া যায় সমাজের বর্তমান পরিস্থিতির নিষ্ঠুর চিত্র “পাকিস্তানিরা ভালোভাবেই ঢুকিয়া পড়িয়াছে কাশ্মীরে বড় ক্যালিবারের কামান লইয়া— রাজাকারেরা পণ করিয়াছে আর হিন্দু বলিয়া কিছু থাকিতে দিবে না— দুইটা সংবাদ খোঁজা একটা যেন বাতিকে দাঁড়াইয়া গেছে গঙ্গাধরের। একটা অনেকেদিন আগের পুরনো খবরের জের— মন্ত্রীর দল হানা দিয়া কোন মাড়োয়ারির ময়দার কলে তেঁতুলের বিচির পাহাড় আবিষ্কার করে, কি হইল তারপর? দ্বিতীয় খবর বাঙ্গালীদের নাকি পল্টন তোলা হইবে, অপেক্ষাকৃত অধুনাতন খবর, আবার চাপা পড়িয়া গেছে। দুটোতেই বড় আশা জাগাইয়াছিল—রোজ একবার এ-কোন থেকে ও-কোন পর্যন্ত খুঁজিয়া যান— প্রায় পাগলামি। একখানি চিঠি— “...সম্পাদক মহাদয়েষু উলিপাড়া গোবিন্দপুরের হাটে চালের অবস্থা দিন দিনই শঙ্কাজনক হইয়া উঠিতেছে, গত সপ্তাহের অপেক্ষা এ সপ্তাহে মন পিছু তিন টাকা বর্ধিত হইয়া এখন সাড়ে তেইশ টাকায় দাঁড়াইয়াছে, আরোও আশঙ্কার বিষয় যে, কাঁকরের অনুপাত দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে।”<sup>(৪)</sup> এই সমস্ত জীবন্ত সমস্যা দেশে প্রতিনিয়তই বেড়ে চলছিল।

দেশের সামাজিক মানুষের ওপর ঘনিয়ে আসা এই সমস্ত জীবন্ত সমস্যার দিকে কোনরকম দৃষ্টি ছিল না। এই সমস্যা মেটানোর দিকে কোনোরকম তৎপরতা সরকারের পক্ষ থেকে দেখা যায়নি, বরং তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতেই মেতে উঠেছিল। স্বাধীনতার বর্ষপূর্তিতে দেশের সমাজের সাধারণ মানুষের কথা বিন্দুমাত্র না ভেবে নিজেরা চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় সহযোগে স্বাধীনতা ডিনারে মেতে উঠেছিল। ন্যূনতম বিবেকের দংশন, শোভনতা, শালীনতা লজ্জাবোধ বিসর্জন দিয়ে প্রচণ্ড দুর্মূল্যের বাজারে ভালো ঘি, ময়দা, পুকুরের মাছ, গুণধর পাঁঠার ফরমাস করে পাঠায়। এবং ইংরেজি কায়দায় গালভরা নাম দেয় ‘স্বাধীনতা ডিনার’। উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা গঙ্গাধরের পুত্র অমরেশ পর্যন্ত এই ভোজে অংশগ্রহণ করতে

ইচ্ছুক জেনে ব্যথিত হয় সে। এই ভোজের সমস্ত আয়োজনের দায়িত্ব এসে পৌঁছায় গঙ্গাধরের সুহৃদ পতিতপাবনের উপর। তারই দালান বাড়িতে এই ভোজের আয়োজন হয়। গঙ্গাধর তার আয়োজন করতে গিয়ে রাষ্ট্রনেতাদের উপর ক্রোধে সেই দুর্মূল্য বাজারে ভালো ভোজের পরিবর্তে এমন আয়োজন করে যাতে সেই খাবার কারোও মুখে দেওয়ার যোগ্য থাকে না।

এইভাবে তৎকালীন সময়পর্বে জনসাধারণের কল্যাণকর কাজে সরকারের উদাসীনতা এবং কাণ্ডজ্ঞানহীনতার প্রতি লেখকের মনের তীব্র বিক্ষোভ ‘স্বাধীনতা-ডিনার’ গল্পটির মধ্যে রূপ লাভ করেছে।

আবার ‘বিরূর প্রশ্ন’ গল্পেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার হাত ধরে আসা মহামন্বন্তরে সমগ্র দেশ বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের শোচনীয় অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন লেখক। গল্পটির কথকের বন্ধু হিসাবে চিত্রিত হয়েছে বিরূ চরিত্রটি যার চোখে ধরা পড়েছে মন্বন্তরের করুণ চিত্র। অসংখ্য নিরন্ন মানুষের হাহাকারের চিত্র। দু মুঠো অন্নের জন্য কলকাতার রাজপথে ভিড় করে আসে মানুষ। গ্রাম থেকে দলে দলে তারা কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়। মানুষের দরজায় দরজায় অন্নের জন্য বিফল পার্থনা করতে থাকে তারা। ভাত নয়, একটু ফ্যান পেলেও তারা বেঁচে যায়। লেখকের ভাষায় — “প্রত্যেক বাড়ির দোরগোড়ায় দুটি তিনটি, দুটি তিনটি করে দাঁড়িয়ে দু বছরের থেকে সত্তর বছরের পর্যন্ত কারুর কোলে ছয় মাসের শিশু— দেখলে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে—হাতে এক একটা করে মাটির বাসন— বড়জোর একটি লোহার শানকি—মুখে এক বুলি - ‘মা একটু ফেন দাও মা’।”<sup>(৫)</sup> এসব মানুষের জন্য বিরূ সবকিছু বিলিয়ে দেয়। কিন্তু সে প্রত্যক্ষ করে শহরের অধিকাংশ মানুষের মন থেকে মনুষ্যত্ব বোধটুকু হারিয়ে গেছে। তারা নিজেদের স্বার্থপরতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছে। এই সমস্ত নিরন্ন মানুষগুলির ক্রন্দন তাদের মনে বিন্দুমাত্র দাগ কাটতে পারেনি। তাই বিরূ বলেছে ‘কেউ বেঁচে নেই’ শহরে অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষের মন থেকে বিবেকবোধ, মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে গেছে। বিরূ কিন্তু এই স্বার্থপর মানুষগুলির সাথে একাসনে বসতে পারেনি। সে এই অসংখ্য অভুক্ত আশ্রয়হীন অবাস্তিত মানুষদের সাথে এক দলে মিলে গেছে “তাহার চারিদিকে দশ বারোটি কঙ্কালসার জীব-- মানুষ বলা চলে না তাদের, কেহ ভিক্ষা চাহিতেছে, কেহ নিজীব ভাবে পড়িয়া, কেহ হাতের পাত্র থেকে কাড়িয়া ভক্ষণ করিতেছে। দু একটি শিশু আমসির মতো স্তন হইতে সান্তনা আহরণের চেষ্টা করিতেছে, মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে বিরূ”<sup>(৬)</sup> কিন্তু সত্যি তো এই মানুষগুলি উচ্ছিষ্ট পেয়ে বেঁচে থাকার যোগ্য নয়। দেশের তথাকথিত শিক্ষিত বিবেকবান মানুষগুলির মধ্যে শুভবোধ জাগ্রত হোক, বীরুর অবস্থার মধ্য দিয়ে লেখক সেই প্রার্থনায় করেছেন।

এভাবে মন্বন্তরকালীন বাংলার সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্র ‘বিরূর প্রশ্ন’ গল্পটির মধ্যে ফুটে উঠেছে।

ভারতবর্ষকে দ্বিখন্ডিত করে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নিয়ে আসে। হিন্দুস্তান আর পাকিস্তান দুটি দেশের জন্ম হয়। এবার এই দুটি দেশের জন্ম কে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমান দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়, যে দাঙ্গায় উভয় সম্প্রদায়ের অসংখ্য নিরীহ মানুষের প্রাণ যায়। ‘কলকাতা নোয়াখালী বিহার’ গল্পগ্রন্থের ‘বিশ্বাস’ গল্পটির কথা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যায়।

গল্পের মুখ্য দুটি চরিত্র পরেশ এবং রহমান তারা দুজনে দীর্ঘকাল জুড়ে পরস্পর পাশাপাশি বাস করে আসছিল। কলকাতার একটি পল্লীতে তারা ছিল একে অপরের প্রতিবেশী। শুধু প্রতিবেশী নয় তাদের মধ্যে যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল তা ছিল সোনার মতোই খাঁটি। তারা দুজনে ভিন্ন সম্প্রদায়ের হলেও সেই সম্প্রদায়

গত কোনো বিভেদ তাদের মধ্যে ছিল না। হিন্দু-মুসলমানের মিশ্র বসতি ছিল সেখানে। দাঙ্গা কালীন পরিস্থিতিতেও তাদের সম্পর্কের মধ্যে প্রথমদিকে কোন চিড় ধরেনি। শিশুকাল থেকেই রহমান ও পরেশ ছিল বন্ধু, একই স্কুল একই ক্লাসে তাদের যাত্রা শুরু হয়। তখন হিন্দুস্তান ও আর পাকিস্তান এর মধ্যে কোনো ভেদ তৈরি হয়নি। স্কুল পেরিয়ে কলেজ, চাকরির জীবন সবই তাদের একসাথে, এমনকি বিবাহ তাদের একই সাথে হয়। পরেশ ও রহমান দুজনেই দুজনের বাড়ির সকলের মন জয় করে নেয়। পরেশের বাড়ির লোকজন যেমন রহমানের বাড়ি অবাধে যাতায়াত করে তেমনি রহমানের বাড়ির লোকজনও পরেশের বাড়ি যাওয়া-আসা করত। এরকমই আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধনে জড়িত ছিল উভয়ের পারিবারিক ব্যক্তিগত জীবন।

কিন্তু একসময় সম্প্রদায়গত বিভেদ দেশজুড়ে তীব্র আকার লাভ করে। যুদ্ধবিগ্রহ, হানাহানি কাটাকাটি নিত্য সংঘটিত হতে থাকল। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান দেশমাতাকে খন্ডিত করার নেশায় মেতে উঠল গোটা দেশ। দেশ-মাতৃকার সন্তানেরাই দেশের অঙ্গচ্ছেদ করার খরগ কে নিজের হাতে তুলে নেয়। তার ফলে - 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ার ভেদনীতি হইল আরো সফল। আগে ছিল “মন্দির ভাঙ্গো” “মসজিদ ভাঙ্গো” রব তাহার চেয়ে “দেশ ভাঙ্গো” রবটা আরোও মিষ্ট লাগিল - একতরফা রব, কিন্তু সংঘর্ষে আটকাচ্ছিল না, অখন্ড ভারতীয়রাও তো রহিয়াছে ওদিকে, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই। এত বিরাট একটা গন্ডগোল যে তাহার মধ্যে বাংলার পঞ্চাশ লক্ষ্য দুর্ভিক্ষ মূর্মুয়ুর হাহাকারও চাপা পড়িয়া গেল—তাহারা হিন্দুও ছিল মুসলমানও ছিল।”<sup>(১)</sup> এইরকম পরিস্থিতিতে বাংলার হিন্দু মুসলমান উভয়ই পরস্পরের বিরুদ্ধে হানাহানি হত্যাকাণ্ডে মেতে ওঠে। দেশচ্ছেদ বিশ্বাসীদের দল হঠাৎই জেহাদ ঘোষণা করে বসে। এই রাজনৈতিক উত্তেজনায় মেতে ওঠে রহমানও। দাঙ্গাকারী মানুষগুলির সঙ্গে সে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। হিন্দুদের দেশ ছেড়ে, এলাকা ছেড়ে তাড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করতে থাকে। চারিদিকের পরিবেশ পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তাল, যেকোনো মুহূর্তে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ নেমে আসতে পারে। এই কথা ভিতরে ভিতরে আন্দাজ করতে পেরে রহমান একসময় পরেশ কে এলাকা ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেয়, কিন্তু পরেশ এত সহজে মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাতে পারেনি। দীর্ঘদিন ধরে আত্মীয়ভাবে বসবাস করা মানুষগুলো যে ভয়ানক শত্রু হয়ে উঠতে পারে সে কথা সে কল্পনাতেও আনতে পারেনি। এমনকি তার প্রাণপ্রিয় বন্ধু রহমান যে সাম্প্রদায়িক হত্যা লীলায় মেতে, নিজের শৈশবের বন্ধুর কোনো ক্ষতি করতে পারে একথা সে কল্পনাতেও আনতে পারেনি। তাই রহমান পরামর্শ দিলেও পরেশ সেই এলাকা ছেড়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় না। সে রহমানকে বলে --“কিন্তু জিন্মা সাহেবের এদিক কার সেন্টিমেন্ট টা দেখছিস তো?... স্পষ্টই তো বলছে, হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোন অভিসন্ধি নেই, এখানকার মন্ত্রীদেরও তো ওই একই সুর, সেরকম উগ্র নেই তো আর, কাগজগুলো পড়ছিস না? দিন যতই এগিয়ে আসছে, নিজেদের দায়িত্ব--জ্ঞান নিশ্চয়ই ফিরে আসছে; বুঝছে তো—যা বলে ফেলছে তাতেই খানিকটা মিসচিফ হয়ে পড়বে।”<sup>(২)</sup> কিন্তু তা সত্ত্বেও রহমান পরেশকে তার ছেলেমেয়ে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে বলে। পরেশ সে কথায় আমল দেয় না তার মাসুল গুনতে হয় তাকে, জেহাদের দিন পরেশের সমস্ত পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তার বিশ্বাস ভঙ্গ হয়ে যায়। রহমানও এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মুক্তি পায় না। মুসলমানরা যেমন হিন্দুদের মারে তেমনি হিন্দুরাও উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তারও পুরো পরিবার বিনষ্ট হয়ে যায়। শুধু তার ত্রিশ বছরের বন্ধু পরেশ রহমানের একমাত্র মেয়ে নুড়িকে বাঁচিয়ে রাখে।

সেইসময় পর্বে এই বিপুল ধ্বংসযজ্ঞে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কবলে পড়ে শুধু পরেশ বা রহমানই নয় তাদের মতো অনেক মানুষ, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তাদের পরিবার আত্মীয় পরিজন সর্বস্ব হারিয়ে ফেলেছিল। শুধু পরেশ ও রহমানের মতো যারা বেঁচে ছিল তাদের স্বজন হারানোর বেদনার পাশাপাশি বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণা ও অনুতাপ নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়েছিল স্বাধীনতার পূর্বে দেশভাগকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের এই পাশবিকতার পরিচয় কে লেখক ‘বিশ্বাস’ গল্পটির মধ্যে অত্যন্ত জীবন্ত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিভূতিভূষণের গল্পে এই রাজনৈতিক উত্তেজনায় সমাজের বাস্তব রূপ যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি সমাজের অভ্যন্তরে মানুষের মনের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকা কুসংস্কার, জাতিভেদ প্রথা, তারও পরিচয় রয়েছে বিভিন্ন গল্পে। যেমন ‘সম্পত্তি’ গল্পে দুজন জমিদারের মধ্যে মূঢ় প্রতিদ্বন্দিতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ‘জাগ্রত’ গল্পে হরকালির চরিত্রের মধ্যে দিয়ে দেবতার প্রতি অন্য বিশ্বাসের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। ‘প্রতিপত্তি’ গল্পেও দেখা যায় দেশের নারী সমাজ দেবতার নামে বিমূঢ় বিশ্বাসে বিবশ, অন্ধ সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন। আবার সমাজে অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদও যে কতখানি প্রখর তারও পরিচয় রয়েছে ‘দেবতা’ গল্পটির মধ্যে। এ প্রসঙ্গে আমরা ‘দেবতা’ গল্পটির একটু বিস্তারিত আলোচনা করব।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন, সত্যাগ্রহ আন্দোলন অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সাধারণ মানুষের কাছে গান্ধীজী এক দেবতা স্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন। গান্ধীজীর মতাদর্শে নিম্নবিভ শ্রমিক শ্রেণীর মানুষেরা নানা আন্দোলনে মেতে উঠেছিল, এতে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল মালিক শ্রেণীকে ‘দেবতা’ গল্পে রমণী চাটুজ্যে এরকমই একজন চোরা চালানকারী ব্যবসাদার, যিনি শ্রমিক শ্রেণীর মানুষদের কাছে নিজের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য গান্ধীমন্দির বানানোর পরিকল্পনা করেন। তাকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসে নবীন হাজরা, সংকর পাল, কেষ্ঠ মজুমদার, সারদা বিশ্বাসের মতো মানুষেরা। যারা প্রত্যেকেই চোরা ব্যবসায়ের সঙ্গে ছিল যুক্ত। কারো ছিল চুন সুরথির কারবার, কারোও বা সিমেন্টের চোরা গুদাম আছে ইত্যাদি। বেশ আড়ম্বর সহকারে, ধুমধাম করে তারা অনেক পরিকল্পনা করে গান্ধীজীর মন্দির বানানোর সংকল্প করে—‘একদিকে থাকিবে চরখা- তাঁতশালা, একদিকে ছাগলঘর - ভোগের পায়েসের ব্যবস্থার জন্য। খুব একটা বড়ো যজ্ঞ করিয়া গান্ধীজীর মূর্তি স্থাপনা হইবে।’<sup>(৯)</sup>

গল্পে চোরাব্যবসায়ের একটি মস্ত বড় প্রতিবন্ধক চরিত্র হিসেবে দেখা যায় বিনোদকে। তার নেতৃত্বে চোরাব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কুলি-মজুরেরা নানা বিদ্রোহে মেতে ওঠে। এই গান্ধী মন্দির নির্মাণের কথায় প্রথমে সে প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হয়। তেত্রিশ কোটি দেবতা থাকতে তাদের মন্দির নির্মাণ না করে এমনকি গ্রামে যে বড় শিব মন্দির আছে , সংস্কারের অভাবে যার ভগ্নদশা সেই মন্দির কে মেরামত না করে একজন মানুষকে দেবতার আসনে বসিয়ে মন্দির বানানোর উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করতে না পেরে, রমণী চাটুজ্যের বাড়ি গিয়ে যথেষ্ট রাগ দেখায়। কিন্তু চোরাব্যবসায়ীদের সকলেই এই কাজের জন্য প্রশংসা করতে থাকে রমণী চাটুজ্যেকে। গান্ধীজীর মতো মহাপুরুষের মন্দির নির্মাণ করে তিনি খুবই পুণ্য কাজ করছেন বলে তারা মনে করেন। কিন্তু পরে বিনোদ এই কাজের আসল উদ্দেশ্যকে ভালোভাবে বুঝতে পারে। আসলে এটা ছিল চাটুজ্যের একটা প্রকান্ড চাল। এর মধ্যে আসলে ভক্তি কোথাও ছিল না। কারণ - “কুলি-মজুরগুলো ক্রমাগতই বেহাত হইয়া যাইতেছে, কথায় কথায় ধর্মঘট, শহরে পাঁচটা কল, তার মধ্যে তিনটে ওর নিজের,

একরকম অকর্মণ্যই হইয়া পড়ে মাঝে মাঝে, গান্ধী মন্দির প্রতিষ্ঠা কড়িয়া বুড়ো রমণী চাটুজ্যে এই কটাকে চাই ঠেকাইয়া রাখিতে। কতদূর সম্ভব সে আলাদা কথা, কিন্তু চেষ্টা করিতেছে।”<sup>(১০)</sup> তাই বিনোদ যদি এই কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে তো কুলি মজুরদের কাছে তার জনপ্রিয়তা চলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সেই কারণে বুদ্ধি খাটিয়ে এক অভিনব পরিকল্পনা গ্রহন করে।

সাতাশে আষাঢ় একটা যজ্ঞ করে মহাশক্তির পূজো করে মন্দিরের বুনেন দেওয়ার দিন স্থির হয়। সেইদিন সর্বত্র চাটুজ্যে মহাশয়ের জয়-জয়কার পড়ে যায়। খদ্দর পড়ে তিনি সর্বত্র তদারকি করে বেড়াতে থাকেন অত্যন্ত বিনয় সহকারে। বিকাল পর্যন্ত যজ্ঞ সমাপন শেষে মন্দিরের বুনেন দেওয়ার সময় হঠাৎই সদলবলে বিনোদ এসে উপস্থিত হয়। সঙ্গে আনে হান্ডা, চাঙ্গারি, আর একটি পিঠে পা ওলা ধর্ম গাইয়ের মতো একটি রহস্যজনক ছাগল। এসব আয়োজনের কৈফিয়ৎ দিয়ে বলে যে, গান্ধীজীর কাছে নিজে উপস্থিত হয়ে তাঁর সত্যিকারের প্রসাদ নিয়ে এসেছে যা সবার মুখে সে তুলে দিতে চায়। তাই “এখানে এসে এই দু হাঁড়ি পায়ের করে তার সঙ্গে তার সেই মুখের প্রসাদ মিশিয়ে দিয়ে সমস্তটাকে পবিত্র করে নিয়েছি। এইবার আপনারা সেই প্রসাদ পেয়ে ধন্য হবেন।”<sup>(১১)</sup> এই প্রসাদ সবার আগে প্রাপ্য পুরোহিত নিবারণ ভট্টাচার্যের। তাকে প্রসাদ দিতে গেলেই ভক্তির মোড়ক উন্মোচিত হয়ে যায় সবার সামনে। অত্যন্ত রাগে কম্পিত হতে হতে চিৎকার করে বলে ওঠে - ‘কী! আমি পঞ্চগনন সার্বভৌমের সন্তান, আমায় বেনের প্রসাদ খেতে হবে? এতবড় স্পর্ধার কথা বলে আমায় অর্বাচীন।’<sup>(১২)</sup> বিনোদ এর প্রত্যুত্তরে বলে— “দেবতার জাত নেই বলেই আমি জানতাম, তাই এই সাহসটা করেছিলাম।”<sup>(১৩)</sup> তাই যিনি দেবতাকে সবথেকে ভালো চিনে এই মহান কাজের উদ্যোগ করেছেন সেই রমণী চাটুজ্যের নিকট প্রসাদ নিবেদন করলে তিনি রাগে আক্রোশে কাঁপতে কাঁপতে বলেন - “আর আমার পূর্বপুরুষেরা বুঝি চামার ছিল মশাই? ঐ পেসাদ মুখে দিতে হবে আমায়! লোকে পঞ্চগনন সার্বভৌমের নাম শুনেছে আর বাসুদেব বাচ্ছপতির নাম শোনেনি? আমি এই উনসত্তর জাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঐ বেনের মুখের উচ্ছিষ্ট...।”<sup>(১৪)</sup> এরপর সকলের নিকট সমস্ত বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়। আসলে এইসব হল বুজরুকি, ধাঞ্চাবাজি। জনতা ক্ষেপে ওঠে, ঐ প্রসাদ তাদের মাথায় ঢেলে দিতে চায়।

এই গল্পে একদিকে যেমন অসৎ ব্যবসায়ী শ্রেণীর মানুষের ধর্মের নামে মিথ্যাকে আশ্রয় নেওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, তেমনি মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা যে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসেও তথাকথিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মানুষের কাছে কতটা প্রবলভাবে বিরাজিত ছিল তারও অত্যন্ত বাস্তব পরিচয় ‘দেবতা’ গল্পের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

এইভাবে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখা ছোটগল্পের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজনৈতিক আন্দোলন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তার বাস্তব প্রতিচ্ছবির সাথে সমাজের অভ্যন্তরের বিভিন্ন ক্ষত কে তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ভাবে রূপায়িত করেছেন। সেই সময় এর বিশ্বাসযোগ্য সামাজিক দলিল হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর লেখা ছোটগল্প গুলির গুরুত্বকে তাই অস্বীকার করা যায় না।

#### তথ্যসূত্র:

- ১) দত্ত, সরোজ ‘বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় জীবন ও সাহিত্য - সাধনা’: রত্নাবলী, ৫৯ এ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৯, ১৯৮৫/পৌষ ১৩৯১, পৃ. ৩৭।

- ২) মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, রচনাবলী; ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা, চৈত্র ১৪১৬, লঘুপাক' দুঃশাসন, গল্প, পৃ.৩২১।
- ৩) ঐ, স্বাধীনতা ডিনার, পৃ-৩২২।
- ৪) ঐ, পৃ. ৩২৩।
- ৫) বীরুর প্রশ্ন, ঐ, পৃ. ৩১৩।
- ৬) বীরুর প্রশ্ন, ঐ, পৃ. ৩১৫।
- ৭) মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ -রচনাবলী; ৪র্থ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩, আশ্বিন ১৪১৮, 'কলিকাতা নোয়াখালি- বিহার', 'বিশ্বাস' পৃ.২৭৫।
- ৮) ঐ, পৃ-২৭৬।
- ৯) মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, কথাচিত্র; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, আশ্বিন ১৩৫৬, দেবতা, পৃ.১৪।
- ১০) ঐ, পৃ. ১৯।
- ১১) ঐ, পৃ. ২৩।
- ১২) ঐ, পৃ. ২৫।
- ১৩) ঐ, পৃ. ২৫।
- ১৪) ঐ, পৃ. ২৬।

#### আকর গ্রন্থ:

- ১) মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, আশ্বিন ১৪১৮.
- ২) মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ১৪১৬
- ৩) মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, 'কথাচিত্র', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, আশ্বিন ১৩৫৬

#### সহায়ক গ্রন্থ:

- ১) গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ন 'সাহিত্যে ছোটগল্প', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০১৬
- ২) গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ন 'বাংলা গল্প বিচিত্রা', প্রকাশভবন, ১৫বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, মাঘ ১৪০১.
- ৩) ঘোষ মঞ্জুরি সম্পাদনা, 'অপ্রবাসী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, ১৯৮৯
- ৪) দত্ত সরোজ, 'বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় জীবন ও সাহিত্য' সাধনা, রত্নাবলী, ৫৯ বেচতে চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৯.১৯৮৫/পৌষ ১৩৯১
- ৫) মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার 'কালের পুস্তিকা—বাংলা ছোটগল্পের একশ বিশ বছর /১৮৯১-২০১০', সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, সেপ্টেম্বর ২০১১
- ৬) মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, 'জীবন-তীর্থ', নব মুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৭০ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০০০৪, ১লা ফাল্গুন ১৩৬৬.



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 610-615

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.049



## বিশ শতকে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি : প্রসঙ্গ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্প

রাকেশ চন্দ্র সরকার, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাঙ্গাপাড়া মহাবিদ্যালয়, আসাম, ভারত

Received: 10.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*After the World War-I, the morale value of people was discouraging in the world and in the midst of crisis; a number of writings were developed by the Bengali writers. The Bengali writers created a history by their valuable writings in this period. The famous Bengali writer who has been remembering for his revolutionary writings after World War-I was Manik Bandyopadhyay. Manik Bandyopadhyay was born at the time of Swadeshi Movement, Boycott Movement and First World War. He witnessed the critical days after the Great War when the world was facing economic depression. As the capitalists continuously exploited the innocent villagers, the people of Bengali middle class became the pray of this misdeed. Similarly, the British domination was also increasing day by day. This created atrocities in the minds of the people of Bengali middle class. So, the main topics of the writings of Manik Bandyopadhyay included the conditions of middle-class people, movements of labour class etc. Interesting was that, Manik Bandyopadhyay's writings reflected his inclination towards Marxism. The novels of Manik Bandyopadhyay namely, Putulnacher Itikatha, Dibaratrir Kabya, Padma Nadir Manjhi etc. and the short stories namely, Otashimami, Pragaitihashik, Chotobokulpurer Jatri, Sare Sath Ser Chal etc. are considered important and valuable creations of this well-known writer. All the writings of Manik Bandyopadhyay contain the lives and other issues of the people of Bengali middle people.*

**Keywords:** Middle Class, Crisis, Swadeshi, Exploitation, Marxism.

কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯মে ১৯০৮ সালে সাঁওতাল পরগনার দুমকা শহরে। পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুর, ঢাকা শহরে। তার পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাকনাম মানিক। সেটাই তিনি লেখক-নাম করে তোলেন। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা নীরদা দেবী। উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের চতুর্থ পুত্র বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ থেকে আই এস সি পাশ করে অঙ্কে অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি এস সি পড়ার সময় প্রথম গল্প 'অতসীমামী' লেখেন এবং 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ছাপা হয় ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে।



সাহিত্যচর্চায় তাঁর আগ্রহ অভিভাবকদের সহানুভূতি পায়নি। বরং বিরোধিতা এসেছে। কিন্তু সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ তাঁর নিজের পথ বলে মনে করেন মানিক। শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে স্বেচ্ছানির্বাচিত দারিদ্র্যের মধ্যে সাহিত্যকর্মকেই জীবিকার একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনের দু-চার বছরের চাকরি ছাড়া সাহিত্যরচনাই ছিল তাঁর একমাত্র কাজ। “লেখা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই যে সব কথা জানানো যায় না, সেই কথাগুলো জানাবার জন্যই আমি লিখি।”<sup>১</sup> মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণীয় উপন্যাসগুলির মধ্যে আছে ‘পদ্মানদীর মাঝি’, ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’, ‘ইতিকথার পরের কথা’, ‘শহরবাসের ইতিকথা’, ‘হলুদ নদী সবুজ বন’, ‘জননী’, ‘চিহ্ন’, ‘হরফ’ ইত্যাদি। লিখেছেন তিনশোর বেশি গল্প। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলি হল, ‘অতসীমামী’, ‘প্রাগৈতিহাসিক’, ‘সরীসৃপ’, ‘বউ’, ‘পরিস্থিতি’, ‘লাজুকলতা’ ইত্যাদি। মানিকের প্রবন্ধ সংকলনের নাম ‘লেখকের কথা’।

প্রয়াত সমালোচক ও কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, “মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চিরদিন আঙ্কিকের স্থির-মস্তিষ্ক নিয়ে ‘কেন’-র উত্তর খুঁজেছেন। তাঁর দৃষ্টি মোহ ও পূর্বসংস্কারমুক্ত। তিনি বিজ্ঞানজীবী।” লেখালেখি সম্পর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই বলেছেন “জীবনকে আমি যে ভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেবার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা জেনেছি এ জগতে কেউ তা জানে না (জল পড়ে পাতা নড়ে জানা নয়)। কিন্তু সকলের সঙ্গে আমার জানার এক শব্দার্থক ব্যাপক সমভিত্তি আছে। তাকে আশ্রয় করে আমার খানিকটা উপলব্ধি অন্যকে দান করি।। দান করি বলা ঠিক নয়, -পাইয়ে দিই। তাকে উপলব্ধি করাই। আমার লেখাকে আশ্রয় করে সে কতকগুলি মানসিক অভিজ্ঞতা লাভ করে-আমি লিখে পাইয়ে না দিলে বেচারী যা কোনদিন পেত না।”<sup>২</sup> তাঁর লেখায় মধ্যে মধ্যবিত্ত মানুষ এর কথা বর্ণিত হয়েছে।

মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের অন্যতম সংস্থান হলো খাদ্য। খাবারের জন্যই নিয়মিত সংঘর্ষ করতে হয়। ‘সাড়ে সাত সের চাল’ গল্পে দেখা যায় অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের কাতর আর্তনাদ। আধার রাতে সন্ন্যাসী যখন পিঠে সাড়ে সাত সের চাল নিয়ে নিজের গ্রামে ফিরছিল তখন তার মনে ভয় ছিল কেউ তার চাল ছিনিয়ে না নেয়। এতটাই অন্য কষ্ট যে মানুষ একে অন্যের খাবার করে খেতে বাধ্য হচ্ছে। সন্ন্যাসীর কল্পনায় ভেসে ওঠে খাবার এর যন্ত্রনার নিদারুণ চিত্র। “-না খেতে পেয়ে কজন তার বাড়িতে ইতিমধ্যে মরে গেছে কে জানে! কজন মরোমরো হয়ে আছে তাই বা কে জানে! দু-একজন হয়তো ঠিক এমন অবস্থায় পৌঁছেছে- তাদের মধ্যে সোনা বউঠান একজন হতে পারে- তার সাড়ে সাত সের চালের দু-মুঠো নিয়ে সিদ্ধ করে আজ মাঝরাত্রেও দিতে পারলে যারা জীবনমরণের সীমারেখায় টলমল করার বদলে বেঁচে যাওয়ার দিকেই কোনোমতে টলে পড়তে পারবে। আবার লড়াই করতে পারবে তারপর। কাল পর্যন্ত দেরি করলে হয়তো- সর্বনাশ।”<sup>৩</sup> খাবারের অভাবে যে শুধু মানুষ মারা যেতে পারে তা নয়, সেই সাথে পশু-পাখিও মারা যায়। “মানুষ ও কুকুরের একসঙ্গে মরবার ও গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যাবার এই অতি ঠাণ্ডা খবর অনুভব করতে গিয়ে সন্ন্যাসীর জ্বরো অনুভূতি ছ্যাঁতছ্যাঁত করে উঠল।”<sup>৪</sup>

খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান -এই তিনের সমাহারেই চলে জীবন। জীবন যুদ্ধে কখনো খাদ্য সংকট, আবার কখনো বাসস্থানের সংকট দেখা যায়। “পলাশমতিতে প্রবেশপথের ধারেও তেমনই একটি ভাঙা বাড়ি আছে, কেবল বেড়ার কিছুই অবশিষ্ট নেই। কানা বাঞ্জুর বাড়ি। দেখলেই টের পাওয়া যায় বাড়িটা শূন্য, মানুষ নেই। ‘বাঞ্জুর’ ! সাড়া না পেয়ে অনুমানকে প্রত্যয় করে সন্ন্যাসী এগিয়ে গেল। দু-একটি দুঃস্থ কুকুরের তেমনই ক্ষীণ

আওয়াজ কানে আসছে। কোন বাড়িতে মানুষ আছে, কোন বাড়িতে নেই নির্ণয় করতে সে সময় নষ্ট করবে না। সোজা বাড়ি চলে যাবে-নিজের বাড়িতে কে বেঁচে আছে, কে মরে গেছে দেখতে। বামুনপাড়ার নতুন পুকুরের পাশ দিয়ে যাবার সময় মনে হল কে যেন জিজ্ঞাসা করল, ‘কে?’, সন্ন্যাসী সাড়া দিল না। ঘোষালদের আমবাগান থেকে শুকনো পাতায় চারপেয়ে কোন কিছুর চলার মচমচ শব্দের সঙ্গে তীব্র একটা পচা গন্ধ ভেসে এল। পরের পাড়ার তিনটি বাড়ি পেরিয়ে তাদের টিনের চালার তিনটি ঘরওয়ালা বাড়ি। আট-নবছর মেরামত হয়নি। তবে যা কিছু থাকবার কথা প্রায় সবই আছে, ভেঙে পড়েনি এখনও। বেড়া নেই। পাশের ছোটো কলাবাগান আর সবজি খেতের বেড়ার চিহ্ন লোপ পেয়েছে। সামনে লাউ কুমড়ার মাচা দুটি হয়েছে অদৃশ্য।”<sup>৫</sup> আসলে কোন ঘরে কেউ নেই তালা দিয়ে সবাই পালিয়েছে অথবা মারা গিয়েছে। “সবাই যখন বেঁচে ছিল তখন সবাই পালিয়েছে, সোনা বউঠান সুদ্ধু? না, অনেকে যখন মরে গিয়েছিল তখন পালিয়েছে বাকি যারা ছিল? কোথায় পালিয়ে কোথায় মরেছে বাড়ির সবাই, সোনা বউঠান সুদ্ধু? ভাবতে ভাবতে ঝিমোতে ঝিমোতে একসময় দাওয়া থেকে হুমড়ি দিয়ে উঠোনে পড়ে সন্ন্যাসী নিঃশব্দে মরে গেল।”<sup>৬</sup> এই ভাবেই কতশত মানুষ রোজ জীবনযুদ্ধে হেরে গিয়ে নিঃশব্দে মারা যায়।

খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান তিনটি মিলেই যখন জীবনচক্রের অপরিহার্যতা। ‘সাড়ে সাত সের চাল’ গল্পে দেখা গেছে খাদ্য ও বাসস্থানের সংকটময় পরিস্থিতি। ঠিক তেমনি বস্ত্র মানুষের লজ্জা নিবারণের এক অন্যতম আধার। সেই বস্ত্র সংকট নিয়েই লেখা ‘দুঃশাসনীয়’ গল্প। “কোনো ছায়ার গায়ে লটকানো থাকে একফালি ন্যাকড়া, কোনো ছায়ার কোমরে জড়ানো থাকে গাছের পাতার সেলাই করা ঘাঘরা, কোনো ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার, কুরুসভায় দ্রৌপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় রূপক বস্ত্রের মতো।”<sup>৭</sup>

হাতিপুর গ্রাম দুর্ভিক্ষের গ্রাসে তলিয়ে গিয়েছে। “দুর্ভিক্ষে গাঁয়ের অধিকাংশের অপমৃত্যু -নিরুদ্ধার, এ-জ্ঞান জন্মেই আছে। তারপর সেই গাঁয়ে চারিদিকে ছায়ামূর্তির সঞ্চারণ চোখে দেখে এবং মর্মে অনুভব করে তাদের কি সন্দেহ থাকতে পারে যে জীবিতের জগৎ পার হয়ে তারা ছায়ামূর্তির জগতে এসে পৌঁছে গেছে।”<sup>৮</sup> আসলে বস্ত্রের অভাবে রাতের অন্ধকারে নিজেদের লজ্জা নিবারণের চেষ্টায় ছায়া মূর্তি হয়ে উঠেছে। ভোলা নন্দী নিজের ধুতিখানা বাড়ির মেয়েদের দিয়েছে। ভোলার বউ কাপড় পড়ে বাইরে কাজকর্ম সেরে ঘরে এসে মেয়েকে দেয়। মেয়ে সেই ভেজা কাপড় গায়ে জড়িয়ে বাইরে যায়। এইভাবে একটি ধুতি দিয়েই বাড়ির মেয়েরা বাইরে বের হয়। বিপিন সামন্তের মতো মুনাফা লোভী মানুষের লোলুপ দৃষ্টিপাত থেকে রক্ষা পায়না বিন্দীর মতন সাধারণ মেয়েরা। “এই শনের বনের মাঝখানের পায়ে-হাঁটা পথ ধরে বেনারসি শাড়ি পরা গোকুলের বোন মালতী বিপিন সামন্তের পিছু পিছু ছ-কুনের ছাউনির দিকে চলতে থাকে গর্বে ফাটতে ফাটতে, তাই তাকিয়ে দ্যাখে মানদা ঘরের বেড়ার ফোকর-জানালায় চোখ রেখে। দাসু কামারের মেয়েটা আজ ওদের সঙ্গে যাচ্ছে। ও-ও তো রাতের ছায়া ছিল কাল রাত্রিতক, সারাদিন ঘরে লুকিয়ে থেকে চুপিচুপি ঘাটে আসত দুটো-চারটে বাসন আর কলসি নিয়ে। ধোপদুরস্ত সাদা থান কাপড়টা কোথা পেল ও সধবা মাগি?”<sup>৯</sup>

মানদা সব দেখেও কিছু বলার ও করবার থাকে না। কারণ সে নিজেও অসহায়। যদিও বিন্দি এই ফাঁদ থেকে ছাড়া পেতে চায়। কিন্তু কাপড়ের জন্য ছাড়তে পারে না। “অ বিন্দু! দাঁড়া। রঘু ডাকে। বিন্দী দাঁড়ায়। ফাঁদছাড়া হরিণী তো নয় আসলে, মানুষের মেয়ে। দাঁড়িয়ে মুখ ফেরায়। বলে, ‘কাল-কাল যাব সামন্ত মশায়। বড় ডর লাগছে’। বেনারসি পরা মালতী বলে, ‘ইহিরে, খুকি মোর ডর লাগছে। দে তবে, দে কাপড়

খুলে। খোল কাপড়। যাবি তো চ, নয় কাপড় খুলে দিয়ে ঘরে।”<sup>১০</sup> চাষির ঘরের বউ রাবেয়া দুর্ভিক্ষের দিনে না খেয়ে কাটিয়েছে কোন কথা বলেনি। কিন্তু নিজের আত্মসম্মান লজ্জা নিবারণের বস্ত্রের অভাবে সে পায়খানার চটের পর্দা গায়ে জড়িয়ে মৃত্যুর পথ বেছে নিতে চেয়েছে। স্বামী আনোয়ারকে রাগ ও আক্ষেপ করে জানিয়েছে। “কাপড় যদি নেই, ঘোষবাবুর বাড়ির মেয়ারা এবেলা ওবেলা রঙিন শাড়ি বদলে নিয়ে পরে কী করে, আজিজ সায়েবের বাড়ির মেয়েরা চুমকি বসানো হালকা শাড়ির তলার মোটা আবরণ পায় কোথায়? সবাই পায়, পায় না শুধু তার স্বামী!”<sup>১১</sup> তাই রাবেয়ার মত মেয়েদের শেষে পুকুরের জলে ডুবে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়।

গ্রামের সকল চাষি মজুর মিলে অনেক চেষ্টা করেও কাপড় জোগাড় করতে ব্যর্থ কারণ কালোবাজারিতে ভরে গিয়েছে সমাজ। “আবদুল আজিজ আর সুরেন ঘোষ হাতিপুরের একুশ-শ চাষি ও কামার কুমোর জেলে জোলা তাঁতি আর আড়াই-শ ভদ্র স্ত্রী-পুরুষের কাপড় জোগাবার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে। মাস দেড়েক আগে উলঙ্গ হাতিপুর সোজাসুজি সদরে গিয়ে মহকুমা হাকিম গোবর্ধন চাকলাদারকে লজ্জিত করেছিল। এভাবে সিধে আক্রমণের উসকানি যুগিয়েছিল শরৎ হালদারের মেজ ছেলে বন্ধু আর তার সতেরজন সাঙ্গোপাঙ্গ। সতেরো মাইল দূরে স্বদেশসেবক তপনবাবুর কাপড়ের কল কয়লার অভাবে অচল হয়েও সাড়ে তিন-শ তাঁত কী করে সচল আছে আর খালি গুদামে কেন অনেক শ’ গাঁট ধুতি শাড়ি জমে আছে, এসব তথ্য আবিষ্কার করায় বন্ধু আর তার সাতজন সাঙ্গোপাঙ্গ মারপিট দাঙ্গাহঙ্গামার দায়ে হাজতে আছে সোয়ামাস।”<sup>১২</sup>

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম একটি গল্প হল ‘কে বাঁচায়, কে বাঁচে!’ গল্পে মধ্যবিত্ত মৃত্যুঞ্জয় কিভাবে ধীরে ধীরে ফুটপাতের হতদরিদ্র নিরন্ন মানুষের মাঝে নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। “তারপর দিন দিন কেমন যেন হয়ে যেতে লাগল মৃত্যুঞ্জয়। দেরি করে আপিসে আসে, কাজে ভুল করে, চুপ করে বসে ভাবে, একসময় বেরিয়ে যায়। বাড়িতে তাকে পাওয়া যায় না। শহরের আদি অন্তহীন ফুটপাত ধরে সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। ডাস্টবিনের ধারে, গাছের নীচে, খোলা ফুটপাতে যারা পড়ে থাকে, অনেক রাতে দোকান বন্ধ হলে যারা হামাগুড়ি দিয়ে সামনের রোয়াকে উঠে একটু ভাল আশ্রয় খোঁজে, ভোর চারটে থেকে যারা লাইন দিয়ে বসে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃত্যুঞ্জয় তাদের লক্ষ করে। পাড়ায় পাড়ায় লঙ্গরখানা খুঁজে বার করে অন্নপ্রার্থীর ভিড় দেখে। প্রথম প্রথম সে এইসব নরনারীর যতজনের সঙ্গে সম্ভব আলাপ করত। এখন সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। সকলে এক কথাই বলে। ভাষা ও বলার ভঙ্গি পর্যন্ত তাদের এক ধাঁচের। নেশায় আচ্ছন্ন অর্ধচেতন মানুষের প্যানপ্যানানির মতো ঝিমানো সুরে সেই এক ভাগ্যের কথা, দুঃখের কাহিনী। কারও বুকো নালিশ নেই, কারও মনে প্রতিবাদ নেই। কোথা থেকে কীভাবে কেমন করে সব ওলটপালট হয়ে গেল তারা জানেনি, বোঝে নি, কিন্তু মেনে নিয়েছে।”<sup>১৩</sup>

মৃত্যুঞ্জয় ফুটপাতের মৃত্যু দেখে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। নিজের অর্জিত সমস্ত অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের মতো মানুষেরা বুঝতে পারেনা যে সমুদ্রে এক বালতি জল নিষ্ক্ষেপের নেয় হচ্ছে। “যে রিলিফ চলছে তা শুধু একজনের বদলে আর একজনকে খাওয়ানো। এতে শুধু আড়ালে যারা মরছে তাদের মরতে দিয়ে চোখের সামনে যারা মরছে তাদের কয়েকজনকে বাঁচানোর চেষ্টা করার সালুনা।”<sup>১৪</sup> মৃত্যুঞ্জয়ের এই সমাজে নিজেকে উৎসর্গ করা দেখে বন্ধু নিখিল বারংবার সজাগ করার প্রয়াস করেছে। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থতাই পরিণত হয়েছে। গল্পের শেষে দেখা যায় মৃত্যুঞ্জয় ফুটপাতের ভিড়ে মিশে

গিয়েছে। “তারপর মৃত্যুঞ্জয়ের গা থেকে ধূলিমলিন সিল্কের জামা অদৃশ্য হয়ে যায়। পরনের ধুতির বদলে আসে ছেঁড়া ন্যাকড়া, গায়ে তার মাটি জমা হয়ে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। দাড়িতে মুখ ঢেকে যায়। ছোট একটি মগ হাতে আরও দশজনের সঙ্গে সে পড়ে থাকে ফুটপাথে আর কাড়াকাড়ি মারামারি ক’রে লঙ্গরখানার খিচুড়ি খায়। বলে, ‘গাঁ থেকে এইছি। খেতে পাইনে বাবা। আমায় খেতে দাও!’”<sup>১৫</sup>

‘প্রাগৈতিহাসিক’ গল্পে দেখা যায় ডাকাত ভিখু বাঁচার তাগিদে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছে। ডাকাতির সময় তার একটা হাতে আঘাত লেগে অকেজ হয়ে যায়। সেই অকেজো হাতের সাহায্যেই সে ভিক্ষা দিয়ে রোজগার শুরু করে। “কয়েক দিনের ভিতরেই সে পৃথিবীর বহু পুরাতন ব্যবসাটির এই প্রকাশ্যতম বিভাগের আইনকানুন সব শিখিয়া ফেলিল। আবেদনের ভঙ্গি ও ভাষা তাহার জন্ম-ভিখারির মতো আয়ত্ত হইয়া গেল। শরীর এখন আর সে একেবারেই সাফ করে না, মাথার চুল তাহার ক্রমেই জট বাঁধিয়া বাঁধিয়া দলা দলা হইয়া যায় এবং তাহাতে অনেকগুলি উকুন-পরিবার দিনের পর দিন বংশবৃদ্ধি করিয়া চলে। ভিখু মাঝে মাঝে খ্যাপার মতো দুই হাতে মাথা চুলকায়, কিন্তু বাড়তি চুল কাটিয়া ফেলিতে ভরসা পায় না। ভিক্ষা করিয়া সে একটি ছেঁড়া কোট পাইয়াছে, কাঁধের ক্ষতচিহ্নটা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য দারুণ গুমোটের সময়েও কোটটি সে গায়ে চাপাইয়া রাখে। শুকনো হাতখানা তাহার ব্যবসার সবচেয়ে জোরালো বিজ্ঞাপন, এই অঙ্গটি ঢাকিয়া রাখিলে তাহার চলে না। কোটের ডানদিকের হাতাটি সে তাই বগলের কাছ হইতে ছিঁড়িয়া বাদ দিয়াছে। একটি টিনের মগ ও একটা লাঠিও সে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজারের কাছে রাস্তার ধারে একটা তেঁতুল গাছের নীচে বসিয়া সে ভিক্ষা করে। সকালে এক পয়সার মুড়ি খাইয়া নেয়, দুপুরে বাজারের খানিক তফাতে একটা পোড়ো বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া বটগাছের নীচে হুঁটের উনুনে মেটে হাঁড়িতে ভাত রান্না করে, মাটির মালসায় কোনদিন রাঁধে ছোট মাছ, কোনদিন তরকারি। পেট ভরিয়া খাইয়া বটগাছটাতোই হেলান দিয়া বসিয়া আরামে বিড়ি টানে। তারপর আবার তেঁতুলগাছটার নীচে গিয়া বসে।”<sup>১৬</sup>

ভিখু যৌবনের জ্বালা অনুভব করে। “রাত্রে স্বরচিত শয্যায় সে ছটফট করে। নারীসঙ্গহীন এই নিরুৎসব জীবন আর তাহার ভালো লাগে না। অতীতের উদ্দাম ঘটনাবহুল জীবনটির জন্য তাহার মন হাহাকার করে।”<sup>১৭</sup> ভিখু যৌবনের তাগিদে পাঁচী ভিখারীকে সঙ্গী করেছে। পাঁচীর সঙ্গী বসিরকে হত্যা করে পাঁচীকে নিয়ে পাড়ি দেয় অজানা পথে।

‘হলুদ পোড়া’ গল্পে বলাই চক্রবর্তী ও শুভ্রার অস্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গল্প শুরু হয়। শুভ্রার দাদা স্কুলের মাস্টার হলেও মন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। গ্রামে নবীনের মত শিক্ষিত ছেলেও যে অন্ধ বিশ্বাসের বেড়া জাল থেকে বের হতে পারে না। তার প্রমাণ মেলে স্ত্রী দামিনের অসুস্থতায় মন্ত্র তন্ত্রের মাধ্যমে ভালো করার প্রচেষ্টায়। কুঞ্জ গুণীন এর কাজকর্ম গ্রামের লোকেরা ভিড় করে কৌতুক ভরা দৃষ্টিতে উপভোগ করতে চায়। “এক পা সামনে এগিয়ে, পাশে সরে, পিছু হটে, সামনে পিছনে দুলে দুলে, কুঞ্জ দুর্বোধ্য মন্ত্র আওড়াতে থাকে। মালসাতে আগুন করে তাতে সে একটি দুটি শুকনো পাতা আর শিকড় পুড়তে দেয়, চামড়া পোড়ার মতো একটা উৎকট গন্ধে চারিদিক ভরে যায়। দামিনীর আর্তনাদ ও ছটফটানি ধীরে ধীরে কমে আসছিল, এক সময়ে খুঁটিতে পিঠি ঠেকিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সে বোজা বোজা চোখে কুঞ্জর দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ হয়ে রইল। তখন একটা কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে কুঞ্জ তার নাকের কাছে ধরল। দামিনীর ঢুলুঢুলু চোখ ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সর্বাঙ্গে ঘন ঘন শিহরণ বয়ে যেতে লাগল। ‘কে তুই? বল, তুই কে?’ ‘আমি শুভ্রা গো, শুভ্রা। আমায় মেরো না।’”<sup>১৮</sup>

শুধুমাত্র দামিনীর প্রতি নয়। গ্রামের প্রতিটি মানুষ কুসংস্কার বশীভূত হয়েছে। তাই তো ধীরেধীরে স্ত্রী গ্রামের ক্ষেপ্তি পিসির কাছে জেনেছে কিভাবে ভূতকে আটকানো সম্ভব। “নূতন একটা বাঁশ কেটে আগা মাথা একটু পুড়িয়ে ঘাটের পথে আড়াআড়ি ফেলে রাখতে। ভোরে উঠে সরিয়ে দেব, সন্দের আগে পেতে রাখব। তুমি যেন আবার ভুল করে বাঁশটা ডিঙিয়ে যেও।”<sup>১৯</sup>

মধ্যবিত্ত তথা দরিদ্র মানুষের মুখের কথা সাহিত্যের পাতায় কথাশিল্পী সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন তার সাবলীল কলমের মাধ্যমে। ‘শিল্পী’ গল্পে মদন তাঁতি কিভাবে সুতোর অভাবে খালি তাঁত চালিয়ে নিজের পায়ের যন্ত্রণাকে লাঘব করেছে। আবার ‘ছিনিয়ে খায়নি কেন’ গল্পে যোগী ডাকাতে বর্ণনায় দেখা যায় খাদ্যাভাবের চরম দুর্দশা। এছাড়াও ‘টিচার’, ‘হারানের নাত জামাই’, ‘ছোট বকুলপুর এর যাত্রী’, প্রভৃতি গল্পের মধ্য দিয়ে দরিদ্র মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। যা সমকালীন সমাজের ভাষ্য।

### তথ্যসূত্র:

- ১) চক্রবর্তী, যুগান্তর, (সম্পাদনা) ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প’, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ভূমিকাংশ ১০।
- ২) তদেব, পৃ. ভূমিকাংশ ১০।
- ৩) তদেব, পৃ. ৮৮।
- ৪) তদেব, পৃ. ৮৯।
- ৫) তদেব, পৃ. ৮৯।
- ৬) তদেব, পৃ. ৯০।
- ৭) তদেব, পৃ. ৯১।
- ৮) তদেব, পৃ. ৯১।
- ৯) তদেব, পৃ. ৯২।
- ১০) তদেব, পৃ. ৯৩।
- ১১) তদেব, পৃ. ৯৪।
- ১২) তদেব, পৃ. ৯৪।
- ১৩) তদেব, পৃ. ৮৬।
- ১৪) তদেব, পৃ. ৮৬।
- ১৫) তদেব, পৃ. ৮৭।
- ১৬) তদেব, পৃ. ১৪।
- ১৭) তদেব, পৃ. ১৫।
- ১৮) তদেব, পৃ. ৭৮।
- ১৯) তদেব, পৃ. ৮১।



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 616-623

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.050



## জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্পে চিত্রভাবনা

আদেশ লেট, গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস, উত্তর প্রদেশ, ভারত

Received: 12.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*Jyotirindra Nandi (20 August 1912 - 3 August 1982) is recognized as one of the finest fiction writers in 20th-century Bengali literature. His works often delve into the complexities of family relationships and the psychological nuances of both male and female characters. While many writers employ diverse techniques to publish their works, Nandi's approach is uniquely distinctive. One of his most striking stylistic devices is the use of vivid imagery. In nearly all of his stories and novels, he skilfully crafts pictures using by words to bring his narrative to life and evoke a strong emotional response in the reader.*

*As revealed in the introduction to Jyotirindra Nandir Nirbachita Galpo, edited by Dr. Nitai Bosu, Nandi had a lifelong fascination with visual art. From a young age, he enjoyed painting alongside his paternal uncle, indicating an early artistic inclination. Inspired by the historical novels of Rameshchandra Dutt and the literary works of Rabindranath Tagore, Nandi began to explore the potential of imagery in fiction. This fusion of artistic sensibilities resulted in a distinctive literary voice, blending the depth of a gifted storyteller with the keen visual perception of a painter.*

*By analyzing stories such as Nadi o Nari, Samudro, Brishtir Pore, Girgiti, Shwapad, Mangalgraho, Parvatipurer Bikel, and Jwala, we can observe how Jyotirindra Nandi masterfully integrates imagery into his narratives, enriching them with layers of visual and emotional depth.*

**Keywords:** Imagery, Visual representation, light and shadow, Portraiture, Pomegranate tree, Illusion

আমরা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জীবন পর্যালোচনা করলে দেখব যে একেবারে প্রথম জীবনে তিনি চিত্রশিল্পের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। তখন তিনি লেখার চেয়ে বেশি ছবি আঁকায় মগ্ন ছিলেন। তাঁর আর্টিস্ট জীবনের সঙ্গী ছিলেন তাঁর ছোটোমামা। তারপর যখন তিনি রমেশচন্দ্র দত্ত-র ‘মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত’, ‘মাধবীকঙ্কন’ ও ‘রাজপুত্র জীবনসন্ধ্যা’ এই তিনটি উপন্যাস হাতের কাছে পেয়েছিলেন, তখন উপন্যাসে বর্ণিত পাহাড়, ঝর্না ইত্যাদি প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্য তাঁর মনে চিত্র হয়ে ধরা দিয়েছিল। তারপর

রবীন্দ্রনাথের ‘গল্পগুচ্ছ’ হাতে পাওয়ার পর তিনি অভিভূত হন এবং গল্প লেখার প্রতি মনোনিবেশ করেন। তখন তিনি রং-তুলি নিয়ে ছবি আঁকা থেকে কিছুটা সরে এসে গল্পের মধ্য দিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করেন এবং সুনিপুণ ছবির ব্যবহার করে তিনি তাঁর গল্পগুলিকে অনবদ্য করে তোলেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পগুলি পর্যালোচনা করলে আমরা বিভিন্ন ধরনের ছবির সন্ধান পেয়ে থাকি। যেমন— নিসর্গ প্রকৃতির ছবি, প্রতিকৃতির ছবি, বিমূর্ত ছবি, ইত্যাদি। আবার এরই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ‘আলো-ছায়া’ (Light and Shade)-র সুনিপুণ উপস্থাপনা এবং বিশেষ বিষয়বস্তুর ওপর আলোকপাত (Focus on) করার প্রবণতা। আলোচ্য প্রবন্ধে আনুপুঞ্জিক আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

প্রথমেই আসা যাক গল্পকার তাঁর গল্পে নিসর্গপ্রকৃতির চিত্রকে কীভাবে উপস্থাপন করেছেন সেই প্রসঙ্গে। মনে রাখতে হবে একজন গল্পকার তাঁর গল্পে অযথা কোনো ছবিকে টেনে আনেন না। গল্পের আবহ সৃষ্টি, পরিবেশ নির্মাণ এবং গল্পের মেজাজকে স্পষ্ট করতেই তিনি ছবি সৃষ্টি করেন। ‘নদী ও নারী’ গল্পে যে প্রকৃতি-চিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায় তা থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গল্পটির নামকরণে গল্পকার যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন, সেই ব্যঞ্জনাকে ধরে রাখতেই বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি এক বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে প্রকৃতিকে বার বার টেনে এনেছেন। গল্পের প্রথম অংশটি লক্ষণীয়— ‘সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি যায় নদীর পাড় ধরে মাঠের পর মাঠ। পরিষ্কার স্বচ্ছ শস্পতটের মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথ গঞ্জে যাবার। এখানে ওখানে দুটি নারকেল গাছ। চারিদিক নিঃবুম।’<sup>১</sup> বর্ণনাটি পড়ে আমরা সহজেই বুঝতে পারি এটি একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। আবার গল্প পড়ে এও জানা যায় যে এই অংশে নৌকায় এক নবদম্পত্তি অর্থাৎ সুরপতি ও নির্মলা উপস্থিত রয়েছে। কিন্তু তবুও এই দৃশ্যকে রোমান্টিক মনে হয় না। কেননা, এখানে গল্পকারের উদ্দেশ্য রোমান্টিকতা নয়। তিনি গল্পের আবহ নির্মাণ করতেই এই নির্জন পরিবেশের ছবি এঁকেছেন। ছবিটির দিকে লক্ষ রাখলে দেখবো যে, ‘নদীর পাড় ধরে মাঠের পর মাঠ’, ‘এখানে ওখানে দুটি একটি নারকেল গাছ’ এই উপাদানগুলি তিনি খুব সচেতন ভাবেই ব্যবহার করেছেন এক বিচ্ছিন্নতা বা নির্জনতাকে স্পষ্ট করতে। তাই তিনি বলেছেন ‘চারিদিক নিঃবুম’, শুধু তাই নয়, ‘নির্মলার শাড়ির খসখস শব্দ ও হাতের চুড়ির আওয়াজ টের পেয়ে একটা মাছরাঙা ‘ক্রিক’ শব্দ করে উড়ে গেল’<sup>২</sup> এই কথাটির মধ্য দিয়ে তিনি নির্জনতাকে অনেকটাই বাড়িয়ে তুলেছেন। পরিবেশ কতটা শুনশান হলে ‘শাড়ির খসখস ও চুড়ির আওয়াজ’-এ একটা মাছরাঙা পাখি ‘ক্রিক’ শব্দ করে উড়ে যেতে পারে তা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু গল্পকার কেন এরকম পরিবেশের ছবি গ্রহণ করেছেন তা গল্পের বিষয়বস্তু অর্থাৎ একজন নারীর নদীকেন্দ্রিক এক অদ্ভুত জীবনসংগ্রাম এর দিকে লক্ষ রাখলে আমরা বুঝতে পারবো।

গল্পের বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করতে গল্পকার আরও একটি ছবির ব্যবহার করেছেন। আগের ছবিতে আমরা দেখেছি গল্পকার কোনো রং-এর কথা উল্লেখ করেননি, কিন্তু এক্ষেত্রে দেখবো যে তিনি অসাধারণ রং-এর ব্যবহার করেছেন। ‘আকাশ ও পদ্মার প্রসারিত বক্ষ ছেয়ে নেমে এল দিনাবসানের নির্মল অবসাদ। পরপারে ধূসর বালির বিছানায় আঁকাবাঁকা জলের রেখা অস্তসূর্যের আভা লেগে সোনা হয়ে উঠেছে।’<sup>৩</sup> এই অংশে আমরা প্রত্যক্ষ করি গোখুলিবেলার এক দৃশ্য। তবে গল্পকার অন্যান্য গোখুলিবেলার মতো এই গোখুলিবেলাকে অতটা মনোরমভাবে আঁকেননি। দূরের সাদা বোট দেখে গল্পের চরিত্র নির্মলা ও সুরপতির মনে যে জিজ্ঞাসাবোধ এবং বোটের উপরে থাকা নারীর আচরণে বিস্ময়বোধ ও রহস্যময়তা জেগে ওঠে তা পদ্মা নদীর রহস্যময়তার সঙ্গে এক হয়ে উঠেছে। ‘নির্মল অবসাদ’ কথাটি এপ্রসঙ্গে লক্ষণীয়। আবার দেখা

যাচ্ছে গল্পে এই ছবিটি অনেকটাই বিশ্রামসূচক (Interval) হয়ে উঠেছে। আসলে গল্পকার একাধিক প্রশ্নকে সামনে রেখে এই ছবির মাধ্যমে গল্পের যে বিরতি সৃষ্টি করেছেন এবং গল্পের রহস্য উন্মোচনের দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছেন। গল্পকারের এই কৌশলটি ছবিটিকে অন্য মাত্রা দান করেছে।

‘পার্বতীপুরের বিকেল’ গল্পে রয়েছে শহীদ সন্তানের শোকাতুর পিতার মর্মবেদনা। গল্পটি শুরু হয়েছে যে বর্ণনার মধ্য দিয়ে তা ক্রমশ এক ছবি। বর্ণনাটি এরকম — ‘বৃষ্টি হয়ে গেছে তাই ঘাস ভিজে ছিল। একটা মাঠের মতো জায়গায় আমরা এসে গেলাম। সুন্দর মাঠ। উজ্জ্বল সবুজ গালিচা বিছিয়ে রেখেছে কেউ, মনে হচ্ছিল। আর মাঠের মাঝামাঝি একটা জায়গায় চার-পাঁচটা বাবলা গাছ দাঁড়িয়ে আছে চোখে পড়ল।’<sup>৪</sup> এখানে গল্পকার নিসর্গ প্রকৃতির ছবিটিকে সুন্দরভাবে এঁকেছেন। কিন্তু যে গল্প জুড়ে শহীদ সন্তানের পিতার শোক জমে রয়েছে সে গল্পে গল্পকার শুধু নির্মল পরিবেশের ছবি আঁকলেন একথা ভাবতে খটকা লাগে। আমরা জানি যে, শিল্পীর হাতে প্রথমে ছবি সৃষ্টি হয়, ভাব তৈরি হয় তার পরে। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘চিত্রকথা’ গ্রন্থে এপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন — ‘...ভাবকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে দরকার তার দেহরূপ, যা দেয় ভাবকে ভঙ্গি এবং সেই ভঙ্গিকেই অনুসরণ বা আশ্রয় করে আমরা পুনরায় উত্তীর্ণ হই ভাবের জগতে।’<sup>৫</sup> জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীও এখানে প্রথমে ছবির দেহরূপ গঠন করে পরে তার ওপর ভাব আরোপ করেছেন। ‘যেমন সবুজ নীচের ঘাসের রঙ তেমন আবার মিশমিশে কালো বাবলা গাছের কাণ্ডগুলি।’<sup>৬</sup> এই অংশে ‘সবুজ’ এবং ‘কালো’ রং-এর ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আমরা জানি ‘সবুজ’ যেমন শুভ বা সৃষ্টিকে চিহ্নিত করে অন্যদিকে ‘কালো’ চিহ্নিত করে অশুভ বা ধ্বংসকে। তাই গল্পকার সবুজ ও কালো রঙের বৈপরীত্য সৃষ্টি করে এক রহস্যময় আবহকে পরিবেশন করতে চেয়েছেন। এর পরই আবার তিনি যোগ করেছেন চিত্রকল্পকে — ‘যেন মনে হচ্ছিল চার-পাঁচটা কালো রঙের মানুষ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে মাঠটাকে পাহারা দিচ্ছে।’<sup>৭</sup> বলা বাহুল্য, এই ছবি যেমন গল্পের পরিবেশকে স্পষ্ট করেছে তেমন পাঠকের জানার আকাঙ্ক্ষাকেও অনেকটা বাড়িয়ে তুলেছে।

এছাড়াও ‘শ্বাপদ’ গল্পে শহরের ছেলে খোকনের দৃষ্টিতে গল্পকার এক রোমান্টিক পরিবেশের ছবি এঁকেছেন এভাবে— ‘...এখন শরৎকাল। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছে। নারিকেল পাতার ঝালর থেকে উজ্জ্বল রৌদ্র চুইয়ে পড়ছে। নীচে দীঘির জল আয়নার মত স্বচ্ছ স্থির। আয়নার বুকে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছবি, সাদা মেঘের টুকরো টুকরো প্রতিবিম্ব। আর জলের কিনারে লম্বা সবুজ ঘাস, ঘাসের ডগায় হলদে ফড়িং।’<sup>৮</sup> এভাবেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর বিভিন্ন গল্পে নিসর্গ প্রকৃতির ছবিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর গল্পে প্রতিকৃতি (Portrait)-র খুব ভালো ব্যবহার দেখিয়েছেন। বিভিন্ন গল্পের চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি চরিত্রের চেহারাকেও খুব স্পষ্টভাবে অঙ্কন করেছেন। ‘বৃষ্টির পরে’ গল্পে আমরা দেখতে পেয়েছি সন্তানদের অন্যায় আচরণের জন্য মুখোমুখি বসে থাকা অনুশোচনাবোধে ব্যথিত দুই পিতার প্রতিচ্ছবি। এখানে এক পিতা প্রভাত অন্য পিতা হলেন কথক। গল্পকার প্রথমে প্রভাতের চিত্রটিকে নিখুঁতভাবে এঁকে তার ক্রোধ, চিন্তা, ঘৃণা সবকিছুকে একসঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার কথকের ভাবনায় যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের দৃশ্য ফুটে ওঠে তার সঙ্গে প্রভাতের বর্তমান অবস্থাকেও সংযুক্ত করতে চেয়েছেন। আলোচনার সুবিধার্থে গল্পে উল্লিখিত সেই অংশগুলি উল্লেখ করা হল—

‘প্রভাতের বজ্রমুষ্টি আমার দিকে এগিয়ে এল। কুশিঙেত কপাল। ভুরুর রেখায় স্পন্দন।’<sup>৯, ১০</sup>



‘বজ্রমুষ্টি আমার নাক কপাল লক্ষ করে ছুঁতে এল না। বরং আস্তে আস্তে তার শক্ত মুঠিটা খুলে গেল, আঙুলগুলি ছড়িয়ে পড়ল; জলে ভেজা পেট-মোটা আঙুরের রঙের নরম ফোলা ফোলা আঙুলগুলি ছড়িয়ে পড়ল।’<sup>৯.২।</sup>

‘পাতলা ধোঁয়ার বলয় তার প্রকাণ্ড মুখমন্ডল ঘিরে ফেলেছে। চোখ বোজা।’<sup>৯.৩</sup>

‘...সেই মুহূর্তে লক্ষ করলাম তার মুখের দাড়ি-গোঁফ অবিশ্বাস্যরকম বেড়ে উঠেছে। বোজা চোখের কোলে গাঢ় কালির পোছ।’<sup>৯.৪</sup>

‘... চোঁট জোড়া কাঁপছিল। চাউনিটাও কটমটে।’<sup>৯.৫</sup>

‘বিশী একটা ভাঁজ দেখা গেল প্রভাতের চর্বি থলো-থলো খুতনিতে।’<sup>৯.৬</sup>

এভাবে খুঁটিনাটি বর্ণনার মধ্য দিয়ে গল্পকার প্রভাতের ভাব (Expression)-কে তুলে ধরতে চেয়েছেন। বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করতে গল্পকার সাহায্য নিয়েছেন ভাঙা আয়নার— ‘ফাটল ধরা আরশির বুকে তাঁর বাঁকাচোরা মুখটিকে শয়তানের মুখের মতন দেখায়। অথচ এমনি সে সুপুরুষ।’<sup>৯.৭</sup> এই অংশটি লক্ষণীয়। গল্পকার এগুলি একসঙ্গে বর্ণনা করেননি, কিছুটা বিচ্ছিন্নভাবে বর্ণনাগুলিকে রেখেছেন। কারণ তিনি গল্পের বিষয় অনুযায়ী প্রভাতের এই ভাবকে পুরো গল্প জুড়ে ছড়িয়ে রাখাটিকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। তাই সব বর্ণনাকে একজায়গায় করে দেখা যাচ্ছে সার্বিকভাবে প্রভাতের ক্রোধ ও ঘৃণাসূচক ছবিটিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গল্পকার নিজেও লিখেছেন — ‘উত্তেজনা কৌতূহল ঘৃণা লোভ আশঙ্কা আকাঙ্ক্ষার ছবি যদি কেউ একসঙ্গে দেখতে চায় তো প্রভাতকে দেখুক।’<sup>৯.৮</sup> অন্যদিকে কথকের ভাবটিও লক্ষণীয়। গল্প পড়লে বোঝা যায় সে রাগান্বিত নয়। কিন্তু কেউ যতই শান্ত অবস্থায় থাকুক না কেন তার দুর্বল জায়গায় আঘাত করলে সে চুপ থাকতে পারে না, সে আঘাত মানসিক হোক বা শারীরিক। এক্ষেত্রেও আমরা দেখি প্রভাত যখন কথকের পূর্বের মদ্যপানের প্রসঙ্গ অনুসরণ করে বলে— ‘কেবল চা খেলে তো আর নেশা হয় না ব্রাদার।’<sup>৯.৯</sup> তখন কথকের রাগান্বিত ভাবটি ফুটে উঠেছে এভাবে— ‘এই প্রথম আমার পাকা ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল, হাতের মুঠি শক্ত হল, চোখের রং লাল হল।’<sup>৯.১০</sup>

‘স্বাপদ’ গল্পে গল্পকার দেখিয়েছেন প্রথমদিকে গণেশ একজন গ্রামের সরল ছেলে হলেও, গল্পের পরিণতিতে দেখা যায় কামাসক্ত হয়ে কীভাবে তার স্বভাব বন্য ও অসামাজিক হয়ে উঠেছে। তবে গল্পকার স্বভাবে তাকে সরল দেখালেও তার যে চেহারার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা থেকেই এই ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গল্পকার তার চেহারার বর্ণনা করেছেন শহুরে খোকনের জবানিতে; এভাবে— ‘...শুকনো পেঁয়াজের শিকড়ের মত চার পাঁচটা অসমান দাড়ি খুতনি ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে, মাথার চুলগুলি খাড়া খাড়া, নখগুলি বড়বড়; রং চটা ছোট একটা হাফ প্যান্ট পরনে-যা তার বয়স ও দেহের কাঠামোর পক্ষে অত্যন্ত বেমানান ঠেকছিল; মুগুরের মাথার মতন জবরদস্ত হাঁটু দুটোর দিকে তাকিয়ে কথাটা আমার মনে হয়েছিল।’<sup>৯.১১</sup>

‘জ্বালা’ গল্পটিতেও দেখা যায় একজন সানওয়ালার ভয়ংকর চেহারার ছবি। গল্পের প্রথমদিকে নীরার কাছে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপ ও গরম অসহ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই সানওয়ালার বিশী চেহারা নীরার চোখে যে রূপ নেয়, অথবা নীরার দেহে যে জ্বালা ধরায় তা গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমের জ্বালাকেও উত্তীর্ণ করে। গল্পকার প্রথমে সানওয়ালার কর্মরত অবস্থার ছবি এঁকেছেন নিখুঁতভাবে। ‘যন্ত্রের পাথরের চাকায় ফিতে পরিয়ে লোকটা একটা বাক্স থেকে লাল লাল ইঁটের টুকরো বার করে। টুকরোগুলো চাকার সঙ্গে ঠেকিয়ে দুটো কাঠের মাছখানে ভাল করে বসিয়ে দিয়ে যন্ত্রের পা-দানিতে পা রাখে। একবার পা-দানি চেপে ধরে তখন

পা-টা তুলে নেয়, আবার চেপে ধরে। কাঠের ফ্রেমের ভিতর বড় চাকা ঘোরে।<sup>১৫</sup> তারপর আলোকপাত করতে চেয়েছেন সানওয়ালার চেহারাটিকে — ‘কপালে এত বড় একটা কাটা দাগ চুল থেকে চোখ পর্যন্ত নেমে এসেছে। কদম ফুলের মতো ছোট করে ছাঁটা মাথার চুল। কাঁধ দুটো এককালে কেমন উঁচু শক্ত ছিল বোঝা যায়। এখন বসে গেছে। বাঁ কাঁধে আর একটা কাটা দাগ। লোকটা খুনে না ডাকাত! মনে হয় যেন এইমাত্র কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে এল। ভেবে সত্যি নীরা চোখ ছোট করে যন্ত্রের ওপর ধরে রাখা কালো কুকড়ে যাওয়া শিরাবহুল হাত দুটো পরীক্ষা করে হাতকড়ার দাগ আছে কিনা লক্ষ করে।<sup>১৬</sup> তারসঙ্গে— ‘দস্তহীন নোংরা মাড়ি দুটো মেলে ধরে লোকটা নীরার চোখে চোখ রেখে হাসে।<sup>১৭</sup> এখানে তার কুৎসিত দৃষ্টিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন গল্পকার।

‘গিরগিটি’ গল্পের ভাব প্রকাশ করতে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী একাধিক চিত্রের আশ্রয় নিয়েছেন। নরনারীর অতৃপ্ত যৌন আকাঙ্ক্ষা থেকে তৃপ্তির সন্ধানকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে উল্লেখিত গল্পটি। নিসর্গ প্রকৃতির ছবি, প্রতিকৃতির ছবি, আলো-ছায়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ছবির সহাবস্থান ঘটেছে এই গল্পটিতে। তবে আমরা সব ছবির আলোচনা এখানে করব না। এখানে মায়ার প্রতিকৃতির ছবিটি গল্পকার কতটা নিপুণভাবে এঁকেছেন আমরা তা দেখে নেব— ‘গায়ের জামার বোতাম নেই, আঁচলটা টিলে হয়ে মাটিতে লুটোয়, খোঁপায় বাঁধন খুলে দেওয়াতে ঘাড়ে পিঠে কোমর অবধি একরাশ কালো চুল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মাঝারি গড়ন। রং খুব ফর্সা না। কিন্তু মুখখানা সুন্দর। অন্তত মায়ার নিজের কাছে নিজের ছোট্ট পাতলা কপাল আর দু’ধারে একটু বেঁকে যাওয়া না-সরু-না-মোটা ভুরু ও ঢালুর দিকে ঈষৎ ছড়িয়ে পড়া নাক ও কালো পালক ঘেরা চোখের লালচে মতন বা বলা যায় বাদামী রঙের চকচকে মণি দুটো অসম্ভব ভাল লাগে। হ্যাঁ, আর ওর কচি পেয়ারার মতন ছোট্ট সুগোল মসৃণ একখানা থুতনি।<sup>১৮</sup> এভাবেই গল্পকার মায়ার প্রতিকৃতিকে পাঠকের সামনে প্রস্ফুটিত করেছেন। এছাড়াও একটি ডালিম গাছের যৌবন বর্ণনায়, মায়ার যৌবন মিলিয়ে দিতে তিনি এক অসাধারণ চিত্রকল্পের আশ্রয় নিয়েছেন।

পাশ্চাত্যে, সাহিত্যের ভাবধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রতীকবাদ ও শূন্যবাদ-এর জন্ম হয়, বিমূর্তভাব (Abstract concept) মূলত তা থেকেই এসেছে। বিমূর্তভাব আসলে ভাবমূর্তি। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে গিয়ে কল্পনার মাধ্যমে শিল্পীরা সেই ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেন। বলা চলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীও সেই ধরনের একজন শিল্পী। ‘সমুদ্র’ গল্পটিতে আমার এই বিমূর্তভাবনার পরিচয় পেতে পারি।

গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর ‘সমুদ্র’ গল্পে তিন ধরনের ছবিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। সাধারণের দৃষ্টিতে সমুদ্র তার যে রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে তা এরকম:

হাঁটু জলে, কোমর জলে, কেউ গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে, আর সাহস পাচ্ছে না এগোতে- ডেউয়ের ধাক্কায় কাত হয়ে যাচ্ছে, নুয়ে পড়ছে; কেউ কেউ তলিয়ে গিয়ে আবার ভেসে উঠে যেন খাবি খেতে খেতে কোনোরকমে স্নান সেরে ছুটতে ছুটতে তীরে উঠে এল। সাদা টুপি পরা কালো কুচকুচে শরীর নুলিয়ার শক্ত মুঠোর ভিতর আটকা পড়ে সুন্দর মেয়েটা হাঁসফাঁস করছে; বেগোচ্ছল বিশাল ডেউ হা-হা করে ছুটে আসছে। মেয়ে ভয়ে চোখ বুজল আর সেই মুহূর্তে নুলিয়া ওর বেণীসুদ্ধ ছোট মাথাটা জলের নীচে ঠেসে ধরল। আতর্নাদ করে উঠল কি ও, না ডেউ সরে গেছে- নুলিয়ার কঠিন বাহুর ওপর ফর্সা নরম শরীরের ভর রেখে ভিজা সপসপে শায়া ব্লাউজ নিয়ে রূপসী মাতালের মতো টলতে টলতে হাসতে হাসতে তীরে উঠে আসছে। কে ওকে মাতাল করল- নুলিয়ার হাতের

ঝাঁকুনি? চেউয়ের একটা মাত্র দোলা? বালির বিছানায় বসে পুরুষ হাসছে। হয়তো স্বামী, হয়তো সঙ্গী। এস্ত হাতে শুকনো শাড়ি ব্লাউজ বাড়িয়ে দিচ্ছে।<sup>১৯</sup>

সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে স্নানার্থীদের এই দৃশ্য অত্যন্ত সাধারণ মনে হয়। কিন্তু কথক সমুদ্রকে দেখেছে অন্যরকমভাবে।

আমরা জানি যে, যারা ভাবুক তারা একান্তে পৃথিবীর সমস্তকিছুকে একটু অন্যরকমভাবে দেখতে চায়। কথকও কিছুটা সেই ধরনের সেকথা বলা চলে। কথক যেভাবে সমুদ্রকে দেখেছে তা মূলত রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি। গল্পকার কথকের দৃষ্টিতে সমুদ্রের যে রূপ তুলে ধরেছেন তা এরকম — ‘দেড়ঘন্টা আগে সূর্যোদয় হয়েছে। কিন্তু রোদ ছিল না। জগদ্বল পাথর হয়ে মেঘটা পুবাকাশ অন্ধকার করে মুখ খুবড়ে পড়ে ছিল। আমার হৃদপিণ্ড এবার চঞ্চল হয়ে উঠল। এতক্ষণ সীসার রঙের জল ছাড়া চোখের সামনে আর কিছু ছিল না। এখন দিগন্ত ঘেঁষে সমুদ্র গাঢ় নীল রঙ ধরেছে, মাঝের জলে সবুজের ছাপ, বর্ষার পরে নতুন ঘাস গজানো পলিমাটির যে-রং ধরে; আর একটু কাছের জল গৈরিক। উত্তাল অশান্ত ক্ষিপ্ত প্রখর। রূপার মুকুট পরে নাচতে নাচতে ছুটে আসছে। একটা বড় চেউ বালির ওপর এতটা দুধ ছড়িয়ে দিয়ে নীচে নেমে গেল।’<sup>২০</sup> আবার কথকের দৃষ্টিতে চেউগুলি ‘জুঁই ফুলের মতো সাদা’ সেটাও প্রসঙ্গত লক্ষণীয়।

এই যে ছবি আমরা দেখলাম তা কথকের ভাবমূর্তি। তবে সমুদ্রের এই সৌন্দর্য শুধু যে সুন্দর তাও মনে হয় না, কিছুটা রহস্যময়তার আভাসও রয়েছে এই ভাবমূর্তির মধ্যে। কিন্তু কী সেই রহস্য? তা যেমন কথকের মনের জিজ্ঞাসা তারসঙ্গে গল্পপাঠকেরও। সেই রহস্য উন্মোচিত হয়েছে গল্পে মামা চরিত্রটির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। যিনি সমুদ্রকে সবথেকে কাছ থেকে দেখেছেন। স্নানার্থীদের স্নান করার দৃশ্য বা সমুদ্র চেউয়ের সৌন্দর্য্য মামার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কেননা সমুদ্রের রং, রূপ, শব্দ, চেউ তার মনে যে ভাবমূর্তি সৃষ্টি করতে চায় তা সেই সব কিছুই উর্ধ্ব। সমুদ্রকে সে কেবল সমুদ্ররূপে উপলব্ধি করেনি, উপলব্ধি করেছে এক হিংস্র জন্তু রূপে। যা ডাব, ফুল, বেলপাতা ইত্যাদি পছন্দ করে না, জন্তুদের মতো আমিষ পছন্দ করে। তাই সে কথককে বলে — ‘পাথরের দেবতা না, মাটির ঠাকুর না- সমুদ্র হল সাংঘাতিক জীবন্ত একজন কেউ।... আমি যখনই বালুর চড়ে বেড়াতে আসি পকেটে করে কিছু মাছভাজা, কেক পাউরুটি বা আর-কিছু খাবার নিয়ে আসি।’<sup>২১</sup> তারপর বিষয়টিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে সে বলে— ‘...আমার আপনার মতো তারও ক্ষুধা আছে, লোভ আছে, ইচ্ছা রুচি সব-কিছু। ওই দেখুন কেমন রাফসের মতো হাঁ নিয়ে ছুটে ছুটে আসছে।’<sup>২২</sup> আবার যে চেউগুলি কথকের দৃষ্টিতে জুঁই ফুলের মতো সাদা মনে হয়েছে, সেই চেউগুলিকে দেখে মামা কথককে বলেছে— ‘আপনি তখন বলেছিলেন জুঁইফুল-সাদা জুঁইয়ের মালা মাথায় জড়িয়ে ওরা আপনাকে আমাকে ভালোবাসতে আসে। তা তো বটেই-একটু ভাল করে নজর দিয়ে দেখুন, ফুল কি সাদা শক্ত ধারালো দাঁত ওগুলো।’<sup>২৩</sup> এভাবেই গল্পকার সমুদ্রকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং নিজের চিত্রভাবনাকে প্রস্ফুটিত করেছেন।

এখন আলোচনা করা যাক ‘আলো-ছায়া’ (Light and Shade) সম্পর্কে। আলো-ছায়া ছবির জগতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যাঁরা ছবি আঁকেন বা ছবি বিষয়ে চর্চা করেন তাঁরা বোঝেন ছবি সৃষ্টি করতে হলে আলোছায়ার গুরুত্ব কতখানি। স্কেচ করার মধ্য দিয়ে তো একটি অবয়ব গড়ে তোলা হয়, কিন্তু তা বাস্তবানুগ(Realistic) হয়ে ওঠে কি? যদি একটি মানুষের অবয়বকে ফুটিয়ে তুলতে হয় তাহলে তার শরীরের বিভিন্ন গঠনকে প্রকাশ করতে ফোলা, ভাঁজ, গোল, চ্যাপটা এই বিভিন্ন জায়গাগুলি ছব্ব ফুটিয়ে

তুলতে ব্যবহার করা হয় আলো ও ছায়া। প্রকৃতি জগতের কোনো কিছুকে চিত্ররূপ প্রদান করার জন্য; যেমন- ঘরবাড়ি, গাছপালা, নদীনালা সবক্ষেত্রেই আলো ছায়া প্রয়োজন হয়। যিনি আলো-ছায়ার যত ভালো ব্যবহার করেন তাঁর ছবি তত বেশি উৎকৃষ্ট হয়ে ওঠে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী একসময় ছবি এঁকেছেন এবং পরে তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ছবি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। কাজেই তিনি বোঝেন আলো-ছায়া ছবিকে কোন মাত্রায় পৌঁছে দিতে পারে। গল্পকার ‘মঙ্গলগ্রহ’ গল্পটিতে আলো-ছায়ার নিপুণ ব্যবহার করেছেন। গল্পের কথক কুলদারঞ্জন পাইন পেশায় একজন সাধারণ কেরানি। অভাবের সংসারে স্ত্রী হেমলতা ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে খুব একটা সম্ভুষ্ট ছিল না। সে যে বাড়িতে বসবাস করে, তারই অন্য এক ঘরে নতুন ভাড়াটের আগমনে সে যেন নতুনত্ব অনুভব করে। তাদেরকে দেখার জন্য কুলদা বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে পড়ে ও জানালার দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য— ‘জামা-কাপড় পরে ধনেচাল চিবোতে চিবোতে যখন বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, দেখি প্যাসেজের ওপাশের দরজা খুলেছে। এতক্ষণে ঘুম ভাঙলো। এবং ঘুম যে ভেঙেছে চোখেই দেখতে পেলাম। শুকনো খোঁপার আধখানা মুখ খুবড়ে ঘাড়ের ওপর পড়েছে। ভাঙাচোরা আঁচলের ঢেউ। শরতের কাঁচা রোদ গালে কানে পিঠে লেগেছে। মেয়েটি-মেয়ে কি মহিলা তখনো ধরা গেল না-...’<sup>১৪</sup> বোঝা যায়, কথকের সঙ্গে লীলাময়ীর দূরত্ব খুব কাছাকাছি নয়, আবার খুব বেশি দূরও নয়। লক্ষ করতে হবে লেখক এখানে আলো হিসেবে ব্যবহার করেছেন ‘শরতের কাঁচা রোদ’ অর্থাৎ যা উজ্জ্বল ও ফটফটে। সেই আলো পড়েছে লীলাময়ীর ‘গালে কানে পিঠে’। আমরা সাধারণত কারোর চেহারা দেখে তার বয়স অনুমান করতে পারি। যদি প্রশ্ন ওঠে কীভাবে? তাহলে স্মরণ করা দরকার একজন অল্পবয়সির চেহারায় যে ধরনের ভাঁজ পরিলক্ষিত হয় এবং একজন বয়স্কর চেহারা তার তুলনায় ভাঁজবহুল হয়। সেগুলি অতি সূক্ষ্ম হলেও চেহারার পেশি বলে দেয় তার সম্ভাব্য বয়স। উপরে উল্লেখিত গল্পাংশে কথক বলেছে — ‘মেয়েটি মেয়ে কি মহিলা তখনো ধরা গেল না।’ কারণ, কথক যেখান থেকে লীলাময়ীকে দেখছে এক ঝলকে চেহারার সূক্ষ্ম ভাঁজ সেখান থেকে অস্পষ্ট হওয়াটা স্বাভাবিক। আরও স্বাভাবিক শরতের কাঁচা রোদের কারণে। কেননা, মুখে বা পিঠে সোজাসুজি উজ্জ্বল আলো পড়লে সূক্ষ্ম ভাঁজগুলি আলোর উজ্জ্বলতার জন্য প্রকাশ পায় নি। তাই প্রথম দেখায় লীলাময়ীর বয়স অনুধাবন করতে সংশয়ে পড়তে হয়েছে কথককে। আবার যখন বিকেলে মাংস কিনে এনে দেওয়ার অনুরোধ করতে লীলাময়ী কথকের বাড়িতে উপস্থিত হয় তখন কথকের সে অসুবিধা হয় না। কাছ থেকে সেইটি স্পষ্ট হয়ে যায় এবং তিনি বুঝতে পারেন ‘মেয়েটি মেয়ে নয় মহিলা।’<sup>১৫</sup>

লীলাময়ীর যখন রান্না করার সময়, তখনও কথক তাকে দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু লীলাময়ী দেওয়ালের আড়ালে থাকায় তাকে কল্পনায় দেখতে হয় কথককে। এখানে ছায়ার ব্যবহার লক্ষণীয়। আমরা দেখি সাধারণত কেউ উনুনের সামনে বসে রান্না করলে উনুনের আলো লেগে শরীরের ছায়াটি পিছনের দিকে গোল মতো দেখায়। গল্পের এই অংশেও তা পরিলক্ষিত হয়—‘কেবল ওদিকের দেয়ালে একবার গোল-মতো একটা ছায়া দেখলাম। বুঝলাম দেয়ালে ঢাকা ওই অংশটায় বসে লীলাময়ী রাঁধছে। আর উল্টোদিকে ছায়া পড়েছে। একবার কাঁপছে আবার স্থির হয়ে আছে।’<sup>১৬</sup> এই অংশে তা আমরা লক্ষ করেছি। গল্পকার কথকের দৃষ্টিতে এই যে চিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন তা তাঁর এক অনবদ্য কৌশল। ছায়ার ব্যবহার করে দেওয়ালের আড়ালে লীলাময়ীর উপস্থিতিকে তিনি অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সাহিত্যে ছবির ব্যবহার অনিবার্য। প্রত্যেক সাহিত্যিকই তাঁদের সাহিত্যে ছবি ব্যবহার করে থাকেন। তাঁদের মধ্যেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছবিকে অন্য মাত্রা দিতে সক্ষম হয়েছেন, যা আমরা দীর্ঘ আলোচনার মধ্য দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছি। আলোচ্য গল্পগুলি থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে ছবি মানে শুধু সুন্দর প্রকৃতি বা সুন্দর কোনো জিনিসের বর্ণনা নয়, ছবি হল বাস্তবে যা কিছু অর্থবহ তাকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা। ‘নদী ও নারী’, ‘স্বাপদ’, ‘পার্বতীপুরের বিকেল’ ইত্যাদি গল্পে আমরা সুন্দর প্রকৃতির বর্ণনা পেয়েছি তবে এও দেখেছি সেগুলি কিভাবে আলাদা আলাদা অর্থবহন করছে। ‘জ্বালা’ গল্পে সানওয়ালার কুৎসিত চেহারার সুন্দর বর্ণনা আমরা পেয়েছি। ‘গিরগিটি’ গল্পে গল্পকার ভুবনের যে ছবি এঁকেছেন তাও লক্ষণীয়। এভাবেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী লেখার দ্বারা তাঁর শিল্পীসত্তাকে বাস্তবায়িত করেছেন।

### উল্লেখপঞ্জি:

১. নন্দী, জ্যোতিরিন্দ্র, ‘গল্পসমগ্র-১’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩।
২. তদেব, পৃ. ৩।
৩. তদেব, পৃ. ৫, ৬।
৪. তদেব, পৃ. ৬১২।
৫. মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী, ‘চিত্রকথা’, কাঞ্চন চক্রবর্তী সম্পাদিত, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ৩০৩।
৬. নন্দী, জ্যোতিরিন্দ্র, ‘গল্পসমগ্র-১’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৬১২।
৭. তদেব, পৃ. ৬১২।
৮. বসু নিতাই (সম্পাদিত), ‘জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ.-১৪৮।
৯. তদেব, পৃ. ৬১-৬৪। (৯.১- পৃ.৬১, ৯.২-পৃ.৬১, ৯.৩-পৃ. ৬১, ৯.৪-পৃ. ৬১, ৯.৫-পৃ. ৬২, ৯.৬-পৃ. ৬৪)।
১০. তদেব, পৃ. ৬৪।
১১. তদেব, পৃ. ৬৬।
১২. তদেব, পৃ. ৬৪।
১৩. তদেব।
১৪. তদেব, পৃ. ১৩৪।
১৫. তদেব, পৃ. ২৫১।
১৬. তদেব, পৃ. ২৫১।
১৭. তদেব, পৃ. ২৫১।
১৮. তদেব, পৃ. ১০৮।
১৯. তদেব, পৃ. ৪৪।
২০. তদেব।
২১. তদেব, পৃ. ৫৪।
২২. তদেব।
২৩. তদেব, পৃ. ৫৫।
২৪. তদেব, পৃ. ১৭৩।
২৫. তদেব, পৃ. ১৭৭।
২৬. তদেব।



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 624-632

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.051



**সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্প: আটপৌরে লৌকিক জীবনের ইতিবৃত্ত**  
বাবলী বর্মণ, গবেষক, বাংলা বিভাগ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 11.01.2025; Accepted: 19.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## Abstract

*Subrata Mukhopadhyay (1950–2020), a distinguished writer, emerged as a prominent literary figure of the 1970s. His works adeptly depict the political landscape of Bengal in the seventies, eighties, and nineties of the 20th century, addressing issues such as land and agriculture, the deprivation of common people, the struggles of marginalized lower classes, and the vibrant yet challenging lives of rural folk. He skillfully portrays the essence of life in his works, capturing the complexities of everyday existence with remarkable depth. Additionally, he highlights the spiritual resilience of the unwavering Brahmin community.*

*Mukhopadhyay's literature gives artistic expression to the eternal beauty of human civilization, emphasizing human integrity above all else in an effort to uncover the profound beauty of the human heart. Through his narratives, he vividly illustrates the hardships of the rural lower class, portraying their crises, daily struggles, and social challenges. His stories explore themes of boundless heroism and resilience among those without physical or financial support, including the disabled, blind, crippled, lepers, and beggars. Moreover, his short stories intricately weave the perpetual relationship between humans and nature.*

*This article aims to examine the artistic beauty embedded in the inner lives of the poor and needy in rural areas, as well as the seamless blend of worldly experiences in Mukhopadhyay's storytelling. By analyzing selected short stories such as Badyakar, Vishahar, Kakcharitra, Shaman, and Kuthobabara Chailen, this study seeks to explore the depth and engagement of his literary illustrations.*

**Keywords:** Subrata Mukhopadhyay, Short story, Rural Folksy, Bengali literature, Marginalized lower classes.

বিশ শতকের সাতের দশকের কথাশিল্পী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ৬ই জুন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষজনের টিকে থাকার যে আশ্রয় সংগ্রাম তার চিত্র সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে ফুটে উঠেছে। তাঁর জন্মস্থান যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের একটি

ঐতিহাসিক স্থানে উত্তর চব্বিশ পরগণার হালিশহরের কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচরাপাড়ায় সেখানে সাধক ও কবি রামপ্রসাদ সেনের (১৭২০-১৭৮১) জন্ম ও তিরোধান, রানী রাসমণি দেবীর জন্মস্থান, চৈতন্য পার্শ্বদ শিবানন্দ সেনের জন্মভূমি এই মাটিতে কথাসাহিত্যিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ও শৈশবে লালিত হওয়া, তাই নিজের জন্মস্থানের অতীত গৌরবময় সময়কালের লুপ্ত ইতিহাস ও সঙ্গে একজন শিল্পীর আর একজন শিল্পীকে অনুসন্ধান ও বুঝতে চাওয়ার যে চেষ্টা তা তাঁর রচনাবলীতে লক্ষণীয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বসে অষ্টাদশ শতকের একজন বিরল প্রতিভাধর কবি সাধক রামপ্রসাদকে নিয়ে তিনি ‘যে দেশেতে রজনী নাই’ ছোটগল্প এবং ‘আয় মন বেড়াতে যাবি (১৯১০) উপন্যাস লিখেছেন। রচনা করেছেন একাধিক উপন্যাস- পৌর্ণমাসী’ (১৯৮৪), ‘রসিক’ (১৯৯১), ‘আয় মন বেড়াতে যাবি’ (২০১০), ‘বীরাসন’ (২০০৯), ‘চন্দনপিঁড়ি’ (২০১৫) ইত্যাদি। তিনি বিশ শতকের সাতের দশক থেকে একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর প্রতিনিয়ত সাহিত্য রচনা অনুশীলন করে গিয়েছেন। ১৬ই মার্চ, ২০২০ সালে কলকাতার সোনারপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। এই সময়কালে তিনি কুড়িটির অধিক উপন্যাস এবং প্রায় দুইশত ছোটগল্প রচনা করেছেন। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিই প্রান্তিক নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের বেঁচে থাকার লড়াই থেকে শুরু করে সমাজের হীন মানসিকতা, নারী নির্যাতন, রাজনৈতিক শোষণ, ধর্ষণ, তন্ত্র সাধনার সঙ্গে বিজ্ঞানমনস্ক মানসিকতার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিষয়ের বিচিত্রতা ও শৈল্পিক রূপের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ। প্রতিটি লেখার মধ্য দিয়ে তিনি প্রতিবারই জীবনকে এক এক ভাবে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন ও উপলব্ধি করেছেন। এই গভীর জীবনবোধ থেকে উৎসারিত এক দৃষ্টি দিয়ে অবহেলিত সমাজ এবং নির্মোহ ভঙ্গিতে মানুষের জীবনযাত্রার হুবহু রূপকে তিনি তাঁর লেখনীতে স্থান দিয়েছেন। তাই তাঁর ছোটগল্পগুলি এতটা অভিনব ভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রতিটি ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে তিনি শৈল্পিক রূপের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এক ভিন্ন মাত্রার সাহিত্য সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর এই বিশিষ্ট জীবন ভাবনা ও শিল্পকৌশলে সমৃদ্ধ গল্পগ্রন্থগুলি হল - যে দেশেতে রজনী নাই (১৯৯০), আব্দুল-রহিমা (১৯৯০), সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প (২০০৪), সেরা ৫০টি গল্প (২০১২), দশটি গল্প (২০০৮), চরমপত্র (১৯৮৮), পাতার বাঁশি (২০০১) ইত্যাদি।

‘বাদ্যকর’ গল্পটির নায়ক ইলামবাজারের বাদ্যকর শ্রীপতি মাষ্টার। বাদ্যকর শ্রীপতি মাষ্টারের আহ্বান আসে সুদূর পলাশীর রসা স্টেশনের নিকটবর্তী রক্ষ, গুরু ডোম পাড়ার লাগোয়া গ্রাম পৈঁচালিয়ার বাদ্যকরদের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ঢোলক, সানাই, কাঁসি, হারমোনিয়াম, বাঁশি শেখানোর জন্য। পৈঁচালিয়ার বাদ্যকরদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে শ্রীপতি বাজনা শেখাতে গিয়ে তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার জীবনের গুরুত্ব যে কতটা মূল্যবান তা এই আপনজন স্বরূপ মানুষগুলির কাছে আন্তরিকতায় অনুভব করে। লেখক শ্রীপতির নিজ কর্মের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা এবং নিপুণ কর্মপ্রিয় এই মানুষটির শিল্পের প্রতি রক্তবাহিত এক নাড়ির টানের প্রকৃতি প্রদত্ত স্বভাবকে মিলিয়ে দিয়েছেন প্রকৃতির সহজতার সঙ্গে -

“মাঝখানে দুটি বৎসর। খরায়-বানে দেশ কাতর ছিল বলে ডাক পড়েনি। এবার রুখোশুখো হলেও রসাতলে নামেনি। তাই ইলামবাজারের শ্রীপতি বাদ্যকরের ডাক পড়েছে আবার। ডাক গিয়েছে এখানা পোস্টকার্টে- এসো হে মাস্টার, আমরা বাজনা পেড়েছি।- বিস্তর বাক্য না থাকলেও এ তলবের তলে তলে টান ছিল। অনেকটা সেই প্রবল গ্রীষ্মে শাল-নদীর তলাকার লুকোছাপা জলের মতন। বালি আঁচড়ালেই সরল কাচ জল। শীতলে জীবন জুড়ায়।”<sup>১</sup>

বাদ্যকরদের সভা মহলে শ্রীপতি মাষ্টার কত বড় একজন মহাত্মা, যিনি পঁচালিয়ার বাদ্যকরদের জীবনের রুজি রোজগারের অল্পদতা একজন মানুষ, যার আগমনে নিরন্ন মানুষগুলির অল্পের যোগান হবে আর তারসঙ্গে আনন্দমেলায় সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হওয়া যেন আর এক উপরি পাওনা। এই নিরন্ন মানুষগুলির সঙ্গে শ্রীপতির যোগসূত্র রয়েছে বাঁশির সুরেই সে যদি মাঠের প্রান্তে ক্ল্যারিওনেট বাঁশিতে যাত্রা পথের হৃদিস জানতে চায় তাহলে ওপার থেকে করনেট বাঁশিতে আওয়াজ ফিরবে “এসো হে প্রাণ সখা তুমার চরণ দেইখতে সাধ মনে।”<sup>২</sup> এভাবে কুশল বিনিময়ের জন্য একে অপরের হৃদয় যে এক সুতোয় বাঁধা, এক অদৃশ্য বন্ধন শ্রীপতি উপলব্ধি করে। শ্রীপতির সুর শিক্ষা দানের মাধ্যমেই ঘটবে অনেকেরই প্রাণ-

“মাস্টার তাদের সুর দেবে, তারা সেই সুর সিখে উঠবে গিয়ে আর পাঁচজনের আঙিনায়, আনন্দমেলায়। মাঝখানে পেটপূরণের জন্য মিলবে কিঞ্চিৎ রজতমুদ্রা। কিঞ্চিৎ না কোনো বঞ্চিত।”<sup>৩</sup>

পঁচালিয়া যেতেই মেঠো পথেই ভুলো লাগার এক মাঠে শ্রীপতির সাক্ষাৎ ঘটে মনসার সঙ্গে। যে কিনা ঘরছাড়া এক ভুলো মেয়ে যার মাথার কোন ঠিক নেই। এই মনসাই শ্রীপতি মাষ্টারকে পঁচালিয়া নিয়ে যায় রাতের অন্ধকারে মাঠের পথ দেখিয়ে। দশজনের দৃষ্টিতে মনসা পাগলি যার মাথার ঠিক নেই, সে কিন্তু প্রকৃতির রূপ দেখার জন্য চাতক পাখির মত মুখিয়ে থাকে ঘরে যার মন বসে না। মনসার উজ্জিতে - “আমি আমার মতন থাকি, দুনিয়াটো দেখি। কিন্তু দিনটো ঝপ্ করি শ্যাঁষ হইন যায়। রাতটো যেন জঁরুই থাকে জলের পারা। হঁ গো, আমি কুছুই জানি না। ঠার করে থাকি রেতের বেলা। কে জানে বাপু কার মনে কি আছে।”<sup>৪</sup> এরপর পঁচালিয়ায় মনসার সঙ্গে কুশল বিনিময় এবং ভাবের আদানপ্রদানের মাধ্যমে শ্রীপতি নিজেদের মধ্যে এক অজানা টান যেন অনুভব করে। যদিও পরের দিন নিজের কর্ম পটুতা শিখিয়ে দিয়ে শ্রীপতি পঁচালিয়া ত্যাগ করে। গল্পের শেষে দেখি দুই বছর পরে শ্রীপতি আবার পঁচালিয়া যাত্রা করে বাজনা শেখাতে কিন্তু সেবারে আর কোন ভুলোর সাথে সাক্ষাৎ হয়না এমনকি গন্তব্যে পৌঁছেও আর মনসাকে দেখতে পায় না। এবারে মনসা অন্যরূপে শ্রীপতি মাষ্টারের সামনে আসে সুস্থ এক গৃহবধূর বেশে ঘোমটা টেনে পরিপাটি চায়ের প্লেট হাতে। যাকে দেখে শ্রীপতি চমকে ওঠে এই ভেবে যে ভুলো পথের মনসাকে কি এই পরিবেশে মানায়? দুপুরে এক আকাশ রোদ মাথায় করে শ্রীপতি এবারে ফিরছিল কিন্তু এবারে হাজার মাথা খুঁড়লেও যে সেই ভুলকো তারাটিকে আর দেখা যাবে না। তাই শ্রীপতি বাদ্যকরের জীবন থেকে তার নিজের মত আরও একজন যে উদাসী খেয়ালিপনা মানুষ আছে তা এরপর মুছে যাবে। গল্পটিতে লেখক এক অক্ষরজ্ঞানহীন বাদ্যকরের জীবনের অন্তরের শিল্পসৌন্দর্যকে প্রস্ফুটিত করেছেন। যার নিম্নবৃত্ত সংসারে রুজি রোজগার করে সংসার চালনা করার মত পরিবেশ থাকলেও তার নিজের ভালোলাগার সূত্রে শিল্পের প্রতি এক অদৃশ্য হৃদয়ের টানে সে ভাইকে বাড়িতে দোকান পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে সুদূর পঁচালিয়া যাত্রা করে অনেক খানা খন্দ মার্ট ঘাট পেরিয়ে। নিজের অন্তরের রক্তবাহিত এক টান রয়েছে শ্রীপতি বাদ্যকরের শিল্পের প্রতি। যার ফলে সে নিজেও মনসার মত একজন আউল বাউল নারীর মধ্যেও নিজের ভাবের আদান প্রদান করতে পারে। হৃদয়ের টান অনুভব করে মেয়েটির প্রতি এবং তার সঙ্গে রাত্রিকালেও কুশল বিনিময় করে পথ চিনে পঁচালিয়া গ্রামে পৌঁছেতে পারে। এরকম এক আপনভোলা উদাসী নিপুণ কর্মপটু শ্রীপতি বাদ্যকর দু’বছর পরে পঁচালিয়া এসে হৃদয়ের গোপনে লুক্কায়িত বাসনা যে ভুলো পথের মনসাকে দেখতে পাবে নিজ ভাবের পরিসরে, কিন্তু মনসা তখন তার স্বামীর ঘরের ঘরনী সুস্থ স্বাভাবিক এক রমণী। তার স্বামী তাকে পুনরায় ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে সুস্থ হওয়ায়। এভাবে



তিনি প্রকৃতির বৃহত্তর পরিবেশের সঙ্গে মানবসত্তার অন্তরস্থিত সততাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। এই কর্মনিপুণ শৈল্পিক মনভাবাপন্ন মানুষটি যেন আমাদের থেকেও অনেকটা উর্দে অবস্থান করেছে। কুটিলতা, জটিলতা, চক্রান্ত, দুর্নীতি ইত্যাদির থেকে শত হস্ত দূরে এই প্রান্তিক মানুষগুলির মধ্যে সুব্রত মুখোপাধ্যায় ফুটিয়ে তুলেছেন আদর্শ ভারতবর্ষের চিত্রাবলী। আধুনিকতার থেকে দূরে বাস করলেও যে তারাই সত্যিকারের অর্থে আধুনিক মানব তা আমরা গল্পটি পাঠ করলে উপলব্ধি করি। তারা অন্ধকারেও নিজেদের অন্তরের প্রদীপটিকে জ্বালিয়ে রেখেছে এবং সকলের মধ্যে সেই আলো ছড়িয়ে দিয়ে প্রকৃত সেবা করেছে। জগতের আনন্দমেলায় যে সবারই নিমন্ত্রণ তা শ্রীপতি, সৃষ্টিধর, মনসা, সুবল, অধর, মহাদেব, নরেনদের মধ্যে পারস্পরিক আন্তরিকতায় বিচ্ছুরিত হয়েছে গল্পটিতে।

‘বিষহর’ গল্পটি গ্রামের এক সাপুড়ে শিবনাথ হালদার ও অক্ষয় সান্যালকে ঘিরে সাপুড়ীদের সাপ ধরা জাতব্যাবসা এবং সঙ্গে সাপ সম্পর্কে গ্রামীণ বিভিন্ন ট্যাবুকে দেখানো হয়েছে। গল্পের শুরুতেই লেখক সাপের সঙ্গে পঙ্গু অক্ষয়ের তুলনা করেছেন চিত্র সাপের সঙ্গে “এ চিত্র নড়তে পারে না। নিজের বিষে নিজেই জর জর।”<sup>৬</sup> শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ অক্ষয় তার স্ত্রী পদ্মের সঙ্গে প্রতিবেশী সাপুড়ে হালদারের গোপন সম্পর্কের সন্দেহের বিষে আবিলা। তাই সে হালদারকে দুচক্ষে সহিতে পারে না। অথচ দুজনেই ছোটবেলার বন্ধু পাশাপাশি দুটি লাগোয়া ঘরে অবস্থান করে। সাপুড়ে ওস্তাদ হালদার যে সাপ ধরতে পটু সে কোন এক অলৌকিক ক্ষমতাবলে বলতে পারে কার বাড়িতে কোন জাত সাপ লুকিয়ে আছে, কার বাড়িতে বেজোড় সাপ সঙ্গী হারিয়ে একা রয়েছে। হালদার নিজের পেটের মধ্যে সাপ রেখে নির্দিধায় ঘুরে বেড়ায়। অক্ষয়ের বাড়িতে হালদার আসে তাদের গৃহে একটি গোখরো আছে তাকে না ধরে তার শাস্তি নেই বলে। কিন্তু অক্ষয়ের পদ্মকে নিয়ে হালদারের কোন সম্পর্ক রয়েছে বলে সন্দেহ করে। তাই সে পদ্মকেও অনেক কটুবাক্য বলতে দ্বিধা করে না। সাপকে নিয়ে লৌকিক মানুষের মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের ট্যাবু রয়েছে তাকে দেখানো হয়েছে গল্পটিতে। বেচু পালেরদের বাড়িতে আসা এক গুণিনের কথায়-

“এ বাড়িতে দুটি চন্দ্রবোড়া ছিল। পুরুষটা পালিয়েছে এনাদের অনাচারে। তেনার গায়ে খারাপ জল ফেলা হয়েছে। সে এখন বনে বাদাড়ে নিঃশ্বাস ফেলে বেড়াচ্ছে আর তাতে এদের অকল্যান হচ্ছে। হালদার এক পা এগিয়ে এল \_ আর মেয়েমানুষটি?

\_তেনাকেই ধরতেই তো এখানে আসা। যে কোনদিন বাড়ির মানুষকে দংশন করতে পারে।”<sup>৬</sup>

এরপর গুণীন বেচু পালের বাড়ি থেকে এক চন্দ্রবোড়া সাপকে বের করে ধরে বাঁপিতে পুরে ফেলে। হালদার নিজে সাপ ধরে তাকে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। একদিন অক্ষয়ের ঘরেই এক গোখরো সাপ ঢুকে পরে। এইসময় পদ্ম আসে হালদারকে ডাকতে অক্ষয়ের প্রাণ ভিক্ষা চাইতে। হালদার তাকে নির্দিধায় পঙ্গু অক্ষয়ের মরণ কামনার কথা বলতেই পদ্ম হালদারের পায়ে পড়ে। যে স্বামী আজীবন পঙ্গু হয়ে শয্যাশয়ি এই স্বামীর প্রাণের মূল্য পদ্মের কাছে এতটা দামী তা যেন হালদারের দৃষ্টিকেও হতচকিত করে দেয়। পদ্ম হালদারের পা জড়িয়ে ধরে তার স্বামীর প্রাণ রক্ষার জন্য করুণ প্রার্থনা জানায়। হালদার যেন তার জীবনে এই প্রথম কোন নারীর পদসেবা পেল। সাপিনী স্বরূপ পদ্ম সাপুড়ে হালদারের পা পেঁচিয়ে ধরে কারো জীবনের মূল্যকে অন্যের কাছে যে এতটা দামি হতে পারে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। যার হাত থেকে হালদারের ছাড়া পাবার উপায় নেই। লেখকের কলমে এভাবে বর্ণিত হয়েছে -

“হালদার নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর চোখ বুজে পায়ের কাছে তার তপ্ত-ক্ষীর শরীরের ওম নিতে থাকে। এই নারী কিনা বিষ ঢালে। এখন যে মধুর ধারায় ধুয়ে যাচ্ছে, বহুকালের রুখোশুখো শরীরের বন্ধ শিরায় আবার রক্ত উছলে উঠছে। বিষ না অমৃত। কী করে একসঙ্গে একপাত্রে থাকে। আশ্চর্য!”<sup>৭</sup>

অক্ষয়ের উঠানে পা দিতেই হালদার বুঝতে পারে পঙ্গু চিতি অক্ষয়ের গোঙানি। গোখরো সাপের সম্মুখে নিজের প্রাণকে হারাতে দেখে পিশাচ স্বরূপ মরণভয় অক্ষয়কে আঁকড়ে ধরে। আধমরা অক্ষয় জীবনে কোন আলোর সন্ধান না পেলেও বেঁচে থাকতেই তার আনন্দ। জীবনকে বড় ভালবেসে ফেলেছে অক্ষয়। তাই বিকলাঙ্গ দেহ নিয়েও সে মরতে ভয় পায়। প্রাণ রক্ষা করতে বন্ধু হালদারের কাছে সে ভিক্ষা চায়। তাই এক প্রাণকে বাঁচাতে সাপুড়ে হালদারকে আর এক প্রাণের বিনাশ ঘটতে হয়। এই প্রথম হালদারকেও মানুষের আর্তনাদের সামনে সাপকে মারতে হয়। সাপ সম্পর্কে গ্রাম্য সমাজে ট্যাবু রয়েছে যে সাপ আঘাত পেলে তাকে ছেড়ে দিলে সে তিন দিনের দিন আবার এসে আঘাতকারীর প্রাণ নেবে প্রতিশোধ স্বরূপ। তাই হালদারও অক্ষয়ের কথামত আঘাতপ্রাপ্ত সাপটিকে মেরে ফেলে। অন্যদিকে অক্ষয় সেই পুরনো খোলসেই জীবিত থেকে যায়। তার আর পুরনো জীর্ণ খোলস ছাড়ার ফুরসৎ হয় না। এভাবে ব্যঞ্জনার মাধ্যমে গল্পটি আমাদের জীবন সত্যকে পাঠ দেয়। এছাড়া গল্পটিতে লেখক গ্রামীণ পরিবেশের রূপ, উপমা, চিত্রকল্পের প্রয়োগ শিল্পীর নিপুণ তুলিতে চিত্রিত করেছেন। যেমন অন্ধকার বর্ষা প্রকৃতির রূপের বর্ণনা-

“অন্ধকারেও বোঝা যায় বিলের এখানে ওখানে পানার ঝাকে নীল ফুলের থোকাগুলো থই থই আনন্দে হাসছে। ঝাঁ ঝাঁ আর ব্যাঙের ডাকে কান পাতা যায় না। নিরিবিলা বাদলা মাথায় করে বোলতার বৃকে যেন কনসার্ট বসেছে, বাজনা বাজছে নানান সুরে। তার সঙ্গে ঝিপ ঝিপ বৃষ্টি। ওধারে জলপাই গাছের মাথা থেকে সেই পাখিটা ডেকে ওঠে - কে জাগে। কে জাগে।”<sup>৮</sup>

‘কাকচরিত্র’ গল্পটিতে লেখক মেথর জ্ঞানীরামের নিম্নবৃত্ত সংসারের সামান্য রোজগার করে জীবিকা নির্বাহ এবং তার আত্মদক্ষ বিষাদময় জীবনের কথা দরদী শিল্পীর তুলিতে বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানীরামের ক্ষুদ্র সংসারে মেয়ে চম্পাকে নিয়ে তার বাস। জ্ঞানীরাম তার কর্মময় জীবনে সময়ে অসময়ে লাশ বয়ে নিয়ে যাওয়া আসা মেথরের কাজ করলেও তার জীবনে ধর্মগ্রন্থ পাঠ হল এক আকাশ শান্তির স্থান। তাই সে দৈনন্দিন কর্ম সেরে প্রতিরাতে তুলসীদাসকে পাঠ করে। তুলসীদাস তাকে সকল পথের হৃদিশ বলে দেন। জ্ঞানীরাম তাই তুলসীদাসকে তথা ভগবত পাঠ করে মানব জীবনের সত্যকে উপলব্ধি করে। মানুষের চরিত্র সম্পর্কে তুলসীদাস একস্থানে বলেছেন - “যে জনমে কলিকাল করালা করতব বায়স বেষ মরালা। যে সব মানুষ এই কলিযুগে জন্মেছে, তাদের কর্মের ধারা হল কাকের মতন কিন্তু পোশাক আশাক মরালের।”<sup>৯</sup> একালের মানুষ সম্পর্কে উক্তিটির সত্যতা আমরা গল্পটিতে পাঠ করি। গল্পটিতে দেখি জ্ঞানী রামের সংসারে সে কোনমতে নিজের কর্ম করে সামান্য যা রোজগার করে তাতে তার সংসার চলে। সে দিনে সজির ঠেলা নিয়ে বাজারে সজি বিক্রি করে, রাতে মুর্দা ফরাসের কাজ করে। তার একমাত্র মেয়ে চম্পার সাত বছরে বিয়ে দেয় পঁয়ত্রিশ বছরের এক পাত্রের সঙ্গে কিন্তু যুবতী চম্পা সেই বৃদ্ধের সঙ্গে সংসার করতে নারাজ তাই সে শ্বশুরঘর ছেড়ে এসে বাপের কাছেই থাকে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই চম্পা তার নিজের চারিত্রিক সততা হারিয়ে মুখে পান, বাহারি সাজে ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে সিনেমা দেখে ও যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। এরপর একসময় কুমারী চম্পা অন্তসত্ত্বা হওয়ায় সে ফাঁসী দিয়ে আত্মহত্যা করে পরম শান্তি লাভ

করে। জ্ঞানীরাম তার সকল দুঃখ তুলসীদাসের শ্রীচরণে অর্পন করে সকল যন্ত্রণা, বেদনা থেকে মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু একদিন এই মেয়ে চম্পা জ্ঞানীরামকে ঝড়বাদলের রাত্রে পিশাচ বেশে বা ভৌতিক পরিবেশে দেখা দেয়। সন্তানের এই অতৃপ্ত আত্মাকে বীভৎস বেশে প্রত্যক্ষ করে জ্ঞানীরাম নিজের অপরাধবোধ তথা পাপবোধে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। গল্পটিতে এক অসহায় পিতার আত্মগ্লানিকে নিখুঁতভাবে পরিবেশন করেছেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। অর্থসংকটে কন্যাকে এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ, পিতার সন্তানের প্রতি কর্তব্যহীনতা এবং উত্তরাধিকারকে সুস্থ, স্বাভাবিক পরিবেশ দিতে না পারার যে তিল তিল যন্ত্রণা তা জ্ঞানীরাম চরিত্রটিতে লেখক ক্রমান্বয়ে ঘটনাপ্রবাহের দ্বারা দেখিয়েছেন।

**‘শমন’** গল্পটিতে অন্ধকার রাজবংশীর জীবনে অভাব-অনটনে পূর্ণ এক নিম্নবর্গ পরিবারে উচ্চবৃত্তের দ্বারা সামাজিক এবং আর্থিক শোষণের কথা বর্ণিত হয়েছে। অন্ধকার রাজবংশীর ঘরে যমদূত স্বরূপ সরকারি পেয়াদা কৃষ্ণচন্দ্রের খাজনার তাগিদে আগমন এবং তাকে নিজেদের মুখের গ্রাসের অর্ধেক ভাগ বুঝিয়ে দিয়ে বিদেয় করার চিত্র দেখানো হয়েছে। অন্ধকারের পরিবারের অন্ধকার দিবারাত্রির প্রাণীগুলির হা অন্ন হা অন্ন প্রতিধনির পরিবেশে পেয়াদাকে নিজেদের ক্ষুধার অর্ধেক ভাগ দিয়ে বিদায় করার মাধ্যমে উচ্চবর্গের মানুষের দ্বারা শোষিত এক নিম্নবর্গের মানুষের জীবনকে লেখক তুলে ধরে দেখিয়েছেন সামাজিক শোষণের চিরাচরিত বাস্তব রূপকে। গ্রামীণ নিরক্ষর মানুষগুলিকে ভয় দেখিয়ে, প্রতারণা করে, ছলে বলে কৌশলে টাকার জালে ফাঁসিয়ে জোর জবরদস্তি করে অর্থ-সামগ্রী লুণ্ঠের চিত্র গল্পটিতে দেখানো হয়েছে। সরকারি পেয়াদা কৃষ্ণচন্দ্র অন্ধকারের ক্রোকের টাকার আদায় করতে আসে অন্ধকারের নিকট। সরকারি লোনের টাকা পাঁচ বছরে অন্ধকার কেবল পঁচিশ টাকা শোধ করতে পেরেছে, সুদে আসলে সেই টাকা বেড়ে পরবর্তীতে দ্বিগুণ হয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্র টাকা চাইতে এসে অন্ধকারের কাছে জানতে পারে তার পঁচাত্তর টাকার লোন হিসেবের খাতায় দুশো পঁচিশ টাকা লেখা হয়েছে। উপরন্তু অন্ধকারের কেনা ষাঁড় প্রধানের বাপের শ্রাদ্ধে লাগে – “আজ্ঞে বেরষো উচ্ছুগুণ করলেন কিনা। ষাঁড়ের ন্যাজ ধরে তেনার পিতা সগ্যে গেলেন।”<sup>১০</sup> এভাবে সমাজের উচ্চবৃত্ত মানুষ এবং সরকারি কর্মচারী ব্যক্তিদের দ্বারা শোষিত এক চালচুলোহীন হতদরিদ্র পরিবারের চিত্র গল্পটিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

**‘কুঠোবাবারা চইললেন’** গল্পে সমাজ বিচ্ছিন্ন কুষ্ঠরোগীদের অবস্থান দেখানো হয়েছে। সুস্থ মানুষদের সঙ্গে কুষ্ঠরোগীদের ভিন্ন জীবন যাপন চিত্র এবং হিন্দু-মুসলমানের আত্মিক সম্পর্ক পীর নিমচাঁদের মেলার মিলনক্ষেত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। দেদার বকস এবং নূর মহম্মদ দুজন কুষ্ঠরোগী নিমচাঁদের মেলার প্রাঙ্গণে আসে। মেলার পরিবেশে এসে এক বৃদ্ধ স্বামীর স্ত্রী তরাসীর সঙ্গে নূর মহম্মদের কথোপকথনে লেখক কুষ্ঠরোগীরাও যে মানুষ তা দেখিয়েছেন। তরাসী নূর মহম্মদকে তাদের পেশার কথা জানতে চাইলে সে প্রথমেই বলে “নূর ঝপ করে বলে ফেলে - আমরা তো মানুষ”<sup>১১</sup> এরপর নূর মহম্মদ বৃদ্ধ বৈরাগীর তরুণী স্ত্রী তরাসীর প্রতি তার প্রেমিক সত্তার স্বাভাবিক প্রণয় অনুভব করে, সেও তরাসীকে পছন্দ করে তাই তরাসীর সঙ্গে কয়েক দণ্ড কথা বলে সে শান্তি উপভোগ করে। নূরকেও একসময় প্রসঙ্গক্রমে বলতে দেখা যায় – “আমরা জোনাই, চাম সবাইকে তো পাখি সমঝি।”<sup>১২</sup> এভাবে লেখক মিলিয়ে দিয়েছে স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে কুষ্ঠরোগীদের জীবনকে। তারাও জীবনকে উপভোগ করতে চায়, স্বাভাবিক স্রোতে মিশতে চায়। সকলের মধ্যেই যে মনুষ্যরূপী ঈশ্বরের বাস তা আমরা গল্পটি পাঠে উপলব্ধি করি। এছাড়া লেখক মিলিয়ে দিয়েছেন বৃহত্তর প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একত্রে মিলিত হওয়ার পরিবেশকে নিমচাঁদের মেলার প্রাঙ্গণে।

বর্ণিত হয়েছে পীর বা দরবেশ রূপী নিমচাঁদের বীরত্বের কথা, পীরের তসবি ছেড়ে অসি ধরার চিত্র, লৌকিক মানুষদের জীবনে পার্বণ বা উৎসবের চিত্র, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মেলার উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে সকলের মিলিত হওয়ার বা আহ্বানে সকলের সাড়া দেওয়ার মত প্রকৃতি ও মানুষের একাত্মতাকে। একান্তই নিজস্ব সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যবাহী এই পীরের মেলা। এই দরবেশ অথবা পীরের মেলায় বিশাল প্রান্তরে খোলা মাঠে প্রকৃতির উন্মুক্ত এক আকাশের নীচে সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণের একত্রে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চিত্র বর্ণিত হয়েছে -

“কথা আছে, পীর নিমচাঁদ যখন রাজার সঙ্গে তরবারি লয়ে ধর্মযুদ্ধে গমন করেন তাঁর সম্মুখে হাজার হাজার বগী।... এ অত্যাচার দমন করতে পারেন না একা রাজা শিবরাম, তাই শরণ লন পীর নিমচাঁদের যিনি তাঁর দোস্ত-বন্ধু আবার অন্তরের গুরুও বটেন।... এই সেই মাঠ। এখন খাঁ খাঁ তেপান্তর না, মেলার শোরে তাল বেতাল হট্টগোল। দোকানপাট মানুষজন, চোঙার গান সব নিয়ে যাকে বলে এলাহি কারবার।”<sup>১০</sup>

এই উন্মুক্ত পরিবেশে মেলার প্রাঙ্গনে এসে লেখকও ভিন্ন পথযাত্রী বিকলাঙ্গ কুষ্ঠরোগীদেরকে মিলিয়ে দিয়েছেন সমাজের স্বাভাবিক স্রোতে। ব্যক্ত করেছেন সুস্থ মানুষদের মত তাদের চাওয়া পাওয়া এবং বেঁচে থেকে স্বাভাবিক মানুষরূপে দিনযাপনের মনোবাসনাকে। সর্বোপরি লেখক প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মিক যে সংযোগ তা গ্রামীণ লৌকিক মানুষদের জীবনযাপন এবং তাদের প্রতিদিনের জীবনস্রোতকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। তুলে এনেছেন জীবন এবং যাপনের মধ্যেও যে শৈল্পিক সৃষ্টিশীলতা বিরাজমান তা। দেখিয়েছেন প্রকৃত ভারতবর্ষের চিত্রাবলীকে। সকলের মধ্যেই যে কোন না কোন সৃষ্টিশীলতা রয়েছে, সে ছোট কিংবা বড় যাই হোক না কেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিটি জীবনের মূল্যকে গল্পগুলিতে প্রস্ফুটিত করেছেন। এক প্রাণের মূল্য যে অন্য প্রাণের কাছে সীমাহীন তা চরিত্রদের উপলব্ধির মাধ্যমে বের করে এনেছেন। সুব্রত মুখোপাধ্যায় নিজে কর্মজীবনে ছিলেন একজন মহকুমাশাসক। বাস্তবকে তিনি প্রত্যক্ষ স্বচক্ষে দেখেছেন ও কর্মজীবনে তাঁকে অনেক বাস্তব গরিবদুঃখী মানুষের নানা সমস্যায় পাশে থেকে সাহায্য করতে হয়েছে। নদীয়ার কল্যাণী মহকুমায় তাঁর অবস্থানকালে টাউন রেল চালু হলে, বস্তি উচ্ছেদ নাগরিকদের পুনর্বাসনে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। এভাবে তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন এবং তার থেকে অতিক্রান্ত হয়েছেন। এরকম কিছু সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা, প্রশাসনিক ব্যক্তিদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বিবেচ্যমূলক আচরণ, রাজনৈতিক ব্যক্তিদের শোষণ, অমানবিকতার কথা তাঁর কিছু ছোটগল্পে ফুটে উঠেছে। সাধারণ মানুষের ছোট ছোট সুখদুঃখের সমব্যথী হয়ে সুব্রত মুখোপাধ্যায় মানুষের পাশে থেকেছেন ও তাকে শিল্পরূপের মাধ্যমে সকলের সামনে এনেছেন, তার মধ্য দিয়ে পাঠক সমাজও শৈল্পিক রস তথা সুখ দুঃখের সঙ্গী হয়েছেন। এভাবেই তিনি সমকালের থেকে ভিন্ন দৃষ্টিতে জীবনকে উপলব্ধি করেছেন সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে। প্রান্তজনের হয়ে তিনি কলম ধরেছিলেন তাই তাঁর ছোটগল্পগুলিতে উঠে এসেছে শিকড় থেকে উঠে আসা আটপৌরে লৌকিক মানুষের জীবনবৃত্ত। যাদের পায়ের নীচে মাটি নেই বাসস্থানের ভূমিটুকুও পরের কিন্তু তারা তাদের নিজস্বতায় নিজেরা ভাস্বর। তাদের সকলেরই রয়েছে নিজ নিজ জাতিসত্তা তথা নিজের কর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং জীবনের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাভরা ভালোবাসা। নিম্নবৃত্ত মুচি, মেথর, বাদ্যকর, সাপুড়ে, যাত্রা দলের গাইয়ে, জল্লাদ, ভিথিরি, ডোম বিভিন্ন নিম্নবৃত্ত সম্প্রদায়ের মানুষজন তাঁর ছোটগল্পের নায়ক। তাদের রুদ্ধ জীবন সঙ্গীত এবং দৈন্দন্দিন জীবনের কথাকে বলতে গিয়ে সুব্রত মুখোপাধ্যায় প্রকৃতির অকৃত্রিমতার সঙ্গে এই মানুষগুলির জীবনকে মিলিয়ে দিয়ে বিস্তৃত এক সীমাহীন উদার উন্মুক্ত আকাশকে দেখিয়েছেন।

যেখানে সকলেই রাজার বেশে নিজ নিজ সাম্রাজ্যের অধিকারী। কেউ কোথাও নিঃস্ব বা রিক্ত নয়। যেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের মতই, ‘আমারা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে’।

### তথ্যসূত্র:

- ১। মুখোপাধ্যায়, সুব্রত, ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ তেমার লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০০৪, পৃ. ৭।
- ২। তদেব, পৃ. ৮।
- ৩। তদেব, পৃ. ৮।
- ৪। তদেব, পৃ. ১৪।
- ৫। তদেব, পৃ. ১৯।
- ৬। তদেব, পৃ. ২৪।
- ৭। তদেব, পৃ. ৩২।
- ৮। তদেব, পৃ. ২৮।
- ৯। তদেব, পৃ. ৩৫।
- ১০। তদেব, পৃ. ৪৭।
- ১১। তদেব, পৃ. ৬৭।
- ১২। তদেব, পৃ. ৬৮।
- ১৩। তদেব, পৃ. ৫৯।

### গ্রন্থপঞ্জি:

- ১। মুখোপাধ্যায়, সুব্রত, ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ তেমার লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০০৪।
- ২। হোসেন, সোহরাব, ‘বাংলা ছোটগল্প: তত্ত্ব ও গতিপ্রকৃতি’ (১ম খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ২০১০।
- ৩। দত্ত, বীরেন্দ্র, ‘বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ’ (প্রথম খণ্ড), পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৫।
- ৪। বিশী, শ্রীপ্রমথনাথ, ‘রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৬১, চতুর্দশ মুদ্রণ আষাঢ় ১৪২০।
- ৫। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, ‘কালের পুত্তলিকা’ (বাংলা ছোটগল্পের একশ’ বিশ বছর/ ১৮৯১-২০১০), দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৯১২, পুনর্মুদ্রণ অক্টোবর ২০১৬।

- ৬। দাশ, শিশিরকুমার, 'বাংলা ছোটগল্প' (১৮৭৩-১৯২৩), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, ষষ্ঠ সংস্করণ আগস্ট ২০১২।
- ৭। ভট্টাচার্য, সুখেন্দ্র, 'ছোটগল্পের পর্ব-পর্বাস্তর', প্রতিভাস, ১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা-৭০০০০২, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯।
- ৮। ভদ্র, গৌতম, 'ছোটগল্পে পার্থ (সম্পাদনা)', 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, নবম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৮।
- ৯। হোসেন, সহারা, 'বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্য জীবন', করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০৪।
- ১০। চৌধুরী, শ্রীভূদেব, 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প গল্পকার', মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, নববর্ষ ১৩৭২।
- ১১। গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, 'সাহিত্যে ছোটগল্প', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, সপ্তম মুদ্রণ পৌষ ১৪২৩।
- ১২। পাল, ড. শ্রাবণী, 'বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা বিশ শতক', অক্ষর প্রকাশনী, ৩২ বিডন রো, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ মে ২০০৮।
- ১৩। রায়, অলোক, 'ছোটগল্পে স্বদেশ স্বজন', অক্ষর প্রকাশনী, ৩২ বিডন রো, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ ৮ মে ২০১০।
- ১৪। হোসেন, সোহারা, 'বাংলা ছোটগল্প: তত্ত্ব ও গতিপ্রকৃতি' (২য় খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০১০।
- ১৫। হোসেন সোহারা, 'বাংলা ছোটগল্প: তত্ত্ব ও গতিপ্রকৃতি' (৩য় খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ২০১৪।



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 633-640

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.052



## শতীন দাশের গল্প : সুন্দরবনের বাঘ-বিধবা মহিলাদের জীবন সংগ্রাম

সমরেশ বাগ, গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 15.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*When the word Sundarbans comes to mind, we think of it as forest or jungle. The Sundarbans is an island surrounded by mangroves at the mouth of the Ganges and Brahmaputra. In short, the Sundarbans is a region full of thrills in the water and the jungle. It is the largest delta in the world. It is said that in ancient times it was called the Angiri forest. There is no exact information about when it became the Sundarbans after going through many paths of evolution. It is believed that the name Sundarbans was derived from the fact that a large number of Sundari trees grow there. However, there is controversy about this naming. But whatever the controversy, what was once a forest has now been cut down to a large extent and is now a township. And people have converted the forest into a township. And this township is today's Sundarbans. In the Sundarbans, forests and roads are located side by side and the salty water there meets the sea through narrow and thick river creeks. The island land of the Sundarbans is shaken by the tides, and there is a constant struggle for survival. There are crocodiles in the water and tigers on the shore. But even with crocodiles in the water and tigers on the land, the people are constantly fighting there for survival. And if the man among the family members is lost in that fight, how difficult it becomes for a woman to survive alone. Through how many adversities she has to move forward, to survive. This article has tried to highlight that life pain.*

**Keywords:** Sundarbans, tiger-widow, women's livelihood, child rearing, protecting women's honor, government assistance.

শতীন দাশ ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত বসবাসকারী একজন বাঙালি লেখক। তাঁর জন্ম ১৯৫০ সালের ২ জুলাই কলকাতায়। কলোনি জীবনের নানা দুঃখ কষ্ট মাখা সময়ের মধ্য দিয়ে যখন জীবনের এক-একটা দিন অতিবাহিত করছিলেন। অন্তরে তীব্র একটা বাসনা লালিত হচ্ছিল নতুন কিছু শুরু করার, জীবনকে নতুন রঙে সজ্জিত করার। হাতে তুলে নিলেন কলম। লিখতে শুরু করলেন। আর এই লেখালেখির সূত্র ধরেই তথ্য সংগ্রহের আশায় দক্ষিণের বাধা অঞ্চলকে নিজের চোখে দেখা। দেখলেন এ এক ভিন্ন পৃথিবী।

চারপাশে নদী-নালা, খাল-বিলে ভরা আলাদা এক জগৎ। সেখানে মানুষের জীবন যুদ্ধের পৃথক কাহিনি আছে। কোনও উৎসবে একত্রে তারা যেমন আনন্দ করে আবার সামান্য কারণে একে অপরের সাথে ঝগড়া করে। এমন এক ভিন্ন পৃথিবীর সন্ধান শচীন দাশকে আকর্ষণ করে। তিনি সেখানকার নারী পুরুষদের জীবন যুদ্ধের ছবি নিজের চোখে দেখলেন। আর তাকে অবলম্বন করেই পরবর্তী সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হলেন। আমরা এই প্রবন্ধে শচীন দাশের সুন্দরবন কেন্দ্রিক নির্বাচিত গল্পে বাঘ-বিধবা মহিলাদের জীবন সংগ্রামের কাহিনি নিয়ে আলোচনা করবো।

“সমগ্র সুন্দরবনের এক সামগ্রিক রূপ প্রলম্বিত হয়ে আছে আবহমান কাল থেকে - এর ইতিহাসে, এর ঐতিহ্যে, এবং এর কৃষ্টিতে। আজও সে রূপ প্রকটিত হয়ে আছে এ অঞ্চলের মানুষের সমাজে বনওয়ালিদের মাধ্যমে”<sup>১</sup>

‘বনওয়ালি’ বন্য শব্দ। জনপদী সুন্দরবনের ভয়াল-ভয়ঙ্কর জীবন যাপনের অভ্যস্ত এক শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষ। যারা সখে নয়, সুখের খোঁজে বনে যায়। খিদে পেলে খেতে পেলে তাদের সুখ। আর শান্তি যতটা না শ্মশানে, তার চেয়ে বেশি সুন্দরবনে। এই অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষ এমনটাই মনে করে। তাই সুখ ও শান্তি এই দুয়েরই ঠিকানা তারা খুঁজে ফেরে জল ও জঙ্গলের মধ্যে। এই সহজ সরল মানুষগুলো ভয়ঙ্কর হিংস্র জঙ্গলের কোলে লালিত পালিত হতে হতে বনকেই তারা নিজেদের ভগবান বলে মনে করে। তারা জীবনের এই সত্যকে স্বীকার করে নেয় যে বনেই তাদের জীবন আর বনেই মৃত্যু। তাই বনের সাথে তাদের মিত্রতা। তারা পরস্পরকে সমানভাবে যেন বোঝে। তাই এই জঙ্গলের সাথে কোনরূপ ছলনা করার কথা তারা ভাবতেই পারে না। আর ছলনা করলেও তারা জানে এর ফল তাদের পেতেই হবে।

বনজসমাজে এই মানুষেরা জীবিকা ভেদে কেউ বাওয়ালি, কেউ মৌলে, আবার কেউ জেলে, কেউ বা কাঁকড়া শিকারি। এদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য কেউ আবার গুনি বা ওঝা। হিংস্র জন্তুদের মুখবন্ধন, বেড়বন্ধন করে কাঁটাপথ পরিষ্কার করা এদের কাজ। কিন্তু সব সময় তাদের এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না। খাদ্য-খাদকের তাগিদে বাঘ সব বাধাকে অগ্রাহ্য করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির রাখে এবং সময় বুঝে আকাজ্জিত বস্তুকে মুখে তুলে পাড়ি দেয় নিজের গন্তব্যে। এভাবেই চলতে থাকে বাদা অঞ্চলে মানুষের জীবন সংগ্রামের গল্প। আমরা শচীন দাশের গল্পের মধ্য দিয়েও দেখতে পাই ঠিক এভাবেই কেউ জঙ্গলে কাঁট কাটতে গিয়ে কেউ বা মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের হামলায় প্রাণ দিয়েছে। আর পরিবারের কর্তার অনুপস্থিতিতে বাদা অঞ্চলে একা মহিলার জীবন সংগ্রাম কী ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তা-ই কয়েকটি গল্প আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখার চেষ্টা করবো।

‘হেঁতালের মানুষেরা’ গল্পে দেখা যায় নয়ানির দুটো ছোট ছোট ছেলেকে নিয়ে বাস। একটির বয়স সাত বছর আর অন্যটির বয়স পাঁচ বছর। নয়ানির স্বামী তিনকড়ি এক মধুসংগ্রহের গোনে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। তার বিশ্বাস তিনকড়িকে বনবিবি জঙ্গলে ডেকে নিয়েছে। কারণ আগের মধু সংগ্রহের গোনে গিয়ে তিনকড়ি জঙ্গলের নিয়ম ভেঙ্গে বনবিবির জঙ্গলে অর্পণ করা কারোর হেঁতালের চারা সবার অলক্ষে তুলে বাড়িতে এনেছিল। এ বিষয়টা নয়ানির ভালো না লাগলেও কিছু বলতে পারেনি স্বামীকে।

স্বামীহীন অবস্থায় তাকেই দুই ছোট ছোট সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে জীবনযুদ্ধে নামতে হয়। বেরিয়ে পড়তে হয় দুই ছেলেকে পাশে নিয়ে একটা হাতজাল ও একটা বড়ো মাটির হাঁড়ি নিয়ে। এরপর হাঁটু পর্যন্ত শাড়ি



তুলে নদীর বুকে চলতে থাকে জীবন রসদ সংগ্রহের খেলা। নয়ানির চোখ তখন ঘুরতে থাকে নদীর এদিক থেকে ওদিক। কোথায় খেলে বেড়াচ্ছে বাগদার পোনারা। আর লেখকও এ সম্পর্কে বলেন-

“এদেশে ডিম পাড়ার সময় হলে সমুদ্রের কড়া নোনা জল থেকে বেরিয়ে এসে কম নোনা জলের নদীনালায় ঢুকে পড়ে বাগদারা। বঙ্গোপসাগর থেকে সপ্তমুখী, জামিরা, গোসাবা ও মাতলা হয়ে কোটিতে কোটিতে শত শত শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ে। পড়েই ডিম ছাড়ে। ডিমগুলো সব কুয়াশার দানার মতো মিহি হয়ে যেন ছড়িয়ে পড়ছে তখন নদী নালায় তা ডিম ছাড়লো। এবং ওই ডিম থেকেই পরে সরু সুতোর মতো লার্ভা। লার্ভার আবার বড় হতে হতে একসময় পরে বাগদার মীন। কম নোনা জলে হেসে খেলে বেড়ায়। একটু বড় হলে অবশ্য ফের তাদের সেই সমুদ্রেই ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু ফিরতে আর পারে না। তার আগেই তারা বাঁধা পড়ে হাতজালে। এদেশের গরিবগুরোঁরা তাদের ধরে ফেলে”<sup>২</sup>

লেখকের উদ্ধৃতির এই বক্তব্যে কতদূর সত্যতা আজও আমরা সুন্দরবন অঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষদের সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারি। কোনও একদিন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে দেখা যাবে অনেকেই চিংড়ির মীন ধরতে ব্যস্ত।

আমরাও গল্পে দেখি নয়ানি নদীর পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে কখন ঝুপ করে নেমে পড়েছে নদীর জলে। হাতে তার টানা জাল। এরপর জালটা জলে ডুবিয়ে জালের দড়ি ধরে চলতে থাকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এরপর সেই জালে পড়া বাগদার মীনগুলো একে একে হাঁড়িতে ভর্তে থাকে। এভাবেই ঘন্টার পর ঘন্টা চলতে থাকে নদীর বুকে নয়ানির জীবন সংগ্রাম। ছেলে দুটো তখন নদীর পাড়ে মায়ের দিকে লক্ষ্য রেখে হাঁটতে থাকে। শেষে নয়ানি তার সারা দিনের মীন সংগ্রহের পর তা নিয়ে দাঁড়ায় মহাজনের আর্তে। মীন বিক্রি করে যা পায় তা দিয়েই তার চলে যায়। অবশ্য তার চাহিদাও সামান্য।

“বছরে দুটো মোটা কাপড় ও কচিকাচার শানকিতে দুটো মোটা চালের নুনভাত তা জুটলেই তারা খুশি”<sup>৩</sup>

অবশ্য এ জীবিকায় বিপদের ঝুঁকিও কম নয়। মীন ধরার ব্যস্ততায় তাদের চারিপাশের জ্ঞান থাকে না। আর এইসব নদী-নালায় নিঃশব্দে জলের নিচে ঘুরতে থাকে কামটের দল। তাদের দাঁত সুতীক্ষ্ণ ধারালো। যখন সেই দাঁতের মুখে কোনও ব্যক্তির পা পড়ে সে বুঝতেই পারে না কেন হঠাৎ করে জলের ভেতরে পা বসে গেল। আর যখন বুঝতে পারে, দেখে তার চারিপাশের জলের রঙ লাল। তখন তীব্র যন্ত্রণামাখা আর্তনাদ ছাড়া মুখ থেকে কোনও শব্দ নির্গত হয় না।

আর এভাবেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে দেখি ‘জল-মানুষ’ গল্পের ছায়ানিকেও। ছায়ানির স্বামীর নাম ধান্য। মধু সংগ্রহের গোনে গিয়ে ধান্য আর ফিরে আসেনি। বাঘের কবলে পড়ে প্রাণ হারায়। তারপর থেকে ছায়ানিকে নিজের পেটের চিন্তা নিজেই করে নিতে হয়েছে। নদী-নালা থেকে মীন ধরে বিক্রি করে উপার্জন। তবে এই দৃশ্য কেবল ছায়ানির একার ঘরের নয়, এই দৃশ্য গ্রামের অনেক পরিবারের মধ্যেই দেখা যায়। তাই জলদস্যু ধরতে আসা পুলিশ অফিসারকে ছায়ানির পরিচয় দিতে গিয়ে পঞ্চগয়েত সদস্য ভূষণ পাখিরাকে বলতে দেখা যায়-

“কী করবে... ধান্যটা মধু আনতে গিয়েই বাঘের পেটে গেল...ওই সেই থেকেই তো... এ গেরামে এমন অনেক ঘরেই পাবেন স্যার...”<sup>৪</sup>

তবে সব মহিলারাই যে কেবল মীন ধরা জীবিকার সাথে নিজেকে যুক্ত করে তা নয়। কোনও কোনও মহিলা অন্য জীবিকিও বেছে নেয়। যেমন ‘সবুজ কাঁকরা’ গল্পে দেখা যায় মান্যর পিতা দলের সঙ্গে জঙ্গলে গিয়ে মধু আনত। কিন্তু একদিন গোনো গিয়ে আর ফিরে আসেনি। বাঘের মুখে জীবন দেয়। আর তারপর থেকে মান্যর মাকেও জীবিকার পথ বেছে নিতে হয়। সে কাজ করে ভেড়িতে। তার কাজ হল চিংড়ির বাছাই। বিভিন্ন সাইজের, ধরনের চিংড়ি বাছাই করে রাখা। এরপর সেগুলি বরফভর্তি বাক্সবন্দী করে চালান দেওয়া। এই কাজ করতে করতে মান্যর মায়ের সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কেটে যায় ভেড়িতে।

কাজের পর শেষ বেলায় ঘরে ফেরা। কিন্তু তখনও জীবনের শান্তি নয়, হাতে তুলে নিতে হয় সংসারের কাজ। জ্বালানি যোগাড় করে উনুন ধারাতে হয়। তারপর ভাত বসানো। এভাবেই জীবন যুদ্ধ চলতে থাকে নিত্যদিন। তবে এই গল্পে দেখা যায় মান্যর মায়ের দুঃখের অংশিদার হয়েছে মান্য নিজেও। তার বয়স পনেরো বছর। তার মা যেমন সকালে উঠে কাজের জায়গায় যায়, মান্য নিজেও সকালে উঠে বিভিন্ন নদী-নালায় খুঁজতে থাকে কাঁকড়া। তার একটা কাঁকড়া ধরা কলও আছে। আর সেই কল সম্পর্কে গল্পে হৈমু জানতে চাইলে, মান্য তাকে বলে-

“একটা লোহার তার নিয়ে তার মাথাটা বেঁকায়ে ধইরে গর্তে ঢুকিয়ে দাও অমনি দেখবে সেই লোহাটা খপ করে কামড়ে ধরবে গর্তের কাঁকড়াটা। ব্যাস, তারপর টেইনে তুলিনাও”<sup>৫</sup>

এমন করেই কাঁকড়া ধরে সকাল থেকে দুপুর হয়ে অবেলা কাটতে থাকে মান্যর। এরপর বাড়ি ফিরে পলিথিনের প্যাকেটে রাখা কাঁকড়াগুলিকে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে ঢুকিয়ে রাখে। পরে সেই হাঁড়ির মুখ জাল দিয়ে ভালো করে বেঁধে রাখে। পরের দিন এগুলি নিয়ে সে বাজারে যায়। এভাবেই মা ও ছেলের জীবন সংগ্রাম চলতে থাকে। তবে মান্যর মায়ের মতো কপাল সবার হয় না। কোনও কোনও মহিলাকে দেখা যায় কোলের শিশুকে নিয়েই জীবিকার সন্ধানে ছুটতে হয়।

‘অন্নসত্র’ গল্পে দেখা যায় নদেরানী স্বামী ভীমচন্দ্রকে হারিয়ে দুই ছোট ছেলে মেয়েকে নিয়ে বিপদে পড়েছে। তার স্বামী এক বাবুর অধীনে কাজ করতো। বাবুর যাবতীয় কাজ সে করে দিত। সেই বাবুর কথাতেই ভীমচন্দ্র জঙ্গলে গাছ কাটতে গিয়ে বাঘের হানায় জীবন দেয়। আর নদেরানীকে বসতে হয় পথে।

নদেরানী প্রথমে কিছু খয়রাতের আশায় সেই বাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেও কোনও লাভ হয়নি। বাবু অঘোর হালদার তার স্বামীর দোষ দেখিয়ে তাকে ফেরত পাঠায়। অথচ নদেরানী জানে এই বাবুর কথাতেই ভীমচন্দ্র ফরেস্ট অফিসারের দেখানো সীমানার বাইরে গিয়ে গাছ কাটতে গিয়েছিল। আর তাতেই বাঘের মুখে পড়ে ভীমচন্দ্রের জীবন যায়।

কোনও সাহায্য না পেয়ে নদেরানীকে নিজের জীবিকা নিজেই খুঁজে নিতে হয়। সে অন্যান্য নারীদের মতো জঙ্গলে যেতে শুরু করল। সেখান থেকে ধানী ঘাস কখনও বা জঙ্গলের কাঠ নিয়ে নদী সাঁতরে এনে বিক্রি করতো। কিন্তু তার এই জীবিকাতে বাবুর দৃষ্টি পড়ে। ফলে জীবন আরও কঠিন রূপে দেখা দেয়।

‘মউলে’ গল্পে দেখা যায় ফুলকুসী তার স্বামী মাধাইকে হারিয়ে জীবন যাপনে ভয়ংকর বিপদে পড়েছে। মাধাই সাঁইদারের টাকার লোভে পড়ে মধু সংগ্রহ করতে একাই রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে যায়। আর ডিঙি রেখে জঙ্গলে উঠতে না উঠতেই বাঘের থাবায় পড়ে। স্বামীকে হারিয়ে ফুলকুসী ওরফে ফুলিকে জীবিকার লড়াইতে নামতে হয়। সে প্রথমে মালোপাড়ায় অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবারে কাজের জন্য গেলেও

তার অল্পবয়সী শরীরের সৌন্দর্যের কথা ভেবে কোনও বাড়ির গিন্নিই তাকে বাড়িতে কাজ দিতে রাজি হয় না।

তবে ফুলিকে কাজ দিতে রাজি না হলেও তারা সকলেই ফুলির প্রতী সমব্যথী। তাই কোনও কাজ ছাড়াই কিছু পান্তা কচুপাতায় ফুলিকে দেয়। যা নেবে না নেবে না করেও আত্মসম্মানী ফুলি দুটি পেটের কথা ভেবে নিঃশব্দে তুলে নেয় এবং বাড়িতে এসে সেগুলি নুনু লঙ্কা সহযোগে অমৃত জ্ঞান করে ভক্ষণ করতে থাকে।

এরপর তার মাথায় ঘুরতে থাকে বাড়ির পোষা মুরগিগুলোকে বিক্রি করে দেবে। তারপর ভাবতে থাকে খালে-বিলে ঘুরে ঘুরে মাছ ধরবে। আর তা পুড়িয়ে খেয়েই পেট ভরাবে ছেলে ও মা। তাতেও যখন মন সায় দিল না ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয় মালো পাড়ার দেলো গাজীর কাছে। তার ছোট ছেলেকে বাঘ বশীকরণ মন্ত্র শিখিয়ে দেওয়ার জন্য। মন্ত্র শিখে মা ও ছেলে ডিঙি নিয়ে পারি দেবে গেমোর ও গরানের জঙ্গলে। এরপর ছেলে মৌচাক ভেঙে আনবে আর ফুলি ছেলেকে পাহারা দেবে। কিন্তু তার এই প্রস্তাব মালো পাড়ার কোনও মাতব্বর মেনে নেয় না। সবাই তার কথায় হাসাহাসি করতে থাকে। কোনও নারী জঙ্গলে গিয়ে মধু সংগ্রহ করে আনবে এ তাদের কাছে বিশ্বাসের উর্ধ্ব। তাই প্রত্যেকই ফুলিকে এই চিন্তা বাদ দিতে বলে। কিন্তু জীবিকাহীন নিরন্ন ফুলি নিজের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে পিছিয়ে থাকতে বা বিলুপ্ত হতে চায় না। তাই এক সকালে ছেলেকে সঙ্গে করে ফুলি উপস্থিত হয় স্থানীয় স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক ও বর্তমানে এমএলএ সত্যবন্ধু দাসের বাড়িতে। সেখানে ফুলি নিজের অর্থকষ্ট ও জীবিকায় বাধা দেওয়ার কথা জানালে এমএলএ সাহেব ফুলিকে জানায় অবশ্যই সে নিজের পেশা বেছে নিতে পারে। তাকে বাধা দেওয়ার অধিকার কারোর নেই। এছাড়া তাঁর বক্তব্য --

“গণতন্ত্র আছে না দেশে? ওরা সব ভেবেছেটা কি। তোমাকে তোমার বাঁচার অধিকার না দেওয়ার মানে কি জানো - গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা। না-না এসব ফাজলামো চলতে পারে না। যাই হোক দেশে একটা আইন আছে। সংবিধান আছে। সবার ওপরে মানুষের বেঁচে থাকার গণতান্ত্রিক রাইট আছে”<sup>৬</sup>

মূর্খ ফুলি এমএলএ সাহেবের সব কথা বুঝতে না পারলেও বুকটা তার ভরে ওঠে এই ভেবে যে এতক্ষণে সে একজন আপনজন পেয়েছে যে তার দুঃখ কষ্টের কথা বুঝতে পেরেছে। ফুলি তাই সাহেবকে এই কথা পাড়ার সকলকে বুঝিয়ে বলতে অনুরোধ করে। তার জীবিকার পথে কেউ যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। সাহেবের পূর্ণ সম্মতিতে ফুলি হাসিমুখে ছেলেকে সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে এরপর অপেক্ষা করতে থাকে সাহেবের সেই অর্ডারের জন্য। কিন্তু দিনের পর দিন চলে গেলও সাহেবের কোনও অর্ডার এসে পৌঁছায় না। একদিন সাহেবের বাড়িতে আবার গিয়ে উপস্থিত হলে সেদিন আর এমএলএ সাহেবের সাক্ষাৎ পায় না ফুলি।

তবে এতো গেলো তাদের জীবিকার লড়াই। এর পাশাপাশি চলতে থাকে তাদের টিকে থাকার লড়াই। স্বামীহীন পরিবারে এই সব যুবতি মেয়েদের ভোগ করার জন্য একদল মানুষ লালায়িত হয়ে থাকে। তাদের নানারকম প্রলোভন দেখানো হয়। কিন্তু শত প্রলোভনকে উপেক্ষা করে না খেয়ে দেয়ে যখন এরা নিজেদের মতো করে জীবন যুদ্ধে এগিয়ে চলতে চায়। তখন এদের উপর শুরু হতে থাকে নানা রকম অত্যাচার।

‘হেঁতালির মানুষেরা’ গল্পে দেখা যায় নয়ানি তার একমাত্র বাসস্থানটি নদীগর্ভে হারিয়ে যখন আশ্রয় নিয়েছিল নদী বাঁধের উপরে। অপেক্ষায় দিন গুণছিল কবে তার চিহ্নিত হেঁতালের গাছটির বাসস্থান নদী জল থেকে উঠে আসবে। সরকারি সাহায্যের জন্য দরবার করছিল পঞ্চায়েতের কাছে। পঞ্চায়েত নয়ানিকে বেআইনি ঘর বেঁধে থাকার জন্য কোনও রকম সাহায্য করতে না চাইলেও একজন পঞ্চায়েত মেম্বার সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। সে নয়ানিকে পরামর্শ দিতে থাকে এস্থানের বাস ছেড়ে তার চিহ্নিত স্থানে ঘর তুলতে। আর তার চোখ দুটো তখন ঘুরতে থাকে নয়ানির বুক দুটোর দিকে। নয়ানি সে কথার কোনও উত্তর দেয় না বরং নিজের বাসস্থান জেগে ওঠার অপেক্ষা করতে থাকে। আর এমন করে যখন সময় যেতে লাগলো অথচ নয়ানি ঘরের কোনও প্রমাণ দিতে পারল না। অথচ নদী বাঁধের থেকে উঠে যেতে পঞ্চায়েতের আদেশ আসতে থাকে বারে বারে। তখন সেই পঞ্চায়েত মেম্বার আবার এসে হাজির হয়। সে নয়ানিকে তার মৌজার একটা পড়ন্ত জায়গায় ঘর বাঁধতে বলে। এতে নয়ানি তার গোপন অভিসন্ধির কথা বুঝতে পেরে চিৎকার-চেষ্টামেচি করে সেই মেম্বারকে তাড়িয়ে দিতে চাইলে। তখন সেই মেম্বারের চোখ মুখ থেকে আগুন বারে পড়তে থাকে। সে দাঁতে দাঁত চেপে বলতে থাকে -

“ঠিক আছে এই আমি দেখে নুব নয়ানি। তোর বিষ দাঁত যদি আমি না ভেইঙে ফেলি... ভালো কথায় তোর মন ভরলনি”<sup>৭</sup>

এরপরে নয়ানি তার জেগে ওঠা পুরনো জায়গায় আবার ঘর বাঁধতে শুরু করলে পঞ্চায়েত ও সেই প্রতিহিংসাপরায়ণ মেম্বার নয়ানিকে ঘর তুলতে বাধা দিতে যায়। কিন্তু হাতে দা নিয়ে অগ্নিমূর্তি এক নারীকে কাজ করতে দেখে আর কিছু বলার সাহস পায় না তার।

‘জল-মানুষ’ গল্পে ছয়ানির স্বামী বাঘের পেটে যাওয়ার পর পঞ্চায়েত সদস্য ভূষণ পাখিরা অনেকবার এই ছয়ানির কাছে ঘোরাঘুরি করেছে। ছয়ানি এসব বোঝে। আর বোঝে বলেই সে ভূষণ পাখিরকে এড়িয়ে চলতে চায়।

কিন্তু তাতেও কি বিপদ কম! বিপদ যে এমন নানা দিক থেকে আসতে থাকে। জলদস্যু ধরার জন্য পুলিশ অফিসার, পঞ্চায়েত ও গ্রামের অন্যান্যদের নিয়ে যখন ছয়ানির ঝুপড়ির কাছে উপস্থিত হয়। পঞ্চায়েত সদস্যের বারবার ডাকে ছয়ানি বেরিয়ে এলে পুলিশ অফিসারের চোখ ছয়ানির সারা শরীর বেয়ে বুকে দৃষ্টি স্থির হয়। তার ঠোঁটও তখন লালসায় ভিজে উঠেছে। ‘টর্চটা তখনও ফোকাস ফেলে রেখেছিল ছয়ানির বুকোর ওপরে’<sup>৮</sup>। কিছুক্ষণ পর যদিও সেই অফিসার মুখে একটা লালসা মাখা হাসি নিয়ে ফিরে যায়।

‘অল্পসত্র’ গল্পে দেখা যায় নদেরানী স্বামী হারাবার পর বাবু অঘোর হালদারের নজরে পড়ে। অঘোর হালদার নদেরানীকে নিজের অধীনে পেতে চায়। এমন করে সে বহু বিধবা নারীকে নষ্ট করেছে। নদেরানীকেও সেই একই পথে নিয়ে যেতে চায় অঘোর। তাই নদেরানী নিজের মতো করে ধানী ঘাস বা জঙ্গলের কাঠ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে চাইলে সেই পথে বাধা দেয় অঘোর হালদার। নদেরানী জীবিকাহীন হয়ে পড়লে তাকে সরকারি সাহায্যের লোভ দেখায় অঘোর। অঘোর হালদারের কথায় গ্রাম প্রধান একদিন নদেরানীর বাড়িতে যায়। আর ‘নদেরানীকে দেখেই প্রধানের চোখ নেচে ওঠে’<sup>৯</sup>। এরপর থেকে প্রতি সপ্তায় অনিল সামন্তর দোকান থেকে খয়রাতি সাহায্য আনতে বলে প্রধান। নদেরানী নিজেও

শুনেছে যাদের সারা মাসে দশ টাকাও আয় হয় না সংসারে, সরকার থেকে তাদের সাহায্য দেওয়া হয়। আর এ ব্যাপারে নামধাম ঠিক করে প্রধান।

নদেরানী এরপর সাপ্তাহিক সরকারি সাহায্য পেতে থাকলেও বিপদ বাধে বাবু অঘোর হালদার ও তার চামচা প্রধানকে কোনও রকম তোষামোদ না করায়। একদিন নদেরানীকে নিজের ঝুপড়ি থেকে ডাকাতি হতে হয়। রাত গভীর যখন তার দরজায় টোকা পড়ে। সে প্রথমে বুঝতে না পারলেও পরে ঝাপের গায়ের আওয়াজ শুনে সে চমকে ওঠে। আন্তে আন্তে আঙ্গুল দিয়ে ঝাপটি ফাঁক করতেই -

“তিন- চারটি হাত ওর বাহুমূলের নিচ দিয়ে ঘুরে আমচকা ওর সুগোল স্তনের নিচে জোঁকের মতো চেপে ধরে আর তারপরেই ও ফাঁকটি দিয়ে বেরিয়ে যায়।... শূন্য বাঁধের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে যেতে যখন বুঝল সে ডাকাতি হতে চলেছে।... চিৎকার করতে না পেরে অনেক কষ্টে একটা কালচে বাহুতে হুল ফোটায়; মোক্ষম কামড়-! বাহুর মালিকটি আর্তনাদ করে ওঠে ও তাকে আচমকা ছেড়ে দেয়; আর সেই সুযোগেই সে বাঁধেরগা বেয়ে গড়াতে গড়াতে একদম নদীর জলে”<sup>১০</sup>

যদিও নদেরানীর পরে বুঝতে অসুবিধা হয়নি এ কাজ কাদের ছিল। তাই খয়রাতি সাহায্য আনতে গিয়ে লিস্ট থেকে তার নাম বাদ দেওয়ার কথা শুনে, প্রধানের বসে চা খাওয়া খোলা হাতের বাহুতে একটা গভীর অপূরানো ক্ষত চিহ্ন দেখে সে একে একে বুঝতে পেরেছিল বনদপ্তরে তার ধরা পড়া, বাবুর ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, লিস্ট থেকে নাম বাদ যাওয়া। এসবের মধ্যে একটা গভীর যোগসূত্র আছে।

‘মউলে’ গল্পে দেখা যায় ফুলি যখন তার ছেলেটাকে নিয়ে কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করবে তা নিয়ে ভেবে অস্থির। তখন রাতের অন্ধকারে তার ঝাপের দরজায় টোকা পড়ে। ফুলি তখন নিঃশব্দে ঘরে থাকা বাঁটিটা হাতে তুলে নেয়। এরপর চিৎকার করতে যাওয়ার আগেই চৌকিদারের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। এই চৌকিদার হলো সে অঞ্চলের প্রভাবশালী দীনু মন্ডলের এক চামচা। দীনু মন্ডলের নারী চালান ব্যবসা আছে। অঞ্চলের অল্প বয়সী স্বামীহারা মেয়েদের কাজ দেওয়ার নাম করে তাদের কলকাতায় চালান দেওয়া হয়। এরপর আর তাদের খবর পাওয়া যায় না। ফুলি জানে এসব। তাই কাজের কথা বলে বাবু দীনু মন্ডলের বাড়ি ফুলিকে যেতে বললে ফুলি অগ্নিমূর্তি হয়ে বাঁটি সোজা করে দরজার দিকে ছুটে যায়। চৌকিদার ভয়ে পালিয়ে যায়। যদিও গল্পে দেখা যায় ফুলির শেষ রক্ষা হয়নি। সে দীনু মন্ডলের ফাঁদে পড়ে। এরপর তাকেও বন্দী হতে হয় অঞ্চলের অন্যান্য বিধবা মেয়েদের মতো।

এভাবেই স্বামী হারিয়ে নারী যখন নিরুপায় হয়ে পরিবারের কথা ভেবে, নিজের সন্তানের কথা ভেবে নিজেকে জীবনযুদ্ধের সৈনিক করে তোলে। তখন তাকে নানা ধরনের প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। জলে বাগদার মীন ধরে যেমন জীবিকা নির্বাহ করা যায়। তেমনি এ জীবিকায় আছে জীবনের ঝুঁকি। একবার কুমির বা কামটের মুখে পড়লে নিস্তার নেই। জঙ্গলের কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহী আগে সহজ থাকলেও বর্তমান বনদপ্তরের সময়পর্বে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে কঠিনসাধ্য ব্যাপার। সে অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবারে রূপবতী মেয়ের কাজ হয় না। এরকম পরিস্থিতিতে নারী যখন আকাশময় চিন্তায় মগ্ন। তখনও আশপাশের ক্ষমতাবান লোলুপ মানুষদের কাছ থেকে আসতে থাকে নারীর সম্মান রক্ষার চ্যালেঞ্জ। সে চ্যালেঞ্জে যদি অটুট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, চারপাশ থেকে আসতে থাকবে নানা ধরনের

সমস্যা। সরকারি সাহায্য বন্ধ হবে, কাজ পাওয়া যাবে না, রাতের অন্ধকারে ডাকাতি হওয়ার সম্ভবনা ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই পুরুষহীন বিধবা মহিলাদের জীবন সংগ্রাম কতটা কঠোর ও কঠিন হতে পারে তা এই প্রবন্ধ বা শচীন দাশের সুন্দরবন কেন্দ্রিক কিছু গল্প পড়ে আমরা উপলব্ধি করতে পারি মাত্র, তাদের বাস্তব জীবনযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অংশীদার হতে পারি না।

### তথ্যসূত্র :

১. মিত্র, শিবশঙ্কর, 'সুন্দরবনের সততা', 'সুন্দরবন সমগ্র', আনন্দ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৪৩০।
২. দাশ, শচীন, 'হেঁতালের মানুষেরা', 'হেঁতালের মানুষেরা', সুন্দরবন বিষয়ক গল্প সংকলন, সমকালের জিয়নকাঠি, প্রথম প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ২৪৪।
৩. তদেব, পৃ. ২৪৫।
৪. দাশ, শচীন, 'জল-মানুষ, হেঁতালের মানুষেরা', সুন্দরবন বিষয়ক গল্প সংকলন, সমকালের জিয়নকাঠি, প্রথম প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ২৩৯।
৫. দাশ, শচীন, 'সবুজ কাঁকড়া, হেঁতালের মানুষেরা', সুন্দরবন বিষয়ক গল্প সংকলন, সমকালের জিয়নকাঠি, প্রথম প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ২০০।
৬. দাশ, শচীন, 'মউলে', 'হেঁতালের মানুষেরা', সুন্দরবন বিষয়ক গল্প সংকলন, সমকালের জিয়নকাঠি, প্রথম প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ৯০।
৭. দাশ, শচীন, 'হেঁতালের মানুষেরা', 'হেঁতালের মানুষেরা', সুন্দরবন বিষয়ক গল্প সংকলন, সমকালের জিয়নকাঠি, প্রথম প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ২৪৯।
৮. দাশ, শচীন, 'জল-মানুষ, হেঁতালের মানুষেরা', সুন্দরবন বিষয়ক গল্প সংকলন, সমকালের জিয়নকাঠি, প্রথম প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ২৩৯।
৯. দাশ, শচীন, 'অন্নসত্র, হেঁতালের মানুষেরা', সুন্দরবন বিষয়ক গল্প সংকলন, সমকালের জিয়নকাঠি, প্রথম প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ১৪৫।
১০. তদেব, পৃ. ১৪৮।



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 641-648

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.053



## অনিল ঘড়াইয়ের ছোটোগল্পে প্রান্তজনের জীবনচর্যা

সীমা সূত্রধর, স্বাধীন গবেষক, দত্তপুকুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 12.11.2024; Accepted: 26.11.2024; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*While exploring the literature of Anil Gharai, one can clearly notice the author's selective love for the rural towns. The author's preference for the region instead of the township of the center is evident in the naming of several of his stories. The strange lifestyle of the rural towns, the way of life, the ups and downs of their life have been repeatedly represented in his stories and novels. Raised in the warm embrace of rural civilization, Anil Gharai's short stories have become clear in the reformation-culture of the village society, the unique experiential heartbeat of the life and livelihood of the marginal people. 'Pokaparban', 'Bogulahoot', 'Baligarh', 'Jalkumari', 'Chatak', 'Gobrahanu'- short stories have been tried to highlight this heart beat of the life of the marginal people.*

**Keyword:** Livelihood, Poverty, Existence, Scarcity, Social structure.

অনিল ঘড়াইয়ের সাহিত্য পরিভ্রমণ করতে গিয়ে স্পষ্টত লক্ষ করা যায় প্রান্তভূমির জনপদের প্রতি লেখকের নির্বাচন প্রিয়তা। কেন্দ্রভূমির জনপদের পরিবর্তে প্রান্তভূমির প্রতি লেখকের পক্ষপাতিত্ব ধরা পড়েছে তাঁর একাধিক গল্পের নামকরণেই। গ্রামীণ জনপদের বিচিত্র জীবনাচরণ, জীবনভাবনা, তাদের জীবনপ্রবাহের উত্থান-পতন বারংবার প্রতিস্থাপিত হয়েছে তাঁর গল্প-উপন্যাসে। গ্রামীণ সভ্যতার নিভৃত আলিঙ্গনে লালিত অনিল ঘড়াইয়ের ছোটোগল্পে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গ্রামসমাজের সংস্কার-সংস্কৃতি, প্রান্তজনের জীবন-জীবিকার বিচিত্র অভিজ্ঞতাময় হৃদস্পন্দন। অনিল ঘড়াইয়ের ছোটোগল্পে দেখা যায়, প্রান্তজনের সাধারণ জীবনের একটি স্পষ্ট রূপরেখা দিতে গিয়ে লেখক গ্রাম সভ্যতার অন্ধকার কোণ থেকে এমন এমন চরিত্র উন্মোচন করেছেন- যাদের ব্যক্তিনাম, নিতান্ত তুচ্ছ জীবন পাঠককে কৌতূহলী করে। তিনি এমন সব জীবিকার সন্ধান দিয়েছেন যা উন্নত সমাজের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। অথচ প্রান্তজনের জীবন ধারণের জন্য অত্যাৱশ্যকীয় সেই জীবিকাই তাদেরকে স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল দান করেছে, তাদের নিজস্ব আইডেন্টিটির আয়ুধ হিসেবে কাজ করেছে। বিষয়টিতে আলোকপাত করার জন্যে কয়েকটি গল্প অবলম্বন করা হল।

‘পোকাপার্বণ’ গল্পে কৃষিনির্ভর সমাজগোষ্ঠীর পরিচয়ের পাশাপাশি ধরা পড়েছে গ্রামসমাজের একটি ভিন্ন ঐতিহ্যময় জীবিকা- খোলের কারবার। গ্রামের হলু বুড়োর পৈতৃক ব্যবসা এটি। হলু বুড়ো সম্পর্কে লেখকের অভিব্যক্তি,

“হাঁড়িপাড়ায় গোটা বারো চালাঘর, একেবারে টেরের ঘরটা হল হলু বুড়োর খোলঘর। খোলঘরে খোল সারে হলু, তার বয়স পঞ্চাশের ওপরে- দেখলে মনে হয় ঝুঁকো মানুষটা ঘাটের মড়া”।<sup>১</sup>

বংশগত জীবিকা সংরক্ষণে হলু বুড়োর ঐকান্তিক লড়াই, দীর্ঘশ্বাসের অনুরণন লক্ষ্য করার মতো। হলু বুড়োর সংসারে পচা ভাদোদের ধারার মতো ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে অভাব, দারিদ্র্য। তবু হলু বুড়োর জাতব্যবসাপ্রীতি-প্রচেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পঞ্চাশোর্ধ্ব দুর্দান্ত বয়স নিয়েও খোল সারানোর ধৈর্যে হলু বুড়ো অটুট। কেঁচোমাটি সংগ্রহ করা, মাটি পুড়িয়ে গুঁড়ো করে খোলের ‘গাব’ তৈরি করা, পুরনো গাব ঝেড়ে নতুন গাব করে রোদ খাইয়ে ‘লয়’ বেঁধে দেওয়া ইত্যাদি। নানাপ্রকার অভ্যন্তরীণ খুঁটিনাটির পরিচয়ে গল্পটি ধারণ করে আছে গ্রামসংস্কৃতির লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্য। দারিদ্র্যময় জীবনে অভাবের সঙ্গে লড়াই করেও ব্যবসার কাজে অকৃত্রিম আনন্দলাভ, গৌরবান্বিত হওয়া এক স্রষ্টার অনুভূতি প্রদান করেছে হলু বুড়োকে। এ ধরনের জীবন-জীবিকায় হাঁড়িপাড়ার হলু বুড়োর ভাবপ্রকাশ,

“খোল ব্যবসায় আর কিছু না হোক- হাতের কাজ ভাল করলে গ্রামসমাজে খাতির বাড়ে, বাপ-পিতামহের নাম নিজের নামের পাশে পাশে ঘোরে- যা কানে এলে এই বয়সেও মন্দ লাগে না হলু বুড়োর”।<sup>২</sup>

সমাজব্যবস্থা নামক পরিকাঠামোটি তৈরি হয় ভিন্ন ভিন্ন স্তরে নিয়ে। প্রতিটি স্তরে গড়ে ওঠে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা, নির্দিষ্ট প্রণালী। বৃহত্তর অর্থে রাষ্ট্রব্যবস্থা এই সমাজ পরিকাঠামোটির উপর সার্বিক শৃঙ্খলা চাপিয়ে দিলেও আংশিক দৃষ্টিতে প্রতিটি সমাজব্যবস্থায় থাকে ভিন্ন আচরণ। সেই বিচিত্র সমাজব্যবস্থার, বিশেষত প্রান্তিক স্তরের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে অনিল ঘড়াইয়ের সাহিত্যে। প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রার স্বরূপ উন্মোচন করতে গিয়ে লেখক বিচিত্র জীবিকার সন্ধান দিয়েছেন, জীবিকানির্ভর বিচিত্র জীবনযুদ্ধের পরিচয় দিয়েছেন। ‘বালিগড়’ গল্পে পৌঁছে সমুদ্র তীরবর্তী প্রান্তিক মানুষের এক নিষিদ্ধ জীবিকা পালনের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। বালিগড় নামক আঞ্চলিক শব্দেই অনুমান করা যায় জীবিকাটির স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল। কচ্ছপ ধরা বা খাওয়ার ব্যাপারে যেখানে কড়াকড়িভাবে সরকারি নিষেধাজ্ঞা বলবৎ, সেখানে দিঘার সমুদ্রতটে গোপনে রমরমিয়ে চলছে এ ব্যবসা। শীতের রাতে সাইকেল চেপে বহুদূর পেরিয়ে ব্যাঙার মতো মানুষকে এ প্রতিযোগিতায় সামিল হতে হয়, জেলে নৌকাগুলো তীর ছোঁয়ার আগেই ছুঁড়াছড়ি করে দখল নিতে হয় মালের। তারপর পুলিশ- প্রশাসনের চোখ এড়িয়ে, কখনও জরিমানা, কখনও বা প্রহারের বিনিময়ে কারবার করতে হয় বালিগড়ের। বালিগড়ের মতো অপ্রতুল প্রাণী চোরাচালানে জীবনের ঝুঁকি থাকে বিস্তার। পুলিশি নির্যাতনের ভয়-আতঙ্ক নিয়ে, শীতের রাতের গভীর কষ্ট স্বীকার করে অস্তিত্বের লড়াই করতে হয়েছে ব্যাঙাকে।

“পৌষ মাসের শীতও তার কাছে কাবু। জলো হাওয়া-বাতাস সব তার কাছে একটিপ নসিয়া। গায়ে একটা ফিনফিনে জামা। জামার নীচে সঁপড়ির বুনে দেওয়া জালি গেঞ্জি। খুব বেশি হলে কানটা ঢাকার জন্য একটা মাফলার। সেটাও সঁপড়ির বোনা”।<sup>৩</sup>



প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষ এরকম নানা অপ্রচলিত জীবিকাকে আঁকড়ে ধরেছে জীবনযাপন প্রতিপালনে। বালিগড়ের মতো অমূল্য প্রাণী চালান করে ব্যাঙারা সম্পদশালী হতে পারে না, দৈনন্দিন স্বচ্ছলতা লাভ করে মাত্র। বালিগড় সম্পর্কে ব্যাঙার অভিমত,

“খাসি তিরিশের কম নয়, শুয়োর আঠারো থেকে কুড়ি। সস্তা বলতে বালিগড়। লোকে খাচ্ছে ভালো”।<sup>৪</sup>

ঝুঁকি নিয়ে নামা এ কাজের বিনিময়ে রক্ষিত হয় মাত্র প্রান্তজনের দৈনন্দিন জীবনবৃত্ত। গল্পের শুরুতেই লক্ষ্য করা যায় ব্যাঙার বিপদগ্রস্ত পরিস্থিতি। চোরাপথে বালিগড় আনতে গিয়ে তার কোণঠাসা পরিণতি,

“সাইকেলের পেছনের কেরিয়ারে চটের ছালায় মোড়া আছে বালিগড়, দূর থেকে দেখে মনে হয় কাঁচা আনাজের ঝুড়ি। কিন্তু পুলিশটার নজর এড়াল না। হিড়হিড়িয়ে হাত ধরে টেনে আনল ব্যাঙাকে। কষে পিছনে ঘাকতক রুলের বাড়ি। বাপরে, মারে চিল্লিয়ে উঠল শীতকনকনে ব্যাঙা, ছাড়ি ওগো বাবু, তুমার দুটা গোড়তোল পড়ি গরীব মানুষ মুই। এই করিকি খাইটি। ভাতে মারবনি গো, তুমার মা-বাপের দিব্যি”।<sup>৫</sup>

জীবনকে বাজি রেখে এভাবে প্রতিনিয়ত প্রতিপালিত হয় অসংখ্য প্রান্তিক মানুষের জীবন। এ ধরনের অপ্রচলিত জীবিকা গ্রহণের ক্ষেত্রেও আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্য করা যায় তাদের অসাধারণ জীবনীশক্তি, অদম্য সাহস, মানসিক প্রশান্তি। বালিগড় ধরা থেকে শুরু করে কাটার মতো অস্বস্তিকর ক্ষেত্রেও ব্যাঙা একইভাবে সিদ্ধহস্ত। গা-হাত-পা মাখা জ্যাবজ্যাবে রক্ত নিয়েও ব্যাঙা আত্মতুষ্টি লাভ করেছে কর্ম স্বাধীনতায়। ব্যাঙার অনুভূতিতে ধরা পড়েছে,

“ইম্পাতের ধারালো ফলায় টুকরো টুকরো বালিগড়। চিকচিক কাগজে রক্তের থোক থোক ফুল। মাংসগুলো হাওয়া লাগা পলাশ ফুলের মতো নড়ছে”।<sup>৬</sup>

সাদা গেঞ্জিতে লেগে থাকা রক্তের ছিটে, মুখের চারপাশে ছিটকে আসা রক্তের জমাটি, মাছির ভনভনানি- ইত্যাদির সঙ্গে সহজেই মানিয়ে নিয়েছে ব্যাঙা।

জীবন-জীবিকার এক বিচিত্র পরিচয় নিয়ে উত্থাপিত হয়েছে ‘জলকুমারী’ গল্পটি। জীবনধারণের জন্য প্রান্তিক মানুষ কত যে করুণ পরিস্থিতির শিকার হতে পারে, অতি সাধারণ কাজের জন্যও চরম আশাবাদী হয়ে ওঠে; ‘জলকুমারী’ তার অন্যতম নজির। চূড়ান্ত অভাবগ্রস্ত পরিবারে যেখানে একের বেশি পোশাকের স্বচ্ছলতা নিতান্ত অকল্পনীয়, শিক্ষার পর্যাণ্ড সুযোগ যেখানে মেলে না, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনওরকমে দিনপাত হয়, সেখানে জলদানের মতো সামান্য কাজও স্বপ্ন সঞ্চারণ করেছে সরলার কাছে।

“জীবিকা নির্বাহের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র আর্থিক অভাব দূরীভূত হয় না, অনেক স্বপ্নপূরণও হয়, জীবনে সম্মান ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। জীবিকাহীনতা মানবজীবনে বেকারত্বের অভিশাপ ও জীবন সংকটকে ডেকে আনে। ধনী থেকে নির্ধন প্রত্যেকে জীবিকা নির্বাহ করে জীবনকে পরিচালিত করে। কিন্তু জীবন ও জীবিকার দ্বন্দ্ব, জীবিকার জন্য কঠিন সংগ্রাম দরিদ্র মানুষদেরই জীবনে লক্ষ্য করা যায়”।<sup>৭</sup>

মাইতিবাবুর সুপারিশে পাওয়া রেলবাবুদের জল দেওয়ার কাজটি মহামূল্য লাভ করেছে সরলার অভাবী সংসারে। মাসের সামান্যতম পারিশ্রমিক দিয়েই অভাবী সংসারের দৈন্য মোচনের স্বপ্ন দেখেছে সরলা।

মায়ের পুরোনো, নোংরা, ফেঁসে যাওয়া শাড়ির পরিবর্তে একটা নতুন কালোপেড়ে শাড়ি ও ভাইয়ের জন্য ন্যূনতম দামের রোদচশমা কেনার আনন্দঘন শিহরণে বিভোর হয়ে থাকে সে। সামান্য উপার্জনেই পৃথিবী জয়ের আত্মশক্তি লাভ করে। চূড়ান্ত অভাবী জীবনযাপনে যে অসহায়তা, মানসিক শূন্যতা প্রতি মুহূর্তে তৈরি হয় প্রান্তিক জীবনে; জীবিকার অভাব সেখানে অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। মাকে কেন্দ্র করে সরলার অভিব্যক্তি,

“মাঝে মাঝে তার যে কি হয় সে নিজেও জানে না। মায়ের দুঃখ-দুর্দশার কথা তার বেশি করে মনে পড়ে। জ্ঞান বাড়ার পর থেকে মাকে সে হাসতে দেখেছে কম দিন”।<sup>৮</sup>

সরলা বা আশালতার এই দুঃখী মনের ভরকেন্দ্র জীবিকার নির্ভরতায় পরিবর্তিত হয় সাহসী যোদ্ধার ভূমিকায়। সরলা তার কাজের আয়ু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। বর্ষা এলেই মেয়াদ ফুরোবে তার কাজের। এই স্বল্পমেয়াদি কাজেই সবসময় সতর্ক থাকতে হয় তাকে কাজের নৈপুণ্য নিয়ে, সবসময় অনুগত থাকতে হয়েছে, বকুনি-শাসন শুনতে হয়েছে। তবুও এই গৌণ কাজের সহায়তায় স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে সরলা, আত্মবিশ্বাসী হয়েছে। প্রান্তিক জনসমাজের মধ্যে বিচরণ করে অনিল ঘড়াই এরকম অসংখ্য গৌণ জীবিকার সন্ধান, জীবিকাকে কেন্দ্র করে তাদের মানসিক দোলাচলতা, স্বল্পময় জীবনগঠনের পরিচয় উদ্ভাসিত করেছেন তাঁর গল্প-উপন্যাসে।

অনিল ঘড়াই শহর থেকে নগর, নগর থেকে আস্তাকুঁড় কিংবা গ্রামের অভ্যন্তরে সর্বত্রই ব্রাত্য, অবহেলিত, পিছিয়ে থাকা জনজাতির জীবনযাত্রার স্থূল আবরণ সরিয়ে পুঞ্জানুপুঞ্জ নগররূপ তুলেছেন তাঁর সাহিত্যে। প্রান্তবর্তী মানুষগুলোর বেঁচে থাকার দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমস্তটাই দায়বদ্ধতার সঙ্গে ছন্দোবদ্ধ করেছেন তিনি। ‘বগলাছট’ গল্পটি অনুরূপভাবে আস্তাকুঁড়ে জীবনের চলমানতাকে বহন করেছে সাবলীলভাবে। গল্পটির নামকরণই দাবি করে গরিব-গুরবোকে প্রদেয় কুখাদ্যের শিরোনাম- ‘বুলগার ছইট’। এ গল্পটিতে দেখা গেল, একমাত্র খাদ্যের দাবিতে পরিচালিত হয়েছে জীবন-যৌবন, চিন্তা-চেতনা, নীতি-নৈতিকতা। খাদ্যের বাইরে অন্যমাত্রিক আবেদন সাড়া ফেলতে পারেনি আস্তাকুঁড়নির্ভর ভিখিরি জীবনে। দারিদ্র্যের মাত্রা কতখানি তীব্র হতে পারে, তাদের জীবনযাত্রার ধরনই বা কীরকম- তার নমুনা হয়ে আছে ‘বগলাছট’। দিনযাপনের দায়ভারে দারুণভাবে অবনত গংগার পরিবার, কুড়ুনীর পরিবার। কুড়ুনী-গংগার দশ ও চোদ্দ ছাড়া নো উর্বর সময় বিক্রীত হয়েছে দারিদ্র্যের কাছে। খিদে অবরোধ করেছে প্রান্তবাসী ভিখিরি জীবনের বিকাশ। গংগার মানসিক জগৎ অধিকার করে নেয় লড়াই করে বেঁচে থাকার তত্ত্ব। গংগার দৃষ্টিপাত আষ্টেপৃষ্ঠে থাকে হাসপাতালের খাবার-ঘরের সামনে পোড়া কয়লার ছাই-টিপিটার কাছে। কখন শুকনো বেগুন, মুলো, পচা পচা দু’চারটে কাঁচা লঙ্কা পাওয়া যাবে তার সম্ভাবনায় সচেতন থাকে গংগা। কারণ সপ্তাহ শেষে রিলিফবাবু ওখানেই পচা-ভ্যাবসা মালগুলো ফেলে দিয়ে যায়। তখনই শুরু হয়ে যায় বেঁচে থাকার অধিকার, সংগ্রামের ইতিহাস। গংগার শৈশব এভাবেই শিখেছে অস্তিত্ব রক্ষার আদব। ফলে কারো ক্ষমতা নেই গংগার কাছ থেকে একমুঠো খাবার ছিনিয়ে নেওয়ার। গংগার ভদ্রতাবোধ সন্ত্রম হারিয়ে তখন নগ্ন। গালিগালাচে দশদিক আঁধার করে গংগা এভাবেই প্রতিনিধিত্ব করেছে প্রান্তবাসী জীবনের।

গংগা ও কুড়ুনীর মনের আবেগ, সৌন্দর্যবোধ, নান্দনিকবোধ বাস্তব জীবনের অন্ধকারকে অতিক্রম করে কল্পনার কুহকীজাল নির্মাণ করতে চাইলে সেটি প্রতিহত হয়েছে মানবেতর জীবন-যাপনের প্রাত্যহিকতায়। স্বপ্নবিন্যাসে আপ্ত গংগা। অথচ, এই গংগা-কুড়ুনীর দৈনন্দিন যাপিত পৃথিবীর কদর্য মাটিতে। দুপুরবেলায় না

খেয়ে থাকার অভিজ্ঞতায় বড়ো হয়েছে গংগা। পোয়াটাক চাল মা-বেটিতে ভাগাভাগি করে খেয়েছে তারা। সঙ্গে পাড়ার কানাই মোড়লের বেড়ার ধারে পড়ে থাকা হাড় লিকলিকে মরাটে কুমড়োলতি ভাজা। হরসময় পড়ে পড়ে ছিন্ন হয়ে যাওয়া বস্ত্রটুকুই একমাত্র সম্বল কুড়ুনীর কা ছে। মালবাবুর অশালীন আচরণকে প্রশ্রয় দিয়েই গংগা আদায় করেছে মাত্র দু'হাতা তেল খলথলে খিচুড়ি। বাপের অক্ষমতায় কুড়ুনী দেখেছে সংসারের দুর্দান্ত অক্ষমতা। গংগার বাপের পরিচয় চোর। গংগাকে সমবয়সী পরিমণ্ডলে ডাকা হয়- চোরের বিটি। ফলে মনঃকষ্টে, ঘণায় গংগা কাটাতে থাকে অস্বাস্থ্যকর জীবন।

‘বগুলাছট’ গল্পটি এভাবে সমাজের নিচুতলার, প্রান্তজনের নিঘূণ্য জীবনের চলচ্চিত্রই হয়ে ওঠেনি, ধরা পড়েছে ঐ সমাজের সদ্যপ্রাপ্ত যৌবনের নিহত প্রতিধ্বনি, বেঁচে থাকার ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস।

পেটের দায়ে নিচু হয়ে থাকা, সভ্যতার চলমান কক্ষের এককোণে অপাঙ্ক্বেয় হয়ে থাকা মানুষগুলোর মানবেতর জীবন প্রণালী দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে অনিল ঘড়াইয়ের ছোটোগল্পে। বশীভূত করতে না পারা পেটের দায়ে বাপ-ঠাকুরদার শেখানো নৈতিকতার বোধকে বিসর্জন দিয়ে চুরির পথ বেছে নিয়েছে ‘চাতক’ গল্পের বুড়ো। একসময় গ্রামের মুরুন্দি হয়ে চুরির অপরাধে নিতাইকে বিচার করেছিল যে বুড়ো, সে-ই মাত্র দু’একটি ডাবের জন্য লোলুপ হয়ে উঠেছে অবস্থাবিশেষে। রক্ত পায়খানা-বমিতে কাবু শরীরের সামর্থ্য অর্জনে ডাক্তারবাবুসহ পারিপার্শ্বিকজন পরামর্শ দিয়েছে ডাব পানের জন্য। ফলে হাসপাতালের কড়া কড়া ওষুধ, ইনজেকশনে ঘায়েল বুড়ো অসহায় আর্তের মতো নির্বাচন করে নিয়েছে অসৎ পস্থা। পরিস্থিতির তীব্র প্রতিকূলতা এভাবে প্রান্তজনকে বাধ্য করেছে নৈতিক স্থানচ্যুতিতে।

ডাব খাওয়ার তীব্র লালসা ও অনিবার্যতা নিয়ে বুড়োর মধ্যে যে চরম মানসিক দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়, ফলস্বরূপ প্রান্তবর্গীয় সমাজে বার্ধক্যের চূড়ান্ত দৈন্যদশা প্রকট হয়ে উঠেছে গল্পে। গাঁ-ঘরে একষট্টি বছর অতিবাহিত করেছে সে। অথচ একটা ডাবের অধিকারও জন্মায়নি তার। যে ডাব-নারকেল পেড়ে একসময় বাবুদের কাছে বাহবা কুড়িয়েছিল সে, সেই একটা ডাবের অপ্রাপ্তিতে তার বেঁচে থাকার উদ্যম, জীবনীশক্তিই শুধুমাত্র নিঃশেষিত হয়নি, পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর প্রতি বিশ্বাসবোধ, ভালোলাগাটাই ফিকে হতে থাকে। টিউবওয়েলের পাশে পড়ে থাকা কাটা ডাব, কলের জলের স্পর্শে তার অতিরিক্ত সজীবতা, শিশিরসিক্ত হয়ে ডাবের তরতাজা সৌন্দর্য প্রকাশ- এভাবে সময়ের পালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে কাটা ডাবের রূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে বুড়ো। ফলে অপ্রাপ্তির আর্তিতে প্রতিটি মুহূর্তে বিক্ষুব্ধ হয়েছে তার বেঁচে থাকার প্রবণতা।

বার্ধক্য বিনষ্ট করেছে সম্পর্কের বুনিয়াদকে। প্রান্তবর্গীয় সমাজে সম্পর্কের সুতো শিথিল হয়েছে বার্ধক্যে, অভাবে, স্বার্থসুরক্ষায়। সন্তানের সঙ্গে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের প্রায়শই বিচ্ছেদ ঘোষিত হয়েছে এই সমাজের সীমারেখায় দাঁড়িয়ে। ভিন্ন হয়ে যাওয়া ছেলের প্রতি বাপের প্রতিক্রিয়া,

“ছেলের নিন্দে শুনতে কার ভালো লাগে? ছ্যাকা তো নিজের গায়েই লাগে। এ যেন উপর দিকে খুতু ছুঁড়ে দেওয়া। বাপ-ছেলের সম্পর্কটা এখন পোড়া বিড়ির চেয়েও খারাপ।”\*

গল্পে বাপের অসুস্থতায় কর্ণপাত করেনি বেচা। হাসপাতালে দেখতে যাওয়া তো দূরের কথা, বাড়ির গাছের দুটো ডাবও সে বরদাস্ত করেনি বাপের জন্য। প্রান্তবর্গীয় সমাজে বাপ-মায়ের প্রতি সন্তানের সম্পর্কের এই অবক্ষয় আরও প্রান্তিক করেছে বার্ধক্যকে। ফলে বার্ধক্যে পরাজিত প্রান্তজন দৈনন্দিন পদানত

হয়েছে সম্পর্কের কাছে, নিত্য অভাব-অভিযোগে। গল্পে প্রকাশ পেয়েছে বুড়োর অসহায় মানসিক পরিস্থিতি,

“পিচবোর্ডের চেয়েও শক্ত পেটটা বড় অবাধ্য তার। বেহিসেবী। খালি যখন তখন খিদে পাইয়ে দেয়।”<sup>১০</sup>

গল্পে আশ্চর্য শিল্পময়তার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে খিদের বাস্তব স্বরূপ। হাসপাতালের অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে বৃদ্ধের যে ছবি দেওয়ালে ফুটে উঠেছে, সেখানে পাওয়া যায় গর্তে ঢোকা পেটের ছবি। বৃদ্ধের নিজস্ব আইডেন্টিটির পরিবর্তে ক্ষুদার্ট পেটের দাবিটিই সর্বগ্রাসী পরিণতিতে প্রকাশ্যমান হয়ে উঠেছে। পেটের দাবিতেই বিষ্ণুপদবাবুর বাড়ির পেট ফুলে মারা যাওয়া ছাগলটিকে ভাগাড়ে বিসর্জন দিতে পারেনি বৃদ্ধ। ঠ্যাং উল্টানো ছেরানো ধাড়ীটাকে বাড়িতে এনে যত্ন সহকারে কেটে রান্না করে একাই খেয়েছে দু’সের মাংস, খলখলে চর্বি, মেটে। দীর্ঘদিন মাছ-মাংসের অনটনে ভোজবাড়ির মতো রসিয়ে রসিয়ে রেঁধে খেয়েছে রোগগ্রস্ত ছাগলটিকে। জীবনের সুরক্ষার পরিবর্তেও জীবনের স্বাদ বেশি মহার্ঘ্য হিসেবে পরিচালিত করেছে প্রান্তজনকে, ফলস্বরূপ গল্পে দেখা যায় বৃদ্ধের শোচনীয় অবস্থা। হাসপাতালে কাঁচকলা সহযোগে শিঙি মাছের ঝোল ও ভাত দেওয়া হলে বুড়োর প্রতি বুড়ির সাবধানবাণী -একটু সামলে-সুমলে খাওয়ার জন্যে। অভাবী জীবনে খাওয়ার প্রবল প্রত্যাশায় যে চূড়ান্ত পরিণতি ঘটতে পারে, তার ফলস্বরূপ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে ‘চাতক’ গল্পটি। খাওয়ার প্রতি প্রান্তজনের প্রত্যাশাটাই নামকরণেও শৈল্পিক দাবি অধিকার করেছে গল্পে।

‘গোবরাহনু’ গল্পটি জীবিকার বিশেষত্ব ও মানবিকতার পরিচয়ে উদ্দীপ্ত একটি অসাধারণ গল্প। প্রান্তজনের জীবনচর্যায় মনোনিবেশ করলে একটি সাধারণ চিত্র প্রায়শই লক্ষ্য করা যায় - অনেকক্ষেত্রেই কর্মে পুরুষের নিষ্ক্রিয়তা, প্রবল দারিদ্র্যেও সংসারে তাদের উদাসীনতা, সংসারে মেয়েদের হাল ধরা, বাইরে কাজে যাওয়া, সঙ্গদোষে পুরুষের নেশাভাঙ গ্রহণ এবং পারিবারিক কলহ। অনিল ঘড়াইয়ের একাধিক গল্প সহযোগে ‘গোবরাহনু’ গল্পের প্রথমমাংশেও এই চিত্রটিই ধরা পড়েছে। ক্রমে গল্পের উত্তরণ স্তরে এসে দেখা যায় চিত্রবদল। ময়নার শাসন-পীড়নে গোবর কাজে অংশগ্রহণ করে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় চরিত্রের নাম পরিচয়। প্রান্তিক সমাজে এই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের নামের চরিত্রেরা নির্ধারণ করে দেয় তাদের অতি নগণ্য জীবনধারণের চালচিত্রকে। গোবর দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের অগ্নিময় জ্বালা-হতাশা পেরিয়ে ময়নার প্রেরণায় গাছ ঝোড়ার কাজে লেগে পড়ে। গাছে চড়ার দক্ষতা দেখে একসময় লোকে তাকে ঠাট্টা করে ‘লেজছাড়া হনু’ নামে আখ্যায়িত করেছিল, সেই উপাধিভূষণকে কাজে লাগিয়েই গাছ ঝোড়ার কাজে মনোনিবেশ করছে সে।

“লোকের কথা শুনে উৎসাহের ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠত বুকের ভেতর। গাছে চড়ে সে কসরৎ দেখাত বাঁদরের মতো, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে লাফ দিত এক ডাল থেকে আর এক ডালে। তার রোগা-প্যাটকা শরীরটা সরু ডালে দিব্যি মানিয়ে যেত, কখনো ডাল ভেঙে নীচে পড়ত না ধুপ করে। নীচে দাঁড়িয়ে যারা দেখত ভয়ে রক্ত হিম হয়ে যেত তাদের”।<sup>১১</sup>

গাছে চড়ার দক্ষতা দেখেই একসময় প্রেম নিবিড় হয় ময়না ও গোবরের মধ্যে। গাছে চড়ার কাজে বিপজ্জনক ঝুঁকি থাকলেও তাকে তোয়াক্কা না করেই সাহসী যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে গোবর। প্রান্তিক জনজীবনে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যে জীবিকার উপরেই তারা নির্ভরশীল হোক না কেন, সেটি যতই

সাধারণ হোক, কাজের প্রতি তাদের একনিষ্ঠতা-সততা। গাছ ঝোড়ার কাজে গোবর সামাজিক সম্মান বা স্বীকৃতি পায়নি বটে, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে তার আত্মমগ্নতা, আনন্দলাভ অনন্য স্থান অধিকার করেছে। গোবরের অনুভূতিতে,

“যখন ওপর পানে চড়ছি তখন নজর আমার ওপর পানেই থাকে। যার একবার ওপর পানে নজর যায়- সে কোনোদিন নীচে তাকায় না। ওপরে ওঠার নেশাটাই আলাদা। এ আমি তোমাদের ঠিক বোঝাতে পারব না। সুপরিগাছের শির ছুঁলে ওই আকাশ আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে গো। তার ডাক আমি শুনি। আমার তখন নেশাখোর মানুষগুলোর মতো অবস্থা। কিছুতেই নিজেকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারি না। উঁচা উঁচা গাছগুলোও যে আমাকে তাদের নিজেদের লোক বলেই ভাবে”।<sup>১২</sup>

গাছ ঝোড়ার কাজে গোবরের এই অনির্বচনীয় আনন্দের পাশাপাশি তার এবং ময়নার মানবিক বোধের সজীবতা অনন্য মাত্রা দিয়েছে তাদের চরিত্রধর্মে। মেয়ের অসুস্থতার দিনে কুণ্ডুমশাইয়ের কাছে দুটো ডাব চেয়ে সাহায্য পায়নি গোবর, উপরন্তু অপদস্থ হয়েছে। আবার গাছ ঝোড়ার দিনে সন্দেহ প্রবণতায় কুণ্ডুমশাই নজরদারি চালিয়েছে গোবরের উপর। অথচ কুণ্ডুমশাইয়ের অসুস্থতার দিনে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে কুণ্ডুমশাইয়ের ছেলে এসে পৌঁছায় গোবরের কাছে। রাতবিরেতে ডাব পেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব নাকচ করে প্রতিশোধস্পৃহা পূরণ করতে চাইলেও পরমুহূর্তেই ময়নার প্রেরণায় মানবিক বোধ ফিরে পায় গোবর। গভীর অন্ধকারেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধারকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করে সে। গল্পের শেষে বলা হয়েছে,

“অন্ধকার পথে নেমে এসে গোবরের মনে হয় মানুষের জীবনে কোনো কিছুই বুঝি বৃথা যাবার নয়। যে কাজকে প্রথমে সে ঘৃণা করত, এখন সেই কাজকেই সে ভালোবাসতে শিখেছে। তাই এই হিম আঁধারে পথ চলতে তার কোনো ভয় করে না”।<sup>১৩</sup>

উচ্চসমাজের উপেক্ষা, বিদ্রোহ, জীবনের হতাশা, হীনম্মন্যতা, অভাব পেরিয়ে প্রান্তজনের এই অসাধারণ মানবিক ভূমিকা, কাজের বৈচিত্র্য, একাগ্রতা প্রান্তজনকে চিহ্নিত করেছে স্বতন্ত্র হিসেবে। উপরোক্ত গল্পগুলি ছাড়াও অনিল ঘড়াইয়ের আরও একাধিক গল্প যেমন- ‘কাকমারা’, ‘ভোটবুড়া’, ‘হাত’, ‘জার্মানের মা’, ‘পুনশচ পরশুরাম’, ‘পিণ্ডি’, ‘চৌকিদার’, ‘হাতিছাপ’, ‘খরার আকাশ’, ‘ইলিশ’, ‘ছবি’, ‘বন্যার নদী’, ‘ভুমিপুত্র’, ‘ঘাসমুখ’ ইত্যাদি ছোটোগল্পে প্রান্তজনের জীবন-জীবিকা উন্মোচনে অপরিহার্য।

**তথ্যসূত্র:**

- ১। ঘড়াই, অনিল, 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ৬৬।
- ২। ঘড়াই, অনিল, 'পরীযান ও অন্যান্য গল্প', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০০, পৃ. ২৮৩।
- ৩। ঘড়াই, অনিল, 'অন্ত্যজ প্রেমের গল্প', কলকাতা, আধুনিক পুস্তক প্রকাশন, ২০০৯, পৃ. ২৬।
- ৪। ঐ, পৃ. ২৭।
- ৫। ঐ, পৃ. ৩০।
- ৬। ঐ, পৃ. ২৮।
- ৭। সরকার, প্রভাতচন্দ্র (সম্পা), এবং আলোচনা, (বাংলা উপন্যাসে জীবন ও জীবিকা), প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, অক্টোবর, ২০২২, পৃ. ৭৭।
- ৮। ঘড়াই, অনিল, 'অন্ত্যজ প্রেমের গল্প', কলকাতা, আধুনিক পুস্তক প্রকাশন, ২০০৯, পৃ. ২২৪।
- ৯। ঘড়াই, অনিল, 'পরীযান ও অন্যান্য গল্প', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০০, পৃ. ৫৮।
- ১০। ঐ, পৃ. ৬৭।
- ১১। ঘড়াই, অনিল, অনিল ঘড়াইয়ের ছোটোগল্প, কলকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৫, পৃ. ২৭।
- ১২। ঐ, পৃ. ২৯।
- ১৩। ঐ, পৃ. ৩৬।



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 649-659

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.054



## অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে সংস্থান

উর্বা মুখোপাধ্যায়, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 15.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*The special role of setting in the discussion of the novel can be seen from the beginning of the novel. Just as the discussion of how and in what order the story of a narrative will be organized belongs to the plot, so does the resource to clarify the geographical location of that story or event. The author places the characters of his story in a particular environment with respect to a particular period. We consider setting as 'text without story duration'. That is, as the presence of setting in the text can be direct or indirect, mobility or spatiality can also be the characteristics of resources. In fact, it all depends on the author's writing style and perspective. Setting in general refer to the natural geography of an area, its surrounding environment and climate. Not only the natural, but also the cultural geography of the region. Settings often play the role of symbols in narratives. Forests, seas, deserts, paths, flowers, even the light of the sunrise and the darkness of the sunset, replace their external meaning in the narrative with a search for a different meaning. In this essay we have tried to discuss the diversity of application of settings in some of Amiyabhushan Majumder's novels and its relevance in narrative with examples. Nature has always added a different dimension to Amiyabhushan's composition. His characters seem to have formed themselves by being united with nature. Amiyabhushan loved to paint, so the diversity of his use of color in describing setting is particularly noticeable.*

**Keyword:** narrative, setting, character, symbol, novel.

উপন্যাস এমন একটি শিল্প মাধ্যম, যাকে সমালোচকেরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে চলেছেন। সাহিত্যতত্ত্বের বিভিন্ন ধারায় চলে তার পর্যালোচনা - তেমনই একটি ধারা হল আখ্যানতত্ত্ব। উনিশ শতকের সূচনা থেকে উপন্যাস তত্ত্ব তার যাত্রাপথ শুরু করলেও, বিশ শতকের মাঝামাঝি পরবে এসে তা পূর্ণতা পায় 'আখ্যানতত্ত্ব' নামক প্রস্থানের মধ্যে দিয়ে। আখ্যানের তাত্ত্বিক কাঠামোটি গড়ে ওঠে প্রপ, বাখতিন, লেভি স্ট্রাস, বার্ত, জেনেত, তোদোরভ, স্ট্যানজেল প্রমুখের হাত ধরে। এঁদের আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পায় আখ্যানের গঠন সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা। আখ্যান গঠনে প্রাধান্য পায় প্লট, সংস্থান, সময় ও চরিত্র। কোনো আখ্যানের কাহিনি কীভাবে, কী প্রণালীতে বিন্যস্ত হবে সে সংক্রান্ত আলোচনা যেমন প্লটের অন্তর্গত, পর্ব-১, সংখ্যা-৩, জানুয়ারি, ২০২৫

তেমনই সেই কাহিনি বা ঘটনার ভৌগোলিক অবস্থানকে স্পষ্ট করার দায়িত্ব সংস্থানের। লেখক তাঁর কাহিনির চরিত্রদের এক বিশেষ সময়কালের সাপেক্ষে এক বিশেষ প্রতিবেশে স্থাপন করে থাকেন। সংস্থান বর্ণনাকে আমরা ‘text without story duration’ হিসেবে ধরে থাকি। আখ্যানতত্ত্বে ‘setting’-এর বাংলা পরিভাষা করা হয় সংস্থান বা প্রতিবেশ। সাহিত্যে সংস্থান বলতে বোঝায় কাহিনি বা ঘটনাটি কোথায়, কখন সংঘটিত হচ্ছে অর্থাৎ কাহিনির স্থান ও কাল বিষয়ক আলোচনা করা হয় সংস্থানে। সংস্থান প্রধানত আখ্যানের অধিগঠনে বা সারফেস স্ট্রাকচারে প্রাধান্য পায়।

সংস্থান উপন্যাস ও নাটকে বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। আখ্যানে সংস্থানের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির মধ্যেই তার চরিত্ররা তাদের কল্পিত-জীবন যাপন করে। আখ্যানে সংস্থান দুটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এক, আখ্যানে বস্তুগত বাস্তবের একটি স্পষ্ট পটভূমি নির্মাণ করে বাস্তবকে দৃঢ়তা দেয়। দুই, সংস্থান পাঠকৃতির ভাববস্তু সঙ্গ্রে সংলগ্ন হয়ে তাকে প্রতীকী অর্থ প্রদান করে। সংস্থান সংক্রান্ত আলোচনায় বলা যায়, আখ্যানের বিষয়গত বিন্যাসের পার্থক্যের সঙ্গ্রে সঙ্গ্রে সংস্থানও বদলে যায় “setting may be textually prominent or negligible, dynamic or static, consistent or inconsistent, vague or precise, presented in an ordinary fashion... or a disordinary one.” (Prince, 1982:73) অর্থাৎ পাঠকৃতিতে সংস্থানের উপস্থিতি যেমন প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ হতে পারে তেমনই গতিশীলতা বা স্থানুত্বও হতে পারে সংস্থানের বৈশিষ্ট্য। আখ্যানের বিষয়ের সঙ্গ্রে তা যেমন সংগতিপূর্ণ হয়, কখনো আবার তাকে খাপছাড়া বলেও মনে হতে পারে। আসলে সবই নির্ভর করে লেখকের রচনাশৈলী তথা দৃষ্টিভঙ্গির উপরে। কেননা তিনিই ঠিক করেন, সংস্থানকে গুরুত্ব দেবেন কিনা, দিলে কখন কতটা দেবেন।

সার্বিকভাবে সংস্থান বলতে কোনো অঞ্চলের প্রাকৃতিক ভূগোল, তার চারপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতি ও আবহাওয়াকে বোঝায়। শুধু প্রাকৃতিক নয়, অবধারিতভাবেই চলে আসে সেই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ভূগোলের প্রসঙ্গও। আখ্যানের কথক বর্ণনার মধ্য দিয়ে সংস্থানের বিবরণ দিয়ে থাকেন। অবশ্য অনেক সময় চরিত্রের কথোপকথনের মধ্য থেকেও কোনো স্থান সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আখ্যানে বর্ণিত চরিত্রের আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, জীবনধারণ পদ্ধতি অনেকাংশেই পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অরণ্য, পাহাড়, নদী, উপত্যকা অঞ্চল পৃথক পৃথক ভাবে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। তাদের জীবনের চাহিদা, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশাও নিয়ন্ত্রিত হয় পরিবেশ দ্বারা। যেমন নদী বা সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার মানুষের জীবিকা হিসেবে প্রাধান্য পায় মাছ ধরা বা ফেরি পারাপার করার মত পেশা। আবার অরণ্য অঞ্চলের মানুষের জীবনে শিকার, বন্য ফল সংগ্রহ, গাছ কাটা প্রধান জীবিকা হয়ে ওঠে। আখ্যানে যে অঞ্চলের কথা বলা হয়, সে অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, তাদের সার্বিক সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস এই সব কিছুই আবার সংস্থানের সঙ্গ্রে একাত্ম হয়ে তার অংশ হয়ে পড়ে। শরৎচন্দ্রের ‘পল্লীসমাজ’, কমলকুমারের ‘অন্তর্জলীয়াত্রা’য় বিশেষ সময়ের প্রেক্ষাপটে গ্রাম বাংলার সমাজচিত্র উঠে এসেছে। আবার সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘টোঁড়াইচরিত মানস’এ কিংবা অমিয়ভূষণের ‘হলং মানসাই উপকথা’য় যোগাযোগের মাধ্যম স্বরূপ রাস্তা নির্মাণ, ব্রিজ তৈরি কিংবা ধানী জমির হাতছাড়া হওয়ার ফলে পেশা পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে মানুষের জীবনধারা।

সংস্থান অনেক সময় আখ্যানে প্রতীকের ভূমিকা পালন করে থাকে। অরণ্য, সমুদ্র, মরুভূমি, পথ, পুষ্পোদ্যান এমনকী সূর্যোদয়ের আলো আর সূর্যাস্তের অন্ধকারের বিবরণও আখ্যানে তার বাহ্যিক অর্থের পরিবর্তে এনে দেয় এক ভিন্নতর অর্থের সন্ধান। অমিয়ভূষণের ‘মহিষকুড়ার উপকথা’তে মানুষের অবচেতন



মনকে প্রতীকায়িত করে অরণ্য। বিভূতিভূষণের ‘আরণ্যক’এ দেখি দিগন্ত বিস্তৃত অরণ্য কথক সত্যচরণের জন্য এক অপার সৌন্দর্য ও এক অজানাকে নিয়ে যেন অপেক্ষা করছিল। পথ দ্যোতিত করে গতিময়তাকে, যার কুশলী প্রয়োগ দেখি অভিজিৎ সেনের ‘রহু চণ্ডালের হাড়’এ। সুখী দাম্পত্য বা পারিবারিক ছবি ফুটিয়ে তুলতে সাজানো সুসজ্জিত বাগান এবং ব্যক্তিমানুষ তথা পরিবারের সার্বিক অসুখে সেই বাগানের শুকিয়ে যাওয়া, বিবর্ণ ও মলিন হয়ে যাওয়ার প্রতীক তো আমরা ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ থেকে ‘মালঞ্চ’এ বারবার দেখেছি। (মুখোপাধ্যায়, ২০১৫:১৪)

লেখক প্রধানত দৃশ্যপট নির্মাণের সাহায্যে কোনো অঞ্চলের সঙ্গে তার পাঠকের পরিচয় করিয়ে থাকেন। অর্থাৎ চিত্রকল্প নির্মাণ হল এক্ষেত্রে তার একমাত্র অবলম্বন। দৃশ্য নির্মাণের পাশাপাশি ইন্দ্রিয় নির্ভর অন্যান্য অনুভূতি অর্থাৎ শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ও ঘ্রাণের সাহায্যও তিনি নিয়ে থাকেন তার রচনার সংস্থানকে বাস্তবায়িত করে তুলতে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নির্মিত সংস্থাকে লেখক জীবন্ত করে তুলতে চান, যার মধ্য দিয়ে রচনার প্রেক্ষাপট নামক জড় বস্তুটিও সজীব হয়ে ওঠে।

২

অমিয়ভূষণ তাঁর একাধিক উপন্যাসে সংস্থানকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর ‘মহিষকুড়ার উপকথা’, ‘দুখিয়ার কুঠি’, ‘বিনদনি’, ‘মাকচক হরিণ’, ‘হলং মানসাই উপকথা’ ও ‘সোঁদাল’ এর মত একাধিক উপন্যাসেরই পটভূমি হল উত্তরবঙ্গের দিগন্ত বিস্তৃত অরণ্যের কোলে লালিত ছোটো ছোটো গ্রাম। যেগুলো সভ্যতার স্পর্শে ক্রমে আধুনিক শহরের চেহারা নিতে শুরু করেছে। আমরা এই নিবন্ধে দেখব কীভাবে অমিয়ভূষণ তাঁর উপন্যাসে সংস্থান নির্মাণ করেছেন এবং তা ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে কতটা সাযুজ্যমণ্ডিত হতে পেরেছে।

‘মহিষকুড়ার উপকথা’, ‘দুখিয়ার কুঠি’ ও ‘হলং মানসাই উপকথা’ উপন্যাস তিনটি নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা যাক। অমিয়ভূষণ উপন্যাসের নামকরণেই আঞ্চলিকতাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ‘মহিষকুড়ার উপকথা’ হল মহিষকুড়া নামক এক অঞ্চলের মানুষের কাহিনি। এ কাহিনি শুরু হয়েছে মহিষকুড়ার অতীত ইতিহাস দিয়ে এবং গ্রাম্যতাকে ত্যাগ করে মহিষকুড়া এগিয়ে গেছে যন্ত্রসভ্যতার দিকে। তাই এর নামকরণেও ‘উপকথা’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ঠিক একইভাবে ইতিহাসের হাত ধরেই উত্তরের হলং ও মানসাই নদীর তীরের মানুষের জীবনের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে ‘হলং মানসাই উপকথায়। অন্যত্র ‘কুঠি’ শব্দটাই প্রমাণ করে ‘দুখিয়ার কুঠি’র প্রাচীনতাকে, যাকে আশ্রয় করে বা বহন করে সেই গ্রামও পা বাড়িয়েছে আধুনিকতার দিকে।

তিনটি উপন্যাসের শুরুতেই ঔপন্যাসিক দীর্ঘ পরিসর ব্যয় করেছেন সংস্থান বর্ণনায়। ‘দুখিয়ার কুঠি’র সূচনাতে যদিও লেখক বলে দিয়েছেন যে, এই উপন্যাসের পটভূমি কাল্পনিক এবং তাকে বিশ্বস্ত করতেই আঞ্চলিক কথ্যভাষার ব্যবহার। কিন্তু উপন্যাস পড়তে পড়তে কখনোই মনে হয় না তার কাল্পনিকতার কথা। বরং তাকে অনেক বেশি বাস্তবিক মনে হয় - “ভূমিকায় এইটুকু বলা উচিত যে উপন্যাসটির সমস্ত ঘটনাই কল্পনাপ্রসূত। এমনকি কোনো বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলকেও পটভূমি হিসেবে নির্দিষ্ট করা উচিত হবে।” কিন্তু লেখক সচেতনভাবে যে প্রতিবেশকে উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন তার কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল -

“মহকুমা সদর গদাধরপুর। শহরের লোকসংখ্যা পাঁচশো ছিয়াত্তর। ...

শহরের একখানা বাঁধানো পথের দৈর্ঘ্য আধ মাইল পরিমাণ। লাল সুরকি পথ বেমেরামতের ফলে ঝামা ও ইটের টুকরোয় খরখরে। ...

স্কুল নেই, চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই, কিন্তু বেশ্যালয় আছে। ...

ধুলো ধুলো ধুলো। বর্ষার দুমাস পর থেকে ধুলো শুরু হয়ে ক্রমশ সেটা বাড়তে থাকে। ... তারপর আসে বর্ষা। কাদা কাদা। ....

কেন এই শহর তৈরি হয়েছিল এ নিয়ে নানারকমের মত আছে। ...

তথাপি একটা শহর বিশ-ত্রিশ বছর ধরে টিকে গেলে আশা করা যায় হয়তো সেটা আরো কিছুদিন বেঁচে থাকবে।... গদাধরপুর তার যৌবনদশার দিকে এগোচ্ছে। এ ধরনের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে পিচ ঢালা পথ দিয়ে সদর মহকুমার সঙ্গে গদাধরপুরকে সংযুক্ত করার চেষ্টা...”

(দুখিয়ার কুঠি, পৃ. ১৯-২০)

এরপরই লেখক দুখজাগানিয়ার কুঠি, যার চলতি নাম দুখিয়ার কুঠি ও তৎসংলগ্ন গদাধর নদীর নাম সংক্রান্ত কিছু তথ্য দিয়েছেন। সেইসঙ্গে দুখিয়ার কুঠির বেদনাবহুল অতীত ইতিহাসকেও সংস্থান হিসাবে তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে লেখক পুনরায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দিয়েছেন কীভাবে ধানজমির পাকা ফসলকে নষ্ট করে নতুন পিচের সড়ক সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রথম পরিচ্ছেদে ভগ্নদশাপ্রাপ্ত যে গদাধরপুরকে আমরা পাই, উপন্যাস যত অগ্রসর হয়েছে তার বর্ণনায় পরিবর্তন এসেছে। এখনকার গদাধরপুর আর আগের মত নেই। সভ্যতার অগ্রগতি যে গদাধরপুরের চেহারাতেও বদল এনেছে, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলছেন-

“ক্রেতা-বিক্রেতায় মিলে চারশো লোক জমা হতো। ...আগে সপ্তাহে একদিন হাট বসত।

এখন সপ্তাহে দুদিন তো হাট হচ্ছেই, আর একদিন বসতে পারলে যেন ভালো হয়। ...

গোঁসাইদের দুটো দোকানের চেহরাই বদলে গেছে। ...হাটবার বলে কথা নয়, রোজই তাদের দোকানে শ্রমিকদের ভিড়। ...

নতুন দোকান উঠেছে একটি। ...মদ, গাঁজা ও আফিম বিক্রি হয়।” (দুখিয়ার কুঠি, পৃ.৪৯)

অরণ্য-প্রকৃতি অমিয়ভূষণের উপন্যাসে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা মূলত আদিবাসী হওয়ায় এবং উত্তরবঙ্গের অরণ্যবহুল অঞ্চলে বাস করায়, প্রকৃতি তাদের আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। অরণ্যকে বাদ দিয়ে তারা নিজেদের অস্তিত্বকে ভাবতে পারে না। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই সংস্থান হিসেবে অরণ্য-প্রকৃতির শান্ত-শ্লিষ্ণ রূপ, তার ত্রুরতা, তার নৃশংসতা - সব কিছুই স্থান পেয়েছে উপন্যাসে। উপন্যাসের উনিশ পরিচ্ছেদে কাঁকরু ও মাতালু দুই বন্ধু তাদের মনের গভীর হতাশাকে দূর করতেই আশ্রয় নেয় অরণ্যের গভীরতায়। আর অরণ্যও যেন মাতালুর বেদনাকে আত্মীকৃত করে দুঃখী হয়ে ওঠে।

“মাতালু তার বাটুল নিয়ে ফিরে এল। কিন্তু বলল, তাহলে কাঁকরকে একা যেতে দেবে না, সেও সঙ্গে যাবে।...

‘জঙ্গল? কেনে তোর দুখ কী?’ ... ..

... যেহেতু মাতালুর মনে অশান্তি ছিল তা থেকে অনুমান হয়, সে হয়তো একটা কিছু অবলম্বন হিসেবে খুঁজছিল। আর অরণ্যের নিস্তরুতায় বোধ হয় শান্তির একটা রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; সে

রূপ আদিম হতে পারে, তবু মানুষের ইতিহাসে দেখা যায় সুদূর অতীত থেকেই অরণ্যস্তরুতার প্রতি তার একটা আকর্ষণ আছে।” (দুখিয়ার কুঠি, পৃ.৯৪)

পুনরায় -

“আকাশে আলো আর মেঘ, হলুদ আলো আর সাদা মেঘ। খুব ভালো করে দেখলে মেঘ যেখানে ভাঙচুর হয়ে সেখানে কখনো হালকা নীল, কখনো হালকা কমলা রং চোখে পড়তে পারে। এতক্ষণ নদীর ওপারের শহরের আলোগুলো মিটমিট করে জ্বলছিল দিগন্তে। এখন তাও নেই। এ কী রকম নীরস, জীবনহীন, অপয়োজনীয় আলো?” (দুখিয়ার কুঠি, পৃ. ৯৫)

“স্নিগ্ধ রাত্রিতে ভেজা ভেজা সবজে আলোতে শান্ত গাছগুলো বিশ্রাম করছে। আর তিনটি ঘর্মান্ত মানুষ দুই দলে ভাগ হয়ে এক নির্বোধ খেলায় হিংস্র হয়ে উঠছে।” (দুখিয়ার কুঠি, পৃ. ৯৭)

“এক অদ্ভুত, অপ্ৰাকৃত ব্যাপারই যেন। এই আলোটা, এটা শেষ রাতের চাঁদের অথবা প্রথম সকালের সূর্যের তাও বোঝা যাচ্ছে না। ... বালি আর জল সমান চিকচিক করছে সেই অপার্থিব বিবর্ণ পাণ্ডুর আলোতে।” (দুখিয়ার কুঠি, পৃ. ১০০)

শান্ত, স্নিগ্ধ প্রকৃতি ক্রমে অপ্ৰকৃত হতে উঠতে শুরু করে। মানুষের অবস্থার বদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও যেন তার রূপ বদলে ফেলেছে। অমিয়ভূষণের এই গভীর নিরীক্ষণের প্রকাশ আমরা দেখি ‘মহিষকুড়ার উপকথা’ উপন্যাসেও। সেখানেও প্রকৃতি বা অরণ্য যেন মানুষের মনের অবচেতন অংশ। সে যেন মনের না-বলা অব্যক্ত কথা, অব্যক্ত বেদনার সাক্ষ্য বহন করছে সে। এই উপন্যাসের শুরুতেও লেখক দীর্ঘ অংশ জুড়ে মহিষকুড়া নামক গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান এবং মহিষকুড়া নামের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

“আমরা মহিষকুড়া গ্রামের কথাই বলছি, কিন্তু বনের কথা এসে গেল, কারণ বন থেকে এই সব গ্রামকে আলাদা করা যায় না।” ... “এই মহিষকুড়া, কিংবা ভোটমারি, অথবা তুরুককাট গ্রামগুলোকে: তারা যেন বনের কোলে ঘুমায়, বনের বুকে খেলা করে, দুঃখে বনের বুকে মুখ রেখে কাঁদে।” (মহিষকুড়ার উপকথা, পৃ. ২৪০)

বন ও মানব-মনের যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তাকেও লেখক সংস্থান বর্ণনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন-

“বনে ক্রীড়াশীল হরিণ-হরিণী যেমন আছে, তেমন, মুহূর্তে সে ক্রীড়াকে বিভীষিকায় পরিণত করে গ্রীবা কণ্ঠনের আদর আনত, তাকে তীক্ষ্ণ দাঁতে চিরে রক্তপান করে এমন বাঘও আছে, বাস-ট্রাকের শব্দে অপমানিত বোধ করে ডালপালা ভেঙে গুঁড় তুলে ছুটে চলা হাতীর দল আছে। ... অরণ্য সম্বন্ধে নানারকম কথা যে মনে হয়, ... তার কারণ বোধহয় এই যে, সে বরং অবচেতন মনের মতো। ... এসব মিলে যেন একটাই মন, বন যে মনের অবচেতন অংশ। আর তা যদি হয়, তবে মহিষকুড়ার মতো গ্রামগুলি অস্ফুট আবেগের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে।” (মহিষকুড়ার উপকথা, পৃ. ২৪০)

আসফাকের জীবনে নারীসঙ্গ প্রথম আসে কমরুনের নৈকটে আসার দরুণ। প্রকৃতির কোলেই তাদের প্রথম পরিচয় ও মিলন। লেখক তাদের প্রথম মিলনের বর্ণনা করে বলেছেন -

“বিস্ময়ের মতো শোনালেও জন্মদিরদ্র আসফাক সেই প্রথম এক রত্ন দেখেছিল। নীলাভ বেগুনী রঙের মতো মেঘ-মেঘ পাহাড়ের কোলে সবুজ মেঘ-মেঘ মাথা। ... সেই নদী যেখানে সবুজে-নীল মেশানো, কখনও বা মোষ-রঙের পাথরের আড়ালে বাঁক নিয়েছে, সেখানে সকালের চকচকে আলোয় নিরাবরণ এক বাঁকে, ভরা জলে চকচকে মেয়েমানুষের শরীর। তা এখন শাড়ীতে ঢাকা আছে বটে। কিন্তু কী এক সর্বগ্রাসী মাধুর্য কমরুনের মুখে, তার কপালে, .... আধবোজা চোখদুটিতে, যার কোণে হাসি জড়ানো মনে হয়।” (মহিষকুড়ার উপকথা, পৃ. ২৬৯)

আবার ‘হলং মানসাই উপকথা’ উপন্যাসের প্রথমেই লেখক হলং ও মানসাই নদীর উৎস, তার প্রবাহ ও গতিপথের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন। লেখক সংস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে বারবার বলেছেন -

“আসল কথা, কি ভূগোল, কি ইতিহাস নিয়ে বেশ গোলমালই আছে।” (হলং মানসাই উপকথা, পৃ. ১৫)

কিংবা

“তাহলে তো ইতিহাস নয়, ভূগোল বদলায়।” (মাকচক হরিণ, পৃ. ২৫২)

সেই ভূগোল এবং ইতিহাস - দুইই পাশাপাশি স্থান করে নিয়েছে তাঁর সংস্থান বর্ণনায়। হলং ও মানসাই নদীর কাছাকাছি গ্রাম উখুণ্ডী, যার ভগ্নদশা থেকে শুরু করে ক্রমপরিবর্তমান রূপের বিবরণ দিয়েছেন বিস্তারিতভাবে। -

“দেখতে দেখতে সে গ্রাম শহর হয়ে ওঠার ঝাঁক নিয়ে বসল। কারণ একটাই, সড়কটা দিক বদলে হলং-এর দিকেই খানিকটা সরে এসেছিল, ...। দেখতে দেখতে গ্রামের চাষের জমিতে করাতকল, ধানকল, গম ভাঙানোর কলের চাকি বসে গেল; ছোট ছোট বয়লার তাদের। আর পরের পর ইলেকশন হতে থাকলে একটা স্কুল, পঞ্চায়েত অফিস, পুলিশের পাকাপোক্ত তাম্বু, একটা হেলথ সেন্টার।” (হলং মানসাই উপকথা, পৃ. ১৬-১৭)

সংস্থান বর্ণনার ক্ষেত্রে অমিয়ভূষণের এক বিশেষত্ব হল - তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থির পটভূমি নির্মাণ করতেন না। প্রতিবেশ বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি চলমান দৃশ্য নির্মাণের প্রতি তাঁর ঝাঁক বেশি। ‘বিনদনি’, ‘মাকচক হরিণ’ উপন্যাস দুটির পটভূমি একই স্থানের। রায়ডাকের তীরে শালবাড়ি অঞ্চলের তল্লিগুড়ি গ্রামের কাহিনিই বর্ণিত হয়েছে। ‘বিনদনি’ উপন্যাসে তল্লিগুড়ির যে পটভূমি তৈরি করা হয়েছে, ‘মাকচক হরিণ’ এ তার দু’ বছর পরের পরিবর্তিত চেহারাকে পটভূমি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। সংস্থান বর্ণনায় কিছু তফাৎ তাই লক্ষ করা যায়।

“সম্ভবত এই গাছজোড়া থেকেই গ্রামের নাম তল্লিগুড়ি। প্রধান গ্রামও ছিল বোধহয় - সে জন্যই গাঁয়ের দুপাশে লাগা আর দুটো গ্রামকে অন্দরম তল্লিগুড়ি ও বাহির তল্লিগুড়ি বলা হচ্ছে। ... এখন অবশ্য তল্লিগুড়ির কোনোদিকে কোনো প্রাধান্য নেই। বরং মরা-রায়ডাক আর রায়ডাকের মধ্যে বাহির তল্লিগুড়ি, যার পূর্ব অংশ দিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে প্রায় রায়ডাক বরাবর, সেটা এত প্রধান যে তার নাম নগর রাখতে হয়েছে। প্রমোদনগর, শহর না হয়ে যায়!” (বিনদনি, পৃ. ৮৫)

অন্যত্র -

“গুড়ি এখন প্রধান গ্রাম নয়। বরং মরা-রায়ডাক আর রায়ডাকের মধ্যে বাহিরগুড়ি, যার পূর্বপ্রান্ত দিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে, সেটা এত প্রধান যে তার নাম নগর, প্রমোদনগর। পইলা পমোদনগর, তা

থাকি অ্যালা আমোদনগর। নগর নাম বলেই নয়। ... গত দু-বছরের মধ্যে আমোদনগরে পাকা দেওয়ালের বাড়িতে ক্লাস এইটের স্কুল।” (মাকচক হরিণ, পৃ. ২৪৫)

পরিবর্তনের চেহারা হরিতলার বর্ণনাতেও ধরা পড়েছে। ‘বিনদনি’তে হরিতলার বর্ণনায় পাই -

“হরিতলাতে আর একটা চায়ের দোকান চোখে পড়ল, আর যেখানে হরিতলা হাটতলায় মিশেছে, সেখানে বেশ কয়েকটি দোকান। ...একটির গায়ে ছোট একটা সাইনবোর্ডে ‘রয়্যাল সেলুন’ লেখা আছে। দোকানগুলিতে খড়ের ছাদ, বাঁশ-চাচাড়ির বেড়া। খুব নতুন নয়। ...তাহলেও পাঁচ বছর আগে হাটের দিন ছাড়া একটা দোকানও বসত না।” (বিনদনি, পৃ.১১৩)

সেই হরিতলার বর্ণনা আরও দু’বছর পর পাই -

“...এখন পাকাপাকি হয়ে যাচ্ছে। আরও চায়ের দোকান। একটা জামাকাপড়ের দোকান। চায়ের দোকানের পাশে স্ত্রুপাকারে চায়ের পাতা, ডিমের খোলা। ... হাটতলার মাঝামাঝি পথের ধারে আকরাম ছুটির দিনে একটা-দুটো খাসি-বকরি জবেহ করত। ভিড় লেগে যায় মাংস কিনতে।” (মাকচক হরিণ, পৃ. ২৫০)

৩

অমিয়ভূষণ সংস্থান বর্ণনাকে শুধুই প্রকৃতির বিবরণ হিসেবে রেখে দিতে চাননি। তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা যেন প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা এক একটি জীবন্ত সত্তা। তিনি রাভা জনগোষ্ঠীর কথা বলতে গিয়ে তাঁর ‘বিনদনি’ ও মাকচক হরিণ’ উপন্যাসে এমন একটি বিষয়ের উপস্থাপনা করেছেন যার সঙ্গে প্রকৃতির একাত্ম সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অমিয়ভূষণ রাভাদের মধ্যে প্রচলিত নানাবিধ সংস্কারের কথা বলতে গিয়ে একটি বিশেষ প্রথার কথাও আলোচনা করেন - ‘চিকাবাইরাই’। ‘বিনদনি’ উপন্যাসের শুরুতে লেখক চিকাবাইরাই প্রসঙ্গে বলেছেন -

“অনেক ব্যাপার আছে, যার কারণ খুঁজে কোনোদিনই পাওয়া যায় না, অনেক মানুষ আছে, যার বীজের ঠিকানা শুধু মা-ই জানে।” (বিনদনি, পৃ.৮৬)

বীজের এই ঠিকানাই হল ‘চিকাবাইরাই’। বুদিনাথের ভাষায় -

“এটা এমন গোপন যা শুধু রাভা মেয়েরাই জানিতে পারে। রাভা মেয়েরা নিজের মিত্তুর আগে নিজের কন্যার কানে কয়া দেয়। অন্য কারো জানা দূরে থাক, নিজের স্বামী, ভাই, ছেলেকেও বলে না রাভা মেয়েরা। ... মানুষ, মানি রাভার আত্তা কোনো নদী, পাহাড়, ঝোরা-ঝন্না, বড় গাছ এসবকে অবলম্বন করিয়া মার শরীরে ঢুকে। মিত্তুর পর যেটে থাকি আসছিল, সেটে যায়। বাঁচি থাকিতে থাকিতে মানুষ ভুলি যায় কোটে থেকে আসছিল। সেজন্য মিত্তুর সময় বলি দেওয়া হয়, কী তার চিকাবাইরাই, কোনো শক্তি তার জন্ম। কিন্তু গোপনে কানে কানে। চিকাবাইরাই শুনি আত্তা নিজের জায়গা ফিরি যায়।” (বিনদনি, পৃ.৯২)

অমিয়ভূষণ উপন্যাসে ‘চিকাবাইরাই’ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রাভাদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী ছিল - গ্রামের বাইরের বড় বড় পাথরের চাঁইগুলো হল যুদ্ধে মারা যাওয়া রাভা মানুষের আত্তা। যুদ্ধের সময় কেউ তার আত্তার সদগতির কথা বলেনি - তাই তারা পাথর হয়ে গেছে। উপন্যাসে দেখি, শ্যামচাঁদের ঠাকুরদার ‘চিকাবাইরাই’ হল ‘ললৎহাচু’ অর্থাৎ ভাস্বর এক পাহাড়। বিন্দের আত্তা উজ্জ্বল বর্ণা

থেকে এসেছিল। তার ‘চিকাবাইরাই’ হল - ‘ললৎ চিকা’। রাভা পুরুষ এই অদৃশ্য আত্মাকে ভয় পায়। প্রত্যেক রাভার ‘চিকাবাইরাই’ থাকবেই।

যে অরণ্য সম্পদে একদিন অরণ্যচারী জনগোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকার ছিল, তাকে খর্ব করেছে সভ্যসমাজের মানুষেরা। ফলে স্বাধীনভাবে জীবনযাপনকারী অরণ্যের আদি বাসিন্দারা ক্রমে পরিণত হয়েছে শ্রেণি-চরিত্রে - খেটে খাওয়া মজুরদের। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলেও, অরণ্যের কাছে ফিরে যাওয়ার কোনও পথ নেই, কেননা আসফাকের মতো আজ অনেকেই জানে -

“তা আসফাক এই পৃথিমিতে যত জমি দেখ, তা সবই কোনো-না কোনো জাফরের। ... বন তো শুনি এক মালিকের। তা তুমি যত দূরে যেখানে যাও বনে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবে সেই বনও, যাকে তুমি নতুন মনে কর, তাও সেই মালিকের।”(ম.কু.উ. পৃ.৫০)

আসফাক, মাতালুর মতো রাভা জনগোষ্ঠীর মানুষেরাও অরণ্যের সঙ্গে আত্মার যোগ অনুভব করত। রাভা গ্রাম গড়েই উঠেছিল অরণ্যকে কেন্দ্র করে। রাভা পুরুষের সত্তার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে অরণ্য। অমিয়ভূষণ এই সত্যতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন কীভাবে অরণ্যের বিলুপ্তি রাভা জনগোষ্ঠীর মানুষের জীবনে সংকটকে ঘনীভূত করেছিল। রাভা সমাজ-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ছিল অরণ্য। রাভা জমিতে মেয়েরা চাষ দেবার পর, শিকার ছাড়া রাভা পুরুষের আর কোনও কাজই থাকে না। শিকারেই পুরুষের পৌরুষত্ব। রাভা জমিকে বন্য পশুর হাত থেকে রক্ষা করাও ছিল রাভা পুরুষের কাজ -

“কী করবে, কেন, তোমরা রাভার বেটা? রাভার বেটির নয় তো ধানখেত থাকিল। হাঁতি আইসে, রুখিবে? ভৈষী ঢোকে ধানখেতৎ, পেনটি ধরি টানো? বুনা শুয়োর আইসে ধানবাড়ি? বন কোটে?”  
(সোঁদাল, পৃ.৮২)

মোন্নাত, মলগুঁ উভয়েই জানে বন্য শুয়োর, হাতি, মোষ কোনও বন্যজন্তুই আর রাভা জমিতে ধান খেতে আসে না। কারণ দিগন্তবিস্তৃত সুগভীর অরণ্য আর নেই। কাঁটাতারের বেড়ায় সে আবদ্ধ। আর বন না থাকলে রাভা পুরুষের কোনও কাজই অবশিষ্ট থাকে না। ‘রিজার্ভ ফরেস্ট’-এ অনুমতি লাগে প্রবেশ করতে, শিকার করা তো দূরস্ত। এছাড়াও রাভা স্ত্রীর মৃত্যু হলে রাভা পুরুষেরা শ্বশুরবাড়িতে থাকে না। কারণ রাভা নারী মারা গেলে পুরুষ জমিহারা হয়, তার তখন থাকে শুধু - ‘বন’ ও ‘দাও’ (দাঁ)। তাই জনের মায়ের মৃত্যুর পর তার পিতা বনে চলে গিয়েছিল বনসাহেবের চাকরি নিয়ে, নতুবা তার বনে প্রবেশের কোনও অধিকার নেই। তবুও রাভা পুরুষের অন্তর বারবার ধাবিত হয় অরণ্যের দিকে। যেমনটা হয়েছিল জন ও বোমভোলার। ডাকহরকরা বোমভোলা ছুটি পেলেই ছুটে যায় বনে - চৈ, মেটে আলু সংগ্রহের অজুহাতে। হয়তো কখনও বনে কোনও বন্য জন্তুও সে পেয়ে যায়।

অমিয়ভূষণ রাভা পুরুষের অন্তরের দ্বিধাময়তাকে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন অরণ্য ছাড়া রাভা পুরুষের অস্তিত্বও বিপন্ন। তারা ক্রমেই আশ্রয়হীন হয়ে পড়ছে। একদিকে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পরিবর্তন এবং অন্যদিকে প্রগতিশীল মানুষের অরণ্যের উপর অধিকার - এ দুইই যেন রাভা পুরুষকে দিশেহারা করে তুলেছে। তারই অপর উদাহরণ ‘বিনদনি’ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র জন। সে একসময় স্ত্রীর মৃত্যুর পর আসামে চলে যায়, কারণ বনে প্রবেশের অনুমতি তার ছিল না। কিন্তু দীর্ঘ পাঁচ বছর পর গ্রামে ফিরে সে যখন তার শাশুড়ির জমি রক্ষার তাগিদে সরকারী কর্মচারীকে খুন করে তখন সে শেষবারের মতো

বনের কোলে আশ্রয় নিতে চায়। যে বিনদনি তার শাশুড়ি, যাকে সে একদিন ‘কিলাংনানি’ প্রথার আশ্রয় নিয়ে স্ত্রী হবার জন্য অনুরোধ করেছিল, সেই বিনদনির কাছে তার করুণ আর্তি শোনা যায় -

“চলো পালাং, চলো। ...সে বিনদনির হাঁটুতে মুখ রাখল, আচ্ছা, আচ্ছা, নো-হয়ত আমার মাও হন। মাও হয় বনং চলেন।”  
(বিনদনি, পৃ.১৪৭)

অমিয়ভূষণ জন, বোমভোলা, আসফাক-এর অরণ্যের প্রতি এই তীব্র আকর্ষণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, -

“কবিতা করে বলতে, বনের টান রক্তে, নাকি বিজ্ঞান করে বলতে ডি-এন-এ’র অসন্তোষ?”  
(বিনদনি, পৃ.১৩৫)

8

সংস্থান বর্ণনায় উপন্যাসগুলোতে বিভিন্ন স্থানের ব্যবহার করা হয়েছে। তার মধ্যে অধিকাংশ স্থানই ভৌগোলিকভাবে বাস্তবসম্মত। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার বিভিন্ন স্থান তাঁর উপন্যাসে পটভূমি হিসেবে এসেছে। রায়ডাক নদী, মানসাই নদীর কথা আমরা পাই উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ইতিহাসেও। উপন্যাসগুলির সংস্থান হিসেবে এসেছে গ্রাম-জীবন। গ্রামজীবনের সঙ্গে যুক্ত নানান প্রসঙ্গ যেমন - কৃষিকাজ, বাথান, হাট-বাজার, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কথা এসেছে। গ্রামজীবন থেকে ক্রমে যন্ত্রসভ্যতার দিকে ধাবিত হয়েছে পটভূমি। যন্ত্রসভ্যতার অনুষ্ঙ্গ হিসেবে এসেছে - কলকারখানা, রাস্তা তৈরি, ব্রিজ তৈরি, ইটভাটার প্রসঙ্গ। আছে স্কুল, কলেজ-এর কথা, ভোট, হাসপাতালের প্রসঙ্গও এসেছে, যা সংস্থানকে বিশ্বস্ত করেছে। নিচে একটা সারণীর সাহায্যে দেখা যাক কোন উপন্যাসে কোন সংস্থান কীভাবে এসেছে।

উপন্যাস	প্রতিবেশ	স্থান নাম	গ্রাম্য অনুষ্ঙ্গ	অরণ্যের অনুষ্ঙ্গ	আধুনিক সভ্যতার অনুষ্ঙ্গ
মাকচক হরিণ	গ্রাম ও শহর	প্রমোদনগর (বাহিরগুড়ি), সেরফাংগুড়ি, মেচপড়, তল্লিগুড়ি, বুড়ির হাট, মহকুমা সদর, গান্ধীনগর, সোনামালা, গৌহাটি (আসাম)	পঞ্চায়েত প্রথা, পঞ্চায়েত অফিস আধিয়ার, বর্গা দার ধানজমি, টিউবওয়েল	শালবন	ডাক ব্যবস্থা, ইলেকট্রিক, ন্যাশনাল হাইওয়ে, পাকা বাড়ি, মাধ্যমিক স্কুল, জলের মেশিন
হলং মানসাই উপকথা	নদী, গ্রাম, শহর, বন	হলং ও মানসাই নদী মনসাইঘাট, হলং বন, উখুণ্ডি গ্রাম, ফালাকাটা, ধুপগুড়ি শহর, আসাম, শালবাড়ি, পলাশবাড়ি	হেলথ সেন্টার (ডাক্তার, নার্স, কম্পাউন্ডার)	বন, বাঘিনী	ভোট ব্যবস্থা, ড্রামাটিক ক্লাব, ফ্যান্টরি

সৌদাল	বনশহর ,	মরুচমতী (নদী), তুরুককাটা (শহর), ডাউকিমারি (ব্লক), হাতকাটা, হাদলমারি, লাউতামা	-	রিজার্ভ ফরেস্ট, সৌদাল গাছ, শটী বন, পানি কচু, শোল কচুর খেত	ভোট, ইলেকট্রিসিটি, হাইস্কুল, কলেজ, সমাজভিত্তিক বনসৃজন, ইটভাটা, অফিস, রাইফেল
মহিষকুড়া র উপকথা	গ্রাম ও অরণ্য	মহিষকুড়া গ্রাম, সলসলা বাড়ি [কোচবিহার শহরের কাছাকাছি] তুরুককাটা, ভোটমারি, শালবাড়ি-র নাম এসেছে	মোষের বাথান, তামাক খেত, ধান খেত, গরু গাড়ি, পঞ্চগয়েত প্রথা, খামার বাড়ি, হাট, ধান মাড়াইয়ের জায়গা	বন্যপথ, বন্যমহিষ, বাইসন, গভীর জঙ্গল, যাযাবর জীবন শালের জঙ্গল, চৈ, খরগোশ, বনমোরগ	কোর্ট, রেডিও, ট্রাক, বাস
দুখিয়ার কুঠি	গ্রাম, শহর, অরণ্য ও নদী	গদাধরপুর (মহকুমা সদর), দুখিয়ার কুঠি (গ্রাম), গদাধর (নদী), রাজধানী (কোচবিহার)-এর উল্লেখ আছে	নদীতে সাঁকো, ধানখেত, গোয়ালঘর, হাট, কাদা- ধুলো	নদীর ধারে জঙ্গল, জঙ্গলে বরা শিকার, নামহীন ঘন জঙ্গল, চোরাবালিতে ভর্তি	কোর্ট, পাকা সড়ক, ব্রিজ নির্মাণ, আফিম, মদের দোকান, ট্রাক, গ্রামোফোন, একসাইজ বিভাগ
বিনদনি	গ্রাম, শহর, নদী, বন	তল্লিগুড়ি (বাহির ও অন্দর), বাহির তল্লিগুড়ি বা প্রমোদনগর (শহর), মিশন হাউস (গোপালনগর), এছাড়া কলিগুড়ি, শালবাড়ি, মাকালগুড়ি, বুড়ির হাট-এর নাম আছে। কামাগুড়ি, বারুহাট, নদী-রায়ডাক, মরা রায়ডাক, বুড়া- রায়ডাক	হাট, হরিঘর, চাষের খেত, প্রাথমিক স্কুল, গোয়ালঘর, খড়ের গাদা, মাটির বাড়ি	বুড়া রায়ডাকের পাড়ে খণ্ড শালবন, মাটিয়া আলু, চৈ, বন্য শুয়ার, বাইসন	ন্যাশনাল হাইওয়ে, ডাকবাহক, রেডিও, আদালত, থানা, পুলিশ, ট্রাক, বনসাহেব, রাইফেল



**তথ্যসূত্র:**

- 1) মজুমদার, অমিয়ভূষণ, দুখিয়ার কুঠি, ‘অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র’ (৩য় খণ্ড), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫।
- 2) মজুমদার, অমিয়ভূষণ, মহিষকুড়ার উপকথা, ‘অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র’ (৬ষ্ঠ খণ্ড), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮।
- 3) মজুমদার, অমিয়ভূষণ, বিনদনি, ‘অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র’ (৭ম খণ্ড), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯।
- 4) মজুমদার, অমিয়ভূষণ, হলং মানসাই উপকথা, ‘অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র’ (৮ম খণ্ড), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০।
- 5) মজুমদার, অমিয়ভূষণ, সোঁদাল, ‘অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র’ (৮ম খণ্ড), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০।
- 6) মজুমদার, অমিয়ভূষণ, মাকচক হরিণ, ‘অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র’ (৮ম খণ্ড), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০।
- 7) মুখোপাধ্যায়, উর্বী ও চট্টোপাধ্যায়, অনুনয় (সম্পা), ‘বাংলা সাহিত্যে সমুদ্র’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৫।
- 8) Bal, Mieke, ‘Narratology: Introduction to the Theory of Narrative’, University of Taranto Press, London, 1999.
- 9) Chatman, Seymour, Story and Discourse, Cornell University press. London, 1980.
- 10) Prince, Gerald, Narratology, Mouton Publication, New York, 1982.



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 660-669

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.055



## স্যাফো সই-কথা ও কয়েকটি বাংলা উপন্যাস

ড. প্রীতম চক্রবর্তী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শেঠ সুরজমল জালান গার্লস কলেজ, কলকাতা, ভারত

Received: 31.12.2024; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*Even though homosexuality is an ancient issue, there is still hesitation in the expression of the issue in the socio-culture or art-literature of the time. Similarly, we reach the ancient Greek island of Lesbos in search of the source of female homosexuality, but the subject is largely ignored in contemporary social thought. But its existence is strongly present in human society. A few selected novels of Bengali literature based on such thought are reviewed; Along with that, the importance and acceptance of the issue in the society has also been shed light. There are eight novels in chronological order — ‘Jadubangsho’ by Bimal Kar, ‘Jara Bristite Bhijechilo’ by Joy Goswami, ‘Chander Gaaye Chand’ by Tilottama Majumdar, ‘Abhijyan’ by Nabaneeta Devasen, ‘Anuprobesh’ by Trishna Basak, ‘Prem Samokami’ by Himadrikishor Dasgupta, ‘Biscuit’ by Tanwi Halder and ‘Sab Path Brittar’ by Ushasi Chakraborty. The novels discuss not only the representation of lesbianism in fiction, but also the evolution of attitudes towards the subject in society.*

**Keywords:** Homosexuality, Homosexuality, Lesbianism, Character, Social-Reform-Culture-Evolution.

‘কোন পুরাতন প্রাণের টানে...’: ‘গঙ্গাজল’, ‘বকুল ফুল’ সই-কথা পেরিয়ে ‘কল্লোল’-এর পাতায় এলো ‘ঝরা ফুল’; মেয়েদের বিকল্প যৌনতার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও সমপ্রেমের একটা ছবি ধরা পড়েছিল সেখানে। অবশ্য তার আগেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘প্রিয়তম’ গল্পে দুই সখী প্রিয়তমা-তরঙ্গিনীর নিবিড় বন্ধুতা দেখেছি। পরবর্তীকালে বাংলা ছোটগল্পে নারীর বিকল্প যৌনতার আভাসটি উজ্জ্বল হয়েছে কমলকুমার মজুমদারের ‘মল্লিকা বাহার’ বা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘বুটকি ছুটকি’তে। বাণী রায় তো ‘স্যাফো’ নামেই গল্প লিখেছিলেন। নারীর বিকল্প-যৌনতার উৎস সন্ধানে আমাদের যেতে হয় খ্রিস্টজন্মের ২০০ বছর আগে গ্রিসের ‘লেসবস’ দ্বীপে, যেখানে জন্ম নিয়েছিলেন ‘প্রেম ও ঈর্ষার কবি’ স্যাফো, যাঁর কবিতায় ছিল ‘সমকামিতার বার্তা’— ‘নারীর প্রতি নারীর ভালোবাসার গান।’ সেই মিথ আশ্রয় করে ‘লেসবিয়ান’ শব্দের উদ্ভব। এমনকি কলকাতায় সমকামী মেয়েদের সহায়ক গোষ্ঠী হিসেবে ‘স্যাফো’ সংগঠনও তৈরি হয়েছে। ২০১২ সালে এই সংগঠন সম্পর্কে উষসী চক্রবর্তী লিখেছিলেন— ‘চারজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নিয়ে

টিমটিম করে প্রান্তিক অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকা স্যাফো এখন অতীত। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, বিভিন্ন অর্থনৈতিক পটভূমি থেকে আসা মেয়েদের নিয়ে স্যাফোর সদস্য সংখ্যা ৩০০। ... ৬৫০ স্কোয়ার ফুট অফিসে যথেষ্ট দৃশ্যমানতা নিয়ে সাক্ষাৎকার দিতে প্রস্তুত থাকেন স্যাফোর সদস্যরা। তৈরি হয়েছে ‘স্যাফো ফর ইক্যুয়ালিটি’। প্রান্তিক গোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের পরিবার ও সমাজের চক্ষুশূল, সমস্যার উৎস ভেবে গুটিয়ে থাকা, আত্মবিশ্বাস-হীনতায় ভোগা একদল মেয়ে নয়, স্যাফো এখন আত্মপরিচয়-ভিত্তিক রাজনীতি (Identity politics) এবং হেটেরোনরমেটিভিটি (Heteronormativity)-র বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং করতেই থাকা একদল লড়াকু মেয়ের দল, কিছুতেই হার না মানা একটা দক্ষ সংগঠন।”

‘তোদের আছে মনের কথা...’: সমকামিতা (যদিও ‘সমপ্রেম’ বলাই কাজিঁকত) বিষয়ষয়টিকে সমাজ সামগ্রিকভাবে গ্রহণ না করলেও এ-ব্যাপারে এখন কম-বেশি সচেতন অনেকেই। এইসব ঘটনা বা পদক্ষেপ সাম্প্রতিক হলেও মেয়েদের বিকল্প যৌনতার জায়গাটি ছিলই। বিশ-শতকের বাংলা উপন্যাসের দিকে তাকালে দেখবো শিবরাম চক্রবর্তীর ‘ছেলে বয়সে’ (যেখানে কিশোরদের বিকল্প যৌনতার বিষয়টি স্পষ্ট ছিল)-র মতো উপন্যাস কিন্তু মেয়েদের নিয়ে লেখা হয়নি। একমাত্র ছ’য়ের দশকের পটভূমিতে বিভ্রান্ত সময়ের বিক্ষুব্ধ যৌবন আশ্রয় লেখা উপন্যাস বিমল করের ‘যদুবংশে’ বিষয়টি এসেছিল। সূর্যর দূর-সম্পর্কের মাসি মালা— যদিও তাকে ‘মালাদি’ বলে ডাকে কিংবা সম্বোধন এড়িয়ে যায় সে। মালা চাকরি করে— একই বাড়িতে তার সঙ্গে থাকে অধ্যাপিকা জয়ন্তী। ঘরের বাইরে থেকে সূর্য মালা ও জয়ন্তীর যে বাক্যালাপ শুনেছিল, তা শুধু তাদের সমকামী সম্পর্কের ইঙ্গিত নয়, স্পষ্ট প্রমাণ রাখে।

১৯৬৮ সালে প্রকাশিত উপন্যাসে সমকামিতা প্রসঙ্গ একালের পাঠককেও চমকিত করে। শরীর নিয়ে খেলার পাশাপাশি সূক্ষ্ম মান-অভিমানও লেগে থাকে মালা ও জয়ন্তীর মধ্যে। দুই স্বাবলম্বী নারীর এই যৌথ-যাপন সমাজের প্রতি এক তীব্র বিদ্রোহও বটে। আর সূর্য বা সূর্যের মতো ছেলেরা, যাদের কাছে নারীদেহ মাত্রই পুরুষের ভোগের সামগ্রী, তারা মেয়েদের এতখানি যৌন-স্বাধীনতা সহ্য করতে পারবে কেন! তাই স্বপ্নে দেখে— ‘মালাদি আর জয়ন্তী জড়াজড়ি করে তার চারপাশে কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে নাচছে আর সূর্য হাতে তালি মারছে, ক্লাউনের পোশাক তার। সূর্য ছড়ির বেঁকানো মাথা দিয়ে একবার এর গলাটা টেনে এনে চুমু খাচ্ছে, একবার ওর গালে। ওরা সূর্যকে শুধু হাসাচ্ছে। অবশ্য শেষে সূর্য দেখেছিল মালাদি তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে শরবত খেতে দিল, শরবতটা সূর্য খেল না, না খেয়ে মালাদির বুকে ঢেলে দিল, দিতে ব্লাউজ ভিজে গিয়ে ব্লিটিং পেপারের মতো চূপসে গেল। ঠাস করে চড় মারল মালাদি, সঙ্গে সঙ্গে সূর্য মালাদির পেছনে এক লাথি।’ মনে রাখতে হবে, বিমল কর, মালা বা জয়ন্তীর মধ্য দিয়ে গভীর প্রেম-মনস্তত্ত্ব তুলে ধরতে চাননি; বিশেষত মালায় আচার-আচরণ, ভাষা প্রয়োগ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও নানা ইঙ্গিতে তার চারিত্রিক বিকৃতিকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

‘রাখিব প্রমোদে ভরি দিবানিশি মনপ্রাণ’: বিশ শতকের একেবারে শেষে প্রকাশ পেয়েছিল জয় গোস্বামীর কাব্যোপম উপন্যাস- ‘যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল’ (১৯৯৮)। শুরুতেই কবি-উপন্যাসিক জানিয়েছিলেন— ‘সে বড় নিকট কথা যা বর্ণনা করি—/ কিছু বলবো ধীরে আস্তে, কিছু তড়িঘড়ি।’ সমাজ-প্রতিবেশ, প্রেম-প্রবৃত্তির টুকরো টুকরো জল-ছবির মাঝে কবির চোখে পড়েছিল রমণরতা দুই নারীমূর্তি; সম্পাদিকা ও পাঠিকা— ‘একটি চাদর দুটি মনুষ্যমূর্তি/ জড়ায় পিণ্ড তালগোলাকার হয়ে/ ছটফট করে, নিঃশ্বাস সে ঝড়/ ফিসফিস কথা দাঁতে দাঁত চেপে রাখা/ যেন কষ্টের আওয়াজ রিলিজ করে/ উপর্যুপরি দুবার।’ মধ্যরাতের ‘আলতো

আর্তনাদে'র পর 'দুই সখী দুজনাকে/ জড়াজড়ি করে ঐকেবঁকে শুয়ে' থাকে। কবির উপস্থিতিতেও দুই রমণী নিজেদের 'দমন' করতে পারেনি— চায়ওনি। এ নিয়ে কবির প্রাথমিক বিবমিষা জাগলেও উপন্যাসে তা আলাদা আবর্ত সৃষ্টি করেনি।

'তোমার মাঝে আমার আপনারে দেখতে দাও...': 'ফোঁস ফোঁস জোরে নিঃশ্বাসবায়ু' আর 'ফিসফিসে কথা'— সম্পাদিকা আর পাঠিকার জীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলেনি, কারণ তাদের সামাজিক অবস্থান ও স্বাবলম্বী জীবন। কিন্তু এই ঘটনা যখন কলকাতার হোস্টেল জীবনে ঘটে তখন দেবরূপা-শ্রেয়সী এবং তাদের রুমমেট শ্রুতির ভবিষ্যৎকেও বেপথু করে দেয়— উপন্যাস তিলোত্তমা মজুমদারের 'চাঁদের গায়ে চাঁদ' (২০০৩)। ছাত্রী-আবাসে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল দুই কিশোরী দেবরূপা আর শ্রেয়সী। নিছক মানসিক বন্ধুতা বা সখীত্ব মাত্র নয়, দৈহিকভাবে কাছাকাছি এসে পড়েছিল তারা। আর তাদের কৃতকর্ম নিঃশব্দে দেখে যাচ্ছিল সায়েন্স ছেড়ে দর্শনে অনার্স পড়তে আসা শ্রুতি। সাম্মানিক-বিষয়ের তত্ত্বের আড়ালে আরো এক ভিন্ন অনুভূতি মনে সঞ্চারিত হয়ে চলেছিল তার। তথাকথিত 'পুরুষালী ছাঁদে'র দেবরূপাকে বিশেষ পছন্দ না করলেও বীরভূম থেকে আসার শ্রেয়সী ছিল তার চোখে 'আলোক ঝরানো মেয়ে'; বীরভূমের লাভপুরে স্কুল জীবনের শ্রেয়সী পেয়েছিল দময়ন্তীকে, কিন্তু তার কলকাতায় চলে আসায় অভিমানে 'কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিল' দময়ন্তী। তাকে ভুলে শ্রেয়সীও পেল দেবরূপাকে— 'ছেলেদের মত করে ছাঁটা ছিল চুল। গড়নে শীর্ণ বলা যায়। চোখে পড়ার মতো কোনো সৌন্দর্যই তার ছিল না।' আর শ্রুতির চোখে পড়ছিল 'টুকরো টুকরো কিন্তু অমোঘ' কিছু দৃশ্য— হাত ভাঙা দেবরূপাকে স্নানে কিংবা অন্তর্বাঁস পরতে শ্রেয়সীর সাহায্য কিংবা খাওয়ার সময় মাছের কাঁটা ছাড়িয়ে দেওয়া। সুন্দরী শ্রেয়সীর জীবনে শুভ্রনীলের আগমনেও বিরক্ত দেবরূপা। উপন্যাসটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সুতপা ভট্টাচার্য লিখেছিলেন— 'যৌন-সম্বন্ধ যে নারী-পুরুষেই হতে হবে— এও তো সমাজ-প্রতিষ্ঠানের গড়ে-তোলা নিয়ম। যে নিয়ম মানুষই রচনা করেছে, প্রকৃতি নয়। এক ছাত্রী আবাসনে দেবরূপা-শ্রেয়সীর শরীরী প্রেম জমে ওঠে আর প্রতিবাদের ঝড় ওঠে আবাসনের সমস্ত ছাত্রীদের সম্মিলিত কণ্ঠে। ফলে তারা বিতাড়িত হয় ছাত্রী আবাস থেকে। আখ্যানের পরবর্তী অংশে দেবরূপার সঙ্গে এক মেয়েলি ছেলে ললিতার মিথুন কলার দৃশ্যও থাকে। এই প্রেম-দৃশ্যের ভিন্ন লৈঙ্গিকতায় বুঝিয়ে দেয় সমাজ যে লিঙ্গ (Gender) রচনা করে, সে কত কৃত্রিম, শারীরিক কিংবা প্রাকৃতিক যৌনতার থেকে তা কতই পৃথক।'<sup>২</sup>

সেদিন শ্রেয়সী ও দেবরূপার সঙ্গে বিতাড়িত হয়েছিল শ্রুতিও। অভিযুক্ত হয়েছিল 'ভয়ার' হিসেবে। তিনটি মেয়েরই সমকামিতার অপরাধের পড়াশোনায় ঘটে গেছে চরম ক্ষতি। দেবরূপা ও শ্রেয়সীর কাহিনি মূলত উপন্যাসের প্রথম পর্ব জুড়ে থাকলেও ক্লাসিক ভঙ্গির এই রচনার কেন্দ্রে লেখিকা শ্রুতিকেই রেখেছেন (উপন্যাসের স্পষ্ট দুটি পর্ব আছে 'পূর্বশ্রুতি' এবং 'পরশ্রুতি' নামে)। তার চোখ দিয়েই দেখিয়েছেন বিকল্প যৌনতাকে— 'যৌনতার নজির' চারপাশে। সুতপা ভট্টাচার্য তিলোত্তমার উপন্যাসে 'সামাজিক অনুশাসন লঙ্ঘন' করা 'যৌনআকাজ্ঞা'র উপস্থাপনের দিকটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। তাইতো শাপ্তে লেখা নরনারীর প্রেমের বাইরে গিয়েও দেখা যায়— 'নারীতে নারীতে প্রেম সখীত্ব হয়েছে/ নরকে নরতে প্রেম সখা নাম পেল/ হে সখা হৃদয়ে রহ হৃদি দন্ধ হলো।'

উপন্যাসের শেষে নারীবেশী ললিতার সঙ্গে দেবরূপার মিলনদৃশ্য দেখে শ্রুতির মনে পড়ে শ্রেয়সীকে, তার 'তলপেট টনটন' করে ওঠে। অনুভব করে নিজের বিকল্প যৌনসত্তা— 'আমার শরীর জুড়ে আশ্চর্য

অনুভূতি। আমার, ওইরকম দেবরূপার মতো, কাঁটুলি ভেদ করতে ইচ্ছা করছে! আমার শ্রেয়সীকে মনে পড়ছে! হে ঈশ্বর, এর নাম যৌন অনুভূতি! হে আশ্চর্য, আমি কি নিজেকে চিনতে পারছি! হে ঈশ্বর, আমি ওদের ঘোর ভাঙিয়ে দিলাম না কেন? সে কি এজন্যই যে আমি যা পারি না, দেবরূপা যা পারে, তা প্রত্যক্ষ করে আমার সুখানুভূতি হচ্ছে! সমকামিতার প্রতি তার ‘ভয়’, ‘ঘেন্না’ সবই ছিল বাহ্য উপলব্ধি। সেই কারণে বনা মিশ্র বা মিত্রা নাথ কুড়ি নম্বর রুম ত্যাগ করলেও শ্রেয়সী-দেবরূপাকে ছেড়ে যায়নি শ্রুতি। ‘ভরস্তু’ কোপাই আর ‘শীর্ণ’ ইছামতীর মিলন চেতন-অবচেতনে উপলব্ধি করে চলেছিল— ‘শ্রেয়সী ও দেবরূপার সমস্ত সক্রিয়তার উদাহরণ সে পেয়ে যাচ্ছিল একে একে।’ মধ্যরাতে জেলে ফেলা হঠাৎ আলোয় দেখেছিল ‘দুখানি গোল চাঁদ যেন-বা যুক্ত হয়ে আছে এবং উপুড় করা ঘোলাটে সে চাঁদে পাঁচ পাঁচ দশ খানি আঙুল যেন বাজাচ্ছে মৃদঙ্গম।’ তবুও প্রতিবাদী সভায় (যেখানে অনেক মিথ্যা অভিযোগ যুক্ত হচ্ছিল) শ্রেয়সী বা দেবরূপার দিকে অভিযোগের আঙুল না তুলে কিংবা বনার স্বাভাবিক বন্ধুত্বের সাড়া না দিয়ে মাধ্যমিকে স্টার আর উচ্চমাধ্যমিকে ৭১৪ পাওয়া শ্রুতি দর্শনের অনার্স পাবার সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দেড়-হাজার টাকার এনজিওর চাকরির হাতে তুলে দিয়েছিল নিজের ভবিষ্যৎ।

**‘মৌনবীণার তন্ত্র আমার জাগাও সুধারবে...’:** নবনীতা দেবসেনের ‘বামাবোধিনী’ উপন্যাসে সঞ্জয় আর রবির মধ্যে তৈরী হয়েছিল বন্ধুত্বের এক সম্পর্ক। সে সম্পর্কের মাঝে দাঁড়িয়ে রবি বলতে পারে—‘ওর চোখের দিকে তাকালেই আমি বুঝতে পারি, আমি ওর। আমার যা কিছু সমস্তই ওর।’ কেবল বোঝেনি তাদের পরীক্ষা— অংশুমালা আর মালিনী। সমাজে খোলা বাতাস কম, ‘বোম্বে দোস্তু’এর মতো পত্রিকা তখনও কলকাতা থেকে বেরোনো সম্ভব ছিল না। তবু নিজেদের প্রেমকে অস্বীকার করতে পারেনি রবি-সঞ্জয়। কারণ তারা জানে তথাকথিত সমাজের কাছে ‘সমকাম’ মানেই ‘কাম’। শুধু ‘কাম’ই নয়, ‘বিকৃত কামনা’। প্রেমের অবস্থানকে সেখানে কেউ স্বীকারই করে না। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে নিজেদের প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে তারা। রবি ও সঞ্জয় পরস্পরকে ভালোবাসে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে একসঙ্গে থাকার। কিন্তু অংশু বা মালিনীর মতো একনিষ্ঠ প্রেম কি ছিল তাদের? এ প্রশ্নের উত্তর ‘বামাবোধিনী’তে পাওয়া যায় না। প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে নবনীতা এই উপন্যাসের এক উপসংহার রচনা করেছিলেন ‘অভিজ্ঞান’ (২০০৯) নামে। মাত্র সাতদিনের মধ্যে লেখা উপন্যাসে ‘আধুনিক নারী জীবনের কয়েকটা বড় সমস্যাকে ধরতে’ চেয়েছিলেন উপন্যাসিক। ‘সেফ সেক্স প্র্যাকটিস’ করেও শেষ রক্ষা হয়নি, সেখানে দেখা গেছে ‘কোনও এয়ার নাইট স্ট্যান্ডের খেসারত’ দিয়ে এইচ.আই.ভি আক্রান্ত হয়েছে রবি। উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে গেছে সে, পল নামে এক সঙ্গীকেও পেয়েছে সেখানে। ‘অভিজ্ঞান’-এ অংশুমালা মলয়-পত্নী হয়েও নিজের কাজ-কর্ম, লেখা-লেখি নিয়ে সক্রিয়, এমনকি সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক ভাবনায় সব সময় সচেতন। গে-রাইটসের দাবী নিয়ে মিছিলেও হাঁটেন। তবু দশক পেরিয়ে সাহিত্য জগতে মেয়েদের অবস্থান কিন্তু বদলায়নি। মালিনী জেরি সিং-এর সঙ্গে নতুন করে সংসার পেতেছে। আর পুষ্পা রয়ে গেছে মাসি অংশুর কাছেই। আপাতভাবে বাবার উত্তরাধিকার বলে মনে হলেও অতি স্বাভাবিক নিয়মেই পুষ্পা বা পুষ্পাঞ্জলির মধ্যেও দেখা দিয়েছে সমকামিতা বা উভকামিতা (যদিও বলা হয় সমকামী পুরুষের সমকামী মামা থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকে, কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে তেমন কিছু প্রমাণ হয়নি।) প্রেমিক সৌম্যকে রোহিণীর হাতে ছেড়ে সে চলে গেছে সালমার দিকে। স্বাধীনচেতা এবং আধুনিক মানসিকতার অংশুমালাও পুষ্পাকে প্রথমদিকে স্বচ্ছন্দে সমর্থন করতে পারেনি, পেরেছে পরে। তবে আরও ভয়ংকর পরিস্থিতির

মুখোমুখি হতে হয়েছে পুষ্পাকে; সালমার স্বামী অনীশ তাকে ভোগ করতে চেয়েছে, ‘তুমি আমার বউয়ের প্রেমিকা, অতএব তুমি আমারও প্রেমিকা। অ্যান্ড হি... অ্যান্ড হি...’

দ্যুতসভায় দ্রৌপদীর মতো তাকে বেআব্রু করেছিল অনীশ। কিন্তু অনীশ ছাড়াও আছে পুষ্পার প্রায় বাল্য-বয়সের প্রেমিক ‘ইন্টেলেকচুয়াল’ নবীন ফিল্মমেকার সৌম্য, যে নিজেকে ‘বিশ্রী রকমের হেটেরো’ বা ‘বিশ্রী রকমের হোমোফোবিক’ বলেছে। ‘মেল টাচ সহ্য করতে’ না পারলেও প্রেমিকার ‘ওরিয়েন্টেশন’ বুঝে নিয়ে বলতে পারে— ‘আসলে অনেক মানুষই বাইসেক্সুয়াল হয়, সেটা অস্বাভাবিক কিছুই না। পুষ্টি, আমার মনে হচ্ছে তুই-ও বাইসেক্সুয়াল। আমাকেও খুব ভালবাসিস, আই নো উই হ্যাভ আ গ্রেট টাইম ইন বেড, কিন্তু আমাদের তো অনেক কালের বাল্যপ্রেম? মিইয়ে যাচ্ছে। এটা নতুন, খুব রোমান্টিক, এতে নতুন বডি ল্যান্ডস্কেপ অ্যাডেড হয়েছে, নতুন নতুন ডিসকভারি থাকতে পারে, গিল্ট আছে, অ্যাডভেঞ্চার আছে, অনীশকে ঠকানো আছে, আমাকেও অল্পবিস্তর, সেম সেক্সের রিলেশনশিপে গোপনতা আছে, সামাজিক বাধা আছে, সেই বাধা লঙ্ঘনে আনন্দ আর ভয় আছে— মোট কথা এই সবে প্রচুর উত্তেজনা আছে...’। বাবরি-মসজিদ থেকে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম— সমকালীন নানা বিষয় থাকলেও নেতি-ইতির নানা প্রসঙ্গ পেরিয়ে এই সংক্ষিপ্ত উপন্যাসের কেন্দ্রে অবস্থান করেছে পুষ্পা ও সালমা। শেষ পর্যন্ত লেখিকা আন্তরিক সহানুভূতি ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে দুই-নারীর ভালবাসাকে যথার্থ স্বীকৃতি দিয়ে সমর্থন করেছে।

**‘বৃথা অভিসারে এ যমুনাপারে...’:** তৃষ্ণা বসাকের ‘অনুপ্রবেশ’ (২০১৬) উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে সমকালের সঙ্গে ষাটের দশকের হাংরি আন্দোলন থেকে বিদ্যাপতির যুগ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। প্রেম-বিরহ-মান-অভিমানের সঙ্গে যেমন চেতন-অবচেতনকে মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছেন, তেমনি হিংসা-ঈর্ষা-আক্রোশের সঙ্গে মাসল টিস্যু ট্রান্সপ্ল্যান্ট-এর মতো বিষয় চলে আসে। আর ‘পেশি খুঁড়ে’ বেদনাবহ স্মৃতির সন্ধান পেয়েছিল অতি সাধারণ চাকুরে রঞ্জন; ‘নীতি প্রিয়দর্শিনী’ নামের আড়ালে রয়ে গিয়েছিল যথাক্রমে দুই নারী— অবস্তিকা ও রঞ্জু। তাদের সম্পর্কের আড়ালে বয়ে চলেছিল সমকামী-সত্তা। রঞ্জুর বাড়ি ধূলিসরাইয়ে আর অবস্তিকা থাকত সীতাপুর। উপন্যাসের স্থান-পটভূমিতে কলকাতার সঙ্গে মিশে গেছে বিদ্যাপতির মিথিলা বা ষাটের দশকের বিহার; কলকাতার মধ্যবিত্ত সংসারের পাশে এসেছে মৈথিল ‘ঝা’ পরিবার।

সেই প্রতিকূল পরিবেশেও দুই নারী নিজের অনুভূতিকে চেপে রাখতে পারেনি। ‘ভেতরের কথাটা’ নিজেদের কাছে স্পষ্ট হলেও ‘অর্থোডক্স’ পরিবার থেকে আড়াল করে রেখেছিল অয়স্তিকা। ‘একটু রক্ষ পুরুষালী’ চিত্রকর রঞ্জু গ্রামের মধুবনি শিল্পীদের নিয়ে নতুন আর্ট ফর্ম তৈরি করছে; কবিতাও লেখে; ‘মাসের পর মাস পড়ে থাকে গ্রামে। ওকে পায় কোথায় অবস্তিকা? মাঝে মাঝে ঝড়ের মতো হাজির হয় আর ওকে তছনছ করে চলে যায়।’ বিরহ বেদনা তৈরি হয় দুই নারীর, শরীরী মিলনের অতল সমুদ্রে যার সমাপ্তি ঘটে।

দুই নারী চরিত্রে আছে বৈপরীত্য— অবস্তিকা নরম স্বভাবের, ফিউডাল পরিবারের বেষ্টনী থেকে বিচ্যুত হতে পারেনি। রঞ্জু ছুটে বেড়ায়, ঈশ্বর নয় মানুষের প্রতিই তার ভরসা; কবিতা লিখতে জানলেও কবিতা আন্দোলনের গিমিকে ঢুকতে চায়নি— ‘...আমার কাজ মাটির কাছে মানুষদের জড়িয়ে, ওসব শৌখিন কবিতা যেন আমার থেকে দূরে থাকে।’ কিন্তু দূরে থাকেনি কবিতা, কলকাতার হাংরি আন্দোলনের কবি সমীরণ চৌধুরী বা বিহারের ডাক্তার-কবি বিলোল প্রসাদ ঝা’য়ের পুরুষ প্রবৃত্তি ধ্বংস করে দিয়েছিল দুই

নারীর নিজস্ব যাপনকে। পুলিশের তাড়া খেয়ে কলকাতা থেকে পালিয়ে এসে প্রবৃত্তির দাহ নিয়ে দুই পুরুষ যখন দেখলো অবন্তিকা-রঞ্জুর মিথুন মূর্তি, তখন তাদের প্রতিক্রিয়া— ‘...পৃথিবীতে সবে সন্ধ্যা নামছে। সেই অন্ধকারের ভেতরের আলোয় ও স্পষ্ট দেখতে পেল রঞ্জুর শরীর অবন্তিকার শরীরে মিশে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, দুজন নয়, একজনই দোল খাচ্ছে। বিলোল রাস্তায় খুতু ফেলে বলে, ‘আরে কত দেখলাম। নরুয়ায় চল একবার। এত রূপ একটা মেয়ের ভোগে লাগতে দেব, বুরবক পাওনি আমায়।’

বিলোলপ্রসাদ বা ধর্ষণ করেছিল রঞ্জুকে, প্রত্যক্ষদর্শী অবন্তিকা খুন হল তারই হাতে। আর ‘অপমানে আত্মহত্যা করল রঞ্জু। সে ছিল শরীরে মেয়ে, অন্তরে পুরুষ। নিজের এই পরিণতি সে মেনে নিতে পারেনি।’ কবি সমীরণ চৌধুরীও এই ঘটনায় কোনো প্রতিবাদ জানায়নি, ‘নেপাল বর্ডার পেরিয়ে’ চলে গেছে সুন্দরী কবি পারিজাতের কাছে। অতএব দুই অপরাধী পুরুষ ‘একজন নেপালে, একজন মুম্বাইতে। সমাজের দুজন সম্মানিত পুরুষ। আর দু-দুটো মেয়ে যে মরে গেল।’ না, সে নিয়ে কোনো সাড়া পড়েনি, একাডেমি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করা বৃদ্ধ কবি সমীরণ চৌধুরীর প্রতিক্রিয়া— ‘ওদের সমাজ ওদের এমনিতেই মারত। ওরা ছিল সমকামী। তার ওপর বিদ্যাপতিকে নিয়ে এমন একটা উপন্যাস লিখেছিল যে ওদের কিছুতেই বাঁচতে দিত না। দেখবেন সাহিত্যের ইতিহাসে ওদের কোথাও কোনো উল্লেখ নেই।’

মৈথিলী সাহিত্যের ইতিহাস রঞ্জু বা অবন্তিকাকে মুছে দিলেও কবি বিদ্যাপতি, লখিমা, রাধা, শিবসিংহ এমনকি জানকীও ধরা দিয়েছিল অবন্তিকার কলমে— ‘অবন্তিকা একটা অন্যরকম লেখা লিখেছে। কবিতা নয়, উপন্যাস। আর তার প্রধান চরিত্র একজন কিংবদন্তি কবি। আর দুটি প্রধান নারী চরিত্র, যাদের একজনকে নিয়ে কবি অনেক কবিতা লিখেছেন আর একজনকে নিয়ে কিছুর না। আশ্চর্য ব্যাপার হল, নারী চরিত্র দুটি একই সময়ের নয়, তাদের মধ্যে রয়েছে একটি গোটা যুগ— ত্রেতা।’ সেখানে জানকী রাধার কাছে প্রশ্ন রাখে ‘সন্তানের জন্য বিবাহের কী প্রয়োজন?’ জানকীর কথা জানার-বলার জন্য রাধা আকুল— ‘আমিই পারব। তোমার দুই স্তন, যার মধ্য দিয়ে রামচন্দ্র বলেছিলেন, একটি সুতোও গলানো যায় না, তার নিচে একটা হৃদয় আছে, একটা মন আছে— আমি ছাড়া কে জানে তার কথা?’ অরাজক দেশে দুই নারীর অপ্রতিরোধ্য-প্রেমকে পাঠক দেখলেন বিদ্যাপতির চোখ দিয়ে— ‘...শীৎকার ও ফিসফিসের স্বর তাঁকে কিছু অবাক করে। তিনি আচমকা দেখেন ধানী রঙ ওড়না উড়ছে জোৎস্নায়, তার সঙ্গে মিশে আছে নীল শাড়ি, দুটি নারী শরীর পরস্পরকে এমনভাবে লেহন করছে যেন পৃথিবীতে ওরা অমৃতের সন্ধান পেয়েছে। ... রাধা ও জানকী নদীতটে চাঁদের আলোয় আলিঙ্গনবদ্ধ।’ নিজের জীবনের ‘অনুচ্চারিত এবং নিষিদ্ধ’ তথ্য নিয়ে অবন্তিকার এই গাথা; ‘আশঙ্কা’ও আছে তার মনে ‘সে শুধু সমাজের রোষেই পড়বে না, বাড়ি থেকেও তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।’ চার দেওয়ালের আড়ালে সে লেখা পড়ে সমীরণ-বিলোলের প্রতিক্রিয়া – ‘মেয়েটির সাহস আছে। বিদ্যাপতিকে হোমোসেক্সুয়াল দেখিয়েছে। শিবসিংহের সঙ্গে নাকি তাঁর প্যাশনেট সম্পর্ক ছিল। ওর তো জিভ ছিঁড়ে নেবে সবাই।’ বিজ্ঞানের সমর্থন থাকলেও সমাজ তো আজও অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দেয়নি বিষয়টিকে। সেই স্বীকৃতি হয়তো ছ’য়ের দশকে অবন্তিকা খুঁজে ছিল বিদ্যাপতির আত্মজবানীতে—‘শিবসিংহ নেই, কোথাও নেই। দূত তাঁর মৃত্যুসংবাদ নিয়ে এসেছে। আর আরও একটি খবর তাঁকে সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন করে দিল। রাজার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে চিতা জ্বলে মৃত্যুবরণ করেছে লখিমা। তবু ভালো সে প্রকৃত সত্য জেনে যায়নি। জানলে তার হৃদয় খান খান হয়ে যেত। হয় রাজা, তাঁর হৃদয়ের রাজা। সবাই বলে তিনি লখিমার অনুরক্ত। ভেতরের কথা কেউ জানে না। তিনি তো রাজার, একান্তভাবে রাজার। নানান ছলে তার নাম নিয়েছেন তাঁর পদাবলীতে। রাধার মতো অনন্ত বিফল অভিসার তাঁর।’ আসলে রঞ্জু-অবন্তিকার পর্ব-১, সংখ্যা-৩, জানুয়ারি, ২০২৫

‘ভেতরের কথা’ই তো সঞ্চরিত হয়েছে রাধা-জানকী বা বিদ্যাপতি-শিবসিংহের মধ্যে; দেহ থেকে যে প্রেম পৌঁছে গেছে দেহাতীতে।

‘ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে...’: রুদ্রাণী-শ্যামলীর প্রেম এবং অহনার সমকাম-আশ্রিত উপন্যাস-লেখা, এই পটভূমিতে হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্তের উপন্যাস প্রেম সমকামী (২০১৯)। রচনাটিতে সমকামিতা বিষয়ে দেশি-বিদেশি নানা প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ এসেছে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সাহিত্য-সংস্কৃতি ও যাপিত জীবনে সমকামিতায় প্রকাশগুলির স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন উপন্যাসিক। উনিশ শতকের অগ্রগণ্য কবি থেকে স্যার উপাধিপ্রাপ্ত বাঙালি ছাড়াও স্যাফো, সফ্রোটিস, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, বায়রন, আলেকজান্ডার থেকে অস্কার ওয়াইল্ড— অনেকের জীবনেই কম বেশি আলোকপাত করা হয়েছে। প্রাচীনকালে সমকামিতার উপস্থিতির প্রমাণ আছে সাহিত্য থেকে ভাস্কর্যে, এসবের পরেও সমকামিতা যে একুশ শতকের সমাজেও সহজভাবে গৃহীত হয়নি, সেই চিহ্ন ছড়িয়ে আছে উপন্যাসের পাতায় পাতায়।

সমকামিতার অপরাধে রুদ্রাণীকে তার দাদা বৌদি কামুক গুরুদেবের সামনে ঠেলে দিয়েছে। ধর্ষণ থেকে বাঁচলেও ভগুও-গুরুর ভাঙা মদের বোতলের চিহ্ন চিরকালের মতো মেয়েটির তলপেটে আঁকা থাকে। আর শ্যামলী বিয়ের জন্য বাড়ির অত্যধিক চাপ সহ্য করতে না পেরে হার্টঅ্যাটাকে মারা যায়। শ্যামলী যদি গ্রামের অতি সাধারণ পরিবারের মেয়ে না হতো বা রুদ্রাণীর মায়ের অর্থনৈতিক ভিতটা একটু মজবুত হতো, তাহলে হয়ত তাদের নিবিড়-প্রেমের এমন করুণ পরিণতি হতো না। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসিক দেখিয়েছেন সমকামী সম্পর্কের মধ্যে মিশে থাকে কি গভীর সমপ্রেম।

সমকামের প্রতি ঘৃণা বা ‘হোমোফোবিয়া’র চরম দেখিয়েছেন অহনার প্রেমিক নীল ও তার পরিবারের মধ্য দিয়ে। তথাকথিত শিক্ষিত পরিবার হয়েও বিবাহের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বিভাজনকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়; আইটি সেক্টরে চাকরি করা ছেলে (যার আমেরিকায় যাবার প্রবল সম্ভাবনা), সেও পরিবারেরই মানসিকতার বদল না ঘটিয়ে মাথা নোয়ায় কুসংস্কারের কাছেই। একই বাস থেকে প্রেমিকা ও দুজন হিজড়েকে নামতে দেখে হবু পত্নীকে অনায়াসে সমকামী ভেবে নিতে পারে। হিমাদ্রিকিশোর দুই নারীর প্রেমের চেয়ে সমাজের সংকীর্ণ ভাবনা আর তার কদর্য প্রতিক্রিয়াটিকে বিশেষভাবে দেখাতে চেয়েছেন। কলকাতা LGBTQ-এর বর্তমান অবস্থান কাজকর্ম যেমন কাহিনিতে আছে, তেমনি তাদের অস্তিত্বের লড়াই কেউ দেখিয়েছেন— ‘এল.জি.বি.টি আন্দোলন তো প্রথম ও দেশেই (আমেরিকা) শুরু হয়েছিল। এল.জি.বি.টি গোষ্ঠীভুক্ত মানুষেরা নাগরিক মর্যাদা পায়, সব ধরনের সামাজিক অধিকার ভোগ করে। ওদেশ থেকে এল.জি.বি.টি আন্দোলন যখন এদেশে এলো তখন থেকে অনেকে বলতে শুরু করেছে আসলে এসব হল এদেশের সমাজ-সংস্কৃতিকে উচ্ছিন্নে দেবার মার্কিনী চক্রান্ত! এমনকি সুপ্রিম কোর্টের রায়ও নাকি এই বৃহত্তর চক্রান্তেই অংশ।’

উপন্যাসের শেষে অহনার বাবা সহানুভূতিশীল মন নিয়ে সমকামী মানুষ ও তাদের নিয়ে মেয়ের লেখা উপন্যাসকে স্বাগত জানিয়েছেন। অহনার মনের সুগু সমকামিতা বা উভগামী-সত্তা প্রকাশ পেয়েছে নীলের প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হবার পর রুদ্রাণী নিবিড় আলিঙ্গনে কান্নায় ভেঙে পড়ার সময়। তাই উপসংহারে উপন্যাসকের বার্তা ‘হয়তো প্রত্যেক মানুষের মনেই সমকামিতা গোপনে লুকিয়ে থাকে। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে কিছু সময়ের জন্য তা প্রকাশ পায়। প্রেম সমকামী।



‘পেরিয়ে এলেম অন্তবহীন পথ...’: জগদীশ গুপ্তের একটি বহু-চর্চিত গল্প ‘অরুপের রাস’; রাণু-কানুর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-প্রেম-প্রবৃত্তি শেষ পর্যন্ত ঠেকেছিল কানু পত্নী ইন্দীরা ও বিবাহিতা রাণুর একটি শরীরী মিলনের আভাসে। যদিও গল্পের নামকরণ ও মনোবিকলন পদ্ধতির দিকে তাকালে গল্পটিকে নিছক সমকামিতার গল্প বলা যায় না। বরং প্রিয় পুরুষের সঙ্গ-লিপ্সা ও অন্তরে লালিত গভীর প্রেম বা প্রবৃত্তি সমকামিতার পথ ধরে বিকল্প মুক্তির দিকে গিয়েছিল। কানুর জবানীতে গল্পের শেষে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এভাবে— ‘ইন্দীর অঙ্গ হইতে আমার স্পর্শ মুছিয়া লইয়া সে ত্বক রক্তপূর্ণ করিয়া লইয়া গেছে। ... আমি তৃপ্ত।’<sup>৩</sup> তব্বী হালদারের নভেলেট ‘বিস্কুট’ (২০২১)-এও এক পুরুষকে কেন্দ্র করে দুই নারী এভাবেই কাছাকাছি এসেছিল, কবি অংশুমান বসুর স্ত্রী অঙ্কন-শিল্পী উবী এবং প্রেমিকা অধ্যাপিকা ইন্দুমতী।

কাহিনীর যখন শুরু, তখন অংশুমান মৃত। বোলপুর থেকে উবী আসছে মধ্যমগ্রামে, ইন্দুর ফ্ল্যাটে। মৃত প্রেমিকের স্ত্রীর আসার খবর পেয়ে ইন্দুমতীর মনে তৈরি হয়েছে উৎকণ্ঠা; না, কোনও বিরক্তি বা ঈর্ষা নয়, নিজেকে নিবেদনের জন্যই যেন তার প্রস্তুতি। ঘর সাজানোর পরামর্শ চেয়ে প্রায় মধ্যরাতে কলেজের সহকর্মী রেশমিকে ফোন করে তার ‘রাগ বিরক্তি’ তুঙ্গে তুলেছে। শুধু পর্দা বা সোফা সেটের ঢাকনা-বদল নয়, বাথরুম সারাই করাতে গিয়ে এক সপ্তাহ হাসিমুখে রাজমিস্ত্রির বাড়ির অতিথি হতেও কুণ্ঠিত হয়নি। ঘর রঙ করানোর ইচ্ছেটুকু সামলে নিয়েছিল গৃহসেবিকা সুলতাদির চরম আপত্তিতে। ট্রেন থেকে নেমে উবীর আসার পথটুকু নিয়েও অতিমাত্রায় ‘কনসার্ন’ ইন্দু। উবীর কটাক্ষ, আঘাতের পরেও মন সেদিকেই ধায়, উবীর দিকে তাকিয়ে ইন্দুর ‘একবুক কষ্ট টনটন করে।’

লেখিকা খুব সচেতন ভাবে দুই নারীর শরীরে আকর্ষণের পটভূমি তৈরি করে দিয়েছেন। ইন্দুর চোখ দিয়ে উবীকে দেখিয়েছেন এভাবে—

- 1) ‘উবী হাসলে বাঁ গালে টোল পড়ে। ইন্দু যেন টোলের অন্ধকারে হারিয়ে যায়। পূর্বের ছ’ফুটের কাছাকাছি লম্বা, সুঠাম শরীরটার দিকে তাকিয়ে ইন্দু যেন চোখ ফেলতে পারে না।’
- 2) ‘মেরুন রঙের একটা টিশার্ট আর ঘিয়ে রঙের ট্রাউজার পরেছে উবী। মাথায় ইন্দুর কেনা সেই নতুন টাওয়ালটা পঁচিয়ে রাখা।’
- 3) ‘উবী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইন্দুর পিঠে হাত রাখলে, এতক্ষণ ইন্দু যেন নিজেকে সঁপে দেওয়ার একটা আশ্রয় পায়। উবীর বুকের ভেতর মুখ গুঁজে দিলে বুকের ভেতর ঘাপটি মেরে থাকা কান্নাটার আগল খুলে যায়।’

উবী এসেছিল ইন্দুকে আঘাত করতে, ব্যথা দিতে; অংশুমানের ব্যাগে রয়ে যাওয়া ইন্দুর অন্তর্ভাস বয়ে এনেছিল অপমানে জর্জরিত করার জন্যই। কিন্তু সেই আঘাতের প্রতিক্রিয়াতে ইন্দুমতীর জ্ঞান হারানো মানসিক এবং শারীরিকভাবে কাছাকাছি নিয়ে এলো দুই নারীকে। তৈরি হলো সম্পর্কের নতুন ‘নকশিকাঁথা’— ‘লিপলকে’ বন্দী হয় দুই নারী। তারা উপলব্ধি করেছে— ‘একই রকমের দুঃখে, একই রকমের অভিমানে, একই রকমের অপমানে, একই রকমের হারানোর ভয়ে তারা হাসতে ভুলে গেছিল। হয়তো বা বাঁচতেও।’ দুই নারী কবি অংশুমানের শঠতার শিকার; বিশিষ্ট শিল্পী হয়ে স্ত্রীর ছবিকে নিজের আঁকা অথবা প্রেমিকার কবিতাকে নিজের বলে প্রচার করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় তব্বী হালদারেরই ‘চিত্রাঙ্গদ’ উপন্যাসটির কথা। সেখানেও কবি অর্চিমান বসু সুভদ্রর হাতে মদের গ্লাস তুলে দিয়ে তার সঙ্গে শুধু পায়ুসঙ্গমই করেননি, তরুণ কবির লেখা ‘অরুন্ধতী’ কবিতাটিকে নিজের কবিতা ‘পরাগ’ কাব্যে ছেপে

দিয়েছিলেন। ‘বিস্কুট’ উপন্যাসে সেই মিথ্যার মুক্তি অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধে ‘শান্ত স্বভাবের’ ইন্দুমতী এবং ‘রাফ এন্ড টাফ’ উর্বীকে। রণাঙ্গনের গ্রাভিয়েটর—দুই হিংস্র বাঘিনী থেকে হয়ে উঠে পরস্পরের আশ্রয়।

একটা প্রশ্ন থাকে— সম্পর্ক নির্মাণ সময়ের সংক্ষিপ্ততা নিয়ে। সামাজিক চেনা প্রেমের বাইরে বেরিয়ে সম্পর্কের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্রুতময়তা একটা জিজ্ঞাসা তোলেই। মনে রাখতে হবে শরীরী তৃপ্তির উল্লেখ আমরা উর্বীর সংলাপে পেয়েছি— ‘একটু বেশিই নরম ইন্দুমতী’— এই তৃপ্তি হয়তো ইন্দুমতীর জীবনেও এনেছিল ‘অন্যরকম চাপুরচাপুর আনন্দ’। তবে উপন্যাসের শেষে ইন্দুমতীর কলেজের ঘটনা তথা প্রিন্সিপালের সামনে ‘লিভ-ইন’এর প্রসঙ্গ কিছুটা আরোপিত মনে হয়। হয়তো আয়তনের সংক্ষিপ্ততা রক্ষা করতে গিয়ে লেখিকাকে কিছুটা উদ্দেশ্যমূলকতার দিকে ঝুঁকতে হয়েছে। কিন্তু ভাবনার স্পষ্টতা ও সম্পর্কে স্বচ্ছতায় তথী হালদারের ‘বিস্কুট’ ‘টানটান জীবনের জলছবি’— যা শূন্যতা থেকে নিয়ে যায় সৃজনের দিকে, সত্যের দিকে এবং সত্যের দিকে।

‘কী লাগি ফিরিস পথে দিবারাতি...’: ২০২১ এর ‘সানন্দা’ পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল উষসী চক্রবর্তীর ‘সব পথ বৃত্তাকার’। কাহিনিতে প্রথিতযশা সাংবাদিক বা ‘প্রায় সেলিব্রিটি’ জয়িতা মজুমদারের সঙ্গে ছিল নৃত্যশিল্পী দোয়েল বসুর ‘অন্যরকম সম্পর্ক’; জয়িতার মা, যাদবপুরের অধ্যাপিকা শেফালী মজুমদার মেয়ের যৌন অভিমুখ মেনে নিলেও আহিরিটোলার বসু পরিবার অর্থাৎ বাপ-মা-হারা দোয়েলের জেঠু-জেঠুমা, যাঁরা সন্তান-স্নেহে মানুষ করেছেন তাকে কিংবা ‘অর্থোদক্স’ পিসিঠাম্মা, তুতো-বোন কোয়েল— এদের কাছে নিজের ‘ওরিয়েন্টেশন’ গোপন করতে হয়েছিল নাচ নিয়ে গবেষণারত বা ডান্স থেরাপি নিয়ে চর্চা করা দোয়েলকে। যদিও স্বাবলম্বী দুই নারীর বিচ্ছেদ ঘটেছিল সামাজিক বা পারিবারিক কারণে নয়, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে। ‘খবর সারাদিনে’র ডেপুটি এডিটর জয়িতার জীবনে আসা-যাওয়া করে একাধিক নারী— ঙ্গিস্তা-সাবেরী-মন্দিরা। প্রেমে একনিষ্ঠ দোয়েল যা মেনে নিতে পারেনি। অভিমানে আক্রোশে ভেঙে পড়েছে। আর জয়িতার প্রতিক্রিয়া— ‘বেঁচে থাকার জন্য আমার... অন্য ইনস্পিরেশন... অন্য স্পার্ক দরকার। কিন্তু তা বলে এমন নয় যে আমি তোকে ভালোবাসি না, আমি তোর সঙ্গেই থাকতে চাই ... কেন বুঝতে পারছি না।’

দোয়েল ফিরে যায়নি জয়িতার কাছে; সমাজ সংসার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল। জয়িতাও পাড়ি দিয়েছিল বিদেশে। ধ্বস্ত-দাম্পত্যের সন্তান অ্যাগনেস লী ব্যানার্জি— তারই বন্ধুতায় ও সহায়তায় ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল দোয়েল। মণিপুরী জিম ট্রেনার অং-এর সঙ্গে লী এর বিয়ে; সেই সূত্রের তার ঠাকুরমা পূর্ণিমা দেবীর সহায়তায় জাহাজী নীলাদ্রিশেখর ও চায়না টাউনের রেস্তোরাঁর মালকিন শ্যারন— পুত্র-পুত্রবধূর পুনর্মিলন। এবং তারপরেই বিয়ের জন্য জেঠু-জেঠুমার অনুরোধ— এসবের প্রতিক্রিয়ায় দোয়েল বিনা প্রতিবাদে বিয়েতে মত দিয়েছিল। নির্বাচিত পাত্র— ধনী পরিবারের সন্তান রাহুলও সমকামী। তার স্টেডি বয়ফ্রেন্ড সুগত। এটা দোয়েলের দ্বিতীয় ধাক্কা। বাইসেক্সুয়াল দোয়েল নিজেকে ভাবে ‘ফ্লুইড’— ‘সেক্সুয়ালি ফ্লেক্সিবেল, পরিবর্তনশীল। স্ট্রেট, হেটেরো বা হোমো কোন ছকেই ঠিক বসানো যায় না।’ শেষ পর্যন্ত রাহুল-সুগতর বাড়ির অন্য ফ্লোরে পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকতে গিয়ে দোয়েল হয়ে পড়েছে আরো বিষণ্ণ; পুরুষ নয়, নারীকে জীবনসঙ্গী করার কথাই ভেবেছে। লী-সুজাতা-সুগতরা উৎসাহ নিয়ে তার জন্য পাত্রী খুঁজতে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়েছে। সেই নিয়ে টিভি চ্যানেলে চলেছে জোর তরজা। টিআরপি বেড়ে গেছে মুন টিভির। সেই বিজ্ঞাপন দেখে দেশ-বিদেশের বহু নারীর সঙ্গে এসেছে

জয়িতার মেল। ছোটগল্পের মত প্রশ্ন-চিহ্নে উপন্যাস শেষ করেছেন উষসী, খুলে রেখেছেন প্রেমের অনন্ত সম্ভাবনার পথ।

### তথ্যসূত্র:

১. চক্রবর্তী, উষসী, 'মেয়েঘেঁষা লেখারা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩, পৃ. ৫৬।
২. ভট্টাচার্য, সূতপা, 'মেয়েলি আলাপ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১২, পৃ. ১২৮-১২৯।
৩. রায়চৌধুরী, সুবীর (সম্পা), 'জগদীশ গুপ্তের গল্প', দে'জ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৫, পৃ. ১২৬।

### আকর গ্রন্থ :

১. কর, বিমল, 'যদুবংশ', 'উপন্যাস সমগ্র ৩', আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০০।
২. গোস্বামী, জয়, 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল', আনন্দ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮।
৩. চক্রবর্তী, উষসী, 'সব পথ বৃত্তাকার', শারদীয়া 'সানন্দা', কলকাতা, ২০২১।
৪. দাশগুপ্ত, হিমাদ্রিকিশোর, 'প্রেম সমকামী' প্রিয়া বুক হাউস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৯।
৫. দেবসেন, নবনীতা, 'অভিজ্ঞান', দে'জ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯।
৬. বসাক, তৃষ্ণা, 'অনুপ্রবেশ', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬।
৭. মজুমদার, তিলোত্তমা, 'চাঁদের গায়ে চাঁদ', আনন্দ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩।
৮. হালদার, তন্মী, 'বিস্কুট', সমকালের জীবনকাঠি, প্রথম প্রকাশ, ২০২১।

### সহায়ক গ্রন্থ :

১. হালদার, তন্মী, 'চিত্রাঙ্গদ', ঐহিক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০২১।
২. দেবসেন, নবনীতা, 'বামাবোধিনী', দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭।
৩. পাল, সুদীপ্ত, 'সমকামিতা ও বিবর্তন', গুরুচণ্ডা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০২২।
৪. রায়, অভিজিৎ, 'সমকামিতা', শুদ্ধস্বর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০১০।



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 670-682

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.056



## নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাস:

## বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের আত্ম-সংকট ও আত্ম-অস্বীকার

শুভঙ্কর দাস, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 01.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*In the history of post-independence Bengali literature Narayan Gangopadhyay is widely known as a powerful novelist and short story writer. But while the notable novels of the first few phases of his literary career, such as 'Upanibesh', 'Shilalipi', 'Mahananda', 'Padasanchar', 'Amabasyar Gaan', have been studied and analyzed academically, his later self-investigative self-projective and confessional novels have not received as much intellectual scrutiny and critical acclamation. It is fair to say some have been neglected. However, in novels like 'Nirjan Shikhar', 'kacher Darja' the author has represented unmerciful as well as impartial analysis of the so-called intellectual and rational upper-middle class Bengali mind of a particular period which helps us to identify the layers of historical reality of our society and literature from an evolutionary point of view. Therefore, the present article attempts to provide a brief review and evaluation of such novels.*

**Key words:** Narayan Gangopadhyay, Confessional novel, Bengali intellectuals, Analysis, Social reality, Historical significance.

উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত বাঙালির ভাবজগতে সনাতন প্রাচ্য জীবনবোধের উপর নবজাগরণ-জাত পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও মননধর্মের তীব্র অভিঘাত সত্ত্বেও ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল এক অখণ্ড মানবতার আদর্শ থেকে, পারিবারিক-সামাজিক শ্রেয়বোধ ও রোম্যান্টিক স্বাদেশিক চেতনার প্রত্যয় থেকে। কিন্তু বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে একের পর এক ঘটনার ঘূর্ণীবর্ত গত শতকের প্রত্যয় বা স্থিতাদর্শে ভাঙন ধরিয়েছিল। ১৯০৫-১১ বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত। এক বৈপ্লবিক চেতনার ঐক্যসূত্রে যুবসমাজ বহিমান হয়ে উঠলেও, ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ায় 'স্বদেশী'র কিছু অবিশ্বাস্য আলোড়ন এবং স্বাধীনতাকামী যুবমানসের দুর্মর আকাজক্ষা হঠাৎ নির্বাপিত হল। বন্ধনমুক্তির প্রত্যাশী তরুণ সমাজে হতাশা ও ব্যর্থতাবোধ সৃষ্টির সে-ই প্রথম পর্যায়। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে স্বরাজলাভের আশায় ইংলণ্ডের তরফে মহাযুদ্ধের প্রয়োজনীয় খাদ্য-বস্ত্র-অর্থের রসদ জুগিয়েও প্রতিদানে পাওয়া গেল মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের প্রবঞ্চনা। যুদ্ধের ফলে একদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর পর্ব-১, সংখ্যা-৩, জানুয়ারি, ২০২৫

অভাব ও দুর্মূল্যতা জীবনযাত্রাকে দুর্বহ করে তুলছিল, অন্যদিকে উক্ত সংস্কারের বলে মধ্যবিভেদ শিক্ষিত বাঙালির অন্যপ্রদেশে চাকরি সংগ্রহের পথ হচ্ছিল ক্রমে সংকুচিত। এই সময় দমনমূলক রাওলাট আইন, প্রতিবাদে জালিয়ানওয়ালাবাগের নরহত্যাযজ্ঞ, অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা (১৯২০) ও তার পরিণামী বিফলতা, ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনের নিষ্ফল সমাপ্তি, সন্ত্রাসবাদী উন্মত্ততার পুনর্জাগরণ ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর তালিকা দীর্ঘ না করে বলা চলে বিশ শতকের গোড়া থেকেই রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে মধ্যবিভেদ বাঙালির, বিশেষত যুবমানসে হতাশা, অনিশ্চয়তা, নৈরাশ্য ও প্রচল মূল্যবোধ সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণা ও আত্মঅনাস্থার সুরটি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। এরই সমান্তরালে প্রথম মহাযুদ্ধের কালে বা তার অল্প আগে-পরে জীবনদর্শন, মূলগত বিশ্বাস ও রুচি এবং মানব-প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে তিনজন বস্তুবাদী মনীষী-প্রবর্তিত তিনরকম তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে। কার্ল মার্কসের (১৮১৮-১৮৮৩) ডায়ালেকটিক্যাল বস্তুবাদ বা ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা বা শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্ব-শোষণ ও শোষিতের লড়াই অথবা বিপ্লবের পথে শ্রেণিহীন সর্বহারার সমাজপ্রতিষ্ঠার তত্ত্ব সাম্য, মানবমুক্তি, জনগণমুখিনতার স্লোগান শোনাল। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের সার্থকতা মানুষ-সভ্যতা-জীবন-জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত রূপান্তরের বিশ্ববোধকে নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা দিল। চার্লস ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) ক্রমবিবর্তনবাদে মানুষের পাশব সত্তার স্বীকৃতি, প্রাণীজগতের সর্বস্তরে অস্তিত্বরক্ষার ক্ষমাহীন সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্ভবের ধারণা, বংশগতি ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের নিয়ন্ত্রণে মানবচরিত্রের নির্মাণভাবনা মানুষের দেবত্ব সম্পর্কিত চূড়ান্ত মোহভঙ্গের কারণ হয়ে উঠল। অবশেষে সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) মনোবিকলন তত্ত্বে মনের সচেতন সজ্ঞান ও অবচেতন নির্জ্ঞান এলাকার বাসিন্দা যথাক্রমে বাস্তব যুক্তিবুদ্ধি ও দুর্দমনীয় কামনা-বাসনার নিয়ত দম্ব, নিউরোসিস ও বিভিন্ন কম্পলেক্স বা গুঁড়ো, অবাধ ভাবানুষ্ণ, মানুষের নিজের ভিতরেই এরস ও থ্যানাটোস তথা রক্ষণ-সংযোগ-প্রেম-ধর্মী সত্তার সঙ্গে ধ্বংস-বিযুক্তি-হনন-ইচ্ছুক সত্তার টানাপোড়েন ভাববাদী দর্শনের প্রভাবকে নস্যাত্ন করে দিল। মানুষের নিহিত অমৃতত্ব নিয়ে, মানুষের মর্মগত মহত্ত্ব নিয়ে, মানুষের মৌল দেবত্ব নিয়ে যে-সব সংস্কার বা বিশ্বাস এতকাল আমাদের মনে লালিত হয়ে আসছিল, এঁদের ঘোর বাস্তববাদী মানবতত্ত্ব সেই সব বিশ্বাস ও সংস্কারের ভিত্তিমূল ধরে নাড়া দিয়ে বসল। বিশ শতকের তিরিশের দশকে কালগত ও মননগত অস্থিতাবস্থার জটিল বিন্যাসে জট-পাকানো বাস্তবজীবন তথা অন্তর্জীবনের দুস্পাঠ্য গ্রন্থিমোচনের দায় ছিল ঔপন্যাসিকদের। সেই দায় স্বীকার করেন তিরিশের মননপ্রধান ঔপন্যাসিক- ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, গোপাল হালদার এবং এঁদের সমান্তরালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ ও বুদ্ধদেব বসু।

জীবনানন্দ দাশ, মস্তিষ্কের গোপন প্রকোষ্ঠে ‘বোধ’এর জন্ম-মৃত্যুতে আচ্ছন্ন যাঁর বিষাদকরোজ্জ্বল চেতনা, ত্রিশ দশকীয় মননশীলতার স্বাভাবিক কিরণসম্পাতে আত্মজীবনের নিরিখে প্রথম উপলব্ধি করছিলেন গ্রামীণ মধ্যবিভেদের অস্তিত্বগত দুর্দশাকে, অসহায়তাকে, বিপন্নতাকে। বিশেষত সেই মধ্যবিভেদ যখন সংবেদনশীল, স্পর্শকাতর কবিচিন্তের অধিকারী, শিল্পসৃষ্টির অন্তলীন তাড়না যাকে সমাজের প্রচল অর্থে জীবনের চতুর্ভুগে সফল পুরুষ হতে দেয়নি, তখন সেই অন্তর্মুখী ব্যক্তিপাত্র চরম বিষাদখিন্ন সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে স্বীকারোক্তির মাধ্যমেই আত্মমোক্ষণের প্রয়াসী হয়েছে। এই সংকটের সত্যনিষ্ঠতা যেহেতু জীবনানন্দেরই আত্মজীবনের গভীরে প্রোথিত, সেহেতু তাঁর হাতেই বাংলা সাহিত্য প্রথম সার্থক স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাস পেয়েছে - ‘কারুণ্যবাসনা’ (১৯৩৩)। সমসময়ে বুদ্ধদেব বসুও তাঁর নাগরিক মননঋদ্ধি রোম্যান্টিক চেতনার আলোকে ‘সানন্দা’ (১৯৩২), ‘ধূসর গোখুলি’ (১৯৩৩), ‘আমার বন্ধু’

(১৯৩৩) ইত্যাদি আত্মকথনরীতির উপন্যাসে কিছু তীব্র আত্মসচেতন, অন্তর্মুখী চরিত্রের আমদানি করেছেন যারা আত্ম-উন্মোচনের তাগিদে কখনো কখনো স্বীকারোক্তির পথ অবলম্বন করেছে। কিন্তু যথার্থ স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাস রচনার জন্য চরিত্রের পূর্বাপর যে তীক্ষ্ণধী যন্ত্রণাদায়ক চৈতন্যের নিরবচ্ছিন্ন অভিঘাত দরকার, যে দাহ, দংশনের প্রাবল্য দরকার তা এই উপন্যাসগুলিতে অনুপস্থিত। তিরিশের দশকে অপরাপর বাঙালি ঔপন্যাসিকের বুদ্ধিজীবী-মানসে চিন্তাকে বিজ্ঞাননিষ্ঠ করে তোলার জন্য যে প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে, তার মূলে একদিকে যেমন আলোড়িত বিশ্ববীক্ষা, স্বদেশকে বিশ্বের অংশ হিসেবে উপলব্ধি, অপরদিকে তেমনি মানুষের পরিবেশ ও মনোজগৎ সংক্রান্ত নানা জিজ্ঞাসার ভূমিকা ক্রিয়াশীল ছিল। কখনো ধূর্জটিপ্রসাদের চেতনাপ্রবাহরীতির উপন্যাসে দেশজ ভাবপরিমণ্ডলের সাথে নবলব্ধ বিশ্ববীক্ষার সংযোগসাধনের ব্যক্তিক প্রয়াস, ভ্রান্তি, বিচ্যুতি; কখনো মানিকের উপন্যাসে ফ্রেয়েডীয় অবচেতন তত্ত্বের আলোকে লিবিডো-কাতর যন্ত্রণা ও উত্তরহীন নৈরাশ্যের ইতিকথা। তিরিশের বুদ্ধি-জগতে জীবনের সার্বিক-সংকটের স্বীকৃতি বেশ স্পষ্ট, সেই সংকটকে শিল্প-সৃষ্টিতে পরিহার না করার দৃঢ়তাও লক্ষণীয়। কিন্তু এই দৃঢ়তার মূলে ছিল জীবন সম্বন্ধে প্রবল আশা। ভারতবর্ষে এই আশার চেহারা গড়ে উঠেছিল উপনিবেশের বন্ধনমুক্তির স্বপ্নে। বলা বাহুল্য, যত অস্পষ্টই হোক এই আশাবাদ, গণজীবনমুখী চেতনা-বিস্তার, বিস্তৃতি ও গভীরতায় বিশিষ্ট জীবনাগ্রহের মৌল প্রেরণা বিষয়-নির্বাচনে ও শিল্প-প্রয়াসে যে সমগ্রসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক, তা স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাসের উপযুক্ত সমাজ-মানসিক পটভূমি তখনও নির্মিত হতে দেয়নি। স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাসের যথার্থ বিকাশের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী আশাহীন, প্রত্যয়হীন, মূল্যবোধলুপ্ত সার্বিক নেতিগ্রস্ত পরিবেশে খণ্ডিত চূর্ণ-বিচূর্ণ মানুষের আত্মস্বরূপ-সন্ধানের উদ্দেশ্যে চরম আত্মনাশা সচেতনতা ও সর্বার্থে অবক্ষয়িত অস্তিত্বের দহনজ্বালা অনুভবের তুরীয় বিপন্নতা পর্যন্ত।

প্রথম মহাযুদ্ধ যে গভীর আর্থিক সংকটের জন্ম দিয়েছিল, তা আরও ঘনীভূত হয় জমির উপর শিক্ষিত মধ্যবিভোর নির্ভরতার ক্রমহ্রাসমানতায়। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই কলকাতা শিল্প-বাণিজ্য-শিক্ষা-পরিবহণ-প্রশাসনের কেন্দ্র হয়ে ওঠায়, উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে আর্থিক অনিশ্চয়তায় ভোগা গ্রামীণ মধ্যবিত্ত চাকরির আশায় শহরমুখী হতে শুরু করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে খাদ্য ও বস্ত্র-সংকট এই শহরমুখীনতার স্রোতকে করে প্রবলতর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকে জাপানি আক্রমণ (১৯৪১), আগস্ট আন্দোলন ও মেদিনীপুরের বিধ্বংসী বন্যা (১৯৪২), মহাযুদ্ধের কাঁচামাল সরবরাহের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় কলকাতার অর্থনৈতিক ও সমাজজীবনে বৈশিষ্ট্য অস্থিরতা, কালোবাজারি-মজুতদারির সূত্রে সমাজে তীব্র আর্থিক বৈষম্য, দাঙ্গা (১৯৪৬), দেশভাগ, স্বাধীনতা, উদ্ভাস্ত স্রোত - প্রায় দীর্ঘ এক দশকের ক্রমাঘনীয় আঘাত চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের বাঙালি কথাকারদের কিছুতেই অব্যবহিত পূর্ববর্তী দশকগুলির শান্তি-স্থিতি-প্রচলিত ধ্যানধারণার জগতে আস্থাসীল হতে দেয়নি। এই কালে যে তরুণ লেখকগোষ্ঠীর আবির্ভাব, তাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন ভাঙন ও বিপর্যয়ে সংক্ষুব্ধ দেশকালকে -

“বাংলা এখন আপনাকে বাঁচাতে পারছে না। প্রাণ রাখতে গিয়ে আত্মা বিকিয়ে যাচ্ছে। মনুষ্যত্ব ও টাকার দাম পড়ছিলো হু হু করে, পাল্লা দিয়ে সেই সঙ্গে যতক মূল্যবোধ... ডিভ্যালুয়েশনের প্রথম পর্যায়। ধীরে ধীরে বিনষ্ট হচ্ছিলো ব্যক্তিগত গুঁচতা, সম্ভ্রমবোধ, পরিবারগত সম্প্রীতি। অর্থনীতির আণবিক আঘাতে মধ্যবিত্ত সমাজে যৌথ বলে যা কিছু সব গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছিলো।

জীবনকে যদি একটা সংগ্রাম বলি, তাহলে তার সমস্ত রণাঙ্গণ জুড়ে ঘটছিলো সুন্দরের পশ্চাদপসরণ ও প্রস্থান।”<sup>১</sup> (সন্তোষকুমার ঘোষ, ‘এই বাংলা’, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৮, পৃ-১৫৭-৫৮)

পারিবারিক সম্পর্কগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক জটগুলি অতিমাত্রায় প্রকট হতে লাগল। সতীত্ব-মাতৃত্ব-নারীত্ব-প্রেম-দাম্পত্য-বাৎসল্য-পরিবার প্রভৃতি যে সমস্ত স্নিগ্ধ পবিত্র সুকুমার বৃত্তিগুলিকে এতদিন জীবনে বড় মূল্য দেওয়া হয়েছে সেগুলি ভাঙতে লাগল কলকাতার ফ্ল্যাটে, রাস্তায় বাস্তুহারা লাঞ্চিত অসহায়তায়। স্বভাবতই এমতাবস্থায়, যখন সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য আসলে রাষ্ট্রিক নৈরাজ্য ও সামাজিক স্থিরাদর্শহীনতারই ফল, যখন বিমুখ বর্তমান ও বিশূন্য ভবিষ্যৎ থেকে জন্ম হয় এক পঙ্গু নিরুপায়তাবোধের, ঔপন্যাসিকের পক্ষে সম্ভব হয় না শরৎচন্দ্রের আবেগদ্রব অসম্পূর্ণ সমাজচেতনায়, কল্লোলের ইন্টেলেক্ট বিলাস বা রোম্যান্টিক বিপ্লববোধে, বিভূতিভূষণের সমাহিত বিশ্বরহস্যজিজ্ঞাসায় ফিরে যাওয়া। সামূহিক ও ব্যক্তিক মূল্যবিনষ্ট সম্বন্ধে ঔদাসীন্য ও আগ্রহের অভাবের সামনে মানুষ তখন আত্মহত্যাকারীর নীরব নিরুপায় ভূমিকা পালন করে চলেছে। এরকম অবস্থায় সর্বাঙ্গিক নেতির মধ্যে কোনো ইতিবাচক মানসদৃষ্টির সন্ধান জরুরি ছিল এবং সেজন্যই গোটা সমাজের দ্বন্দ্বিক চেহারার অনুধাবন একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। মননশীল সমাজমানস তীক্ষ্ণধী সচেতনায় বুঝতে পারছিল, সমাজের সর্বের মূল্যহানি আসলে প্রতি একক ব্যক্তিমানুষের বিনষ্ট ন্যায়বোধের সমাহার। তাই সামাজিক ব্যাধিকে চিহ্নিত করতে হলে সবার আগে নিজের মুখোমুখি হয়ে আপন সত্তার গভীরে সেই ব্যাধি, বিকৃতি ও ক্লেশের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিতে হবে। সে স্বীকৃতির পথ সরল নয় - বহু বিকারে, মোহে, মিথ্যাচারে, ভড়ং-এ, আত্মহলনায়, বিভ্রমে তার পথ কন্টকাকীর্ণ। তবু এই আত্মব্যবচ্ছেদ ও স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আত্মশুদ্ধিই তখন সামাজিক অবক্ষয় ও পচনশীলতা রোধের একমাত্র প্রতিষেধক। তাই নিজের কাছে, নিজের কালের কাছে, নিজের সামাজিক ও শিল্পিসত্তার কাছে সৎ, স্বচ্ছ, নিষ্ঠীক থাকার দৃঢ় প্রত্যয় অঙ্গীকার করে স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাস নির্মিত হতে থাকল দুঃসাহসিক আত্মবীক্ষণ তথা সমাজবীক্ষার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায়। জীবনানন্দের ‘মাল্যবান’, বুদ্ধদেবের ‘গোলাপ কেন কালো’, ‘রাত ভরে বৃষ্টি’ ইত্যাদি ছাড়াও রমাপদ চৌধুরী, সন্তোষকুমার ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, গৌরকিশোর ঘোষ, সমরেশ বসু, লোকনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ প্রতিভাধর ঔপন্যাসিকদের প্রাতিস্বিকতায় এই উপন্যাস-সংরূপ হয়ে উঠল বিচিত্রগামী।

বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সূচিত যে ছিন্নমস্তা, নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যময় কাল, তার বৈনাশিক অন্ধকার দীর্ঘায়িত হয়েছিল এই শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত। ফলত স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাস সৃজনের ঐতিহাসিক দাবি ও ব্যক্তিগত তাগিদ ফুরিয়ে যায়নি শতাব্দীর উপান্তে পৌঁছেও। যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছিলাম মানবতার চূড়ান্ত অবমাননার বিনিময়ে, রাশি রাশি উন্মূল জীবনের বিনিময়ে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার স্বপ্নভঙ্গের বিনিময়ে, তা বাঙালির এক শতাব্দীর অর্জিত সমস্ত বিশ্বাস-শক্তির প্রত্যয়ভূমিতে গভীর ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিল। শরণার্থী জনগোষ্ঠীর বিরাট একটা ভাগ অর্থনীতিক স্বস্তি কখনো পেল না, আন্তরিক পুনর্বাসন তাদের কখনো ঘটেনি। মাটির শিকড় সম্মান যাদের লুপ্তিত তাদের মধ্যে মূল্যবোধ বিশেষ অবশিষ্ট থাকে না। এক প্রজন্মের অস্থিরতা উৎকেন্দ্রিকতা মূল্যহানি পরবর্তী প্রজন্ম-পরম্পরায় বাহিত হতে থাকে। উদ্বাস্তু সমস্যার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নাসিকতা, শিল্পায়নের রুদ্ধগতি, ভয়াবহ বেকার সমস্যা, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার-হরণ, ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধ, কমিউনিস্ট চীনের সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপ, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিধাবিভক্তি, তেভাগা আন্দোলনের কৃষকদের উপর অথবা ধর্মঘাটা শ্রমিকদের উপর

কিংবা শান্তিপূর্ণ ছাত্রমিছিলে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, নকশাল আন্দোলন দমনে নৃশংস পুলিশি তৎপরতা বাঙালির রাজনৈতিক চেতনার জগতে বিশ্বাসরিক্ততার ও বিবিক্তির আততিকে ক্রমপ্রসারিত করে যাচ্ছিল। অন্যদিকে নাগরিক জীবনের মেট্রোপলিটন স্তরে সামাজিক জীবনের অখণ্ডতার ধারণার চূর্ণীকরণ, পারিবারিক নৈতিক শাসন ও সেন্টিমেন্টের পরাজয়, উগ্র বিভ্রান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, ছোট পরিবারকেন্দ্রিক আত্মসুখপরায়ণ ফ্ল্যাট-কালচারে আত্মিকভাবে নির্বাসিত মানুষের অনিকেত বিচ্ছিন্নতাবোধ, শহরমুখী বৃত্তিহীন স্বার্থান্ধ জনপিণ্ডের মর্মসংযোগহীন সহাবস্থান, ভগ্নোদ্যম শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের নিষ্ক্রিয় ক্লীবত্বের মানসধর্ম সব মিলিয়ে সামাজিক ও নৈতিক জীবনেও ঘুণধরা অসুস্থতার প্রকটিত রূপ। এইভাবে এক শতকের স্বৈরবৃত্ত কাল সামূহিক পাপ, সংশয়, বিচ্ছিন্নতা, অবসাদ, বিকার, গ্লানি, নিরর্থকতার ক্রোধ ও আত্মক্ষয়ী সচেতনতার পাঁকে পাঁকে জড়িয়ে মানুষকে এক অসহ অন্ধকূপে নিষ্ক্ষিপ্ত করে। স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাসের ক্রমিক নির্মাণ এই অন্ধকূপ থেকে যন্ত্রণাশুদ্ধ উত্তরণের জন্য মানব-অস্তিত্বের যুগোপযোগী উন্মুক্ততাকেই প্রমাণ করে। যুগের এই অপরিহার্য দাবিপূরণের তাগিদেই সমকালীন অন্যান্য অনেক উপন্যাসিকের মত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শেষ পর্বে মহাযুদ্ধোত্তর শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিভের চারিত্র্য-ধর্মকে আনুভূতিক অস্তর্দৃষ্টির সামনে রেখে বিশ্লেষণে আগ্রহী হয়েছিলেন। উপরন্তু মূলত মধ্যবিভ-লিখিত বাংলা উপন্যাসের পাঠকও ছিল উচ্চ ও মধ্য-মধ্যবিভ সম্প্রদায়, তাই মধ্যবিভের সংকট-স্বরূপ-নিরূপণ এই সময়ের উপন্যাসিকদের মনন ও সৃজন-চর্চার অন্যতম আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে উচ্চ-মধ্যবিভ বুদ্ধিজীবী শ্রেণির অন্তর্গত মানুষ হিসাবে তাঁর উপন্যাসগুলিতে এই তথাকথিত প্রাগ্রসর শ্রেণির অন্তর্নিহিত বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেছিলেন আত্যন্তিক স্পষ্টতায় এবং এই শ্রেণির মানুষদেরই তাঁর অন্তিম পর্বের স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাসগুলির পাত্র-পাত্রী করে তুলেছিলেন।

স্থূল বিচারে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসিক জীবনের চারটি পর্ববিভাগ লক্ষ করা যায়। প্রথম পর্বের (১৯৪৩ -১৯৪৮) উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হলো - ‘উপনিবেশ’, ‘মন্দ্রমুখর’, ‘স্বর্ণসীতা’, ‘সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী’, ‘সূর্যসারথী’। দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে (১৯৪৯-১৯৫৬) ‘বিদিশা’, ‘শিলালিপি’, ‘লালমাটি’, ‘মহানন্দা’, ‘পদসঞ্চারণ’। তৃতীয় পর্বের (১৯৫৭-১৯৬২) অন্তর্ভুক্ত হতে পারে ‘অসিধারা’, ‘মেঘরাগ’, ‘নিশিাপান’, ‘ভস্মপুতুল’। চতুর্থ পর্বে (১৯৬৬-১৯৭০) স্মরণীয় ‘সন্ধ্যার সুর’, ‘পাতালকন্যা’, ‘নির্জন শিখর’, ‘তৃতীয় নয়ন’, ‘কাঁচের দরজা’, ‘আলোকপর্ণা’। মূলত শেষ পর্বের কিছু উপন্যাসে আত্মানুসন্ধান ও স্বীকারোক্তিমূলকতা প্রাধান্য পেয়েছে। সেইসব উপন্যাসের বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বে যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাস রচনা শুরু করেছিলেন প্রিয় উপন্যাসিক মিখাইল শলোখভকে আদর্শ মনে ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্য মুছে ফেলে সমগ্র মানবতাকে স্পর্শ করতে, সেই তিনিই কীভাবে শেষ পর্বে অন্তর্মুখী ব্যক্তি-চরিত্রের আত্মবিশ্লেষণের ভাবপ্রেরণাগত নতুন বীক্ষায় এসে স্থিত হলেন, সে বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবনা অপরিহার্য বলে বোধ হয়।

নিজের উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপট এবং ঘোষিত জীবনাদর্শ সম্পর্কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন -

“বাংলাদেশের আরো অনেক লেখকের মতোই আমিও কলম ধরেছিলাম পরাধীন ভারতবর্ষের দুঃসহ অগ্নিযন্ত্রণার মধ্যে... ত্রিশ সালের সত্যগ্রহ দেখেছি, দেখেছি চট্টগ্রামের বিস্ফোরণ... সে দিনের বালক মনে তখন একটি মাত্র সংকল্পই আগুনের অক্ষরে লেখা হয়ে গিয়েছিল। যদি কলম



ধরতে হয়, তবে তা দেশের জন্য; যদি লিখতে হয় তবে তা স্বাধীনতার সংগ্রামকে এগিয়ে দেবার জন্য।”<sup>২</sup> (‘শিল্পীর স্বাধীনতা’, দেশ ২০ পৌষ ১৩৬৯, পৃ. ৮৯)

এই সজাগ দেশপ্রেমের আদর্শনিষ্ঠা আরও ঐকান্তিক হয়েছিল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদা, বিপ্লবী আন্দোলনের গোপন পথিক, শেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধায় ও আস্থা পোষণে। তাই গান্ধীজির অহিংস রাজনীতিতে বিশ্বাসী হয়েও নিজে তরুণ বয়সে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর উপন্যাসে বিশ শতকের তিরিশ ও চল্লিশের দশকের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু প্রেক্ষাপট হিসাবেই ব্যবহৃত হয়নি, চরিত্রের অন্তর্বিকাশে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। লক্ষণীয় যে, তাঁর প্রথম দিকের অধিকাংশ উপন্যাসের নায়কই বিপ্লবী আন্দোলনের শরিক। আবার পরবর্তীকালে শেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের মতোই এই নায়কেরা কৃষক আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, যার পরিণতি মার্কসবাদে দীক্ষাগ্রহণ এবং নতুন সমাজগঠনের স্বপ্ন।

১৯৪২ সালে জলপাইগুড়িতে আনন্দচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনাকালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রগতি সাহিত্যআন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এই সময়েই কলকাতায় ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা, আর কয়েক মাস পরে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ‘ভারত ছাড়া’ আন্দোলনের সূচনা। এই সময়পর্বের ‘তিমিরতীর্থ’, ‘মন্দ্রমুখর’, ‘শিলালিপি’ প্রভৃতি উপন্যাসে বিপ্লবী মার্কসীয় সাহিত্যাদর্শের প্রকাশ অনায়াসদৃষ্ট। তবে কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী না হওয়ায় এবং দলকর্মীর মতাক্রান্ততার বদলে শিল্পীর স্বাধীনচিন্তা বজায় রাখায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্রম-বিকৃতি ও আদর্শ-বিচ্যুতির প্রবণতাকেও প্রত্যক্ষ করেন যন্ত্রণার্ত হৃদয়ে, যেমন ‘শিলালিপি’র রঞ্জন অনুধাবন করেছিল সশস্ত্র বৈপ্লবিকতার অন্তরালে বহমান যুগান্তর-অনুশীলন সমিতি প্রভৃতি দলগুলির অন্তর্কলহ, বিদ্বেষ, বিরোধ, অনৈক্য, দলাদলির ভঙ্গুরপটিকে। ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্বিরোধ, চীন কর্তৃক ভারত-আক্রমণ, ১৯৬২ সালে নীতিগত স্বার্থে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিধাবিভক্তি, শ্রমিক-সংহতির ভাঙন, কমিউনিজমের চৈনিক পররাজ্যলোলুপতা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষাক্ত বীজে পরিণত হওয়া ক্রমশ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিশ্বাসের ভূমিতে রিক্ত-নিঃস্ব করে তোলে। তাই ‘তৃতীয় নয়ন’-এর ভূপেশের জবানিতে আমরা লেখকেরই আক্ষেপোক্তি শুনতে পাই, “সতেরো বছরের বিশ্বাস যদি একদিন হঠাৎ দেউলে হয়ে যায়, তাহলে দাঁড়াবারও আর জায়গা থাকে না।” আমরা লক্ষ করি, ১৯৬৫ সালের ‘অমাবস্যার গান’ উপন্যাসে ‘উপনিবেশ’ বা ‘পদসঞ্চারণ’ থেকে অনেকখানি সরে আসেন লেখক। রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এখানেও নেই এমন নয়, তবে তা পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলির ন্যায় রিপোর্টাজ আকারে বা এপিক বিস্তারে নয়, বরং অনেকখানি প্রক্ষিপ্ত ধরনে। রাজসভার বিদূষকে পরিণত ভারতচন্দ্রের চিত্রণে এক ধরনের নিয়তি-নির্দিষ্ট বা আগে থেকেই স্থিরীকৃত ব্যর্থতা ও পরাজয়ের চেতনা মনঃক্ষোভের সাথে প্রকাশিত হয়, যা ‘নির্জন শিখর’-এর অধ্যাপক দেবনাথ ভট্টাচার্যের সেই ডিটারমিনিজম্-এর পূর্বাভাস। ‘নিছক মতবাদের রুদ্ধ প্রাচীরে শিল্প-ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিতে’ অসম্মত লেখকের জীবন-সায়াহু-পর্বের উপন্যাসে তাই নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, অন্তর্মুখিতা, আত্মানুসন্ধানের প্রয়াস এবং ভাবপ্রেরণাগত এই পরিবর্তনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই শিল্পরূপেরও পরিবর্তন ঘটে - দেখা দেয় আত্মোক্তিপ্রবাহ, মননপ্রবাহ, সাংকেতিকতা ও স্বীকারোক্তির প্রাধান্য।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাসের ধারায় প্রথমে আসে ‘সঙ্ক্যার সুর’ (১৯৬৬)। স্ত্রীকে হত্যা করে তিনদিনব্যাপী স্মৃতিচারণায় সংসারের প্রতি পদে প্রতারিত ও লাঞ্চিত নায়কের স্বীকারোক্তি এই উপন্যাসের উপজীব্য। জবানবন্দীর সূচনায় নায়কের ভাব-সংকট ভাষারূপ পেয়েছে এইভাবে, “আমি কাউক খুন করতে চাইনি। বিশ্বাস করুন, আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এ-কথা স্বীকার করেন তো যে জীবনে কখনো কখনো খুন আর আত্মহত্যা এক হয়ে যায়- দুটোকে আলাদা করা যায় না।... বলতে পারেন কনফেশন। তবে আপনাদের ঐ পুলিশের কাছে নয়, নিজের বিবেকের কাছে।”

চুয়াল্লিশ বছর বেঁচে থাকার পর জীবন যখন বারেরবারে পড়া একটা পাঠ্য-বইয়ের মতোই মুখস্থ, বিবর্ণ, বৈচিত্রহীন হয়ে গেছে, যখন সে জেনে গেছে বাকি জীবন জুড়েও ভবিতব্যের হাতে মার খেয়ে যাওয়াই তার নিয়তি, তখন নিজে মরবার আগে তার চেয়েও নিরুপায়, অক্ষম ও ভাগ্য-পীড়িত স্ত্রী শীলাকে হত্যা করে তাকে জীবন-কারাগার থেকে মুক্ত করতে পারার শেষ সান্ত্বনাটুকু পেতে চেয়েছে কথক। কিন্তু শীলা মরেনি, বরং সে জানিয়েছে যে, সে-ই নাকি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। খালাস পাওয়ার সংবাদে ভেঙে পড়েছে নায়ক। কারণ, সে জানে ‘মৃত্যুর মুক্তি’র বদলে ‘জীবনের নরকে’ বাঁচতে বাধ্য হওয়া আত্ম-ধিকারে, পাপবোধে ও পরাজয়ের চেতনায় কী নিদারুণ গ্লানিময়, কী নিষ্ফল টর্যাজিক! ব্যক্তির অসহায়তা ও পরাভব-বেদনা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে শিল্পরূপ পেলেও, অতিনাটকীয়তা উপন্যাসটির শিল্পধর্মকে ক্ষুণ্ণ করেছে। তুলনায় ‘নির্জন শিখর’ (১৯৬৮) উন্নততর সৃষ্টি। উনিশশো পঁয়ষট্টি খ্রিষ্টাব্দে পঁয়ষট্টি বছরে উপনীত দর্শনের অধ্যাপক দেবনাথ ভট্টাচার্য অধ্যাপনা-জীবন থেকে অবসরপ্রাপ্তির শেষ দিনটিতে দাঁড়িয়ে আত্মবীক্ষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন, নিজের জবানীতেই উপন্যাসের কাহিনি আগাগোড়া পরিবেশন করেছেন, পর্যালোচনা করেছেন তাঁর জীবনের মুখ্য ঘটনা ও ব্যক্তিদের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় নির্মিত নিজেরই স্বরূপের।

ঔপনিবেশিক আমল থেকে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মধ্যবিভের চরিত্রধর্মগত স্ববিरोধ এই যে, একদিকে তার নৈয়ায়িক আদর্শবাদী সামাজিক সত্তা বৃহত্তর কাল ও জীবনের সংঘর্ষমুখর ঘটনাপ্রবাহে যুক্ত হতে চায় রোম্যান্টিক আত্মবিস্তারের আকাঙ্ক্ষায়, কিন্তু ভীরা আনুগত্যপরায়ণ ব্যক্তিসত্তা মধ্যবিভ চরিত্রের বাইরে যেতে পারে না, নিরাপদ স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার দুর্গকে বেছে নিয়ে ভাববাদী দর্শনের মাঝে নিজের পলায়নপর মনোবৃত্তির নৈতিক সমর্থন খুঁজে চলে। অধ্যাপক দেবনাথ ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে তাঁর ডিটারমিনিজম ও বার্গসঁর তত্ত্বলোক সেই নিরাপদ দুর্গ। প্রখ্যাত সমালোচকের প্রণিধানযোগ্য বক্তব্যে বুদ্ধিজীবী মধ্যবিভের প্রতিষ্ঠান-অনুকূল চিন্তাবৃত্তির সংকীর্ণতা ধরা পড়েছে এইভাবে, “পরাধীনতার কালে তাঁদের অনেকেই— যাঁদের establishment-এর বুদ্ধিজীবী বলা যায়—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তোষণ করেছেন। ব্যক্তি এবং সম্পদের নিরাপত্তা ব্রিটিশ শাসনে অটুট থাকবে—এই interest-এর বশবর্তী হয়েই তাঁরা এই তোষণকর্ম চালিয়ে গেছেন। আবার অনেকেই—যদি এঁদের establishment-বিরোধী বলা যায়—ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর মধ্যে নিজেদের বৃত্তিগত সম্ভাবনা সংকুচিত দেখে বেদনাকাতর হয়েছিলেন। ভবিষ্যতের স্বপ্নে তাঁরাই আবার আবেগদীপ্ত হলেন: বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি ঘটলেই বোধহয় সমস্ত সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে। কিন্তু ঔপনিবেশিকতা যে আমাদের সমাজজীবনের বিভিন্ন স্তরে কী ব্যাপক গভীর প্রভাব অনুসৃত করে রেখেছে, তার কোনো যুক্তিসংগত বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন স্বাধীনতার পরেও বুদ্ধিজীবীরা করতে পারলেন না। ঔপনিবেশিক শাসনকালেই অবশ্য এই ব্যর্থতার জন্ম কারণ, বুদ্ধিজীবীরা ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার

পরিমণ্ডলেই ‘মানুষ’ হয়েছিলেন; ফলে ঔপনিবেশিকতা সম্পর্কে মৌলিক কোনো সমালোচনায় তাঁরা ব্যাপ্ত হলে না। তাছাড়া, এইসব বুদ্ধিজীবী তাঁদের মননচর্চার ক্ষেত্রে নিজেদের মর্যাদা বা স্বীকৃতির জন্য শাসককুলের অনুকূলে যে ভাবাদর্শ, তার চার দেওয়ালে বন্ধ থাকতে বাধ্য হয়েছেন। উদারনীতিবাদে আস্থাশীল হওয়া সত্ত্বেও এবং নিজেদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রবর্তনা বোধ করলেও বুদ্ধিচর্চার ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন ‘intellectual satellites of the metropolitan intellectual world,’ স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও আমাদের বুদ্ধিজীবীরা এই ব্যর্থতারই উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন।”<sup>৭</sup> এই বুদ্ধিজীবী-চরিত্র-বিশ্লেষণের সঙ্গে মিলে যায় দেবনাথ ভট্টাচার্যের সলিলকিতে উঠে আসা নাগরিক আত্ম-কণ্ঠন ও ব্যর্থতার গ্লানি, বৌদ্ধিক ও দার্শনিক ভাববিলাসের বাস্তবচেতনারহিত বিফলতার বয়ান, “না— কাউকেই আমি সুখী করতে পারলুম না। বাবাকে নয়, স্ত্রীকে নয়, নিজের সম্ভানকেও নয়। আর নিজেকে তো নয়ই। আমার মতো মানুষেরা কাউকে সুখী করতে পারেও না। আমরা জোর করে দিতে পারি না, নিতেও পারি না। আমাদের মনের নৈয়ায়িক চিরকালের হ্যামলেটের মতো অনিশ্চয়তার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে টলমল করে—শেষ পর্যন্ত একটা নিরাপদ স্বার্থপরতার, একটা আত্মকেন্দ্রিকতার দুর্গকেই আমরা বেছে নিই।”

দারিদ্র্য ও নানা অঘটনে ম্যাট্রিকের আগে পড়া ছাড়তে হলেও প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের বদান্যতায় প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাশ করে, বহরমপুর কলেজে পড়তে গিয়ে, জ্যোতিপ্রকাশের গৃহে থাকাকালীন সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী সিদ্ধার্থের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে দেবনাথ পুলিশি নজরে পড়ে আশ্রয় হারান। নিজের বাবাকে অশিক্ষা, অর্থলোলুপতার কারণে ঘৃণা করেন দেবনাথ, অথচ সিদ্ধার্থের কথায় যখন ইংরেজের চাটুকারিতার জন্য তার লয়্যালিস্ট বাবার প্রতি অশ্রদ্ধা স্পষ্ট ধরা পড়ে তখন দেবনাথ অসম্ভব হন নিজের মধ্যবিত্তসুলভ পিছুটানপ্রিয় ও সংস্কার-অভ্যস্ত ‘অন্যতর শিক্ষায়’ আঘাত লাগার দরুণ। ইতিমধ্যে দরিদ্র পিতা অর্থলোভে পড়ে ধনী পিতার দুলালীকে পুত্রবধূ নির্বাচন করে পুত্রের জোর করে বিবাহ দেন। উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করে এই বিয়ে যে আত্মহত্যারই নামান্তর, তা জানা সত্ত্বেও এবং মুক্তি পাওয়ার রাস্তা থাকা সত্ত্বেও দেবনাথ যে সেদিন চলে যেতে পারেননি, প্রৌঢ় দেবনাথ তার কারণ হিসাবে নিজের মধ্যবিত্ত ভীর্ণতাকেই চিহ্নিত করেন, স্বীকার করেন,

“সেই মুক্তি আমার হাতেই ছিল, তবু তা আমি নিতে পারলুম না। যদি পারতুম তাহলে আমি সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় হতুম- দেবনাথ ভট্টাচার্য হতুম না। কিংবা এও সেই ডিটারমিনিজম্। সব নির্ধারিত হয়ে ছিলো আমার চরিত্রে, আমার ভাবনায়, আমার দুর্বলতায়, আমার ভীর্ণতায়।”<sup>৮</sup>

অবশ্য স্ত্রী মাধুরীর নীচ আচরণে বিয়ের পরপর বাড়ি ছাড়েন দেবনাথ, কলকাতায় পৌঁছে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আনুকূল্যে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন, নিজস্ব যোগ্যতায় কলকাতাতেই অধ্যাপনার সুযোগ পান। মাধুরীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ও তাদের মধ্যবর্তী দেওয়াল পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে। চাকরিজীবনের এক পর্যায়ে জ্যোতিপ্রকাশের মেয়ে বিদ্যুৎ দর্শন পড়ার জন্য তার ছোটবেলার দেবদার সঙ্গে দেখা করতে আসে। দুজনের মধ্যের গভীরতর অনুরাগ প্রেমে ঘনীভূত হয়ে বিয়ের পর্যায়ে পৌঁছালে বিদ্যুৎ সব জানিয়ে মাধুরীকে চিঠি লেখে নৈতিক সততা রক্ষার খাতিরে, বোন হিসাবে তার সব জানানো উচিত এই ভেবে। সব শুনে মাধুরী নিজের স্ত্রীর অধিকারের দাবি নিয়ে উপস্থিত হলে বিদ্যুৎ বিদায় নেয়। পূর্বের শঠ, মিথ্যেবাদী, বিষাক্ত মনের মাধুরী তখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত; তবে বর্তমানের লক্ষ্মীমন্ত, পরোপকারী, সহৃদয় মাধুরীর প্রতিও তো দেবনাথ কোনো আকর্ষণ অনুভব করতে পারেন না। প্রথম যে নারীর সান্নিধ্য দেবনাথকে তার

প্রেমিক সত্তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, দিয়েছে জীবনের অর্থ ও বাঁচার উষ্ণ আশ্রয়, সেই বিদ্যুৎকে হারিয়ে শূন্যতার অতলে তলিয়ে যেতে যেতে আরও একবার দেবনাথ ভাবলেন, এই পরিণামই তার জন্য নির্ধারিত হয়েছিল- একে বদলাবার মত দৃষ্ট পৌরুষ বা দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি তার নেই। অবশ্য পঁয়ষট্টি বছরের দেবনাথ অন্তত বর্তমানে নিজস্ব চিন্তনে বিদ্যুৎকে অন্তরতমার মর্যাদা দান করে অকপটে স্বীকার করতে পেরেছেন, “আজ পঁয়ষট্টি বছরে নিজের কাছে আমি কোনো আবরণ রাখবো না। আমি বিদ্যুৎকে ভুলতে পারলুম না। নারী হিসাবে আমার জীবনে সে-ই বিদ্যুতের মত এসেছে আর মিলিয়ে গেছে। মাধুরী শুধু স্ত্রী হিসাবেই এসেছিল, কিন্তু তার অতিরিক্ত এতটুকু আকাশ, এতটুকু জ্যোতির্ময় বিস্তার তার মধ্যে ছিল না।”<sup>৫</sup> মাধুরী-দেবনাথের ছেলে বারীন শৈশব অবস্থা থেকেই মায়ের প্রতি বাবার শীতল ঔদাসীন্যকে বুঝে নেয়, যেন একপ্রকার মায়ের জয়ের জন্যই বাবার জীবনাচরণ, আদর্শ, মত ও পথের বিরোধিতায় দর্শনের বদলে অর্থনীতি নিয়ে পড়ে, সক্রিয় বামপন্থী রাজনীতি করে, শিপাকে ভালোবেসে বাড়িতে নিয়ে এসে অবাধে মেলামেশা করে। অবশ্য এই মতান্তর ও প্রতিদ্বন্দ্বী মানসিকতার মধ্যে দেবনাথ নিজেরই পূর্বনির্ধারিত নিয়ন্ত্রিত সত্তার মুক্তপক্ষ বিস্তার ও পরিপূরকতা দেখতে পেয়ে তৃপ্ত হোন। যে মধ্যবিভসুলভ পিছুটান ও নিরাপত্তাবোধের কারণে তিনি সত্যাগ্রহে বা বিয়াল্লিশের রক্তঝরা পথে নামতে পারেন না অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে, সেই অনিশ্চয়তাকে জয় করে বারীন নিজ চরিত্রবলে রাজনীতি করে, দৃষ্ট ভাষণ দেয় সভা-সমিতিতে, প্রয়োজনে পুলিশের হাতে প্রহৃত হতেও পিছপা হয় না। দর্শনের ভাববিলাসের নির্জন শিখরে বসে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পলায়নপরতার ছদ্মবেশ বলে চিনতে পারেন দেবনাথ, চিনতে পেরে বৃহত্তর জীবন-সমুদ্রে বারীনের কর্মময় অংশগ্রহণের মধ্যে নিজের ভীর্ণ মধ্যবিভ ‘আমি’-র প্রতিফলন না দেখে পরম আনন্দ অনুভব করেন। কিন্তু সেই বারীনও একটা সময়ে দেশ-দেশের কথা ভুলে আত্মসুখের স্বার্থে যখন রাজনীতি ত্যাগ করে এল.আই.সি অফিসারের চাকরি ‘ম্যানেজ’ করে নিল, দেবনাথ বুঝলেন যে, তার-ই ভীর্ণ, কাপুরুষ, নিরাপত্তা প্রিয় সত্তা তার ছেলের মধ্যে বংশগতির উত্তরাধিকার স্বরূপ কী ভয়ঙ্কর বিষবৃক্ষের মত বিকশিত হয়ে উঠেছে! বুদ্ধিজীবী মধ্যবিভেদর এই নৈতিক ও আত্মিক সংকট অকপট, নির্মম স্বীকারোক্তির আকারে ধরা পড়েছে দেবনাথের জবানীতে -

“ভেবেছিলুম - যা আমি পারবো না, তা আমার ছেলে পারবে; তার জন্মগত প্রতিযোগিতায় সে আমাকে ছাড়িয়ে অনেক উর্ধ্বে উঠে যাবে। কিন্তু পারলো না। আমার জন্মবীজের অভিশাপ নিয়ে আমারই বিকৃত বিকলাঙ্গ সত্তা হয়ে, আমাকেই বিদ্রূপ করে গেল। তার মধ্য দিয়ে আমি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গেলুম।”<sup>৬</sup>

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ব্যক্তিজীবনে দেবনাথ ভট্টাচার্যের মতোই ভালো ছাত্র ছিলেন, এম-এতে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়েছিলেন, এক বছর পড়াশোনা করতে পারেননি, রেণু ও আশা - দুই স্ত্রীয়ার মধ্যে বিভাজিত হয়ে দ্বন্দ্বর্জরতা তাঁরও ছিল, আর রাজনৈতিক চেতনার জগতে এক বিশ্বাসের ভাঙন থেকে আরেক বিশ্বাসের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে তাঁর ক্লাস্ত দেউলে হয়ে যাওয়ার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ, দেবনাথের সংকট অনেকখানিই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিজস্ব সংকটের প্রক্ষেপণ, এ কথা স্বীকার্য। সে অর্থে, ‘নির্জন শিখর’ সীমিতার্থে আত্মজীবনীমূলক স্বীকারোক্তি-উপন্যাসও বটে।

‘তৃতীয় নয়ন’ (১৯৬৯) উপন্যাসে ইন্দিরা, ধীরাজ সেন, ভূপেশ দস্তিদার তিনটি প্রধান চরিত্র। তিনজনের আত্মকথনের মধ্যে দিয়ে একের অন্য দু’জন সম্পর্কে এবং নিজের সম্পর্কেও কিছুটা স্বগতোক্তিতে, কিছুটা

সংলাপে দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত ফুটে উঠেছে মাত্র। চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রায় নেই বললেই চলে। আত্মনিরীক্ষায় शामिल হয়ে বিভিন্ন বিপরীতধর্মী আবেগ-যুক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের আয়নায় সমস্ত অস্বচ্ছতা কাটিয়ে নিজের অকৃত্রিম স্বরূপটিকে আবিষ্কার ও স্বীকার করার যে জটিল বহুরৈখিক কৌশল স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাসে দেখা যায়, তা এই উপন্যাসে অনুপস্থিত। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে ইন্দিরা তরুণী বয়সে রহস্য, দুর্বোধ্যতার প্রতি আকর্ষণবশত বিপ্লবী মার্কসবাদী ভূপেশের কার্যকলাপ ও বাঁশির সুরে মুগ্ধ হয়ে একধরনের রোম্যান্টিক প্রণয় অনুভব করে। অবশ্য ভূপেশের ডাকে ঘর ছেড়ে বিপ্লবের পথে পা বাড়ানোর মত না ছিল তার কঠোর আদর্শ, না প্রেমের আত্মঘাতী গভীরতা। অন্যদিকে, ভূপেশ সাঁওতালদের সংগঠিত করে বিদ্রোহের আয়োজন করলে পুলিশি ধরপাকড় থেকে বাঁচতে পালিয়ে যায় পূর্ববঙ্গে, ধরা পড়ে কারাগারে দীর্ঘ কয়েকবছর শারীরিকভাবে অত্যাচারিত হয়, অবশেষে ভগ্নস্বাস্থ্যে গ্যাস্ট্রিক আলসার আর টিউবারকুলোসিস নিয়ে ফিরে আসে পশ্চিমবঙ্গে। ততদিনে শুধু তার দৈহিক ক্ষয়ই ঘটেনি, ঘটেছে মানসিক মৃত্যুও। কমিউনিস্ট চিনের ভারত-আক্রমণ, পররাজ্যলোলুপতার হিংস্র চেহারা, নীতিগত দ্বন্দ্ব ভারতের মার্কসবাদী পার্টির ভাগ হয়ে যাওয়া ও দলাদলি ভূপেশের সমাজতত্ত্ববাদী বিশ্বাসকে আমূল আঘাত করে তার এতদিনের সংগ্রাম, আদর্শ ও অস্তিত্বকে করেছে অর্থহীনতায় পর্যবসিত। সরকারি চাকুরের মেয়ে ইন্দিরার স্বাভাবিকভাবেই বিয়ে হয়েছে সরকারি জজ ধীরাজের সাথ, যার মধ্যে ‘নির্জন শিখর’-এর অধ্যাপক দেবনাথ ভট্টাচার্যেরই ছায়াপাত লক্ষ করা যায় অনায়াসে। ধীরাজ দেবনাথের মতোই ডিটারমিনিজম তত্ত্বের আলোকে জীবনকে দেখে—সবকিছুই পূর্বনির্ধারিত, নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত। তার বিশ্বাস “নাটক কেউ লিখে রেখেছে—তুমি এক জন্মতাড়িত অভিনেতা, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে— ঘটনা থেকে ঘটনায় তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে, একটা সিচুয়েশন বদলাতে পারো না তুমি— একটা ডায়লগ পর্যন্ত না।” আর এই সর্বাঙ্গিক অক্ষমতার জন্যই তার মত মানুষের কাজ শুধু ‘ভূশঞ্জীর কাকের’ মত দেখে যাওয়া, বুদ্ধি সজাগ রেখে নিরাসক্ত দার্শনিকের ন্যায় বিশ্লেষণ করে যাওয়া।

এই তিন নর-নারীর দৈব-সংযোগে পুনরায় সাক্ষাৎ এবং একত্রে আবহাওয়া-পরিবর্তনের জন্য এসে একদিনের কালগত পটভূমিকায় আত্মচারণার মধ্যে দিয়ে কিছু কিছু সত্যের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ইন্দিরা বুঝেছে, ধীরাজকে সে উপযুক্ত বৌদ্ধিক সাহচর্য দান করতে পারে না। নিজের সেই অপারগতার জন্য ধীরাজের দেওয়া আর্থিক নিরাপত্তা, জাগতিক সুখ ও ঐশ্বর্যকে সম্মান জানাতেই সে নিজের প্রকৃতিপ্রেমী, রোম্যান্টিক আমি-র মৃত্যু সহ্য করেও শুধুমাত্র স্ত্রীর কর্তব্য পালনের জন্য বেঁচে থাকবে। এই দাম্পত্য যে প্রেমহীন, শুধুই অভ্যাসের ক্রমিক অনুশীলন মাত্র, সে সত্য তার স্বগত-উজ্জ্বলিত ধরা পড়েছে,

“বাড়ির ছাদে যে টবের গাছগুলোতে তিনি কখনো কখনো বিকেলে নিজের হাতে জল দেন, অথচ দুটি বেলের কুঁড়ি, একগুচ্ছ জুঁই অথবা একটা লিলির ডাঁটি উঠলে চেয়েও দেখেন না, তাঁর জীবনে আমার জায়গা ঠিক ওই রকম। আমাকে উনি বাঁচিয়ে রাখতে ভালোবাসেন, কিম্বা বাঁচিয়ে রাখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, তাই আমি ওঁকে খুশি রাখবার জন্যই অনেক দিন বেঁচে থাকব।”<sup>১</sup>

ধীরাজের কাছে জীবন একটা থিয়োরি, মানুষ একটা ইম্প্রেশন, কতকগুলো বুদ্ধি-যুক্তি-বিন্যাসের সমষ্টিমাত্র। তাই ইন্দিরার রক্ত-মাংসের ব্যক্তিসত্তাকে সে গুরুত্ব দেয়নি, তার আবেগ-অনুভূতি-ইচ্ছা-অনিচ্ছার স্বতন্ত্র জগতকে স্বীকার করেনি। বরং নিজের ফাঁপা দার্শনিকতার ছাঁচে স্ত্রীকে গড়তে গিয়ে ইন্দিরার আদি-অকৃত্রিম নারীসত্তাকে হত্যা করেছে। সুখ-অসুখ, জীবন-মৃত্যু ইত্যাদির উর্ধ্বে নিজের অবস্থানের

ভ্রান্তিকে আঁকড়ে থেকে ইন্দিরার মানসিক আশ্রয়হীনতার অসুখকে বহুগুণিত করে গেছে মাত্র। এই সত্য ধীরাজের অবগত, না হলে সে নিজের পরিপাটি বসার ঘরের অভ্যন্তরস্থ বেসুর বিচ্ছিন্নতাকে স্বীকার করতে পারত না, “তবু জীবনে অ্যাকর্ড তৈরি করা অসম্ভব নয়। কম্প্রোমাইজও করা যায় খানিকটা। আমি অস্বীকার করবো না—ইরার সঙ্গে আমার তাও হয়নি। দু-নদীর জল পাশাপাশিই বয়ে গেল। অথচ, সাদা চোখে আমার সংসারের দিকে তাকাও। নির্বাণট সুখী সংসার। মধ্যবিত্ত পরিবারের অভাবী ড্রাজারি নেই, দাম্পত্যকলহ নেই, মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্য আছে এবং—এবং—অ্যানাদার ভ্যানিটি—সামাজিক মর্যাদাও কিছু আছে।”<sup>৮</sup> অবশ্য এই স্বীকারোক্তির মধ্যে কোথাও ধীরাজের আত্মদহন বা অপরাধবোধের তীব্রতা অনুভূত হয় না।

ব্যক্তিগত জীবন ও বৃহত্তর জীবনে পরাজিত, নিঃশেষিত, ভগ্নমনোরথ ভূপেশের সংকট আসলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনৈতিক চেতনা তথা সাহিত্যাদর্শে ক্রমশ আস্থা হারানো ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়েরই নিজস্ব সংকট। সে অল্প বয়সে হিন্দুকে ভালোবেসে পায়নি, নিরুকে নিজের বিপ্লবী মতাদর্শের যোগ্য সঙ্গিনী হিসাবে পেয়েও হারিয়েছে, সর্বোপরি কমিউনিজমের সর্বহারার একনায়কতন্ত্র ও শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থার ইউটোপীয় চেতনার প্রত্যয়ভূমি হারিয়ে সে আজ ভবিষ্যতহীন, বর্তমানহীন নিজের অতীতের ভস্মাবশেষ মাত্র, এ সত্য সে স্বীকার করে নিয়েছে। ধীরাজ-ইন্দিরার দাম্পত্য-সম্পর্কে তার ও ইন্দিরার বাল্যপ্রণয়-সম্পর্কের কোনো কুপ্রভাব-বিস্তারকারী ছায়াপাত ঘটেছে কিনা, সে সম্পর্কিত ক্ষণিকের আলোড়ন ব্যতীত এই চরিত্রটিও সরলরৈখিক। এক চূড়ান্ত নাটকীয়তার মধ্যে দিয়ে ভূপেশের মৃত্যুও যেন জোর করে আরোপিত মনে হয় ; যেন সে মৃত্যুর আয়োজন ধীরাজের অকস্মাৎ নবজাগরিত চেতনার স্বীকৃতি আদায়ের জন্যই, “ইরা, তুমি তিলে তিলে মৃত্যুর কথা ভেবেছ। আমি জীবন-মৃত্যুকে এক করে নিয়ে এক নকল নিরাসক্তির নির্বোধ নায়ক ছিলাম। আজ এই মৃত্যুটা প্রমাণ করলো বেঁচে থাকার ঐশ্বর্য কত বেশি, নিরাসক্তিটা কী নিরর্থক প্রলাপ।”<sup>৯</sup>

ধীরাজের সদর্শক এই জীবন-প্রত্যয়ে পৌঁছানোর রাস্তা আত্মবিশেষণ, অপরাধবোধ, ভ্রান্তি ও সত্যের মুহূর্হু টানাপোড়েন, স্বীকারোক্তি ও যন্ত্রণাশুদ্ধ উত্তরণের দীর্ঘ মানস-প্রস্তুতির মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠল না। তাই ধীরাজ যখন নতুন করে বাঁচার কথা বলে, তখন সন্দেহ থেকেই যায় যে, এও তার তত্ত্বপিপাসু মনের কোনো কৃত্রিম ভাবতিরেক কিনা। সে সংশয় তার নিজেরও মন থেকে যায়নি। তাই তো, ভূপেশের মহান মৃত্যুতে জীবনের দাম সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পর নতুন করে স্ত্রীকে নিয়ে বাঁচার পরিকল্পনার পরমুহূর্তেই কিছুক্ষণ থেমে সেই পরিকল্পনার সাফল্য বিষয়ে সন্দিহান হয়ে তাকে বলতে হয়, “কী জানি।” ইরার উত্তরহীনতা আর ধীরাজের এই অনিশ্চিত সংশয় স্বীকারোক্তির শিল্পমূল্যকে খর্ব করে, উপন্যাসটিরও।

‘কাচের দরজা’ উপন্যাস যথার্থ স্বীকারোক্তিমূলক। তবে এর শিল্পাঙ্গিকে নতুনত্ব আছে। সাংকেতিকতায় সমৃদ্ধ, গতিতে খরধার, ব্যঞ্জনায ঋদ্ধ উপন্যাসটির গঠনকৌশলে নাট্যধর্মিতার লক্ষণ পরিস্ফুট। শুধু নাট্যলক্ষণ নয়, কাহিনিগত সংহতি, সংলাপের গুরুত্ব, ঘটনার গতি ও চমৎকারিত্ব নাট্যোপন্যাস নির্মাণের অভিপ্রায়কে স্বীকৃতি দেয়। এখানে চরিত্রের আত্ম-নিরীক্ষা, উন্মোচন, স্বীকারোক্তি অন্যান্যরূপে ক্ষেত্র অনবচ্ছিন্ন নির্জনতার মধ্যে ইনটেরিয়র মনোলগের মাধ্যমে নয়; বরং একে অন্যের মুখোমুখি বসে, সংলাপ-প্রতিসংলাপ-আশ্রয়ে এবং নাটকসুলভ আরোহণ-ক্লাইম্যাক্স-অবরোহণ পদ্ধতির বিন্যাসে।

বিদেশ থেকে সদ্যফেরত প্রবালের সাথে দেখা করতে আসে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু নিত্যানন্দ সোম। প্রবালের স্ত্রী সীমা পিকনিকে গেছে বলে দুজনেই জানে। নগরজীবনের প্রাণহীন যান্ত্রিকতা, পুরনো মূল্যবোধগুলির

বিনষ্টি, পূর্ববঙ্গের মায়াময় প্রকৃতি ও অতীত জীবনের প্রতি নস্টালজিয়া ইত্যাদি নিয়ে কথোপকথনের এক পর্যায়ে প্রবাল খুঁজে পায় সীমার রেখে যাওয়া চিঠি। সে চিঠিতে আত্মিক বিচ্ছিন্নতার দেওয়াল-ওঠা দাম্পত্য ও নিষ্প্রাণ জীবনের অসহ্য বন্ধন পরিহার করে সীমার চিরকালের মত চলে যাওয়ার কথা ছিল লিখিত। সীমার এই বিদায়-গ্রহণ প্রথমে সোমকে ও পরে প্রবালকে বিবেক-তাড়িত করে, তারা নিজেদের মুখোমুখি বসে নিজেদের ভূমিকার পর্যালোচনা করতে তৎপর হয়, ‘সীমার চলে যাওয়ার আয়নায়’ নিজেদের মুখ-মুখোশ-মুখশ্রী উন্মোচনের উদ্দেশ্যে স্বীকারোক্তির পথ অবলম্বন করে।

অবিবাহিত সোম স্বীকার করে, কীভাবে বাল্যবন্ধু প্রবালের বিশ্বাস ও নির্ভরতার সুযোগ নিয়ে সীমাকে ‘সিডিউস’ করে তার সঙ্গে অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক সে তৈরি করেছিল। তবে এই পর্যায়ে সোম-সীমার কথোপকথনের মাধ্যমে এ সত্যও অস্পষ্ট থাকে না যে, সীমার মধ্যেও শূন্যতা ছিলো, স্বামীর কাছে আর্থিক নিরাপত্তা-বস্ত্রগত ঐশ্বর্যবিলাসের সমস্ত উপকরণ পেলেও হৃদয়-সংযোগের আন্তরিক আশ্লেষ সে পায়নি, তাই সোমের স্তুতিবাদে বিভ্রান্ত হয়ে রামধনু-রাঙা আকাশের খোঁজে সোমকে সে প্রশয় দিয়েছিল। অন্যদিকে, প্রবাল স্বীকার করেছে রত্না চৌধুরীর সাথে তার পরকীয়া সম্পর্কের কথা, সীমাকে সম্পূর্ণ ভালোবাসতে না পারার কথা। সীমার অর্থ ও বস্ত্ররতিময় জীবনদৃষ্টিই হয়তো প্রবালকে ঠেলে দিয়েছে অপ্রেম-পীড়িত রত্নার দিকে। রত্না আমেরিকায় গিয়ে গাড়ি-দুর্ঘটনায় মারা গেছে। শেষে সীমার ফোন এলে যখন সোম ও প্রবাল জানতে পারে যে, সীমা পিকনিকেই গেছে, তার চিঠিটা আসলে বহুদিন আগের কোনো এক অভিমানহত মুহূর্তের রচনা, আজকের নয়, ততক্ষণে ঘষা কাচের অস্বচ্ছ দরজাটা তাদের সামনে থেকে সরে গেছে। নিজেদের অকপট আত্মপরিচয়লাভে অন্তর্ভাষণের আর কোনো জায়গা তখন নেই। অবশ্য সীমার ফোন ও ফেরার খবরে পূর্বকার সমস্ত স্বীকারোক্তি সোমের কাছে হয়ে উঠেছে অসহ্যকর প্রহসন। স্বীকারোক্তির মাধ্যমে নিজ স্বরূপের যে নগ্নতা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, তারপরে তার পক্ষে আর সম্ভব নয় প্রবাল বা সীমার বন্ধু হয়ে থাকা। তাই সে পালিয়েছে। আর প্রবাল মানস-সংকটের বিপজ্জনক কিনারায় পৌঁছে সুস্থ জীবনবোধে ফেরার আকুলতা জানিয়েছে তার মামা অসীম রায়ের কাছে, “আমাদের যেতেই হবে মামা। জীবনের একটা মানে কোথাও আমাদের পাওয়া দরকার।”<sup>১০</sup>

উপন্যাসের উপসংহারের অনেক আগেই প্রবাল বর্তমান সমাজে প্রতিটা মানুষের নিঃসঙ্গ দীপের মত অন্যকে ফাঁকি দিয়ে ও ফাঁকি পেয়ে বেঁচে থাকার, একে অন্যকে মানবিক অনুভববেদ্যতায় ছুঁতে ও বুঝতে না পারার ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ ও শুভবোধের আততিকে স্বীকারোক্তির আকারে ব্যক্ত করেছিল, “সোম, যে-জীবনের মধ্যে তুমি আমি আমরা বেঁচে আছি, সেখানে কোনো সততা নেই, কোনো বিশ্বস্ততাও নেই। সে-সব মূল্যবোধ আমরা হারিয়ে ফেলেছি, যা জীবনের গভীরতম শেকড়কে আঁকড়ে আছে,...। আমাদের কোনো আদর্শ নেই বলে কেউ সং হতে পারি না, বিশ্বস্ত হতে পারি না। পরস্পরকে অনেকখানি ফাঁকি দিয়ে আমরা কম্প্রোমাইজ করে নিই—একভাবে চলতে থাকে, ফাঁকিটা বাড়তে বাড়তে একদিন হঠাৎ ভেঙে পড়ে সব।”<sup>১১</sup> আসলে এই নির্মম সত্য শুধু সোম বা প্রবালের ব্যক্তিগত উচ্চারণ নয়, বরং আত্মসর্বস্ব পুঁজিলোভী স্বার্থপর বিবিধ প্রতীতি নাগরিক মানুষের অন্তর্নিহিত বিবেকী সত্তার সম্মিলিত স্বীকারোক্তি।

উপরে আলোচ্য উপন্যাসগুলির দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখব, এগুলিতে যে চরিত্রদের অবলম্বন করে মূলত কনফেশন গড়ে উঠেছে তারা সকলেই সমাজের উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্গত। যেমন, ‘নির্জন শিখর’-এর দেবনাথ ভট্টাচার্য দর্শনের অধ্যাপক, ‘তৃতীয় নয়ন’ উপন্যাসের ধীরাজ সেন কোর্টের জজ এবং

দার্শনিকচিত্ত, ‘কাচের দরজা’ উপন্যাসের প্রবাল স্ট্যাটিস্টিশিয়ান ও সোম পেশাদার ফটোগ্রাফার। এরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী ও জীবনতাত্ত্বিক গোত্রের। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমকালে রমাপদ চৌধুরী যখন তাঁর ‘খারিজ’, ‘লজ্জা’ প্রভৃতি স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাসে ছাপোষা মধ্যবিভেদের শ্রেণিস্বার্থ-চেতনা, সমাজভীতি, ভণ্ডামিকে তুলে ধরেন, দিব্যেন্দু পালিত ‘আমরা’ উপন্যাসে যেখানে নিম্ন-মধ্যবিভেদের অসম আর্থিক সংগ্রাম ও চরম অনির্দেশ্যতার মাঝে তার অননুভূত অস্তিত্বের স্ববিরতাকে ভাষারূপ দেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সেখানে তাঁর স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাসে স্বাধীনতা-উত্তর কালে তথাকথিত ইন্টেলেকচুয়ালদের নাগরিক আত্মকেন্দ্রিকতা, জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা ও শিথিল বিরোধপূর্ণ মধ্যবিত্ত মানসিকতা-জনিত আত্মিক সংকটকে দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেন।

#### তথ্যসূত্র:

- ১) ঘোষ, সন্তোষকুমার, ‘এই বাংলা’, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৮, পৃ. ১৫৭-৫৮।
- ২) গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, শিল্পীর স্বাধীনতা’, দেশ, ২০ পৌষ ১৩৬৯, পৃ. ৮৯।
- ৩) নাগ, শ্রীরঞ্জু, ‘বুদ্ধিজীবীদের কাল শেষ হল’, ‘কম্পাস’, ৩ এপ্রিল ১৯৭১ সংখ্যা।
- ৪) নির্জন শিখর, ‘নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী’ দশম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, তৃতীয় মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪২২, পৃ. ১৬৩।
- ৫) প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩।
- ৬) প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯।
- ৭) গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, ‘তৃতীয় নয়ন’, ‘সেরা পাঁচটি উপন্যাস’, মিত্র ও ঘোষ, কার্তিক ১৪২১, পৃ. ২০৮।
- ৮) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।
- ৯) প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১।
- ১০) গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, ‘কাচের দরজা’, ‘সেরা পাঁচটি উপন্যাস’, মিত্র ও ঘোষ, কার্তিক ১৪২১, পৃ. ৩৩৭।
- ১১) প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬।





# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 693-692

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.057



## মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য ধারায় অন্ত্যজ নারী ও আদিবাসী জীবন জিজ্ঞাসা

বিকাশ মণ্ডল, স্বাধীন গবেষক, বালিগুমা, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 13.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*Mahashweta Devi was one of the greatest novelist and fiction writers of Bengali language. She was also known to be an active social worker. That is why; she had the opportunity to observe the people different areas very closely, most of which are indigenous communities and which lies in the lower stratum' of society, like the Bagdi, Dom, Pakhamara, Ganju, Mal, Khariya, Bauri etc. Based on her real life experiences, she has created many literature by using the social life of those inferior communities which have represented different ethnicities in different fields. She emerged in Bengali literature in 1956 by writing 'Jhasir rani', an autobiographical fiction. Besides her novel she wrote many short stories wherein we find many tribal and subaltern women characters who always remonstrate against their social and sexual exploitation or deprivation. In her short story 'Droupadi', 'Shikar' we draw up the main protagonist two tribal characters who protest against their sexual exploitation. But in her 'Bayen' 'Rudali' 'Dhouli' she left a big question about social stigma against subaltern women. She spent most of her life with the indigenous tribal people and with the communities who were on the 'lower stratum' of Culture. In this article, we will try to highlight the 'life' and 'lore' of different tribal culture and subaltern women of the communities of 'lower stratum' in Mahashweta Devi's literature and it will also be discussed how she played her role to help them.*

**Keywords:** Tribe, Subaltern women, Lifestyle, Deprivation, Suppression.

বাংলা সাহিত্যের ধারায় এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। অবিভক্ত বাংলাদেশের খ্যাতনামা লেখক, পণ্ডিত, বুদ্ধজীবী, সৃজনশীল পরিবারে ১৯২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মহাশ্বেতা দেবী ছিলেন একধারে কবি, শিল্পি এবং বিদ্রোহী সমাজকর্মীও। তিনি অনেক পরিচিতদের মধ্যে একজন কল্লোল আন্দোলনের অগ্রদূত ও বাংলা সাহিত্যের ধারায় একটি বিশিষ্ট আধুনিকতাবাদী আন্দোলনের সহযোদ্ধা। মহাশ্বেতা দেবীর পরিবারের মাতৃ ও পৈত্রিক দিক ছিল পণ্ডিত্য এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের বিশেষ অধিকারী। তিনি সাপ্তাহিক, প্রগতিশীল একাডেমিক লেখার সুবাদে একটি স্বাধীন পথ অনুসরণ করে নিজেকে একজন বিশিষ্ট কর্মী এবং লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। মহাশ্বেতা দেবীর বেশিরভাগ কাজই প্রান্তিক, নিম্নবিত্ত, পর্ব-১, সংখ্যা-৩, জানুয়ারি, ২০২৫

নিপীড়িত আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি এই সম্প্রদায়ের মহিলাদের উপর বিশেষ মনোযোগ দেন। কারণ তিনি লক্ষ্য করে দেখেছেন ঐ জনজাতির মানুষেরা প্রায়শই কাঠামোগত নিপীড়নের শিকার হয়। তিনি কেবলমাত্র লেখকই ছিলেন না, আদিবাসী অধিকারের জন্য ভারতের অগ্রগণ্য কর্মীদের মধ্যে অন্যতম একজন। মহাশ্বেতা দেবীর লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ ও বই সক্রিয়তা এবং প্রবৃত্তির জন্য বিশেষ খ্যাতিনামা। যে গুলি পাঠ করলে আদিবাসীদের সাথে জড়িত অনেক কিছুর মেলবন্ধন খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর পারস্পরিক সহযোগিতা ১৯৬৫ সালের দিকে ‘পালামউ’-এর আদিবাসীদের সাথে শুরু হয়েছিল। তিনি উপজাতীয় এলাকায় ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছিলেন বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য রাজ্যে।

মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য ধারায় অন্ত্যজ নারী ও আদিবাসীদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। বাস্তব অভিজ্ঞতা নির্ভর সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিস্থাপন করে তিনি একাধিক কালজয়ী সাহিত্য সৃজন করেছেন, যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করেছে সাঁওতাল সহ অন্যান্য জনজাতিসমূহ। মহাশ্বেতা দেবী ১০০টিরও বেশি উপন্যাস এবং ২০টিরও বেশি ছোটগল্প সংকলন রচনা করেছেন। তিনি মূলত বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন। লেখকের অনেক লেখা/বই/সাহিত্যকর্ম বিদেশি (যেমন- ইংরেজি, জার্মান, জাপানি, ফরাসি এবং ইতালীয়) ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য ধারায় বারে বারে উঠে এসেছে ডোম, পাখমারা, ওঁরাও, গঞ্জ, মাল, খেড়িয়া, লোধা-শবর প্রভৃতি জনজাতির কথা। মহাশ্বেতা দেবী অন্ত্যজ নারী ও আদিবাসীদের জীবন উপজীব্য করে প্রচুর ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনা করেন। এসব লেখা নিয়ে একাধিক গল্পগ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্পগ্রন্থ হল ‘শালগিরার ডাকে’ (১৯৮২), ‘ইটের পরে ইট’ (১৯৮২), ‘হরিরাম মাহাতো’ (১৯৮২), ‘সিধু কানুর ডাকে’ (১৯৮৫) প্রভৃতি। জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি অতিবাহিত করেছেন অন্ত্যজ আদিবাসীদের সঙ্গে। উদ্দিষ্ট জনজাতির ভৌগোলিক পরিবেশ-পরিস্থিতি-অবস্থান, পার্থিব জীবন-যাপন প্রণালী, সুস্পষ্ট জীবন ধারা অনুধাবন এবং উপলব্ধিজাত জীবনভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে তাঁর সৃজনী শিল্পে। সেই কারণে তাঁর একাধিক লেখা হয়ে উঠেছে অন্ত্যজ শ্রেণির ঐতিহাসিক দলিল। ইতিহাসের সমান্তরালে তিনি রচনা করেছেন জনবৃত্ত অন্বেষণের বিকল্প ইতিহাস। আর এই ইতিহাসের ভেতরেই সুপ্ত থাকে সমাজনীতি, অর্থনীতি এবং তার আনুষঙ্গিক আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, দেশজ জীবন-ব্যবস্থা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি অন্ত্যবাসীদের সংগ্রামের মানসিক চেতনার বিকাশ ঘটাতেই বিকল্প এক ইতিহাসের উন্মোচন করেছেন। নানাবিধ কারণেই লেখক বিশেষভাবে নারীদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অন্ত্যজ ও আদিবাসী নারীচরিত্রে বহুমুখী প্রতিবাদী স্বর পরিলক্ষিত হয়। তাঁর সাহিত্যে লালিত নারীসমাজ অনন্যতায় ভাস্বর। বীর্যে, বুদ্ধিতে, সাহসে, প্রতিবাদ- প্রতিরোধে, প্রেমানুভূতি ও প্রেমাকাঙ্ক্ষায় নারীকে স্বমহিমাময় করে দেখার আর্তি বা আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায় মহাশ্বেতা দেবী সৃষ্ট নারী চরিত্র সৃজনে। অবশ্য এসব কিছুর অধিকাংশ সম্ভব হয়েছে তাঁর বহুমুখী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-ধর্মীতার জন্য।

খ্যাতিমান লেখক এবং সংস্কৃতি ও মানবাধিকার কর্মীও ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী, যা তাঁর সাহিত্য সম্ভারের বিষয়-বৈচিত্রতা এবং পরিপূর্ণতা দান করেছে। অরণ্যচারী জন-জীবন সৃজনে, তিনি ‘সাব-অলটার্ন’ ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছেন। উপজাতিদের বঞ্চণা ও বিভিন্ন সমস্যার কথায় প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর ছোটগল্পগুলিতে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রান্তীয় গোষ্ঠীদের পরিবর্তন সাপেক্ষে, ভারতীয় সমাজ-রাজনীতি ভাবনার পরিবর্তিত

রূপচিত্র - যা আসলে বিপন্নতার দলিল এবং সাহিত্য রচনার আধারে স্থানীয় ইতিহাস সৃজনের নবোদ্ভূত কৌশল। আখ্যান গ্রন্থনে কেবল সমাজতত্ত্বই উঠে আসেনি, সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-কূল সমাজ-মনস্তত্ত্বের সন্ধান পান। আলোচ্য নিবন্ধে মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য ধারায় অন্ত্যজ নারী ও আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতির পরিসর নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ তাঁর বেশিরভাগ লেখাই পাঠক ও সাধারণ শ্রেণির হৃদয় ছুঁয়ে যায়। তাঁর কথা হচ্ছে যে,

‘আমি সর্বদাই বিশ্বাস করি যে, সত্যিকারের ইতিহাস সাধারণ মানুষের দ্বারা রচিত হয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সাধারণ মানুষ যে লোককথা, লোকগীতি, উপকথা ও কিংবদন্তিগুলি বিভিন্ন আকারে বহন করে চলেছে, তার পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে আমি ক্রমাগত পরিচিত হয়ে এসেছি।’<sup>১</sup>

প্রথম জীবনে সাংবাদিকতার পাশাপাশি তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্পনীতি সমালোচনা করে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখনী ধরেছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর লেখা ‘হাজার চুরাশির মা’, ‘তিতুমীর’, ‘অরণ্যের অধিকার’ অবিস্মরণীয় রচনা হিসেবে বাংলা সাহিত্যে স্বীকৃত। তাঁর লেখা উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে ‘রুদালি’-র মত কালজয়ী সিনেমা। পরবর্তীকালে তিনি বামপন্থী রাজনীতির আন্দোলনের ধারা থেকে সরে আসেন, রাজা-রাজনীতিতে সিক্সগুর্-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় তাঁকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় দেখা যায়।

সাংবাদিক ও সৃজনশীল লেখক হিসেবেও কাজ চালিয়ে যান মহাশ্বেতা দেবী। পশ্চিমবঙ্গের লোথা ও শবর উপজাতি, নারী ও দলিতদের নিয়ে পড়াশোনা করেন। তাঁর প্রসারিত কথাসাহিত্যে তিনি প্রায়শই ক্ষমতাশালী জমিদার, মহাজন ও দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি আধিকারিকদের হাতে উপজাতি ও অস্পৃশ্য সমাজের অকথ্য নির্যাতনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। মহাশ্বেতা দেবী লেখার উপাদানগুলো সংগ্রহ করেছেন সমাজের সবহারানোদের মাঝ থেকে, দলিত-নিম্নশ্রেণির লোকের কাছ থেকে। আজীবন কাজ করেছেন এদের নিয়ে, পড়াশোনাও করেছেন। তাইতো এসব শ্রেণি নিয়ে তাঁর গর্ব। সগৌরবে বলতে পারেন-

‘...আমার লেখার কারণ ও অনুপ্রেরণা হল সেই মানুষগুলি যাদের পদদলিত করা হয় ও ব্যবহার করা হয়, অথচ যারা হার মানে না। আমার কাছে লেখার উপাদানের অফুরন্ত উৎসটি হল এই আশ্চর্য মহৎ ব্যক্তির, এই অত্যাচারিত মানুষগুলি। অন্য কোথাও আমি কাঁচামালের সন্ধান করতে যাব কেন, যখন আমি তাদের জানতে শুরু করেছি? মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার লেখাগুলি আসলেই তাদেরই হাতে লেখা।’<sup>২</sup>

গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে গ্রাম-বাংলার নিঃস্বজনের বেদনার প্রকৃত ছবিটা উপলব্ধি করেন মহাশ্বেতা দেবী। এসব বিষয়ে তিনি বিভিন্ন মহলে লেখা-লিখিও করেন। সরকার পক্ষকে জানান। তাঁদের এই সমস্যার কথা জানানোর অন্যতম মাধ্যম ছিল মহাশ্বেতার সাহিত্য কলম। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা ও অন্যান্য পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা হিসাবে ‘লোথা সংখ্যা’, ‘মুন্ডা সংখ্যা’, ‘ওঁরাও সংখ্যা’ প্রকাশ করে সমাজে বিভিন্ন বার্তা দিয়েছেন। সামাজিক অবস্থান, সমাজ- সংস্কৃতিতে তাঁদের ভূমিকা, জীবনাচারণ প্রক্রিয়া প্রভৃতি দিকগুলি অনুপঞ্জভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তেমনি মুসলিম সমাজ নিয়েও তাঁকে কাজ করতে দেখা গিয়েছে। খেড়িয়া, লোথাদের সঙ্গে থেকে কাজ করার অভিজ্ঞতাও তাঁর রয়েছে। তাঁদের জন্য লড়াই করেছেন। মুন্ডা, খেড়িয়াদের সংগঠিত করাই ছিল তাঁর কাজের লক্ষ্য। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ-জন নিজেস্বয় যাতে সংগঠিত হতে পারে বা স্বাবলম্বী হতে পারে সেদিকে মহাশ্বেতা দেবী বেশি করে নজর দিতেন। তাঁদের

আত্ম-উন্নয়নে মহাশ্বেতা দেবী কেবল পথপ্রদর্শকের কাজ করে গেছেন, নির্দেশকের কাজ নয়। সে কারণে জনজাতির মানুষেরা ও নারীরা স্বাবলম্বী হতে পেরেছে, এটাই ছিল তাঁর মনোবাসনা। তাদের সামাজিক স্বীকৃতি প্রদানে মহাশ্বেতা দেবীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। মেদিনীপুরে লোখা, শবর, পুরুলিয়াতে খেড়িয়া, শবরদের অস্তিত্ব বর্তমান। লোখাদেরকে সরকারী পক্ষ থেকে দেওয়া বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জনসাধারণকে সজাগ করেন। প্রফুল্ল রায় মহাশ্বেতা দেবীর এই কর্মক্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন-

‘সমাজের প্রান্তিক জনজীবন নিয়ে সমাজের একেবারে তৃণমূল স্তরে গিয়ে যে সমস্ত জনজাতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে তাঁদের জীবনকে শিল্পরূপ দিয়েছেন তা আমাদের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। বাংলা সাহিত্যে এমনকি আগে আমরা দেখিনি।’<sup>৩</sup>

বহুবার ভারতের উপজাতি মানুষদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। বিরসা মুন্ডার জীবনকাহিনি অবলম্বনে ১৯৭৭ সালে মহাশ্বেতা দেবী ‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। দলিতদের নিয়ে ইতিহাস লেখা হয় না কখনও, তারা আড়ালেই থেকে যায়। বাঙালির ইতিহাসেও তাই। আমরা অনাদেশের শাসকদের নিয়ে ইতিহাস লিখি, জয়গান করি। কিন্তু আজীবন যারা দেশের জন্য, এখানকার যারা আদিবাসি তাদের নিয়ে কয়টা লেখা হয়? কয়জন স্বীকৃতি পান? কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন এদের নিয়ে, আন্দোলন করেছেন দলিতদের অধিকার নিয়ে, রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে ব্যক্তিগতভাবেও লিখেছেন। নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালে লেখা ‘হাজার চুরাশির মা’ বহুল পঠিত ও চর্চিত। লেখাটির মধ্যে দিয়ে তিনি নিম্নশ্রেণির মানুষের দুঃখ ও দুর্দশার কথা তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুজাতা। সমগ্র উপন্যাসে তাঁকে একজন কঠোর মানসিকতার নারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি রাজনৈতিক মত ও আদর্শে বিশ্বাসী। যে আদর্শকে বিশ্বাস করে অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তান ব্রতী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লে তাকে প্রাণ হারাতে হয়। উপন্যাসের কতকগুলো অসম্পূর্ণ গতিশীল লাইন সেই দামাল সময় পর্বকেই যেন আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে-

‘বন্দুকের নল থেকেই ... এই দশক মুক্তির দশক হতে চলেছে ... ঘৃণা করুন! চিহ্নিত করুন মধ্যপন্থীকে।... কেননা জেলই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়।’<sup>৪</sup>

মহাশ্বেতা দেবীর ব্যক্তিগত জীবন সুখের ছিল না। প্রথম বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তিনি পরে আবারও বিবাহ করেন। এই সময়কাল অতিবাহিত করা তাঁর পক্ষে বেশ কষ্টকর ছিল। তবে বৈবাহিক জীবন সঞ্জাত অভিজ্ঞতা ভাঙার পরবর্তী সময়ে তাঁর সাহিত্য জীবনকে নানাভাবে পরিপূষ্টি দান করেছে। তাঁর সংগ্রাম চলেছে সাহিত্যচর্চা এবং জীবনচর্চার মাধ্যমে। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই লেখক লিখলেন ‘রুন্দালী’, রাজস্থানের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের নারীকে নিয়ে, অর্থের বিনিময়ে মৃতের বাড়িতে গিয়ে কান্নাকাটি করে যারা। এই ‘রুন্দালী’ গল্পের নায়িকা শনিচরী, কলেরায় স্বামীর মৃত্যুতে অসহায়, স্বামীর জন্যে তার কাঁদা হয়নি, শাশুড়ির মৃত্যুর পরেও সে কাঁদেনি। কিন্তু তাঁকে অর্থ রোজগারের জন্যে এবাড়ি-সেবাড়িতে গিয়ে মাথা চাপড়ে চাপড়ে কাঁদতে হয়েছে। কান্নার রকমফেরে মজুরি ধার্য হয় যে সমাজে সেখানে শনিচরীরা তার স্বামী বা প্রিয়জনের জন্যে কীভাবেই বা কাঁদবে! লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে যেমন সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, পাশাপাশি একথাও ঠিক, তিনি তাঁর উপলব্ধ সমস্যার সমাধান করারও চেষ্টা করেছেন প্রতি মুহূর্তে। তাঁর সমাজসেবী সত্তা তাঁর সৃজনীশক্তিকে ক্ষুন্ন হতে দেয়নি কখনও। তাঁর ছোট গল্প ‘বাঁয়েন’-এ ভয়াবহ অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য চিত্র এঁকেছেন, যেখানে নায়িকা চণ্ডী

জাতিতে ডোম। চণ্ডীর বাবা ভাগাড়ের কাজ করত, অর্থাৎ কারও মৃত্যু হলে তার জন্যে গর্ত খুঁড়ে দিত। চণ্ডী তার বাবার মৃত্যুর পর সেই কাজ আরম্ভ করে। শবদেহ সৎকারের সূত্র ধরেই ওই গ্রামেরই বাসিন্দা মলিন্দরের সঙ্গে পরিচয় ও বিয়ে হয়। তাদের পুত্র ভগীরথের কখনও মনে হয়নি চণ্ডী বাঁয়েন কখনও কারও মা হতে পারে, দূর থেকে দেখেছে মাথায় লাল কাপড়ের ধ্বজা, উদভ্রান্তের মত ধানক্ষেতের আল ধরে চৈত্রের দুপুরে কাঠি দিয়ে টিন বাজাতে বাজাতে পুকুরের দিকে যাচ্ছে, পেছনে একটা কুকুর। ডোমদের মধ্যে একটি প্রচলিত সংস্কার ছিল, বাঁয়েন যদি কোনও ছোট ছেলে বা পুরুষকে দেখে, তখনই তাদের শরীর থেকে রক্ত শুষে নিতে পারে। অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার চণ্ডীকে স্বামী সংসার সন্তান থেকে সরে যেতে হয়, এমনকী নিজের স্বামী সন্তানের পরিচয় দেওয়াও নিষেধ ছিল। পুত্র ভগীরথ জানতেও পারে না তার মাতৃপরিচয়। সেই পরিচয় যখন উদ্ধৃতিতে হয়, ভগীরথের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সেই চণ্ডী বাঁয়েন যখন নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে গ্রামের মানুষজনকে রক্ষা করে, তখন সেই সমাজই তাকে, সেই বিসর্জিত চণ্ডীকে তার আসল পরিচয় ফিরিয়ে দেয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের কাছে চণ্ডী তখন তাদেরই একজন হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়। এখানে নারীর প্রতি অন্ধ কুসংস্কারে জীর্ণ সমাজের অত্যাচার ও তার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ নিয়েই লেখকের সমাজ-সচেতন মন প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। মহাশ্বেতা দেবীর গল্প ‘ধৌলি’তে এক আদিবাসী নারীর সঙ্কটময় জীবনকাহিনি অন্য মাত্রা অর্জন করেছে। বিশ্বাস-অবিশ্বাস, প্রেম ও বিশ্বাসঘাতকতার সক্রম চিত্র স্পষ্ট সেখানে। ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন এলাকার ধৌলির স্বামীর মৃত্যুর পর তার ভাসুরের নজর এড়াতে সে চলে আসে তার মায়ের কাছে। সেখানে উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ মিশ্রিলালের প্রতি তার ভালোবাসা এবং গর্ভবতী হওয়া, তারপর মিশ্রিলালের মায়ের থেকে এবং পরিবারের অনা সদস্যদের থেকে স্বীকৃতি না পেয়ে, সর্বোপরি মিশ্রিলালের থেকে প্রত্যাখাত হয়ে একসময় সে পতিতাবৃত্তি বেছে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই ধরনের পথ নারীকে অবলম্বন করানোর জন্যে যে মিশ্রিলালরা দায়ী থাকেন, সেকথা সমাজে কখনওই বিবেচিত হয় না। সেই বাস্তব ছবিই ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক তাঁর কলমে। মহাশ্বেতা দেবীর আরেকটি শক্তিশালী গল্প ‘দ্রৌপদী’। গল্পটি নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত মহাশ্বেতা দেবীর অনবদ্য সৃষ্টি। এই গল্পে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মেয়ে দ্রৌপদীকে লেখিকা প্রতিবাদী চরিত্ররূপে অঙ্কন করেছেন। মহাভারতের দ্রৌপদী যেমন রাজসভায় অপমানিত ও লাঞ্চিত হয়েছে অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে ভারতীয় সাহিত্যে এক অসাধারণ প্রতিবাদী চরিত্ররূপে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। দ্রৌপদী চরিত্রটি বহুদিনের জমে থাকা অত্যাচার, উৎপীড়নের এক জ্বলন্ত বহিঃপ্রকাশ। দ্রৌপদী তার উপর ধর্ষণের প্রতিবাদ সে নিজেই করে। সে নিজেকে নগ্ন করে ফেললে সমস্ত রকমের বীরত্ব এবং বিক্রমের বর্ম খুলে পরে। ক্রোধে, ক্ষোভে উন্মত্ত দ্রৌপদী অন্যরূপ আমরা দেখি।

‘কাপড় কী হবে কাপড় লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে মরদ তু ... হেথা কেও পুরষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরতে দিব না। লে, কাঁউটার ক... দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়কে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।’<sup>৬</sup>

নারীরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সর্ব বিষয়ে ক্ষমতানুযায়ী যথাযোগ্য সুযোগ পাবে এবং তাদের ক্ষমতানুযায়ী নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করবে বা নেতৃত্ব দেবে- এই ছিল মহাশ্বেতা দেবীর আকাঙ্ক্ষা। বিভিন্ন গল্পের নারী চরিত্রের মধ্যে আমরা সেই চেতনাবোধ লক্ষ্য করি। বীর্যে, বুদ্ধিতে, সাহসে, প্রতিবাদ- প্রতিরোধে, প্রেমানুভূতি ও প্রেমাকাঙ্ক্ষায় নারী চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রেখেছেন। এই

প্রসঙ্গে আমরা ‘শিকার’ নামক গল্পের কথা উল্লেখ করতে পারি। নারীদের প্রতি সমাজের অমানবিক আচরণের তীব্র প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে এই গল্পে। সমাজে নারীদের প্রতি পুরুষের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পায়। গল্পের প্রধান চরিত্র মেরী নামধারী এক নারী। বাংলা সাহিত্যে সৃষ্ট অন্ত্যজ নারী চরিত্রের মধ্যে এই মেরীকে সামনের সারিতেই রাখা যায়। সে নারীর স্বাজাত্যবোধ, কর্মদক্ষতা, প্রেমাকাজক্ষায় সজীব। উচ্চবিত্ত সমাজের সম্ভোগলিপ্ত পুরুষরা প্রান্তীয় সমাজের নারীদের শারীরিক চাহিদা মেটাবার জন্য বেশিরভাগ সময় ব্যবহার করেন। মেরীর ওপরেও এমন কুদৃষ্টি পড়েছিল। তসিলদার তাকে পেতে চেয়েছিল। এমনই এক পরিস্থিতিতে আমরা মেরীকে প্রতিস্পর্শী রূপে আবিষ্কার করি-

‘তসিলদার তাঁবুতে বসে মেয়ে মরদকে পয়সা দিচ্ছিল। প্রচুর মানুষের ভিড়। তারই মধ্যে মেরী ঢুকে পড়ে ও জঘন্য গাল দিয়ে কাপড়টা ছুঁড়ে দেয়। বলে, শহরের রাণী পেয়েছিস আমাকে। কাপোড় দিয়ে ভোলাতে এসেছিস? ফের বদমাশি করবি তো নাক কেটে নেব। হাত দুলিয়ে ও বেরিয়ে যায় ও সগর্বে।’<sup>৬</sup>

মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য ধারায় একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে আদিবাসী মানুষ। আদিবাসীদের নিয়ে বাংলা ভাষায় আগেও লেখা হয়েছে, কিন্তু একজন লেখকের কলমে এতখানি লেখা আগে মেলেনি। তা ছাড়া, আগের লেখার কথা ও কখনরীতি মহাশ্বেতা দেবীতে অনেকখানি বদলে যায়। সে বদলের উৎস গত শতাব্দীর যাটের দশকের নানা আন্দোলন, যার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল আদিবাসী অঞ্চল। মহাশ্বেতা দেবীর আদিবাসী যোগের সূত্রপাত ওই সময়ে। তা আরো নিবিড় হয় আট-দশ বছরে। তার প্রথম ফল ১৯৭৫-এ একটি পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত ‘অরণ্যের অধিকার’। সেই অধিকারের প্রশ্ন তারপর তাঁর লেখায় উচ্চারিত হতে থাকে নানা ভাবে এবং নানা প্রেক্ষিতে। ১৯৮২-তে প্রকাশিত হয় ‘হুলমাহা’ ও ‘শালগিরার ডাকে’। ‘অরণ্যের অধিকার’-কে জুড়লে দেশের একটি বিস্তৃত অংশের আদিবাসী জীবনকথা ধরা থাকে সাহিত্য ধারাতে।

সারা ভারত জুড়ে সাহিত্যগত যে আলোচনা, তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। নিছক ভক্তি নয়, জ্ঞান ও কর্মকে তিনি তাঁর আদিবাসী চর্চা ও চর্চায় যুক্ত করেন। নিজেকে বদলান এবং বদলের চালিকা শক্তিও হয়ে ওঠেন। তাই তাঁকে নিয়ে, তাঁর সৃজনকে নিয়ে নতুন নতুন পাঠ বইটির প্রথম আলোচ্য ‘ইতিহাসে নিম্নবর্গের কণ্ঠ’ এবং সে আলোচনা ‘অরণ্যের অধিকার’, ‘হুলমাহা’ ও ‘শালগিরার ডাকে’ উপন্যাস তিনটি নিয়ে। প্রথম উপন্যাসটিতে সারা উনিশ শতক জুড়ে মুন্ডাদের অরণ্যভূমি হারানোর ইতিহাস। শুরু আরও আগে, বিরসার ঠাকুরদার জন্মাবার কালে। ১৮৫৫ সালে ধানী মুন্ডা যোগ দেন সিদু-কানুর দলে মুন্ডাদের জমি রক্ষা করতে। তার চার দশক পরে বিরসা অরণ্যের অধিকার চান। সাঁওতালদের ‘হুল’ নয়, সর্দারদের ‘মূলকই লড়াই’ নয়, তিনি ডাক দেন ‘উলগুলান’-এর, এক মহাবিপ্লবের। তার বিরুদ্ধে একযোগে দাঁড়ায় দিখুদের দল, পুলিশ এবং চার্চও। ১৯০০-তে ধরা পড়েন বিরসা এবং ফাঁসি হয় কয়েক মাস পরে। কিন্তু মুন্ডাদের অবদমিত স্বরে ততদিনে অধিকারের ধ্বনি প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছে। তাঁদের গানে, গল্পে, নতুন উপমায় গাঁথাও হয়েছে এই ‘উলগুলান’-এর কথা। মহাশ্বেতা দেবী এই বিকল্প ইতিহাসের মানুষজনকে খুঁজছিলেন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। তাঁর নিজের অগ্নিময় সময় হয়তো তাঁকে খুঁজিয়ে নিচ্ছিল।

‘হুলমাহা’-ও আর এক বিদ্রোহের ইতিহাস। জমিদার, মহাজন, নীলকুঠির সাহেব এবং কোম্পানি সরকারের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে ছিল সেটা সাঁওতাল অভ্যুত্থান। বিস্তার পেয়েছিল দামিন, বীরভূম,

ভাগলপুর, হাজারিবাগ, মানভূমের বিস্তৃত অঞ্চলে। বিদ্রোহের নায়ক কানু মুরুর ফাঁসি হয় ১৮৫৬-তে। মৃত্যুর আগে ‘হুলমাহা’-তে কানুর একটি কথা আছে আমি আবার আসব।’ ইতিহাসের অংশ হয়েও এই উচ্চারণ কিন্তু অতীত নয়।

‘শালগিরার ডাকে’ আরও খানিক পিছনের কাহিনি, ১৭৫০-এর। সেই বছরই জন্ম হয়েছিল তিলকা মুরুর। তিলকার বয়স তখন পনেরো, কোম্পানির হাতে আসে বিহার-ওড়িশার ভার। তখন থেকেই তসিলদার-গোলদারদের শেকড়বাকড় ছড়ায় দূর-দূরান্তে। ১৭৭২-এ রাজস্ব আদায়ের শুরু এবং বিদ্রোহ নানা আদিবাসী অঞ্চলে। সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন তিলকা মুরু। তারপর কোম্পানির ফৌজের সঙ্গে নানান জায়গায় সংঘর্ষের পর আহত তিলকা বন্দি হন এবং তাঁর ফাঁসি হয় ১৭৮৫-তে। সনাতন তাঁর আলোচনায় দেখান, ঠাকুমার গল্পে এই পৃথিবীতে মানুষের জন্মবৃত্তান্ত শুনেছিলেন তিলকা। বাবার কথায় জেনেছিলেন সাঁওতাল জাতির ঐতিহ্য, সামাজিক বন্ধন এবং কৌমের মানুষজনের নৈকট্যের কথা। এই ইতিহাস তাঁর মধ্যে স্বপ্নের জন্ম দেয়। সে স্বপ্ন বাঁচার ও বাঁচানোর। তারই প্রতিষ্ঠা মহাশ্বেতা দেবীর এই উপন্যাসে। আবার তিলকা, কানু ও বিরসার তিন কাহিনির মধ্য দিয়ে বিদ্রোহের ধারাবাহিকতাকে চিহ্নিত করেন মহাশ্বেতা দেবী। এই জঙ্গম ইতিহাসের বিপরীতে কোম্পানির নির্মিত ইতিহাস বেশ যান্ত্রিক ফাঁসি, ফাঁসি এবং ফাঁসি। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের বাঁচার ইতিহাসের পাশে শাসকের ফাঁসুড়ের ইতিহাস সাজিয়ে দিয়েছেন মহাশ্বেতা দেবী।

‘চোটি মুন্ডা ও তার তীর’ (১৯৮০) উপন্যাসটিকে নিম্নবর্ণের নিয়ন্ত্রিত বিদ্রোহের স্বর বলে চিহ্নিত করেছেন আলোচক। চোটির পূর্বপুরুষ পূর্তি মুন্ডা যেখানে যেতেন, সেখানেই মাটি থেকে অভ্র বা কয়লা বেরত। তাঁরই উত্তরপুরুষ হল চোটি, যে নামে একটি নদীও। সব সময়ে গুঁকে নিয়ে গল্প গজাচ্ছে। এও এক ইতিহাসের গড়ন, লিপি নিরপেক্ষ কথার কথা, যা মহাকথার জন্ম দেয়। নির্মিতির সঙ্গে যার যোগ আছে তা হল মহাকাব্যের, এমনকী চোটির তিরের সঙ্গে রাম বা অর্জুনের বাণেও মিল। তবে তার ব্যবহার চোটিতে গ্রিক মহাকাব্যের ঢালটির মতো। চোটি মুন্ডা কোনও বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন না, কিন্তু বিশ শতকের তৃতীয় থেকে সপ্তম দশক পর্যন্ত মুন্ডাদের কিছু তির ঠিক লক্ষ্যই ভেদ করে। সেই তিরের পিছনে চোটির কথা-মহাকথার যোগও থাকে।

মহাশ্বেতাদেবীর সাহিত্য ধারাকে আরো শক্তিশালী গড়ে তুলেছে তাঁর কালজয়ী বেশ কিছু সাহিত্য সম্ভার। ‘শিকার’ গল্পে মহাশ্বেতা দেবী অন্ত্যবাসী মানুষদের প্রতিরোধস্পৃহাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন সুরে রূপায়িত করেছেন। এই গল্পটি আদিবাসী গুঁরাওদের নিয়ে লেখা। এই গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র মেবী গুঁরাও। মেবী গুঁরাও সাহেবের জারজ হিসাবে পরিচিত বলে তার সমাজ তাকে অনেক দূরত্বে ঠাঁই দিয়েছিল। মেবী অন্য আদিবাসীদের মেয়েদের মতো গতানুগতিক জীবন কাটাতে চায়নি। তাই প্রসাদ গিনী তার বিয়ের কথা বললে মেবী মুখের উপর বলে দেয়-

‘ঝোপড়িতে থাকব, মরদ মদ খাবে, তেল সাবান পাব না, ফর্সা কাপড় পরব না, এমন জীবন আমি চাই না।’<sup>৭</sup>

গুঁরাও সমাজের চিরাচরিত সংস্কারকে ভেঙে দিয়ে সে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। তহশীলদার ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় শিকার। তাই গল্পের শেষে দেখি, তার ভালোবাসার বন্ধু জালিমকে নিয়ে

সে যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিল তহশীলদারকে হত্যা করে সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিল। দিনটি ছিল তাদের শিকার পরবের দিন, মেরীর জীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিন।

‘সাঁঝ সকালের মা’ গল্পে পাখমারা সম্প্রদায়ের পাখমারা সম্প্রদায়ের সাধন কান্দোরীর মা জটি ঠাকুরানীর আশ্চর্য জীবনবৃত্তান্তের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী। জটেশ্বরীকে সূর্য ওঠার আগে এবং অস্ত যাওয়ার পর মা বলে ডাকার নিয়ম ছিল। তাই তাকে ‘সাঁঝ সকালের মা’ বলা হত। দিনের বেলায় সে জটি ঠাকুরানী। লেখিকা জটেশ্বরীকে একাধারে সাধনের মা এবং অন্যদিকে ঠাকুরানী নারী- এই দুইরূপে প্রকাশ করেছেন।

‘গোছমনি’ গল্পে লেখিকা স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও পালামৌয়ের সুবিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে কিভাবে শ্রমিকদের উপর নানাভাবে শাসন, শোষণ, অত্যাচার করত তারই বাণীচিত্র ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে অরণ্যজীবী আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষদের সঙ্গে সমাজের নারীর বেদনার কথাও প্রচার করেছেন। এই গল্পে ঝালো ওরফে গোনুমনি নিজের অস্তিত্ব ও সামাজিক মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য লড়াই করতে ভয় পায়নি। ঠিকাদারের প্ররোচনায় পড়ে ঝালোর স্বামী বিশাল ভুইঞা বেশ কিছুদিনের মতো নিরুদ্দেশ থাকে। ঝালোকে জোর করে সমাজ বিধবা করেছে। সমস্ত যন্ত্রণা বুকে নিয়ে ঝালো বিশ্বাস হারায়নি, বরং সংগ্রাম করে গেছে এবং একদিন তার স্বামীকে সে ফিরে পেয়েছে। দৃঢ় বিশ্বাস, মনের জোর এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং লড়াই করে ঝালো সংসারের সুখ এনেছে।

‘স্তনদায়িনী এবং অন্যান্য গল্প’ গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পগুলিতেও নারীজীবনের মর্মবেদনা কাহিনি বিবৃত হয়েছে। ‘জগন্নাথের রথ’ শীর্ষক গল্পে আছে পূণ্যদাসীর বেদনাবিধুর জীবনের ইতিহাস, আছে তার বিশ্বাসের কথা। সমাজে এরা কতখানি উপেক্ষিতা, অবহেলিতা লেখিকা তাদের জীবনের সেই মর্মবিদারক দৃশ্যটিও তুলে ধরেছেন। ‘বায়েন’ গল্পে ভগীরথের সতমা যশির দুঃখদীর্ণ নারী জীবনের অসামান্য পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। বায়েন ওদের সমাজে ডাইনের মতো অপরাধী, তাদের দৃষ্টি খারাপ। সমাজ অকারণে তাদের শাস্তি দেয়, পাথর ছুঁড়ে মারে।

লেখিকার ‘স্তনদায়িনী’, ‘ডাইনি’, ‘যশোমতি’, ‘বিশলাক্ষীর ঘর’, ‘হারুন সালেমের মাসি’, ‘যমুনাবতীর মা’ প্রভৃতি গল্পগুলিতে আমরা নারীজীবনের করুণাঘন বেদনার্ত জীবনকাহিনির সঙ্গে পরিচিত হই। লেখিকা গজু, দুসাদ, ওঁরাও, মুন্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতিদের দুঃখদীর্ণ শোষিত, অত্যাচারিত এবং উৎপীড়িত জীবনকাহিনীর বাস্তব ইতিহাসকে প্রকাশ করতে গিয়ে তাদের সমাজের অসহায়, লাঞ্ছিত নারীদের ব্যথাতুর জীবনের কথা বলতে ভুলে যাননি।

‘ডাইনি’ গল্পে দেখি হনুমান মিশ্রের ছেলে টুরা গ্রামের পহানের বোবা মেয়েকে নষ্ট করে। হনুমান মিশ্র সেই মেয়ে অর্থাৎ সোমরিকে নিজের ইচ্ছেমত বিধান দিয়ে ডাইনী করে দেয়। গ্রামে কোন বিপদ দেখা দিলে তারজন্য সোমরিকে দায়ী করা হয়। লেখিকা দেখিয়েছেন আদিবাসী গ্রামগুলি কিভাবে কুসংস্কারে আবদ্ধ। আরও দু’টি স্বরের কথা আলোচনা করেছেন সনাতন। এর একটি হল নারীকর্ষ, অন্যটি অপেক্ষাকৃত স্তিমিত কর্ত। প্রথম অংশে আসে দ্রৌপদী, হুলমাহার মা, শনিচরী ইত্যাদি এবং দ্বিতীয়টিতে সাগোয়ানা ও অন্যান্য লেখা। আদিবাসী নারীদের নানা ভাবে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, ব্যবহৃত হওয়ার কাহিনি বর্ণিত মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যের ধারায়। এঁদের অনেককে তিনি কাছ থেকে দেখেছেন, এদের কথা শুনেছেন, নিজের নারী সত্তা



দিয়ে অনুভব করেছেন। দিমু, ইটভাটার মালিক, সশস্ত্র বাহিনী, এদের লুণ্ঠন করে। ডাইনি অপবাদেও মারে। তবু কেউ কেউ উঠে দাঁড়ায়। সেনানায়কের সামনে দাঁড়িয়ে ধর্ষিতা নারী এনকাউন্টারের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। ক্ষীণ স্বর তখন ঘন ধ্বনিকে অস্বীকার করে। এ ভাবেই শালগাছ প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় সেগুন বৃক্ষের।

সনাতন বিনির্মাণ তত্ত্ব, নিম্নবর্গের পাঠক্রম ইত্যাদির সঙ্গে ফরাসি দার্শনিক আল্যাঁ বাদিযুর চিন্তাকে তাঁর পাঠে সূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বাদিযুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর মেলেও অনেক জায়গায় এবং সে কারণে দর্শনের সূত্র দিয়ে সৃজনের গুরুত্ব বোঝা। অনেক জায়গায় মিলেছে ঠিকই, কিন্তু বেশ কিছু ক্ষেত্রে কষ্টকল্পিত মনে হয়েছে। সৃজন থেকে তত্ত্বগঠন আর তত্ত্ব দিয়ে সৃজন বোঝার মধ্যে উপার্জন ভিন্ন। কিন্তু সনাতন ভাওয়াল যত্ন ও সততারসঙ্গে বইটি লিখেছেন। সঙ্গে এটিও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসীদের কাছে শুধু যাননি, তাদের জন্য দরজাও খুলে রেখেছেন। দরজা বন্ধ থাকলে লেখার সময় নিজের কথা নিম্নবর্গের নামে ঢুকে পড়ে। এমন কত গল্প- উপন্যাসই না লেখা হয়েছে বিগত চার-পাঁচ দশকে। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর এ উপন্যাসের কৌয়ার, তেতরি ভূইন ও কসিলা চরিত্রগুলোকে বাস্তব ঘটনার আলোকে চিত্রায়িত করেছেন। ঘটে যাওয়া ঘটনাই এক সময় ইতিহাস হয়ে যায়, আর সেই ইতিহাস থেকে সংগৃহীত চরিত্রগুলো নিয়ে মহাশ্বেতার রচিত সাহিত্য ধারায় আর এক ইতিহাস।

**শেষের কথা:** মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যের ধারায় যে বাস্তব সমস্যা ফুটে উঠেছে তা বর্তমান সময়েও সমান প্রাসঙ্গিক। সমাজের উচ্চ ও নীচ ভেদাভেদ ও নানা ঘটনা মহাশ্বেতা দেবী কথাসাহিত্যে তুলে ধরেছেন। সমকালীন কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসেবে এই শোষিত নিপীড়িত মানুষের কাহিনীকে গ্রহণ করে। মহাশ্বেতা দেবীর কর্মপ্রয়াস কে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন অনেক সাহিত্যিক। মহাশ্বেতা দেবী উচ্চ ক্ষমতাসীন শক্তির বিরুদ্ধে নিঃস্ব জনের হয়ে কলম ধরেছেন, অন্ত্যজ প্রতিবাদী চরিত্র সৃজন করেছেন। তাঁর লেখা আদিবাসী জীবনভিত্তিক গল্পগুলি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, লেখিকা আদিবাসী মহিলাদের জীবনের অন্দরমহলে প্রবেশ করে তাদের সুখ-দুঃখ-আনন্দ বেদনার একান্ত বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। আদিবাসী নারীদের শুধু বঞ্চনা, শোষণ নয়, সেই বনা থেকে পরিত্রাণের উপায় বাতলে দিয়েছেন দরদী লেখিকা। সাহিত্য চর্চার সমান্তরালে তিনি রচনা করেছেন জনবৃত্ত অন্বেষণের বিকল্প ইতিহাস যা হয়ে উঠেছে অন্ত্যজ শ্রেণীর ঐতিহাসিক দলিল। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনের সাহিত্য ও জীবনকে এক জায়গায় নিয়ে এসেছেন। তাঁর সাহিত্যে বাস্তব জীবনের শৈলী স্পষ্ট হয়ে ওঠে শিল্পসম্মতভাবে। সে আখ্যান অতীতেরও হতে পারে, আবার বর্তমান সময়ের হতে পারে। তিনি লেখক হিসেবে ছিলেন সাহসী ও প্রতিবাদী, আবার ব্যক্তি জীবনেও তিনি মানবদরদী ও প্রতিবাদী।

**তথ্যসূত্র:**

১. দেবী, মহাশ্বেতা, 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তক মেলা, পৃষ্ঠা. ৬৯।
২. তদেব, পৃষ্ঠা. ৯৪।
৩. ধর, তপন (সম্পাদক), প্রসাদ, ৫০ বর্ষ, ২০১৬ সেপ্টেম্বর, পৃষ্ঠা. ১০।
৪. দেবী, মহাশ্বেতা, 'হাজার চুরাশির মা', কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১৪, পৃষ্ঠা. ১৯।
৫. দেবী, মহাশ্বেতা, 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র' অষ্টম খণ্ড, দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা, ২০০৩, পৃষ্ঠা. ৪১৮।
৬. গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), 'মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র' তৃতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা. ২৩২।
৭. দেবী, মহাশ্বেতা, 'মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪, পৃষ্ঠা. ৪৬।

**সহায়ক গ্রন্থ:**

১. দেবী, মহাশ্বেতা, 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারি ২০০১।
২. দেবী, মহাশ্বেতা, 'নানা রসের ৯টি উপন্যাস', দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ২০১১।
৩. নন্দী, রতনকুমার সম্পাদিত, 'অরণ্যের অধিকার, লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষিত, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৫।
৪. ঘোষ, নির্মল, 'মহাশ্বেতা দেবী: অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ', করুণা প্রকাশনী, বইমেলা, ১৯৯৮।
৫. দেবী, মহাশ্বেতা, 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', অষ্টম খণ্ড, দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা, ২০০৩।



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 693-699

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.058



রাভা জনগোষ্ঠীর পরিচয় এবং 'সোঁদাল' ও 'বিনদনি' উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে বাস্তব চিত্র  
ধনেশ্বর বর্মণ, স্বাধীন গবেষক, বালাসুন্দর, আলিপুরদুয়ার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 15.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## Abstract

*Although the Rabha community is an indigenous tribe of Assam, a section of them migrated to the vast plains of North Bengal due to livelihood needs. There are significant differences between the Rabha tribe of Assam and the Rabha community residing in three districts of North Bengal (Jalpaiguri, Alipurduar, and Cooch Behar). This distinction becomes evident when one examines their dwellings, houses, furniture, attire, ornaments, food, and language. The geographical environment of North Bengal has influenced the lifestyle of the Rabha community living in these regions. Amiya Bhushan Majumdar (1918–2001) was an exceptional author in Bengali literature. He spent his childhood, grew up, and spent his entire professional life in the town of Cooch Behar. Living in the Cooch Behar district for an extended period allowed him the unique opportunity to closely observe the tribal societies of North Bengal. In his novels *Sondal* (1987) and *Bindani* (1985), he depicted the society and culture of the Rabha community. Drawing from his close observations, he portrayed the origin, language, culture, traditions, and social systems of the Rabhas through the characters in his novels. Amiya Bhushan was familiar with the languages of the indigenous communities of North Bengal. By examining the social condition of the Rabhas, he highlighted how they have gradually been marginalized over time. His novels encapsulate the conflicts and integration of the Rabhas with modern civilized society. The first phase of modernization for the Rabhas was marked by their religious conversion. Through his writings, he attempted to show how the Rabha community of North Bengal is one of the most affected groups. Over time, they have lost their settlements, culture, language, identity, and even the structure of human relationships. The author directly experienced and observed all these aspects of the Rabha community and expressed these observations in his novels.*

**Keywords:** Rabha, community, Assam, North Bengal, lifestyle, modernization, religious conversion.

ভারতের অন্যান্য উপজাতির মতই রাভা জনগোষ্ঠী ভারতীয় সংবিধানে 'জনজাতি' হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী রাভা জনজাতি নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারা প্রধানত আসামের কোকরাঝাড়, গোয়ালপাড়া, বঙ্গাইগাঁও, কামরূপ, শোণিতপুর, দরং, ধুবড়ী, মেঘালয়ের পশ্চিম গারো-পাহাড় জেলা, পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলায় বাস করে। রাভাদের উৎপত্তি বসতি ও জাতিগত পরিচয় নিয়ে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। নৃতাত্ত্বিক বিচারে মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট উপজাতি রাভা। এই জনজাতি সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বুকালন হ্যামিলটনের রচনায় ১৮১০ সালে।

বি.এইচ. হডসন ১৮৮০ সালে মন্তব্য করেন যে, রাভা বোড়ো জাতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এছাড়া অনেক ভাষাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মতে রাভারা ইন্দো-মঙ্গোলীয় কোচগোষ্ঠীর অন্তর্গত। *অস্তেবাসীসমাজ, সংস্কৃতি ও উন্নয়ন* প্রবন্ধগ্রন্থে রূপকুমার বর্মণ মন্তব্য করেন—“রাভারা মূলত কোচ ভাষা ও বোড়ো সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত একটি সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠী, জাতি-সাংস্কৃতিক বৈপরীত্য (Racio-Cultural Contradiction) সংবিধান অনুযায়ী খানিকটা দূরীভূত হয়ে রাভাদের তপশিলি উপজাতি (Scheduled Tribe) এর মর্যাদা দান করলেও জাতি না সংস্কৃতি এই জনগোষ্ঠীর পরিচিতির মানদণ্ড হওয়া উচিত, সেই প্রশ্নের কোনো সঠিক সমাধান হয়নি।”<sup>১</sup> তবে একসময় রাভা জনগোষ্ঠীকে 'অনির্দিষ্ট' জাতির তকমা বহন করতে হত। রাভা সমাজের প্রচলিত মতানুসারে ঈশ্বর সৃষ্ট এক দম্পতি থেকে বিভিন্ন কন্যার জন্ম হয় তাদের থেকে পরবর্তীতে রাভাদের বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি ঘটে। অতীতে রাভারা কোচ নামেই পরিচিত ছিলেন। কোচ রাভাদের পাঁচটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হত, (রংদানিয়া, পাতি, দুহড়ী, মায়তোরী, কোচ)। সুনীল পাল তার *রাভা লোকমানস* গ্রন্থে বলেছেন—“কোচদের লোকগাথানুসারে দেখা যায় কোচ, মেচ, লেপচা, ওরাই এরা হলেন চার ভাই যারা স্বর্গ (রাংকারাং) থেকে পৃথিবীতে (হাসং) এসেছিলেন দেবতা ঋষিবাই (রাভাদের প্রধান দেবতা) এর নির্দেশে।”<sup>২</sup>

কোচ রাভারা বৃহত্তম বোড়ো ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে অনেকে মনে করেন। কোচ নামটি এই জাতির অতিপ্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ নাম। কিন্তু কালক্রমে রাভা একটি স্বতন্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত হয়। ফ্রেণ্ডপেরেরাও একটি গল্পের নির্দেশ করে বলেছেন, প্রথমে দিকে রাভারা গারো পাহাড়ে বসবাস শুরু করে কিন্তু সেখানে গারোদের সঙ্গে অবিরত লড়াই শুরু হয় ফলে তারা সমতল ভূমির দিকে (গোয়ালপাড়া) নেমে আসে। সমভূমির দিকে বিশেষত উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নামতে থাকে। *উত্তরবঙ্গের জনজীবন ও লোকাচার* গ্রন্থে ধনেশ্বর বর্মণ বলেছেন উত্তরবঙ্গে রাভারা কবে এসেছিল সে সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে সম্ভবত যিশুখ্রিস্টের জন্মের দু-হাজার বছর আগে মহাচীনের ইয়াং-সি-কিয়াং ও হোয়াং-হো নদীর অববাহিকা থেকে পশ্চিম দিকে এক দল লোক যাত্রা শুরু করে। যাত্রাপথে এই দলের লোকেরা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে একটি দল তিব্বত ও ব্রহ্মদেশ হয়ে ভারতের মিজোরাম, মণিপুরে, অসম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল, এসে বসবাস শুরু করার চেষ্টা করে। অন্য দলটি আর একটু পশ্চিমের দিকে গিয়ে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তার অববাহিকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তরাই ও ডুয়ার্স এলাকায় বসবাস শুরু করার চেষ্টা করে। এই অঞ্চলগুলিতে যারা বসবাস শুরু করতে থাকে তারাই রাভা বলে পরিচিতি লাভ করে। বাসস্থান অনুসারে রাভা জনজাতিকে দুই ভাগে ভাগ করা হত, বনাঞ্চল পার্শ্ববর্তী রাভাবস্তু এবং জাতি হিন্দু অধ্যুষিত রাভাদের গ্রাম। *উত্তরবঙ্গের উপজাতির ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে রণজিৎ দেব মন্তব্য করেন—“কোচবিহার

ও জলপাইগুড়ি জেলার তরাই অঞ্চলে কোচ রাভার জনসংখ্যা ছয় হাজারের বেশি। কোচবিহার জেলার ভারেয়া, বড় শালবাড়ি এবং জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য, দক্ষিণ কামাখ্যাগুড়ি, হেমাগুড়ি-পূর্ব শালবাড়ি, নারারখালি রাধানগর, কালচিনি থানার নিমতি, মেন্দাবাড়ি, মাদারিহাট, রায়ডাক-ইন্দুবস্তির বনাঞ্চলে রাভা জনজাতির বাস।”<sup>৩</sup>

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিরাচরিত প্রথানুগ জীবনযাত্রা ভেঙ্গে যাচ্ছে। রাভা সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। সমাজের নানান বিচিত্র পূজা-পার্বণ, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, লোকধর্ম, লোকনৃত্য প্রবাহমান কাল ধরে মানুষের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই চলে আসছে। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সমাজ জীবনের কাছে তা গুরুত্বহীন হয়ে যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের রাভা বসতি অঞ্চলগুলিতে দেখা দিয়েছে মানুষের সময়ের সাথে দিনবদলের দিন যাপনের পালা। সময়ের আধুনিকতায় পুরাতন নিয়ম-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, লোকসংস্কার-লোকবিশ্বাস, রাভা সমাজের মন থেকে অনেকটাই মুছে গেছে। সোঁদাল (১৯৮৭) উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে প্রতিক্ষণ পত্রিকায়। পরে বই আকারে প্রকাশিত হয় (শারদীয়া) ১৩৯৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। উপন্যাসটিতে লেখক রাভা সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তিনি রাভা সম্প্রদায়ের জনজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা আমাদের শুনিয়েছেন। কিভাবে তাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিবর্তন ঘটে চলেছে তা তিনি এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন। মরুচমতী নদী, তুরুককাটা শহর, ডাউকিমারি ব্লক, হাতকাটা, হাদলমারি, লাউতামা এই নামগুলি বার বার এসেছে এই উপন্যাসে। এই উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে তপোখীর ভট্টাচার্য তাঁর সোঁদাল: ভঙ্গুর সত্তার আখ্যান প্রবন্ধে বলেছেন – “সোঁদাল’কে ভাবা যেতে পারে অমিয়ভূষণের মাতৃভূমি আবিষ্কারের গল্পহীন গল্প। শুরু থেকেই প্রকট ও প্রচ্ছন্ন ভাবে সভ্যতার যে সমালোচনা উপস্থাপিত করেছেন তিনি, তার তাৎপর্য গভীরভাবে অনুধাবন করতেই হয়। সচেতন ভাবে হোক বা অবচেতন ভাবে, আপদগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মানুষেরা প্রতিনিয়ত যে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ব্যাপ্ত থাকে, তাদের আদিবাসী বলে চিহ্নিত করা হয় কিন্তু সে অভিধার যোগ্যমান্যতা দেওয়া হয়না কখনোই। এই জন্যে পর্বে-পর্বান্তরে তারা ভারত নামক দেশের মূল জনস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকে। তাদের কোনো মৌলিক অধিকারই স্বীকৃত হয়না; বরং কালস্রোতে ভেসে যায় সবকিছু।”<sup>৪</sup> সোঁদাল উপন্যাসের কাহিনি মূলত আবর্তিত হয়েছে মোন্নাতকে কেন্দ্র করে। মূল কাহিনি হিসেবে উঠে এসেছে কৈচন্দ্র এবং তিন্নির কাহিনি। নায়ক মোন্নাতের অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে দিয়ে তিনি রাভা জনজাতির বিভিন্ন সমস্যার কথা আমাদের বলেছেন। এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে লেখক উত্তরবঙ্গের রাভা সমাজ ব্যবস্থায় জমির সাথে নারীর সম্পর্ক এবং অরণ্যের সঙ্গে তাদের যে একটা আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে তা উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীতে কিভাবে জমির মালিকানা থেকে নারীর প্রাধান্য কমে গেল এবিষয়ে তিনি গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন রাভা গ্রামগুলির বেশির ভাগেই গড়ে উঠেছিল অরণ্যকে কেন্দ্র করে। তিনি লক্ষ করেছিলেন অরণ্যের বিলুপ্তি ফলে রাভা জনজাতির মানুষের জীবনে কি পরিমাণে সংকট নেমে এসেছিল এবং যে রাভা সমাজে একসময় অরণ্যই ছিল সমাজ-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র, সেই রাভা সমাজ কিভাবে অরণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এই প্রশ্নগুলি তিনি উপন্যাসে তুলেছেন। রাভা গ্রাম আর অরণ্যকে নিয়েই এই উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। উপন্যাসের চরিত্র গুলির মধ্যে দিয়ে লেখক অরণ্যের সঙ্গে রাভা সমাজের যে সম্পর্ক ছিল তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

উপন্যাসে দেখি তিনি এক বন থেকে উৎখাত হয়ে অন্য বনে এসে আশ্রয় নিয়েছে। রক্তের সঙ্গে মিশে থাকা অরণ্যকে রাভা সমাজের মানুষেরা অস্বীকার করতে পারেনি। বারবার তারা অরণ্যের অধিকার ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র মোল্লাতের মুখ থেকে শুনতে পাই – “বনকে রক্ষা করলে বন তোমাকে রক্ষা করে।”<sup>৫</sup> রাভাদের ধান খেতের পাশেই থাকত বন তাই খুব সহজেই রাভা জনজাতির মানুষের সাথে বনের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শুধু রাভা নয়, কোচ রাজবংশীদের সঙ্গেও লেখক বনের একটা সুসম্বন্ধ দেখিয়েছেন। রাভা বসতি গ্রাম গুলি অরণ্যের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। এই অরণ্যগুলি রাভা জনজাতির মানুষদের কিভাবে রক্ষা করে ছিল লেখক মোল্লাতের সংলাপের মধ্যে দিয়ে আমাদের শুনিয়েছেন। রাভা সমাজে নারীর সঙ্গে জমির একটা আত্মিক যোগ রয়েছে এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে লেখক তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসটিতে আমরা দেখি পঙ্কিনী রাভার একই মাসে স্বামী ও মেয়ের মৃত্যু হয়। স্বামী, মেয়ে মারা যাওয়ার পর পঙ্কিনী কীভাবে তার জমি রক্ষা করবে সে বুঝে উঠতে পারেনা। তাই তিনি বাধ্য হয়েই জমি রক্ষার জন্য সংকটময় মুহূর্তে অল্প বয়সী জামাইকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করে। রাভা পুরুষের কাছে যেন নারীই সব। নারী হারালে তাদের জমি অধিকারে টান পড়ে। রাভা পুরুষেরা যেন রাভা নারীর শরীরের শান্তি খুঁজে পায় জমির মধ্যে দিয়ে। রাভা নারীর জমিতে পুরুষের কৃষিকাজ করার পর শিকার ছাড়া আর তেমন কোনো কাজই থাকে না। কৃষিজমির ফসলকে হাতির হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল রাভা পুরুষের। সোঁদাল উপন্যাসে লেখক এপ্রসঙ্গে বলেছেন – “কী করবে, কেন, তোমরা রাভার বেটা? রাভার বেটির নয় তো ধানখেত থাকিল। হাঁতি আইসে, রুখিবে? ভৈষী ঢোকে ধানখেতৎ, পেনটি ধরি টানো? বুনা শুয়োর আইসে ধানবাড়ি? বন কোটে?”<sup>৬</sup> কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাভা সমাজেও জমি হস্তান্তরিত হতে দেখা যায়। জমির মালিকানা পুরুষের হাতে চলে যায়। লেখক এই পরিবর্তন টাই দেখিয়েছেন এই উপন্যাসে। এই উপন্যাসের আরেক চরিত্র মলগুঁর মধ্যে দিয়েও লেখক তাদের সমাজের বদল দেখিয়েছেন। মলগুঁর কথা থেকেই আমরা জানতে পারি তার শাশুড়ি তাকে তার স্ত্রীর গ্রামে নিয়ে আসে। সমাজ সচেতন মলগুঁ সে তার জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে। রাভা থেকে যারা পদবী পরিবর্তন করে দাস বা বৈষ্ণব পদবী গ্রহণ করে তাদের মধ্যে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। মলগুঁ জানায় বৈষ্ণব হওয়ায় কিছু অসুবিধা আছে। রাইস্তুক পূজা লক্ষ্মী রূপে পূজিত হয়। সেখানে চকোৎ এবং শূকরের মাংস দেওয়া যায় না। কিন্তু রাভা সমাজে যেখানে রাইস্তুক পূজায় চকোৎ এবং শূকরের মাংস দেওয়া ছিল আবশ্যিক। পদবী পরিবর্তন হওয়ায় এই সমস্যা ভয়ানক হয়ে দেখা দেয়। মোল্লাত যখন মলগুঁর কাছে জানতে চায় যে তোমার গোত্র কার? তখন সে জানায় সে মায়ের গোত্র পেয়েছে। তার ছেলে মেয়েরা তারা তাদের মায়ের গোত্র পাবে। রাভা সমাজে একসময় গোত্র নির্ধারিত হত মায়ের দিক থেকেই মলগুঁর সংলাপ দিয়ে লেখক স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। রাভাদের আত্মার সন্ধান সংক্রান্ত ‘চিকাবাইরাই’ নামক প্রথার কথা আমরা সোঁদাল উপন্যাসে ও মোল্লাতের সংলাপের মধ্যে দিয়ে জানতে পারি। সব রাভাই জানে তার চিকাবাইরাই আছে। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে রাভা সমাজের মানুষেরা জানতে পারে তার চিকাবাইরাই কোথায় আছে।

আর এই চিকাবাইরাই এর কথা রাভা জননীই একমাত্র জেনে থাকে। সারা জীবন রাভা জননী মনের গোপনে চিকাবাইরাই কথা লুকিয়ে রাখে। জননীর মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দিলে সে মাতৃ সম অন্য কোনো রমণীকে বা তার স্ত্রীকে গোপনে চিকাবাইরাই নামক প্রথার কথা বলে যান। রাভা সমাজের মানুষেরা চিকাবাইরাই নামক প্রথার সঙ্গে পরিচিত ছিল মলগুঁর সংলাপ থেকেই তা আমরা জানতে পারি – “কোন

রাভার চিকাবায়রাই নাই থাকে কেমন রাভা সে?"<sup>১</sup> অমিয়ভূষণ মজুমদার উত্তরবঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাস করায় উত্তরবঙ্গের রাভা সম্প্রদায়ের মানুষদের তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং রাভা জনজাতির দৈনন্দিন জীবনের সাথে তিনি খুবই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। একারণেই হয়তো তিনি জানতে পেরেছেন তাদের চিকাবাইরাই নামক প্রথার কথা। কিন্তু বর্তমান রাভা সমাজে এই প্রথার প্রচলন দেখা যায় না। উত্তরবঙ্গের রাভা জনজাতির মানুষেরা সবদিক দিয়েই যে একটা অস্তিত্বের সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়ে এই উপন্যাসে স্পষ্ট ভাবে আমরা দেখতে পাই। এই উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর সোঁদাল: ভঙ্গুর সত্তার আখ্যান প্রবন্ধে বলেছেন –“আগ্রাসী পুঁজিবাদ যখন প্রযুক্তির নখর প্রহারে আরণ্যক সভ্যতাকে ফালাফালা করতে চাইছে, মাতৃতান্ত্রিক রাভাগোষ্ঠীর মানুষ যে প্রতিকারহীন বিপন্নতার মুখোমুখি- সেই উপলব্ধিকে অমিয়ভূষণ আখ্যানে রূপান্তরিত করেছেন। নৃতাত্ত্বিক নিরিখে যে সব জনগোষ্ঠী ‘অতিআপতগ্রস্ত’ বলে অভিহিত হচ্ছে। তাদের অন্যতম ‘সোঁদাল’ এর গণমানুষ।”<sup>২</sup>

অমিয়ভূষণ মজুমদারের বিনদনি (১৯৮৫) উপন্যাসটি ১৩৯২ বঙ্গাব্দে সপ্তাহ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়েও তিনি রাভা জনজাতির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এই উপন্যাসের তিনি রাভা সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরে তাদের সংকটের কথা বলেছেন। এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তিনি দেখাতে চেয়েছেন রাভারা কোথা থেকে এলো? তাদের পরিচয় কি? এবং পরবর্তীতে তারা কোথায় গেল? এসব প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে লেখক তাদের অস্তিত্বের সংকটের কথা তুলে ধরেছেন উপন্যাসের শুরুতে –“গুড়িটা গাছের গোড়া নয়, নাকি দ্রাবিড় ভাষার শব্দ, ঠিক কি মানে ছিল তা ধরা যাচ্ছে না, তবে গুড়ি যুক্ত গ্রামের নামগুলো নাকি প্রমাণ করেছে, এদিকে বোড়ো জাতের মানুষেরা ছিল। এমনকি এখন যাকে ভোটান বলা হয় সেখানেও বোড়োরা রাজত্ব করেছে। এসব নিয়ে বেশি দূর যাওয়া ভালো হয়না। অহোম-আসাম নিয়ে গোল মাল আছে। এরকম মত আছে, যারা নিজেদের অহোম বলছে, তারা ব্রহ্মপুত্রের দুপারে বড় বড় ঘাসের পৃথিবীতে পৌঁছানোর আগেই, আরও একদল মানুষ সে সব জায়গাকে আসাম, হা-সাম বলত। তাদের ভাষায় হা-সাম মানে পৃথিবী, মাটি, ভূমি-তৃণ, তৃণাচ্ছন্ন; এক কোথায় সবুজ তৃণাচ্ছন্ন পৃথিবী। যাক সে কথা, কোথায় গেলো তারা? রাভা নাকি তারা?”<sup>৩</sup> এই প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে রাভা জনজাতির অস্তিত্বের সংকটকে তিনি ঘনীভূত করে তুলেছেন। তাদের সমাজ-সংস্কৃতি সময়ের কিভাবে হারিয়ে যাচ্ছে তা তিনি দেখিয়েছেন এই উপন্যাসে। লুপ্তপ্রায় জনজাতির মানুষদের কথা আলোচ্য উপন্যাসের তুলে ধরেছেন লেখক। অমিয়ভূষণ *বিনদনি* উপন্যাসে বুদিনাথ দাসের সংলাপের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন রাভা কোচরা-কীভাবে হিন্দুর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

বুদিনাথ রাভা জনজাতি সম্পর্কে জানায়- তারা ‘নাং কোচা। আমরা কোচ’ তারা রাভা এবং কোচ দুটোই। উত্তরবঙ্গে বহুদিন ধরে কোচ রাজারা রাজত্ব করেছিল। তারাই রাভা-কোচদের সর্বনাশ করেছে। বুদিনাথের সংলাপের মধ্যে দিয়ে লেখক এই প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছেন। লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের প্রয়োজনে উপজাতিদের ব্যবহার করেছে, উপন্যাসে লেখক তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন- “তুই জানিস? উম্মা নাকি কয় রিস্টোবেঙ্গল এলা দশ হাজার আর হামরা পাঁচ হাজার। গাদলু একটু ভেবে নিল। বলল কথাটা মিথ্যা নয়। ও তো বলে, এখন প্রধানরা যে মাটি কাটায় কাজ করায়, তাতেও ওদের সংখ্যা বেশি বেশি, খেতমজুরের বেলাতেও তাই। সংখ্যায় ওরা আরও বেড়ে যেতে পারে। খোঁজ করলে দেখবি, রাভাদের জমিতে ওরা অনেকে আধিয়ার হয়ে গিয়েছে। জনাদল বলল, বমভোলা

কয়, মন্ত্রী নাকি বলছে ইম্রা আত্মীয়। আই সবেই এটে। যারা দ্যাশ ভাগ করছে উম্রায় দায়ী। ইম্রায় চিরদিন আত্মীয় থাকিবে।”<sup>১০</sup> অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর বিনদনি উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে রাভা জনজাতির বাড়িঘরের বর্ণনা দিয়েছেন। এই উপন্যাস থেকে আমরা জানতে পারি রাভা সমাজের মানুষেরা নিজেদের থাকার ঘর নিজেরাই তৈরী করত। বাড়ি তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তারা বন-জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করত। প্রতিটি রাভা পরিবারে কাঠ দিয়ে তৈরি একটি বড়ো ঘর থাকত। এই বড়ো ঘরকে তারা চার-পাঁচটি ভাগে ভাগ করে নিত নিজেদের প্রয়োজনে। যেসব রাভা পরিবারে আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল তারা পাটাতন করা দুটি ঘর বানাত। তাদের ভাষায় সেই ঘরকে বলা হয় নক্সা নগৌ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাদের বাড়ি ঘরের অনেক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বিনদনি উপন্যাসে লেখক রাভা সমাজের পোশাক-পরিচ্ছেদ এবং অলংকারের বর্ণনা দিয়েছেন। রাভা সমাজের মানুষেরা ছিল নৃত্যগীত প্রিয়। সারা বছরই তাদের বিভিন্ন উৎসব লেগে থাকত। আর এই উৎসবের জন্য প্রয়োজন হত বিভিন্ন ধরনের পোশাক-পরিচ্ছেদ এবং অলংকারের। তাঁত শিল্পের কাজ ছিল রাভা নারীদের জানা তাই তাদের প্রয়োজনীয় পোশাক নারীরা নিজেরাই তৈরি করত। বিনদনি উপন্যাসে লেখক নিম্নরূপ পোশাক পরিচ্ছেদের বর্ণনা দিয়েছেন –“হতে পারে, কেউ একদিন ফ্রক ছেড়ে আসামের দোখনার মত লাইফুন পরেছিল যা পায়ের পাতা ছুঁয়ে যায়, হতে পারে তাঁর বুক ঢাকার কামুং মেখলার মত পরা ছিল। সে সব প্রমাণ করে, সে সবই মাপে বড় হচ্ছিল সেই হাক্সা বারো-তের বছরের সবুজ সবুজ গায়ে। বিন্দে, তোর সাত নহর- লবগ আর আধুলি গাঁথা মালা তোর একমুঠো কোমরে আর কুল-বড়োই সমান বুকে বড় হচ্ছিল।”<sup>১১</sup>

### তথ্যসূত্র:

১. বসু, আশিসকুমার, ও চ্যাটার্জী, দেবী (সম্পাদিত) ‘অন্তেবাসী সমাজ’, সংস্কৃতি ও উন্নয়ন, হাওড়া: ম্যানাক্রিপ্ট ইণ্ডিয়া, ২০০৪, পৃ. ১৭৯।
২. পাল, সুনীল, (সম্পাদিত), ‘রাভা লোকমানস’, জলপাইগুড়ি: কিরাতভূমি, ২০০১, পৃ. ৬৯।
৩. দেব, রণজিৎ, ‘উত্তরবঙ্গের উপজাতির ইতিবৃত্ত’ মেইনস্ট্রীম পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৭৮।
৪. সামান্ত, সুবল (সম্পাদিত), ‘অমিয়ভূষণ মজুমদার’, বিশেষ সংখ্যা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৯৬।
৫. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, সোঁদাল, ‘অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র’ অষ্টমখণ্ড, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৮৩।
৬. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, সোঁদাল, ‘অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র’ অষ্টমখণ্ড, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৮২।



৭. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, সোঁদাল, 'অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র' অষ্টমখণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৮১।
৮. সামন্ত, সুবল (সম্পাদিত), ; অমিয়ভূষণ মজুমদার' বিশেষ সংখ্যা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৮৯।
৯. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, বিনদিনি, 'অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র' সপ্তমখণ্ড, দে'জপাবলিশিং, ২০০৯, কলকাতা, পৃ. ৮৫।
১০. মজুমদার, অমিয়ভূষণ, বিনদিনি, 'অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র' সপ্তম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৩২।
১১. মজুমদার, অমিয়ভূষণ (২০০৯)। বিনদিনি। অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র। সপ্তম খণ্ড। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১০৬-১০৭।

### সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. বর্মণ, ধনেশ্বর, 'উত্তরবঙ্গের জনজীবন ও লোকাচার', প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০০৭।
২. বাস্ক, ধীরেন্দ্রনাথ, 'পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ' প্রথম খণ্ড, বাস্ক পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৩।
৩. দে, সরকার, দিগ্বিজয়, 'উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি পরিচয়', ছায়া পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১০।
৪. দেব, রণজিৎ, 'উত্তরবঙ্গের উপজাতির ইতিবৃত্ত', মেইনস্ট্রীম পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৪।
৫. বিশ্বাস, সুশান্ত, 'লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০১৭।
৬. রাভা, রাজেন, রাভা জনজাতি, বীনা লাইব্রেরি, গুয়াহাটি, ১৯৭৪।
৭. সাহা, রেবতীমোহন, 'রাভাদের লোককাহিনী', অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০।
৮. ঘোষ, প্রদ্যোত, 'বাংলার জনজাতি', পুস্তকবিপণি, কলকাতা, ২০০৭।



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 700-707

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.059



আধুনিক নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের বহুমাত্রিক সংকট:

প্রসঙ্গ 'বিষবৃক্ষ', 'ঘরে বাইরে' ও 'গৃহদাহ' উপন্যাস

ড. বাপি চন্দ্র দাস, সহকারী অধ্যাপক, সাপটগ্রাম মহাবিদ্যালয়, সাপটগ্রাম, আসাম, ভারত

Received: 16.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## Abstract

*To analyze the multifaceted crises in the marital lives of modern men and women, this dissertation selects three novels by three modern Bengali literary figures. The selected novels are Bankim Chandra Chattopadhyay's Bishabriksha (1873), Rabindranath Tagore's Ghare Baire (1916), and Sarat Chandra Chattopadhyay's Grihadaha (1920). Although numerous other works, such as Bankim's Kapalakundala (1866), Krishnakanter Will (1878), and Rajani (1877), Rabindranath's Chokher Bali (1903) and Jogajog (1929), and Sarat Chandra's Charitraheen (1917) and Sesh Prashna (1931), reflect similar marital issues, we have focused on these three novels for ease of analysis. Examining these three novels reveals a continuity in the crises of modern marital relationships. A common theme among these novels is the presence of love triangles. In Bishabriksha, the entry of Kundanandini into the married life of Nagendra and Surjamukhi creates a love triangle, leading to significant marital conflict. Similarly, in Ghare Baire, the arrival of Sandip in the marital life of Nikhilesh and Bimala forms a love triangle, introducing multifaceted marital crises. In Grihadaha, the active involvement of Suresh in the married life of Mahim and Achala exacerbates their marital problems. Bankim Chandra resolves the consequences of love triangles through moral and societal values. Rabindranath seeks resolution through self-awareness and the realization of inner freedom. Sarat Chandra, on the other hand, transcends moral and self-awareness to depict redemption through remorse and the acknowledgment of stigma. In this dissertation, we aim to explore the multifaceted crises in the marital lives of modern men and women through these three seminal works by these literary giants.*

**Keywords:** marriage, society, love triangle, extramarital affairs, modernity, individualism.

**ভূমিকা:** কথাসাহিত্যে নর-নারীর দাম্পত্য জীবনে সম্পর্কের গভীরতা এবং সংকট ফুটে উঠে স্বাভাবিকভাবে। বিশেষত আধুনিক যুগের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিষবৃক্ষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরে বাইরে, এবং শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের গৃহদাহ—এই তিনটি উপন্যাসে দাম্পত্য জীবনের বহুমাত্রিক সংকট নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই রচনাগুলোতে দেখা যায়, দাম্পত্য জীবন শুধু একটি সম্পর্ক নয়; এটি সামাজিক কাঠামো, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, এবং প্রেম-ত্যাগের টানাপোড়েনের সমষ্টি। উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা কথা সাহিত্যের যুগটি ছিল সামাজিক পরিবর্তনের সময়। তখনকার সমাজে প্রথাগত দাম্পত্য সম্পর্কগুলি প্রায়শই পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তবে আধুনিকতা ও পশ্চিম শিক্ষার প্রভাব, নারীর স্বাধীনতার প্রশ্ন, এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উত্থান দাম্পত্য জীবনে নতুন সংকটের সৃষ্টি করেছিল। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, ও শরৎচন্দ্র এই পরিবর্তনকে তুলে ধরেছেন তাদের রচনায়। বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষে দাম্পত্য জীবনের এক জটিল রূপ তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সূর্যমুখী একজন কর্তব্যপরায়ণা স্ত্রী, কিন্তু তার বৈবাহিক সম্পর্ক নিছক কর্তব্যের বেড়াজালে আবদ্ধ। তার স্বামী নগেন্দ্রনাথের প্রতি তার প্রেম গভীর হলেও স্বামীর চরিত্রগত দুর্বলতা এবং কুন্দনন্দিনীর প্রতি আকর্ষণ দাম্পত্য সম্পর্ককে জটিল করে তোলে। এই উপন্যাসে বঙ্কিম দাম্পত্য জীবনের অভ্যন্তরীণ সংকট, যেমন—বিশ্বাসভঙ্গ, ত্যাগ, এবং আত্মপরিচয়ের প্রশ্নকে তুলে ধরেছেন। সূর্যমুখী যে ত্যাগ স্বামীর প্রতি করে, তা একদিকে তার প্রেমের গভীরতা, অন্যদিকে দাম্পত্য জীবনের অসমতাকে স্পষ্ট করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘরে বাইরেতে দাম্পত্য জীবনের সংকটকে ব্যক্তিগত আবেগ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার দ্বন্দ্বের মধ্যে তুলে ধরেন। নিখিলেশ, বিমলা, এবং সন্দীপের সম্পর্কের জটিলতা এই উপন্যাসের মূল বিষয়। নিখিলেশ একজন উদার ও আধুনিক চিন্তাধারার স্বামী, কিন্তু বিমলার প্রতি তার নিঃশর্ত বিশ্বাস এবং স্বাধীনতার সুযোগ সৃষ্টির ইচ্ছা তাদের দাম্পত্য জীবনে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। বিমলা যখন সন্দীপের আদর্শে আকৃষ্ট হয়, তখন দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাস, স্বাধীনতা, এবং সামাজিক প্রভাবের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ এখানে দেখিয়েছেন, কেবলমাত্র ভালোবাসা বা উদারতা দিয়ে দাম্পত্য জীবনের সংকট মেটানো সম্ভব নয়; বরং সম্পর্কের ভারসাম্য এবং উভয়ের মানসিক সমতা গুরুত্বপূর্ণ। শরৎচন্দ্র গৃহদাহে দাম্পত্য জীবনের সংকটকে তীব্রভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মহিম ও অচলার দাম্পত্য সম্পর্ক একদিকে প্রেমময়, অন্যদিকে তা সামাজিক শর্ত এবং ব্যক্তিগত সংকটে ভরপুর। সুরেশের অধিকারবোধ এবং ঈর্ষা দাম্পত্য জীবনে প্রেমের জটিল রূপকে উন্মোচিত করে। এই তিনটি উপন্যাস দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন সংকটকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, এবং শরৎচন্দ্রের এই তিনটি উপন্যাস আধুনিক নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের বহুমাত্রিক সংকটকে তুলে ধরে। প্রেম, কর্তব্য, স্বাধীনতা, এবং আত্মপরিচয়ের টানাপোড়েন দাম্পত্য জীবনের জটিলতাকে আরও গভীর করেছে। এই সংকটগুলি কেবল ব্যক্তিগত নয়; এগুলো সামাজিক, রাজনৈতিক এবং মানবিক পরিবর্তনের প্রতিফলন। বাংলা কথাসাহিত্যের এই রচনাগুলিতে বিদ্যমান দাম্পত্য জীবনের সমস্যাগুলি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা আজও প্রাসঙ্গিক এবং মূল্যবান।

**পদ্ধতি:** প্রত্যেক গবেষণা অভিসন্দর্ভ কোনো না কোনো পদ্ধতিকে অবলম্বন করে রচিত হয়। তাই আমরা আমাদের বর্তমান অভিসন্দর্ভ চয়নে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিকে অবলম্বন করেছি।

**বিশ্লেষণ:** ‘বিষবৃক্ষ’ বঙ্গদর্শন পত্রিকায় মোট বারোটি কিস্তিতে প্রকাশিত হবার পর ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৯১ সালে শিয়ালকোট থেকে বিষবৃক্ষের হিন্দুস্তানি অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮৪ সালে মরিয়ম এস. নাইট ‘The Poison Tree’ নামে বিষবৃক্ষের ইংরেজি অনুবাদ করেন। “বিষবৃক্ষ উপন্যাসের বিষয়বস্তু ছিল সমসাময়িক বাঙালি হিন্দু সমাজের দুটি প্রধান সমস্যা বিধবা বিবাহ ও বহুবিবাহ

প্রথা। এই উপন্যাসের পটভূমি বিধবা বিবাহ আইন পাশ হওয়ার সমসাময়িক কাল। এই উপন্যাসের নায়িকা বিধবা কুন্দনন্দিনীর চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যার ছায়া অবলম্বনে রচিত বলে জানা যায়।<sup>১</sup> যাই হোক উপন্যাসটি সামাজিক। পরিবারস্থিত চরিত্রের ক্রিয়া-কলাপে সমাজ চালিত হয়। আবার সমাজের বিধি নিয়মের নির্দেশিত পথ ও সমাজ পরিবর্তনের ধারায় চরিত্র ঘুরপাক খায়। বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, হীরা ও দেবেন্দ্র প্রভৃতি মুখ্য চরিত্রগুলো সমাজের নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। যখনই এই বন্ধনের বিপরীতে গিয়েছে তখনই আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। দাম্পত্য জীবন মানে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ স্বামী ও স্ত্রীর মিলন ও সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি সুস্থ প্রবাহ। উপন্যাসে জমিদার নগেন্দ্রনাথ দত্ত ও তার স্ত্রী সূর্যমুখীর মধুর মিলনে গড়ে ওঠে তাদের সুখী দাম্পত্য জীবন। কিন্তু তাদের দাম্পত্য জীবনে সংকট দেখা দেয় বিধবা হয়ে কুন্দনন্দিনীর প্রথাবর্তনে। কুন্দনন্দিনীর আগমনের পূর্বে তাদের দাম্পত্য জীবনে কোন সংকট বা সমস্যা ছিল না। একে অপরের প্রতি ছিল তাদের অবিচল বিশ্বাস ও ভালোবাসা। সেখানে সন্দেহ-ঘৃণা-অবহেলার কোন স্থান ছিল না। নদীর স্রোতের মতো গতিশীল ছিল তাদের দাম্পত্য জীবন। সূর্যমুখী স্বামী নগেন্দ্রনাথের প্রতি পরম বিশ্বাসের কারণেই অনাথা কুন্দনন্দিনীকে তাদের সংসারে স্থান দিয়ে দূর সম্পর্কের ভাইয়ের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর অনাথা কুন্দনন্দিনী পুনরায় নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখী দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করলে তাদের সংসারে অশান্তি নেমে আসে। তখন কুন্দনন্দিনী সতেরো বছরের যুবতী। তার রূপ যৌবন বলসে উঠেছে। কুন্দনন্দিনী যখন তেরো বছর বয়সে অনাথ হয়ে নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে এসেছিল। তখন কুন্দকে দেখে নগেন্দ্রনাথের মনে কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। কিন্তু সতেরো বছরের ভরা যৌবন নিয়ে যখন কুন্দনন্দিনীর প্রত্যাবর্তন ঘটে তখন নগেন্দ্রনাথ চিন্তসংযম করতে পারল না। কমলমণিকে লেখা সূর্যমুখীর চিঠিতে কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রের দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে উঠে, “তাহার চক্ষু এদিক ওদিক চাহে, কাহার সন্ধানে তা কি আমি বুঝিতে পারি না? দেখিলে আবার ব্যস্ত হইয়া চক্ষু ফিরাইয়া লয়েন, কেন তাহা কি বুঝিতে পারি না? কাহার কণ্ঠের শব্দ শুনিবার জন্য, আহারের সময়, গ্রাস হাতে করিয়াও কান তুলিয়া থাকেন, তাহা কি বুঝিতে পারি না? হাতের ভাত হাতে থাকে, কি সুখে দিতে কি মুখে দেন, তবু কান তুলিয়া থাকেন, কন? আবার কুন্দের স্বর কানে গেলে তখনই বড় জোরে হাপুস হাপুস ফিরিয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করেন কেন, তা কি বুঝিতে পারি না।”<sup>২</sup> নগেন্দ্র ধীরে ধীরে কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। নিজের চিত্ত দুর্বলতা ও বৈকল্যের জন্য তাদের দাম্পত্য জীবনে আগুন ধরল। নগেন্দ্রনাথ জমিদার, সমাজও বিধবা বিবাহ ও বহুবিবাহের জন্য অনুকূল ছিল। চাইলে কুন্দকে অনায়াসে বিয়ে করতে পারত। কিন্তু নগেন্দ্র মুখ ফুটিয়ে কথা বলতে ও দৃঢ়তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে ভয় করল। আসলে সময়টা মধ্যযুগ নয়, আধুনিক যুগের জটিলতা যখন দানা বাঁধতে শুরু করেছে তখন বঙ্কিমের কলমে নগেন্দ্রনাথের আবির্ভাব। তাই নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীকে কোন প্রস্তাব না দিয়ে তাকে দেখলে লজ্জায় সরে যায়। আবার তার প্রতি আসক্ত হয়ে সূর্যমুখীর কাছ থেকে সরে আসে। সূর্যমুখী স্বামীর আচরণে অস্বাভাবিকতা দেখে অচিরেই বুঝতে পারল কুন্দনন্দিনীই তার স্বামীর ব্যাধির কারণ। সূর্যমুখী তখন সিদ্ধান্ত নিল স্বামীকে কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সুখী করবে। সূর্যমুখী তা করতে পেরেছিল আধুনিক যুগের সূচনা লগ্নে। একবিংশ শতাব্দীর সূর্যমুখীরা নিশ্চয় স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ে দিত না। স্বামীকে ডিভোর্স কিংবা জেলে পাঠাত। সূর্যমুখী স্বামীকে বিয়ে দিয়ে স্বামীর সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসীর আশ্রমে স্থান নিয়েছিল। বিকল্প উপায়ে সে বিষপান ও করতে পারত। আধুনিক সময়ের প্রারম্ভে নারীরা দাম্পত্য কলহ থেকে নিষ্কৃতি পেতে এই দুটি পথ বেছে নিত। বর্তমান সময়ে ডিভোর্সই শেষ কথা। যদিও নগেন্দ্র সূর্যমুখীর জীবনে সংকট সৃষ্টি হওয়ার মূলে কুন্দনন্দিনীর সক্রিয় কোন

ভূমিকা ছিল না। কিন্তু তার উপস্থিতিতে নগেন্দ্রনাথের চিত্ত বৈকল্য ঘটে। তাই পরোক্ষভাবে সেও দায়ী। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের চরিত্র যখন বজ্র দৃঢ় হয় যখন তাদের চারিত্রিক স্বলন কোনো অবস্থাতেই হয় না, তখন স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে তৃতীয় কোন পুরুষ কিংবা নারীর আগমন ঘটলেও তাদের দাম্পত্য জীবনে কোনরূপ সংকট সৃষ্টি হতে পারে না। নগেন্দ্র যদি সতেরো বছরের যুবতী কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্ত হত না তাহলে তাদের দাম্পত্য জীবনে চিড় ধরত না। এ বিষয়ে সমালোচক শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, “গ্রন্থের কেন্দ্রগত বিষয়ে হইতেছে আত্ম সংঘমে অক্ষম নগেন্দ্রনাথের রূপ মোহ এই অসংযত প্রবৃত্তির ফলে নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখী তিনটি জীবনে একটা দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি। তিনটি জীবন সমুদ্র মল্লনে হলাহলোৎপত্তি।”<sup>৩</sup> অবশ্য অনেক দেরিতে কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রের মোহ ভঙ্গ হয় এবং নগেন্দ্র সূর্যমুখী দাম্পত্য জীবন আবার জোড়া লাগে। কিন্তু নগেন্দ্রনাথের চিত্ত সংঘমের অভাবে যে কুন্দনন্দিনীর জীবন ক্ষতবিক্ষত হয়ে অকালে মৃত্যু হয় তার জন্য দায়ী নগেন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে সমালোচক বলেছেন, “নগেন্দ্রনাথ সূর্যমুখীর সুখী দাম্পত্যের মধ্যে হঠাৎই অসহায় সুন্দরী কুন্দনন্দিনীর আবির্ভাব। ক্রমে নগেন্দ্রনাথের কুঞ্জ আসক্তি তীব্র হয়ে উঠলো। এবং ত্রিকোণ প্রেম তথা দাম্পত্য দূরত্ব ও জটিলতা গভীরতা অর্জন করল। বিধবা বিবাহের প্রশ্নটিকে দূরে সরিয়ে রাখলেও এই অবৈধ সম্পর্কের ট্রাজিক পরিণতি ও শেষে অনেক মূল্য দিয়ে নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখীর মধুর মিলন। ভারতীয় তথা হিন্দু দাম্পত্যের মাধুর্য ও অটুট দায়িত্ব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের দূর আস্থার মনোভাবই প্রতিষ্ঠা দেয়।”<sup>৪</sup>

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসটি ‘সবুজপত্র’ পত্রিকায় ১৯১৫ সালে এবং গ্রন্থাকারে ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। উপন্যাসটিতে মোট আঠারটি আত্মকথা বা অনুচ্ছেদ আছে। উপন্যাসের নায়ক নিখিলেশের সাতটি আত্মকথা, নায়িকা বিমলার সাতটি আত্মকথা ও উপনায়ক সন্দীপের চারটি আত্মকথা রয়েছে। প্রতিটি আত্মকথার মধ্য দিয়ে নায়ক-নায়িকা ও উপনায়কের আত্মবিশ্লেষণ উদ্ভাসিত হয়েছে। আত্মবিশ্লেষণ করতে প্রয়োজন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ ও যুক্তি। যা আধুনিকতার একটা বড় প্রভাব। লক্ষণীয় নিখিলেশ, বিমলা ও সন্দীপ প্রত্যেকে আধুনিক চিন্তা ভাবনায় উদ্বুদ্ধ। সময়টা প্রাসঙ্গিক করে রবীন্দ্রনাথ এই মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচনা প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র যেমন চন্দ্রনাথ, পঞ্চু, অমূল্য, হরিশ কুন্ডু প্রভৃতি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তেমন জোর না দিলে ও নিখিলেশ, বিমলা ও সন্দীপকে আধুনিকতার সার্বিক বৈশিষ্ট্যে সম্পৃক্ত করে চিত্রিত করেছেন। নিখিলেশ উচ্চ শিক্ষিত, বিমলা ও মিসের শিক্ষা প্রদানে ব্যক্তি চৈতন্যের বিকাশ ঘটিয়েছে। আর সন্দীপ স্বদেশী আন্দোলনের নেতা, তার মধ্যে যুক্তি- তর্কের অভাব নেই। সচেতন নিখিলেশ বিমলার দাম্পত্য জীবন সুখে তৃপ্তিতে নয়টা বছর কাটে। তাদের একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা অটুট ছিল। কিন্তু এই নয়টি বছর সুখে থাকার দুটি কারণ বিদ্যমান। প্রথমত: নিখিলেশের চরিত্রে ‘বিষবৃক্ষে’র নগেন্দ্রনাথের মতো কোন স্বলন দেখা যায়নি। বিমলার চেয়ে সুন্দরী ছিল নিখিলেশের বিধবা বৌদিরা। দ্বিতীয়তঃ বিমলা ঘরে থেকেই স্বামীকে দেখেছিল এতদিন, বাইরে থেকে নয়। বাইরের কোনো পুরুষের সঙ্গে তুলনা করে স্বামীকে দেখার অবকাশ পায় নি। বর্তমান সময়ে নারী কিংবা নর পর পুরুষ ও নারীর সঙ্গে নিজ স্বামী কিংবা স্ত্রীর তুলনা করে যখন দেখে তখনই তাদের দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরে। আধুনিক নর-নারীর মানস যুক্তি ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধে ভরা। তাই যে মুহূর্তে পর পুরুষ কিংবা নারীর প্রতি আসক্ত হয় সেই মুহূর্তে তাদের এতদিনের সাজানো ভালোবাসার দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরে। বিমলা যখন ঘরের বাইরে এসে সন্দীপের সাক্ষাৎ পায় তখন অনায়াসে সন্দীপের বাক পটুতায় মুগ্ধ হয়। তখন স্বাভাবিকভাবে নিজের স্বামীর সঙ্গে

সন্দীপের তুলনা করতে তাকে বিমলা মনের কোণে। নিখিলেশের উদারতা ও নিষ্ক্রিয় চিন্তাভাবনা এতকাল বিমলাকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু সন্দীপের উত্তেজনার কাছে তা হীন হয়ে পড়ে। নারী পুরুষের গুণের চেয়ে উত্তেজনায়ই বেশি আকর্ষিত হয়। বিমলার হৃদয়ের টানাপোড়েন নিখিলেশের বুঝতে দেরি হয়নি। নিখিলেশ তখন স্ত্রীর হাতের নিগড় হয়ে না থেকে বিমলাকে মুক্তি দিল। সেটা একমাত্র সম্ভব আধুনিক সময়ের উচ্চ শিক্ষিত মনে উদারচেতনা বোধের জন্য। মধ্যযুগে কোন পুরুষই নারীকে তার পুরুষতান্ত্রিক অনুশাসনের বেড়া জাল থেকে মুক্তি দিত না। বিমলা স্বাধীন হয়ে নিজেই হারাতে বসে। সে প্রথমে সন্দীপকে স্বদেশের ভারী নেতা কল্পনা করে নেয়। “কিন্তু সেদিন সন্দীপবাবু যখন বক্তৃতা দিতে লাগলেন আর এই বৃহৎ সভার হৃদয় দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠে কুল ছাপিয়ে ভেসে যাওয়ার জো হল তখন তার সে এক আশ্চর্য মূর্তি দেখলুম।”<sup>৫</sup> কিন্তু সন্দীপের স্বার্থপরতা, লোভ, নীচতা ও মিথ্যাবাদী আচরণ চোখে পড়েনি। বিমলা সন্দীপের যত কাছে যেতে থাকে তত স্বামী নিখিলেশ থেকে দূরে সরে যায়। তবে সন্দীপের কাছে থেকে বুঝতে পেরেছে সন্দীপের চোখে কামনার আগুন জ্বলছে। কিন্তু কোন অনিবার্য বেগে সে সন্দীপের দিকে ধাবিত হচ্ছে সেও বুঝতে পারেনি। এ বিষয়ে শ্রী শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, “স্বদেশী আন্দোলনের তীব্র উত্তেজনার মুখে নিখিলেশের নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষতা ও অবিচলিত নীতি জ্ঞানের সহিত সন্দীপের জ্বালাময় প্রচণ্ড আবেগ ও প্রবল ইচ্ছা শক্তির তুলনা করিয়া সে তাহার স্বামীর মনোভাবকে কাপুরুষচিত দুর্বলতা বলিয়া ভ্রম করিয়াছে। তাহার ক্রমশ অজ্ঞাতসারে সে সন্দীপের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। সন্দীপ নানাবিধ কৌশলে তাহার মোহাবেশ ঘনাইয়া তুলিয়াছে।”<sup>৬</sup> সন্দীপের কথায় সে প্রণামীর গিনি মুদ্রা সিন্দুক থেকে চুরি করে স্বামীর ঘরকে কলঙ্কিত করেছে। নিজের গহনার বাস্তু সন্দীপকে দিয়ে নিজেই লজ্জিত করেছে। এমনকি নিজের আপন ভাই তুল্য অমূল্যকে দিয়ে কাছারির টাকা চুরি করিয়েছে। তবে অমূল্যের সাহায্যে বিমলা সন্দীপের আসল মুখোশ চিনতে পারে। অবশেষে নিজের স্বামীর চরণে অশ্রু বিসর্জন করে বিমলা তার প্রায়শ্চিত্ত করে। লক্ষণীয় বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনীর কোন সক্রিয় দোষ না থাকলেও নিখিলেশ বিমলার দাম্পত্য জীবন লম্বাভঙ্গ করার জন্য সন্দীপ বহুলাংশে দায়ী। নিজ বন্ধু নিখিলেশের প্রতি সন্দীপ চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। স্বদেশের নামে বন্ধুর ধন লুট করার পাশাপাশি বন্ধুর ঘরে লক্ষ্মীকে ‘মক্ষীরানী’ বলে অভিহিত করে ঘরের বাইরে বের করে এনে চরম অপমান করে তাদের দাম্পত্য জীবনকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। স্বদেশী আন্দোলনে গা ভাসিয়ে ‘পরস্ত্রী মাতৃ সমান’ এই বোধ সন্দীপ হারিয়েছে। যে পরের স্ত্রীকে মাতৃজ্ঞানের পূজা করতে পারেনি, সে কখনো দেশমাতৃকার আরাধনায় ব্রতী হয়ে প্রকৃত স্বদেশী আন্দোলনের নেতা হতে পারে না। সন্দীপের স্বদেশী ক্রিয়া-কলাপ ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়। আধুনিক নর-নারীর দাম্পত্য জীবনে তৃতীয় ব্যক্তির আগমনের কারণ স্বয়ং নর কিংবা নারীর তৃতীয় ব্যক্তির সম্পর্কে উদারতা, বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতাই দায়ী। তৃতীয় ব্যক্তি স্বামী-স্ত্রীর এই গুণাবলীর সুযোগে তাদের দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে সহজেই তাদের দাম্পত্য জীবনকে কলুষিত ও হারখার করে দেয়। যেমনটা করেছে সন্দীপ ও সুরেশ। ঘরে বাইরে উপন্যাসে নিখিলেশ বিমলার দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরা সম্পর্কে সমালোচকের উক্তিটি যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য - “নিখিলেশ বিমলার মধুর দাম্পত্যের মধ্যে শনিগ্রহের মতো ঢুকে পড়েছিল সন্দীপ। সাময়িকভাবে বিমলা সন্দীপের প্রতি মোহাবিষ্ট হয়। মোহমুক্ত হতেও বেশি সময় লাগে নি। কিন্তু সন্দীপের প্রবেশের পর এদের দাম্পত্য জীবনে অস্থিরতার ও সংকট দেখা দেয়।”<sup>৭</sup>

‘গৃহদাহ’ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি বাস্তবধর্মী ত্রিকোণ প্রেমের উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটিতে মোট ৪৪ টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। প্রধান চরিত্র মহিম, অচলা, সুরেশ, পর্ব-১, সংখ্যা-৩, জানুয়ারি, ২০২৫

কেদারনাথ, মৃগালিনী ও রামবাবু। ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসের ঠিক চার বছর পর ‘গৃহদাহ’ প্রকাশিত। ফলে নর-নারীর মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে উভয় উপন্যাসের মধ্যে একটু সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। গৃহদাহের মহিম, সুরেশ উচ্চশিক্ষিত এবং অচলা উদারমনা ও প্রগতিশীল পরিবারের মেয়ে। নায়ক মহিম, নায়িকা অচলা ও উপনায়ক সুরেশকে নিয়ে ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনিই গৃহদাহের উপজীব্য বিষয়। অচলা বিয়ের পূর্ব থেকে মহিমকে ভালোবাসে। মহিমের দারিদ্রপূর্ণ সংসারের পরিচয় পেয়েও মহিমের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে পা দিয়েছে। কিন্তু মহিমের দেশের বাড়িতে এসে শ্বশুরের দারিদ্রপূর্ণ ঘরবাড়ি দেখে অচলার মন কষ্ট পায়। অচলার মন এই বাড়িতে বসতেই চায় না। আসলে অচলা কোনো নিরক্ষর মেয়ে নয়, তার মন যুক্তি দিয়ে ভালো-মন্দের তুলনা করতে জানে। নিজের বাপের বাড়ির অবস্থা সঙ্গে মহিমের বাড়ির অবস্থার দিনরাত তফাৎ। তাছাড়া অচলার মনকে মহিমের বন্ধু, তার প্রণয় প্রার্থী ধনী সুরেশের অবস্থাও প্রভাবিত করে পরোক্ষভাবে। বিয়ের আগে সুরেশের প্রস্তাবে সে রাজি না হয়ে যে ভুল করেছে এটাও তার অবচেতন মনে বাজতে থাকে। সুরেশের বাড়িতে অচলা বিয়ের পূর্বে গিয়েছে এবং সুরেশের ঘরবাড়ির অভিজাত্যতা দেখে বিস্মিত হয়েছে। তাই কী একটা অতৃপ্তিই তাকে মহিমের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে দিচ্ছে না। একথা নিশ্চিত করে বলা যায় মহিম অচলার বিয়ের পূর্বে যদি সুরেশের প্রবেশ তাদের জীবনে ঘটত না তাহলে স্বামীর দারিদ্রপূর্ণ সংসারে এসে অচলা মহিমকে নিয়ে দাম্পত্য জীবনে কিছুটা হলেও সুখী হতে পারত। তাছাড়া মৃগালিনী প্রতি অচলার অহেতুক সন্দেহই তাদের দাম্পত্য জীবন কিছুটা অসুখী করেছে। একদিকে সুরেশের প্রতি টান, অপরদিকে মহিমের সংসারের কদাচার পরিবেশে অচলা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় মহিমের গ্রামের বাড়িতে হঠাৎ মহিম-অচলার দাম্পত্য জীবনে সুরেশের আগমন ঘটলে অচলা যেন মরুভূমিতে জল খুঁজে পায়। এ বিষয়ে সমালোচক শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, “মহিমের পল্লীভবনে সুরেশের অনাহত আগমনে স্বামী-স্ত্রীর এই বিরোধ সাংঘাতিক তীব্রতা লাভ করিল। তাহার অবস্থানের কয়েকদিন ধরিয় তাহাদের অহোরাত্র ঘাত প্রতিঘাতে সুরেশের ধারণা জন্মিল যে অচলা বাস্তবিকই মহিমের প্রতি অনুরক্ত নহে। এই প্রতীতিই তাহার মনকে চরম বিশ্বাসঘাতকতার জন্য প্রস্তুত করিল।”<sup>৮</sup> তারপর মহিমের ঘরে আগুন লেগে মহিম সর্বস্বান্ত হলে অচলা যেন হাল্কা হল। মহিম সুরেশের সঙ্গে অচলাকে কলকাতায় তার বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে অচলার মনে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি মহিম সম্পর্কে। সে সুরেশকে আগুনের মধ্যে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছে। কিন্তু নিজের স্বামীকে ছেড়ে যেতে একটুকুও দ্বিধাবোধ করেনি। তারপর দীর্ঘদিন পরে মহিমের অসুখের খবর পেয়ে সুরেশের বাড়িতে এসে কলের পুতুলের মতো স্বামীর সেবা করেছে ঠিকই। কিন্তু তার প্রাণমন কেড়ে নিয়েছিল সুরেশের বৈভব ও অযাচিত ভালবাসা। সে বুঝে উঠতে পারেনি যে সুরেশ তাকে কাছে পাওয়ার জন্য তার প্রতি বাড়তি খেয়াল নিচ্ছে, বন্ধুর স্ত্রী বলে নয়। অচলার এই বিবেকহীনতা ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণে অচলা স্বামীকে যবলপুর হাওয়া বদলে নিয়ে যেতে সুরেশকে সঙ্গী করে। অচলা জানে যে তাদের প্রতি সুরেশের একটা বিদ্বেষ আছে, তাছাড়া সুরেশ ধীরে ধীরে তাকে কাছে চাইছে, তাসত্ত্বেও জেনে শুনে বিষ পান করার মতো সে সুরেশকে সঙ্গী করেছে। অবশ্য এলাহাবাদ থেকে স্বামীকে একাকী ট্রেনে ছেড়ে যাওয়াতে অচলার ইচ্ছা ছিল না। সুরেশ তার কামনার ধন অচলাকে কাছে পেতে বিবেক হারিয়ে অসুস্থ বন্ধুকে একাকী ফেলে যেতে একবার চিন্তা করেনি। সুরেশের চালাকিতে অচলা কেঁদেছে। কিন্তু সুরেশের কামানলে নিজেকে বিসর্জন দিতে অচলা নিজেকে থামায়নি।- “আজ জীবনের এই চরম মুহূর্তে অভিমান ও মোহই তাহার চিরজয়ী হইয়া রহিল। সে বাধা দিল না, কথা কহিল না, একবার পিছনে চাহিয়াও দেখিল না। একেবারে

নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সুরেশের শয়ন কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল।”<sup>১৯</sup> অচলার অবচেতন মনে আগে থেকে এরকম একটা কিছু আশা করছিল। মহিমের দাম্পত্য জীবন ভেঙে অচলাকে হরণ করে সুরেশ টাকার জুড়ে ডিহরীতে বাড়ি তৈরি করে অবৈধ সংসার পাতলেও মানসিকভাবে অচলা ও সুরেশ একদিনের জন্য সুখ পায়নি। তাদের মনে পাপ বোধ তাদের শান্তিতে থাকতে দেয়নি। অবশেষে প্লেগ রোগে সুরেশের মৃত্যু ঘটান লেখক। আসলে বন্ধিমের মতো শরৎচন্দ্র সামাজিক দায়বদ্ধতার বেড়া জাল মাড়াতে পারেন নি। তাই অচলা সুরেশের পরকীয়া প্রণয়ের পরিণতি বিচ্ছেদে ঘটিয়েছেন, মিলনে নয়। অনেকে বলতে পারেন শরৎচন্দ্র ইচ্ছাকৃতভাবে সুরেশের মৃত্যু ঘটিয়ে দেখিয়েছেন পরকীয়ায় লিপ্ত হলেই পাপ হয়। আসলে এটা ধ্রুব সত্য যে যৌন অপবিত্র হলেই ব্যক্তির বিনাশ অবশ্যস্বাভাবিক। কবি কৃতিবাসও মনে করেন স্বামী বা স্ত্রী ছেড়ে পর স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে রমণ করলে নরকে গমন হয়। এই বোধ আধুনিক শিক্ষিত নর-নারীর মধ্যে সকল সময় দেখা যায় না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক নরনারী স্বার্থপর ভালবাসাকে বেশি পছন্দ করে। অচলা যদি সুরেশের ধন, বৈভব ও সম্পদের প্রতি প্রলুব্ধ না হয়ে শত অভাবের মধ্যেও নিজ স্বামীর প্রতি ভালোবাসা অটুট রাখত তাহলে তাদের গৃহদাহ হয় না। আর তার জীবন ও কলঙ্কিত হত না। সুরেশ যদি নিজ বন্ধু স্ত্রীকে মাতৃজ্ঞানে দেখত তাহলে সেও অচলার চেয়ে সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করে সুখী হতে পারত। মহিম অচলার দাম্পত্য জীবন চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন, “এ উপন্যাসে নায়িকা অচলার দোলাচল চিত্ততা এক অপরিণত নারীর ‘মূঢ়তা’র দায়ে অভিযুক্ত। তবে ঘরে বাইরে বা যোগাযোগ উপন্যাসের তুলনায় শরৎচন্দ্র এক্ষেত্রে একটি সাহসী নিরীক্ষাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। বিমলা মোহগ্রস্ত হয়েও অমূল্যের অদৃশ্য প্রেরণায় দ্রুত-মোহমুক্তি পথে ফিরে এসেছে। স্বামী চরিত্রহীন জেনেও কুমুদিনী কোন মূল্যেই বিপথগামীনি হয়নি। কিন্তু অচলা মুহূর্তের ভ্রান্তিতে, স্বামীর বন্ধু সুরেশের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে। তারপরে অবশ্য অচলার পরম সম্পদ হারানোর শোচনীয় অনুভূতি হয়েছে।”<sup>২০</sup>

**উপসংহার:** পরিশেষে বলা যেতে পারে যে দাম্পত্য জীবনে ফাটল আধুনিক নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। যা একটা অভিলাপও বলা যায়। সমাজ দ্রষ্টা বন্ধিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র দাম্পত্য জীবনের চিড় ধরার পেছনে যে ত্রিকোণ প্রেমকে শনাক্ত করেছিলেন, তা আজ আমাদের চারপাশ ছেয়ে গেছে। সমাজের আনাচে-কানাচে কান পাতলেই ডিভোর্সের খবর মিলে। প্রতিটি কোর্টে শত শত ডিভোর্সের কেস ঝুলে আছে। সেখানে শিক্ষিত ডিভোর্সিদের সংখ্যা বেশি। বিশ্বায়নের যাঁতাকলে পিষ্ট নর-নারী সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও সুচরিত্র সম্পন্ন হওয়াতে কোথাও কিছু একটা ঘাড়তি নিশ্চয় হচ্ছে। দাম্পত্য জীবনে নর-নারী একে অপরের প্রতি ভালোবাসা, বিশ্বাস ও নিঃসন্দেহ যতক্ষণ অটুট রাখে ততক্ষণ তাদের দাম্পত্য জীবনে কোন সংকট আসে না। যেমন দেখা গেছে নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনী, নিখিলেশ বিমলা ও মহিম অচলার দাম্পত্য জীবনে। কিন্তু যেই মুহূর্তে তৃতীয় কোন ব্যক্তির প্রতি দম্পতির মধ্যে কেউ প্রভাবিত হয়েছে তখনই তাদের মধ্যকার ভালোবাসায় ঘৃণা জন্মেছে এবং বিশ্বাসে অবিশ্বাস জন্মেছে। ফলে অনিবার্যভাবে দাম্পত্যে কলহ সৃষ্টি হয়ে ধীরে ধীরে একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দাম্পত্য জীবনে পতন ঘটায়। সমাজবদ্ধ জীবনে দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি সংসারকে সুন্দর করে জগতকে সভ্য করে তুলে। সভ্যতার অগ্রগতির মূলে রয়েছে দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা। তাই বন্ধিম দাম্পত্য জীবনে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কুন্দনন্দিনীর অকাল মৃত্যু ঘটিয়ে নগেন্দ্রনাথ সূর্যমুখীর দাম্পত্য জীবনকে পুনরায় গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নিখিলেশ বিমলার দাম্পত্য জীবনে সংকট সৃষ্টিকারী সন্দীপকে দূরে সরিয়ে বিমলার অচিরেই মোহমুক্তি ঘটিয়ে নিখিলেশ বিমলার দাম্পত্য জীবনকে আবার গড়ে তুলতে চেয়েছেন। আর শরৎচন্দ্র মহিম



অচলার দাম্পত্য জীবনকে ধ্বংসকারী সুরেশের প্লেগ রোগে মৃত্যু ঘটিয়ে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে মহিম ও অচলার দাম্পত্য জীবনকে পুনরায় জোড়া লাগাতে চেয়েছেন। তাছাড়া বিমলা ও অচলার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের ঘটনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে দাম্পত্য জীবনে পবিত্রতার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

### তথ্যসূত্র :

- ১) আন্তর্জাল, <https://bn.wikipedia.org.in>, তারিখ ১৬/০১/২৫, সময় ২.৩৬ মিনিট।
- ২) চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'বিষবৃক্ষ', বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়, কাঁঠালপাড়া, কলকাতা -১, প্রথম প্রকাশ ১২৮০ বঙ্গাব্দ, পৃ : ৪৭।
- ৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, 'বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা', প্রথম প্রকাশ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, মডার্ন বুক এজেন্সি, প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৭০০০৭৩, পৃ: ৬৫।
- ৪) আন্তর্জাল, <https://ir.nbu.ac.in>, ১৫/০১/২৫, পৃ : ২৭৬।
- ৫) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ঘরে বাইরে', বিশ্বাস সাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৩৬৬, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৩, ঢাকা -১০০, পৃ : ২০।
- ৬) বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শ্রীকুমার: বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা', প্রথম প্রকাশ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, মডার্ন বুক এজেন্সি, প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৭০০০৭৩, পৃ: ৯৩।
- ৭) আন্তর্জাল, <https://ir.nbu.ac.in>, ১৫/০১/২৫, পৃ : ২৭৮।
- ৮) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, 'বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা', প্রথম প্রকাশ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, মডার্ন বুক এজেন্সি, প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৭০০০৭৩, পৃ: ১৪১।
- ৯) চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, 'গৃহদাহ', কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ মাঘ- ১৩৫৯, পৃ : ২০৪।
- ১০) আন্তর্জাল, <https://ir.nbu.ac.in>, ১৫/০১/২৫, পৃ : ২৭৯।



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 708-714

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.060



## লোকসংস্কৃতির আলোকে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস: একটি বিশ্লেষণ

ড. আনন্দ ঘোস, সহকারী অধ্যাপক, জি.ল চৌধুরী কলেজ, আসাম, ভারত

Received: 12.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*Forests or rivers have been the source of human civilization and culture since ancient times. We know that the diversity of human life are mainly dependent on the geography of the land. The river and its tributaries have influenced the culture, customs, religion, beliefs, literary works, food and clothing of the Malo community of the country. Advaita Malla Barman's novel 'Titas Ekti Nadir Naam' has highlighted the Malo's culture and life of the Titas River and its tributary Malo's and its rural life. This novel is about the life of Malo community living on the banks of a river called Titas in the Kumillah district (East Pakistan).*

*The fishermen celebrates various festivals focusing on the river. The novel has been divided into four parts and each part has two chapters, and each of their stories has been depicted by the characters in various ways. The sorrows, laughter, love, worship, marriage, dance, songs, etc. of their lives are all narrated here. Despite the struggles of Malos, the celebrations on the banks of river always keep them joyous. In my discussion, I will discuss the various festivals of the Malo community of Titas river valley.*

**Keyword:** Folk culture, diversity, Titas river, Malo, Festivals.

**ভূমিকা:** 'কোনও একটি জাতি বা গোষ্ঠীর নিজস্ব আচার ও সংস্কার, দেবকল্পনা ও ধর্ম-বিশ্বাস, রীতি ও নীতিবোধ, খাদ্য ও পরিচ্ছেদের বিশিষ্টতা, শিল্প ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্যকলা ইত্যাদি অর্থাৎ জীবনধারার সর্ববিধ প্রকাশ যাতে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, সাধারণভাবে তাকেই 'লোকায়ত সংস্কৃতি' বলা যায়।' নদীকে কেন্দ্র করে মানব জীবনের বিচিত্র লীলা উদ্ভাসিত হয়েছে। অরণ্য বা নদীর সঙ্গে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির অঙ্গঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে প্রাচীনকাল থেকে। কারণ পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলির অধিকাংশ গড়ে উঠেছে নদীকে কেন্দ্র করে। নদী, মাটি এবং অরণ্যের প্রাধান্য বাংলাদেশের লোকসমাজের বিভিন্ন রীতিনীতি, আচার-আচরণ, ধর্ম-সংস্কার, বিশ্বাস, শিল্প-সাহিত্য, খাদ্য, পোশাক ইত্যাদি সবকিছুকেই কমবেশি প্রভাবিত করেছে। আমরা জানি মানুষের জীবনচর্যার বিভিন্নতা, স্বাতন্ত্র্যতা ও বৈশিষ্ট্য মূলত সেই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে প্রমথনাথ বিশীর 'পদ্মা' (১৯৩৫), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬) তারাশঙ্কর

বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' (১৯৪০) ও 'হাঁসুলি বাকের উপকথা' (১৯৪৭), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' (১৯৫০), অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬), সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' (১৯৫৭) এবং দেবেশ রায়ের 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮) উপন্যাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসগুলিতে নদী পাড়ের মানুষের সমাজ জীবনের বিভিন্ন লোকউৎসব ও লোকবিশ্বাসের কথা বলা হলেও তার স্বরূপ কিন্তু এক নয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমার আলোচনার বিষয় হল 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে প্রতিফলিত লোকউৎসব ও লোকবিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা। এই উপন্যাসটিতে মালোজীবনের লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান রয়েছে। মালো সম্প্রদায়ের লোকজীবনকে গড়ে তুলেছে তিতাস নদী। এই নদীকে ভিত্তি করে তাদের জীবন বৃত্তের বিভিন্ন লোক উৎসব বর্ণিত হয়েছে এখানে। সাহিত্য সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- 'তিতাসের মন্ত্র স্রোতের উদাসীন মালোপাড়ার জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু জড়িত জীবিকার ছবিকে কাব্যময় ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন অদ্বৈত বাবু।'<sup>২</sup> মালোদের জীবনকথার এমন চিত্র সহজে দেখা যায় না। এ উপন্যাসটি যেন বিশ্বস্ত মালোদের পূজাপার্বণের ও আনন্দনাট্যের এক নির্ভরযোগ্য দলিল হয়ে উঠেছে। নদীর পটভূমিকায় মৎস্যজীবী মানুষের খেটে খাওয়ার এক বাস্তব জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন লেখক এখানে। এই গ্রন্থের লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ তিনি নিজে পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের তিতাস নদীর তীরবর্তী মানব সমাজ থেকে উঠে এসেছেন। তাই তিতাস নদীর সঙ্গে তাঁর জীবনের সংযোগ অত্যন্ত গভীর। তিতাস নদী মালোপাড়ার মানুষের কাছে শুধু একটা নদী নয়, বিশ্বাসবদ্ধ জীবনের চালিকাশক্তিও। কেননা তিতাসের তীরেই তাদের বাঁচা মরার ইতিহাস সঞ্চিত। উপন্যাসের শুরুতেই রয়েছে তিতাস নদীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় - 'তিতাস একটি নদীর নাম। তার কুলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ, প্রাণভরা উচ্ছ্বাস স্বপ্নের ছন্দে সে বহিয়া যায়। ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙ্গে, দিনের সূর্য তাকে তাতায়, রাতের চাঁদ ও তারারা তাকে নিয়ে ঘুম পাড়াইতে বসে কিন্তু পারে না।'<sup>৩</sup>

**অধ্যয়নের উদ্দেশ্য:** আমার আলোচনা পত্রটির মধ্যে আমি অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে নদীতটের বিভিন্ন লোকসংস্কৃতি এবং লোক উৎসব সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়াস করব।

**অধ্যয়নের উৎস:** আলোচনা পত্রটি প্রস্তুত করতে মুখ্য উৎস হিসেবে অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' গ্রন্থটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং গৌণ উৎস হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

**অধ্যয়নের পদ্ধতি:** আলোচনা পত্রটি প্রস্তুত করতে বর্ণনাত্মক এবং বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

এই উপন্যাসটিতে কুমিল্লা জেলার তিতাস নদীতীরবর্তী মৎস্যজীবী মালোপাড়ার জীবনের ছবিটি লেখক বিশ্বাস্যভাবে চিত্রিত করেছেন। তিতাসের মন্ত্র স্রোতের সমান্তরাল মালোদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-সুখ-দুঃখের স্রোত মন্ত্র গতিতে বয়ে চলেছে। তিতাস নদী তার প্রতি উদাসীন। প্রকৃতির এই নির্মম উদাসীনতা এখানে চিত্রিত। এখানে এসেছে ভৌগোলিক সীমা সংহতি ও মানবজীবনের উপর প্রকৃতির প্রভাব। এখানে কাহিনী কোনো এক বিশেষ ব্যক্তির নয় সমগ্র মালো গোষ্ঠীর- 'ইহাতে লেখক কুমিল্লা জেলার তিতাস নামে একটি অখ্যাত নদীর তীরে বাস করা জেলে সম্প্রদায়ের জীবন যাত্রা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, পূজা-পার্বণ-উৎসব ও রীতি-সংস্কৃতির একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণ দিয়াছেন।'<sup>৪</sup> অদ্বৈত মল্লবর্মণ উপন্যাসটিকে চারটি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন এবং প্রতি খণ্ডে আবার দুটি করে অনুচ্ছেদ রয়েছে, প্রতি অনুচ্ছেদে কাহিনীকে সুবিন্যস্ত করেছে বিভিন্ন চরিত্র এবং তাদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট, হাসি-কান্না, পূজা-পার্বণ এবং বিভিন্ন লোক উৎসব। তবে এই

সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছে তিতাস নদী কারণ তিতাস নদীর তীরে মালোদের বাস। মালোদের সমাজের মানুষেরাও তিতাস নদীকে নিজের ভেবে বুকে জড়িয়ে ধরে। এই নদীর তীরবর্তী হিন্দু মালোসমাজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের সরস রূপায়ণ দেখা যায় এই উপন্যাসে। 'ঔপন্যাসিক এখানে বৈষ্ণব, বাউল, ভাটিয়ালি গানের পাশাপাশি লোকজীবনের নানা বিচিত্র উৎসব-নৌকাবাইচ, পদ্মপুরাণ পাঠ ও জন্ম-মৃত্যু বিবাহ নিয়ে নান উল্লাস বেদনার বর্ণনা দিয়েছেন। ঔপন্যাসিক মালো সম্প্রদায়ের একটি সুখপাঠ্য উৎসব বিবরণী তুলে ধরেছেন।'<sup>৫</sup>

এবার আমরা তিতাস নদীতটের জনজীবনে প্রচলিত বিভিন্ন লোক উৎসব সম্বন্ধে আলোচনা করব:

**মাঘ মন্ডলের ব্রত:** এই উৎসবটি মালোপাড়ার কুমারী মেয়েরা পালন করে থাকে। লেখকের ভাষায়- 'মাঘ মাসের শেষ তারিখে সেই মালোপাড়ায় একটা উৎসবের ধুম পরল। এটা কেবল কুমারীদের উৎসব নয়। নাম মাঘ মন্ডলের ব্রত।'<sup>৬</sup> কুমারী মেয়েরা বিয়ের উদ্দেশ্যে এই ব্রতটি করে থাকে। মাঘ মাসের প্রতি সকালে কুমারী মেয়েরা স্নান করে ভাটফুল আর দুর্বাদলে বাঁধা ঝুটার জলে সিঁড়ি পূজা করে উচ্চস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করে- 'লও লও সুরজ ঠাকুর লও ঝুটার জল মাপিয়া বুকিয়া দিব সপ্ত আজল।'<sup>৭</sup> ব্রতের শেষ দিন তৈরি হয় রঙিন কাগজের চৌয়ারী, সেই চৌয়ারি মাথায় করে ভাসানো হয় তিতাসের জলে। অক্ষত চৌয়ারি দখল নিতে কিশোর সুবলেরা হল্লোড় করে উঠে। এপ্রসঙ্গে সাহিত্য সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- 'জেলেদের চৌয়ারি ভাসানার উৎসবকে উপলক্ষ্য করিয়া সাত বছরের মেয়ে বাসন্তীর প্রতি অনুরাগে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই মালো তরুণ- কিশোর ও সুবল- রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছে।'<sup>৮</sup> উঠোন জোড়া আলপনার মাঝে বাসন্তীর মত কিশোরীরা ছাতা মেলে বসে, তার মা ছাতার উপর ছাড়িয়া দেয় খই-নাডু, আর তা কাড়াকাড়ি করে খায় কিশোরেরা। এই ব্রতটির মধ্যে লেখক তিতাসের সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে- 'সেদিন মালোপাড়ার ঘাটে ঘাটে সমারোহ। ঢোল-সানাই বাজিতেছে, পুরনারীরা গান গাহিতেছে, দুপুরের রোদে তিতাসের জল চিক্ চিক্ করিতাছে।'<sup>৯</sup>

**দোল পূর্ণিমার উৎসব:** চৈত্রের মাঝামাঝি এই উৎসব শুরু হয়। বসন্তের তখন ভর যৌবন, এলো দোল পূর্ণিমা। এই দোল উৎসব মালোদের এক নতুন মাত্রা এনে দেয়। এই উৎসবে তারা সকলকে রাঙিয়ে আপন করে তুলতে চায়। তারা শুধু নিজেকে রাঙায় না, প্রিয়জনকেও রাঙিয়ে তোলে। সুকদেবপুরের খোলাতে ঘটা করে দোল উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে নাচ-গানের মাধ্যমে একটি বিচিত্র লোকাচার পালিত হয় সেখানে- 'খলাতে দোল পূর্ণিমার খুব আড়ম্বর হয়। মাইয়া লোকে করতাল বাজাইয়া নাচে। নাচেতো না যেন পরীর মত নৃত্য করে। পায়ে ঘুঙুরা, হাতে রাম-করতাল, এ নাচ যে না দেখছে সে মায়ের গর্ভে রয়েছে।'<sup>১০</sup> সুকদেবপুরের খোলায় নারী পুরুষ একত্রে রং মাখামাখি করে। লেখকের ভাষায়- 'পুরুষেরা কতক্ষণ রং মাখামাখি করিয়া শান্ত দেহে চাটাইয়ের উপর বসিয়াছে। ওদিকে মেয়েদের রং মাখামাখির পালা চলিতেছে, এদিকে পুরুষদের হোলির গান শুরু হইয়াছে।'<sup>১১</sup>

এই দোল উৎসব শুধু মালো সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিতাসের বুকেও রঙের খেলা জেগেছে। তাইতো তারা তাদের নৌকাগুলোকে সাজিয়ে তোলে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে আবির্ ও রং নৌকাকে মাখিয়ে দেয়। এর ফলে তিতাসের বুকে এক অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়।

**পদ্মাপুরাণ এবং মনসা পূজা:** শ্রাবণ মাসের প্রতি রাতে মালোপাড়ায় পদ্মাপুরাণ গান হয়, এক এক বাড়িতে আসর বসে শ্রাবণ মাসে, রোজই রাতে পদ্মাপুরাণ গান হয়। 'বনমালী রাতের জালে আর যায় না। দিনের জালে যায়। আর রাইত হইলে বাড়ি বাড়ি পদ্মাপুরাণ গান গায়।'<sup>১২</sup>

তবে এক সাধুবাবাজীও সুর করে পদ্মাপুরাণ গায়, যে রোজ ভরে মন্দিরা বাজিয়ে পাড়ায় নাম বিতরণ করে। কিন্তু প্রধান গায়ক বনমালী, তার গলা সকলের উপরে। শ্রাবণের শেষ দিন অবধি পদ্মাপুরাণ পাঠ করা হয়, কিন্তু গ্রহ শেষ করা হয় না। লখিন্দরের পুনর্জীবন মনসা পূজার পর দিন সকালে সেটি পাঠ করা হয়। মালোপাড়ার প্রতি ঘরেই শ্রাবণের শেষে মনসা পূজার আয়োজন করে - 'শ্রাবণ মাস শেষ হইয়াছে পদ্মাপূরণও শেষ হইল। ঘরে ঘরে মনসা পূজার আয়োজন করিয়াছে। করিয়াছে জাল বিয়ার আয়োজন।...এক মেয়ে বরের মত সোজা হইয়া চৌকিতে দাঁড়ায় আরেক মেয়ে কনের মতো সাতবার তাকে প্রদক্ষিণ করে, দীপদানির মত একখানি পাত্রে ধানের চারা গুলি রাখিয়া বরের মুখের কাছে নিয়ে প্রতিবারের নিছিয়া-পুছিয়া লয়।'<sup>১৩</sup>

**জন্ম মৃত্যু বিবাহ কেন্দ্রিক উৎসব:** 'জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ তিন ব্যাপারেই মালোরা পয়সা খরচ করে। পাড়াতে ধুমধাম হয়।' বিশেষ করে শিশুর জন্মকে কেন্দ্র করে মালোপাড়ায় এক ব্যতিক্রমী রূপ দেখা যায়। জন্মের সময় ৫ বাড়ির পাঁচ নারী আসিয়া মিলিত হইল। নারীরা একত্র হয়ে উৎকণ্ঠায় শিশুর জন্মের অপেক্ষা করে। তবে তাদের পরস্পরা হল-ছেলে হলে পাঁচবার জোকার দেয় আর মেয়ে হলে তিনবার- 'ছাইলা হইলে পাঁচ ঝার জোকার, মাইয়া হইলে তিন-ঝাড়।'<sup>১৪</sup>

মালোদের বিশ্বাস শিশুর জন্মের ছয় দিনে চিত্রগুপ্ত এসে শিশুর ভাগ্য লিখে দেয়, - 'ছয় দিনের দিন ঘরে দোয়াত, কলম দেওয়া হইল। এই রাতে চিত্রগুপ্ত আসিয়া দোয়াত হইতে কালি তুলিয়া সেই কলমের সাহায্যে শিশুর কপালে লিখিয়া যায় তার ভাগ্য লিপি।'<sup>১৫</sup>

শিশুর জন্মের অষ্টম দিনে পালন করা 'আট-কলাই'। অর্থাৎ সেদিন পাড়ার ছেলেদের খই, ভাজা কলাই, বাতাসা ইত্যাদি খেতে দেওয়া হয়। আর ১৩ দিন পরে অন্ত পড়ে অশৌচের। তাই সেদিন সব কিছু ধোয়া-পাখলার পালা। নাপিত ডেকে পুরুষেরা দাড়ি কামায় আর পুরোহিত দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণে শুদ্ধতা লাভ করে। শিশুকে প্রথম বাইরে বার করার কিছু নিয়ম রয়েছে মালোদের মধ্যে। যেমন- 'উঠানে একটি চাটাই পাতিয়া তাতে ধান ছড়াইয়া দেওয়া হইল। নতুন একটা শাড়ি পারিয়া, নতুন একটা রঙিন বড় রুমালে জড়াইয়া ছেলে কোলে মেজ বউ বাহির হইল। চাটাইয়ের উপর উঠিয়া ধান গুলি পা দিয়া সারা চাটাইয়ে ছড়াইয়া দিল।'<sup>১৬</sup>

শিশুর অন্নপ্রাশনেরও কিছু নীতিময়ম রয়েছে মালদের মধ্যে। এক্ষেত্রে তিতাসেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ তিতাস মালোদের অভিভাবক। তিতাসের সঙ্গে রয়েছে তাদের পারিবারিক সম্পর্ক। তাই অন্নপ্রাশনের দিন শিশুকে তিতাসের জলে স্নান করানো হয় এবং তিতাসকে প্রণাম জানানো হয়- 'ছেলে কোলে ছোট বউকে মাঝখানে করিয়া গান গাইতে গাইতে নারীরা তিতাসের ঘাটে গেল। ছোট বউ তিতাসকে নিজে তিনবার প্রণাম করিল, ছেলেকেও তিনবার শাড়ির আঁচল দিয়া মুছিয়া লইয়া তার মাথা ধোয়াইলো। শাড়ির আঁচল দিয়া মুছিয়া নদীকে আবার নমস্কার করিয়া বাড়ি ফিরে আসিল।'<sup>১৭</sup>

তারপর রাধামাধবের মন্দিরে এক থালা পরমাম্ন নিবেদন করে প্রসাদ বানানো হয় এবং সেই প্রসাদ শিশুর মুখে তুলে দেওয়া হয়। আর বাকি প্রসাদ উপস্থিত ছেলেদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

তিতাসপারের মালো জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি আনন্দ উপভোগ করে বিবাহ অনুষ্ঠানে। বিবাহ যে করে তার তো সুখের শেষ নেই, তাছাড়া অন্যান্যরাও বিবাহ দেখে আনন্দ উপভোগ করে থাকে। বিশেষ করে মালোদের নিজের কোন নিকট আত্মীয় বা প্রিয়জন বিয়ে করে বউ নিয়ে আহ্লাদ করতে দেখলে তাদের খুশির অন্ত থাকে না। আর যে বিবাহ করতে পারে না, সে রাত কাটায় নৌকাতে।

**কালীপূজা:** মালোসমাজে কালী পূজা খুব ঘটা করে হয়ে থাকে। 'কালী পূজাতে হয় সবচাইতে বেশি সমারোহ। বিদেশ হইতে কারিগর আসে। পূজার এক মাস আগে মূর্তি বানানো হয়।'<sup>১৮</sup>

কালী পূজাতে যারা সংযমী থাকবে তারা আগের দিন নিরামিষ আহার গ্রহণ করে। কারণ তারা পুরোহিতের সাহায্যকারিণী। পূজার দিন তারা সকালে প্রাতঃস্নান করে। তারপর পূজার জল তুলে, ফুল বাছাই করে, ভোগ নৈবেদ্য সাজায় আর ফুলের মালা গলায় ও নামাবলী গায়ে দিয়ে পুরোহিত পূজায় বসে। পুরোহিতের নির্দেশ মতো নানা দ্রব্য সংযমীরা এগিয়ে দেয়। অর্ধেক পূজা তারাই সমাধা করে। কালীপূজা উপলক্ষে মালোপাড়ায় যাত্রা ও কবি গান হয়ে থাকে। লেখকের ভাষায়- 'চারদিন পর্যন্ত মালোরা রাত্রে যাত্রা, দিনে কবি শুনিল। চার দিনের জন্য নৌকা গুলি ঘাটে বাঁধা পরিল। জাল গুলি গাবে ভিজিয়া রোদে শুকাইলো। চারদিন তাদের না হইল আহার, না হইল নিদ্রা।'<sup>১৯</sup>

**উত্তরায়ণ সংক্রান্তি:** কালী পূজার সময় গান-বাজনা আমদ আহ্লাদে মালোরা অনেক টাকা খরচ করে সত্য কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার জন্য খরচ করে এই উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে। এটি পালিত হয় পৌষ মাসের শেষ দিন। অর্থাৎ সংক্রান্তিতে। তবে সংক্রান্তির ৫-৬ দিন আগে থেকেই ঘরে ঘরে চালের গুড়ি কোটার ধূম পড়ে। মুড়ি ভেজে ছাতু কুটার তোড়জোড় লাগে। চালের গুড়ি রোদে শুকিয়ে রাখে কারণ তারা খোলাতে পিঠা বানাবে। সংক্রান্তির আগের দিন সারা রাত জেগে মেয়েরা পিঠা বানায়। পরের দিন সকাল থেকেই লেগে যায় পিঠে খাওয়ার ধূম। এই পার্বনে মালোদের মধ্যে একটি রীতিও রয়েছে - 'নারী পুরুষ ছেলে বুড়া অতি প্রতুষে জাগিয়া তিতাসের ঘাটে গিয়া স্নান করে। যারা জালে যায় তারাও নৌকায় উঠিবার আগে গামছা পরিয়া ডুব দেয়।'<sup>২০</sup>

তারা যত তাড়াতাড়ি স্নান করে পিঠে খাওয়া শেষ করবে তত তাড়াতাড়ি গ্রামে নগরকীর্তন শুরু হবে। সারা গ্রাম জুড়ে এই কীর্তন করার জন্য প্রথমেই বেরিয়ে পড়ে মালোপাড়ার দল এবং তারপরেই সাহা পাড়া, যোগি পাড়ার দল তাদের দেখাদেখি বেরিয়ে পড়ে। মালোরা কীর্তন করে নেচে-কুঁদে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে। পুরুষেরা কীর্তন করে বেড়ায় আর মেয়েরা ঘরেতে নানা পঞ্চগন ব্যঞ্জন রান্না করে।

এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন উৎসবে প্রচলিত কিছু লোকগান যে গান গুলির মধ্যে তাদের বাস্তব জীবনের ছবি ফুটে ওঠে। তারা সকলে সুর মিলিয়ে গায়-

নাওরে বন্ধু-

তেল নাই সলিতা নাই, কিসে জলে বাতি

কেবা বানাইলো ঘর, কেবা ঘরের পতি।।

নাও রে বন্ধু

উঠান মাটির খন খন পীরা নিল স্রোতে।

গঙ্গা মইল জল তীরাসে ব্রহ্ম মইল শীতে।'<sup>২১</sup>

মালো সমাজ এ ধরনের গান তাদের পূর্বপুরুষের কাছ থেকে শিখে। তাদের গানগুলিতে বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ সুরের সঙ্গে মিশে যায় মানবতার গভীর আকৃতি।

উপন্যাসটির মধ্যে তিতাস পাড়ের মালোদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন খেলাধুলার উল্লেখ রয়েছে যা লোকসংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ। যেমন গোল্লাছুট, লাই খেলা, নৌবাইচ। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন প্রবাদ প্রবচন ও ঝাঁধা। উপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাই তো বলেছেন- 'মালদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি আছে। গানে- গল্পে- প্রবাদে এবং লোকসাহিত্যের অন্যান্য মাল মশলায় সে সংস্কৃতিও ছিল অপূর্ব। পূজায়-পার্বনে, হাসি-ঠাট্টায় এবং দৈনন্দিন জীবনের আত্মপ্রকাশের ভাষাতে তাদের সংস্কৃতি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মালো ভিন্ন অপর কারো পক্ষে সে সংস্কৃতির ভিতর প্রবেশ করার বা তার থেকে রস গ্রহণ করার পথ সুগম ছিল না। কারণ মালোদের সাহিত্য উপভোগ আর সকলের চাইতে স্বতন্ত্র।'<sup>২২</sup>

**উপসংহার:** পৃথিবীর সব দেশের লোকসমাজেই নানা ধরনের বিশ্বাস-সংস্কার প্রচলিত। লোকসমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অবস্থায় এগুলির উদ্ভব। লোকসমাজকে এগুলি নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। বিশ্বাস-সংস্কারের অবস্থান খুব কাছাকাছি। কিন্তু উয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম একটি পার্থক্যও বিদ্যমান। বিশ্বাস হলো মানসিক ব্যপার একটা ধারণা। আর সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা যখন কিছু করি, তখনই তা সংস্কারে পরিণত হয়। বিশ্বাস-সংস্কারগুলির উদ্ভবমূলে রয়েছে ভয় আর আশঙ্কা। 'অশুভ আর অমঙ্গল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নানাবিধ সংস্কারের আশ্রয় নেয় লোকসমাজ। কখনও কখনও বিশেষ বিশেষ বিধি-নিষেধ গড়ে তোলে। শতাব্দীর পরম্পরায় এমনটা চলে আসছে...লোকসমাজের এমন কোনও দিক নেই, যা নিয়ে বিশ্বাস সংস্কার গড়ে ওঠেনি। জন্ম থেকে মৃত্যু, বছরের শুরু থেকে শেষ, বিশ্বাস সংস্কারের বিপুল আধিপত্য আমাদের চোখে পড়ে। লোকসমাজ এগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।'<sup>২৩</sup> উপন্যাসটির পটভূমি তিতাস নদী কিন্তু তার সঙ্গে যোগ রয়েছে মালো সমাজের জীবন সংস্কৃতি, উৎসব, আচার-আচরণ, জীবনধরণের নানা কাহিনি। তিতাস মালোপাড়ার মানুষের কাছে শুধু একটা নদী নয়, বিশ্বাসবদ্ধ জীবনের অন্যরকম চালিকাশক্তিও। কেননা তিতাসের তীরেই তাদের বাঁচা মরার ইতিহাস সঞ্চিত। তাই তিতাসের জলে নেমে মিথ্যে বলাও তাদের রীতিবিরুদ্ধ। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন- 'তিতাসের জলে দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাদের মুখ দিয়া মিথ্যা কথা বাহির হইতো না। সর্বদা মিথ্যা কথা বলিতে পারিলেও তিতাসের জলে নামিয়া মিথ্যা কথা বলা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।'<sup>২৪</sup> তিতাসের সঙ্গে ছিল মালোদের আত্মিক সম্পর্ক। তাই তাদের প্রতিটি উৎসব পার্বণে তিতাসের প্রসঙ্গ এসেছে। তিতাস কে বাদ দিয়ে মালো সমাজের উৎসব পার্বণ নিষ্ফল।

**তথ্যসূত্র:**

- ১) সেনগুপ্ত, পল্লব, 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', দ্বিতীয় সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, ২০০২, পৃ: ১০০।
- ২) বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ১৯৯৫, পৃ:৩২২।
- ৩) মল্লবর্মাণ, অদ্বৈত, 'তিতাস একটি নদীর নাম', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২০১৩, পৃ: ১৭।
- ৪) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', নবম সংস্করণ, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা:লি, কলকাতা-৭৩, ১৯৯২, পৃ: ৭৬৫।
- ৫) মল্লিক, দীপঙ্কর (সম্পা), 'তবু একালব্য', দ্বিতীয় সংস্করণ, বিশেষ সংখ্যা-লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য, দি গৌরী কালচারাল এণ্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা, ২০২১, প:৫৮৫।
- ৬) মল্লবর্মাণ অদ্বৈত, 'তিতাস একটি নদীর নাম', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২০১৩, পৃ: ৩১।
- ৭) তদেব, পৃ:৩১
- ৮) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', নবম সংস্করণ, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা:লি, কলকাতা-৭৩, ১৯৯২, পৃ: ৭৬৫।
- ৯) মল্লবর্মাণ অদ্বৈত, 'তিতাস একটি নদীর নাম', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২০১৩, পৃ:৩২।
- ১০) তদেব, পৃ: ৫২-৫৩।
- ১১) তদেব, পৃ: ৫৭।
- ১২) তদেব, পৃ: ১৭৮।
- ১৩) তদেব, পৃ: ১৮০-১৮১।
- ১৪) তদেব, পৃ: ১০৪।
- ১৫) তদেব, পৃ: ১০৪।
- ১৬) তদেব, পৃ: ১০৪।
- ১৭) তদেব, পৃ:১০৫।
- ১৮) তদেব, পৃ: ১০৯।
- ১৯) তদেব, পৃ: ১০৯।
- ২০) তদেব, পৃ: ১১৫।
- ২১) তদেব, পৃ: ১১৬।
- ২২) তদেব, পৃ: ২৩১।
- ২৩) মজুমদার, মানস, 'লোকসাহিত্যপাঠ', প্রথম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ: ৬১।
- ২৪) মল্লবর্মাণ, অদ্বৈত, 'তিতাস একটি নদীর নাম', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ২০১৩, পৃ: ২৩৯।





# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 715-724

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.061



## বাংলা সাহিত্যে দলিত ও শরৎচন্দ্র

কিরণ মন্ডল, গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ভারত

Received: 12.01.2025; Accepted: 20.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*The word 'Dalit' in a Hindi word, but word has been used in Bengali Language long before. The word 'Dalit' becomes a uniform force which express a broder caste community. We can explain that the Dalits are the sufferers. The word 'Dalit' is related to various remarkable words such as lower cast, lower community, the sufferers, the outsider, the terminal etc. SaratChandra expresses them in his writings so that the so called readers of our society can understand about them. But he could not describe how to emancipate them from the sufferings. He gives this duty to his readers. If he did not write about them they were under water of sufferings and unbringings and mishaps of our society. So the Dalits are described as Dalits in his writings which is expressed in Bengali Literature.*

**Key words:** Dalit, Uniform, Express, Community, Sufferers, Outsider, Emancipate, Unbringings.

মানুষ সামাজিক জীব একথা আমরা সবাই জানি। এই সমাজের সৃষ্টি হয়েছিল জীবন ধারণের প্রয়োজনে। মানুষ প্রথমে দল বেঁধে থাকার সুবিধা বুঝে একসঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে থাকে, তা থেকেই ধীরে ধীরে গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, গোষ্ঠী থেকে সম্প্রদায়, সম্প্রদায় থেকে বর্ণ-বর্গ-গোত্র ইত্যাদি গড়ে ওঠে। প্রাচীনকাল থেকেই দলিত মানুষের অস্তিত্ব ছিল বলে দেখা গেছে। যারা বঞ্চনার ফলে পিছিয়ে পড়েছে সমাজ জীবন থেকে কিন্তু শোষণ ও নিপীড়নের ফলে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। সেই পিছিয়ে পড়া থেকে আজও এদের মুক্তি ঘটেনি। কালক্রমে তারাই দলিত নামে পরিচিত হয়েছে। হিন্দি ভাষার সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যারা অনুশোচিত জনজাতি তারাই এস.সি, এস.টি, এবং ও.বি.সি নামে পরিচিত হয়েছে।

‘দলিত’ শব্দটি হিন্দি ভাষার শব্দ কিন্তু এই শব্দটি বলদিন আগে থেকেই ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ভারতে বিশেষ কোনো বর্ণের নাম হিসাবে শব্দটি নতুন বলে বিবেচিত হয়। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ নতুন এক পারিভাষিক শব্দ। ‘দলিত’ শব্দটি হয়ে উঠেছে স্বয়ংক্রিয় এক শক্তি যা একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে নির্দিষ্টতা দেয়। অচিন্ত্য বিশ্বাস এর মতে- “বলপূর্বক অবদমনের ফলে যে বর্ণের মানুষরা মানবিক অধিকার বঞ্চিত তারাই দলিত।” অর্থাৎ ‘দলিত’ বলতে আমরা নিপীড়িত মানুষদের বুঝি।

‘দলিত’ শব্দটি বিশেষণ, যার আভিধানিক অর্থ মর্দিত, মাড়ানো হয়েছে এমন অর্থাৎ পদদলিত, পিষ্ট, দমিত এবং নিপীড়িত প্রভৃতি। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে মুসলমানরা ছাড়াও যেসব সামাজিক গোষ্ঠী কংগ্রেসি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে নিজেদের অনেকটাই সরিয়ে রেখেছিল, তারা হলো অব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্য। ১৯৩০ এর দশক থেকে অস্পৃশ্যরা নিজেদের দলিত অর্থাৎ নিপীড়িত দলিতবর্গ বলে পরিচয় দিতে শুরু করে। ঔপনিবেশিক শব্দ ‘পিছড়েবর্গ’ বা পশ্চাৎপদ শ্রেণির চেয়ে ‘দলিত’ শব্দটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাকে বোঝানোর জন্য সুপ্রযুক্ত এবং তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। অন্যদিকে গান্ধীজীর দেওয়া ‘হরিজন’ অর্থাৎ ‘ঈশ্বরের সন্তান’ নামটিও আপত্তিকর ছিল, কেননা এর মধ্যে কৃপা ও করুণার পাশাপাশি বর্ণাশ্রম দর্শনের প্রতি রক্ষণশীল মনোভাব রয়েছে। ‘দলিত’ শব্দটির মধ্যে ‘দলন’ প্রক্রিয়ার কথা বিবৃত হয়েছে। অধ্যাপক হিরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন- “...‘দলন’ বস্তুটি আমাদের দেশে এবং সমাজে আবহমান কাল থেকে প্রায় একটি ‘fine arts’ এ পরিণত হয়েছে। যার তুলনা জগতে শুধু দুর্লভ নয়, একেবারে অপ্রাপ্য। মুনি-ঋষিদের দোহাই দিয়ে আর নিত্যকর্ম পদ্ধতিকে ধর্মের শিকলে বেঁধে রেখে, শুধু বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ আর জন্মান্তরবাদের মতো ধারণার জোরে ইতিহাসে সর্বকালের সর্বদেশের সবচেয়ে মজবুত ‘শ্রেণীকর্তৃত্ব’এর ইমারত এদেশের মনুবাদীরা পরম ঐতিহাসিক দক্ষতায় প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন।”<sup>২</sup> বাসব সরকারের মতে- “সমাজের নিম্নবর্গের শ্রেণিচেতনায় উদাসীন কিন্তু স্বতন্ত্রতা সম্পর্কে সজাগ সংগঠিত জঙ্গি অংশের নাম ‘দলিত’।”<sup>৩</sup>

আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩০ সালে ‘রাশিয়ার চিঠিতে’ লিখেছেন- “চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদের সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন, তাদের মানুষ হবার সময় নেই, দেশের সম্পত্তির উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে, কম পড়ে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে। সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা রোগে মরে। উপোসে মরে। উপরওয়ালাদের লাখি বাঁটা খেয়ে মরে। জীবন যাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ-সুবিধে সবকিছু থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে- উপরের সবাই আলো পায় আর তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।”<sup>৪</sup> অর্থাৎ এই যে মাথায় প্রদীপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের শরীরে তেল গড়িয়ে পড়ে তবুও সকলকে আলো দান করে যে মানুষগুলি, তাদেরকেই আসলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘দলিত’ বলে অভিহিত করেছেন।

১৯৩১ সালে ড. বি. আর. আম্বেদকর আমেদাবাদ ভ্রমণের সময় ‘দলিত’ সম্প্রদায়ের প্রতি বলেন- “my dalit friends, think for a while and ask yourself a question. Does this country belong to you? And freedom for whom?”<sup>৫</sup> অর্থাৎ আমার দলিত বন্ধুগণ, ক্ষণিকের জন্য ভেবে নিজেদের মধ্যে একটি প্রশ্ন করো। এই দেশটি কি প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য? এবং স্বাধীনতা কাদের জন্য?

বর্ণের দিক থেকে নিচু মানুষদের ‘দলিত’ ও বলা হয়ে থাকে। ‘দলিত’ শব্দটি নতুন নয়, মারাঠি, হিন্দি, গুজরাটি এবং আরো অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় দরিদ্র ও শোষিত জনগণ অর্থে তা প্রচলিত রয়েছে। ১৯৩০ সালে হিন্দি ও মারাঠা অনুবাদে ‘বঞ্চিত শ্রেণি’ বা ‘Depressed class’ অর্থে ‘দলিত’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সংকীর্ণ অর্থে ‘দলিত’ বলতে হিন্দু জাতিভেদ ও বর্ণভেদ যুক্ত সমাজের অস্পৃশ্য অংশকে বোঝায়। ‘দলিত’ কথাটি উচ্চারণের সাথে সাথে আমাদের মনে নিম্নবর্গ, নিম্নবর্ণ, অন্ত্যজ, ব্রাত্য, প্রান্তিক, নিম্নবিত্ত ও

নিম্নশ্রেণি ইত্যাদি কথাগুলি উঠে আসে। অনেক সময় আমরা শব্দগুলিকে একই অর্থের বলে ভুল করে থাকি, তাই এখন আমরা প্রতিটি বিষয়কে একটু আলাদা আলাদা ভাবে দেখানোর চেষ্টা করছি-

‘নিম্নবর্গ’ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘সাবলটার্ন’ (subaltern)। এই ‘সাবলটার্ন’ শব্দটি বিশেষভাবে সামরিক সংগঠনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। তবে শব্দটির সাধারণ অর্থ অধস্তন বা নিম্নস্থিত। ইতালিও দার্শনিক ও কমিউনিস্ট নেতা আন্তোনিও গ্রামশি ১৯৩০ এর দশকে তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘কারাগারের নোটবই’ (prison notebooks) বইতে ‘সাবলটার্ন’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন এবং তখন থেকেই শব্দটির বহুমুখী ব্যবহার ছিল। নিম্নবর্গের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রনজিৎ গুহ তার ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’ প্রবন্ধে বলেছেন- “ঔপনিবেশিক যুগে ভূস্বামীদের মধ্যে যারা নিঃস্ব হয়ে পড়ে, গ্রাম ভদ্রদের মধ্যে যারা আর্থিক বা সামাজিক ক্ষমতায় একটু খাটো, মাঝারি কৃষকদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত ওপরের দিকে এবং ধনী কৃষক শ্রেণি এরা সকলেই আমার সংজ্ঞার শুদ্ধ অর্থে নিম্নবর্গের অন্তর্গত। ... উচ্চ বর্গ বলতে আমি বোঝাতে চাই তাদেরই, ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে যারা প্রভু শক্তির অধিকারী ছিল। ... ঔপনিবেশিক ভারতে যারা এই সংজ্ঞা অনুযায়ী উচ্চবর্গের অন্তর্গত, সমগ্র জনসংখ্যা থেকে তাদের বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তারাই নিম্নবর্গ।”<sup>৬</sup>

নিম্নবর্গ সম্পর্কে রুমা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- “হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় যারা সর্বনিম্নে অবস্থিত তারাই তমঃ গুণাধিত। সূত্রাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং এদের সবার নিচে শূদ্র। এরাই তমঃ গুণের আধার, পেশাগত দিক থেকে হীনকর্মে ব্রতী, জাতিগত দিক থেকে অচ্ছুৎ, অর্থনৈতিক অসাম্যের ফলে দরিদ্র, শিক্ষাগত দিক থেকে নিরক্ষর, সংস্কৃতি চিন্তায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এই সকল পরিচয়ে পরিচিত মানুষ, কালে কালে বিভিন্ন ধরনের প্রভুশক্তির পীড়নে পর্য্যদস্ত। এই দলিত, অচ্ছুৎ, পিছিয়ে পড়া মানুষগুলি নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত।”<sup>৭</sup>

এবার আসা যাক ‘নিম্নবর্গ’ (lower cast) বলতে বোঝায় প্রাচীনকাল থেকেই সমাজে যে চারটি বর্গ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের মানুষ দেখা যায়। বর্ণগত দিক দিয়ে শূদ্ররাই সবচেয়ে বেশি শোষিত হতে দেখা যায়, তাই এই শূদ্রদেরকেই নিম্নবর্গের মানুষ বলা হয়ে থাকে। ‘অন্ত্যজ’ বলতে সমাজের নিম্নস্তরের অস্পৃশ্য, অবজ্ঞাত মূলত দরিদ্র সবার পিছে সবার নিচে সর্বহারাদেরই বুঝেছি। তবুও মনে রাখতে হয়েছে ‘অন্ত্যজ’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ ও পরবর্তী সময়ে তার সংকীর্ণ অর্থ ব্যঞ্জনা। আক্ষরিকভাবে অন্ত্য=অন্ত+জ, জন্মা (যে জন্মে)= অন্ত্যজ। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্গ বিরাট পুরুষের (ঋগ্বেদ) দেহ থেকে জন্মের পর শেষ জাত চতুর্থ বর্গ শূদ্রই হল অন্ত্যজ। এই অর্থে ‘শূদ্র’ অর্থে কিন্তু কোন ঘৃণার কথা নেই কারণ পবিত্র বিরাট পুরুষের সকল অঙ্গই তো পবিত্র। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অন্ত্য (শূদ্র) থেকে জ (জাত) অর্থাৎ শূদ্রের ঔরসে উচ্চবর্গের স্ত্রীর গর্ভে প্রতিলোমজ সন্তানদের বলা হতে লাগলো অন্ত্যজ। এখন থেকে ‘অন্ত্যজ’ শব্দের প্রতি সমাজের অন্য তিন বর্ণের অবজ্ঞা লক্ষ্য করা গেল। স্মৃতি শাস্ত্রে বিধান দেওয়া হল যে শাস্ত্রসম্মত সর্বর্ণ এবং অসর্বর্ণ বিবাহের পর সামাজিক প্রথা লঙ্ঘনের ফলে ভ্রষ্ট সংস্রবের সন্তানরাই ‘অন্ত্যজ’। আবার ‘অন্ত্য’ অর্থ নীচ, তাই নীচকুলে যার জন্ম সেই নীচাশয়, অধম ব্যক্তিই অন্ত্যজ।”<sup>৮</sup>

‘ব্রাত্য’ বলতে ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে ‘ব্রত+ষ্ণ্য’ (হীনার্থে) হল ‘ব্রাত্য’ (সরল বাংলা অভিধান: সুবল মিত্র)। কিন্তু অন্য জায়গায় দেখি ‘ব্রাত (ব্যাদি) + য’ সাদৃশ্যে হল ‘ব্রাত্য’ কিংবা ‘ব্রাত+ত্য’ (বেদব্রতচ্যুত অর্থে) হল ‘ব্রাত্য’ (বঙ্গীয় শব্দকোষ: হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)। অর্থ : ব্রতভ্রষ্ট, আচার-সংস্কারহীন, বর্ণচ্যুত, পতিত। অর্থাৎ নিন্দিত অর্থে, হীনার্থে, সংকুচিত ছোট অর্থে, নীচ অর্থে ‘ব্রাত্য’ শব্দটি বর্তমানে ব্যবহৃত হয়ে

থাকে। ড. সুকুমার সেনের মতে, “প্রাচীন বৈদিক ধারার আর্যভাষীরা সমাজ রীতির দিক দিয়ে দুই দলে বিভক্ত ছিল- ‘গ্রাম্য’ আর ‘ব্রাত্য’। ‘গ্রাম্য’ ছিল মর্যাদাবান কুলপতি। দ্বিতীয় দল, যাদের মর্যাদা গ্রাম্যদের তুলনায় অনেক কম ছিল, তাদের নাম ছিল ‘ব্রাত্য’। পরবর্তীকালে শব্দটির আসল অর্থ লোপ পাওয়ার নিন্দার্থক অর্থ আসিয়া যায় এবং তাহা হইতে ‘ব্রতবাহ্য’ অর্থাৎ আর্য সংস্কৃতিচ্যুত এই মানে দাঁড়াইয়া যায়।”<sup>৯</sup> ‘ব্রাত্য’ বলতে স্যার উইলিয়াম মনিয়রের মতে, “vratya a man of the medicant or a vagrant class, a tramp, out caste, low or vile person, either a man who has lost caste through non-observance of the ten principal sanaskaras or a man of low caste descended from a sudra and a kshatriya, accord to some of the illegimate son’s of a kshatriya who know the habits and intentions of slodiers.”<sup>১০</sup>

এবার আরও একটি শব্দ এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে আসে তা হল ‘প্রান্তিক’। ‘প্রান্তিক’ বলতে সাধারণত প্রান্তে বা সীমান্তে যার অবস্থান তাকেই বোঝায়। অর্থাৎ ‘Hegemony’ তথা ক্ষমতা, কর্তৃত্ব বা আধিপত্যকে কেন্দ্র করে যদি একটি বৃত্ত আঁকি তাহলে সেই বৃত্তের প্রান্তে বা পরিধিতে যারা থাকে তাদেরকেই ‘প্রান্তিক’ বলা হয়। তাই পদাবলী সাহিত্যের সাথে সুর মিলিয়ে বলা যায়, সব নিম্নবর্গই প্রান্তিক কিন্তু সব প্রান্তিকই নিম্নবর্গ নয়। অর্থাৎ ‘প্রান্তিক’ বা ‘প্রান্তজন’ বলতে আমরা মূলত সমাজের প্রান্তে অবস্থিত পিছিয়ে পড়া, মূল সভ্যতা থেকে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া মানুষদেরকেই বুঝি। যারা সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে শুধু দুমুঠো অন্নের জন্য। যাদের বুদ্ধির তুলনায় দৈহিক ক্ষমতা অনেক বেশি।

এছাড়া আরও দুটি শব্দ ‘নিম্নবিত্ত’ ও ‘নিম্নশ্রেণি’ নিয়ে একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করব। সাধারণত বিত্ত কেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা অর্থনৈতিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ইংরেজি ‘Finance’ শব্দটির বাংলা অর্থ হল ‘বিত্ত’। তবে বিত্ত নির্ভর করে অনেকটাই মানুষের কর্মের উপর তাই বিত্তের সঙ্গে বংশ-পরম্পরার কোন সম্পর্ক নেই। তাই বিত্তের পরিমাণকে কেন্দ্র করে মূলত উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। নিম্নবিত্ত সম্প্রদায় মূলত কৃষক, ভিখারি, দিনমজুর, শ্রমিক ইত্যাদি। এক কথায় দৈহিক শ্রম নির্ভর বা পেশীনির্ভর কর্মজীবীরা এর মধ্যে পড়ে। অন্যদিকে ইংরেজি ‘Lower Class’ শব্দটির বাংলা অর্থ হল ‘নিম্নশ্রেণি’। মার্কসীয় দর্শন অনুযায়ী ‘নিম্নশ্রেণি’ বলতে আর্থিক অবস্থানে সীমাবদ্ধ থাকেনি, সেই সঙ্গে সামাজিক ও ধর্মীয় মানদণ্ডে নিচু তলার মানুষদেরও বোঝায়।

যুগের হিসাবে দেখা যায় নিম্নবর্গের মানদণ্ড হিসাবে এক এক সময় এক এক জিনিসকে মাপকাঠি হিসাবে ধরা হয়েছে। প্রাক ঔপনিবেশিক যুগে মাপকাঠি ছিল বর্ণ, ঔপনিবেশিক যুগে মাপকাঠি ছিল শিক্ষা আর বর্তমানে উত্তর ঔপনিবেশিক যুগে মাপকাঠি হয়েছে অর্থনীতি। কার্ল মার্কস শ্রেণি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাপকাঠি হিসাবে অর্থনীতিকেই দেখেছিলেন। জমিদারি, মহাজনি শাসনব্যবস্থায় গরিব চাষী, কৃষকদের যখন চরম দুর্দশা দেখা যায় তখন অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব দেখা দিল। কলকারখানার প্রসারের ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছিল। গ্রামের দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ গুলি তখন কৃষিতে আধুনিকীকরণ না ঘটায় ফলে শহরে এসে কলকারখানার শ্রমিকে পরিণত হয়েছে।

প্রাচীনকালে বর্ণগত অনগ্রসরতা এবং বর্তমানের অর্থগত অনগ্রসরতা প্রায় একই রকমের। জন্মগত দিক থেকে যারা দলিত বর্গের, তারাই অর্থনৈতিক দিক থেকে শোষিত হয়ে এসেছে। দলিত বর্গের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল দারিদ্র। বর্ণগত, পেশাগত, গুণগত, শিক্ষা সংস্কৃতিগত উত্থান পতনের পর যা থাকে তা হলো

দারিদ্র। নিম্নবর্ণের সমস্যা আগেও ছিল এখনও আছে এবং পরেও রয়ে যাবে। সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষের বঞ্চনার শিকার হয়ে এসেছে এরা যুগ যুগ ধরে। এরাই নিম্নবর্ণের-নিম্নবিত্তের-নিম্নবর্ণের মানুষ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী এরা তপশীলি জাতি, তপশীলি উপজাতি হিসাবে পরিচয় লাভ করেছে। আবার ৯০ এর দশকে অন্যান্য অনগ্রসর জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেগুলি হল-

১. **তপশীলি জাতি:** ডোম, বাগদি, দুলে, চডাল, চামার, চর্মকার, মুচি, ধোপা, বাইতি, বাতার, বাউরী, ভোগতা, বিদ, চৌপাল, ধাঙড়, তাৎমা, দোসার, ধারী, খাসী, হাঁড়ি, মেথর, ভাঙ্গী, জেলে, মালো, কাদর, কামী(নেপালি), কাওড়া, কাউর, কোচ, কোনার, লোহার, মাহার, মাল্লা, নমঃশূদ্র, নাট, নুনিয়া, পালিয়া, পাটনী, পোদ, রাজবংশী, গুড়ী, তিয়র, তুরি, কোটাল প্রভৃতি সম্প্রদায়।

২. **তপশীলি উপজাতি:** ভুমিজ, বেদিয়া, বীরহোর, বিরজিয়া, চাকমা, চেরো, গারো, গোল্ড, গোড়াইত, হাজং, হোড়, খারওয়ার, খোন্দ, কোড়া, লেপচা, লোধা, খড়িয়া, লোহারা, মগ, মাহালী, মাল, পাহাড়ীয়া, মেচ, মুন্ডা, নাগেশিয়া, ওঁরাও, রাভা, সাঁওতাল, শবর, সৰ্বা, তামাং, ভুটিয়া, টোটো প্রভৃতি সম্প্রদায়।

৩. **অন্যান্য অনগ্রসর জাতি:** গোয়ালা, বেনে, বারুই, মোদক, তেলি, কৈবর্ত, দফাদার, ধুনিয়া, জমাদার, চিত্রকর, কাপালি, কর্মকার, মহলদার, যোগী, কুর্মি, ফকির, গায়ন, লক্ষর, কুমার প্রভৃতি সম্প্রদায়।

এতক্ষণ আমরা ‘দলিত’ শব্দ নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার আসা যাক ‘দলিত সাহিত্য’ বলতে ঠিক কী বোঝায়? এ বিষয়ে মনোহরমৌলি বিশ্বাস বলেন- “দলিত সাহিত্য মানে গ্রাম সংস্কৃতিতে বিকল্প চেতনার উন্মেষ ঘটানো। নগর সভ্যতার সাথে দলিত মানুষের যোগ নেই বললেই চলে। যে-টুকুনি যোগ তা যে ক্ষীণ রশিতে বাধা। যেহেতু তাদের জন্ম এবং অবস্থান গ্রামে, গ্রামই তাদের প্রেম ও ভালোবাসার তীর্থ। গ্রামের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-লাঞ্ছনা, ঘৃণা শোষণ তাঁদের লৈখিক শিল্পের আধার। অন্য লেখকদের থেকে তাঁদের চিন্তায় একটা বড় পার্থক্য ধরা পড়ে এইখানে যে, তারা দৈবনির্ভরতা থেকে মুক্ত হতে চান। মানুষ ভাগ্যের হাতে বন্দী হতে চান তখনই, যখন নিজের ভেতরের শক্তিতে আর আস্থা থাকে না তাঁদের। জটিল সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ হিসাবে নায়ক-নায়িকাকে করে তুলতে হয় ঈশ্বরমুখী। দৈবের থেকে আহত শক্তিতে মিলে যায় জীবনের অমিল অংকের উত্তর। এই চিরকালীন সংস্কৃতি বোধে মানুষের নিজস্ব পরাজয় বিধৃত হয়। দলিত সাহিত্য মানুষের জয়ী হবারই স্বপ্ন দেখায় এবং সে স্বপ্ন বাঁচার। মানুষই সেখানে কথক ও কথকতা। যদিও লেখকদের একটি পা শহরে এবং একটি পা রয়েছে গ্রামে, শিকড়ের টানে শক্তি সঞ্চারিত হয় প্রতিটি লেখায়। দলিত সাহিত্য যেন আরও নির্দিষ্ট হতে পারল আত্মপরিচয়ে- যাঁরা দলিত, তাঁদের জন্য লেখা, তাঁদের নিয়ে লেখা, তাঁদের লেখাই দলিত সাহিত্য।”

সাহিত্যের মধ্যে ‘দলিত’ প্রসঙ্গ হঠাৎ করে এসে যায়নি, আমরা দেখি বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন ‘চর্যাপদ’এর মধ্য থেকেই এই ‘দলিত’ প্রসঙ্গ ধরা পড়েছে। সেখানে ডোম, শবর, চডাল, জেলে, কুলি, মাঝি, ব্যাধ, ক্ষেতমজুর প্রভৃতি নিম্নবর্ণীয় দলিত জাতির প্রসঙ্গ রয়েছে। যাদেরকে নগরের বাইরে, উঁচু পর্বতে বসবাস করতে হত। তাদের বৃত্তি ছিল ঝুড়ি, চাঙাড়ি বোনা, নৌকা চালানো, মদ তোলা, শিকার করা প্রভৃতি। ফলে ‘দলিত’ মানুষের কথা যে এখানে রয়েছে সে কথা বলাই যায়। মধ্যযুগের সাহিত্যেও একইভাবে নিম্নবর্ণীয় দলিত প্রসঙ্গ ধরা পড়েছে। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যেও আমরা গোপ ও গোপিনীর প্রসঙ্গ

পাই, যারা মাঠে গরু চড়ায় ও বাজারে দুধ, দই বিক্রি করে। তাই এদেরকেও নিম্নবর্গীয় ‘দলিত’ বললেও মনে হয় ভুল হয় না। কৃতিবাসের ‘রামায়ণে’ও আমরা নিষাদরাজ গুহক চন্ডাল কে পাই যাকেও আমরা এই পর্যায়ে ফেলতে পারি। ‘মহাভারতে’ আমরা একলব্য এর কথা পাই। ‘চৈতন্য সাহিত্যে’ও যবন হরিদাস ও শ্রীধর এর প্রসঙ্গ পাই যাদেরকেও নিম্নবর্গীয় দলিত হিসাবে ধরা যেতে পারে। পরবর্তী ধারা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে এই দলিত প্রসঙ্গ নানাভাবে ধরা পড়েছে। ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে আমরা রাখাল, জেলে জালু ও মালু, বিশাই ছুতোর, গোদা ঘাটোয়াল, শিবা ডোম প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে নিম্নবর্গীয় দলিত হিসাবে পাই। একইভাবে ‘চতীমঙ্গল’ কাব্যেও কালকেতু-ফুল্লুরা সেই দলিতবর্গ থেকেই উঠে এসেছে। ‘ধর্মমঙ্গল’ কাব্যেও সাধারণত ডোম সমাজ, কালু ডোম ও লখাই ডোমনী এর প্রসঙ্গ উঠে আছে যারা প্রকৃত দলিত। ‘শিবায়ন’ কাব্যের শিবের কৃষক রূপ ও ভিক্ষাবৃত্তি করার প্রসঙ্গ পায়, এছাড়া বাগদী জাতি, কোচনী প্রভৃতি বর্গের সমাজের কথা আসে, যারা নিম্নবর্গীয় দলিত এর মধ্যে পড়ে। সেরকমই আমরা ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যেও ঈশ্বরী পাটনী, শিবের ভিক্ষুকের বেশ, হরিহর প্রভৃতি চরিত্রগুলি নিম্নবর্গীয় অতি দরিদ্র দলিত বলেই আলোচনা প্রসঙ্গে ছুঁয়ে গেছি।

মধ্যযুগের পরবর্তীতে আধুনিক যুগের কথাসাহিত্যের ধারায় সার্থক রূপকার হিসাবে আমরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কে পাই। তার বিভিন্ন উপন্যাস ও প্রবন্ধের মধ্যেও আমরা নিম্নবর্গীয় দলিত প্রসঙ্গ পায়। ‘দুর্গেশনন্দিনী’ উপন্যাসে মাসী লেঘরের ঘরে নিম্ন দলিতবর্গের এক শূদ্রের যুবতী কন্যাকে দাসী করতে দেখি। ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসে নিম্নবর্গের মাঝি, মতিবিবির দাসী প্রভৃতি চরিত্রকে পায়। ‘মৃগালিনী’ উপন্যাসে হেমচন্দ্রর ভৃত্য দিগ্বিজয় কে নৌকার মাঝি রূপে এবং রত্নময়ীর পিতাকে নিম্নবর্গীয় পাটনী চরিত্র হিসাবে পেয়েছি। ‘বিষুবক্ষ’ উপন্যাসে আমরা হীরা চরিত্রটিকে দাসী রূপে এবং নদী তীরে রাখাল, কৃষক, কুলকামিনীর বর্ণনা পায় যা দলিত রূপে প্রতিভাত হয়। ‘ইন্দিরা’ উপন্যাসে কাহার জাতিতে পায় এবং জেলে চরিত্রের খোঁজ পায় যারা নিম্নবর্গীয় দলিত বর্গেরই মানুষ। ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসে মালী, দাসদাসী, পাঁচি চাঁড়ালিনি, পালকিবাহক প্রভৃতি নিম্নবর্গের দলিত মানুষের পরিচয় পায়। ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসেও ভিখারি, তাঁতি, চোয়াড়, হাড়ি, ডোম, বাগদী প্রভৃতি জাতির পরিচয় মেলে যা দলিত বর্গের অন্তর্ভুক্ত। ‘দেবী চৌধুরানী’ উপন্যাসেও আমরা প্রফুল্লকে বাগদী ঘরের মেয়ে হিসাবে এছাড়াও হাড়ি, ডোম, চন্ডাল, বেহারা, মাঝি, নাপিত প্রভৃতি নিম্নবর্গীয় দলিত বর্গের মানুষের পরিচয় পায়। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তীতে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পায়। তাঁর ‘করণা’ উপন্যাসের মধ্যে ভবি ও শম্ভুকে নিম্নবর্গের চরিত্র হিসাবে দেখা যায়। ‘রাজসী’ উপন্যাসের মধ্যে আমরা নিম্নবর্গের দলিত হিসাবে আদিবাসী সমাজের কুকি ও জুমিয়ারা জনজাতির পরিচয় পায়। ‘চোখের বালি’ উপন্যাসে আমরা জেলে, মাঝি মাঝা, লাছমনিয়া, প্রভৃতি চরিত্র কে নিম্নবর্গের মানুষ হিসাবে দেখেছি। ‘গোরা’ উপন্যাসের মধ্যেও আমরা জেলে, ছুতোর, নাপিত, ফেরিওয়াল, চন্ডাল এবং চরঘোষপুরের ফরুসদার কে নিম্নবর্গের দলিত জাতি হিসেবে পরিচয় পেয়েছি। ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসে আমরা নিম্নবর্গের হতদরিদ্র দলিত বর্গের প্রতিভূ হিসেবে পঞ্চু চরিত্রটিকে পেয়েছি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তী সাহিত্যিক হিসাবে আমরা যাকে পেয়েছি তাকে নিয়েই আমাদের মূল আলোচনা, তিনি হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি একদিকে যেমন বাংলার জমিদার শ্রেণি ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে নিখুঁত ও প্রাণবন্ত রূপ দিয়েছেন তেমনি অন্যদিকে উপেক্ষিত, পতিত, অপাণ্ডজ্যেয়, অবহেলিত, নির্যাতিত শ্রেণির মানুষদের কথাও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাদের অশিক্ষা,

সংস্কার কুসংস্কার, আত্মিক ও মর্মান্তিক সমস্যাগুলিই তার সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছে। তিনি পল্লী বাংলার নিম্নবর্ণের অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে সারা জীবন ধরে সংস্পর্শে যেমন থেকেছেন তেমনি তাদেরকে সাহিত্যেও স্থান দিয়েছেন। তিনি সমাজের এই অবহেলিত, অবদমিত, নির্যাতিত, শোষিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, পীড়িত নিম্নবর্ণের দলিত মানুষের হাত ধরে টেনে তুলেছেন তার লেখনীতে।

গোপাল চন্দ্র রায় তাঁর ‘শরৎচন্দ্র’ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের নিবেদন অংশে দেখিয়েছেন- “তাঁর নিজের কথায়- ‘এমন দিন গেছে, যখন দু তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় থেকেছি। কাঁধে গামছা ফেলে এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি। কত বাড়িতে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে-তারা ভদ্রলোক! কত হাড়ি-বাগদীর বাড়িতে আহা করছি...তারপর খুব ভালো করে দেখে নিয়েছি পল্লীগ্রাম ও পল্লীসমাজ’।”<sup>১২</sup> শরৎচন্দ্রের রচিত যে সমস্ত গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে আমরা নিম্নবর্ণীয় দলিত বর্ণের পরিচয় পেয়েছি সেগুলি আলোচনা করার চেষ্টা করছি-

প্রথমেই আসা যাক গল্পের কথায়। ‘বিলাসী’ (১৯১৮) শরৎচন্দ্রের অন্যতম ছোট গল্প। এখানে ব্রাহ্মণ সন্তান মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে দলিত শ্রেণির বেদের মেয়ে বিলাসী দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয়ের অসুখের সময় এই দলিত নারী বিলাসী নিরলস সেবা-শুশ্রূষার দ্বারা তাকে সারিয়ে তোলে এবং স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। সেটি সমাজ মেনে নেয় না, ভদ্র সমাজের কাছে এটা অনাচার। বিলাসীর প্রেম গভীর, সে মৃত্যুঞ্জয় কে নিয়ে মালোপাড়ায় উঠলো। সুখেই চলছিল তাদের জীবন কিন্তু একদিন একটা বাড়িতে সাপ ধরতে গিয়ে সাপের কামড়ে মারা যায় মৃত্যুঞ্জয়। স্বামী বিয়োগের ব্যথা বিলাসীর বুকে প্রচণ্ড আঘাত হানে। সে এক সপ্তাহের মধ্যে আত্মহত্যা করে প্রেমাস্পদহীন পৃথিবী থেকে বিদায় নিল- “একদিন গিয়া শুনিলাম, ঘরে তো বিষের অভাব ছিল না, বিলাসী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে।”<sup>১৩</sup> সমাজ নেতারা এর মধ্যে সাপের অবশ্যম্ভাবি দণ্ডবিধির নিশ্চিত প্রমাণ পেয়ে সমাজনীতির জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছে। প্রেম ও প্রেমাস্পদের জন্য এই প্রাণ বিসর্জন দলিত বর্ণের প্রতিভু হিসেবে বিলাসী চরিত্রটিকে অনন্য করেছে।

‘মহেশ’ (১৯২২) গল্পেও দলিত মুসলমান কৃষক গফুর ও তার মেয়ে আমিনার কথা পাই। দলিত বলে আমিনাকে জল আনতে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। জমিদার শিবচরন বাবুর অত্যাচারে শেষ পর্যন্ত রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছেড়ে আমিনাকে নিয়ে ফুলবেড়ের চটকলের দিকে রওনা দেয়। যাওয়ার সময় বলে- “আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্ঠা নিয়ে মরেছে, তার চরে খাবার এতোটুকু জমি কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্ঠার জল তাকে খেতে দেয়নি তার কসুর তুমি যেন কখনো মাফ করো না।”<sup>১৪</sup> বর্ণবৈষম্য ও সমাজের শোষণ ও শোষিত দুই শ্রেণির চিত্র ফুটে উঠেছে এবং সেই সঙ্গে দলিত শ্রেণিকে যে কত অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে তা দেখিয়েছেন। একদিকে যেমন লেখকের নীরব প্রতিবাদ ও দলিত শ্রেণির মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তেমনি অন্যদিকে সমাজ সচেতনতার দিকটিও গল্পে যথেষ্ট সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে।

‘অভাগীর স্বর্গ’ (১৯২২) গল্পেও অভাগী নামের এক দলিত ‘দুলে’ জাতের মেয়ের করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। কাঙালীর মায়ের ধর্ম বিশ্বাস কেন্দ্রিক মৃত্যু চিন্তার কথা ফুটে উঠেছে। মুখুঞ্জি গিন্নির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখে তার মনে হয়েছে চিতার ধোঁয়ার মধ্যে যেন আকাশ থেকে রথ নেমে এসেছে, সেই রথে গিন্নিমা স্বর্গে গেছেন। তারও মনে সাধ ছেলের হাতের আঙুন নিয়ে স্বর্গে যাওয়ার কিন্তু তার সাধ পূরণ করতে পারেনি কাঙালী, কেননা দুলে ছোট জাত অর্থাৎ দলিত শ্রেণি তাই সমাজে মরা পোড়ানোর তাদের অধিকার নেই।

ভট্টাচার্য মহাশয় বলে- “তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে? যা, মুখে একটু নুরো জ্বলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দে গো।”<sup>২৫</sup> সামন্তবাদী শোষণের অত্যাচারে নিজেদের জমিতে পোঁতা গাছ কাটতে গিয়ে তারা লাঞ্চিত ও অপমানিত হল। দলিত শ্রেণির সামাজিক সংকটকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। মানবতা বিরোধী কাজের বিরুদ্ধে যেমন জেহাদ ঘোষণা করেছেন তেমনি দলিত শ্রেণির মানুষের প্রতি মমত্ববোধের পরিচয় দিয়ে তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে মানবতার জয়গান গেয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের গল্পের আলোচনার পর আমরা তাঁর উপন্যাসের মধ্যেও দলিত বর্ণের কথা খুঁজে পেয়েছি, সেগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করছি- ‘পল্লীসমাজ’ (১৯১৬) উপন্যাসে দেখি কুঁয়াপুর গ্রামটি যদিও ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম হলেও দলিত জাতি হিসেবে কৈবর্ত, জেলে, সদগোপ, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। এছাড়া পিরপুরের মুসলমান লোকগুলি সমাজে অবহেলিত বা দলিত শ্রেণির ছোট জাত বলে চিহ্নিত। রমেশ দেখেছে “প্রত্যেক গ্রামেই কৃষকদিগের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; অনেকেরই এক ফোটা জমি-জায়গা নাই; পরের জমিতে খাজনা দিয়া বাস করে এবং পরের জমিতে ‘জন’ খাটিয়া উদরাম্মের সংস্থান করে। দুদিন কাজ না পাইলে কিংবা অসুখে-বিসুখে কাজ করিতে না পারিলেই সপরিবারে উপবাস করে।”<sup>২৬</sup> রমেশ উচ্চ পরিবারের সন্তান হয়েও জাতিভেদ প্রথায় বিশ্বাসী নয়, সে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। শ্রেণিশোষণ প্রজাদের দুর্দশার অন্যতম কারণ রমেশ বুঝতে পেরেছে তাই দলিত শ্রেণির প্রজাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জন্য স্কুল বাড়ি নির্মাণ ও রাস্তাঘাট তৈরি সহ আরো নানান কাজে হাত লাগিয়েছে। এভাবেই লেখক দলিত শ্রেণির মানুষদের কথা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

‘শ্রীকান্ত’ (১ম পর্ব: ১৯১৭ ও ২য় পর্ব: ১৯১৮) উপন্যাসের প্রথম পর্বে আমরা দলিত চরিত্র হিসেবে অন্নদাদিদি ও শাহজীকে পাই। শাহজী অন্যান্য কর্মের জন্য পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং সেই সঙ্গে দলিত জাতির সাপুড়ের পেশা অবলম্বন করেছিল। উপায় অভাবে স্বেচ্ছায় সে দলিত বর্ণে নিমজ্জিত হয়েছিল। অন্যদিকে অন্নদাদিদিও তার সতী ধর্ম বজায় রাখতে, নইলে স্বামীর প্রতি ভালবাসায় স্বেচ্ছাকৃতভাবেই স্বামীর সহগামিনী হয়েছিল। উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে দেখি ঝি যখন ডোমের কথা বলে তখন লেখক জানাই- “ডোম! দেশে এই জাতিটা অস্পৃশ্য। ছুঁয়া ফেলিলে স্নান করা compulsory কি না, জানি না। কিন্তু কাপড় ছাড়িয়া গঙ্গাজল মাথায় দিতে হয়, তাহা জানি।”<sup>২৭</sup> এভাবেই লেখক সমাজের দলিত শ্রেণির মানুষদের দুঃখ দুর্দশা ও পরিণতির কথা তুলে ধরেছেন।

‘বামুনের মেয়ে’ (১৯২০) উপন্যাসটিতে জাতিগত বৈষম্য ও সংস্কারের চিত্রটি প্রকট হয়ে উঠেছে। এখানে প্রিয়নাথ এক অসহায় নিরাশ্রয় দলিত দুলে জাতির পরিবারকে গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ার এক প্রান্তে আশ্রয় দেয়। তার জন্য প্রিয়নাথকে অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। দলিত জাতিকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে রাসমণি ক্ষুব্ধ হয়ে বলে ওঠে- “ও তুই এককড়ে দুলের মেয়ে বুঝি? তাই বল। এককড়ে মরতে না মরতে বুড়ো তোদের বের করে দিলে? ছোটজাতের মুখে আঙুন! তা বাপু দিলে বলেই কি তোরা বামুনপাড়ায় এসে থাকবি? তোদের আঙ্গুদী ত কম নয় লা! কে আনলে তোর মাকে? রামতনু বাঁড়ুয়োর জামাই বুঝি? নইলে এমন বিদ্যে আর কার! ঘরজামায় ঘরজামাইয়ের মত থাক, তা না, শব্দের বিষয় পেয়েচিস বলে পাড়ার মধ্যে হাড়ি-ডোম-দুলে-ক্যাওরা এনে বসাবি।”<sup>২৮</sup> লেখক এভাবেই আমাদের দলিত বর্ণের মানুষদের কিভাবে অত্যাচার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করতে হয় তা দেখিয়েছেন।



‘বিরাজ বৌ’ (১৯১৪) উপন্যাসে আমরা দলিত শ্রেণির পরিচয় পাই মতি চাঁড়ালের কথায়। যেখানে সে বলেছে- “ছোটজাত হয়ে জন্মেচি ঠাকুন্দা, কিছুই ত জানি নে কি করতে হয়- একবার চল, বলিয়া সে দু’পা জড়াইয়া ধরিল।”<sup>১৯</sup> বিরাজ বৌ তুলসী চাঁড়ালের ঘর থেকে ভিক্ষা করে নিয়ে যায়, তখন কোন অপমান তাকে তেমন করে বেঁধেনি। লেখক এখানে দেখিয়েছেন দলিত শ্রেণির মানুষের ঘর থেকে ভিক্ষা করে নিয়ে যাচ্ছে বিরাজ, তাই এখানে কিছুটা হলেও দলিত শ্রেণির উত্থান লক্ষ্য করা গেছে।

‘বিপ্রদাস’ (১৯৩৫) উপন্যাসে লেখকের বর্ণনায় আমরা দলিত শ্রেণির বসবাসের কথা পায়- “বলরামপুর সমৃদ্ধ গ্রাম। ছোট-বড় অনেকগুলি তালুকদার ও সম্পন্ন গৃহস্থের বাস। একপ্রান্তে মুসলমান কৃষকপল্লী ও তাহারই অদূরে ঘর-কয়েক বাগদী ও দুলেদের বসতি।”<sup>২০</sup> অর্থাৎ এখানে দেখতে পাই গ্রামের দলিত শ্রেণির বসবাস গ্রামের এক প্রান্তে, যারা নীচ ও ছোট জাত বলে পরিচিত। তাই তাদের আলাদা করে বসতি স্থাপন করতে হয়েছে।

‘দেবদাস’ (১৯১৭) উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই চন্দ্রমুখি এসে অশখথবুরি গ্রামে ঘর বেঁধেছে এবং সেখানে দলিত শ্রেণির পরিচয় পায়- “এ গ্রামে ভদ্রলোকের বাস নাই। চাষা, গোয়াল, বাগদী, দু’ঘর কলু, আর গ্রামের শেষে ঘর দুই মুচীর বাস।”<sup>২১</sup> অর্থাৎ এখানেও আমরা ওই গ্রামে সমস্ত মানুষই দলিত বর্গের বলে জানতে পারি। তারা আপদে-বিপদে সবাই চন্দ্রমুখীর কাছে এসে টাকা নিয়ে যায়। তার পরিবর্তে তারা তাদের ক্ষেতের শাকসবজি, কলা, মূলা দিয়ে যায়। এখানে চন্দ্রমুখীর সঙ্গে দলিত জাতির নিবিড় সম্পর্কের ছবি ফুটে উঠেছে।

‘দেনা-পাওনা’ (১৯২৩) উপন্যাসে আমরা দলিত শ্রেণির পরিচয় পাই রায়মহাশয়ের আতঙ্ক প্রকাশের মধ্য দিয়ে- “তিনি জানিতেন ষোড়শীর কয়েকজন একান্ত অনুগত ভূমিজ ও বাগদী প্রজা আছে। তাহারা যেমন উদ্ধত তেমনি নিষ্ঠুর। ডাকাতি করে বলিয়া পুলিশের খাতায় নাম-ধাম পর্যন্ত লেখা আছে।”<sup>২২</sup> এভাবেই আমরা আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে কিছুটা হলেও দলিত বর্গের পরিচয় পাই।

পরিশেষে লেখকের কথা দিয়েই বলা যায়- “সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের হিসাব নিলে না, নিরুপায়, দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেল না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুই নেই-এদের বেদনায় দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নিবীচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদের নিয়ে।”<sup>২৩</sup> শরৎচন্দ্র এভাবেই নিম্নবর্গের অন্তর্জ দলিত শ্রেণির মানুষের দুঃখ বেদনার কথা তুলে ধরেছেন। কিন্তু তাদের উন্নতির ও মুক্তির কোনো পথ দেখান নি। আসলে তিনি আমাদের সমাজের পাঠক পাঠিকাদের কাছে তাঁর উপন্যাসের মধ্যে থাকা দলিত মানুষের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্পণ করেছেন। শরৎচন্দ্র যদি এসব দলিত মানুষদের কথা সাহিত্যের পাতায় তুলে না ধরতেন তাহলে হয়তো তারা অতল জলেই পড়ে থাকতো। তাই বলা যায় শরৎচন্দ্রের লেখনিগুলো যেন সমাজের নিম্নবর্গীয় দলিত শ্রেণির মানুষের দলিল।

## তথ্যসূত্র :

১. চক্রবর্তী, সুধীর সম্পাদিত, 'বুদ্ধিজীবীর নোটবই', পুস্তক বিপণি, ২০০৫, পৃঃ ২১৬।
২. সেন, সুজিত, 'দলিত আন্দোলন', মিত্রম, ২০১৩, পৃঃ ১২০।
৩. তদেব, পৃঃ ১৬৪।
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রাশিয়ার চিঠি', বিশ্বভারতী, ১৯৩১, পৃঃ ৫২।
৫. Dr. Ambedkar and Ahmedabad, An Echo Beyond the Heart. Yogendra Makwana, Sudarsan Agarwal(ed), India pvt. Ltd,1991, p.g 97.
৬. ভদ্র, গৌতম ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮, পৃঃ ৩৩।
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা, 'বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪, পৃঃ ১৫।
৮. দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন, 'বঙ্গালা ভাষার অভিধান' (১ম খণ্ড), ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১৯৩।
৯. সেন, ড. সুকুমার, 'বঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৪০, পৃঃ ১০।
১০. Monior Monior, Sir Williams. A Sanskrit-English Dictionary.
১১. বিশ্বাস, মনোহরমৌলি, 'দলিত সাহিত্যের রূপরেখা', বাণী শিল্প, ২০০৭, পৃঃ ২৯।
১২. রায়, গোপালচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, ২য় সং, ১৩৮২, পৃঃ ৮।
১৩. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, 'শরৎ রচনাবলী', (২য় খণ্ড)। দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩, পৃঃ ৯৮৩।
১৪. তদেব, পৃঃ ১০১৮।
১৫. তদেব, পৃঃ ১০২৫।
১৬. তদেব, পৃঃ ২৭৮।
১৭. তদেব (১ম খণ্ড), পৃঃ ১৫৩।
১৮. তদেব (৩য় খণ্ড), পৃঃ ৫১৮।
১৯. তদেব (২য় খণ্ড), পৃঃ ৬৫৯।
২০. তদেব (৩য় খণ্ড), পৃঃ ২৫১।
২১. তদেব (১ম খণ্ড), পৃঃ ৭৪১।
২২. তদেব (৩য় খণ্ড), পৃঃ ৮০৬।
২৩. ঘোষ, ড. অজিতকুমার, 'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার', (৫৭তম জন্মদিনে প্রতিভাষণ), দে'জ পাবলিশার্স, ৪র্থ সং, ২০১৬। পৃঃ ৩৩৯।

## সহায়ক গ্রন্থ:

১. ঘোষ, অজিতকুমার, 'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার', দে'জ পাবলিশার্স, ২০১৬।
২. চক্রবর্তী, সুধীর সম্পাদিত, 'বুদ্ধিজীবীর নোটবই', পুস্তক বিপণি, ২০০৫।
৩. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, 'শরৎ রচনাবলী' (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড), দে'জ পাবলিশার্স, ১৯৯৩।
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা, 'বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা, 'মঙ্গলকাব্যে : নিম্নবর্গের অবস্থান', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৯।
৬. বিশ্বাস, মনোহরমৌলি, 'দলিত সাহিত্যের রূপরেখা' বাণীশিল্প, ২০২১।
৭. ভদ্র, গৌতম ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদিত, 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮।
৮. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, 'শরৎচন্দ্র : পুনর্বিচার', দে'জ পাবলিশার্স, ২০০১।
৯. মুখোপাধ্যায়, সুশোভন, 'প্রাক-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অন্ত্যজ জীবন', করুণা প্রকাশনী, ১৪১৩।
১০. রায়, গোপালচন্দ্র, 'শরৎচন্দ্র', আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৩।
১১. সেন, সুকুমার, 'বঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'(১ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৪০।
১২. হোসেন, সোহারাণ, 'বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্যজীবন', করুণা প্রকাশনী, ২০০৪।



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 725-736

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.062



## সমরেশ বসুর 'বিবর' : নৈতিক সংকট, পাপবোধ ও আত্মদ্বন্দ্বের গল্প

মৌমিতা হালদার, গবেষক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 16.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*Somresh Basu stands as one of the most prominent figures in Bengali literature, renowned for his writing that poignantly captures the profound crises and contradictions embedded in society. His novel Bivor is a quintessential work, where he delves into the shadowy facets of middle-class existence, moral quandaries, and the inner turmoil concealed within personal lives. Through this narrative, Basu offers a profound exploration of the ongoing societal turmoil and its intricate relationship with human suffering. In Bivor, the protagonist's way of life, psychological state, struggles, and rebellious mindset introduce readers to an altered vision of social reality. Basu's audacious literary perspective, exemplified by his critique of societal conventions and morals, finds clear expression in this novel. While the readers are forced to confront the stark realities of human existence, they are also invited to reassess and view the darker corners of society through a fresh lens. Basu's literary works are an embodiment of humanism amidst the tensions of political, social, and moral conflicts, shedding light on the complexities of life in turbulent times.*

**Keywords:** Samaresh Basu, Bengali Novel, Bivor, Psychological Conflict, Ethical Rebellion, Social Critique, Moral Dilemma.

সমরেশ বসুকে কেউ কেউ বাংলা সাহিত্যের রাজপুত্র বলে অভিহিত করেছিলেন। এই মন্তব্য হয়তো ছিদ্রাশ্বেষীদের কাছে অতিশয়োক্তি বলে মনে হতে পারে, এবং তাঁরা একে হেলায় উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তবে একথা অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই যে, তিনি বাংলা সাহিত্যের আকাশে এক বিশাল বনস্পতির মতোই নিজের প্রতিভার দীপ্তি ছড়িয়েছিলেন। তিনি ছিলেন এমন এক সৃষ্টিশীল শিল্পী, যিনি প্রবল প্রতিকূলতার মাঝেও জীবনযুদ্ধে লড়াই করে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার চূড়ায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্য শুধু বিষয়-বৈচিত্র্যে নয়, রূপ ও প্রকৃতির দিক থেকেও ছিল এক প্রবহমান নদীর মতো—প্রতিনিয়ত বাঁক নেওয়া, নতুন নতুন মোড়ে গিয়ে পৌঁছানো। একইভাবে, তাঁর জীবনও ছিল সমানভাবে বহুমুখী ও গতিশীল। জীবনের প্রতিটি রঙ এবং প্রতিটি অনুভূতি তিনি সাহিত্যে নিপুণভাবে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন।

সমরেশের জীবনদর্শন ছিল সরল অথচ গভীর। তীব্র কোনও নৈতিকতার বোঝা বা আদর্শের কঠোরতায় তিনি নিজের জীবনকে জড়িয়ে ফেলেননি। বরং তিনি ছিলেন স্বভাবগতভাবে স্বতন্ত্র, একজন নির্লিপ্ত জীবনসন্ধানী। তাঁর কাছে জীবন ও সাহিত্য যেন একাকার হয়ে গিয়েছিল। এই কারণেই তাঁর সৃষ্টিতে কোনও ভান বা ফাঁকি ছিল না। একবার তিনি নিজেই বলেছিলেন,

“সাহিত্যের যা কিছু দায়, তা জীবনের কাছেই। সাহিত্যের থেকে জীবন বড়—এই সত্য উপলব্ধির জন্য সাহিত্যিককে বিশেষ কোনো গভীর সাধনার প্রয়োজন হয় না; জীবন নিজেই এই সত্যকে সতত অতি জীবন্ত করে তোলে।”<sup>(১)</sup>

এই বক্তব্যে তাঁর সাহিত্যদর্শনের মর্মার্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সমরেশের সাহিত্যে মানুষ সবসময়েই ছিল কেন্দ্রস্থলে। তাঁর রচনার প্রাণ ছিল সেই রক্তমাংসের মানুষ, যারা পুরোপুরি মুক্তিকাসংলগ্ন। তিনি কখনও কাউকে বাদ দেননি, তাঁদের জীবনের টানাপোড়েনে, দ্বন্দ্ব-সংঘাতে নিয়ে এসেছিলেন। মানুষকে গভীরভাবে বুঝতে এবং তাদের তল খুঁজতে, তিনি শরীরী সম্পর্কের বাস্তবতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তবে এর ফলে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কাও ছিল প্রবল। সমরেশ জানতেন, জীবনকে পুরোপুরি ধারণ করতে হলে কেবল একজন শিল্পী হওয়া যথেষ্ট নয়, একজন শিকারিও হতে হয়। তিনি ছিলেন সেই জীবনশিকারি—যিনি জীবনের গভীরতম রঞ্জে প্রবেশ করে তার রূপ-রস-গন্ধকে গ্রাস করতে জানতেন। সমরেশ বসুর সাহিত্যিক জীবন শুরু হয়েছিল ‘নয়নপুরের মাটি’ দিয়ে, যা তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্ব বা ‘উদয়ন পর্ব’ হিসেবে পরিচিত। যদিও তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস ছিল ‘উত্তরঙ্গ’, যা রচনাকালের দিক থেকে দ্বিতীয়। শুরুর দিন থেকে শেষ অবধি তিনি কখনও এক জায়গায় থেমে থাকেননি। বারবার দিক পরিবর্তন করেছেন, উপন্যাসে যুক্ত করেছেন নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও আঙ্গিক। তাঁর সৃষ্টিশীলতার এই গতিশীলতাই তাঁকে বাংলা সাহিত্যে অনন্য করে তুলেছে।

সমরেশ বসু, একাধারে জীবনশিল্পী এবং জীবনশিকারি, সাহিত্যকে জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে তুলেছিলেন। তাই তাঁর সাহিত্য শুধু পড়ার জন্য নয়, বোধগম্য করার জন্যও। সাহিত্যের এই তীব্রতা ও অন্তর্গত সত্যকেই তিনি তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার রাজনগরে ১৯২৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক সমরেশ বসু। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল সুরথনাথ বসু। তবে পরবর্তীকালে তাঁর বন্ধু এবং শ্যালক দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় তাঁকে একটি নতুন নাম প্রদান করেন— সমরেশ বসু। সেই নামেই তিনি সাহিত্যজগতে নিজের পথচলা শুরু করেন এবং সমগ্র জীবনব্যাপী এই নামেই পরিচিত হন। সমরেশ বসুর সাহিত্যিক জীবন শুরু হয় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে, যখন ‘পরিচয়’ পত্রিকার পূজা সংখ্যায় তাঁর প্রথম গল্প ‘আদাব’ প্রকাশিত হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, এবং পরিমল গোস্বামীর মতো তৎকালীন বিশিষ্ট লেখকদের পাশাপাশি তাঁর এই গল্প স্থান পায়। গল্পটি ভারতবর্ষের প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ছড়িয়ে পড়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে রচিত একটি অনন্য খণ্ডচিত্র।

সমরেশ বসু তখন ছিলেন নবীন লেখক, কিন্তু তাঁর লেখনীতে সামাজিক সংকীর্ণতা বা প্রচলিত রীতির কোনো ছাপ ছিল না। বরং, তাঁর সৃষ্টিকর্মে ফুটে উঠেছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতি গভীর আস্থা এবং মানবতার প্রতি অগাধ প্রেম। ‘আদাব’ গল্পটির মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন যে, সাহিত্য শুধুমাত্র বিনোদনের

মাধ্যম নয়; এটি মানুষের চেতনার গভীরে আলোড়ন সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে। পরবর্তীকালে, দীর্ঘ চার দশকেরও অধিক সময় ধরে সমরেশ বসু গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজের লেখনীকে আধুনিকতার স্পর্শ দিয়েছেন, কিন্তু কখনোই তাঁর অন্তর্নিহিত প্রতিবাদী মানসিকতা বা সাহসী বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটাননি। তাঁর লেখার ভাষা যেমন সহজবোধ্য, তেমনই তীক্ষ্ণ। তিনি সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন এবং মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

ষাটের দশকে সমরেশ বসু তাঁর রাজনৈতিক আদর্শিক যাত্রায় এক গভীর মোড় নেন। দীর্ঘদিন ধরে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, এই সময় তিনি ক্রমশ পার্টি থেকে দূরে সরে আসেন। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে নৈতিক আদর্শের বিষয়ে মতানৈক্য তাঁকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে। তাঁর মধ্যে জন্ম নেয় সংশয় এবং দ্বন্দ্ব, যা তাঁকে এক ধরনের অভ্যন্তরীণ বিপন্নতার মুখোমুখি করে। রাজনৈতিক বিশ্বাস ও দায়বদ্ধতার দ্বন্দ্ব, পাশাপাশি ব্যক্তিজীবনের জটিলতা, তাঁর জীবনে এক চরম বিপর্যয়ের সূচনা করে। সমাজ, সংসার, রাজনীতি, এমনকি দাম্পত্য জীবনেও চরম তিক্ততা এবং বিরূপ পরিস্থিতি তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আজীবন মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাঁর আস্থা এবং বিশ্বাসের সংকট দেখা দেয়। ব্যক্তিজীবনের সীমাবদ্ধতা ও টানা পোড়েনের মধ্যেও সমরেশ বসু আশ্রয় খুঁজে পান তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মে। নিজের অভিজ্ঞতা এবং যন্ত্রণার প্রতিফলন ঘটে তাঁর লেখনীতে, যা হয়ে ওঠে সমসাময়িক সামাজিক বাস্তবতার এক বিশ্লেষণ।

এই সময়ে লেখা তাঁর দুটি বিখ্যাত উপন্যাস—'বিবর' ও 'প্রজাপতি'—তাঁর ব্যক্তি-জীবনের গভীর অভিজ্ঞতার ফসল। এই উপন্যাসগুলি তাঁর ব্যক্তিগত সংকট ও মানসিক দ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছবি, যা সাহিত্যিক মহলে তীব্র আলোচনার জন্ম দেয়। সমালোচকদের একাংশ 'বিবর'-এর শৈলী ও বিষয়বস্তু নিয়ে তীব্র আপত্তি জানান। কেউ কেউ একে 'কাঁচা, কদর্য এবং অশ্লীলতার প্রবাহ'<sup>(২)</sup> বলে চিহ্নিত করেন, আবার কেউ একে 'অসুস্থ ও বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন'<sup>(৩)</sup> হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তবে এই সমালোচনার মধ্যেও সমরেশ বসু তাঁর সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। 'বিবর' এবং 'প্রজাপতি' উভয়ই বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। এই উপন্যাসগুলিতে তিনি একদিকে মানবজীবনের গভীর সত্যকে প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ এবং ভণ্ডামিকে নির্মমভাবে উদঘাটন করেছেন। তাঁর লেখনীতে উঠে এসেছে সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবন, যন্ত্রণা এবং তাঁদের অস্তিত্বের সংগ্রাম।

সমরেশ বসু এই সময় প্রমাণ করেন যে, একজন সৃষ্টিশীল লেখক ব্যক্তিজীবনের সীমাবদ্ধতা এবং সংকট অতিক্রম করে সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে চিরন্তন মানবিক সত্যকে স্পর্শ করতে পারেন। তাঁর সাহিত্য তাই কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং সমাজ ও মানুষের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব ও সত্যের প্রকাশ। সমরেশ বসু কেবল একজন সাহিত্যিক ছিলেন না; তিনি ছিলেন একজন মননশীল চিন্তক, যাঁর সাহিত্য সমাজের গভীর বাস্তবতাকে ছুঁতে জানত। তাঁর লেখনী আজও পাঠকের হৃদয়ে মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা বয়ে আনে।

সমরেশ বসুর সাহিত্য জীবনের এক নতুন দিগন্তের সূচনা ঘটে উপন্যাস 'বিবর'-এর মাধ্যমে। বাংলা কথাসাহিত্যে এই উপন্যাসটি এক অনন্য ও ব্যতিক্রমী সৃষ্টি, যা সমকালীন সমাজের জীবনচিত্রকে গভীরভাবে প্রতিফলিত করেছে। ১৩৭২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এই উপন্যাসে সমরেশ বসু বাঙালি মধ্যবিত্ত

সমাজের প্রচলিত রীতিনীতিকে একধরনের চ্যালেঞ্জ জানান। এটি ছিল তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা, যেখানে সাহিত্যের প্রচলিত কাঠামো এবং নৈতিকতার ধারণাগুলি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠে।

সমরেশ বসু নিজেই এই সময়ের পটভূমি এবং নিজের মানসিক অবস্থার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

‘নিজের এবং অনেকের লেখা পড়েই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম এবং আমার ধারণা বাঙালি পাঠক সমাজেও তার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।’<sup>(৪)</sup>

এই মন্তব্য তাঁর মানসিক বিদ্রোহ এবং সাহিত্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দেয়। ১৯৬৫ সালের প্রেক্ষাপটে, যখন সাগরময় ঘোষ তাঁকে পূজো সংখ্যার জন্য একটি উপন্যাস রচনার অনুরোধ করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন,

‘সব প্রচলিত প্রথা ভেঙে দিতেই এবার আমি লিখতে চাই।’<sup>(৫)</sup>

কিন্তু তাঁর চিন্তার জগৎ ছিল আরও গভীর এবং বহুমাত্রিক। তিনি পরে বলেছিলেন,

“অবশ্যই, কেবল প্রচলিত প্রথাকে ভাঙার কথাই তো চিন্তা করিনি, চিন্তার জগতেও একটা ওলট-পালট চলছিল।”<sup>(৬)</sup>

‘বিবর’ সেই ওলট-পালট চিন্তাধারার ফলশ্রুতি। এটি কেবল একটি উপন্যাস নয়, বরং সমরেশ বসুর মানসিক বিবর্তনের এক উজ্জ্বল দলিল। এই উপন্যাসে তিনি সাহিত্যের প্রচলিত রীতিকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছেন এবং এক নতুন ধরনের বয়ান প্রতিষ্ঠা করেছেন। সমাজের প্রথাগত মানসিকতা এবং ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেছেন এবং সেই বিদ্রোহের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর লেখার প্রতিটি শব্দে। ‘বিবর’ কেবলমাত্র গল্প বলার মাধ্যম নয়; এটি বাংলা সাহিত্যের গভীরে চিন্তার নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং তার অন্তর্দ্বন্দ্ব, আশেপাশের জগৎ, আর সেই জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক—সবকিছুই অসাধারণ দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন সমরেশ। এই উপন্যাসে উঠে এসেছে তৎকালীন সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা, ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা, এবং আত্মজিজ্ঞাসার তীব্র ধ্বনি। সমরেশ বসুর সাহসী সাহিত্যিকর্ম ‘বিবর’ তাই কেবলমাত্র একটি সাহিত্যিক অভিজ্ঞান নয়, এটি একধরনের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক বিপ্লব। বাংলা কথাসাহিত্যে এটি এক স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছে, যা আজও পাঠকদের মুগ্ধ করে এবং নতুন ভাবনার সঞ্চারণ করে।

দ্রুত অবক্ষয়গ্রস্ত সমাজে ব্যক্তি মানুষের বিপর্যস্ত পাপপুণ্যবোধ, তার অসহায় ক্ষোভ, এবং দুর্দমনীয় ক্রোধের চিত্রায়ণ—এমনই নির্মম ও তীক্ষ্ণ আলেখ্য হল সমরেশ বসুর উপন্যাস ‘বিবর’। এটি সেই মধ্যবিন্ত জীবনের গভীর, পিচ্ছিল, জটিল, এবং অন্ধকারময় দিকগুলি তুলে ধরে, যেখানে জীবিত সন্ন্যাসের মতো প্রবৃত্তি, অসহায়তা, এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রতিটি চরিত্রের জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বাংলা সাহিত্যে ‘বিবর’ মধ্যবিন্ত পাঠকদের জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা। এটি এমন একটি উপন্যাস, যা প্রচলিত রীতিনীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মানুষের অন্তর্গত সংকট এবং সামাজিক অবক্ষয়ের গভীরে প্রবেশ করেছে। একদিকে এই রচনা বহুল প্রশংসিত, অন্যদিকে এটি সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। প্রয়াত সাহিত্যিক সন্তোষ কুমার ঘোষ ‘বিবর’-কে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দশটি উপন্যাসের অন্যতম বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, এটি সাহিত্যের উচ্চ শিখরে অবস্থান করে। পক্ষান্তরে, অনেক পাঠক ও সমালোচক এই উপন্যাসকে অশীল বলে নিন্দা করেছেন।

তবে, সমালোচনা এবং প্রশংসার এমন তীব্র পরস্পরবিরোধিতা শুধুমাত্র সেইসব সাহিত্যকর্মের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যেগুলি প্রকৃত অর্থে নতুন, তীব্র, এবং অপ্রতিরোধ্য। 'বিবর' এমন একটি রচনা, যা মানুষের অস্তিত্বের গভীর সংকটকে সামনে নিয়ে আসে এবং প্রচলিত মূল্যবোধের আরাণ্যের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসতে উন্মুখ এক প্রতিবাদী সত্তার কাহিনি তুলে ধরে। সমরেশ বসু এই উপন্যাসে শুধু সমাজের উপরিতল নয়, বরং তার গভীরে লুকিয়ে থাকা জটিল, কালো অধ্যায়গুলিকে উন্মোচন করেছেন। 'বিবর'-এ তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে মানুষ নিজের অন্তর্জগতের অন্ধকার, নৈতিক দ্বিধা, এবং সমাজের মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা নির্মম সত্যগুলির মুখোমুখি হয়। এটি কেবল একটি গল্প নয়, বরং মানবজীবনের অস্তিত্বের অন্তঃসারশূন্যতা এবং তার গভীর সংকটের বহিঃপ্রকাশ।

'বিবর'-এর মতো একটি সাহসী এবং ভিন্নধর্মী রচনা, যা প্রচলিত সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে অস্থিরতা সৃষ্টি করে, সেটি যে একই সঙ্গে বহুল নিন্দিত এবং বহুল প্রশংসিত হবে, তা অনিবার্য। এটি বাংলা কথাসাহিত্যের এমন এক মাইলফলক, যা পাঠকদের কেবল মুগ্ধ করেনি, বরং তাদের চিন্তায় এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

'বিবর' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র, যাকে আমরা নায়ক হিসেবে দেখছি, তার পরিচয় কোনো নির্দিষ্ট নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই নামহীন চরিত্রটি একদিকে তার নিজস্ব পরিসরে বিচ্ছিন্ন এবং একাকী, অন্যদিকে তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজের সঙ্গে এক গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে। তিনি একজন মদ্যপ, লম্পট এবং স্বেচ্ছাচারী, যাঁর জীবনে নৈতিকতার কোনো স্থান নেই। তাঁর চরিত্রের ভেতর কোনো ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতা বা প্রথাগত শৃঙ্খলা নেই, বরং তিনি এক ধরনের অশ্লীল ভোগবিলাসের মধ্যে মগ্ন থাকেন। যদিও তাঁর সংসারে অর্থাভাব নেই, তবুও তিনি অফিসে ঘুষ গ্রহণ করেন, যার মাধ্যমে তিনি সামাজিক অঙ্গীকারের প্রতি একধরনের অঙ্গীকারহীনতা প্রদর্শন করেন। তাঁর জীবন এক অন্ধকার পথে এগিয়ে চলে, যেখানে নৈতিকতার কোনো স্থান নেই।

তবে, যখন তাঁর মধ্যে নৈরাশ্যবোধ এবং একাকীত্ব প্রবল হয়ে ওঠে, তখন তিনি এক নতুন পরিচয়ে আবির্ভূত হন—এক প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে। এটি তাঁর জীবনের এক অদ্ভুত উলট-পালট। সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় এই চরিত্রকে নিয়ে একটি গভীর পর্যবেক্ষণ করেছেন, যা উপন্যাসের মূল ধারণার প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি দেয়। তিনি বলেছেন,

“আসলে 'বিবর' আমাদের ঔপনিবেশিক বিকৃত ভিক্টোরীয় মূল্যবোধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, আর এই প্রতিবাদ সামগ্রিক। এই কারণে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়েও সমগ্র।”<sup>(১)</sup>

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, এই নামহীন চরিত্রটি শুধু নিজেকে নয়, বরং একটি বৃহত্তর সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। তাঁর প্রতিবাদ শুধু তার ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সমাজের বৃহত্তর কাঠামো ও আদর্শের বিরুদ্ধে এক গুরুতর প্রশ্নবোধক চিহ্ন। উপন্যাসে, এই চরিত্রটির প্রতিবাদ রাষ্ট্রের শাসন, সমাজের কাঠামো এবং ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের প্রতি একধরনের বিদ্রোহের রূপ নেয়।

এই বিদ্রোহ কোনও নির্দিষ্ট দেশ বা সময়সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সর্বজনীন এবং চিরকালীন একটি অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, যা সমাজের শাসন, আদর্শ এবং মানুষের স্বাধীনতার সংকটে আছন্ন হয়ে ওঠে।

সমরেশ বসু এর মাধ্যমে সমাজের বাইরের এবং ভেতরের অন্ধকারগুলোকে উন্মোচন করেছেন, যেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং তার প্রতিবাদী সত্তা এক বৃহত্তর ঐতিহাসিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে যুক্ত হয়ে ওঠে। 'বিবর' সেই প্রতিবাদের এক অভূতপূর্ব সাক্ষ্য, যেখানে ব্যক্তির সংকট এবং সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে।

'বিবর' উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের প্রেমিকা, নীতা, একজন সুন্দরী এবং শিক্ষিত নারী, তবে তার চরিত্রে রয়েছে এক ধরণের দৈবততা। নীতা একদিকে প্রেমিক নায়কের প্রতি আকৃষ্ট হলেও, অন্যদিকে তাঁর জীবনে একাধিক পুরুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক রয়েছে। নায়ক, যদিও এই অপরিচিত সত্য জানে, তবুও সে এক অদ্ভুত আকর্ষণে নীতার প্রতি নিজেকে বন্ধী করে ফেলেছে। নীতার আস্থানে, নীতার ইচ্ছায় সে তার জীবনে প্রবেশ করেছে এবং নীতার প্রতি তার পরাধীনতা মেনে নিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে, নায়ক নিজে চরিত্রহীন হলেও, নীতার চরিত্রহীনতা তাকে সহ্য করতে পারেনি। যদিও সে নিজে সমাজের সীমানায় উর্ধ্ব থাকতে পারেনি, তবুও নীতার দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ এক আশ্চর্য ঘূর্ণন সৃষ্টি করে। নীতার সঙ্গে কথোপকথন করতে করতে, নায়কের মধ্যে এক ধরনের তীব্র প্রতিক্রিয়া জেগে ওঠে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, তার প্রেমিকা, যাকে সে নিজের জীবনসঙ্গী হিসেবে দেখেছিল, সেই নীতা যদি চরিত্রহীন হয়, তবে তাকে নিজেই অবসান ঘটতে হবে।

নায়ক শেষ পর্যন্ত নীতাকে হত্যা করে। এটি তার নিজের একাকীত্ব এবং সমাজের প্রতি অসন্তুষ্টির প্রকাশ, যেখানে সে যৌন পরাধীনতার বিরুদ্ধে এক কঠোর প্রতিবাদ জানায়। নীতাকে হত্যা করে, সে নিজেকে এবং তার সমাজকে এক ধরণের মুক্তি প্রদান করেছে, এক স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তবে, নীতা মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে নায়ককে বলেছিল যে, সে তাকে ভালোবাসে। এই শেষ মুহূর্তে, নায়ক তার প্রেমিকার প্রতি কোনো সহানুভূতি দেখায়নি। সে তার নিজস্ব আদর্শ এবং সত্তার তাগিদে নীতাকে হত্যা করেছে, যা তার চরিত্রের এক চরম পরীক্ষা হিসেবে উঠে আসে।

সমরেশ বসু এই উপন্যাসের মাধ্যমে নীতা এবং নায়কের চরিত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং সমাজের চারিত্রিক অবক্ষয়ের একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছেন। বিশেষত, উপন্যাসের পটভূমি কলকাতা শহরের আধুনিক যুব সমাজের মধ্যে, যাদের মধ্যে একদিকে রয়েছে নৈতিকতার প্রতি অবহেলা এবং অন্যদিকে রয়েছে সম্পর্কের অস্থিরতা। নীতা এবং নায়ক দু'জনের চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক সমাজের সেই বিকৃত দিকগুলোকে উপস্থাপন করেছেন, যেখানে প্রেম, ভালোবাসা এবং যৌনতা শুধু শারীরিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা মানুষের মানসিক এবং নৈতিক অন্ধকার দিকগুলোও উন্মোচন করে।

'বিবর' উপন্যাসের মাধ্যমে সমরেশ বসু সমাজের এক গভীর সংকটকে তুলে ধরেছেন, যেখানে আধুনিকতার নামে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, সম্পর্ক এবং চারিত্রিক মূল্যবোধগুলো ক্রমশ অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই উপন্যাসে প্রেম ও সম্পর্কের মানসিকতা, ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব এবং নৈতিকতার সংকট এক উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

সমরেশ বসু 'বিবর' উপন্যাসে একটি চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন যা স্বাধীনতা এবং পরাধীনতার দ্বন্দ্বকে গভীরভাবে তুলে ধরে। তিনি লেখেন,



“এক তুখোড় চতুর একগুঁয়ে জেদি আর অব্যর্থ শিকারী, একটা বাঘকে ফাঁদে ফেলে মারবার জন্য, যেন এজ্ঞা নধর পুষ্ট ছাগলকে, রাতের অন্ধকারে বনে, গাছের তলায় বেঁধে রেখে দিয়েছিল। আর বাঘটা তার শিকারের ডাক শুনে, গন্ধে গন্ধে, পা টিপে টিপে এল, বন টুঁড়ে টুঁড়ে দেখল। দেখে, খেলতে আরম্ভ করলো।”<sup>(৮)</sup>

এই চিত্রকল্প প্রথমে একধরনের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন সত্তার অনুভূতি সৃষ্টি করে, যেখানে বাঘটি শিকার ধরার স্বাধীনতা অনুভব করে, কিন্তু আসলে, তাকে তার শিকারী শিকার করবে, যিনি তাকে সুচতুরভাবে লক্ষ্য করে এবং ফাঁদে ফেলবে। এর মাধ্যমে লেখক স্বাধীনতার প্রতি এক রক্ষ বাস্তবতা তুলে ধরেছেন, যেখানে স্বাধীনতা হতে পারে শুধু একধরনের ধোঁকা, কারণ প্রকৃতপক্ষে, সে পরাধীন।

এই চিত্রকল্পের মাধ্যমে সমরেশ বসু স্বাধীনতা এবং পরাধীনতার মাঝে সূক্ষ্ম পার্থক্য তুলে ধরতে চেয়েছেন। বাঘের মতো, যাকে মনে হয় তার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু সে জানে না যে এক গভীরভাবে নস্রা করা ফাঁদে সে আসলেই পরাধীন। এরই মাধ্যমে, লেখক পাঠককে বুঝাতে চান যে, অনেক সময় আমরা যা ভাবি বা যা আমরা মনে করি, তা আমাদের আসল বাস্তবতার থেকে বহু দূরে থাকতে পারে, কারণ সমাজ, পরিবেশ এবং ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলোর উপর আমাদের সিদ্ধান্ত এবং কর্মকাণ্ডগুলোই প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে।

নীতাকে খুন করার প্রসঙ্গে সমালোচক অশ্রুকুমার শিকদার একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন,

“খুন যেন সে নিজে করেনি, - ‘কনুইটা যত নষ্টের গোড়া’ - যেন ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধও লুপ্ত। সমস্ত পরিবেশের বিরুদ্ধে তার নৈরাজ্যময় আক্রোশ, তারই ফল নীতার নিষ্কারণ হত্যা।”<sup>(৯)</sup>

এর মাধ্যমে শিকদার দেখাতে চেয়েছেন যে, নায়ক নীতাকে খুন করার সিদ্ধান্ত একান্তভাবে তার ব্যক্তিগত নয়, বরং এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক এবং পরিবেশগত পরিস্থিতির ফলস্বরূপ। তার চারিত্রিক অবক্ষয়, নৈরাজ্য এবং মূল্যবোধের সংকটই তাকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বাধ্য করেছে।

নায়কের মধ্যে নীতাকে খুন করার কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। তাঁর প্রতি গভীর আকর্ষণ এবং নীতার প্রতি এক অদৃশ্য টান তাকে বারবার তার নিজের চরিত্র এবং মূল্যবোধের সঙ্গে সংঘর্ষে ফেলে। নায়ক নিজেই স্বীকার করে বলেছেন,

“আমার পক্ষেও এরকম হওয়া বিচিত্র ছিল না। রাত্রি দশটার পর যে কি স্থির করে বসতাম, তা আমি সন্ধ্যায় কিছই জানতাম না।”<sup>(১০)</sup>

এই আত্মসমালোচনার মধ্যে রয়েছে নায়কের নিজের প্রতি এক ধরনের অক্ষমতা এবং স্বীকৃতি যে, তার অস্থিরতা এবং নৈতিক দ্বিধা তাকে কখনোই স্থির হতে দেয়নি। তাঁর চরিত্রের এই দ্বন্দ্ব, আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং বিপরীত অনুভূতি তার কাজের প্রভাব ফেলেছে, যা তাকে একেবারে নৈতিকভাবে বিভ্রান্ত করেছে।

এছাড়াও, নায়ক আরও একবার আত্মসমালোচনা করতে গিয়ে বলেছে, সকলেই গর্তের মধ্যে আছে। তার বাবাও তার নিজ গর্তের মধ্যে ভালই আছে, যেখানে পাপ পূণ্যের কোন প্রশ্নই নেই। এখানে নায়ক নিজের সংকট এবং পরিবেশের প্রতি এক গভীর অনুধাবন প্রকাশ করেছে, যেখানে সে দেখে, মানুষ আসলে

নিজের সংকটের মধ্যে আটকে থাকে, এবং তার পরিবারের সদস্যরাও তার মতোই সেই সংকটে বন্দী। এখানে পাপ এবং পুণ্য নিয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ যে সমাজে তিনি বাস করছেন, সেখানে সত্য এবং নৈতিকতার ধারণাগুলো ধোঁয়াশা হয়ে গেছে।

এই প্রেক্ষাপটে, 'বিবর' উপন্যাসের নায়ক চরিত্রটি আত্মসমালোচনার এক প্রকৃত রূপ ধারণ করে, যা তাকে তার চারিত্রিক এবং সামাজিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করায়। সমাজের কাঠামো, মানসিক দ্বন্দ্ব এবং ব্যক্তিগত অভ্যন্তরীণ সংকটগুলোর মধ্য দিয়ে নায়ক এক পৃষ্ঠায় তার নৈতিক পতন ও পরিবর্তনকে চিত্রিত করে, অন্যদিকে এটি পাঠককে তার নিজস্ব পরিচয়ের প্রতি প্রশ্ন উঠাতে উদ্বুদ্ধ করে।

উপন্যাসের নায়ক গভীর অন্তরদৃষ্টি দিয়ে সমাজের পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থার প্রতি সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করেছেন। তিনি সমাজে চলমান যৌন অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, যেখানে সমাজের তথাকথিত অভিজ্ঞান এবং নৈতিকতার স্তম্ভগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে। নায়কের পর্যবেক্ষণে, সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং পরিচিত ব্যক্তির প্রায়শই নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে নৈতিক স্বলন ঘটাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, আইনজীবী হারান নিয়োগী, যিনি সমাজে খ্যাত এবং প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও তার বহু উপপত্নী রয়েছে। তেমনি, নায়কের আর্টিস্ট বন্ধু হীরেনও অবৈধ সম্পর্কের দিকে ঝুঁকিয়ে, যা তার ব্যক্তিগত জীবনের একটি অন্ধকার দিক তুলে ধরে।

অফিসের বস মি. চ্যাটার্জী, যিনি প্রথম পক্ষের পুত্রের সঙ্গে তার স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের বিষয়ে সন্দেহান, প্রায়শই তার স্ত্রীর সঙ্গে সময় কাটাতে শুরু করেন। এমনকি, নায়কের এক বন্ধু, যিনি একটি নামী কোম্পানিতে উচ্চ পদে কর্মরত, তারও ঘরে সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও, অফিসের মহিলা স্টেনোগ্রাফারের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। নায়ক এই সকল সামাজিক এবং নৈতিক অস্থিরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই অন্তঃসারশূন্যতা, ভণ্ডামি, এবং শিক্ষিত সমাজের ভ্রষ্টতা নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন। তার মতে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে মিথ্যাচার, প্রতারণা এবং কপটতা ছড়িয়ে পড়েছে, যা সমাজের নৈতিক অধঃপতনের একটি উদাহরণ।

নীতার পরিচারিকা চিত্রা, যে হোটেলে গণিকাবৃত্তির জন্য বহুবার ধরা পড়েছে, তার জীবনও সমাজের আরেকটি অন্ধকার দিক তুলে ধরে। নীতার মতো চিত্রাও একাধিক পুরুষের সঙ্গে শয্যাসঙ্গী। এর পাশাপাশি, সম্ভ্রান্ত পরিবারের ভদ্রমহিলা রুবী দত্ত তার অফিসের বসের সাথে পরকীয়ায় লিপ্ত, যা সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়কে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে। নায়কের নিজের বোন, বিদিশা, নিজেও এই অধঃপতনের বাইরে নয়।

এই সমাজে, যেখানে প্রতারণা, অশ্লীলতা, এবং অস্বচ্ছতা সাধারণ হয়ে গেছে, সেখানে নায়ক এক ধরনের অস্থিরতা এবং হতাশা অনুভব করেন। তাঁর মতে, এমন একটি সমাজের মধ্যে বিবাহের মত পবিত্র সম্পর্কও অর্থহীন হয়ে পড়েছে, কারণ এটি এক দীর্ঘস্থায়ী প্রতারণার ফলস্বরূপ। এমনকি, নায়ক মনে করেন যে, সমাজের এই পরাবাস্তবতার চেয়ে পতিতাবৃত্তি অনেকটাই কম নিকৃষ্ট। সামাজিক এবং নৈতিক অবক্ষয়ের এই চিত্রই উপন্যাসে উঠে এসেছে, যা সমাজের ভিতরে চলমান ভয়াবহ মূর্তমান বাস্তবতার প্রতিফলন।

এভাবে, সমরেশ বসু 'বিবর' উপন্যাসে একটি গভীর বিশ্লেষণ করেছেন সমাজের চারিত্রিক ও নৈতিক অবক্ষয়, যেখানে মানবিক মূল্যবোধ, পারিবারিক সম্পর্ক এবং নৈতিক শুদ্ধতা একে একে ভেঙে পড়ছে।

সমাজের এই অন্ধকার দিকগুলো তার লেখায় স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে, যা পাঠকদের এক গভীর চিন্তা ও আত্মসমালোচনার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

উপন্যাসের নায়ক এক সময় জৈবিক চাহিদা এবং সংকটের শিকার হয়ে 'বিবর'-এ আবদ্ধ ছিল। তবে নীতাকে খুন করার পর, এই বিবর থেকে তার মুক্তি ঘটে। নায়কের এই মুক্তি শুধু শারীরিক দিক থেকেই নয়, বরং এটি তার আধ্যাত্মিক এবং মানসিক মুক্তির প্রতিফলনও। নায়কের স্বাধীনতা ও আত্মপরিচয়ের অনুভূতি তাকে প্রকৃত মানুষ করে তোলে। তবে, এই মনুষ্যত্ব অর্জন কোনো সহজ প্রক্রিয়া ছিল না; এটি ছিল সমাজের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ, যা তাকে নানান সংগ্রামের সম্মুখীন করেছিল। নায়কের চাকরি হারানোর পেছনে ছিল তার সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, কিন্তু তাতে তার সংকল্প বিন্দুমাত্র কমেনি।

তিনি তার বিবর থেকে মুক্তি পেয়েছেন, সেই সঙ্গে তার জীবনের একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা অর্জনের পর, নায়ক তার একান্ত নিজস্ব গর্ত থেকে বাইরে আসার প্রয়াসে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, যা একসময় তাকে অনাবশ্যকভাবে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিল, এখন তার জীবনের পুঁথিগত নীতির প্রতি এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম দেয়। এই স্বাধীনতা তাকে অন্যদের মধ্যে মানবিক সম্পর্কের শিথিলতা, ভণ্ডামি এবং মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে সচেতন করে তোলে।

উপন্যাসের কাহিনি মূলত মানুষের মধ্যে সম্পর্কের ভাঙন, পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, এবং ব্যক্তিগত স্তরে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার চিত্র তুলে ধরে। বিশেষভাবে, নায়কের প্রেমিকা নীতা সম্পর্কিত তার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত, যেখানে সে অকপটে স্বীকার করে,

“হ্যাঁ মশাই, নীতাকে আমিই খুন করেছি, কারণ আমি তার, কি বলে, আসক্তি আর মিথ্যের সঙ্গে ঠিক পেরে উঠছিলাম না।”<sup>(১১)</sup>

এই খুনের পেছনে মূলত নায়কের নিজস্ব মূল্যবোধ এবং সত্যের প্রতি তার অনড় বিশ্বাস কাজ করেছে। নায়ক জানে, তার এই হত্যা এক ধরনের আধ্যাত্মিক এবং মানসিক মুক্তি, যেখানে সে নিজেকে মিথ্যাচারের আবর্ত থেকে বের করে আনতে সক্ষম হয়।

এই প্রেক্ষিতে সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থভাবেই বলেছেন,

“মধ্যবিত্ত শ্রেণী এখানে শ্রেণী হিসাবে তার সব তাৎপর্য হারিয়েছে, - 'বিবর' সে কথাই ঘোষণা করে।”<sup>(১২)</sup>

অর্থাৎ, মধ্যবিত্ত সমাজ, যা একসময় নৈতিকতার রক্ষক হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকত, এখন তার ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা সামাজিক এবং পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে একটি শূন্যতাকে সৃষ্টি করেছে, যা ভণ্ডামি, প্রতারণা এবং মিথ্যাচারে পূর্ণ। সমরেশ বসু 'বিবর'-এর মাধ্যমে এই শ্রেণির অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় এবং তার প্রতিফলন সমাজে কীভাবে এক ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি করেছে, তা চিত্রিত করেছেন।

এভাবে, নায়ক একের পর এক সামাজিক ও ব্যক্তিগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার পরিচয় ও নৈতিকতার সন্ধান করেছে। সমাজের মূল্যবোধের সঙ্গে তার দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত, এবং তার ব্যক্তিগত জীবনে তার যাত্রা এক ধরনের বৃহত্তর সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের উপর আলোকপাত করে, যা 'বিবর'-কে একটি গভীর বিশ্লেষণমূলক সাহিত্যকর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

সমরেশ বসু তাঁর 'আর রেখো না আঁধারে' প্রবন্ধে সাহিত্যের অশ্লীলতা প্রসঙ্গে একটি গভীর মন্তব্য করেছিলেন, যা তাঁর সাহিত্যচিন্তার এক অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। তিনি বলেছিলেন,

“জীবন যদি অন্ধকারে থাকে, তাকে অন্ধকারেই রাখতে হবে কেন? আলোয় আনতে গেলে পেচক শৃগাল চিৎকার করবে, করুকই না, তবুও অন্ধকারে যেন না থাকতে হয়।”<sup>(১৩)</sup>

এই উক্তিটি তার একটি পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করে, যেখানে তিনি মনে করেন, যে কোনো পরিস্থিতিতে সত্য বা বাস্তবতার আলোয় মানুষকে আনা উচিত, এবং সে পথের কষ্ট বা প্রতিবন্ধকতা পরোয়া না করে, অবশেষে অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড়ানোই শ্রেয়। এই বক্তব্যের মাধ্যমে সমরেশ বসু এমন এক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটান, যা সাহিত্যের অন্ধকারমুখী প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা দেয়।

একইভাবে, সমরেশ বসু সাহিত্যে অশ্লীলতা এবং তার প্রতি তথাকথিত নীতিগত চিন্তাধারার আপত্তি সম্পর্কে তাঁর একটি বিশেষ মন্তব্যে আরও খোলাখুলি প্রকাশ করেন। তিনি 'আর রেখো না আঁধারে' প্রবন্ধে বলেছিলেন,

“আসলে সাহিত্যে অশ্লীলতা খুঁজে যারা বিচলিত, শুচি শুচি করে মরছে, তারা জীবনের ক্ষেত্রে পাপ সৃষ্টির প্রতি চোখ ফিরিয়ে রাখতে চাইছে, তাদেরাই সেই স্বাধীনতা অর্জন করছে যে তারা জীবনে যা খুশি করবে আর পাপবোধের কথা না ভাবতে চাইছে। এমনকি সত্যের চেহারাকেও তারা ভয় পায়।”<sup>(১৪)</sup>

এই বক্তব্যে সমরেশ বসু খুব স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, যারা সাহিত্যে অশ্লীলতা খুঁজে বেড়ান এবং সেগুলোর জন্য সমাজে নৈতিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেন, তারা আসলে বাস্তব জীবন এবং তার অন্ধকার দিকগুলি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে চান। তারা তাদের নিজস্ব জীবন ও চিন্তাধারার অন্তর্নিহিত অস্বস্তি বা পাপবোধ থেকে মুক্ত থাকতে চান। তবে, তাদের এই নিজস্ব স্বার্থপরতা এবং ভীতি একে অপরকে স্তব্ধ করে দেয়, এবং বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটানোকে তারা ভয় পায়।

এরপর, তিনি সাবধানবাণী হিসেবে বলেছিলেন,

“আশেপাশে যা ঘটছে, তা যেন তারা ধামাচাপা দিতে পারে, আর তারাই মূলত 'আত্মদর্শনের আতঙ্ক' এর শিকার।”<sup>(১৫)</sup>

সমরেশ বসুর মতে, সমাজে ঘটে চলা নৈতিক অবক্ষয় বা অশ্লীলতার প্রকৃত জগতের মুখোমুখি হওয়ার আতঙ্ক তাদের মধ্যে বিদ্যমান। তাদের মূল সমস্যা হলো, তারা যেটি ধামাচাপা দিতে চাইছে, সেটি আসলে আত্মপরিচয়ের মুখোমুখি হওয়া, বা নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টির প্রতি দায়বদ্ধ থাকা। তাদের এই আতঙ্ক থেকে মুক্তি, তারা তাদের ভয়ে অন্ধকারে থাকতে পছন্দ করেন, এবং সাহিত্যের এমন চিত্রগুলির সাথে সমঝোতা না করে এগুলিকে অশ্লীল হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

সমরেশ বসুর এই বাণীটি সাহিত্যের প্রগতিশীল ভূমিকা এবং মানবিক আত্মদর্শনের প্রয়াসকে তুলে ধরে। তিনি বিশ্বাস করেন যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র জীবন এবং সমাজের সত্য ও বাস্তব দিকগুলি সামনে আনা, যা অনেক সময় অস্বস্তিকর হতে পারে, তবে তা পরিহার করা নয়, বরং গ্রহণ করা উচিত।

ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে, 'বিবর' উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই তার ইড (ID) বা মানসিক স্তরের নিম্নতম আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা, প্রবৃত্তি এবং অসীম ক্ষুধা দ্বারা চালিত। প্রেম, কাম, রাজনীতি, জীবিকা, এবং সমাজ—এই সমস্ত জীবনসংগ্রামের নানা দিকের মধ্যে যে অস্থিরতা এবং বিভ্রান্তি রয়েছে, লেখক সেখানে যেন তাদের মূল উৎসকে খুঁজে বের করেছেন, এবং সেই কুয়াশাচ্ছন্ন আবেগ এবং মানসিক অবস্থা দিয়ে চরিত্রগুলিকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন। লেখক তাদের মধ্যে গাঢ় আত্মবিশ্বাস এবং অপরাধবোধের দ্বন্দ্ব তুলে ধরেছেন। 'বিবর' এর বন্য স্বাধীনতা, যা প্রথমে নায়ককে উন্মুক্ত এবং নিষ্ঠীক করে তোলে, পরবর্তীতে পরাধীনতা বা মানসিক সচেতনতা (CONSCIENCE) দ্বারা প্রতিরোধিত হয়ে একটি সংঘাতের দিকে নিয়ে যায়, এবং এটি চরিত্রটির শেষ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়।

সমরেশ বসু ষাটের দশকের কলকাতার শহুরে জীবনের একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা, হতাশা, এবং সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পতনের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেছেন। সেই সময়কার অবস্থা এবং মানবিক দুর্দশা তার লেখনীর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, এবং 'বিবর' সেই সব হতাশাগ্রস্ত, নিঃস্ব এবং ভগ্নপ্রায় মানুষদের কাহিনী হয়ে উঠেছে। দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে শোষিত, নিপীড়িত মানুষের দুঃখ এবং তাদের আত্মনির্ভরতার প্রয়াসও এখানে স্থান পেয়েছে।

লেখক এই উপন্যাসের মাধ্যমে মানব জীবনের চরম ক্ষয় এবং মানসিক অধঃপতনকে তুলে ধরেছেন, যেখানে একদিকে মানুষ ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়, অন্যদিকে সে পুনরুত্থানের জন্য সংগ্রাম করে। 'বিবর' একদিকে একটি হতাশার প্রতীক হলেও, অন্যদিকে এটি এক ধরনের পুনর্জন্মের কথাও বলে—যেখানে নায়ক ও অন্যান্য চরিত্রগুলি মানবিক দুর্দশা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে, যেন তারা জীবনের শক্তিকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করতে পারে। লেখক শুধু 'বিবর' এর চরিত্রদের সংকটের দিকেই মনোযোগ দেননি, বরং তিনি তার অন্যান্য রচনায়, যেমন 'দেখি নাই ফিরে', 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', এবং 'আনন্দ ধারা', সংকট থেকে মুক্তি এবং উত্তরণের পথও উপস্থাপন করেছেন। সেখানে জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা এবং অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতিফলন রয়েছে। এই প্রক্রিয়া শুধুমাত্র নৈতিক দিক থেকে নয়, বরং মানব মন এবং আত্মার গভীরতাকে আবিষ্কার করে, যা শেষ পর্যন্ত মানুষকে সত্যের পথে পরিচালিত করে।

ফ্রয়েডের থিওরি অনুসারে, মানব মন সর্বদা ইড এবং সুপার ইগো এর দ্বন্দ্ব আবদ্ধ থাকে, যেখানে আমাদের অন্তর্নিহিত কামনা এবং সংস্কৃতির বিধি-নিষেধের মধ্যে এক ভীষণ সংঘাত চলে। 'বিবর' এই দ্বন্দ্বের গভীর অনুসন্ধান, স্বাধীনতা এবং পরাধীনতার খেলাকে উপস্থাপন করে, এবং একজন নায়কের যাত্রাকে চিত্রিত করে যে অবশেষে তার অন্তর্নিহিত সত্যের দিকে এগিয়ে যায়।

**তথ্যসূত্র:**

- ১। <https://www.anandapub.in/book-details/2141>
- ২। বিশ্বাস, দিলীপ কুমার, বিবর উপন্যাসে অশ্লীলতা বিষয়ে দেশ পত্রিকায় লেখা একটি চিঠি, দেশ, অক্টোবর ১৩, ১৯৬৫, 'সমরেশ বসু রচনাবলী', সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১, পৃষ্ঠা ৫৫১।
- ৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৫৫১।
- ৪। দাসমুন্সী, শুভেন্দু, 'বিবর আত্মদর্শন?', এইসময় অনলাইন, প্রকাশ ২৩ অগাস্ট, ২০১৫, সময় বিকেল ৩.০৩, লিঙ্ক <https://eisamay.com/cover-story/article-on-indecency-of-bibor-novel-by-late-samaresh-basu/48640498.cms>
- ৫। ঐ।
- ৬। ঐ।
- ৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম, 'সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন', র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৬৭।
- ৮। বসু, সমরেশ, 'বিবর', আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২০, পৃষ্ঠা ১।
- ৯। শিকদার, অশ্রু কুমার, 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস', অরুণা প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৩০৫।
- ১০। বসু, সমরেশ, 'বিবর', আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২০, পৃষ্ঠা ১০৫।
- ১১। ঘোষ, প্রসূন, 'উপন্যাসের নানা স্বর', এবং মুশায়েরা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ১৯৭-১৯৮।
- ১২। বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম, 'সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন', র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৭১।
- ১৩। দাসমুন্সী, শুভেন্দু, 'বিবর আত্মদর্শন?', এইসময় অনলাইন, প্রকাশ ২৩ অগাস্ট, ২০১৫, সময় বিকেল ৩.০৩, লিঙ্ক <https://eisamay.com/cover-story/article-on-indecency-of-bibor-novel-by-late-samaresh-basu/48640498.cms>
- ১৪। ঐ।
- ১৫। ঐ।



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 737-744

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.063



## রহু চণ্ডালের (হার-না-মানা) হাড় : মানব-জমিনের সন্ধানে

শ্রীচরণ দাস বিশ্বাস, অতিথি অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, বারাসাত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 20.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*Abhijit Sen's novel Rahu Chandaler Har vividly portrays the captivating saga of a nomadic group spanning 150 years. The intricate narrative explores how the ancient story of the Bajikars intertwines with their beliefs, shaping their movement and existence. In this remarkable tale, there is no singular hero; rather, the entire Bajikar tribe embodies heroism. Their lack of a fixed habitat and their perception of the entire world as their home set them apart, as they challenge traditional religious and societal norms.*

*This research paper examines the tensions within the Bajikar tribe's life amid such chaos. It unravels the compelling story of how the bone of Rahu Chandal became the driving force behind a nameless tribe's centuries-long wandering, with their myths and beliefs serving as their only refuge. Ultimately, the novel triumphantly depicts the unyielding human spirit and the will to survive.*

**Keywords:** Captivating Saga, Beliefs, Bajikar Tribe, Rahu Chandal, Societal Norms.

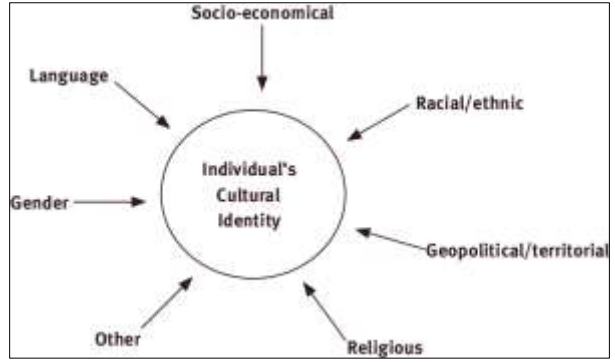
জন্মের প্রথম লগ্ন থেকেই মানুষের সমাজ-বৃত্ত তার জৈব-বৃত্তকে গ্রাস করে। নবাগত সন্তান পুত্র না কন্যা - সে-কথা জানবার জন্য পরিবারের সদস্যদের যে আগ্রহ, তার নেপথ্যেও রয়েছে সেই সামাজ্য-পরিবেশ। কারণ আজও সমাজ-পরিবেশের ওপরই নির্ভর করে - পুত্র বা কন্যার জন্মে মানুষ আনন্দিত হবে না হতাশ হবে। এরপর পরিবার, বিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্র পর্যন্ত একের পর এক সামাজিক পরিচয়ের আড়ালে প্রথম দিনের সেই খাঁটি মানব-সন্তানটি তার জৈবিক পরিচয় নিয়ে ধুকতে ধুকতে কবে যেন ফুরিয়ে যায়। কিছুক্ষণের জন্য যদি ধরে নেওয়া হয় - পরিবার (সামাজিক প্রতিষ্ঠানকেই বোঝানো হয়েছে), বিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্র - এ সব কিছুই নেই তাহলে শেষ পর্যন্ত মানুষের পরিচয় কী হবে? অর্থাৎ এখানে প্রশ্ন হল - মানুষ যদি সামাজিক জীব হয়, তাহলে সেই সমাজবদ্ধ মানুষের পরিচয় কি ব্যক্তি-নির্ভর না প্রতিষ্ঠান-নির্ভর?

আজ থেকে প্রায় চুয়াল্লিশ বছর আগে, ১৯৮০ সালে সাহিত্যিক অভিজিৎ সেন যখন বালুরঘাট মহকুমার তপন থানার কয়েকটি গ্রামের কিছু বাজিকরকে দেখে তাঁর 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসটি লিখতে আরম্ভ করেন, তখনও হয়তো উল্লিখিত প্রশ্নগুলি তাঁকেও ভাবতে বাধ্য করেছিল। তাঁর কথানুযায়ী -

“রহু চণ্ডালের হাড়’ শুধু এক শ্রেণীর যাযাবরের জীবন-সংগ্রামের কাহিনী নয়। এই যাযাবরগোষ্ঠী, আমার উপন্যাসে যে গোষ্ঠীর নাম বাজিকর, তাদের এক-দেড় শ বছরের ঘোরাফেরাকে কেন্দ্র করে আমি একটি বিস্তৃত অঞ্চলের ওই সময়কার ইতিহাস, সমাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়কে টুকরো টুকরো করে তুলে এনেছি।”<sup>১</sup>

ফলে এই উপন্যাস যে আর পাঁচটি গোষ্ঠী-জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসের মতোই হবে - এমন একটি প্রাথমিক ধারণা পাঠকবর্গের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে। স্বয়ং লেখকও সেই সংকেত দিয়েছেন। তবে বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে এই উপন্যাসটিকে একটু ভিন্নভাবেই বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। তাই এই প্রবন্ধে উপন্যাসে বর্ণিত ‘যাযাবর’ বা ‘বাজিকর’ গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার চেয়েও সেই গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের অন্তর্মানসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যে মানুষের ‘ঘর পুড়ে গেছে অকাল অনলে’; যে মানুষের ‘মন ভেসে গেছে প্রলয়ের জলে’ তবু এখনও যে ‘মুখ দেখে চমকায়’ তবু এখনও যে ‘মাটি পেলে প্রতিমা বানায়।’ এই প্রবন্ধে উপন্যাসের সেই মানুষেরই অনুসন্ধান করা হয়েছে।

মনে রাখতে হবে — এই গল্পের প্রধান চরিত্র কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়, সমগ্র গোষ্ঠী-জীবন। যে গোষ্ঠীর মানুষ গত দেড়শো বছর ধরে নামহীন, পরিচয়হীন, স্থায়ী-বাসস্থানহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে। প্রথম দিকে তাদের এই বাধ্যতামূলক ‘প্রবজ্যা’-র নেপথ্যে কোনো প্রগতিশীল উদ্দেশ্য



ছিল না, ছিল দৈবদুর্বিপাক। উপন্যাসের বয়ানেই উঠে আসে সেই ইতিহাস —

“হাজার বছর আগে যখন কোনো এক বিশাল নদীর ধারে স্থায়ী বসবাস করত, সেই সময়কার পৌরাণিক স্মৃতি তাঁদের ভারাক্রান্ত করত। যখন তাদের কোনো প্রাচীন পুরুষ পুরা এক নর্তকীর প্রতি আসক্ত হয় এবং তাকে বিয়ে করতে চায়। তারপর শুরু হয় সেই অন্তর্কলহ, যা তাদের স্থায়ী বসবাসকে ছিন্নভিন্ন করে। মানুষ তখন দুই দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। পুরার বিরুদ্ধবাদীরা দাবি তুলেছিল, এ বিয়ে হতে পারে না, কেন না পালি নামের সেই নর্তকী নাকি তার বোন। সুতরাং এ বিয়ে হবে অসামাজিক এবং অমঙ্গলময়। পুরার সমর্থকরা বলেছিল, এ বিয়ে হবেই, কেননা পালি যে পুরার বোন এর কোনো প্রমাণ নেই। তারপর পুরা ও পালির বিয়ে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেবতার অভিষাপ নেমে আসে তাদের উপর। অন্তর্কলহে সমস্ত সমাজ নষ্ট হয়। পুরা ও পালি দেশ-দেশান্তরে পালিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। তাঁরা কোথাও আশ্রয় পায় না এবং দেবতা তাদের অভিষাপ দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় করে দেয়।”<sup>২</sup>

এই আশ্রয়হীনতা তাদের কাছ থেকে তাদের স্থায়ী বাসস্থান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক অধিকার এমনকী রাজনৈতিক অধিকারও (নিজের শাসক/শোষক-কে নির্বাচন করবার অধিকার) কেড়ে নিয়েছে।



বাসস্থান, প্রতিষ্ঠান এবং অধিকার — এই বিষয়গুলির ওপরই যেহেতু উত্তর-ঔপনিবেশিক কালের ব্যক্তি-পরিচয় নির্ভরশীল তাই ‘বাজিকর’-দের কোনো ব্যক্তি-পরিচয়ই উপন্যাসে দেখা যায়নি।<sup>৭</sup> তাদের একমাত্র পরিচয় তারা ‘বাজিকর’। এই প্রসঙ্গে বলা বাহুল্য — বাজিকর কোনো জাতি নয়, একটি পেশা কিন্তু অন্য কোনো সম্বল না থাকায় এই পেশাই তাদের একমাত্র পরিচয়। এ যেন রক্তকরবীর ‘অধ্যাপক’, ‘সর্দার’, ‘মোড়ল’-এর মতো, যারা ‘Capitalist Society’-র ‘proletarians, alienated, exploited, dependent’<sup>৮</sup> ছাড়া কিছুই নয়। অর্থাৎ, সমাজবদ্ধ মানুষের পরিচয় সবদিক থেকেই প্রতিষ্ঠান-নির্ভর। উপন্যাসে ‘বাজিকর’-দের কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান নেই, তাই কোনো পরিচয়ও নেই। তবে অনেক গবেষক তথা সমালোচক ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ উপন্যাসে বর্ণিত ‘বাজিকর’ গোষ্ঠীভুক্ত ‘জনসংখ্যা’-কে ‘দলিত’ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ‘জনগণ’ বলবার পক্ষপাতি। এই ভাবনা কতদূর পর্যন্ত সমাজ-বিজ্ঞান-সম্মত — সে বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

কয়েক বছর আগে একটি বিদেশি ওয়েব সিরিজ খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ-দেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ওয়েব সিরিজটির নাম - ‘The Game of Thrones’। এই ওয়েব সিরিজেরই একটি পর্বে কয়েকজনের কথোপকথনকে এখানে উদ্ধৃত করা হল, এই প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়ের বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করবার জন্য<sup>৯</sup> -

**Missandei** - Forgive me but may I ask a question?

**John** - Of course.

**Missandei** - Your name is **John Snow** but your father's name is **Ned Stark**.

**John Snow** - I'm a Bastard. My mother and father weren't married.

**Davos** - Is the custom different or not?

**Missandei** - We don't have marriage enough so the concept of the bastard doesn't exist.

**Davos** - Sounds liberating...

যাঁরা ‘Game of Thrones’ দেখেছেন তাঁরা তো বিষয়টি অবশ্যই জানবেন, যাঁরা দেখেননি তাঁদের উদ্দেশ্যে ‘Missandei (মিসান্দে)’-র তৃতীয় সংলাপটি লক্ষ্য করবার জন্য অনুরোধ করব। কী সাংঘাতিক কথা ! বিবাহের প্রচলন না থাকায়, জারজ সন্তানের ধারণাটাই উধাও হয়ে গেল! একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, এই বিষয়টি আমাদের বাস্তব জীবনেও কতটা প্রাসঙ্গিক। ভারতের সনাতন পরম্পরায় - ব্রাহ্মণ, দৈব, আর্ষ, প্রাজপত্য, গান্ধর্ব, অসুর, রাক্ষস, পিশাচ - এই আট প্রকার বিবাহ আছে। শাস্ত্রীয় মতভেদ অনুযায়ী আবার এদের রকমফেরও আছে। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গ অনুসারে যদি ‘বিবাহ’ নামক এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানকেই তর্কের খাতিরে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে - সতী, পতিব্রতা, রক্ষিতা, বেশ্যা, জারজ এই সব সামাজিক পরিচয়ও উধাও হয়ে গেছে। কারণ এর প্রত্যেকটিই কোনো-না-কোনোভাবে বিবাহ নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই জড়িত। তার মানে সমাজের তথাকথিত ‘সভ্য’ বা ‘অ-সভ্য’ যে কোনো পরিচয়ের জন্যই মানুষকে সমাজের প্রতি নির্ভরশীল হতেই হয়। বর্তমানে আলোচিত উপন্যাসে বাজিকরদের সেই অর্থে কোনো স্থায়ী সমাজব্যবস্থা নেই, তাই তাদের কোনো পরিচয়ও নেই।

এবার আসা যাক, ‘বাজিকর’ জনগোষ্ঠীর মানুষজন ‘দলিত’ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত কি না — সেই প্রশ্নে। সর্বপ্রথম জেনে নেওয়া যাক ‘দলিত’ কথাটির অর্থ কী। এই সম্পর্কে প্রচলিত সংজ্ঞাগুলি হল —

1. Dalit is a vernacular form of the Sanskrit (dalita). In Classical Sanskrit, this means “**divided, split, broken, and scattered**”.<sup>৬</sup>

2. To me Dalit is not a caste. He is a man **exploited by the social and economic traditions of the country**....Dalit is a symbol of change and revolution.<sup>৭</sup>

3. ...They prefer to be called Dalit, i.e., **the oppressed**. Occupying the lowest rank in the Hindu caste system, they are called avarna, those whose place is outside the chaturvarna system. They are also known as **perial, panchama, atishudra, antyaja or namashudra** in different parts of the country.<sup>৮</sup>

উল্লিখিত বক্তব্যগুলিকে ‘দলিত’ শ্রেণির পরিচয়ের প্রামাণ্য সংজ্ঞা ধরে নিয়ে উপন্যাসে বর্ণিত ‘বাজিকর’ গোষ্ঠীর জীবনধারার সাযুজ্য সন্ধানের চেষ্টা করলে দেখা যাবে যে, ‘বাজিকর’ চরিত্রগুলি সত্যিই দলিত-শ্রেণিভুক্ত মানুষজন। তবে গুজরাট, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং হরিয়ানায় সরকারের পক্ষ থেকে যে দলিতদের জন্য তফসিলি জাতি বা উপজাতিভুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, উপন্যাসের বাজিকররা সেই দলিত নয়। কেন নয় — এর উত্তর উপন্যাসেই খুঁজে পাওয়া যায়, যখন ইয়াসিন নমঃশূদ্দের দলপতি ভায়রোর কাছে কাতর আবেদন জানায়:

হামরাদের আপনার জাতে তুলে নেন মালিক।

উত্তরে ভায়রো জানায় — বাইশ দিগার হামাক নমোশূদদূর বানাবার হক দেয় নাই বাজিকর, সদগোপ, নমোশূদদূর কিছুই হবার পারো না।<sup>৯</sup>

ফলত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মহীন বাজিকর, ধর্ম ছাড়া কোনো সমাজে ঠাই পায় না। উল্লিখিত সংজ্ঞা তিনটিতে যে অর্থে — ‘divided, split, broken, and scattered’ বা ‘exploited by the social and economic traditions’ বা ‘the oppressed’ ইত্যাদি বিশেষণগুলি ব্যবহার করা হয়েছে, সেই অর্থেই বাজিকর গোষ্ঠী ‘দলিত’ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত (নমঃশূদ্দ নয়)। মনে রাখতে হবে উপন্যাসটি লেখা হচ্ছে ১৯৮০ - ৮৫ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ এই সময়টি হল ‘Post-Capitalist Society’-র যুগ এবং ‘By that time, Marx’s proletarians had not yet become ‘affluent’. **But they had already become middle class. They had become productive.**’<sup>১০</sup> কিন্তু বাজিকর-গোষ্ঠী তখনও দৈব-অভিশাপের বোঝা মাথায় নিয়ে রহু চণ্ডালের হাড় সম্বল করে বা সেই হাড়ের খোঁজে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কারো কারো চোখে স্থায়ী বাসস্থান গড়ার স্বপ্ন, কারও চোখে কৃষক হিসাবে স্থায়ী পেশা বেছে নেওয়ার স্বপ্ন কিন্তু এদের কোনোটিই বাস্তবে পরিণত হয়নি।

উপন্যাসে দেখা গিয়েছে বাজিকরদের জীবনযাত্রা নেই আছে জীবনানুসন্ধান। পিতৃপুরুষের প্রাচীন গল্প তাদের নির্বিবাদী বিশ্বাসের সঙ্গে মিশে পুরুষানুক্রমে এই অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়ার রসদ যুগিয়েছে।

বাজিকর যে কোনো জাতি নয়, একটি পেশা — একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই পেশাই বাজিকর-গোষ্ঠীর জীবন-প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কারণ বাজিকর শব্দের অর্থ —

The term /bāzī-gar/ is a word of Persian derivation meaning “one who performs bāzī.” Bāzī, which connotes “**play,**” refers in this context to a kind of entertaining performance based on physical acts.<sup>20</sup>

The community derives its name from the word baji, meaning **rope dancing and acrobatics**. They wander from place to place and especially visit fairs to display their various acrobatic skills and to perform magic tricks. In some of the states they are notified as a scheduled caste.<sup>21</sup>

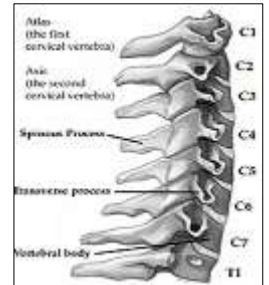
উপন্যাসেও এই ‘rope dancing’-এর কথা এসেছে যখন শারিবার নানি বলে -

দুই ধারে ভইসের সিংএ দড়ি বাইক্কে বাঁশ দিয়া ঠেল্যে সি দড়ি টনটনা হতো। ভুঁই থিকা বিশ হাত উচাতে বাঁশ হাতে হাটা চলা, লাচ দেখানো -<sup>22</sup>

পেশা অনুযায়ী যাযাবর বাজিকরদের গোটা জীবনটাই যেন এই rope dancing and acrobatics-এর নিরবচ্ছিন্ন প্রদর্শন। দড়ির ওপর খেলা দেখানোর সময় বাজিকরের হাতে আড়াআড়িভাবে একটি লম্বা লাঠি ধরা থাকে, ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য। আর এদের জীবনের ভারসাম্য বজায় রেখেছে - রহু চণ্ডালের হাড়। এদের নির্দিষ্ট কোনো বাসস্থান নেই, তাই ‘তামাম দুনিয়া’ তাদের বাসস্থান। তাদের নিজস্ব কোনো ধর্ম নেই তাই কলমা পড়েও তারা সমাজে মুসলমান হয়ে ওঠেনি আবার ‘ওলা মাই, কালী মাই, বিগা মাই’<sup>23</sup> প্রমুখ দেবদেবীর পূজা করেও তারা হিন্দু হতে পারেনি। ভাষার পরিবর্তে তাদের সম্বল হল - বুলি। কিন্তু বুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার দায় তাদের নেই কারণ ‘কোনো জায়গার বুলিই তাদের মুখে ভাষা হওয়ার সময় পায় না, দেখতে-না-দেখতে বাজিকর চলে যায় অন্য কোথাও, সেখানে গিয়ে সে নতুন বুলি রপ্ত করে।’<sup>24</sup> এমন অনিশ্চয়তাকে অঙ্গিকার করেও বাজিকরের জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষায় বিন্দুমাত্র চিড় ধরেনি। এর কারণ হয়তো অনেকেই বলবেন তাদের জীবনতৃষ্ণা, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে এর কারণ হিসাবে ‘রহু চণ্ডালের হাড়’-কেই বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

‘রহু চণ্ডালের হাড়’ আসলে কীভাবে তৈরি - সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক। উপন্যাসেই এই হাড়-নির্মাণের ইতিবৃত্ত রয়েছে:

ঘোর অমাবস্যায় এক বিটিছালের এক ছেল্যা হবে। সি হোবে একোই মায়ের একোই বেটা। সি ব্যাটাক্ মরবা হবে আমাবস্যার দিনোৎ আর লাশ ভাসান হবে আমাবস্যার আতোৎ। তবি সি লাশ গহীন আতোৎ নদী থিকা উঠাবা হবে। তাবাদে তার কণ্ঠার হাড়ে বানাবা হবে ভান্মতির হাড়। সি হল রহু চণ্ডালের হাড়।<sup>25</sup>



এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল - ‘কণ্ঠার’ বা কণ্ঠের হাড় দিয়ে তৈরি হয় রহু চণ্ডালের হাড়। চিকিৎসা-শাস্ত্র অনুযায়ী কণ্ঠের হাড়ের নাম হল - ‘Cervical Vertebrae (সার্ভিক্যাল ভার্টিব্রা)’ মানুষের গলায় মোট সাতটি হাড় থাকে যাকে ‘Cervical’ বা C1 থেকে C7 চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়।<sup>১৫</sup> এই সার্ভিক্যাল ভার্টিব্রা-র কাজই হল অবশিষ্ট শিরদাঁড়ার সঙ্গে মস্তকের সম্পর্ক স্থাপন করা, মস্তকের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা এবং মস্তকের ভার বহন করা। তাহলে রহু চণ্ডালে হাড়ের ক্ষেত্রেও কি বলা যেতে পারে না - রহু চণ্ডালের হাড়কে তর্কের খাতিরে কাল্পনিক বলে ধরে নিলেও তার কর্ম-পদ্ধতি পুরোপুরি বিজ্ঞান-সম্মত। অর্থাৎ এখানে যাযাবর বাজিকরদের গোষ্ঠী-জীবনকে যদি একটি শিরদাঁড়া হিসেবে কল্পনা করা হয় তাহলে সার্ভিক্যাল ভার্টিব্রার নীচের অংশ হল - পূর্বপুরুষের যাবতীয় স্মৃতিকথা, কাহিনি, ঐতিহ্য এবং অভিশাপ এবং সার্ভিক্যাল ভার্টিব্রা-র উপরের অংশ হল - বাজিকরদের বর্তমান প্রজন্ম বা বর্তমান বাজিকর-গোষ্ঠী।



বাজিকরদের বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে পূর্ববর্তী প্রজন্মের সম্পর্ক-সূত্র বা যোগসূত্র হল - রহু চণ্ডালের হাড়। উপন্যাসের বাজিকর-গোষ্ঠীও গত দেড়শো বছর ধরে এই রহু চণ্ডালের হাড়কে সম্বল করেই স্থায়ী কোনোকিছুর পায়ে নিজেদের সমর্পণ করেনি, করতে পারেনি। রহু চণ্ডালের হাড়ই যুগ যুগ ধরে তাদের জীবনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেছে। যাযাবর জাতির জীবনে এই হাড়ের কথা, প্রথা এবং মাহাত্ম্য আগেও শোনা গেছে -

ঘোড়া লইল গাধা লইল কত কইব আর।

সঙ্গেতে করিয়া লইল রাও চণ্ডালের হাড়।<sup>১৬</sup>

সম্পাদক দীনেশ চন্দ্র সেন টীকায় লিখেছেন ‘রাও চণ্ডালের হাড় = রাজ-চণ্ডালের হাড় (চণ্ডালদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হাড় ?) বেদেরা তাহাদের বাজি করিবার সময় একটা হাড় লইয়া তাহাদের দ্রব্যাদিতে ঠেকাইয়া নানারূপ অদ্ভুত ক্রিয়া করিয়া থাকে। সেই হাড়ই সম্ভবত এই রাও চণ্ডালের হাড় হইবে।’<sup>১৭</sup> এখানে উপন্যাসের বর্ণনা অনুসারে ‘রাও চণ্ডাল’-কে কি ‘রাজ চণ্ডাল’ বা ‘রহু চণ্ডাল’ বলা যায় না ?

প্রবন্ধের একেবারে শেষ পর্বে এসে অবশিষ্ট একটি বিষয়ই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় - এইভাবে ভাষাহীন, পরিচিতিহীন, ধর্মহীনভাবে স্থানান্তরিত হতে হতে উপন্যাসের বাজিকর-গোষ্ঠীর বর্তমান প্রজন্ম কি দিক্শূন্যপুরের যাত্রী হয়েই থেকে গেল ? হয়তো না। কারণ প্রবন্ধের প্রথমেই বলা হয়েছে - এই উপন্যাস শুধু মানুষের গল্প। সমাজ-নির্ধারিত কোনো বিকল্প পরিচিতির কাছে যে মানুষ মাথা নত করেনি বা রহুর হাড় তাদের করতে দেয়নি। যে মানুষ প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় নিজেদের পদে পদে বেমানান বুঝেও সেই সমাজের পাকদণ্ডী ধরেই অনিবার্য প্রবজ্যার দিকে এগিয়ে গেছে। সমাজের বাঁধাধরা বঞ্চনা, গ্লানি, অপমান, নির্যাতন সহ্য করেও যে নিজের অস্থায়ী পরিচয় নিয়েই এগিয়ে যাওয়ার সাহস দেখিয়েছে তথাকথিত ‘দলিত’শ্রেণিভুক্ত হতে চায়নি, সেই মানুষের কাহিনি নিছক রাজনৈতিক বা আর্থ-সামাজিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করা যায় না। এরা জনগণ নয়, জনসংখ্যা। রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে এদের সম্বোধন করার মতো এখনও পর্যন্ত কোনো ভাষা আবিষ্কার হয়নি, বলা বাহুল্য ভাষার মধ্যে দিয়ে এদের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। যে মানব-সমাজ গত চারশো বছরে ‘Enlightenment’ থেকে আরম্ভ করে ‘Renaissan’,

‘Capitalism’, ‘Communism’, ‘Post-Capitalism’-এর মতো দেগে-দেওয়া একের পর এক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে থিতু হয়েছে, সেই সমাজের সমান্তরালে বা বাইরে থেকে ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ উপন্যাসের বাজিকর-গোষ্ঠী অক্লান্তভাবে তাদের মানব-জমিন খুঁজে যাচ্ছে এবং মনে হচ্ছে তারা যেন Andrzej Wajda (আন্জে ওয়ায়দা)-র ছবির শিরোনাম ‘Everything for Sale (1969)’-কে বিদ্রূপ করে বলছে – সবকিছু বিক্রি হয় না।

### তথ্যসূত্র:

১. সেন, অভিজিৎ, যেভাবে লেখা হল রহু চণ্ডালের হাড়, গল্পপাঠ ওয়েবজিন, অক্টোবর ২১, ২০১৫।
২. ঐ, রহু চণ্ডালের হাড়, জে. এন. চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১০, পৃ. ২১।
৩. Voicu, Cristina-Georgiana. “1 Identity in the Postcolonial Paradigm: Key Concepts”. Exploring Cultural Identities in Jean Rhys’ Fiction, Warsaw, Poland: De Gruyter Open Poland, 2014, p. 15-42
৪. Drucker, P. Post-Capitalist society. In Routledge eBooks. London and New York, 1994, p. 4
৫. Game of Thrones || Season 7 || Episode 4 || Jon & Davos & Messendei Talking & Theon Returns to Dragon Stone.
৬. Dalit, n. OED Online. Oxford University Press, June 2016. Web. 23 August 2016.
৭. Zelliott, Eleanor. “Dalit Sahitya: The Historical Bckground.” An Anthology of Dalit Literature. Ed. Mulk Raj Anand and Eleanor Zelliott. New Delhi: Gyan Publishing House, rpt. 2014. pp. 1-24. Print.
৮. Guru Gopal. —The Dalit Movement in Mainstream Sociology” in “Dalit in Modern India, Vision and Values” ed. Michael S.M. Sage Publication. New Delhi, 2007, P.150:162.
৯. Drucker, P., Ibid, p. 35
১০. Schreffler, Gibb (2011), ‘The Bazigar (Goaar) People and Their Performing Arts’, Journal of Punjab Studies, Vol.18, Nos. 1 & 2, pp. 217-50.
১১. Singh, K.S., Tribal Society in India: An Anthro-po-historical Perspective, Manohar Publishers & Distributors, New Delhi, 1998, p. 339
১২. সেন, অভিজিৎ, রহু চণ্ডালের হাড়, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১ বৈশাখ ১৩৬২, পৃ. ৩।
১৩. তদেব, পৃ. ১৭৯।
১৪. তদেব, পৃ. ১৭২।
১৫. Sinelnikov, R.D, Atlas of Human Anatomy, Vol. I, MIR Publishers, Moscow, 1988, p. 22
১৬. সেন, দীনেশচন্দ্র (সং.), মহুয়া (দৃশ্যকাব্য), মৈমনসিংহ-গীতিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৫৮, পৃ. ৭।
১৭. তদেব।

### সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি (বাংলা):

১. সেন, অভিজিৎ, ‘রহু চণ্ডালের হাড়’, জে. এন. চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৩।
২. ভট্টাচার্য, দেবাশিস, ‘বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনা’, অক্ষর পাবলিকেশন, ত্রিপুরা, ২০১০।

৩. মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র, 'গৌষ্ঠীজীবনের উপন্যাস', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯।
৪. দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ, 'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি', বর্মণ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৫৩।
৫. ভদ্র, গৌতম (সম্পা.), 'নমনবর্গের ইতিহাস', প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৯৮।

### সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি (ইংরাজি):

১. Eliade, Mircea, Myth and Reality, Pantheon Books, New York, 1954.
২. W. Said, Edward, Orientalism, Vintage Books, U.S, 1978.
৩. Frazer, Sir James, The Golden Bough, Vol. I, The Macmillan Company George, New York, 1925.
৪. Rapport, Nigel, Social and Cultural Anthropology : The Key Concept, Third Edition, Routledge, London and New York, 2014.
৫. Metcalf, Peter, Anthropology : The Basics, Routledge, London and New York, 1<sup>st</sup> Published, 2005.

### সহায়ক পত্রপত্রিকা/ওয়েবজিন (বৈদ্যুতিন):

১. উত্তরধ্বনি, ২৫ বর্ষ, শারদ, ১৪০৯, ২০০২।
২. আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতার কড়চা: প্রতিস্পর্ধী প্রদর্শনী, ০২ মার্চ ২০২০।
৩. তদেব, জেরাইল থেকে প্রতিবাদী স্বর বুনছে শারদীয়া, ০২ অক্টোবর ২০১৬।
৪. প্রথম আলো (বৈদ্যুতিন), দেবতা না, দলপতি রহু, ২৩ অক্টোবর ২০১৯।
৫. জনপদপ্রয়াস প্রবন্ধ সাহিত্যে, সৃষ্টিসদন ম্যাগাজিন, ২০০৯।

### সহায়ক ওয়েবজিন / ব্লগ (বৈদ্যুতিন):

১. শিরোনাম - অভিজিৎ সেন - গল্প ও উপন্যাস,  
ওয়েবসাইট - <https://www.guruchandali.com/comment.php?topic=9455>
২. শিরোনাম - রহু চণ্ডালের হাড় : বহুস্থানিক বর্ণমালায় সমান্তরাল সংস্কৃতি  
ওয়েবসাইট - <https://www.kaliokalam.com>
৩. শিরোনাম - যাযাবর জীবনাখ্যান 'রহু চণ্ডালের হাড়' মঞ্চস্থ  
ওয়েবসাইট - <https://www.dailyjanakantha.com/national/news/399809>
৪. শিরোনাম - উপন্যাস যখন নাট্যভাষায়  
ওয়েবসাইট - <https://poros-por.com/front/singel/2/32713>
৫. শিরোনাম - সেলিম আল দীন স্মরণে শিল্পকলায় 'রহু চণ্ডালের হাড়'  
ওয়েবসাইট - <https://samakal.com/entertainment/article/19081651>



# ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume- I, Issue- III, January, 2025, Page No. 745- 752

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.064



## হুমায়ূন আহমেদের ময়ূরাক্ষী: একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

ড. প্রসেনজিৎ দাস, স্নাতক শিক্ষক, পালাটানা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উদয়পুর, গোমতী, ত্রিপুরা, ভারত

Received: 22.01.2024; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

'Mayurakshi' is the name of a river. Geographically, the Mayurakshi River flows through the Birbhum and Murshidabad districts of West Bengal. The popular Bangladeshi novelist Humayun Ahmed named one of his novel 'Mayurakshi'. Although the story in the novel has no connection to this actual river. In fact, it is a fictional river created by the author and gifted to his beloved character, Himu. Himu does the most unusual things that come to our subconscious mind. The character of Himu is actually a vehicle for fulfilling the author's desires. The author has created this character by diving into the anti-logical world of the human subconscious mind. Himu's father killed Himu's mother when Himu was a child. This created an incompleteness in Himu's subconscious mind for his mother. Himu imagines a form of his mother. He finds the form of his mother through the imagination of a Mayurakshi river. Bangladesh is a riverine country. The relationship between people and rivers has been long-standing. Himu finds his mother in the dream of the river. There is a part of our subconscious mind that does not want to follow any logic. Humayun Ahmed has created Himu from the anti-logical world by diving into our subconscious. Many of us have a latent desire in our subconscious mind to become a wanderer. A wanderer who is loved by everyone for their intelligence, who is ready to sacrifice, and for whom beautiful women wait to return. Himu is actually a vehicle for fulfilling this desire of our subconscious mind.

**Keywords:** Humayun Ahmed, Mayurakshi, Himu, Bangladesh, subconscious mind, anti-logic.

‘ময়ূরাক্ষী’- একটি নদীর নাম। সাহিত্যের সঙ্গে নদীর সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। বাংলা সাহিত্যে নদী কেন্দ্রিক উপন্যাসের সংখ্যাও কম নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাঁসুলি বাঁকের উপকথা’, দেবেশ রায়ের ‘তিস্তা পাড়ের বৃত্তান্ত’, আরো কত কী!

ময়ূরাক্ষী নদীর ভৌগলিক অবস্থান পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে। বাংলাদেশের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ তাঁর উপন্যাসের নামকরণ ‘ময়ূরাক্ষী’ করলেও উপন্যাসের কাহিনীবৃত্ত এই নদীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আসলে হুমায়ূন আহমেদের ময়ূরাক্ষী কোন ভৌগলিক নদী নয়। এটি লেখকের কাল্পনিক নদী। শুধু কল্পনাতেই তার অবস্থান।

উপন্যাসে নদী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও কোন ভৌগলিক অবস্থানে লেখক ময়ূরাক্ষী নদীটিকে স্থাপন করেননি। উপন্যাসটিকে লেখক নদীর সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন এভাবে: ক্লাস সিক্সে জিয়োগ্রাফি স্যার হিমুকে বাংলাদেশের নদনদীর মধ্যে একটা নদীর নাম জিজ্ঞাসা করায়, হিমু উত্তর দিয়েছিল ‘আড়িয়াল খাঁ’। এত সুন্দর সুন্দর নাম থাকতে হিমুর আড়িয়াল খাঁ বলাতে স্যার রেগে গিয়ে রামচড় মেরেছিল। স্যারের চার রকমের চড় ছিল জোরের মাজানুযায়ী রামচড়, শ্যামচড়, যদুচড়, মধুচড়। হিমুর যতদূর মনে পড়ে, সেদিন রামচড় খেয়েছিল। সারা পিরিয়ড। কানে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর স্যার ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, তাঁর অন্যায় হয়েছে। তিনি নদীর নাম জানতে চেয়ে উত্তর পেয়েছিলেন। সুতরাং শাস্তি দেওয়ার কোন যুক্তি নেই। ‘আড়িয়াল খাঁ’ নামটা শুনে তাঁর মেজাজটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। স্যার হিমুর মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে এমনভাবে আদর করে দিয়েছিল যে হিমুর চোখে জল এসে গেছে। তখন স্যার হিমুর কাছ থেকে একটা সুন্দর নদীর নাম শুনতে চাইল-

“সুন্দর একটা নদীর নাম বল।

আমি শার্টের হাতায় চোখ মুছতে মুছতে বললাম ময়ূরাক্ষী।

ময়ূরাক্ষী! এই নাম তো শুনিনি। কোথাকার নদী?

জানি না স্যার।

এই নামে আসলেই কি কোন নদী আছে?

তাও জানি না, স্যার।

স্যার হালকা গলায় বললেন, আচ্ছা থাক। না থাকলে নেই।

এটা হচ্ছে তোর নদী।

এই ঘটনার তিন বছর পর ক্যান্সারে দীর্ঘদিন রোগভোগের পর স্যার মারা যান। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে স্যারকে দেখতে গিয়েছিলাম। স্যার আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। উঁচু গলায় তাঁর স্ত্রীকে ডাকলেন, ওগো, এই ছেলেটাকে দেখে যাও। এই ছেলের একটা নদী আছে। নদীর নাম ময়ূরাক্ষী।

স্যার যেদিন মারা গেলেন সেই রাত্রিতেই আমি প্রথম ময়ূরাক্ষী স্বপ্নে দেখি। ছোট্ট একটা নদী। তার পানি কাঁচের মতো স্বচ্ছ নিচের বালিগুলি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। নদীর দুধারে দুর্বাঘাসগুলি কী সবুজ! কী কোমল! নদীর ঐ পাড়ে বিশাল ছায়াময় একটা পাকুড় গাছ। সে গাছে বিষণ্ণ গলায় একটা ঘুঘু ডাকছে সেই ডাকে এক ধরণের কান্না মিশে আছে।

নদীর ধার ঘেঁসে পানি ছিটাতে ছিটাতে ডোরাকাটা সবুজ শাড়ি পড়া একটি মেয়ে ছুটে যাচ্ছে। আমি শুধু একঝলক তার মুখটা দেখতে পেলাম। যেন কতদীর্ঘ শতাব্দী মেয়েটির সঙ্গে কাটিয়েছি।

ময়ূরাক্ষী নদীকে একবারই আমি স্বপ্নে দেখি। নদীটা আমার মনের ভেতরে পুরোপুরি গাঁথা হয়ে যায়। এরপর অবাক হয়ে লক্ষ্য করি কোথাও বসে একটু চেষ্টা করলেই নদীটা আমি দেখতে পাই তার জন্য



আমাকে কোন কষ্ট করতে হয় না। চোখ বন্ধ করতে হয়না, কিছু না। একবার নদীটা বের করে আনতে পারলে সময় কাটানো কোন সমস্যা নয়। ঘন্টার পর ঘন্টা আমি নদীর তীরে হাঁটি। নদীর হিমশীতল জলে পা ডুবিয়ে বসি। শরীর জুড়িয়ে যায়।”<sup>১</sup>

সুতরাং উপন্যাসের ময়ূরাক্ষী কোন ভৌগলিক নদী নয়। এটি হুমায়ূন আহমেদের কল্পনার নদী, যা তিনি উপহার দিয়েছেন তাঁর প্রিয় চরিত্র হিমুকে।

হুমায়ূন আহমেদের লেখালেখির ভুবনে ‘ময়ূরাক্ষী’ এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই উপন্যাস থেকেই যাত্রা শুরু করে তাঁর জনপ্রিয় চরিত্র হিমু। আমাদের অবচেতন মনে যে সকল উদ্ভট খেয়াল জাগে, হিমু খুব স্বাভাবিক ভাবেই তা করে যায়। হিমু চরিত্রটি আসলে লেখকের ইচ্ছা পূরণের বাহন। মানব মনের অবচেতনের অ্যান্টিলজিকের জগতে ডুব দিয়ে চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন, আর তাঁর পাঠকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এই জগতে-

“সকলকে আণ হিমুর অ্যান্টিলজিকের আশ্চর্য জগতে।”<sup>২</sup>

হিমুর ভালো নাম হিমালয়, সংক্ষেপে হিমু। বাবা যখন ছেলের নাম হিমালয় রেখেছিল লোকে আপত্তি করেছিল ঠিকই কিন্তু হিমুর বাবা কর্ণপাত করেন নি। কারণ, মানুষের নাম নদীর নামে হয়, ফুলের নামে হয়, গাছের নামে হয়, তাহলে পাহাড়ের নামে আপত্তি কিসের। এছাড়া এই নামকরণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যেন এই ছেলের হৃদয় হিমালয়ের মতো বিশাল বড় হয় সেই জন্যই এই নামকরণ। যখন হিমুর বাবাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল-

“তাহলে আকাশ রাখলেন না কেন? আকাশ তো আরো বড়।”<sup>৩</sup>

তখন হিমুর বাবা প্রতিউত্তর করেছিল যে, আকাশ বড় হলেও তা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু হিমালয়কে ছোঁয়া যায়। শুধুমাত্র এই নামের জন্যই ছেলেবেলায় হিমুকে স্কুলে ভর্তি করানো সম্ভব হয় নি। যদিও এর জন্য হিমুর বাবার কোন আক্ষেপ থাকেনি।

হিমুর বাবার সাধনা ছিল হিমুকে অসাধারণ করে তোলার, মহাপুরুষ বানানোর। হিমুর বাবার বিশ্বাস ছিল যে, সাধারণ কুকুরকে যদি প্রশিক্ষণ দিয়ে শিকারি কুকুর করা যায়, তাহলে মানুষকে প্রশিক্ষণ দিয়ে মহাপুরুষ বানানো যাবে না কেন। তাই তিনি হিমুকে নিয়ে মগ্ন হলেন কৃন্তিম মহাপুরুষ বানানোর সাধনায়। হিমু ছিল তাঁর খেলার পুতলা যা তিনি নানা ভাবে নতুন করে তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলেন।

হিমুর বাবা তাকে মহাপুরুষ বানানোর জন্য একটি খাতায় তার জন্য উপদেশ লিখে রাখতেন এবং মৃত্যুর প্রাকমুহূর্ত পর্যন্ত তাকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে, হিমু যেন তার জীবনের পথে এই উপদেশগুলো মেনে চলে। মহাপুরুষদের একটা লক্ষণ মায়া-মমতায় তাঁরা আটকা পড়ে না। তাই এই বিষয়ে হিমুর বাবার উপদেশ -

“পৃথিবীর সকল মহাপুরুষ এবং মহাজ্ঞানীরা এই জগৎকে মায়া বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমি আমার ক্ষুদ্র চিন্তা ও ক্ষুদ্র বিবেচনায় দেখিয়াছি আসলেই মায়া। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম যেমন মায়া বই কিছুই নয়, ভ্রাতা ও ভগ্নির স্নেহসম্পর্কও তাই। যে-কারণে স্বার্থে আঘাত লাগিবামাত্র স্বামী-স্ত্রীর প্রেম বা ভ্রাতা-ভগ্নির ভালোবাসা কর্পূরের মতো উড়িয়া যায়। কাজেই তোমাকে পৃথিবীর সর্ব বিষয়ে পুরোপুরি নির্লিপ্ত হইতে হইবে। কোনোকিছুর প্রতিই তুমি যেমন আগ্রহবোধ করিবে না আবার

অনাগ্রহও বোধ করিবে না। মানুষ মায়ার দাস। সেই দাসত্ব-শৃঙ্খল তোমাকে ভাঙতে হইবে। মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই। চেষ্টা করিলে তুমি তা পারিবে। তোমার ভিতরে সেই ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতা বিকাশের চেষ্টা আমি তোমার শৈশবেই করিয়াছি। একই সঙ্গে তোমাকে আদর এবং অনাদর করা হইয়াছে। মাতার প্রবল ভালোবাসা হইতেও তুমি বঞ্চিত হইয়াছ।”<sup>৪</sup>

হিমুকে মায়ার হাত থেকে বাচানোর জন্য বাবা হিমুর মাকে হিমুর একান্ত শৈশবে হত্যা করেছে। যদিও খুনটা ধড়া পড়ে নি, তবে অনেকেই অনুমান করতে পেরেছিল, অবশ্য উদ্দেশ্য বুঝতে পারেননি। মায়ের প্রতি হিমুর যেন কোনো মায়া সৃষ্টি হতে না পারে এজন্য তার বাবা মায়ের একটা ছবিও ঘরে রাখেনি। এই সমস্ত কিছুই হিমুর বাবার কাছে ছিল একটা পরীক্ষার অংশ। তাঁর ধারণা ছিল এই সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি হিমুকে মহাপুরুষ করে তুলবেন। হিমুর উপরই তাঁর সকল আশা ভরসা। হিমুর মা যদি বেঁচে থাকত তাকে এই সকল পরীক্ষা করতে দিত না, পদে পদে বাধা সৃষ্টি করতো। তাছাড়া সে বেঁচে থাকলে আদর দিয়ে হিমুকে নষ্ট করতো। এইসকল কারণেই হিমুর বাবা তার মাকে হত্যা করেছে। যদিও উপন্যাসের কোথাও একথা উল্লেখ নেই।

হিমুর অবচেতনে মায়ের জন্য একটি অপূর্ণতা সৃষ্টি হয়। হিমু তার মায়ের একটি রূপ কল্পনা করে নেয়। সে একটি ময়ূরাক্ষী নদীর কল্পনার মধ্য দিয়ে তার মায়ের রূপকে খুঁজে পায়। বাংলাদেশ নদীমাত্রিক দেশ। নদীর সঙ্গে মানুষের মায়ের সম্পর্ক সুদীর্ঘকালের। হিমু নদীর স্বপ্নের মধ্য দিয়ে তার মাকে খুঁজে পায়। এই নদী যখন তার স্বপ্নে আসে সমস্ত দুঃখ ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। সে স্বপ্নে দেখতে পায়-

“ছোট্ট একটা নদী। তার পানি কাঁচের মতো স্বচ্ছ। নিচের বালিগুলি পর্যন্ত দেখা যায়। নদীর দুধারের দূর্বাঘাসগুলি কী সবুজ! কী কোমল! নদীর ঐ পাড়ে বিশালছায়াময় একটা পাকুড় গাছ। সে গাছে বিষণ্ণ গলায় একটা ঘুঘু ডাকছে। সেই ডাকে একধরনের কান্না মিশে আছে।

নদীর ধার ঘেঁষে পানি ছিটাতে ছিটাতে ডোরাকাটা সবুজ শাড়ি পরা একটা মেয়ে ছুটে যাচ্ছে। আমি শুধু একঝলক তার মুখটা দেখতে পেলাম। স্বপ্নের মধ্যেই তাকে খুব চেনা, খুব আপন মনে হলো। যেন কত দীর্ঘ শতাব্দী মেয়েটির সঙ্গে কাটিয়েছি।...

তার চোখে গভীর মায়া ও গাঢ় বিষাদ। এই তরুণীটি আমার মা। আমার বাবা যাকে হত্যা করেছে।”<sup>৫</sup>

হিমুর বাবা হিমুর মন থেকে মায়া কাটানোর জন্য তারই সামনে ছেলেবেলায় সাধের খেলনা হাতুড়ি দিয়ে ভাঙলেন, তার পছন্দের টিয়াপাখি গলাটিপে মেরে ফেললেন। সে ছেলেবেলায় বুঝতো না, বাবা এসব কেন করছে। পরে অবশ্য বাবার উপদেশমালা পড়ে সে অনুভব করতে পেরেছিল তাঁর বাবা কেন এইসব করতো।

হিমুর বাবা হিমুকে মহাপুরুষ করে তোলার জন্য বহু উপদেশ লিখে গেছেন। যেমন, মহাপুরুষদের মন হচ্ছে বিশাল। তাই হিমুকেও তার ক্ষুদ্র শরীরে বিশাল মন ধারণ করতে হবে। এর উপায় হচ্ছে-

“যখনই সময় পাবি ছাদে এসে আকাশের দিকে তাকাবি এতে মন বড় হবে।”<sup>৬</sup>

হিমু তার বাবার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য মহাপুরুষ হওয়ার সাধনা করে। নিজেকে অন্যের চেয়ে আলাদা প্রমাণ করার জন্য অদ্ভুত আচরণ করে। হলুদ পাঞ্জাবি পরে খালি পায়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, আকাশের দিকে তাকায়। মহাপুরুষের মত আচরণ করার চেষ্টা করে। যদিও সে জানে-

“আমি মহাপুরুষ নই। কিন্তু এই ভূমিকায় অভিনয় করতে আমার ভালো লাগে। মাঝে মাঝে এই ভূমিকায় আমি অভিনয় করি, মনে হয় ভালোই করি। সত্যিকারের মহাপুরুষরাও সম্ভবত এত ভালো করতেন না।”<sup>৭</sup>

হিমু তার আত্মীয় স্বজনদের কথা জানতে পারে যখন তার বাবা মৃত্যুশয্যায়। হিমুর বাবা ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্রাবস্থায় রাগ করে বাড়ি ছেড়েছিল, আর কোন যোগাযোগ রাখেনি। বাড়ির লোকেরা জানত সে পাগল। তার অসুস্থতার সংবাদ শুনে অভিজাত আত্মীয়স্বজনরা একে একে আসতে থাকে। কিন্তু হিমুর বাবার নির্দেশ তার মৃত্যুর পর হিমুকে যেন পাঠানো হয় তার মামাদের কাছে। হিমুর দাদামশায় কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হিমুর মামারা কিসে বেশি ভালো যে হিমুকে তাদের কাছে পাঠাতে হবে। হিমুর বাবা জানালেন, মামার বাড়িতে হিমুর বড় হওয়া দরকার। কেননা তার মামারা পিশাচ শ্রেণীর। ওদের সঙ্গে থাকলে সে অনেককিছু শিখতে পারবে। পিশাচ শ্রেণীর মানুষদের সংস্পর্শে না এলে মানুষের সদগুণ সম্পর্কে ধারণা হয়না।

হিমুর বাবার মৃত্যুর পর দাদামশায় হিমুকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যান। দাদামশায় হিমালয় নামের পরিবর্তে তার নাম রাখেন চৌধুরী ইমতিয়াজ এবং ডাকনাম টুটুল। তিনি ঘোষণা করে দেন তাকে যেন এই নামেই ডাকা হয়। কিন্তু হিমু তার অভিজাত আত্মীয়স্বজনদের ছেড়ে পিতৃনির্দেশ পালন করে মামার বাড়িতে চলে যায় এবং তাদের মধ্যেই বড় হয়। হিমু তার মামাদের সম্পর্কে বলেছে যে, তার মামাদের শত্রুর অভাব ছিল না। গ্রামের সকলেই ছিল তাদের শত্রু। এক অন্ধকার রাত্রে হিমুর বড়মামাকে মাছ মারার কোঁচ দিয়ে কারা যেন গাঁথে ফেলেছিল। অন্ধকারে শত্রুকে দেখার কথা নয়, তবু মৃত্যুর আগে পুলিশের কাছে জবানবন্দি লিখে যান যে, তিনি টর্চের আলোয় শত্রু চিনেছেন। জবানবন্দি লেখার সময় ওসি সাহেব কাতরকণ্ঠে বলেছিলেন-

“ভাই সাহেব, এই কাজটা করবেন না। ডেথ-বেড কনফেশন খুব শক্ত জিনিস। শুধুমাত্র এর উপরই কোর্ট রায় দিয়ে দেবে। নির্দোষ কিছু মানুষকে আপনি জড়াচ্ছেন। এদের ফাঁসি না হলেও যাবজ্জীবন হয়ে যাবে।”<sup>৮</sup>

হিমুর মামা পুলিশ সাহেবের অনুনয় শুনেন নি। মৃত্যুর আগে হিমুর মেজমামাকে কানে কানে বলেছিলেন, এক ধাক্কা চার শত্রু শেষ হয়েছে। কাজটা মন্দ হয়নি। চার শত্রু শেষ করার আনন্দ নিয়ে হিমুর বড়মামা মারা গেলেন।

এস এস সি পাশ করে হিমু পড়াশুনার জন্য ঢাকায় ফুপার (পিসেমশায়) বাড়িতে আসে। ফুপার ছেলে বাদলের সঙ্গে তার থাকার ব্যবস্থা হয়। অল্পকিছুদিনের মধ্যেই বাদল হিমুর লাইফস্টাইলে আকর্ষিত হয়। হিমু সারাক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটাহাটি করে, হলুদ পাঞ্জাবিতে তাকে কিছুটা ঋষিদের মত মনে হয়। রাতে চাঁদ দেখতে বনে যায়। বাদলও বেশ কয়েকবার হিমুর সঙ্গী হয়েছিল। বাদল আবিষ্কার করেছে যে, হিমুর মধ্যে অসম্ভব রকমের অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। শুধু বাদলই নয় হিমুর অলৌকিক ক্ষমতার কথা সকলেই কমবেশি বিশ্বাস করে। বাদলের চোখে হিমু দেবতার কাছাকাছি। বাদলের মধ্যে হিমুর প্রভাব যে কতখানি তা বাদলের বাবার কথায় উঠে এসেছে-

“ও তোমাকে কেমন অনুকরণ করে সেটা লক্ষ করছে? তুমি তোমার মুখে দাড়ি-গোফের চাষ করছ-কর। সেও তোমার পথ ধরেছে। আজ তুমি হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে এসেছ, আমি এক হাজার টাকা বাজি রাখতে পারি কাল দুপুরের মধ্যে সে হলুদ পাঞ্জাবি কিনবে। তুমি যদি আজ মাথা কামাও, আমি সিঙর ব্যাটা কাল মাথা কামিয়ে ফেলবে।”<sup>৯</sup>

‘ময়ূরাঙ্কী’ উপন্যাসে মনে চিকিৎসার একটি বিষয়ে উঠে এসেছে। হিমু বাদলকে হিপ্পোটিক সার্জেশন দিয়ে তার নিদ্রাহীনতা দূর করেছে। মনোচিকিৎসকেরা অনেক ক্ষেত্রে হিপ্পোটিক সার্জেশনের মধ্য দিয়ে চিকিৎসা পদ্ধতি এগিয়ে নিয়ে যান। এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে সমীক্ষক হিপ্পোটিক সার্জেশন দিয়ে রোগীর মন থেকে রোগের লক্ষণটি দূরীভূত করেন। যদিও ঔপন্যাসিক ‘ময়ূরাঙ্কী’ উপন্যাসে মনোচিকিৎসকের ভূমিকায় হিমুকে উপস্থাপন করেন নি, তবুও তার মধ্য দিয়ে হিপ্পোটিক সার্জেশন দিতে দেখা গেছে -

“রাতে আমার (বাদল) ঘুম হয়না। ঘুমের ঔষধ খাই তাতেও লাভ হয় না। দশ মিলিগ্রাম করে ফ্রিজিয়াম।

আয় তোকে ঘুম পাড়িয়ে দি।

ঘুম আসবে না।

বললাম তো ঘুম এনে দিচ্ছি। নাকি তুই আমার কথা বিশ্বাস করিস না?

কী যে বল! কেন বিশ্বাস করব না? তুমি যা বল তাই হয়।

বেশ, তাহলে চোখ বন্ধ কর।

করলাম।

মনে কর তুই হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিস। চৈত্র মাসের কড়া রোদ। হাট্টিস শহরের রাস্তায়।

হ্যাঁ।

এখন তুই শহর থেকে বেরিয়ে এসেছিস। গ্রাম, বিকেল হচ্ছে। সূর্য নরম।

ই।

হঠাৎ তোর সামনে একটা নদী পড়ল। নদীতে হাটুজল। কী ঠান্ডা পানি! কী পরিষ্কার! আঁজলা ভরে তুই জল খাচ্ছিস। ঘুমে তোর চোখ জড়িয়ে আসছে। ইচ্ছা করছে নদীর মধ্যেই তোর শুয়ে পড়তে।

হু।

নদীর ধারে বিশাল একটা পাকুড় গাছ। তুই সে পাকুড় গাছের নিচে এসে দাঁড়িয়েছিস। এখন শুয়ে পড়লি। খুব নরম হালকা দুর্বাঘাসের উপরে শুয়েছিস। আর জেগে থাকতে পারছিস না। রাজ্যের ঘুম তোর চোখে।

বাদল এবার আর হু বলল না। কিছুক্ষনের মধ্যে তার ভারী নিশ্বাসের শব্দ শুনা গেল। এই ঘুম সহজে ভাঙবে না।”<sup>১০</sup>

এই ঘটনাটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। এর শেকড় অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ানো। হিপ্পোটিক সার্জেশন গ্রহণের ডিপ রোট (Deep Root) আমাদের মনের মধ্যেই রয়েছে। শুরুতে মানবগোষ্ঠী ভয়ংকর বিপদের মধ্যে থাকত। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে দলপতির নির্দেশ তাদের সব সময় মান্য করতে হতো। দলপতির নির্দেশ না মানার অর্থ মৃত্যু।

বিশেষ করে রাতে, যখন চারদিক অন্ধকার। আমাদের জিন সেই ভাবেই তৈরি। আমরা অতি সসভ্য প্রাণী হলেও আমাদের একটা অংশ প্রাচীন পৃথিবীর যখন কাউকে হিপ্পোটিক সাজেশন দেওয়া হয় তখন সে সমীক্ষককে লিডার মানছে। তাই সে সমীক্ষকের প্রতিটি কথা দ্বিধাহীন চিন্তে গ্রহণ করে। বাদলের বেলাতেও তাই ঘটেছে। হিমু বাদলের আদর্শ চরিত্র। হিমুর প্রতি একপ্রকার অন্ধভক্তির জন্যই বাদলকে ঘুমিয়ে যাবার বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে।

সাইকোলজিস্টরা ‘টেলিপ্যাথিক’ বিষয়টি মেনে না নিলেও প্যারা সাইকোলজিস্টরা মানেন। হুমায়ূন আহমেদ ‘ময়ূরাক্ষী’ উপন্যাস মনোবিশ্লেষণ করতে গিয়ে সাইকোলজিস্ট এবং প্যারাসাইকোলজিস্ট উভয়ের ধারণাকেই গ্রহণ করেছেন। ‘ময়ূরাক্ষী’ উপন্যাসে দেখা যায় হিমু অস্বাভাবিক ট্যালিপ্যাথিক ক্ষমতা সম্পন্ন। সে ভবিষ্যতের অনেক ঘটনাই অবলীলায় বলে দিতে পারে। যেমন, হিমুর ধারণা ছিল তার বোন (ফুপুর মেয়ে) রিংকির বিয়ে হবে একটা বামন ছেলের সঙ্গে। আশ্চর্যজনক ভাবেই উপন্যাসে একটি ধনবান বামন ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। প্রসঙ্গত আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। উপন্যাসে ঘটনা চক্রে মীরার সঙ্গে হিমুর পরিচয় হয়। মীরা তার ভাই টুটুলকে খুঁজছে। হিমু তখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই বলেছে-

“আপনি অন্য টুটুলকে খুঁজছিলেন যার কপালে একটা কাটা দাগ।”<sup>১১</sup>

হিমুর এই অনুমানকে আমরা কাকতালীয় হিসাবেও গ্রহণ করতে পারি। কাকতালীয় ঘটনা একবার ঘটে। দ্বিতীয়বারও আশ্চর্যক্রমে ঘটতে পারে। বারবার যখন প্রমাণিত হয় তখন হিমুর টেলিপ্যাথিক ক্ষমতাকে স্বীকার করে নিতেই হয়।

হিমুর লাইফস্টাইল শুধু বাদলকেই মুগ্ধ করেনি, রূপার মত শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী রূপবতী মেয়েদের মুগ্ধ করেছে। রূপা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিমুর সহপাঠিনী। রূপার শিক্ষায়, বুদ্ধিমত্তায়, আভিজাত্যে, রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্ররাই মুগ্ধ। তাকে ছোটখাট সাহায্য করার জন্য চারপাশে শুভাকাঙ্ক্ষীর ভিড়। এমন একটি মেয়েও হিমুর প্রতি মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। হিমু রূপাকে ময়ূরাক্ষী ডাকে। যদিও এই নাম তার পছন্দ নয়, কারণ এলিফেন্ট রোডে এই নামে একটি জুতার দোকান আছে। রূপা হিমুর সঙ্গে দেখা করার জন্য উৎসুক হয়ে থাকে, কিন্তু হিমু দেখা করে না। কারণ, দেখা করলে মায়া জন্মে যায়। তাই সে টেলিফোন করে। টেলিফোনে মায়া জন্মানো কঠিন বলে তার ধারণা। হিমু মাঝে মাঝেই রূপাকে টেলিফোন করে বলে-

“রূপা, তুমি কি এম্ফুনি নীল রঙের একটা শাড়ি পরে তোমাদের ছাদে উঠে কার্নিশ ধরে নিচের দিকে তাকাবে? তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করছে। একটুখানি দাঁড়াও। আমি তোমাদের বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে যাব।”<sup>১২</sup>

হিমুর এই খামখেয়ালি স্বভাবের সঙ্গে রূপা পরিচিত। সে হিমুর কথা বিশ্বাস করে না ঠিকই, তবু যত্ন করে শাড়ি পরে চুল বেঁধে চোখে কাজল লাগিয়ে ছাদের কার্নিশ ধরে দাঁড়ায়। হিমুর জন্য অপেক্ষা করে, কিন্তু হিমু আসে না। মানব মনের এই যুক্তিহীন প্রবণতাকে হুমায়ূন আহমেদ সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তুল এনেছেন তাঁর উপন্যাসের প্লটে।

হিমুর কথা রূপা বিশ্বাস করে না ঠিকই, তবু যত্ন করে শাড়ি পরে, চুল বাঁধে, চোখে কাজল লাগিয়ে ছাদের কার্নিশ ধরে দাঁড়ায়। হিমুর জন্য অপেক্ষা করে, কিন্তু হিমু কখনো আসেনা। হিমুরা আসলে সকলের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ‘অতিথি’র তারাপদের মতো সকলের খুব আপন হয়েও কারো নিজের নয়। সে আর পাচটা ছেলের মত সাধারণ নয়, সে হল হিমু। রাস্তায় হেঁটে হেঁটে সে মহাপুরুষ হওয়ার সাধনায় মগ্ন।

আমাদের অবচেতনের একটা অংশ রয়েছে যা কোন যুক্তি মেনে চলতে চায় না। হুমায়ূন আহমেদ আমাদের অবচেতনে ডুব দিয়ে অ্যান্টিলজিকের জগৎ থেকেই হিমুকে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের অবচেতনে অনেকেই সুপ্ত বাসনা ভবঘুরে হয়ে যাওয়া। ভবঘুরে অথচ সকলে ভালোবাসবে বুদ্ধিমত্তার জন্য, ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকার জন্য, সুন্দরী মেয়েরা অপেক্ষায় থাকবে ফিরে আসার জন্য। হিমু আসলে আমাদের অবচেতনের এই ইচ্ছাপূরণের বাহন।

#### তথ্যসূত্র:

১. আহমেদ, হুমায়ূন, ‘হিমু সমগ্র’ (প্রথম খন্ড), কাকলি প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫, পৃ- ১৪
২. আহমেদ, হুমায়ূন, ‘হিমু সমগ্র’ (দ্বিতীয় খন্ড), অনন্যা, ঢাকা, ২০১২, পৃ- ৫
৩. আহমেদ, হুমায়ূন, ‘হিমু সমগ্র’ (প্রথম খন্ড), কাকলি প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫, পৃ- ২৭
৪. তদেব, পৃ- ৩৭
৫. তদেব, পৃ- ৫১
৬. তদেব, পৃ-৪৮
৭. তদেব, পৃ-২৬
৮. তদেব, পৃ-৩২
৯. তদেব, পৃ-১৯
১০. তদেব, পৃ- ২৩
১১. তদেব, পৃ- ৯
১২. তদেব, পৃ- ৫৪

#### গ্রন্থপঞ্জি:

১. আহমেদ, হুমায়ূন, ‘হিমু সমগ্র’ (প্রথম খন্ড), কাকলি প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫।
২. আহমেদ, হুমায়ূন, ‘হিমু সমগ্র’ (দ্বিতীয় খন্ড), অনন্যা, ঢাকা, ২০১২।
৩. ঘোষ, নিত্যপ্রিয় (সম্পা), সমালোচকদের চোখে, কারিগরি, কলকাতা, ২০১৩।
৪. মিত্র মাধবেন্দ্র, মিত্র পুষ্পা (অনু), ‘সিগমুন্ড ফ্রয়েড: মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা’, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৪।

৫. রহমান, হাবিবুর, 'পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্বঃ দ্রুপদী ও আধুনিক', কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪।
৬. ভট্টাচার্য, অর্ধেন্দু শেখর, 'সাইকোথেরাপি এবং কাউন্সিলিং', এডুকেশন ফোরাম, কলকাতা, ২০১৭।
৭. মণ্ডল, জগদিন্দ্র, 'স্বপ্ন ও মন', দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৭।



# ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume- I, Issue- III, January, 2025, Page No. 753- 761

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.065



## নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে কর্ণ-কুন্তী কথার বিবর্তন

সঞ্চারী হালদার, গবেষক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 17.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*Mahabharata, the great epic of India has encouraged people to think afresh throughout the ages. The story and characters of Mahabharata has been mentioned several times in modern Bengali short stories, to express the tone of time and society. Modern society wants to judge Mahabharata as a book of social experience. In the present article, four short stories are selected for discussion. They are based on the relationship of Karna and Kunti. The names of the texts are 'Kounteya' by Subodh Ghosh, 'Kunti Songbad' by Samaresh Basu, 'Karna-Kunti Katha' by Jyotirmoyee Devi and 'Adhirath Sutaputra' by Amalendu Chakraborty. Kunti and Karna are two very important characters of Mahabharata. In these modern stories, Karna is mostly represented as a lonely man of modern times, who is suffering from existential crisis and Kunti represents the virgin mother who sacrificed his child for social dogma. The dialectic relationship between the mother and son has repeatedly evoked modern writers. Those Bengali writers gave new significance to Karna and Kunti by analyzing it from different perspectives. They try to uncover the true essence of the characters by filling the gaps in classical literature. In this process the past is re-examined by judging events from a modern perspective. Besides, the characters of present society have been compared and recognized in the light of Mahabharata. These Mahabharata-centric works occupy a special place in the trend of post-independence Bengali fiction practice.*

**Keywords:** Mahabharata, Short stories, Deconstruction, Reconstruction, Karna, Kunti, Modern, Existential crisis, relationship.

মহাভারত ধারণ করে আছে ভারতীয় জাতির সহস্রাধিক বছরের কর্মের ইতিহাস, মর্মের ইতিহাস। বহু যুগ ধরে বহু মানুষের অভিজ্ঞতা মিলিত হয়ে এই মহাগ্রন্থের বর্তমান 'শতসাহস্রী সংহিতা'-র অবয়বটি গড়ে উঠেছে। সভ্যতার উন্মালগ্নে কোনো এক মহাকাবি কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের কাহিনি, প্রচলিত লোককথা এবং প্রাচীন সংগীত-আলেখ্য এক সূত্রে গ্রথিত করে গড়ে তুলেছিলেন মহাভারতের মতো এক বিশেষ সাহিত্য সংরূপ। সংরূপের বিচারে সমালোচকেরা একে আদি মহাকাব্য বা 'Epic of growth' বলে চিহ্নিত



করেছেন। লোকশ্রুতি অনুযায়ী মহাকবি বেদব্যাসের হাতে মহাভারত সংহত রূপ লাভ করলেও তাকে একক কবির সৃষ্ট রচনা বলা যায় না। বহুদিন ধরে বহু কবির সংযোজনের ফলে বহু উপকাহিনি একটি মূল কাহিনিতে এসে মেশার ফলে মহাভারত হয়ে উঠেছে এক বিস্তৃত সময় ও সভ্যতার দর্পণ। একটি বিশেষ যুগ ও জাতির মুখপাত্র হয়ে উঠেছে এই মহাকাব্য।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় মহাভারত-চর্চার সূচনা হয়েছিল। এই ধারায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, কাশীরাম দাস, শঙ্কর কবিচন্দ্র প্রমুখ। পরবর্তীকালে উনিশ শতকে অনুবাদের পাশাপাশি প্রবন্ধ এবং কাব্য, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যের বিশেষ সংরূপে এবং বিংশ শতাব্দী থেকে উপন্যাস-ছোটগল্পের পরিসরেও মহাভারতের পুনর্নির্মাণ জারি থেকেছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে আধুনিক যুগের বহু প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিকই তাদের মননচর্চার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন মহাভারতকে।

আধুনিক সাহিত্যে প্রাচীন সাহিত্যের যেকোনোরকম প্রয়োগ হল পুনর্নির্মাণ। এই পুনর্নির্মাণের ভিত্তি মহাভারত হলেও আধুনিক লেখকের জীবন অভিজ্ঞতা, কালচেতনা, সাহিত্যচেতনা, জীবনদর্শন, ভাষাবোধ, শৈলী— এই সবের উপর নির্ভর করে সেই সৃষ্টি হয়ে ওঠে নবনির্মাণ। কথাসাহিত্যিকগণ মহাভারতের আলোয় সমকালকে চিনতে চান, মহাভারতীয় ঘটনার আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতীতকে পুনর্বার যাচাই করে নিতে চান এবং পাশাপাশি ধ্রুপদী সাহিত্যের ফাঁক পূরণ করে চরিত্রগুলির মর্মকথা উদঘাটনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এবং এই প্রক্রিয়ায় অনেকসময় মহাকাব্যিক চরিত্র বা ঘটনার বিনির্মাণ ঘটে যায়।

বাংলা কথাসাহিত্যে মহাভারত-চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে কয়েকটি স্বতন্ত্র ধারাক্রম দৃষ্টিগোচর হয়। একটি ধারায় কথাসাহিত্যিক মহাভারতের মূল কাহিনিসূত্রের কোনো রদবদল না করে ঘটনার নতুন এবং যুগোপযোগী ব্যাখ্যা দেন। পৌরাণিক চরিত্রগুলির মধ্যে সম্ভাবনাগুলি পরিষ্ফুট করে আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেন। অনেক সময় লেখকগণ মহাভারতের ধ্রুপদী মহিমাকে ক্ষুণ্ন করে লঘু ঘটনার মধ্য দিয়ে হাস্যরস পরিবেশনা করেন। দ্বিতীয় ধারায় আছে আধুনিক প্রেক্ষাপট ও চরিত্র নিয়ে গড়ে ওঠা সেই জাতীয় গল্প উপন্যাস যেখানে মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা বা চরিত্রের প্রতীকী ব্যবহার বা ব্যঞ্জনাধর্মী উল্লিখন করা হয়। মহাভারতের অনেক ঘটনা, পরিস্থিতি ও চরিত্র মানবমনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাই আধুনিক সাহিত্যে মহাকাব্যের পরিচিত ঘটনার উল্লিখনে পাঠক সহজে একাত্মবোধ করে। এইসব কথাসাহিত্যের উৎস প্রত্যক্ষভাবে মহাভারত থেকে গৃহীত না হলেও মহাভারতীয় প্রসঙ্গ ও প্রতীক ব্যবহার রচনাটিকে অন্য মাত্রা দান করে। বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে এই দ্বিতীয় ধারার কথাসাহিত্যের উপর মনোনিবেশ করা হয়েছে।

প্রাগাধুনিক যুগ থেকেই বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মহাভারতের নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়া জারি আছে। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে রচিত আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে একাধিকবার মহাভারতকে উপলক্ষ্য করে সময় ও সমাজের স্বর উঠে এসেছে। সেক্ষেত্রে মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র যেমন নতুন আলোকে বিশ্লেষিত হয়েছে; তেমনই বহু ঘটনা নতুনভাবে পর্যালোচিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে সুবোধ ঘোষ, সমরেশ বসু, জ্যোতির্ময়ী দেবী এবং অমলেন্দু চক্রবর্তী রচিত চারটি ছোটগল্পকে বেছে নেওয়া হয়েছে, যেখানে মহাভারতের কর্ণ ও কুন্তী চরিত্রের ব্যঞ্জনাধর্মী উল্লিখন ঘটেছে।

মহাভারতের কুন্তী এবং কর্ণের সম্পর্কের দ্বন্দ্বিকতা ও জটিলতা বারংবার আধুনিক লেখকদের প্রাণিত করে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘কর্ণকুন্তীসংবাদ’ (১৩০৬) হোক বা ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ‘নরনারায়ণ’ (১৩৩৩)— যুগে যুগে কর্ণ এবং কুন্তী চরিত্র নিয়ে ভাঙাগড়া জারি আছে। সরাসরি মহাভারত প্রসঙ্গের অবতারণা না করেও আধুনিক গল্পকারেরা কুমারী মাতা ও কানীন পুত্রের অনুষ্ণে কুন্তী ও কর্ণ চরিত্রের প্রতীকী উল্লেখ করেছেন। এই সব গল্পে কর্ণ মহাভারতের যুগ পেরিয়ে আধুনিক পৃথিবীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল নিঃসঙ্গ মানুষের প্রতিভূ হয়ে উঠেছেন।

মহাভারতের উদ্যোগপর্বে বর্ণিত হয়েছে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরুর ঠিক পূর্বরাতে কুন্তী কর্ণের কাছে তাঁর জন্মপরিচয় উন্মোচন করেছিলেন। কুমারী মাতার সামাজিক লজ্জাকে বিসর্জন দিয়ে পুত্রের কাছে এই যে পরিচয় জ্ঞাপন— এর পিছনে কাজ করেছিল পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাত ও সুবিধাবাদী মনোভাব। কর্ণ তা বুঝে কুন্তীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সখা দুর্যোধনের বিপদের দিনে তিনি তাঁকে পরিত্যাগ করে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের কথা ভাবতে পারেননি। তবে তাঁর স্নেহ-বুভুক্ষু হৃদয় মাতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকারও করতে পারেনি। তিনি কথা দিয়েছিলেন, সমর্থ হলেও তিনি অর্জুন ছাড়া অপর কোনো পাণ্ডবকে হত্যার প্রচেষ্টা করবেন না। যুদ্ধে কর্ণ বা অর্জুন, যারই মৃত্যু হোক, কুন্তীর মোট পাঁচ পুত্রই শেষপর্যন্ত জীবিত থাকবে। মাতা-পুত্রের সম্পর্কের এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আধুনিক প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘কর্ণকুন্তীসংবাদ’ কাব্যনাট্যে।

কাব্যনাট্য ‘কর্ণকুন্তীসংবাদ’-এর কাহিনি গৃহীত হয়েছে মহাভারতের উদ্যোগপর্ব (১৪৫-১৪৬ অধ্যায়) থেকে। এই পর্বে কর্ণ কুন্তীর প্রস্তাবকে সমূলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন শুধু তাই নয়; যুদ্ধের ঠিক প্রাক্-মুহূর্তে কুন্তী কর্তৃক দলবদলের অন্যায্য অনুরোধকে অধার্মিক বলেও চিহ্নিত করেছিলেন। মাতা কুন্তীকে তাঁর পূর্ব কর্মের জন্য কটুভাষন করতেও কর্ণ ছাড়েননি—

“আপনার বাক্যে আমার শ্রদ্ধা নেই, আপনার অনুরোধও ধর্মসংগত মনে করি না। আপনি আমাকে ত্যাগ ক’রে ঘোর অন্যায্য করেছেন, তাতে আমার যশ ও কীর্তি নষ্ট হয়েছে। জন্মে ক্ষত্রিয় হ’লেও আপনার জন্য আমি ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার পাই নি, কোন শত্রু এর চেয়ে অধিক অপকার করতে পারে? আপনি যথাকালে আমাকে দয়া করেন নি, আজ কেবল নিজের হিতের জন্যই আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন।”<sup>১</sup>

কিন্তু ‘কর্ণকুন্তীসংবাদ’ কাব্যনাট্যে কর্ণ এত রুঢ়ভাষী নন। নিজ পরিচয় জানার পর আজীবন মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত কর্ণের স্নেহবুভুক্ষু হৃদয় উদ্বেল হয়েছে— “সত্য হোক, স্বপ্ন হোক, এসো স্নেহময়ী/তোমার দক্ষিণ হস্ত ললাটে চিবুকে/রাখো ক্ষণকাল।...”<sup>২</sup> একদিকে আজন্মবঞ্চিত মাতৃস্নেহের আকাঙ্ক্ষা; অন্যদিকে বন্ধুর প্রতি কর্তব্য এবং ন্যায্যপরায়ণতা— এই দ্বন্দ্ব কর্ণ চরিত্রটিকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। ‘বিদায় অভিশাপ’-এর কচের মতো কর্ণ শেষপর্যন্ত কর্তব্যকেই মান্যতা দিয়েছেন। তিনি মাতা কুন্তীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। পরাজয় নিশ্চিত জেনেও তিনি অসময়ের সুহৃদকে ত্যাগ করার কথা ভাবতে পারেননি। মহাকাব্যিক প্রেক্ষাপটে এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে একক মানুষের অস্তিত্বের সঙ্কট। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব নয়, সূতপুত্রের পরিচয়কেই তিনি শেষপর্যন্ত মান্যতা দিতে চেয়েছেন—

“মাতঃ, সূতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা,  
তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব।”<sup>৩</sup>

কৌরবদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনেও তিনি পক্ষ বদল করতে চাননি। ‘পাণ্ডব পাণ্ডব থাক্, কৌরব কৌরব—’<sup>৪</sup> নিঃসঙ্গ একাকীত্ব তাঁর স্বেচ্ছা নির্বাচন। স্বেচ্ছায় তিনি ঘোষণা করেছেন— ‘আমি রব নিষ্ফলের, হতাশের দলে’<sup>৫</sup>। কর্ণ এখানে মহাভারতের যুগ পেরিয়ে আধুনিক পৃথিবীর ব্যক্তিত্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল নিঃসঙ্গ মানুষের প্রতিভূ হয়ে উঠেছেন।

রবীন্দ্রভাবনায় কর্ণ চরিত্রে আরোপিত হয়েছে আধুনিক মানুষের অস্তিত্বের সংকট। তাঁর কাব্যনাট্যে নিজের মাতৃপরিচয় জানার জন্য কর্ণের আকুল আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে— “কহো মোরে/ জন্ম মোর বাঁধা আছে কী রহস্য-ডোরে/ তোমা সাথে হে অপরিচিতা!”<sup>৬</sup> অস্তিত্বের সংকটের এই মৌল স্বরূপটি সুবোধ ঘোষকে (১৯০৯-১৯৮০) ‘কৌন্তেয়’-এর মতো গল্প লেখার জন্য প্রাণিত করে থাকতে পারে। ‘কৌন্তেয়’ শব্দের অর্থ কুন্তীর পুত্র। এক্ষেত্রে গল্পের শিরোনামে কুন্তীর কানীন পুত্র কর্ণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সমগ্র গল্পে কোথাও সরাসরি মহাভারত প্রসঙ্গের উল্লেখ নেই। শুধু নামকরণের মাধ্যমে মহাভারতের চরিত্রটিকে নব ভাবনায় ব্যঞ্জিত করা হয়েছে।

গল্পের প্রধান চরিত্র মাধব দত্ত, বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে। জার্মানি থেকে ফিরে আসার পর কলকাতায় এক কারখানায় কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি করে। মাতা-পুত্রের নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব জীবনে হঠাৎ রাহুর মতো আবির্ভাব ঘটে মিস সুহাসিনী পলের। এই রহস্যময়ী বৃদ্ধা শহরের বাড়ি বাড়ি ঘুরে চ্যারিটির জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে, যা একপ্রকার ভিক্ষারই নামান্তর। সবাই যেখানে তাকে এক দু-আনা অর্থ সাহায্য করে, সেখানে মাধব দত্ত প্রথমবার তাঁকে আট আনা দিয়েছিল। দ্বিতীয়বার সেই বাড়িতে আবার গেলে মাধবের মা সুহাসিনীকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। চ্যারিটির টাকায় মদ কিনে খাবার কথা প্রকাশিত হয়ে গেলে লজ্জায়, অপমানে সুহাসিনী পল প্রতিশোধ নেবে বলে ঠিক করে। তার এই প্রতিশোধ গ্রহণের খেলায় মাধবকে ঘুঁটির মতো ব্যবহার করতে চায় ধূর্ত বৃদ্ধা। মাধবকে মিথ্যা পরিচয় জানায় যে, সে তারই কুমারী জীবনের সন্তান—

“সে যে আমার জীবনের প্রায় ত্রিশ বছর আগে একটা ভুল ভালোবাসার লজ্জা। সম্মানের ভয়ে আমার সন্তানকে চুপে চুপে অরফ্যানেজে পাঠিয়ে দিতে হয়েছিল।”<sup>৭</sup>

মূল মহাভারতেও কুন্তীর মুখে শোনা গেছিল যে কুমারী থাকাকালীন সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন বলেই তাঁকে পরিত্যাগ করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। মহাযুদ্ধের পূর্বরাতে কুন্তী কর্ণের কাছে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর জন্মপরিচয়। দু-টি ঘটনার পার্থক্য হল মহাভারতে কুন্তীর স্বীকারোক্তি ছিল সৎ। কিন্তু আলোচ্য গল্পে মাধব দত্তের মায়ের উপর প্রতিশোধস্পৃহা থেকে করা সুহাসিনী পলের উক্তি কোনো সত্যতা ছিল না। মাধব ঘোষ একপ্রকার নিশ্চিত যে অর্থের লোভেই মিস সুহাসিনী পল মিথ্যা গল্প ফেঁদেছে। কিন্তু তারপরেও দ্বিধাদীর্ঘ হয়েছে তার মন। সুহাসিনীর বলা কথাগুলো সে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারে না—

“বুড়ির গল্পটা যেন মাধবের শরীরের রক্তের মধ্যে গোপন কৌতুকের মতো সিরসির করছে। সেই ভুয়ো গল্পটা যেন ঠাট্টা করে বলছে, আহা, এখন এই প্রকাণ্ড কলকাতা শহরে কোন্ অলিগলির ভিতর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে মাধবের সত্যিকারের মা, বেচারী ঐ সুহাসিনী পল!”<sup>৮</sup>

কুন্তী এবং সুহাসিনী— দু-জনেই পুত্রের কাছে নিজের পরিচয় উন্মুক্ত করেছেন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। দু-ক্ষেত্রেই মায়ের স্বীকারোক্তিতে সন্তানের তথাকথিত নিস্তরঙ্গ জীবন বিস্ময়-বিপন্ন হয়েছে। ‘কর্ণকুন্তীসংবাদ’-এ কর্ণের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল আজন্ম না দেখা মায়ের প্রতি এক স্নেহবুভুক্ষু পুত্রের অমোঘ টান—

“পুরাতন সত্যসম

তব বাণী স্পর্শিতেছে মুগ্ধচিত্ত মম।

অস্ফুট শৈশবকাল যেন রে আমার,

যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার

আমারে ঘেরিছে আজি।”<sup>১৯</sup>

সুবোধ ঘোষের গল্পটিতে দেখা যায়, এন্টালি বাজারে হঠাৎ দেখা হওয়ার পরে মাধব সুহাসিনীর বাড়ি গিয়ে চা-পাউরটি খেতে রাজি হয়েছে। সেখানে সুহাসিনী পলের কেবিনের গর্তে “একটা শিশু-প্রাণের মতো ধুকপুক করে মাধবের ত্রিশ বছর বয়সের প্রাণ। চট জড়ানো বিছানার একটা নোংরা স্তূপ, তোবড়ানো একটা টিনের বাস্ক, আর একরাশ ছেঁড়া ছেঁড়া জামাকাপড়, ঘরের জিনিসগুলো যেন আবছা অন্ধকার জড়িয়ে পিণ্ড পিণ্ড মাংস আর নাড়ির মতো মাধবের প্রাণের চারদিক জুড়ে বেদনাভরা জন্মলোকের জঠর রচনা করে রেখেছে।”<sup>২০</sup> অস্তিত্ব সংকটের প্রশ্নে এভাবেই মহাভারতের কৌন্তেয়-এর সঙ্গে তাঁর গল্পের মাধব দত্তের অভিন্নতা কল্পনা করেছেন সুবোধ ঘোষ। কর্ণ শেষপর্যন্ত মাতৃ-আহ্বানে সাড়া দেননি। মাধব দত্ত সুহাসিনীর আচরণে সাময়িকভাবে বিমূঢ় হয়ে গেলেও শেষপর্যন্ত তাকে অস্বীকার করেছে।

কুমারী মাতার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে **সমরেশ বসুর (১৯২৪-১৯৮৮) ‘কুন্তী সংবাদ’** গল্পে। মহাভারতের কুন্তী লোকলজ্জার ভয়ে নিজের প্রথম সন্তানকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। এমনকি মৃত্যুর আগে তাঁর পরিচয় জনসমক্ষে প্রকাশও করেননি। কিন্তু বর্তমান গল্পের কুমারী মাতা ভিন্ন পথের পথিক। দেহাতি মেয়ে মুনিয়া অচেনা ব্যক্তির দ্বারা ধর্ষণের ফলে গর্ভবতী হয়ে পড়লে সন্তানের দায়িত্ব অস্বীকার করতে চায় না। তাকে নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে বিচার বসলে সে সরল, দ্বিধাহীন চিত্তে সেদিনের ঘটনার বিবরণ দিয়ে যায়। গ্রামের এক বৃদ্ধ বলে, মুনিয়ার অনাগত সন্তান দেবতার দান। তাই সকলেই তাকে সাদরে গ্রহণ করতে রাজি হয়ে যায়। এখানেই মহাভারতের কুন্তীর সঙ্গে ভিন্ন হয়ে যায় প্রান্তিক জনজাতির কুন্তীর আখ্যান।

মহাভারতের কুন্তীর পুত্র ছিল আক্ষরিক অর্থেই ‘দেবতার দান’। রাজকুমারী কুন্তীর সেবায় তুষ্ট হয়ে ঋষি দুর্বাসা তাঁকে যে বর দিয়েছিলেন, তারই ফলশ্রুতি হিসেবে সূর্যকে আহ্বান করে কুন্তী লাভ করেছিলেন কর্ণকে। মহাভারতের যুগে কানীন পুত্রের সামাজিক স্বীকৃতি থাকলেও কোনো এক অজানা আশঙ্কায় পুত্রকে নিজের কাছে রাখতে পারেননি কুন্তী। অথচ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে লেখা এই গল্পের মুনিয়া সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকে মহাভারতের কুন্তীর থেকে অনেক নিম্নস্তরে অবস্থান করলেও সন্তানকে ত্যাগ করার কথা ভাবেনি। আদিবাসী জনসমাজের নিজস্ব রীতিনীতি, বিশ্বাস ও সংস্কার মুনিয়াকে নিজের মাতৃধর্ম সঠিকভাবে পালন করতে সহায়তা করেছে। এখানে চরিত্র ও কাহিনিগত দিক থেকে সমরেশ বসুর ছোটোগল্পে মহাভারতের বিনির্মাণ ঘটে গেছে।

কর্ণ চরিত্রকে কেন্দ্র করে আধুনিক প্রেক্ষাপটে লেখা আরও দু-টি উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প হল **জ্যোতির্ময়ী দেবীর ‘কর্ণ-কুন্তী কথা’** [প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩৫৮] এবং **অমলেন্দু চক্রবর্তীর ‘অধিরথ সূতপুত্র’** [প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ১৯৬৪]। কথাসাহিত্যে কর্ণ চরিত্রের উল্লিখন ঘটেছে মূলত আত্মপরিচয়ের সংকটকে

প্রকটিত করতে। একজন তথাকথিত সফল এবং মহাবীর যোদ্ধার পূর্ণ অস্তিত্ব প্রশ্ৰুচিহ্নের মুখে পড়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে। উদ্যোগপর্বে শ্রীকৃষ্ণ এবং কুন্তীর কাছ থেকে কর্ণ জানতে পারেন তাঁর এতদিনের সূতপুত্রের পরিচয় মিথ্যা। এতদিন যে অর্জুনকে তিনি সবথেকে বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী বলে বিবেচনা করে এসেছেন, তিনি তাঁরই সহোদর অনুজ। কর্ণ কুন্তীর প্রস্তাবে শেষপর্যন্ত রাজি হননি ঠিকই, কিন্তু এতদিনের লালিত বিশ্বাসে আঘাত লাগায় মানসিকভাবে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। কর্ণ চরিত্রের এই মনস্তত্ত্ব নবভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে জ্যোতির্ময়ী দেবীর (১৮৯৬-১৯৮৮) ‘কর্ণ-কুন্তী কথা’ গল্পে।

‘গল্পভারতী’ পত্রিকার আশ্বিন ১৩৫৮ সংখ্যায় ‘কর্ণ-কুন্তী কথা’ প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্পে দেখা যায়, প্রথিতযশা ডাক্তার সুদেব সরকার হঠাৎই একদিন জানতে পারে তার আসল নাম সুদেব চক্রবর্তী, পিতা শশাঙ্কমোহন চক্রবর্তী। ছোটবেলা থেকে যাকে সে ‘কাকা’ বলে জেনে এসেছে; তিনি আসলে রক্তসম্পর্কে তার কেউ হন না। প্রায় সাতাশ বছর আগে শিশুপুত্রসহ সুদেবের বিধবা মাকে তিনি বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সুদেবের সমগ্র অস্তিত্ব এই ঘটনার পর একটা বিরাট প্রশ্ৰুচিহ্নের মুখোমুখি হয়। তার মা কোন্ পরিস্থিতিতে সংসার ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন; একথা জানার পরেও তার মন শান্ত হতে পারে না। সুদেবের মানসিক অবস্থা প্রকাশ করেছেন লেখক— ‘অসংখ্য নিঃশব্দ প্রশ্ন-উত্তরের যেন অদৃশ্য নীরব বিচারসভা বসেছিল ঘরে। কে বিচারকর্তা, সুদেব? কিসের বিচার? দয়া করার?’<sup>১১</sup>

মহাভারতে কর্ণের কাছে তাঁর প্রকৃত পরিচয় উন্মুক্ত করেছিলেন তাঁর মাতা। এখানে সুদেবের মায়ের অজ্ঞাতেই সেই দায়িত্ব পালন করেছেন তার তথাকথিত কাকা। তারপর থেকে কাকা ও মায়ের সম্পর্ককে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে সুদেব। তার মা কেন প্রকৃত পিতার পদবি ব্যবহার করার বদলে আশ্রয়দাতার পদবি ব্যবহার করেছিলেন, কাকা এতবছর ধরে কেন অবিবাহিত আছেন, তার মা এই সংসার ছেড়ে যাবার কথা কখনও ভাবেননি কেন— এই সব হাজার প্রশ্ন ভিড় করে আসে তার মাথায়। আর ক্রমশ মায়ের সঙ্গে হাজার যোজন মানসিক দূরত্ব তৈরি হয় ছেলের।

উচ্চশিক্ষিত সুদেব নিজেদের পুরাণ, ধর্ম, ইতিহাস থেকে নিজের সপক্ষে দৃষ্টান্ত খুঁজে সাবুনা পেতে চায়। ‘পুরাণের কথা ভাবে— কত কথা— ব্যাস-সত্যবতী, কর্ণ-কুন্তী, বৃহস্পতি-তারা, জবালা, অহল্যা।’<sup>১২</sup> এই যে পৌরাণিক নামগুলি পরপর ব্যবহার করেছেন লেখক, প্রত্যেকেই সামাজিকভাবে অস্বীকৃত কিছু সম্পর্কের দায়ভার বহন করে থাকেন। তবে সুদেবের পরিস্থিতি এঁদের থেকে কিছু ভিন্ন। সত্যবতী, কুন্তী দু-জনেই কুমারী মাতা। তবে পরাশর পুত্র ব্যাসের সঙ্গে তাঁর মা সত্যবতীর সম্পর্ক অনেক সহজ ও নির্ভার। পরিচয় গোপনের কোনো গ্লানি নেই সেখানে। অন্যদিকে কুন্তী ও কর্ণের সম্পর্ক প্রথমাধি গোপনীয়তার কালিমালিঙ্গ। মহাভারত নতুন করে বিশ্লেষিত হয়েছে সুদেবের ভাবনায়—

“মনে হয়, ব্যাস যেন সত্যবতীকে ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু কর্ণ কুন্তীকে সহ্য করেননি, ক্ষমাও করেননি, স্বীকারও করেননি। আর নিজের জীবনযাত্রাও স্বীকার করে নিতে পারেননি, মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আর কুন্তী? কুন্তী রাজ্য পাওয়া ছেলেদের কাছে থাকেননি। বনে গিয়েছিলেন। দাবানলে পুড়ে মরেছিলেন। সে দাবানল কি মনের? কর্ণের ধিক্কারের?”<sup>১৩</sup>

কুন্তী লোকলজ্জার ভয়ে বাধ্য হয়ে প্রথম পুত্রকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। অন্যদিকে সুদেবের মা লোকসমাজে জবাবদিহি এড়াতে সুদেবের পিতৃপরিচয় গোপন রেখেছেন। কর্ণ যেমন কোনোদিন মাকে ক্ষমা পর্ব-১, সংখ্যা-৩, জানুয়ারি, ২০২৫

করতে পারেননি বলেই ‘নিষ্ফলের, হতাশের দলে’ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; সুদেব তেমনই মা আর কাকার সংসার ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। কাকার মৃত্যুর পর দেশে ফিরে যথাবিধি কর্তব্য সম্পাদন করে সে মাকে কাশীবাসের ব্যবস্থা করে দেয়। এখানেই মহাভারতের কুন্তী-কর্ণের থেকে ভিন্ন হয়ে যায় সুদেব ও তার মায়ের আখ্যান। কুন্তী জন্মমুহূর্তেই পুত্রকে ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু সুদেবের মা শত প্রতিকূলতাতেও পুত্রকে ত্যাগ করেননি। আশ্রয়দাতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে সুদেব যে আশঙ্কা করেছিল, তাও সর্বের অমূলক। তারপরেও সুদেব তার মাকে ক্ষমা করতে পারেনি। অস্তিত্বের সংকট থেকে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে তার অভিমানাহত হৃদয় মাকে আঘাত করার পথ বেছে নিয়েছে।

কাশীতে নির্বাসিত সুদেবের মাকে আজীবন নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা বহন করতে হয়েছে। মৃত্যুর আগেও তিনি পুত্রের মুখ দর্শন করতে পারেন না। ছেলের পরিচয় গোপন রাখার জন্যই যেন তাঁর এই শাস্তিভোগ। মহাভারতেও দেখা যায়, কুন্তী দাবানলে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। কর্ণের মৃত্যুর পরে স্ত্রীপর্বে কুন্তী তাঁর বাকি পুত্রদের কাছে কর্ণের পরিচয় প্রকাশ করে তর্পণাদি করতে বলেছিলেন। আলোচ্য গল্পে সুদেব মায়ের মৃত্যুর পর কাশীতে শ্রাদ্ধ করার সময় পুরোহিতের কাছে প্রথমবার নিজের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করেছে। এভাবে মহাভারতের বিপরীত ছবি এঁকে লেখক তাঁর ‘কর্ণ-কুন্তী কথা’ গল্পে আলাদা ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন।

**অমলেন্দু চক্রবর্তী (১৯৩৪-২০০৯)** তাঁর ‘অধিরথ সূতপুত্র’ গল্পে দেশভাগের ফলে বাস্তুচ্যুত এক যুবকের অনিকেত সত্তার সঙ্গে একীভূত করে দিয়েছেন মহাভারতের কর্ণের শিকড়চ্যুত ভাবমূর্তিটিকে। দেশভাগ পরবর্তীকালে বিধবা মা ও দুই বোনকে নিয়ে সনাতন পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়। আন্দোলনে জর্জর কলকাতাকে দেখে তার মনে হয় ‘কুরুক্ষেত্র’। শুধুমাত্র জাতিগত পরিচয় ‘হিন্দু’ হবার সুবাদে সনাতনকে এতদিনের চেনা দেশমাতৃকার ওপর থেকে নিজের অধিকার ছেড়ে দিতে হয়েছিল, সঙ্গে জুটেছিল ‘রিফিউজি’ তকমা। সেই পরিস্থিতিতে সনাতনের মনে হয়েছিল, সে এক ‘কুলপরিচয়শূন্য জারজ সন্তান’<sup>১৪</sup>। এভাবে ‘অধিরথ সূতপুত্র’ গল্পে কর্ণ-কুন্তীর সম্পর্ক আরও বিস্তৃত আকাশ পেয়ে যুগগত ব্যাপ্তি লাভ করেছে। মহাভারতের কুমারী মাতা এবং তাঁর পরিত্যক্ত পুত্রের প্রতীকে উঠে এসেছে দেশমাতৃকা এবং তাঁর রিফিউজি সন্তানের আখ্যান।

প্রেমিকা নাজমাকে উদ্দেশ্য করে সনাতন নিজের উপলব্ধি প্রকাশ করেছে— “আজন্মকাল যাহাকে পরম বিশ্বাসে মাতা বলিয়া জানিয়াছি, আজ চিনিলাম— তিনিই আমার বিমাতা। অথচ নবলব্ধ স্বদেশ-গৃহে আমার জন্য কোনো আশ্রয় নির্ধারিত হয় নাই। প্রেম নাই, ভালোবাসা নাই, মনুষ্যত্ব নাই।”<sup>১৫</sup> ঠিক যেভাবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে কর্ণ জানতে পেরেছিলেন অধিরথ-পত্নী রাধা তাঁর মাতা নন। দুর্দিনের সুহৃদ দুর্ঘোষনকে ছেড়ে পাণ্ডবভ্রাতাদের পক্ষে যোগ দিতে মন সায় দেয়নি তাঁর। অথচ সমগ্র যুদ্ধের উদ্দেশ্যটাই একমুহূর্তে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল তাঁর কাছে।

আলোচ্য গল্পে অর্থের প্রয়োজনে সনাতন একটি ফার্মের বেআইনি কাজে অংশগ্রহণ করতে কোম্পানির অফিসে এসে উপস্থিত হয়। সেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি দেখে তার মনে হয়— ‘কুরুক্ষেত্র কলকাতার নিভূতে এক আলাদা জগৎ’, ঠিক যেন ‘দুর্ঘোষনের গোপন শিবির’<sup>১৬</sup>।

আজন্মলালিত ‘অধিরথ সূতপুত্র’-এর পরিচয় মিথ্যা বলে জানার পর কর্ণ আজীবন নিজের মাকে খুঁজে ফিরেছেন। এবং শেষপর্যন্ত চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুনের মাকে গর্ভধারিণী বলে জানার পর, তাঁর সমগ্র জীবনকেই ‘জয়হীন চেষ্টার সংগীত, আশাহীন কর্মের উদ্যম’<sup>৭</sup> মাত্র বলে মনে হয়েছে। সনাতনও ঘর হারিয়ে, দেশ হারিয়ে প্রকৃত জন্মভূমির সন্ধান করে ফিরেছে এবং ব্যর্থ হয়েছে। নিঃসঙ্গ কর্ণ কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে অর্জুনের থেকে মৃত্যুবাণ গ্রহণ করে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। অন্যদিকে অমলেন্দুর গল্পে সনাতন ট্রেনের তলায় মাথা রেখে আত্মহত্যা করেছে। অধ্যাপক প্রসূন ঘোষ আলোচ্য গল্প সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

“দেশভাগের পটভূমিতে লেখা ‘অধিরথ সূতপুত্র’ গল্পের মূল খীম প্রতিকূল পরিবেশে নিজ পরিচয় সন্ধান। সাতচল্লিশের দেশভাগের ফলে উৎসভূমি থেকে নিদারুণভাবে পরিত্যক্ত সনাতনের সংকটের বহুমাত্রিক দিককে চিহ্নিত করেছেন লেখক।”<sup>৮</sup>

এভাবে কর্ণ ও কুন্তী চরিত্রের দ্বন্দ্বিকতাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় জাতির কল্পসৃষ্টি মহাভারত যুগে যুগে নতুনভাবে চর্চিত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ও মতাদর্শ থেকে মহাভারত-চর্চা করায় কর্ণ চরিত্রের বিবর্তন ঘটে গেছে। আধুনিক যুগের কর্ণ কখনো দেশভাগের কারণে, কখনো মায়ের স্বার্থপরতার কারণে, আবার কখনো মিথ্যা পরিস্থিতির শিকার হয়ে অস্তিত্বের সংকটে ভুগেছে। একালের গল্পকারেরা বহু ছোটগল্পেই মহাভারতীয় মিথের প্রতীকী ব্যবহার করেছেন। ভীষ্ম, কুন্তী, দ্রৌপদী, কর্ণ, যুধিষ্ঠির প্রমুখ মহাভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলি থেকে উক্ত লেখকেরা ভাবনার রসদ সংগ্রহ করেছেন। তারপর নিজস্ব শৈলী ও জীবনবীক্ষার প্রয়োগে গড়ে তুলেছেন স্বতন্ত্র রচনা।

মহাভারতের সময় ও বর্তমান সময়কে মিলিয়ে দেওয়ায় এই সব ছোটগল্পে মহাভারতের অভিনব পাঠ গড়ে উঠেছে। ক্লাসিক সাহিত্যের পরিচিত ঘটনা বা চরিত্রের উল্লেখ পাঠকমননে সহজেই অভিঘাত সৃষ্টি হয়। দীর্ঘলালিত ঐতিহ্যসূত্রে মহাভারতের উত্তরাধিকার ভারতীয় তথা বাঙালি হিসেবে আমরা বহন করে নিয়ে চলেছি। সেই জাতীয় ঐতিহ্যের ফসল বলেই এই জাতীয় কথাসাহিত্যের সঙ্গে পাঠক সহজে একাত্মবোধ করতে পারে। বাঙালির মহাভারত-চর্চার ইতিহাসে আলোচ্য ছোটগল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

**তথ্যসূত্র:**

1. বসু, রাজশেখর, 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত সারানুবাদ', এমসরকার .সি . অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ,কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ, ১৪১৪, পৃ ৩৫২।
2. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'কর্ণকুন্তীসংবাদ', সঞ্চয়িতা, ইস্ট ইন্ডিয়া পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০০২, পৃ ৩১৩।
3. তদেব, পৃ ৩১৬।
4. তদেব, পৃ ৩১৬।
5. তদেব, পৃ ৩১৭।
6. তদেব, পৃ ৩১১।
7. ঘোষ, সুবোধ, 'কৌন্তেয়', গল্পসমগ্র ১, আনন্দ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০০৭, পৃ ৪১৮।
8. তদেব, পৃ ৪১৯।
9. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'কর্ণকুন্তীসংবাদ', প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৩।
10. ঘোষ, সুবোধ, 'কৌন্তেয়', গল্পসমগ্র ১, আনন্দ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০০৭, পৃ ৪২০।
11. দেবী, জ্যোতির্ময়ী, 'কর্ণ-কুন্তী কথা', জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন ৪, গৌরকিশোর ঘোষ সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর ২০২১, পৃ ৪১৫।
12. তদেব, পৃ ৪১৫।
13. তদেব, পৃ ৪১৬।
14. চক্রবর্তী, অমলেন্দু, 'অধিরথ সূতপুত্র', দাঙ্গা ও দেশভাগের গল্প, সুদিন চট্টোপাধ্যায় ও শচীন দাশ সম্পাদিত, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ ৩৩৩।
15. তদেব, পৃ ৩৩৩।
16. তদেব, পৃ ৩৩৫।
17. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'কর্ণকুন্তীসংবাদ', প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৭।
18. ঘোষ, প্রসূন, 'একালের ছোটগল্পে মহাভারত প্রসঙ্গ', কোরক সাহিত্য পত্রিকা, তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, শারদীয় ২০১৪, পৃ ২৬৩।





# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 762-771

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.066



## বাস্তবাত্মিকতার প্রেক্ষাপটে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’

শেখ ইমরান পারভেজ, সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ, গভঃ জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, কালনা-১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 09.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*Ecospirituality is the concept of understanding the interconnectedness of all living organisms on Earth and acknowledging their mutual dependence, while valuing their importance in maintaining ecological equilibrium. From the writings of thinkers like Thomas Berry, Dennis Edwards, etc., we can derive some principles of ecospirituality such as human-nature relationship, sanctity of nature, nature's mystery, nature's benevolence, man's sincere respect for nature's creations and its supervision, etc. Bibhutibhushan Bandyopadhyay is one of the greatest writers in modern Bengali literature. Bengali novel ‘Aranyak’ is considered as one of his best literary works. Here In this article, through literary analysis the present researcher has tried to explore this novel in the context of ecospirituality.*

**Keywords:** Ecospirituality, principles, Bibhutibhushan Bandyopadhyay, Aranyak, literary analysis.

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘আরণ্যক’ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বিভূতিভূষণ তাঁর বিহারের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে উপন্যাসটি রচনা করেন। কোলকাতার পাথুরিয়াঘাটার বাবু খেলাতচন্দ্র ঘোষের ভাগলপুর এস্টেটের সহকারী ম্যানেজার হিসাবে তিনি সেখানে যান এবং সেখানে থাকাকালীন ‘আরণ্যক’ লেখার পরিকল্পনা করেন।

‘আরণ্যক’ উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৩৭-৩৯ খ্রিষ্টাব্দ। ভাগলপুর অঞ্চলের ডিহি আজমাবাদ-ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাটা বইহারের দুর্গম অরণ্যে বসবাসকারী গাঙ্গোতা জাতিগোষ্ঠীর মানুষজন, দোষাদ, ছত্রী, চাম্বা-কলোয়ার, মৈথিল ব্রাহ্মণ, বাঙালি, রাজপুত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিচিত্র মানুষের জীবনকথা উঠে এসেছে এ উপন্যাসে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সত্যচরণ; তাঁর বন্ধু অবিনাশ ছিল ময়মনসিংহের কোনও এক জমিদারের ছেলে। বিহারের পূর্ণিয়া এলাকায় অবিনাশদের জমিদারি দেখভালের জন্য তাঁর এই অঞ্চলে আগমন। সত্যচরণ তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় কলকাতায় কাটিয়েছেন; বন্ধুবান্ধব, বই পড়া, খিয়েটারে যাওয়া, সিনেমা দেখা বা গান শোনা এসবই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম দিকে তিনি ‘জঙ্গল-মহাল’এ

থাকতে পছন্দ করেননি এবং ফিরে যেতে চেয়েছিলেন তাঁর চেনা নগরবাসে। আক্ষেপ করেছেন- ‘...চাকুরির কয়েকটি টাকার খাতিরে যেখানে আসিয়া পড়িলাম, এত নির্জন স্থানের কল্পনাও কোনদিন করি নাই। ...কতবার মনে হইল চাকুরিতে দরকার নাই, এখানে হাঁপাইয়া মরার চেয়ে, আধপেটা খাইয়া কলিকাতায় থাকা ভাল।’<sup>১</sup> তবে সময়ের সাথে সাথে অরণ্যের সুর তাঁকে ধীরে ধীরে আবিষ্ট করতে থাকে এবং এই যাপিত জীবনটাই তাঁর চেতনার অংশ হয়ে ওঠে; কলিকাতায় ফেরার মানসিক চাহিদা ফিকে হতে শুরু করে- ‘দিন যতই যাইতে লাগিল, জঙ্গলের মোহ ততই আমাকে ক্রমে পাইয়া বসিল। এর নির্জনতা ও অপরাহ্নের সিঁদুর-ছড়ানো বনঝাউয়ের জঙ্গলের কি আকর্ষণ আছে বলিতে পারি না- আজকাল ক্রমশ মনে হয় এই দিগন্তব্যাপী বিশাল বনপ্রান্তর ছাড়িয়া, ইহার রোদপোড়া মাটির তাজা সুগন্ধ এই স্বাধীনতা, এই মুক্তি ছাড়িয়া কলিকাতার গোলমালের মধ্যে আর ফিরিতে পারিব না।’<sup>২</sup> তিনি এখানে কিছুদিন থাকার পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু আদিগন্ত আকাশ এবং একা থাকার সৌন্দর্য তাঁকে সেখানে টেনে রাখে চুষকের মতো। ক্রমে তিনি আরও বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে জঙ্গল, বুনো তামারিস্ক, উন্মুক্ত আকাশ, জমির গন্ধ, এখানকার মানুষজন এবং সর্বোপরি শহরের কৃত্রিম জীবন থেকে মুক্তির নেশায়।

বাস্তুআধ্যাত্মিকতা হল একধরনের বিশ্বাস বা দৃষ্টিভঙ্গি যা মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যকার আধ্যাত্মিক আন্তঃসংযুক্ততার উপর জোর দেয়। এই বিশ্বাস বা দৃষ্টিভঙ্গিতে রয়েছে প্রকৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং প্রকৃতিকে পবিত্র বা ঐশ্বরিক হিসাবে দেখার প্রবণতা। বাস্তুআধ্যাত্মিকতার অস্তিত্ব বিভিন্ন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ বা অ-ধর্মীয় প্রেক্ষাপটেও পাওয়া যেতে পারে যেখানে প্রকৃতিকেই আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে মানা হয়। বর্তমান আলোচনায় বাস্তুআধ্যাত্মিকতার প্রেক্ষাপটে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যককে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

**মানব-প্রকৃতি সংযোগ:** মানুষ এবং প্রকৃতির ওতপ্রোত সম্পর্কে জড়িয়ে থাকার বিষয়টি আরণ্যক-এ তুলে ধরা হয়েছে, যা মূলত বাস্তুআধ্যাত্মিকতারই প্রতিফলন। সত্যচরণ জমি জরিপের কাজ করার সময় দেখতে পান কেমন করে সেখানকার মানুষ প্রকৃতির সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত। পুরুষ এবং মহিলারা অরণ্য থেকে তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু পান; গনু মাহাতো, রাজু পাঁড়ে, ভানুমতী, যুগলপ্রসাদ, ধাওতাল সাহু, রাজা দোবরু পান্না এবং অন্যান্য চরিত্ররা যেন জঙ্গলের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে। গনু মাহাতো সত্যচরণকে জানান- “ফাগুন মাসে জঙ্গলে গুড়মী ফল ফলে, লুন দিয়ে কাঁচা খেতে বেশ লাগে- লতানে গাছ, ছোট ছোট কাঁকুড়ের মত ফল হয়; সে সময় এক মাস এ অঞ্চলের যত গরীব লোক গুড়মী ফল খেয়ে কাটিয়ে দেয়।”<sup>৩</sup> উপন্যাসে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আসে এক সাধুর কথা, যিনি সত্যকে জানান- “পরমাত্মা আহাৰ জুটিয়ে দেন। বাঁশের কোঁড় সেদ্ধ খাই, বনে এক রকম কন্দ হয় তা ভারি মিষ্টি, লাল আলুর মত খেতে, তা খাই। পাকা আমলকী ও আতা এ-জঙ্গলে খুব পাওয়া যায়। আমলকী খুব খাই, রোজ আমলকী খেলে মানুষ হঠাৎ বুড়ো হয় না, যৌবন ধরে রাখা যায় বহু দিন।”<sup>৪</sup> ব্যতিক্রমী নন্দলাল ওঝা, রাসবিহারী সিংদের মতো মানুষকেও আমরা দেখতে পাই, যারা নিজেদের মুনাফার জন্য মানুষ এবং প্রকৃতি উভয়েরই ক্ষতি করতে পিছুপা হয়না। উপন্যাস এগোনোর সাথে সাথে আমরা দেখতে পাই মুখ্যচরিত্র সত্যচরণ তাঁর সমস্ত অনুভূতি দিয়ে বিশুদ্ধ রূপে প্রকৃতির প্রবল প্রেমিকে পরিণত হয়েছে। চাঁদনি রাতে বনভ্রমণ তাঁর ভালো লাগে। “সে কি জ্যোৎস্না! কি রূপ রাত্রির! নির্জন বালুর চরে, দীর্ঘ বনঝাউয়ের জঙ্গলের পাশের পথে জ্যোৎস্না যাহারা কখনো দেখে নাই, তাহারা বুঝিবে না এ জ্যোৎস্নার কি চেহারা! এমন উন্মুক্ত আকাশতলে ছায়াহীন উদাস গভীর

জ্যোৎস্নাভরা রাত্রিতে, বন-পাহাড়-প্রান্তরের পথের জ্যোৎস্না, বালুচরের জ্যোৎস্না- ক'জন দেখিয়াছে?'' জ্যোৎস্না যেন চন্দ্রাহত করে ফেলে তাঁকে, জ্যোৎস্নার প্রতি ভালোবাসা সত্যচরণকে আশ্চর্যে জড়িয়ে নেয়। নাড়া বইহারের জমি জরিপ, জমির বিলি বন্দোবস্ত করার জন্য সত্যকে অনেক ঘোরাঘুরি করতে হতো। সত্য জানাচ্ছেন এক খর রৌদ্র দুপুরে কাছারি ফেরার পথে ক্লান্ত হয়ে "...একটা গাছের ডালে ঘোড়া বাঁধিয়া নিবিড় ঝোপের তলায় একখানা অয়েলক্লথ পাতিয়া একেবারে শুইয়া পড়িলাম। ঘন ঝোপের ডালপালা চারিধার হইতে এমন ভাবে আমায় ঢাকিয়াছে যে বাহির হইতে আমায় কেউ দেখিতে পাইবে না। হাত-দুই উপরেই গাছপালা, মোটা মোটা কাঠের মত শক্ত গুঁড়িওয়ালা কি একপ্রকার বনলতা জড়াজড়ি করিয়া ছাদ রচনা করিয়াছে-একটা কি গাছ হইতে হাতখানেক লম্বা বড় বড় বনসিমের মত সবুজ সবুজ ফল আমার প্রায় বুকের কাছে দুলিতেছে।''<sup>৬</sup> এখানে ক্লান্ত পথিককে অরণ্য কেবল আশ্রয়ই দেয়নি, যেন মিশিয়ে নিয়েছে তার নিজের অস্তিত্বের সাথে। এখানে "প্রত্যেক বৃক্ষলতার হৃৎস্পন্দন যেন নিজের বুকের রক্তের শান্ত স্পন্দনের মধ্যে অনুভব করা যায়।"<sup>৭</sup>

লবটুলিয়ার উত্তর প্রান্তে সরস্বতী হৃদের বনভূমিকে সাজিয়ে তুলতে সত্যচরণ কলকাতা থেকে বিদেশী ফুলের বীজ এবং ডুয়ার্সের পাহাড় থেকে বন্য জুইয়ের লতা আনিয়া রোপণ করেন। এই বনভূমিতে বিচিত্র পাখিদের সমাগম নৈসর্গিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। সত্যর ভাষ্যে- "এত পাখীও আছে এখানকার বনে!...অনেক সময় মানুষকে গ্রাহ্যই করে না, আমি শুইয়া আছি দেখিতেছি, আমার চারিপাশে হাত-দেড়-দুই দূরে তারা ঝুলন্ত ডালপালায়-লতায় বসিয়া কিচ কিচ করিতেছে- আমার প্রতি ক্রক্ষেপও নাই।"<sup>৮</sup> অরণ্যে মানুষ এবং মনুষ্যের প্রাণ পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অরণ্যে অঞ্চল তাঁকে এমনই নিবিড় বন্ধনে যুক্ত করে যে জঙ্গল-মহালে তাঁর কাজ সমাপ্তির পর কলকাতা ফেরার পূর্বে মানসিক কষ্ট ও অনুতাপের বিষয়টি ফিরে ফিরে আসে।

**প্রকৃতি সচেতনতা এবং তত্ত্বাবধান:** প্রকৃতি সচেতনতা এবং তত্ত্বাবধানকে বাস্তুআধ্যাত্মিকতার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সত্যচরণের কাজ ছিল জঙ্গল-মহালের এর বিশ-ত্রিশ হাজার বিঘা জমির দেখভাল করা, সেখানে প্রজা বসিয়ে জমিদারি খাজনার জোগান মজবুত করা। অর্থাৎ বকলমে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল জঙ্গল নিধনের উদ্দেশ্যে। সত্যচরণ নিজেও বিষয়টি বুঝেছিলেন। একাজ তাঁকে করতে হলেও তাঁর সংবেদনশীল মন এর বিপ্রতীপ ছিল। "...মন খারাপ হইয়া গেল যখন বেশ বুঝিলাম নাড়া বইহারের এ বন আর বেশী দিন নয়। এত ভালবাসি ইহাকে অথচ আমার হাতেই ইহা বিনষ্ট হইল।...হে অরণ্য, হে সুপ্রাচীন, আমায় ক্ষমা করিও।"<sup>৯</sup> জঙ্গলের বৃকে তুলনামূলক নেতিবাচক শক্তি যেমন নন্দলাল বা রাসবিহারীর মতো মানুষদের কার্যকলাপও তাঁর পছন্দ হয়নি বলেই বোঝা যায়।

উপন্যাসে দেখতে পাই আর এক চরিত্র বয়োজ্যেষ্ঠ রাজু পাঁড়েকে। সত্যচরণ তাঁকে চাষ আবাদে জন্য জঙ্গল-মহালের এর দুই বিঘা জমি দেন। কিন্তু তাঁর ঈশ্বর আরাধনা এবং প্রকৃতি তন্ময়তায় অনেকটা সময় ব্যয় হয়। ফলত দেড় বছর সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও রাজু জঙ্গল পরিষ্কার করে ফসল ফলানোর উপযুক্ত করে তুলতে পারেন না। সত্যচরণের জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলেন- "...এখানে দা-কুড়ুল হাতে করলেই দেবতারা এসে হাত থেকে কেড়ে নেন - কানে চুপি চুপি এমন কথা বলেন, যাতে বিষয়-সম্পত্তি থেকে মন অনেক দূরে চলে যায়।"<sup>১০</sup> যদিও সত্যচরণ তাঁকে বৈষয়িক হওয়ার পরামর্শ দেন, তবে তিনি রাজুর উপর

ঠিক বিরক্ত হতে পারেন না; বরং মানুষটিকে তাঁর ভালোই লাগে। রাজুর কাছে তিনি মাঝে মাঝে যান। তাঁর জন্য আরও কিছু জমির বন্দোবস্ত করেন।

আর এক চরিত্র বনোয়ারীলালের আত্মীয় যুগলপ্রসাদ। এই মানুষটির জীবনে অভাব অনটন রয়েছে, সাংসারিক দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতা রয়েছে; তবুও এসব কিছু পুষ্পপ্রেমী মানুষটির ভবঘুরেপনাকে রুখতে পারেনি। সত্যচরণ তাঁর জন্য আজমাবাদ কাছারিতে মুহুরীর চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। যুগল তাঁর স্বভাবের কারণে আত্মীয় বনোয়ারীলালের কাছেও কিছুটা ব্রাত্য, অথচ সেই ভবঘুরে প্রকৃতিপ্রেমিক মানুষটিই সত্যচরণের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। তাঁর সম্পর্কে সত্যর বিশ্লেষণ-“... নিছক সৌন্দর্যের এমন পূজারীই বা কটা দেখিয়াছি? বনে বনে ভাল ফুল ও লতার বীজ ছড়াইয়া তাহার কোন স্বার্থ নাই, এক পয়সা আয় নাই, নিজে সে নিতান্তই গরিব, অথচ শুধু বনের সৌন্দর্য-সম্পদ বাড়াইবার চেষ্টায় তার এ অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্বেগ।”<sup>১১</sup> সত্য তাঁকে সাথে নিয়ে বনভূমিকে সাজিয়ে তোলার কথা ভাবতে থাকেন- “আমি তাকে সাহায্য করিতে মনে মনে সংকল্প করিলাম। দুজনে মিলিয়া এ বনকে নানা নতুন বনের ফুলে, লতায়, গাছে সাজাইব...”<sup>১২</sup>

সত্যচরণের সাক্ষাৎ হয়েছে সাঁওতাল রাজা দোবরু পান্না বীরবদীর সাথে। দরিদ্র রাজার আতিথ্য তিনি গ্রহণ করেছেন। সত্যকে রাজা দেখিয়েছেন নিজের পূর্বপুরুষদের বাসস্থান- পাহাড়ের উপর দিকে এক প্রাকৃতিক গুহা। পাহাড়ের মাথায় বটগাছতলায় রয়েছে রাজা দোবরুর বংশের সমাধিস্থান। এই বৃদ্ধ রাজা যেন একাধারে তাঁর প্রাচীন রাজবংশ এবং প্রাচীন অরণ্যের প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজা দোবরুর কথায় উঠে এসেছে এই জঙ্গলের বন্য মহিষদের রক্ষাকর্তা দেবতা টাঁড়বারোর আখ্যান- “...টাঁড়বারো বড় জাগ্রত দেবতা। তিনি না থাকলে শিকারীরা চামড়া আর শিঙের লোভে বুনো মহিষের বংশ নির্বংশ করে ছেড়ে দিত। উনি রক্ষা করেন। ফাঁদে পড়বার মুখে তিনি মহিষের দলের সামনে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বাধা দেন- কত লোক দেখেছে।”<sup>১৩</sup>

নিতান্ত চাকরির কারণেই সত্যকে জঙ্গল-মহালের বেশির ভাগ জমি প্রজাবিলি করে দিতে হয়। তবুও সরস্বতী কুঞ্জীর পাড়ের বনভূমিটা অন্তত এই বিলি বন্দোবস্তের বাইরে রাখার চেষ্টা করেন। আক্ষেপ ঝরে পড়ে সত্যচরণের-“তবে কতদিন আর রাখিতে পারিব? সদর আপিস হইতে মাঝে মাঝে চিঠি আসিতেছে, সরস্বতী কুঞ্জীর জমি আমি কেন বিলি করিতে বিলম্ব করিতেছি? নানা ওজর-আপত্তি তুলিয়া এখনও পর্যন্ত রাখিয়াছি বটে, কিন্তু বেশি দিন পারিব না...এই জন্মান্তর মানুষের দেশে একজন যুগলপ্রসাদ কি করিয়া জন্মিয়াছিল জানি না- শুধু তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া আজও সরস্বতী হৃদের তীরবর্তী বনানী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি।”<sup>১৪</sup>

**প্রকৃতির কোলে আঞ্চলিক উৎসব:** ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যেকোনো যেকোনো মানুষসমাজে উৎসবের এক আলাদা গুরুত্ব থাকে। আরণ্যকের বিভিন্ন গোষ্ঠীজীবনও এর ব্যতিক্রম নয়। সে কাছারির পুণ্যাহ উৎসবই হোক কিংবা গ্রামের হোলির মেলা বা রাজা দোবরু পান্নার গ্রামের কুলন উৎসব, অরণ্যকেন্দ্রিক এই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জনপদে বিভিন্ন সময়ে এসেছে উৎসবের প্রসঙ্গ। উপন্যাসে প্রথম যে উৎসবটির প্রসঙ্গ আমরা পাই, সেটি আষাঢ় মাসে কাছারির পুণ্যাহ উৎসব। সত্যর ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়। গনোরাী তেওয়ারী দূর-দূরান্তের বস্তির লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে আসেন। “পুণ্যাহের পূর্বদিন হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিয়াছিল, পুণ্যাহের দিন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। এদিকে দুপুর পর্ব-১, সংখ্যা-৩, জানুয়ারি, ২০২৫

হইতে না হইতে দলে দলে লোক নিমন্ত্রণ খাওয়ার লোভে ধারাবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া কাছারিতে পৌঁছিতে লাগিল, এমন মুষ্কিল যে, তাহাদের বসিবার জায়গা দিতে পারা যায় না।<sup>১৬</sup> এই প্রবল বর্ষণের মধ্যে অনেক বিয় অতিক্রম করে পুণ্যাহ উৎসব শেষ হল।

এরপর শীত শেষে বসন্তে আসে হোলির প্রসঙ্গ। সদর কাছারি থেকে চোদ্দ-পনের ক্রোশ দূরে এক গ্রাম্য মেলায় সত্যচরণ উপস্থিত হন। "...ছোট্ট একটা গ্রামের মাঠে, পাহাড়ের ঢালুতে চারিদিকে শাল-পলাশের বনের মধ্যে এই মেলা বসিয়াছে। মহিষারডি, কড়ারী-তিনটাঙা, লছমনিয়াটোলা, ভীমদাসটোলা, মহালিখারুপ প্রভৃতি দূরের নিকটের নানাস্থান হইতে লোকজন, প্রধানত মেয়েরা আসিয়াছে। তরুণী বন্য মেয়েরা আসিয়াছে চুলে পিয়াল ফুল কি রাঙা ধাতুপ-ফুল গুঁজিয়া; কারো কারো মাথায় বাঁকা খোঁপায় কাঠের চিরনি আটকানো...।"<sup>১৭</sup>

অকৃত্রিম প্রকৃতির বুকে এই মেলায় ঘুরতে আসা নারীদেরকে বসন্তের রাঙা বনভূমি নিজের মরসুমি উপকরণে সাজিয়ে তুলেছে। "মেলার স্থান হইতে কিছুদূরে একটা শালবনের ছায়ায় অনেক লোক রাখিয়া খাইতেছে- ইহাদের জন্য মেলার এক অংশে তারিতরকারীর বাজার বসিয়াছে, কাঁচা শালপাতার ঠোঙায় গুঁটকি কুচো চিংড়ী ও নালসে পিঁপড়ের ডিম বিক্রয় হইতেছে। লাল পিঁপড়ের ডিম এখানকার একটি প্রিয় সুখাদ্য। তা ছাড়া আছে কাঁচা পেপে, শুকনো কুল, কেঁদ-ফল, পেয়ারা ও বুনো শিম।"<sup>১৮</sup> খাদ্যের জোগান দিয়ে মেলায় আসা দরিদ্র মানুষগুলোর পেটের খিদে মেটাচ্ছে এখানকার প্রকৃতিই।

ফসল কাটা হয়ে গেলে ফুলকিয়া বইহারে একটা অস্থায়ী মেলা বসে। "সরিষার গাছ শুকাইয়া মাড়িয়া বীজ বাহির করিবার সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে দলে দলে নানা শ্রেণীর লোক আসিয়া জুটিতে লাগিল।... এসময় সকলেরই দু-পয়সা রোজগারের সময় এসব অঞ্চলে।"<sup>১৯</sup> প্রকৃতির সহায়তায়, মেলাকেন্দ্রিক মানুষজনের অস্থায়ী বাসস্থানও গড়ে উঠেছে এই জঙ্গল এলাকায়। "কত নূতন খুপরি, কাশের লম্বা চালাঘর চারিদিকে রাতারাতি উঠিয়া গেল। ঘর তুলিতে এখানে কোন খরচ নাই, জঙ্গলে আছে কাশ ও বনঝাউ কি কেঁদ-গাছের গুঁড়ি ও ডাল। শুকনো কাশের ডাঁটার খোলা পাকাইয়া এদেশে একরকম ভারি শক্ত রশি তৈরি করে...।"<sup>২০</sup>

শ্রাবণ মাসে রাজা দোবরু পান্না সত্যচরণকে ঝুলন উৎসবের নিমন্ত্রণ করেন। রাজার বংশে বহুদিন ধরে এই উৎসবটি চলে আসছে। নিমন্ত্রণ রক্ষায় রাজা দোবরুর রাজধানী চকমকিটোলায় পৌঁছালে সেখানে পরিচ্ছন্ন খড়ের ঘরে অতিথিদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হয়। সত্যর কথায়- "গভীর রাতে চতুর্দশীর জ্যোৎস্না বনের বড় বড় গাছপালার আড়ালে উঠিয়া যখন সেই বন্য গ্রামের গৃহস্থবাড়ির প্রাঙ্গণে আলো-আঁধারের জাল বুনিয়াছে, তখন শুনলাম রাজবাড়িতে বহু নারীকণ্ঠের সম্মিলিত এক অদ্ভুত ধরনের গান। কাল ঝুলন-পূর্ণিমা, রাজবাড়িতে নবাগত কুটুম্বিনী ও রাজকন্যার সহচরীগণ কল্যকার নাচগানের মহলা দিতেছে। সারারাত ধরিয়া তাহাদের গান ও মাদল বাজনা থামিল না।"<sup>২১</sup> পরদিন ঝুলন উৎসবে সন্ধ্যার আগে সত্যচরণ তাঁর সাথীদের নিয়ে একদল তরুণ তরুণীকে অনুসরণ করে পাহাড়ের দিকে যাত্রা করেন। সত্যর বর্ণনায়, সেখানে "আমরা একপাশে তালপাতার চেটাই পাতিয়া বসিলাম, আর সেই পূর্ণিমার জ্যোৎস্না প্লাবিত বনান্তহলীতে প্রায় ত্রিশটি কিশোরী তরুণী গাছটাকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল- পাশে পাশে মাদল বাজাইয়া একদল যুবক তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। ভানুমতীকে দেখিলাম এই দলের পুরোভাগে। মেয়েদের খোঁপায় ফুলের মালা, গায়ে ফুলের গহনা। কত রাত পর্যন্ত সমানভাবে নাচ ও গান চলিল-মাঝে মাঝে দলটি একটু বিশ্রাম পর্ব-১, সংখ্যা-৩, জানুয়ারি, ২০২৫

করিয়া লয়, আবার আরম্ভ করে- মাদলের বোল, জ্যেৎস্না, বর্ষান্নিক বনভূমি, সুঠাম শ্যামা নৃত্যপরায়ণা তরুণীর দল- সব মিলিয়া কোনো বড় শিল্পীর অঙ্কিত একখানি ছবির মত তা সুশ্রী- একটি মধুর সঙ্গীতের মত তার আকুল আবেদন।<sup>২১</sup> অপূর্ব এই অনুষ্ঠান উপভোগ করে অনেক রাতের দিকে সত্যচরণ ও তাঁর সঙ্গীরা পাহাড় থেকে নেমে আসেন। প্রকৃতির কোলে এইসব উৎসবের বর্ণনা মরমী পাঠকের চেতনা ছুঁয়ে যায়। প্রকৃতি এবং উৎসব যে একই সুতোয় বাঁধা- পাঠকের মধ্যে সেই উপলব্ধিবোধ তৈরি হয়।

**অরণ্যের অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলী:** স্থানীয় মানুষজনের কাছে এই অরণ্য কেবলমাত্র গাছপালা, পশুপাখি ইত্যাদির সমাহার নয়; অরণ্য বিভিন্ন অতিপ্রাকৃত রহস্যের আধারও বটে। বোমাইবুরুর জঙ্গলে জরিপ চলছিল। সেকারণে আমীন রামচন্দ্র সিং এবং পেয়াদা আশরফি টিঙেল সেখানে ফাঁকা মাঠের মধ্যে ছোটো দুটো কুঁড়েঘরে কিছুদিন ধরে থাকছিলেন। সেখানে এক রহস্যময় জীব গভীর রাতে আমীনের ঘরে প্রবেশ করতে শুরু করে। আমীন দেখেন সেটি একটি সাদা কুকুর আর আশরফির চোখে সে এক নারী। রামচন্দ্র সিংয়ের অসুস্থতার খবর শোনার পর সত্যচরণ সেখানে উপস্থিত হলে আশরফি টিঙেল সমস্ত ঘটনা তাঁকে বলেন। আশরফির বিশ্বাস সেই রহস্যময় জীব আর কেউ বরং নির্জন জঙ্গলের একধরণের জীনপরী 'ডামবাণু' যারা মানুষকে মেরে ফেলে। এর কিছুদিন পর রামচন্দ্র সিং প্রায় উন্মাদ হতে শুরু করেন, ডাক্তার দেখিয়েও কোনো উন্নতি হয়না; শেষ পর্যন্ত তাঁর দাদা তাঁকে নিয়ে চলে যান। এই বোমাইবুরুর জঙ্গলে পরবর্তী সময়ে একই রকম রহস্যময় ঘটনার সম্মুখীন হন মহিষ চরাতে আসা এক বৃদ্ধ এবং তাঁর যুবক পুত্র। তবে এক্ষেত্রে পরিণতি আরও মর্মান্তিক হয়। যুবকটি শেষপর্যন্ত মারা যান।

সত্যচরণের প্রিয় সরস্বতী কুণ্ডিকে কেন্দ্র করেও উঠে এসেছে রহস্য কাহিনি। আমীন রঘুবর প্রসাদ সত্যকে জানান- “হুজুর, ও মায়ার কুণ্ডী, ওখানে রাতে ছরী-পরীরা নামে; জ্যেৎস্নারাত্রে তারা কাপড় খুলে রাখে ডাঙায় ঐসব পাথরের ওপর, রেখে জলে নামে। সে-সময় যে তাদের দেখতে পায়, তাকে ভুলিয়ে জলে নামিয়ে ডুবিয়ে মারে। জ্যেৎস্নার মধ্যে দেখা যায় মাঝে মাঝে পরীদের মুখ জলের উপরে পদ্মফুলের মত জেগে আছে। আমি দেখি নি কখনও, হেড সার্ভেয়ার ফতে সিং একদিন দেখেছিলেন। একদিন তারপর তিনি গভীর রাতে একা ওই হুদের ধারে বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন সার্ভে-তাঁবুতে- পরদিন সকালে তাঁর লাস কুন্ডীর জলে ভাসতে দেখা যায়। বড় মাছে তাঁর একটা কান খেয়ে ফেলেছিল।...”<sup>২২</sup>

গনু মাহাতো, রাজা দোবরু পান্না, এবং দশরথ ঝাঙাওয়াল কথায় ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে উঠে এসেছে বন্য মহিষের দেবতা টাঁড়বারোর প্রসঙ্গ। তবে এক্ষেত্রে সত্যচরণকে দশরথ ঝাঙাওয়ালা শুনিয়েছেন তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা- “...এখনও ভাবলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। গহিন রাতে আমরা নিকটেই একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি, বুনো মহিষের দলের পায়ের শব্দ শুনলাম, তারা এদিকে আসছে। ক্রমে তারা খুব কাছে এল, গর্ত থেকে পঞ্চাশ হাতের মধ্যে। হঠাৎ দেখি গর্তের ধারে, গর্তের দশ হাত দূরে এক দীর্ঘাকৃতি কালোমত পুরুষ নিঃশব্দে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এত লম্বা সে-মূর্তি, যেন মনে হল বাঁশঝাড়ের আগায় ঠেকেছে। বুনো মহিষের দল তাকে দেখে থম্কে দাঁড়িয়ে গেল, তারপর ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক পালাল, ফাঁদের ত্রিসীমানাতে এল না একটাও। বিশ্বাস করুন আর না করুন, নিজের চোখে দেখা।”<sup>২৩</sup> গনু মাহাতোর কাছে সত্য শুনেছেন উড়ুকু সাপ, জীবন্ত পাথর, আঁতুড় ছেলের হাঁটা সহ আরও অদ্ভুত সব কাহিনি।

বোমাইবুরুর জঙ্গলের ঘটনা, সরস্বতী কুণ্ডীর রহস্য কাহিনি, কিংবা দশরথ ঝাঙাওয়ালার দেবতা টাঁড়বারো দর্শনের গল্প একদিকে পাঠককে আছন্ন করে রাখে। অন্যদিকে তেমনই অরণ্যের বুকে সৃষ্ট, মানুষের ইহজাগতিক বোধের অতীত এইসমস্ত কাহিনি বাস্তুআধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রকে অনেকাংশে মজবুত করে।

**প্রকৃতির পবিত্র বিগ্ধ সত্তা:** উপন্যাসে বিভিন্ন সময়ে ঘুরেফিরে এসেছে জঙ্গল-মহালের বিস্তীর্ণ ফাঁকা প্রান্তর ও বনভূমিতে নিশ্চিন্তি রাতের শোভা এবং জ্যোৎস্নার সৌন্দর্যের প্রসঙ্গ। সত্যচরণের ভাষায়- “দিকচক্রবালে দীর্ঘ নীলরেখার মত পরিদৃশ্যমান এই পাহাড় ও বন দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায় কত স্বপ্ন আনে মনে। একে তো এদিকের সারা অঞ্চলটাই আজকাল আমার কাছে পরীর দেশ বলিয়া মনে হয়, এর জ্যোৎস্না, এর বন-বনানী, এর নির্জনতা, এর নীরব রহস্য, এর সৌন্দর্য, এর মানুষজন, পাখীর ডাক, বন্য ফুলশোভা- সবই মনে হয় অদ্ভুত, মনে এমন এক গভীর শান্তি ও আনন্দ আনিয়া দেয়, জীবনে যাহা কোথাও কখনও পাই নাই।”<sup>২৪</sup> দোল-পূর্ণিমার রাতে সত্য প্রথমবার ফুলকিয়া বইহারের জ্যোৎস্না চাক্ষুষ করেন- “ফুলকিয়ার সে জ্যোৎস্না-রাত্রির বর্ণনা দিবার চেষ্টা করিব না, সেরূপ সৌন্দর্যলোকের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় যতদিন না হয় ততদিন শুধু কানে শুনিয়া বা লেখা পড়িয়া তাহা উপলব্ধি করা যাইবে না- করা সম্ভব নয়। অমন মুক্ত আকাশ, অমন নিস্তরঙ্গতা, অমন নির্জনতা, অমন দিগ্দিগন্ত-বিসর্পিত বনানীর মধ্যেই শুধু অমনতর রূপলোক ফুটিয়া উঠে। জীবনে একবারও সে জ্যোৎস্নারাত্রি দেখা উচিত; যে না দেখিয়াছে, ভগবানের সৃষ্টির একটি অপূর্ব রূপ তাহার নিকট চির-অপরিচিত রহিয়া গেল।”<sup>২৫</sup> বিস্তীর্ণ প্রায়-উন্মুক্ত প্রান্তরের বুকে সেই জ্যোৎস্নার কোনো ছায়া নেই। সেই জ্যোৎস্নালোকিত ফুলকিয়া বইহারকে অজানা পরীরাজ্য বলে মনে হয়, মানুষ যেন সেখানে অনধিকার প্রবেশকারী মাত্র। এক বসন্তে গ্রাম্য হোলির মেলা থেকে কাছারি ফেরার জন্য সকলের বারণ উপেক্ষা করে, পথের বিপদের ঝুঁকিকে অগ্রাহ্য করে ঘোড়ায় চেপে পড়ন্ত বেলায় সত্যচরণ রওনা দেন কেবলমাত্র জ্যোৎস্নারাতে বন পাহাড়ের রূপসুধা পানের বাসনায়। উপভোগ করেন সেই একাকী যাত্রা- “জ্যোৎস্না আরও ফুটিয়াছে, নক্ষত্রদল জ্যোৎস্নালোকে প্রায় অদৃশ্য, চারিধারে চাহিয়া মনে হয় এ সে পৃথিবী নয় এতদিন যাহাকে জানিতাম, এ স্বপ্নভূমি, এই দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নায় অপার্থিব জীবেরা এখানে নামে গভীর রাত্রি, তারা তপস্যার বস্ত্র, কল্পনা ও স্বপ্নের বস্ত্র, বনের ফুল যারা ভালবাসে না, সুন্দরকে চেনে না, দিগ্বলয়রেখা যাদের কখনও হাতছানি দিয়া ডাকে নাই, তাদের কাছে এ পৃথিবী ধরা দেয় না কোন কালেই।”<sup>২৬</sup> আর একবার তাঁকে জমিদারি মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাজে পূর্ণিয়া যেতে হয়। সেখানে কাজ মিটে যাওয়ার পরেও ফেরার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে দেরিতে যাত্রা শুরু করেন সেই জ্যোৎস্নায় রাত্রিভ্রমণ উপভোগের উদ্দেশ্যে। “...চাঁদ একটু দেরিতে উঠিলেও ভোর পর্যন্ত জ্যোৎস্না পাওয়া গেল। আর কী সে জ্যোৎস্না! কৃষ্ণপক্ষের স্তিমিতালোক চন্দ্রের জ্যোৎস্না বনে-পাহাড়ে যেন এক শান্ত, স্নিগ্ধ, অথচ এক আশ্চর্য রূপে অপরিচিত স্বপ্নজগতের রচনা করিয়াছে- সেই খাটো খাটো কাশ-জঙ্গল, সেই পাহাড়ের সানুদেশে পীতবর্ণ গোলগোলি ফুল, সেই উঁচু-নিচু পথ- সব মিলিয়ে যেন কোন্ বহুদূরের নক্ষত্রলোক- মৃত্যুর পরে অজানা কোন্ অদৃশ্য লোকে অশরীরী হইয়া উড়িয়া চলিয়াছি- ভগবান বুদ্ধের সেই নির্বাণলোকে, যেখানে চন্দ্রের উদয় হয় না, অথচ অন্ধকারও নাই।”<sup>২৭</sup> রাসপূর্ণিমার দিন তিনি লবটুলিয়া কাছারি থেকে একা ঘোড়ায় চড়ে জ্যোৎস্নালোকিত সরস্বতী কুণ্ডীর শোভা দেখতে আসেন। সত্যর উপলব্ধি- “...সেদিন আমার সত্যই মনে হইয়াছিল এখানে মায়াবিনী বনদেবীরা গভীর রাত্রি জ্যোৎস্নান্নাত হৃদের জলে জলকেলি করিতে নামে।...পরিপূর্ণ, ছায়াহীন, জলের উপর পড়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালয় প্রতিফলিত হওয়া অপার্থিব

দেবলোকের জ্যোৎস্না...ভোমরা লতার সাদা-ফুলে-ছাওয়া বড় বড় বনস্পতিশীর্ষে জ্যোৎস্না পড়িয়া মনে হইতেছে গাছে গাছে পরীদের শুভ্র বস্ত্র উড়িতেছে...।<sup>২৮</sup> অন্য এক রাতে নাচা বইহারের জঙ্গল দিয়ে একা কাছারি ফেরার সময় মনে হয়- “যেন এই নিস্তন্ধ, নির্জন রাতে দেবতারা নক্ষত্ররাজির মধ্যে সৃষ্টির কল্পনায় বিভোর, যে কল্পনায় দূর ভবিষ্যতে নব নব বিশ্বের আবির্ভাব, নব নব সৌন্দর্যের জন্ম, নানা নব প্রাণের বিকাশ বীজরূপে নিহিত।”<sup>২৯</sup>

এখানে পূর্বেই উল্লেখিত গ্রাম্য হোলির মেলার যাওয়ার সময় খর দুপুর তার এক অনন্য রূপে সত্যর নিকট প্রতিভাত হয়- “...অপরাহ্নের ছায়া নাই, রাত্রির জ্যোৎস্নালোক নাই- কিন্তু সেই নিস্তন্ধ খররৌদ্র-মধ্যাহ্নে বাঁ-দিকে বনাবৃত দীর্ঘ শৈলমালা, দক্ষিণে লৌহপ্রস্তর ও পাইয়োরাইট ছড়ানো উঁচু-নীচু জমিতে শুধুই শুভ্রকাণ্ড গোলগোলি ফুলের গাছ ও রাঙা ধাতুপফুলের জঙ্গল। সেই জায়গাটা সত্যিই একেবারে অদ্ভুত; অমন রক্ষ অথচ সুন্দর, পুষ্পাকীর্ণ অথচ উদ্দাম ও অতিমাত্রায় বন্য ভূমিশ্রী দেখিই নাই কখনও জীবনে। আর তার উপর ঠিক দুপুরের খাঁ-খাঁ রৌদ্র। মাথার উপরের আকাশ কি ঘন নীল! আকাশে কোথাও একটা পাখী নাই, শূন্য- মাটিতে বন্য-প্রকৃতির বুকো কোথাও একটা মানুষ বা জীবজন্তু নাই- নিঃশব্দ, ভয়ানক নিরাল।”<sup>৩০</sup> এই খর রৌদ্রের সৌন্দর্য দেখে ভাববিহ্বল সত্যর মনে হয়েছে দেশের মধ্যে এমন জায়গা থাকা কল্পনাতীত। সত্য দেখেছেন সামান্য জংলী কাঁটার ফুল কেমন বসন্তের শোভা বৃদ্ধি করেছে। অরণ্যের বসন্ত দেখে মনে হয়েছে- “কি ধ্যানস্তিমিত, উদাসীন, বিলাসহীন, সন্ন্যাসীর মত রক্ষ বেশ তার, অথচ কি বিরীটা!”<sup>৩১</sup>

উপন্যাসে এসেছে মহালিখারূপের পাহাড়ের কথা। সেখানে বনের মধ্যে ঝরণার শব্দ সেই পাহাড় ঘেরা বনানীর নির্জনতাকেই বৃদ্ধি করেছে। যুগের পর যুগ ধরে এই বন পাহাড় একই রূপে রয়েছে। সত্যচরণের কথায়- “মহালিখারূপের পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া নিম্নের সমতলভূমির দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয় প্রাচীন যুগের মহাসমুদ্র একসময়ে এই বালুকাময় উচ্চ তটভূমির গায়ে আছড়াইয়া পড়িত, গুহাবাসী মানব তখন ভবিষ্যতের গর্ভে নিদ্রিত এবং মহালিখারূপের পাহাড় তখন সেই সুপ্রাচীন মহাসাগরের বালুকাময় বেলাভূমি।”<sup>৩২</sup>

সন্ধ্যায় এই উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে সত্যচরণের বারংবার মনে হতো অরণ্যের এইসব মানুষ পশুপাখি উদ্ভিদ জলাশয় পাহাড় ইত্যাদি কোনো এক দেবতার কল্পনার মহৎ প্রকাশ। “সে দেবতাকে ভয় করিবার কিছুই নাই- এই সুবিশাল ফুলকিয়া বইহারের চেয়েও, ঐ বিশাল মেঘভরা আকাশের চেয়েও সীমাহীন, অনন্ত তাঁর প্রেম ও আশীর্বাদ।”<sup>৩৩</sup> এইভাবেই সমগ্র উপন্যাস জুড়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে প্রকৃতির পবিত্র বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক সত্তাটি ফুটে উঠেছে।

**উপসংহার:** অতীন্দ্রিয়বাদী চিন্তাবিদ এমারসন বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতিতে নিজেকে নিমজ্জিত করার মাধ্যমে মানুষ মহাবিশ্ব এবং নিজের অবস্থান সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি অর্জন করতে পারে। এমারসন সমস্ত অস্তিত্বের আন্তঃসম্পর্কের উপর জোর দিয়েছিলেন; যুক্তি দিয়েছিলেন যে ব্যক্তিমানুষ একটি বৃহত্তর সত্তার অংশ। বিংশ শতকের চিন্তাবিদ থমাস বেরীর বিভিন্ন বক্তৃতা এবং লেখায় উঠে এসেছে মানুষ এবং প্রকৃতির আধ্যাত্মিক সম্পর্কের প্রসঙ্গ। তবে তাঁরও পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন লেখায় এই বাস্তুআধ্যাত্মিকতাকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। বাস্তুআধ্যাত্মিকতার নির্দিষ্ট কতগুলো বাঁধাধরা নীতি আছে এমন নয়, প্রকৃতির মধ্যে আধ্যাত্মিকতাকে উপলব্ধিই এর মূল উপজীব্য। তারপরেও থমাস বেরী, ডেনিস এডওয়ার্ডস্ প্রমুখের লেখা



থেকে মানুষ- প্রকৃতি সম্পর্ক, প্রকৃতির পবিত্রতা, প্রকৃতির রহস্য, প্রকৃতির দানক্ষমতা, প্রকৃতির সৃষ্টিসমূহের প্রতি মানুষের আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং তার তত্ত্বাবধান ইত্যাদি কিছু বিষয়কে বাস্তুআধ্যাত্মিকতার নীতি হিসেবে ধরে নিতে পারি। সেই আঙ্গিকেই সমগ্র উপন্যাসের পাঠ বিশ্লেষণের চেষ্টা এই নিবন্ধে করা হয়েছে। সবশেষে বলা যেতে পারে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'আরণ্যক'এ বাস্তুআধ্যাত্মিকতার প্রেক্ষাপটটি বেশ স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান রয়েছে।

#### তথ্যসূত্র:

- ১। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'আরণ্যক', কলকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, শ্রাবণ ১৪২৪  
বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৮।
- ২। তদেব, পৃষ্ঠা ১৬।
- ৩। তদেব, পৃষ্ঠা ১৯।
- ৪। তদেব, পৃষ্ঠা ১১৫।
- ৫। তদেব, পৃষ্ঠা ৬৬।
- ৬। তদেব, পৃষ্ঠা ৭১।
- ৭। তদেব, পৃষ্ঠা ৭০।
- ৮। তদেব, পৃষ্ঠা ৭১।
- ৯। তদেব, পৃষ্ঠা ১৩১-১৩২।
- ১০। তদেব, পৃষ্ঠা ৫২।
- ১১। তদেব, পৃষ্ঠা ৭৫।
- ১২। তদেব, পৃষ্ঠা ৭৫।
- ১৩। তদেব, পৃষ্ঠা ১০৮।
- ১৪। তদেব, পৃষ্ঠা ১৪২।
- ১৫। তদেব, পৃষ্ঠা ২৯।
- ১৬। তদেব, পৃষ্ঠা ৪০।
- ১৭। তদেব, পৃষ্ঠা ৪০।
- ১৮। তদেব, পৃষ্ঠা ৯২।
- ১৯। তদেব, পৃষ্ঠা ৯২।
- ২০। তদেব, পৃষ্ঠা ১২৩।

- ২১। তদেব, পৃষ্ঠা ১২৪।
- ২২। তদেব, পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪।
- ২৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৮৭।
- ২৪। তদেব, পৃষ্ঠা ৫৫।
- ২৫। তদেব, পৃষ্ঠা ১৭।
- ২৬। তদেব, পৃষ্ঠা ৪৩।
- ২৭। তদেব, পৃষ্ঠা ৬৭।
- ২৮। তদেব, পৃষ্ঠা ৭৩।
- ২৯। তদেব, পৃষ্ঠা ১১২।
- ৩০। তদেব, পৃষ্ঠা ৩৯।
- ৩১। তদেব, পৃষ্ঠা ৫৮।
- ৩২। তদেব, পৃষ্ঠা ১৪৭।
- ৩৩। তদেব, পৃষ্ঠা ১৪০।

**সহায়কপঞ্জি:**

- ১। রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, *বিভূতিভূষণ: মন ও শিল্প*, কলকাতা: বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৯।
- ২। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *আরণ্যক*, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, শ্রাবণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।
- ৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *উপন্যাসসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা: কামিনী প্রকাশালয়, ২৫ জানুয়ারি, ২০১১।
- ৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।
- ৫। Berry, Thomas. *Evening Thoughts: Reflecting on Earth as Sacred Community*. Edited by Mary Evelyn Tucker, Sierra Club Books, 2006.
- ৬। Brooks Atkinson, editor. *The Complete Essays and Other Writings of Ralph Waldo Emerson*. The Modern Library, New York. 1950.
- ৭। De Souza, Marian, et al., editors. *International Handbook of Education for Spirituality, Care and Wellbeing*. Springer Netherlands, 2009. <https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9018-9>
- ৮। Edwards, Denis. *Ecology at the Heart of Faith*. Edwards, Orbis Books, 2011. [https://library.oapen.org/bitstream/id/9a60ff19-1c51-48ca-ad733ff0fc2327bd/external\\_content.pdf](https://library.oapen.org/bitstream/id/9a60ff19-1c51-48ca-ad733ff0fc2327bd/external_content.pdf)



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 772-778

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.067



## বোধিসত্ত্বভূমি গ্রন্থনিষ্ঠ দানের ধারণাঃ একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

প্রিয়ান্বিতা দত্ত, গবেষক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 15.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*Bodhisattvabhūmi is a Buddhist scripture and the fifteenth stage of Yogācārabhūmi, authored by Asaṅga, a renowned philosopher of the Yogācāra Buddhist school. The Dānapāṭalam chapter of Bodhisattvabhūmi explores the concept of dāna pāramitā (the perfection of giving).*

*This article endeavors to provide a comprehensive understanding of dāna in a holistic manner. It discusses the character traits of a bodhisattva and the psychological attributes of the recipient. Beyond offering a brief overview of Bodhisattvabhūmi, this study critically and analytically examines the philosophical concept of dāna, shedding light on its deeper significance.*

**Keywords:** Pāramitā, Difficult Task, Sarvatomukha (All-Encompassing), Virtuous Person, Obstructive Factors, Worldly Pleasure, Wisdom, Skillful Means.

বৌদ্ধশাস্ত্রে মানবতার পূর্ণ বিকাশের জন্য অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভের জন্য যে বিশিষ্ট সাধনপ্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে, তার নাম পারমিতা। সংস্কৃত বৌদ্ধ শাস্ত্রোক্ত ‘পারমিতা’ শব্দটি পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে ‘পারমি’ নামে কথিত হয়। পালি বৌদ্ধ শাস্ত্রে দশটি পারমিতা স্বীকার করা হয়েছে। তন্মধ্যে দান পারমিতা প্রথম স্থানেই বিরাজমান। অপরদিকে মহাযান বৌদ্ধ শাস্ত্রে ছয়টি পারমিতা স্বীকার্য এবং তার মধ্যে অন্যতম হল দান পারমিতা। পালি ও মহাযান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গ্রন্থে দানের ধারণা প্রসঙ্গ নানাভাবে আলোচিত হলেও আমি এই প্রবন্ধে মহাযান সম্প্রদায়ের অন্যতম দার্শনিক অসঙ্গের বিশেষ গ্রন্থ বোধিসত্ত্বভূমি গ্রন্থটিকে মুখ্য গ্রন্থ রূপে গণ্য করে দান পারমিতার একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

আমি এই প্রবন্ধটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছি:

- (১) প্রথম বিভাগে দার্শনিক অসঙ্গ এবং তাঁর অন্যতম রচনাবোধিসত্ত্বভূমি গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদানের চেষ্টা করেছি।
- (২) দ্বিতীয় বিভাগে দানের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ প্রদানের চেষ্টা করেছি।

(৩) তৃতীয় বিভাগে বোধিসত্ত্বভূমি গ্রন্থে দানের আলোচনা কীভাবে করা হয়েছে একটি বিবরণ প্রদানের চেষ্টা করেছি।

১

মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশেষত যোগাচার সম্প্রদায়ের দার্শনিক হলেন অসঙ্গ। মহাযান দর্শনের অন্যতম পথিকৃৎ নাগার্জুনের সহিত তাঁকেও এই দর্শনের অন্যতম একজন প্রতিষ্ঠাতা রূপে বিবেচনা করা হয়। বৌদ্ধ গ্রন্থ যোগাচারভূমি শাস্ত্রের রচয়িতা হলেন অসঙ্গ। এই গ্রন্থ যোগাচার সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নিয়মনীতি বিষয়ক একটি গ্রন্থ। আমার আলোচ্য বোধিসত্ত্বভূমি গ্রন্থটি অসঙ্গের এই যোগাচারভূমি শাস্ত্রের সতেরটি ভূমির অন্তর্গত পঞ্চদশ স্তর বা ভূমি। এই গ্রন্থ পরবর্তীকালে সংস্কৃতে রচিত হয়। এই গ্রন্থটি তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা - (ক) আধার- যোগস্থান, (খ) আধারানুধর্ম-যোগস্থান এবং (গ) আধারনিষ্ঠ যোগস্থান।<sup>১</sup> তন্মধ্যে দান পারমিতার বিশদ আলোচনা আমরা আধার- যোগস্থানের অন্তর্গত ‘দানপটলম্’ অধ্যায়ে লক্ষ্য করি।

২

দান হল বোধিচর্যার উদ্দেশ্যে প্রথম ধাপ। দান বলতে বোঝায় ব্যক্তির এমন গুণ যা ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে সহায়তা করে। ‘দান’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল দেওয়া। দানের সমার্থক শব্দ উদারতা, দানশীলতা ইত্যাদি। ত্যাগের অনুশীলন করাই হল দানের সমার্থক।<sup>২</sup> সর্ব জীবের নিমিত্তে সকল বস্তু দান বা ত্যাগ করা হল ‘দান পারমিতা’র সাধনা। বোধিসত্ত্বের বোধি দানেই প্রতিষ্ঠিত<sup>৩</sup>, বোধিসত্ত্বকে এইরূপ সংকল্প গ্রহণ করতে হয় যে, যার যে বস্তুর প্রয়োজন, কোনো প্রকার শোক না করে তাকে সেই বস্তু তিনি প্রদান করবেন।

৩

বোধিসত্ত্বভূমি গ্রন্থে ‘দানপটলম্’ অধ্যায়ের প্রারম্ভে দার্শনিক অসঙ্গ দানের আলোচনা শুরু করেছেন এভাবে - বোধিসত্ত্ব ছয়টি পারমিতা পরিপূর্ণ করার পরে সম্যক সম্বোধি রূপ বুদ্ধত্ব লাভ করেন। এই ছয়টি পারমিতা হল যথাক্রমে - দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা পারমিতা।

এরপর প্রশ্ন ওঠে বোধিসত্ত্বের পালনীয় দান পারমিতা কোনটি? দান পারমিতা আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে অসঙ্গের বোধিসত্ত্বভূমি গ্রন্থের ‘দানপটলম্’ অধ্যায়ে দান পারমিতার বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দানের নয়টি প্রকারের কথা বলা হয়েছে। যথা - (ক) স্বভাব দান, (খ) সর্বদান, (গ) দুষ্কর দান, (ঘ) সর্বতোমুখ দান, (ঙ) সৎপুরুষ দান, (চ) সর্বাকার দান, (ছ) বিঘাতার্থিক দান, (জ) ইহমূত্রসুখ দান, (ঝ) বিশুদ্ধ দান।<sup>৪</sup>

এইসকল দানের মধ্যে এই প্রবন্ধে আমি প্রথম দুই প্রকার দানের বিশদে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

**(ক) স্বভাব দান:** এই নয়টি প্রকার দানের মধ্যে সর্বপ্রথম আসে স্বভাব দান। স্বভাব বলতে এখানে বোধিসত্ত্বের এমন একটি চেতনা রূপ স্বভাব বা গুণের কথা বলা হয়েছে যার দ্বারা তিনি সকল পার্থিব বস্তু এবং নিজ দেহের প্রতি উদাসীন থাকবেন অর্থাৎ, দানের অনুশীলনে বোধিসত্ত্বের নিজস্ব কোনো স্বার্থপূরণের উদ্দেশ্য থাকবে না এবং বিনিময়ে পুরস্কার প্রাপ্তির প্রতিও তিনি কাঙ্ক্ষিত হবেন না। এই চেতনা সকল অধিগ্রহণমুক্ত। সেই চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বোধিসত্ত্ব কায় ও বাক্জনিত কর্ম ত্যাগের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করবেন। অতএব, এর থেকে এই ধারণা স্পষ্ট হয় যে, দান স্বভাব বলতে যে ব্যক্তি (গ্রহীতা) বস্তু কামনা করে তাকে সেই বস্তু দান এবং যে ব্যক্তি এই দান রূপ কর্ম সম্পাদন করবেন অর্থাৎ বোধিসত্ত্ব, এই উভয়

ব্যক্তি অবশ্যই বোধিসত্ত্বের পালনীয় নৈতিক নিয়মাবলীর মধ্যে আবদ্ধ থাকবেন। দানের মাধ্যমে যা অর্জিত হয় তা বোধিসত্ত্ব দেখতে পান এবং দেই দানের ফলাফলকেও তিনি স্বীকৃতি দেন। অর্থাৎ, তিনি ফলদর্শী হয়ে অন্য ব্যক্তি (গ্রহীতা) যা কামনা করেন, তা নির্দিধায় দান করবেন।

**(খ) সর্বদান:** এরপরে আসে দ্বিতীয় প্রকার সর্বদান। প্রশ্ন - সর্বদান কোনটি? সর্বদান বলতে কী ধরনের বস্তু দানের কথা এখানে বলা হয়েছে? দানের ক্ষেত্রে দুই ধরনের বস্তু নির্দেশিত হয়, যথা - (১) অভ্যন্তরীণ (আধ্যাত্মিক) বস্তু ও (২) বাহ্য দেয় বস্তু<sup>৬</sup> বোধিসত্ত্বের নিজ দেহ পরিত্যাগকে আমরা ‘আধ্যাত্মিক বা অভ্যন্তরীণ বস্তু পরিত্যাগ’ অর্থে ধরতে পারি। অবশিষ্ট সকল দ্রব্য বা বস্তু যা দানের উপযুক্ত, তাকে ‘বাহ্যদ্রব্য ত্যাগ’ বলে।

আধ্যাত্মিক বস্তু দানের ক্ষেত্রে দুটি উপায় রয়েছে যার মাধ্যমে বোধিসত্ত্ব নিজের দেহ অন্য ব্যক্তি যারা দেহ সন্ধান করছেন অর্থাৎ গ্রহীতার উদ্দেশ্যে অর্পণ করবেন। তন্মধ্যে একটি উপায় হল - তিনি অপরের অর্থাৎ যিনি দেহ সন্ধান করছেন তার বশীভূত বা নিয়ন্ত্রিত হয়ে এবং তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কর্ম করবেন (যেমন ইচ্ছা তেমন করণীয়)। দৈহিক আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত হয়ে মুক্ত মন নিয়ে একজন বোধিসত্ত্ব যিনি পরম জ্ঞান অর্জনের জন্য আকাঙ্ক্ষিত, যিনি অন্যের উপকার ও সুখ প্রদানে সর্বদা ব্যস্ত এবং যিনি দানের পরিপূর্ণতা সম্পূর্ণ করতে সর্বদা প্রয়াসী (বোধিসত্ত্ব), তিনি নিজেকে অন্যের নিয়ন্ত্রাধীন করে অন্যের ইচ্ছার বশীভূত হয়ে তাদের (গ্রহীতার) ইচ্ছা অনুসারে দান-কর্ম সম্পাদন করবেন।<sup>৭</sup>

দ্বিতীয় উপায় হল - হাত, পা, চোখ, মাথা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা ছোট উপাঙ্গের জন্য মাংস ও রসের অনুসন্ধানে অন্যেরা তাঁর শরণাপন্ন হলে তিনি তাঁর মজ্জা পর্যন্ত প্রদান করবেন।

বাহ্যবস্তু দানের ক্ষেত্রে দুটি উপায়ে একজন বোধিসত্ত্ব অপর প্রাণীদের কাছে বাহ্যবস্তু দান বা ত্যাগ করবেন। প্রথম উপায়টি হল - তিনি একটি ধার করা বস্তু দান করতে পারেন যাতে গ্রহীতা খুশি হতে পারেন। দ্বিতীয় উপায় হল - তিনি এমন বস্তু দান করবেন যাতে গ্রহীতার এটির উপর আধিপত্য থাকতে পারে এবং বোধিসত্ত্ব সেই বস্তুর প্রতি সকল মালিকানা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেই অপর ব্যক্তিকে (গ্রহীতাকে) তা দান করবেন। এরপর প্রশ্ন তিনি কি সকল সময়ে আধ্যাত্মিক ও বাহ্য বস্তু দান করবেন? এর উত্তরে বলা যায়, সর্বদা এই দুই প্রকার বস্তু দান করা যাবে না। এর কারণ কী? এই আধ্যাত্মিক ও বাহ্য বস্তুর ত্যাগ কেবল সুখের জন্য নয়, কেবল অসুখের জন্য নয়, আবার কেবল মঙ্গলের জন্য নয় -এরূপ দান বোধিসত্ত্ব করবেন না। যে দান অবশ্যই কেবল সুখের জন্য না হয়ে পরের মঙ্গলের জন্যও হয়, অসুখের জন্য হয়েও অপরের মঙ্গলের জন্য হয় সেরকম বস্তু বোধিসত্ত্ব দান করবেন। এই ধারণার মধ্যে দিয়েই আমরা দান ও অদানের পার্থক্য নির্দেশ করতে পারি।<sup>৮</sup>

এরপরের প্রশ্ন দানের অনুশীলনের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে একজন বোধিসত্ত্বের নজর রাখা উচিত এবং কোন বিষয় তিনি এড়িয়ে চলবেন?

এই আধ্যাত্মিক ও বাহ্য বস্তুর মধ্যে বোধিসত্ত্ব এমন বস্তু অন্যকে দান করবেন না যা কেবল গ্রহীতাকে সুখ প্রদান করতে পারে, কিন্তু তাতে বাস্তবিক কোনো উপকার হয় না, আবার এরকম বস্তুও দান করবেন না যা সুখ ও উপকার কোনটাই আনে না। অপর ব্যক্তিকে কষ্ট দেয় যারা তাদের আদেশে অথবা তাদের সম্ভ্রষ্টির জন্য তিনি পরবঞ্চনা করবেন না। কাউকে হত্যা করবেন না, কারোর ক্ষতি করার কথা চিন্তাও

করবেন না। একজন বোধিসত্ত্ব অপরের জন্য শত শত হাজার হাজার বার নিজের জীবন পরিত্যাগ করতে পারেন।

যারা উন্মাদ বা বিকৃত মনের হন, তাদেরও বোধিসত্ত্ব নিজ দেহ দান করবেন না। কারণ তারা সঠিক মনের অধিকারী নন এবং একটি প্রকৃত লক্ষ্য নিয়ে তারা দেহ প্রার্থনা করছেন এমনও নয়। অতএব উন্মাদ ব্যক্তি নিজেই নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন না হওয়ায় বোধিসত্ত্ব তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু দান করবেন না। বোধিসত্ত্ব দানের উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করে অভ্যন্তরীণ বা আধ্যাত্মিক বস্তু রূপে নিজের দেহ দান করবেন।

আধ্যাত্মিক বস্তু কেমনভাবে কাদের দান করা যাবে এ প্রসঙ্গ আলোচনার পরেই আসে বাহ্য বস্তু দানের ক্ষেত্রে বোধিসত্ত্ব কীরকম বস্তু ও প্রার্থী নির্বাচন করবেন? একজন বোধিসত্ত্ব গ্রহীতা বা দান প্রার্থীকে বিষ, আগুন, অস্ত্র ও নেশাদ্রব্য সরবরাহ করবেন না। এক্ষেত্রে প্রার্থী বোধিসত্ত্বের নিকট শরণাপন্ন হলে তিনি গ্রহীতাকে এই সকল বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষার কারণ জিজ্ঞাসা করেন অর্থাৎ সেই সকল বস্তু নিজের ক্ষতি বা অপরের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে কিনা তা বিচার করে দেখবেন। যদি এগুলি নিজের এবং অপরের ক্ষতি সাধন না করে অপরের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তাহলে তিনি তা দান করবেন।

বোধিসত্ত্ব নিজের পিতা ও মাতাকে গ্রহীতার কাছে কখনও অর্পণ করবেন না। কারণ পিতা-মাতা পরম গুরুস্থানীয়, তারা তাঁকে লালন-পালন করেছেন। দীর্ঘ সময় ধরে পিতা-মাতাকে নিজের মস্তকে বহন করা তাঁর কর্তব্য। এই কর্মে তিনি ক্লান্তি অনুভব করেন না। কোনো বস্তু যেমন বন্ধক রাখা হয় তেমন বোধিসত্ত্ব তাঁর পিতামাতার কাছে নিজেকে বন্ধক বা বিক্রয়যোগ্য বস্তুর ন্যায় মনে করবেন। একজন বোধিসত্ত্ব তাঁর নিজের পত্নী, সন্তানকে অন্য ব্যক্তির কাছে অর্পণ করবেন না।

বোধিসত্ত্ব তাঁর পিতামাতার কাছ থেকে সম্পত্তি নিয়ে অন্যকে দান করতে পারবেন না। তিনি যেমন তাঁর পিতামাতার থেকে সম্পত্তি নিতে পারবেন না, তেমন তাঁর সন্তান, স্ত্রী, মহিলা চাকর, পুরুষ চাকর ও ভাড়া করা ব্যক্তির থেকেও সম্পত্তি নিতে পারবেন না। এমনকি তিনি তাঁর নিজের বস্তুগুলিকেও এমনভাবে দান করবেন না যাতে সেগুলির দ্বারা পিতামাতা, শ্রমিক বা ভাড়া করা ব্যক্তির ক্ষতি হতে পারে।

একজন বোধিসত্ত্ব ন্যায়সঙ্গত ও বিবেচনা সহকারে মূল্যবান বস্তু অর্জন করেন ও দানের অনুশীলন করেন, অন্যায়্য বস্তু গ্রহণ করেন না। অথবা তিনি এমনভাবে বস্তু গ্রহণ করবেন না যা অন্যের ব্যথা বা আঘাতের কারণ হয়।

একজন বোধিসত্ত্ব যিনি সুগত বুদ্ধের শিক্ষায় শিক্ষিত তিনি যদি দানের অনুশীলন না করেন তাহলে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা লক্ষিত হবে। যখন বোধিসত্ত্ব অপরকে বস্তু দান করেন তখন তিনি এমন মনোভাব পোষণ করেন যে, সমস্ত প্রাণী সমান ও সকলে দান পাওয়ার যোগ্য, তা সেই ব্যক্তি বন্ধু, শত্রু, নিরপেক্ষ ব্যক্তি, গুণী ব্যক্তি বা দোষী ব্যক্তি, নিকৃষ্ট, সমান বা উচ্চতর এবং সুখী অথবা দুঃখী ব্যক্তি হলেও তিনি তাদের বস্তু দান করবেন।

একজন বোধিসত্ত্ব গ্রহীতাকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার থেকে নিম্ন মানের বস্তু (উপহার) দান করবেন না। তিনি চমৎকার বস্তু প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিকৃষ্ট বস্তু দান করবেন না। কম মূল্যের বস্তু দানের প্রতিশ্রুতি থাকলেও যদি তাঁর কাছে এমন একজন মানুষ থাকে যার গুণ চমৎকার, তাহলে তিনি চমৎকার বস্তুই সেই ব্যক্তিকে দান করবেন।

একজন বোধিসত্ত্ব নিজে অস্বস্তি, রাগান্বিত বা উত্তেজিত মনের অবস্থায় বস্তু দান করবেন না। তিনি দান করার সময়ে বারবার প্রাপককে এরকম বলেন না যে, “দানের মাধ্যমে আমি এভাবে আপনাকে সাহায্য করেছি, বা আমি আপনাকে লালনপালন করেছি ও দানের মাধ্যমে এভাবে আমি উচ্চস্তরের মানুষদের উচ্চ আসনে আসীন করতে চাই”। এমনকি নীচু স্থানীয় ব্যক্তিকেও দান করার সময়ে একজন বোধিসত্ত্ব অবজ্ঞাপূর্বক বা অসম্মানজনকভাবে দান করতে পারেন না।<sup>৮</sup> বিভিন্ন ধরনের অন্যায় আচরণে নিয়োজিত গ্রহীতাদের বস্তু দানের সময়ে যারা বিপরীত বুদ্ধিধারণকারী, উদ্ধত, অসংবৃত, ক্রুদ্ধ, রুষ্ট, পরনিন্দাকারী তাদের আচরণে বোধিসত্ত্ব নিরাশ হন।<sup>৯</sup>

একজন বোধিসত্ত্ব পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় দান করেন না। তিনি অতুলনীয় সত্য সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের আশায় দান করেন। একজন বোধিসত্ত্ব দান করার সময়ে দারিদ্র ভয়ে ভীত হন না। করুণা ব্যতীত তিনি অন্য চিন্তা করেন না।

দান গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত এমন দান বোধিসত্ত্ব করবেন না, যেমন - ধর্মীয় সন্ন্যাসীদের জন্য অবশিষ্ট খাদ্য, পানীয় যাতে মলমূত্র, প্রস্রাব, কফ, পুঁজ, রক্ত ইত্যাদি থাকে তা দান করা উচিত নয়, আবার যে খাদ্য ও পানীয় নষ্ট হয়ে গেছে তাও দান করা অনুচিত। একইভাবে বোধিসত্ত্ব অন্য ব্যক্তিকে উপহার প্রদানের সময়ে এরকম অনুপযুক্ত কর্মে জড়িত হন না অথবা তিনি এরকম কোনো উপহার দেন না যা এইগুলির অনুরূপ।

একজন বোধিসত্ত্ব খ্যাতি লাভের আশায় দান করবেন না। এমনকি তিনি অন্যের কাছ থেকে বিনিময়ে কিছু পাওয়ার আশাতেও দান করবেন না। ভণ্ডামি করার জন্য তিনি অন্যদের বস্তু দান করবেন না। তিনি এরকম চিন্তা করেন না যে, তাঁর এই উদারতার কাজের দ্বারা অন্যরা যেমন রাজ পরিবারের সদস্যরা, রাজার মন্ত্রী, নগরবাসী, দেশবাসী, ব্রাহ্মণ, গ্রাম প্রধান, ধনকুবের, বণিকরা তাঁকে উদার ও পরোপকারী হিসাবে চিনবেন যাতে ভবিষ্যতে বোধিসত্ত্বকে তাঁরা শ্রদ্ধা করেন ও সম্মান করেন।

তিনি এমন উপহার দেন না যা আত্মার দারিদ্রকে ইঙ্গিত করবে। তিনি অন্যকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে দান করেন না। তিনি এমন চিন্তা করেন না যে এই দানের মধ্য দিয়ে অন্যকে প্রলুব্ধ করা যাবে এবং তাদের বিশ্বাস অর্জন করার পর তাদের সাথে প্রতারণা করা যাবে। তিনি একজনের কাছ থেকে অপরজনকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য দান করেন না।

একজন বোধিসত্ত্ব দক্ষ, পরিশ্রমী ও সকল কর্মের জন্য প্রস্তুত থাকেন। তাঁকে বা নিজেকে যথাযথ প্রস্তুতির সাথে প্রস্তুত করেন এবং সেই বস্তু দান করেন এবং অন্যদেরও এই কাজ করতে প্ররোচিত করেন। এই কাজে তিনি কোনোরকম অলসতা প্রদর্শন করেন না। যখন তিনি আরও সচেতন হন যে দান গ্রহীতাদের বিশাল সমাবেশ জড়ো হয়েছে এবং এর মধ্যে ভাল ও খারাপ দু ধরনের নৈতিক চরিত্রের ব্যক্তিরাই রয়েছেন, তখন তিনি তার সঠিক বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারাই যোগ্য প্রার্থীকে বস্তু দান করবেন।

একজন বোধিসত্ত্ব একটি উপযুক্ত সময়ে বস্তু দান করবেন, অনুপযুক্ত সময়ে দান করবেন না। বস্তু দান (উপহার) হল এমন যা নিজের এবং অন্যদের উভয়ের জন্যই উপযুক্ত, অনুপযুক্ত নয়। এটি এমন একটি পদ্ধতিতে দান করা হয় যা ভাল আচরণের দৃষ্টান্ত দেয়, অনুপযুক্ত আচরণের প্রতিনিধিত্ব করে না।

একজন বোধিসত্ত্ব একজন গ্রহীতার উপর উপহাস করেন না বা অবজ্ঞা করেন না বা তাকে বিব্রত করেন না। বোধিসত্ত্ব অংকুটি করেন না, তিনি একটি উজ্জ্বল মুখ প্রদর্শন করেন, একটি হাসি দিয়ে অভিবাদন করেন ও ভদ্র কথোপকথন শুরু করেন। তিনি দান দিতে অধিক সময় নেন না এবং দ্রুততাও অবলম্বন করেন না। অন্যরা যা তাঁর কাছে কামনা করেন, বোধিসত্ত্ব স্বেচ্ছায় তাই-ই তাদের দান করবেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাদের সেইসকল বস্তু দান মঞ্জুর করেন।

এবার প্রশ্ন - কীভাবে একজন বোধিসত্ত্ব উপহার দিতে অস্বীকার করেন?

একজন বোধিসত্ত্ব কঠোরভাবে ব্যবহার করে আবেদনকারীকে প্রত্যাখান করতে অক্ষম। বরং দক্ষ উপায় ব্যবহার করে তিনি সেই ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দিতে পারেন। সেই দক্ষ উপায় হল উপায়কৌশল্য।

এইক্ষেত্রে সেই উপায়গুলি হল - যেভাবে একজন ভিক্ষুক তাঁর পোশাক (বৌদ্ধ ভাষায় চীবর) আচার্য বা উপাধ্যায়ের নিকট দান (উৎসর্গ) করেন তেমনই বোধিসত্ত্ব গোড়া থেকেই বিশুদ্ধ মনোভাব নিয়ে তাঁর সকল সম্পত্তি ও ধর্ম (উপদেশ) সর্বদিক (দশ দিক) দিয়ে দানের অনুশীলনের জন্য বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের প্রতি নিবেদন বা অর্পণ করবেন। এইরূপ উৎসর্গের কারণে যদিও একজন ব্যক্তি বিপুল পরিমাণ ও বৈচিত্র্যময় সম্পত্তি অর্জন করতে পারেন যা দানের অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত, তখন তিনি বোধিসত্ত্ব হিসাবে আর্ঘ্য হয়ে ওঠেন অর্থাৎ আর্ঘ্যবংশীয় বোধিসত্ত্ব হয়ে ওঠেন (A bodhisattva who abides in the ārya lineage)। তিনি তখন প্রচুর পরিমাণে পুণ্য অর্জন করবেন। অধিকন্তু এই পুণ্যের পরিমাণ মনের সদৃশ্যগুলির বৃদ্ধি প্রাপ্তির সাথে সাথে তারও বৃদ্ধি প্রাপ্তি ঘটবে। যদি বোধিসত্ত্ব একজন দান গ্রহীতাকে দেখেন যে, তার ইচ্ছা অনুযায়ী দাতব্য উপহার প্রদান করা সেই ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত হয়, তাহলে তিনি সেই প্রার্থীকে তার ইচ্ছিত দেয়ধর্ম দান করবেন।

অসঙ্গ বোধিসত্ত্বভূমি গ্রন্থের ‘দানপটলম্’ অধ্যায়ে দানের এক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন যার মধ্যে দানের স্বরূপ, দানের স্বভাব, কোন্ ধরনের বস্তু দানের যোগ্য, দানের পক্ষে যোগ্য ব্যক্তি কেমন হবেন, কেমন ব্যক্তিকে দান করা যাবে না, কী দান করা অনুচিত, তার একটি সামগ্রিক বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া দাতা রূপ বোধিসত্ত্বের অবস্থান, মানসিকতার পাশাপাশি দান- গ্রহীতারও মানসিকতার পরিচয় এখানে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। গ্রহীতা দাতার কাছে কোনো বস্তু প্রাপ্তির অনুমোদন করলেই যে সে তা প্রাপ্ত হবে এমন নয়, সেক্ষেত্রে তার মানসিকতা, বস্তু প্রাপ্তির উদ্দেশ্য রীতিমতো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে তবেই ব্যক্তি দান লাভের যোগ্য হয়ে ওঠেন। অপরদিকে দেয় বস্তু রূপে যেমন বাহ্য মূর্ত বিষয় গণ্য হয়, তেমনই অমূর্ত বিষয় রূপে জ্ঞানও দেয় বস্তু রূপে এখানে স্বীকৃত হয়েছে। বিশেষ উল্লেখ্য এই অধ্যায়ে দানের আলোচনায় দানের কোনো রূপ সংজ্ঞা প্রদান না করেই সরাসরি দানের প্রকারভেদের মধ্য দিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। দানের এই প্রকারভেদের মধ্য দিয়েই বোধিসত্ত্বের চারিত্রিক গুণাবলী এবং দানের বিভিন্ন দিকের সম্পূর্ণ চিত্র আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানেই বোধিসত্ত্বভূমি গ্রন্থের অভিনবত্ব নিহিত রয়েছে।



তথ্যসূত্র:

১. *Encyclopedia of Buddhism* (vol-7). ed. G.P Malalasekera. Srilanka: The government Of Srilanka, 2005. p.233.
২. Dayal, Har. *The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1932. p. 166.
৩. *Encyclopedia of Buddhism*(vol-5). ed. G.P Malalasekera. Srilanka: The government Of Srilanka, 1979. p. 314.
৪. অসঙ্গপাদ. বৌদ্ধিসত্ত্বভূমি. সম্পা. নলিনাক্ষ দত্ত. পাটনাঃ কে.পি.জয়সয়াল রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ১৯৬৬.পৃ. ৮০।
৫. তদেব, পৃ. ৮০।
৬. তদেব, পৃ. ৮০।
৭. Asaṅga. *Bodhisattvabhumi*. trans. Artemus B. Engle. Boulder: Snow Lion, 2016. p. 207.
৮. Ibid. p.211 .
৯. Ibid. p. 214.



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 779-785

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.068



## অনুমানের প্রকার প্রসঙ্গে প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িক মত: একটি আলোচনা

সুফল দাস, গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 18.01.2025; Accepted: 21.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*Maharsi Gautama in his Nyāya-sutra when he discussing about the identification and classification of Pramāna says in 'panchamsutra'. That there are three types of anumanas Pūrvavat, śeṣavat and sāmānyatodṛṣṭa Inferences. Linguist Vatsyayana discussion it in his first and second Discussion. Next time we notice that Uddyotakara did not mention there anumans instead of in his Nyayavarttika in the first discussions Kevalānvayi, kevala-vyatireki and anvaya-vyatireki inferences. On the other hand books of Later Nyāyayika like. Tattvāchintamoni by Gangeśa Upadhay discussed the three types of anumanas. Then Annam Bhatt's in his 'Tarkasamgraha' he discussed Svārtha and parārtha Inferences and Kevalanvayi, Kevala-vyatireki and anvaya-vyatireki. Biśvanāth, Nyāya-Panchanan in his 'Bhāṣāparicceda' book mentioned Svārtha and parārtha Inferences. So the books by navya Nyāyayikas we got reference Svārtha and parārtha Inferences and Kevalānvayi, kevala-vyatireki and anvaya-vyatireki that types of anumanas. We did not get there Pūrvavat, śeṣavat and sāmānyatodṛṣṭa that types of anumanas. So sutrakar and bhasakar discusses Pūrvavat, śeṣavat and sāmānyatodṛṣṭa, but why there philosophers did not mention ther anumanas are trying to discuss.*

**Keywords:** Pūrvavat, śeṣavat, sāmānyatodṛṣṭa, Svārtha, parārtha, Kevalānvayi, kevala-vyatireki, anvaya-vyatireki.

বেদের প্রামাণ্যের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় দর্শনে দুটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। একটি হলো বৈদিক সম্প্রদায় (ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত) অর্থাৎ এই সম্প্রদায়গুলি বেদের প্রামাণ্যকে স্বীকার করেন। এবং অপরটি হল অবৈদিক সম্প্রদায় (চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন) অর্থাৎ এই সম্প্রদায়গুলি বেদের প্রামাণ্যকে অস্বীকার করেন। ন্যায়দর্শন সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় ষড় বৈদিক সম্প্রদায় গুলির মধ্যে অন্যতম দর্শন সম্প্রদায়। ন্যায়সূত্রই ন্যায়দর্শনের মূলগ্রন্থ। মহর্ষি গৌতম এই সূত্রের রচয়িতা। ন্যায় দর্শনের আবার দুটি শাখা, যথা, প্রাচীন-নৈয়ায়িক (বাৎসায়ন, উদ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র, উদয়ন, ও জয়ন্ত ভট্ট প্রমুখ) ও নব্য-নৈয়ায়িক (গঙ্গেশ উপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চগনন, বর্ধমান, রুচিদত্ত মিশ্র, জয়দেব মিশ্র, রঘুনাথ শিরোমনি

ও জগদীশ তর্কালঙ্কার) প্রমুখগণ। মহর্ষি গৌতমের ‘ন্যায়সূত্রে’র উপর ভিত্তি করে বাৎসায়নের, ন্যায়ভাষ্য, উদ্বোতকরের, ন্যায়বার্তিক, বাচস্পতি মিশ্রের, ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকা, এবং উদয়নের, ন্যায়বার্তিক তাৎপর্যপরিশুদ্ধি, রচিত হয়েছে। অন্যদিকে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের, তত্ত্বচিন্তামনি, গ্রন্থকে কেন্দ্র করে নব্য ন্যায়ের আবির্ভাব হয়। নব্য নৈয়ায়িকদের মধ্যে বিশ্বনাথের ‘ভাষাপরিচ্ছেদ’ এবং অন্নভট্টের, তর্কসংগ্রহ, গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ন্যায়দর্শনে চারটি প্রমাণের (প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ) মধ্যে অনুমান প্রমাণ অন্যতম। মহর্ষি গৌতম তাঁর ‘ন্যায়সূত্রে’ বলেছেন- ‘অথ তৎপূর্বকমনুমানম’।<sup>1</sup> অর্থাৎ মহর্ষি ‘তৎ’ শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যে কোনো প্রত্যক্ষপূর্বক জ্ঞানকে অনুমান প্রমাণ বললে শব্দশ্রবণরূপ প্রত্যক্ষপূর্বক শাব্দবোধ ও উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়। তাই ভাষ্যকার বলেছেন- ‘লিঙ্গ লিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধ দর্শনং লিঙ্গদর্শনঞ্চ’<sup>2</sup> অর্থাৎ ‘তৎপূর্বকং’ এই পদের দ্বারা লিঙ্গ (হেতু) ও লিঙ্গীর (সাধ্যের) সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ, লিঙ্গের প্রত্যক্ষ এবং সেই সম্বন্ধ বিশিষ্ট লিঙ্গ ও লিঙ্গীর প্রত্যক্ষের দ্বারা সেই লিঙ্গের স্মরণরূপ জ্ঞান অভিপ্রেত। অনুমানের প্রকৃত হেতুকে বলে লিঙ্গ এবং লিঙ্গের দ্বারা যে পদার্থের অনুমিতি হয়। সেই অনুমেয় পদার্থকে বলে লিঙ্গী। হেতু (লিঙ্গ) ও সাধ্যে ধর্মের (লিঙ্গী) ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান হলে সেই হেতুর দ্বারা সেই ধর্মের অনুমিতি হয়ে থাকে। তাই অনুমান হল লিঙ্গ-লিঙ্গীপূর্বক জ্ঞান। মহর্ষি গৌতম তাঁর ‘ন্যায়সূত্রে’ প্রমাণের স্বরূপ ও প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট এই অনুমানগুলির কথা বলেছেন এবং পরবর্তীকালে ভাষ্যকার বাৎসায়ন এই অনুমানগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর প্রথম ব্যাখ্যায় বলেছেন- ‘পূর্ববৎ বিদ্যতে যত্র’<sup>3</sup> অর্থাৎ যে অনুমান প্রমাণে কারণ বিশেষের দ্বারা কার্যের অনুমিতি জন্মে তাকে পূর্ববৎ অনুমান বলা হয়। যেমনঃ আকাশের ঘন কালো মেঘ দেখে বৃষ্টি হবে- এইরূপ যে অনুমান। ‘শেষো বিদ্যতে যত্র’<sup>4</sup> অর্থাৎ যে অনুমান প্রমাণে কার্য বিশেষের দ্বারা কারণ বিশেষের অনুমিতি জন্মে তাকে শেষবৎ অনুমান বলা হয়। যেমনঃ নদীর পূর্ণতা ও স্রোতের প্রখরতা বিশেষরূপ কার্যের দ্বারা তার কারণ অতীত বৃষ্টির অনুমিতি জন্মে। ‘ব্রজ্যাপূর্বকমন্যত্র দৃষ্টস্যন্যত্রদর্শনমিতি তথাচাদিত্যস্য’<sup>5</sup> অর্থাৎ অন্যত্র দৃষ্ট দ্রব্যের অন্যত্র দর্শন ব্রজ্যাপূর্বক অর্থাৎ সেই দ্রব্যের গতিক্রিয়াপ্রযুক্ত;- এইরূপ মনে হয়। এইরূপ স্থলে অনুমান প্রমাণের নাম সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। যেমনঃ সূর্যের গতিক্রিয়া। প্রাতঃকালে এক স্থানে দৃষ্ট মধ্যাহ্নকালে অন্যত্র দৃষ্ট হয়। অতএব অপ্রত্যক্ষ হলে ও সূর্যের গতি আছে এইরূপ মনে হয়।

পরবর্তীকালে, ভাষ্যকার মহর্ষির প্রথমোক্ত “পূর্ববৎ” অনুমানের অন্যরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশের জন্য বলেছেন -“অথবা পূর্ববদিতি”।<sup>6</sup> অর্থাৎ তাঁর মতে, যে পদার্থদ্বয় পূর্বে অর্থাৎ ব্যাপ্তিপ্রত্যক্ষকালে যেক্ষেপে প্রত্যক্ষ হয়েছে, এরই মধ্যে অন্যত্র সেই পূর্বদৃষ্ট ব্যাপ্যপদার্থের তুল্য বা সজাতীয় পদার্থের অনুমিতি হলে সেই স্থলে অনুমান প্রমাণের নাম “পূর্ববৎ”। উদাহরণস্বরূপ-“যথা ধূমেনাগ্নিরিতি” অর্থাৎ ধূমত্বরূপে ধূম হেতুর দ্বারা বহ্নিত্বরূপে বহ্নির অনুমিতি জন্মে। স্পষ্ট ভাষায় বলা যায়-পূর্বদৃষ্ট ধূমের সজাতীয় ধূম দর্শনের দ্বারা পূর্বদৃষ্ট বহ্নির তুল্য বা সজাতীয় অপ্রত্যক্ষ বহ্নির অনুমিতি জন্মে। সেই অনুমিতির চরম কারণ যে বহ্নিব্যাপ্য ধূমদর্শনরূপ ক্রিয়া, তা পাকশালাদি স্থানে প্রথম ধূমদর্শন ক্রিয়ার তুল্য হওয়ায় উক্তরূপ অনুমান প্রমাণের নাম পূর্ববৎ। বাচস্পতি মিশ্র এর মতে, ভাষ্যে “প্রত্যক্ষভূত”<sup>7</sup> শব্দটি প্রদর্শন মাত্র। পূর্বে অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা পদার্থদ্বয়ের ব্যাপ্যব্যাপক ভাব সম্বন্ধের নিশ্চয় হলে অন্যত্র সেই ব্যাপ্য পদার্থের তুল্য বা সজাতীয় পদার্থের নিশ্চয়জন্য সেই ব্যাপক পদার্থের সজাতীয় পদার্থের অনুমিতি হলে সেই স্থলে অনুমান প্রমাণ ও পূর্ববৎ। ভাষ্যকার দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ “শেষবৎ” অনুমানের ব্যাখ্যায় বলেছেন- “শেষবল্লম পরিশেষঃ”<sup>8</sup> ইত্যাদি।

“শিষ্যতে অবশিষ্যতে” এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে “শেষ” শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ যা কোন প্রমাণ দ্বারা খণ্ডিত হয় না। শেষ পদার্থটি যে অনুমানপ্রমাণের প্রতিপাদ্য, সেই শেষ পদার্থের সাধক অনুমানপ্রমাণ। উক্ত শেষবৎ অনুমানের নাম-ই পরিশেষ অনুমান। তিনি “তস্মিন্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসংশয়ে” ইত্যাদির সন্দর্ভের দ্বারা সেই অনুমানের প্রণালী প্রদর্শন করেছেন। তৃতীয় প্রকার অনুমানের নাম “সামান্যতো দৃষ্ট”। এটি পূর্ববৎ অনুমানের বিপরীত। কারণ পূর্ববৎ অনুমান স্থলে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধ লৌকিক প্রত্যক্ষের যোগ্য নয়, সেই স্থলে সামান্যদৃষ্ট অনুমানের দ্বারা প্রকৃত সাধ্য সিদ্ধ হয়। যেমন- আত্মা দেহাদিভিন্নত্বরূপে লৌকিক প্রত্যক্ষের যোগ্য নয়। সুতরাং তাতে উৎপন্ন ইচ্ছা প্রভৃতি বিশেষ গুণ,মানসিক প্রত্যক্ষের বিষয় হলে সেই সমস্ত গুণে ওই আত্মার ব্যাপ্তি সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হতে পারে না। কারণ যাতে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ জন্মে, তা দেহাদিভিন্ন আত্মা এই রূপে ব্যাপ্তিনিশ্চয় করতে কোন প্রত্যক্ষসিদ্ধ উদাহরণ নেই। কিন্তু যা যা গুণপদার্থ, সে সমস্তই দ্রবাশ্রিত, যেমন রূপাদি গুণ এইরূপে সামান্যতঃ গুণপদার্থ ব্যাপ্তিসম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয়। কারণ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাদি গুণ যে, দ্রবাশ্রিত তা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং পূর্বোক্তরূপে সামান্যতঃ ব্যাপ্তি সম্বন্ধের ফলে ইচ্ছা প্রভৃতি মনোগ্রাহ্য গুণ কোন দ্রবাশ্রিত অর্থাৎ কোন দ্রব্য পদার্থ তার আশ্রয় বা আধার-এটি সিদ্ধ হয়। এইভাবে ফলতঃ আত্মা নামে অতিরিক্ত দ্রব্যই সিদ্ধ হয়। কিন্তু উদ্দ্যেতকর ও বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন- উক্ত স্থলে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের দ্বারা আত্মা সিদ্ধ হয় না। কারণ আত্মা সেই অনুমিতির বিষয়ই হয় না। কিন্তু যা যা গুণ পদার্থ, তা পরতন্ত্র অর্থাৎ পরাশ্রিত এইরূপে সামান্যতঃ গুণপদার্থ মাত্রে পরাশ্রিতের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হওয়ায় সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের দ্বারা ইচ্ছা প্রভৃতি গুণবিশেষে পরাশ্রিতত্বই সিদ্ধ হয়। পরে ওই ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ পৃথিবীদি কোন দ্রব্যশ্রিত নয়, এটি সিদ্ধ হলে শেষবৎ অনুমানের দ্বারা আত্মাশ্রিতত্ব সিদ্ধ হয়। সুতরাং পরে শেষবৎ অনুমানের দ্বারা-ই আত্মা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ প্রথমে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের পরতন্ত্র সাধক যে অনুমান তা সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। কিন্তু পরে ওই ইচ্ছাদি গুণের আত্মাশ্রিতত্ব সাধক যে অনুমান তা শেষবৎ। সুতরাং পূর্বোক্তরূপে সামান্যতো দৃষ্ট অনুমানের দ্বারাই যে আত্মা সিদ্ধ হয়, তা মহর্ষি কথিত বোঝা যায়। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র যে রূপে ব্যতিরেকী অনুমানকে শেষবৎ বলে আত্মার সাধক অনুমান বলেছেন তা ভাষ্যকার সম্মত বোঝা যায় না। অবশ্য ব্যতিরেকী অনুমানই যে শেষবৎ অনুমান -এইরূপ প্রাচীনসম্মত ব্যাখ্যা। উদ্দ্যেতকর তাঁর “ন্যায়বার্তিকের” প্রথম ব্যাখ্যায় বলেছেন-“ত্রিবিধমিতি, অন্বয়ী ব্যতিরেকী অন্বয়ব্যতিরেকী চ”<sup>৭</sup>। অর্থাৎ অন্বয়ী, ব্যতিরেকী ও অন্বয় ব্যতিরেকী- এই ত্রিবিধ অনুমানের কথা বলেছেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায় ও তাঁর “তত্ত্বচিন্তামনি” গ্রন্থে অনুমানকে ত্রিবিধ (অন্বয়ী, ব্যতিরেকী ও অন্বয় ব্যতিরেকী) বলেছেন। তবে উক্ত প্রকারত্রয়ের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ বিষয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। পরে হেতুবাক্য ও উদাহরণ বাক্যের লক্ষণাদি ব্যাখ্যায় উক্ত বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়। “কুসুমাঞ্জলি” গ্রন্থের তৃতীয় স্তবকে উপমানপ্রমাণের অনুমানত্ব-খন্ডনে ‘প্রকাশটীকা’কার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় এবং সেখানে ‘মকরন্দ’ ব্যাখ্যাকার রুচিদত্ত দত্তের বিচারেও উক্ত বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

নব্য নৈয়ায়িকমতে ব্যাপ্তির ত্রৈবিধ্যের জন্য হেতুর ত্রিবিধ স্বীকৃত হয়েছে। যথা, অন্বয়ীব্যাপ্তি, ব্যতিরেকীব্যাপ্তি ও অন্বয়ী ব্যতিরেকী ব্যাপ্তি। অন্বয়সহচারদর্শনের দ্বারা অন্বয়ব্যাপ্তি, ব্যতিরেক সহচারদর্শনের দ্বারা ব্যতিরেকীব্যাপ্তি এবং উভয়প্রকার সহচারদর্শনের দ্বারা অন্বয়ব্যতিরেকব্যাপ্তি হয়। এই ব্যাপ্তির ভেদের জন্যই হেতুকে তিন প্রকার বলা হয়েছে। হেতুতে সাধ্যের অন্বয়ব্যাপ্তির জ্ঞান হলে, পরে অনুমিতি হলে ওই হেতুকে কেবলান্বয়ী বলা হয়। হেতুতে সাধ্যের ব্যতিরেকব্যাপ্তির জ্ঞান হলে, পরে অনুমিতি হলে ওই হেতুকে

কেবল-ব্যতিরেকী বলা হয়। যখন হেতুতে সাধ্যের উভয়প্রকার ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় এবং তজ্জন্য অনুমিতি হয়, তখন হেতুকে অন্বয় ব্যতিরেকী বলা হয়। এই মতের সমর্থন হলেন গঙ্গেশ উপাধ্যায়। এই বিষয়ে রঘুনাথ শিরোমনি বলেছেন- সাধ্যের ভেদের জন্যই হেতুর ভেদ হয়, সাধ্য তিনপ্রকার হয় বলেই হেতুকে তিন প্রকার বলা হয়ে থাকে। আচার্য অন্নভট্ট তাঁর ‘তর্কসংগ্রহ’ গ্রন্থে কেবলান্বয়ী অনুমানের লক্ষণে বলেছেন- ‘অন্বয়মাত্রব্যাপ্তিকং কেবলান্বয়ি’<sup>10</sup> অর্থাৎ যে হেতু কেবল অন্বয় ব্যাপ্তি বিশিষ্ট তাকে কেবলান্বয়ী অনুমান বলা হয়। যেমন- ‘ঘটঃ অভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ পটবৎ’ এখানে অভিধেয়ত্ব সাধ্য ও প্রমেয়ত্ব হেতু হয়েছে। ফলে অন্বয় ব্যাপ্তি সম্ভব।’ যেখানে অভিধেয়ত্বের অভাব সেখানে জ্ঞেয়ত্বের অভাব’ এরূপ ব্যতিরেক ব্যাপ্তি সম্ভব হয় না। সব বস্তু অভিধেয় এবং সব বস্তু জ্ঞেয় হওয়ায় উক্ত অনুমানে জ্ঞেয়ত্ব হেতুটি কেবলান্বয়ী। তাই অনুমানটি কেবলান্বয়ী অনুমান। অন্নভট্ট তাঁর দীপিকা টীকায় কেবল অন্বয়ী পদের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে পদার্থ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হয়, অর্থাৎ যার অত্যন্তাভাব হয় না তাকেই কেবলান্বয়ী বলে। উল্লিখিত অনুমানে সাধ্য অভিধেয়ত্বের অত্যন্তাভাব কোথাও নেই। সমস্ত পদার্থই শব্দের দ্বারা অভিহিত। অতএব অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হওয়ায় সাধ্য ‘অভিধেয়ত্ব’ কেবলান্বয়ী। এই প্রসঙ্গে অন্নভট্ট অপর একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ‘প্রমেয়ত্ব’ হেতুটি সাধ্য ‘অভিধেয়ত্ব’র সমব্যাপক অর্থাৎ প্রমেয়ত্ব যেমন সর্বত্র আছে অভিধেয়ত্ব ও সেইরূপ সর্বত্র বর্তমান। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হল- পৃথিবীর সমস্ত বস্তু আমাদের মত ক্ষণজীবী স্বল্পমতি মানুষের জ্ঞানের বিষয় কীভাবে হবে? উত্তরে বলা হয়েছে-যাবতীয় বস্তু সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয় হয় এবং মানুষের জ্ঞাত, অজ্ঞাত সমস্ত বস্তু ‘সর্ব’ পদের দ্বারা অভিহিত হয়ে থাকে। অতএব উল্লিখিত সাধ্য অভিধেয়ত্ব ও হেতু প্রমেয়ত্ব এর অভাবের দৃষ্টান্ত সম্ভব না হওয়ায় হেতুটি কেবলান্বয়ী রূপে গ্রাহ্য। আচার্য অন্নভট্ট তাঁর ‘তর্কসংগ্রহ’ গ্রন্থে কেবল-ব্যতিরেকী অনুমানের লক্ষণে বলেছেন- ‘ব্যতিরেকব্যাপ্তিমাত্রকং কেবলব্যতিরেকি’<sup>11</sup> অর্থাৎ যে হেতু কেবল ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বিশিষ্ট তাকে কেবলব্যতিরেকী অনুমান বলা হয়। যেমন- ‘পৃথিবী ইতরেভ্যো ভিদ্যতে গন্ধবত্ত্বাৎ’ এখানে গন্ধবত্ত্বহেতুটি কেবলব্যতিরেকী। এই অনুমানে পক্ষ হল পৃথিবী। যেসব দ্রব্যকে বোঝাতে পৃথিবী শব্দের ব্যবহার হয় সেসব দ্রব্য-ই এই অনুমানের পক্ষ হয়েছে। এই অনুমানে ‘গন্ধবত্ত্ব’ হেতুটি কেবল ব্যতিরেকী হেতু। কেননা এখানে অন্বয় ব্যাপ্তি কখন-ই সম্ভব নয়। “যেখানে যেখানে গন্ধবত্ত্ব থাকে, সেখানে অন্যবস্তু হতে ভিন্নত্ব(ইতর ভেদ) থাকে” এরূপ অন্বয় ব্যাপ্তির দৃষ্টান্ত নেই। কেননা এই ব্যাপ্তির সমর্থক দৃষ্টান্ত পৃথিবীরই কোন না কোন প্রকারভেদ, যেহেতু একমাত্র পার্থিব বস্তুই গন্ধযুক্ত। কিন্তু পৃথিবী মাত্রই পক্ষ হওয়ায় অন্বয় ব্যাপ্তির দৃষ্টান্ত নেই। উক্ত অনুমানে ‘গন্ধবত্ত্ব’ হেতুটি কেবল ব্যতিরেকী। তাই অনুমানটি কেবলব্যতিরেকী অনুমান। আচার্য অন্নভট্ট তাঁর ‘তর্কসংগ্রহ’ গ্রন্থে অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমানের লক্ষণে বলেছেন-‘অন্বয়েন ব্যতিরেকেন চ ব্যাপ্তিমৎ অন্বয় ব্যতিরেকি’<sup>12</sup> অর্থাৎ যে হেতু অন্বয় এবং ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বিশিষ্ট তাকে অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান বলা হয়। যেমন-, পর্বত বহ্নিযুক্ত, যেহেতু পর্বত ধূমযুক্ত’-এই অনুমান অন্বয়-ব্যতিরেকী, যেহেতু এই অনুমানের হেতু ধূম অন্বয়-ব্যতিরেকী হেতু। কেননা ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি অন্বয়ের দ্বারা জানা যায়, আবার ব্যতিরেকের দ্বারা ও জানা যায়। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষণীয়, অন্ন ভট্ট দীপিকাটীকায় হেতু ও সাধ্যের নিয়ত সাহচর্যকে অন্বয়ব্যাপ্তি এবং উভয়ের অভাবের নিত্য সাহচর্যকে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বলেছেন। কিন্তু বক্তব্যটি আর-ও স্পষ্ট ও যথার্থ হ-ওয়া প্রয়োজন। অন্বয়ব্যতিরেকী হেতুর অন্বয়ব্যাপ্তিতে হেতু ব্যাপ্য হয় এবং সাধ্য ব্যাপক হয়; যথা- যেখানে ধূম থাকে, সেখানে বহ্নি থাকে। কিন্তু, ব্যতিরেক ব্যাপ্তিতে সাধ্যাভাব ব্যাপ্য হয় এবং হেতুভাব ব্যাপক হয়; যথা -যেখানে বহ্নিভাব থাকে, সেখানে ধূমাভাব থাকে। অবশ্য এই নিয়ম-

যেখানে হেতু ও সাধ্য সমন্বিত হয় না সেই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সমন্বিত হেতু ও সাধ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব নির্দেশের কোন নিয়ম নেই। আবার অভিপ্রায়ের দিক থেকে নৈয়ায়িকগণ অনুমানকে স্বার্থ ও পরার্থ ভেদে দ্বিবিধ বলেছেন। আচার্য অন্নভট্ট তাঁর 'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থে বলেছেন- অনুমান দুই প্রকার। যথা,- স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। স্বার্থানুমানের দ্বারা নিজে নিজে সাধ্য বিষয়ক জ্ঞান লাভ করা হয়। স্বার্থ অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য এই অনুমান প্রযুক্ত হওয়ায় একে স্বার্থানুমান বলে। গ্রন্থকার উদাহরণের মাধ্যমে স্বার্থানুমানের প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে- কোন ব্যক্তির রন্ধন, গোষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বারংবার ধূম ও বহ্নির সাহচর্যদর্শনের পর যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানে বহ্নি থাকে- এই প্রকার ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভ হয়। তারপর সে যখন কোন পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে প্রয়োজন বশতঃ অগ্নির সন্ধান করতে করতে নিকটবর্তী কোন পর্বতে ধূমদর্শন করে তখন ওখানে অগ্নি থাকতে ও পারে এইরূপ ওই ব্যক্তির মনে সংশয় জন্মায়। তারপর-ই সেই ব্যক্তির পূর্বলব্ধ ব্যাপ্তির যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানে বহ্নি থাকে- এইরূপ স্মরণ হয়। এবং বহ্নিব্যাপ্য ধূমই এই পর্বতে দেখা যাচ্ছে-এই প্রকার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান অর্থাৎ পরামর্শ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অন্নভট্ট পরামর্শজ্ঞানকে এখানে 'লিঙ্গপরামর্শ' নামে অভিহিত করেছেন। এর থেকেই পর্বতে অগ্নির অস্তিত্বের অনুমিতি জন্মে। স্বার্থানুমিতির জনক এই 'লিঙ্গপরামর্শ' স্বার্থানুমান নামে অভিহিত। স্বার্থানুমানে অপরের উপলব্ধি বা জ্ঞানের জন্য অনুমান করা হচ্ছে না বলে অপরকে নিজ মত বোঝানোর জন্য অনুমানটিকে যথার্থভাবে লেখার বা বলার প্রয়োজন হয় না বা কোনো বাক্য প্রয়োগ হয় না। স্বার্থানুমানের প্রক্রিয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্নভট্ট ভূয়োদর্শনকে ব্যাপ্তি জ্ঞানের কারণরূপে বর্ণনা করেছেন। ধূম এবং বহ্নির সাহচর্য বহুবার দর্শনের ফলে 'যেখানে ধূম থাকে সেখানে বহ্নি থাকে' এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু টীকায় তিনি ভূয়োদর্শনের দ্বারা ব্যাপ্তিনিশ্চয় সঙ্গত কিনা সেই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কেবলমাত্র ভূয়োদর্শন ব্যাপ্তিনির্ধারণে সমর্থ নয়। যেমন, বহুবার পৃথিবীত্ব ও লোহলেখ্যত্বের সাহচর্য্য দৃষ্ট হলেও মণিতে লোহলেখ্যত্ব সম্ভব না হওয়ায় উভয়ের ব্যাপ্তি সিদ্ধ হয় না। সুতরাং ভূয়ো দর্শনের দ্বারা ব্যাপ্তিগ্রহ অসম্ভব। এর উত্তরে বলা হয়েছে, ভূয়োদর্শন সত্ত্বেও যদি কোথাও ব্যাভিচার দৃষ্ট হয় তবে অবশ্যই ব্যাপ্তি নিশ্চয় হবে না। কিন্তু ব্যাভিচারের দৃষ্টান্ত বর্জিত যে ভূয়োদর্শন তার দ্বারা ব্যাপ্তিগ্রহে সংসব হতে পারে না। অন্যদিকে, পরের প্রয়োজনে অর্থাৎ অন্যের অবগতির উদ্দেশ্যে যে অনুমান প্রযুক্ত হয় তাকে পরার্থানুমান বলে। নিজে নিজে কোন বিষয়ে অনুমানজন্য জ্ঞানলাভের পর অন্যকে সেই বিষয়ে অবহিত করার প্রয়োজনে পঞ্চ-অবয়ববিশিষ্ট একটি মহাবাক্য প্রয়োগ করা হয়, যার পারিভাষিক নাম 'ন্যায়'। এই মহাবাক্য বা ন্যায়কে পরার্থানুমান বলে। বস্তুতঃ লিঙ্গ পরামর্শ-ই অনুমিতির করণ। যেহেতু পঞ্চাবয়ব বাক্যের মাধ্যমে অপরের লিঙ্গ পরামর্শ জ্ঞান এবং অনিমিতি উৎপন্ন হয়, সেইজন্য পঞ্চাবয়ব বাক্য বা ন্যায়কে ঔপচারিকভাবে পরার্থানুমান বলা হয়। অন্নভট্ট উদাহরণের মাধ্যমে যথাক্রমে পাঁচটি অবয়ব বাক্যের স্বরূপ বিবৃতি করেছেন এইরূপে- ১.পর্বতে বহ্নি আছে (প্রতিজ্ঞা) ২. যেহেতু পর্বতে ধূম আছে (হেতু) ৩. যেখানে যেখানে ধূম থাকে, সেখানে সেখানে বহ্নি থাকে, যথা-মহানস প্রভৃতি (উদাহরণ) ৪. এই পর্বতও সেইরূপ অর্থাৎ বহ্নি ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমযুক্ত (উপনয়) ৫.সুতরাং সেইরূপ অর্থাৎ পর্বত বহ্নিবিশিষ্ট (নিগমন)। এই পঞ্চাবয়ব বাক্য শ্রবণে অন্য ব্যক্তিরও 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান এই পর্বত' এই পরামর্শ জ্ঞানলাভ এবং ফলস্বরূপ পর্বতে বহ্নির অনুমিতি হয়। বাৎস্যায়ন তাঁর 'ন্যায়সূত্রভাষ্যে' বলেছেন- যে স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তিবশঃ সেই বিবাদবিষয় পদার্থে সংশয় জন্মে, সেই স্থলে একতর পক্ষ নিশ্চয়ের উদ্দেশ্যে বাদী ও প্রতিবাদী নিজ নিজ মতের বোধক যে অনুমান প্রদর্শন করেন, সেই অনুমান পরার্থানুমান।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মহর্ষি গৌতম তাঁর ‘ন্যায়সূত্র’-এ অনুমানকে পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট এই নামত্রয়ে ত্রিবিধ বলেছেন। কিন্তু এই ত্রিবিধ অনুমানের লক্ষণ সম্বন্ধে কিছু বলেননি। ভাষ্যকার প্রথম কল্পে কারণহেতুক অনুমানকে “পূর্ববৎ” এবং কার্যহেতুক অনুমানকে “শেষবৎ” বলে ব্যাখ্যা করেছেন। “সামান্যতোদৃষ্ট” অনুমানের একপ্রকার উদাহরণ প্রদর্শন করে তার অন্যবিধ স্বরূপ সূচনা করেছেন। উদ্দ্যোতকর তৃতীয় কল্পে ভাষ্যকারের প্রথম কল্প গ্রহণ করলেও ভাষ্যকারোক্ত “সামান্যতোদৃষ্ট” অনুমানের উদাহরণ গ্রহণ করেননি। তিনি তৃতীয় কল্পে কার্যকারণ-ভিন্ন হেতুক অনুমানকেই “সামান্যতোদৃষ্ট” বলেছেন। বলাকার দ্বারা জলের অনুমানকে তার উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। পরে ভাষ্যকারোক্ত সূর্যের গতির অনুমান রূপ উদাহরণের উল্লেখ করে তার প্রতিবাদ করেছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রথম কল্পে “পূর্ববৎ” বলতে কারণহেতুক, “শেষবৎ” বলতে কার্যহেতুক, ও “সামান্যতোদৃষ্ট” বলতে কার্যও নয়, কারণও নয়, এমন পদার্থহেতুক অনুমান এইরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। পরে ‘পূর্ববৎ’ বলতে অন্বয়ী, ‘শেষবৎ’ বলতে ব্যতিরেকী, ও ‘সামান্যতোদৃষ্ট’ বলতে অন্বয়ী-ব্যতিরেকী এইরূপ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। এই ব্যাখ্যা প্রথম কল্পে প্রাচীন ন্যায়চার্য উদ্দ্যোতকরই প্রদর্শন করেছেন; এটি নব্যদিগের উদ্ভাবিত নূতন ব্যাখ্যা নয়। তবে লক্ষণ ও উদাহরণ এই বিষয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। চিন্তামণিকার গঙ্গেশ উপাধ্যায় “কেবলান্বয়ী” প্রভৃতি নামে অনুমানকে ত্রিবিধ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তৎপূর্ববর্তী উদয়ণও অনুমানের ওই প্রকারত্রয়ের ব্যাখ্যা করেছেন। গঙ্গেশ প্রভৃতি নব্যদিগের ব্যাখ্যাত ত্রিবিধ অনুমানের চিন্তা করে, অনেকেই এই ব্যাখ্যা মহর্ষি সূত্রোক্ত “পূর্ববৎ” প্রভৃতি ত্রিবিধ অনুমানের নব্য নৈয়ায়িকদিগের সম্মত ব্যাখ্যা বলেন। কিন্তু গঙ্গেশ যে মহর্ষি-সূত্রোক্ত ত্রিবিধ অনুমানেরই ব্যাখ্যা করেছেন, স্বতন্ত্রভাবে অনুমানের প্রকারত্রয়ের ব্যাখ্যা করেননি তা নিঃসংশয়ে বোঝা যায় না। পরন্তু নব্য-নৈয়ায়িক চূড়ামনি গদাধর ভট্টাচার্য মহর্ষি গৌতমের অনুমান সূত্র উদ্ধৃত করে পূর্ববৎ বলতে কারণলিঙ্গক, শেষবৎ বলতে কার্যলিঙ্গক এবং সামান্যতোদৃষ্ট বলতে কার্যকারণ-ভিন্নলিঙ্গক অনুমান- এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদর্শন করেছেন। তবে, এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে, লক্ষণ ও উদাহরণ এই বিষয়ে অনেক মতভেদ থাকার ফলে পরোক্ষভাবে এই অনুমানগুলির কথা স্বীকার না করলেও অপরোক্ষভাবে এই অনুমানগুলির (পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট) কথা ওই সমস্ত দার্শনিকদের আলোচনায় পাওয়া যায় বলে মনে হয়।

<sup>1</sup> তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন, খন্ড প্রথম, পৃ:-১৫২।

<sup>2</sup> তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন, খন্ড প্রথম, পৃ:-১৫২।

<sup>3</sup> তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন, খন্ড প্রথম, পৃ:-১৬৮।

<sup>4</sup> তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন, খন্ড প্রথম, পৃ:-১৬৮।

<sup>5</sup> তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন, খন্ড প্রথম, পৃ:-১৬৭।

<sup>6</sup> তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন, খন্ড প্রথম, পৃ:-১৭২।

- <sup>7</sup> তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন, খন্ড প্রথম, পৃ:-১৭২।
- <sup>8</sup> তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন, খন্ড প্রথম, পৃ:-১৭৩।
- <sup>9</sup> তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন, খন্ড প্রথম, পৃ:-১৭৭।
- <sup>10</sup> গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র, তর্কসংগ্রহ, পৃ:-৪০০।
- <sup>11</sup> গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র, তর্কসংগ্রহ, পৃ:-৪০০।
- <sup>12</sup> গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র, তর্কসংগ্রহ, পৃ:-৪০০।

### গ্রন্থপঞ্জি:

১. ন্যায়াচার্য, ভট্টাচার্য, আশুতোষ, 'ভাষাপরিচ্ছেদ', বিজয়ান, কলিকাতা-৭০০০০৯।
২. রায়, চৌধুরী, অনামিকা, 'ভাষাপরিচ্ছেদ', সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা-৭০০০০৬।
৩. গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র, 'তর্কসংগ্রহ', সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা-৭০০০০৬।
৪. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন' খন্ড প্রথম, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা-২০১৪।
৫. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, 'ন্যায়দর্শন' খন্ড দ্বিতীয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা-২০১৪।
৬. রায়, চৌধুরী, অনামিকা, 'তর্কসংগ্রহ', সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা-৭০০০০৬।
৭. শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র, 'ভাষাপরিচ্ছেদ', রায় বাহাদুর কর্তৃক অনূদিত, কলিকাতা ১৩১৯।
৮. ঘোষ, দীপক কুমার, 'ভাষাপরিচ্ছেদ সমীক্ষা', সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা-২০০৩।
৯. ব্রহ্মচারী, শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপ, 'ভাষাপরিচ্ছেদ', কলিকাতা।





# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 786-796

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.069



## মহর্ষি পতঞ্জল ও শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে ‘যোগ’: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

রাজকুমার পণ্ডিত, শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজ, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 18.01.2025; Accepted: 21.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*Bhāratavarṣa is primarily a spiritual land with a distinct and rich cultural heritage. It has given birth to countless saints, sages, and philosophers who have continuously worked to restore and renew its spiritual traditions. These traditions, rooted in the Vedic age, have remained vibrant despite external invasions and internal upheavals. Maharṣi Patanjali and Ṛṣi Aurobindo represent two ends of this unbroken and ever-evolving spiritual tradition.*

*The concept of Yoga holds significant importance in the history of Bhāratiya Darśana (Indian Philosophy). Although widely discussed, different philosophical schools and thinkers have not yet to reach a consensus on the fundamental nature of yoga and its methods of practice. This article presents a comparative analysis of Maharṣi Patanjali's and Ṛṣi Aurobindo's descriptions of yoga. In Patanjali's yoga, the concept of Cittavṛtti is introduced while defining the lakṣaṇa (definition) of yoga. The five types of vṛttis (fluctuations) of citta (consciousness) are well elaborated, along with how Aṣṭāṅga-Yoga (Eightfold Yoga) leads to Kaivalya, the state of absolute liberation attained by restraining cittavṛttis. On the other hand, Shri Aurobindo discussed Purṇayoga (Integral-Yoga) by integrating the concepts of Cit (Consciousness) and Acit (Unconsciousness). He envisions the realization of Divine Life through an integral evolution based on the process of descent and ascent. This article further provides a coherent analysis of the differences between Maharṣi Patanjali's Samādhi-Yoga and Shri Aurobindo's Integral-Yoga, highlighting their unique perspectives on spiritual realization.*

**Keywords:** Akhaṇḍa-Yoga, Aṣṭāṅga-Yoga, Cittavṛtti, Saccidānanda, Samādhi, Yoga.

ভারতীয় দর্শনালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয় হলো ‘যোগ’। এই ‘যোগ’-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বেদোপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, ভগবদ্গীতা, পুরাণাদি প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে নানান আলোচনা রয়েছে। কিন্তু ‘যোগ’কে পৃথক ও সুসংবদ্ধভাবে শাস্ত্র হিসেবে বর্ণনা করে মহর্ষি পতঞ্জল মানবজাতিকে এক অতি উৎকৃষ্ট উপঢৌকন প্রদান করেছেন। ‘যুজ্’ ধাতুর উত্তর ‘ঘঞ’ প্রত্যয় যোগে ‘যোগ’ শব্দটি ব্যুৎপন্ন। ‘যুজ্’ ধাতুর অর্থ হলো ‘যুক্ত হওয়া’। মহর্ষি পতঞ্জল ‘যোগ’ শব্দটিকে সাধারণ অর্থে বা পর্ব-১, সংখ্যা-৩, জানুয়ারি, ২০২৫

আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেননি। যোগ দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হলেও মহর্ষি পতঞ্জল 'যোগ' শব্দটিকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়াকে বোঝাননি। 'যোগসূত্রে' তিনি 'যোগ' শব্দটিকে বিশেষার্থে, 'সমাধি-যোগ' অর্থে গ্রহণ করেছেন। যোগের লক্ষণ প্রসঙ্গে মহর্ষি পতঞ্জল বলেছেন, “যোগশ্চিত্ত্বত্তিনিরোধঃ”<sup>১</sup>, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধই 'যোগ'। এক্ষেত্রে 'যোগ'-এর অর্থ প্রাজ্ঞলভাবে অনুধাবন করতে হলে প্রথমে 'চিত্ত' ও তার 'বৃত্তি' সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে হবে।

সাংখ্যশাস্ত্রে উল্লিখিত মহৎ বা বুদ্ধি, অহংকার এবং মন- এই ত্রিবিধ তত্ত্বকে একত্রে যোগশাস্ত্রে 'চিত্ত' বলা হয়েছে। 'বৃত্তি' শব্দের অর্থ 'পরিণাম'। মহৎ, অহংকার ও মন এই তিনটি তত্ত্ব প্রকৃতির পরিণাম। প্রকৃতির পরিণাম এই চিত্তের বৃত্তি বা বিকারকেই বলা হয় “চিত্তবৃত্তি”। প্রকৃতি স্বরূপতঃ অচেতন ও পরিণামী। পুরুষ বা আত্মা স্বরূপতঃ চেতন্যবিশিষ্ট, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, উদাসীন ও বিকারবিহীন। পুরুষ বা আত্মা স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ হওয়ার জন্য চৈতন্যের বিকার সম্ভবই নয়, চিত্তে প্রতিফলিত আত্মারই শুধু বিকার হয়। পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ চিত্তে পুরুষের চৈতন্য প্রতিফলিত হয়। সত্ত্বগুণের আধিক্য হেতু চিত্ত অত্যন্ত স্বচ্ছ হয়। সেইজন্য চিত্তের ওপর পুরুষ বা আত্মার চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হলে চিত্ত চেতনরূপে প্রতিভাত হয়। এই প্রতিবিম্বনের ফলে, প্রতিফলিত পুরুষ বা আত্মা চিত্তের বিকারকে নিজের বিকার বলে মনে করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গতিশীল সলীল তরঙ্গে চন্দ্রমার প্রতিফলন হলে চন্দ্রমাকে যেমন সঞ্চরণশীল মনে হয়, তেমনি নির্বিকার পুরুষ চিত্তে প্রতিবিম্বিত হলে চিত্তের বিকার বা বৃত্তিগুলিকে আত্মার নিজের বৃত্তি বা বিকার বলে মনে হয়। মনের মাধ্যমে চিত্ত যখন কোনো বিষয়ের সহিত যুক্ত হয় তখন চিত্ত সেই বিষয়েরই আকার ধারণ করে। চিত্তের এই বিষয়াকারের গ্রহণই হলো চিত্তবৃত্তি বা চিত্তের বৃত্তি। চিত্তে প্রতিবিম্বিত আত্মাই অবিদ্যাবশতঃ নিজেকে এইসব বৃত্তিজ্ঞানের জ্ঞাতা-কর্তা-ভোক্তা বলে মনে করে এবং এই অবস্থাই পুরুষ বা আত্মার বদ্ধাবস্থা। বদ্ধাবস্থায় পুরুষ পঞ্চক্লেশে<sup>২</sup> ক্লিষ্ট হয়, আর সেজন্যই বদ্ধমুক্তির হেতু স্বরূপ চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তির প্রয়োজন হয়। চিত্তবৃত্তির নিরোধ সম্পন্ন হলে চিত্ত পরিপূর্ণভাবে বৃত্তিহীনরূপে অবস্থান করে। চিত্তের এইরূপ অবস্থাই হলো 'যোগ' বা 'সমাধি'। চিত্তের বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে নিরোধ হলে প্রকৃতির সাথে পুরুষের সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং পুরুষ স্ব-রূপে অবস্থান করে। এই অবস্থাকে কৈবল্যাবস্থা বা মুক্তাবস্থা বলা হয়। সুতরাং, জীবের কৈবল্যসিদ্ধির জন্য চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ বা যোগ-সমাধির প্রয়োজন হয়।

যোগশাস্ত্রে চিত্তবৃত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, “প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ”<sup>৩</sup>। অর্থাৎ, চিত্তের বৃত্তি পাঁচ প্রকারের- প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। 'প্রমাণ' হলো যথার্থ জ্ঞান বা বৃত্তি। সাংখ্য-যোগশাস্ত্রে

<sup>১</sup> যোগসূত্র ১/২

<sup>২</sup> যোগশাস্ত্রে 'ক্লেশ' এমন এক মানসিক অবস্থা, যা মনকে অশুদ্ধতামূলক ক্রিয়ার দিকে ধাবিত করায়। ক্লেশ পাঁচ প্রকার- অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। 'অবিদ্যা' হলো অজ্ঞান। অনিত্যকে নিত্য রূপে, দুঃখকে সুখ রূপে, অশুচিকে শুচি রূপে এবং অনাত্মাকে আত্মা রূপে ভ্রম জ্ঞানই হলো অবিদ্যা। অর্থাৎ, অবিদ্যাই সকল ক্লেশের মূল। 'অস্মিতা' হল অহং-অভিমান। বুদ্ধ্যাদি প্রকৃতির পরিণামকে পুরুষের 'আমার' মনে করাই হলো 'অস্মিতা'। 'রাগ' হলো সুখজনক বস্তুর প্রতি তৃষ্ণা বা আসক্তি। 'দ্বেষ' হলো দুঃখজনক বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা। 'অভিনিবেশ' হলো মৃত্যুভয়। সাধারণ পুরুষ এই পঞ্চক্লেশাধীন, কিন্তু বিশিষ্ট পুরুষরূপে ঈশ্বর এসব থেকে সদামুক্ত।

<sup>৩</sup> যোগসূত্র ১/৬

তিনটি প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে- প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম বা শব্দ। ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যবস্তুর সংযোগজনিত চিত্তের বৃত্তিই হলো প্রত্যক্ষজ্ঞান বা 'প্রত্যক্ষবৃত্তি'। এই প্রত্যক্ষবৃত্তি 'বাহ্য' ও 'আন্তর' ভেদে দ্বিবিধ। ঘটাদি বাহ্যবস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়মনঃসংযোগের ফলে চিত্তের যে ঘটজ্ঞান বা ঘটাকার বৃত্তি হয়, তা হলো 'বাহ্যপ্রত্যক্ষবৃত্তি'। মন-রূপ অন্তরিন্দ্রীয়ের দ্বারা চিত্তের সুখ-দুঃখাদি মানসিক অবস্থা সমূহের যে বৃত্তি বা জ্ঞান হয় তা 'অন্তঃপ্রত্যক্ষবৃত্তি'। দৃষ্ট বস্তুর (হেতুর) জ্ঞানের সাহায্যে অদৃষ্ট বস্তুর (সাধ্যের) সম্পর্কে যে জ্ঞান বা বৃত্তি হয় তা 'অনুমানবৃত্তি', যথা- ধূম দর্শনের পর বহি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। যথার্থবক্তা বা আশুব্যক্তির বাক্য শ্রবণের পর শ্রোতার চিত্তে যে বৃত্তির উৎপন্ন হয়, তাই শাব্দজ্ঞান বা আগমবৃত্তি।

'বিপর্যয়' হলো মিথ্যা জ্ঞান বা ভ্রান্তজ্ঞান। অর্থাৎ, যা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত নয়, কিন্তু তা জ্ঞানের অভাবও নয়। চিত্তবৃত্তি বিষয়ানুরূপ না হয়ে যদি ভিন্নরূপ হয় তাহলে তা হবে মিথ্যা জ্ঞান বা বিপর্যয়। যেমন, 'রজ্জুতে সর্পভ্রম' হলো বিপর্যয় বা ভ্রান্তজ্ঞান। রজ্জুহলে চিত্ত রজ্জুর আকার গ্রহণ করার পরিবর্তে সর্পের আকার গ্রহণ করে, তাই রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হলো বিপর্যয়। যে জ্ঞান কেবলমাত্র শব্দাশ্রিত, যেখানে শব্দের অর্থানুসারে কোনো বস্তু বাস্তবত থাকে না, অথচ সেই শব্দকে আশ্রয় করে কোনো একটি প্রচলিত অর্থে চিত্তের যে বৃত্তি বা জ্ঞান হয়, তাই 'বিকল্প'। অর্থাৎ, বস্তুর অস্তিত্ব নাই অথচ শব্দজন্য একপ্রকার মনোবৃত্তি জন্মে, তাদৃশ মনোবৃত্তিই হলো 'বিকল্প'। অনাসন্ন কল্পনার নাম বিকল্প। যেমন- সোনার পাথরবাটি, আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ, অশ্বডিম্ব বলে বাস্তবত কিছু না থাকলেও এইসব প্রচলিত শব্দ শুনে শ্রোতার চিত্তে একপ্রকার বৃত্তি উৎপন্ন হয়। নিদ্রাকালীন অবস্থায় জ্ঞানের অভাব বিষয়ক জ্ঞান বা বৃত্তি হয় বলে 'নিদ্রা'ও একপ্রকারের চিত্তবৃত্তি। যোগশাস্ত্রে, 'নিদ্রা' অর্থে সুষুপ্তি বা স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রাকে বোঝায়। গভীর নিদ্রাকালে জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতা বা স্বপ্নাবস্থার অভিজ্ঞতা না হলেও, এইসব অভিজ্ঞতাসমূহের অভাবের জ্ঞান হয়। অর্থাৎ, গভীর নিদ্রাভঙ্গের পর আমরা বলে থাকি, 'আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমার কোনো জ্ঞান ছিল না'। 'জ্ঞান নেই' এইরূপ অনুভবও জ্ঞান। কাজেই যোগশাস্ত্রে, নিদ্রাকালে জ্ঞানাভাবের চিত্তবৃত্তি হয়ে থাকে। পূর্বানুভূত হয়েছে এমন বিষয়মাত্র গ্রহণের জ্ঞান বা বৃত্তি হলো 'স্মৃতি'। অতীত অভিজ্ঞতার বিষয়কে প্রতিরূপের আকারে অন্তরে ধারণ করাই সংস্কার, আর এই সংস্কারের পুনরুজ্জীবনই হলো স্মৃতি। অতীতকালে ঘট প্রত্যক্ষের ফলে চিত্তে ঘটাকারবৃত্তি সংস্কাররূপে সঞ্চিত থাকে। বর্তমানে আমার সম্মুখে ঘট না থাকলেও যদি সেই পূর্ব সংস্কারের উদ্দেক হয়, তবে ঘটাকারবৃত্তিরও উদ্দেক হবে। এভাবেই পূর্বানুভূত বিষয়ের সংস্কারের যথাযথভাবে পুনরুজ্জীবনই হলো স্মৃতি।

এখন প্রশ্ন হলো, এই পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তির নিরোধের উপায় কি? পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র মতে, "অভ্যাসবৈরাগ্যাভাং তন্নিরোধঃ"<sup>4</sup>। অর্থাৎ, অভ্যাস (ধ্যানাভ্যাস) ও বৈরাগ্য সাধনের মাধ্যমেই ক্লিষ্ট চিত্তবৃত্তি সমুদায়ের নিরোধ সম্ভব বলে যোগশাস্ত্রে স্বীকৃত। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বস্তুর প্রতি নির্লিঙ্গভাব বা বিতৃষ্ণা ভাবকেই 'বৈরাগ্য' বলে। বৈরাগ্যের ফলে চিত্তের বিষয়মুখিতা অন্তর্হিত হয় এবং চিত্ত অন্তর্মুখী হয়, ফলতঃ আত্মা বা পুরুষের প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট হয়। পুরুষ বা আত্মার প্রতি এই চিত্ত-নিবেশকে সুদৃঢ় করবার জন্যই প্রয়োজন 'অভ্যাস'-এর। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত আত্মমুখী হলে চিত্তের সকল প্রকার মলিনতা দূরীভূত হয়। এইভাবে চিত্তশুদ্ধি হলে বিবেকখ্যাতি (পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞান) বা বিবেকজ্ঞানের উদয় হয়।

<sup>4</sup> যোগসূত্র ১/১২

বিবেকখ্যাতিই দুঃখমুক্তি ও কৈবল্যলাভের উপায় স্বরূপ। অর্থাৎ, বিবেকজ্ঞান লাভের জন্য চিত্তশুদ্ধি প্রয়োজন, আর চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন অষ্টবিধ যোগানুষ্ঠান বা অনুশীলন। এই অষ্টবিধ যোগানুশীলনই পতঞ্জল যোগদর্শনে 'অষ্টাঙ্গিক যোগ' বা 'অষ্ট যোগাঙ্গ' হিসেবে প্রকটিত। এই অষ্টবিধ যোগাঙ্গের স্বরূপ হলো, “যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োহষ্টাবঙ্গানি”<sup>5</sup>। অর্থাৎ- যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি; এই আটটি হলো যোগের অঙ্গস্বরূপ।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ- এই পাঁচটি অঙ্গের সাধনকেই বলা হয় 'যম'। 'অহিংসা' বলতে কায়-মন-বাক্যে সর্ববিধ হিংসাজনক ক্রিয়া থেকে বিরত থাকাকে বোঝায়। অহিংসা কেবল নেতিমূলক সাধনমাত্র নয়, এর ইতিমূলক দিক হলো 'মৈত্রী'। হিংসা না করা হলো অহিংসার নেতিবাচক দিক, আর মিত্রসুলভ আচরণ তথা প্রেম-ভালোবাসার সিঞ্চনই হলো অহিংসার ইতিবাচক দিক। 'সত্য' বলতে বোঝায় সর্বপ্রকার অসত্যভাষণ ও চিন্তন তথা অপ্রিয়ভাষণ, অতিভাষণ প্রভৃতি বর্জন করে সর্বদা সত্যভাষণ ও সত্যচিন্তন অত্যাবশ্যিক। সত্য অপ্রিয় হলে সেক্ষেত্রে মৌনতা অবলম্বন কাম্য। 'অস্তেয়' বলতে বোঝায়- যা নিজের নয়, অর্থাৎ পরদ্রব্য গ্রহণ থেকে সদা বিরত থাকা। এক্ষেত্রে অর্চৌর্য ব্রতে সাধক পরদ্রব্য গ্রহণের ইচ্ছা পর্যন্তও করতে পারবে না। 'ব্রহ্মচর্য' হলো মূলতঃ জনেন্দ্রিয়ের সংযম। এর জন্য প্রয়োজন অপরাপর ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করা, মিতনিদ্রা ও মিতাহার অভ্যাস, এবং সর্বপ্রকার কামমূলক চিন্তা বর্জন করা। কামনা-বাসনারূপ তৃষ্ণার অধীনস্থ হওয়ার নাম 'পরিগ্রহ'। প্রয়োজনাতিরিক্ত অপরের দান গ্রহণ না করে কেবলমাত্র দেহযাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত যথকিঞ্চিৎ দ্রব্যের গ্রহণকে বলা হয় 'অপরিগ্রহ' (ত্যাগশক্তি)। এইরূপ যম সাধনার ফলে চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হয় এবং চিত্তে যথোপযুক্ত বৈরাগ্যের উৎপন্ন হয়।

শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান; এই পাঁচ প্রকার অনুষ্ঠেয় ক্রিয়ার নাম 'নিয়ম'। তন্মধ্যে 'শৌচ' (শুদ্ধ থাকা) বা শুচিতা দুই প্রকার- বাহ্য এবং আভ্যন্তর। শরীর পরিষ্কার করা, সাত্ত্বিক আহারাদি হলো বাহ্য শৌচ। অহং-অভিমান, অসূয়া প্রভৃতি সকল প্রকার চিত্তগত মলিনতা থেকে মনকে মুক্ত করে মৈত্র্যাদি সদগুণের অনুশীলনই আভ্যন্তর শৌচ। 'সন্তোষ' হলো তৃপ্তি বা অল্পে সন্তুষ্টি। যেটা পাইনি তার জন্য বিলাপ না করে যেটুকু পেয়েছি তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষায় চিত্ত চঞ্চল ও অস্থির হয়, কিন্তু সন্তোষের দ্বারাই চিত্তে শান্তি প্রতিষ্ঠা পায়। 'তপস্যা' হলো সহনশীলতার অভ্যাস এবং ব্রতাচার অনুশীলন। চিত্তে স্বৈর্য বা সংকল্প সাধনের ক্ষেত্রে উপবাস, স্বল্পাহার, কোমলশয্যা বর্জনপূর্বক কঠিনশয্যা গ্রহণ, শীতোষ্ণ সহনাদি ক্রিয়া তপস্যার অন্তর্গত। 'স্বাধ্যায়' হলো যথাবিধি অর্থ সহ বেদপনিষদ ও ভগবদ্গীতাাদি মোক্ষশাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন বা প্রণব-জপ। এর ফলে বিষয়বস্তুর চিন্তা ক্ষীণ হবে এবং আত্মজ্ঞানের বাসনা জাগরিত হবে। 'ঈশ্বর-প্রণিধান' হলো পরমগুরু বা ঈশ্বরের নিরন্তর ধ্যান এবং পরমেশ্বরে সর্ব কর্ম সমর্পণ। ঈশ্বর-প্রণিধানের ফলে ঈশ্বর পরম করুণাবশতঃ সাধকের সাধন পথের সকল প্রতিবন্ধকতা অপসৃত করে সমাধিলাভের সহায়ক করে তোলেন।

স্থিরভাবে (নিশ্চল) সুখজনক উপবেশনই 'আসন'। যেমন- পদ্মাসন, বীরাসান ইত্যাদি। শরীর সুস্থ ও নীরোগ না হলে যোগসাধনা সম্ভব নয়, তাই শারীরিক সুস্থতার হেতু আসন অত্যাবশ্যিক। মনকে সুস্থ রাখার জন্য শরীরকে সুস্থ ও নীরোগ রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সুস্থ দেহ-মনই চিত্ত সংযমের ক্ষেত্রে সহায়ক। আসন

<sup>5</sup> যোগসূত্র ২/২৯

জয় হলে পর, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ও তাদের গতির যে রোধ (নিয়ন্ত্রণ), তাই হলো 'প্রাণায়াম'। পুরক, রেচক ও কুম্ভক- এই তিন প্রকার শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে গতিবিচ্ছেদের ফলে চিত্তে স্থিরতা আসে এবং কোনো বিষয়ে চিত্তনিবেশ সম্ভব হয়। 'প্রত্যাহার' হলো ইন্দ্রিয়সমূহকে বাহ্য বিষয় থেকে মুক্ত রেখে চিত্তের অনুগত বা অন্তর্মুখী করা। ফলে চিত্তের বিষয়াসক্তি বিনষ্ট হয় এবং তখন চিত্ত স্থিরভাবে ধ্যেয়বস্তুতে নিবিষ্ট হয়। দেশ বিশেষে চিত্তের স্থিতি হলো 'ধারণা'। ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিত জ্যোতিতে, নাভিচক্রে, হৃদয়পুণ্ডরীকে, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রাদি শরীরভাগান্তরে, দেবমূর্তি বা ওঙ্কারাদি বাহ্য বিষয়ে চিত্তের বৃত্তিমাত্র সহায়ে সম্যক স্থিতিই ধারণা। ধারণা জনিত প্রত্যয়ের অর্থাৎ জ্ঞানবৃত্তির একতানতা বা নিরবিচ্ছিন্নতাই হলো 'ধ্যান'। 'সমাধি' অবস্থায়, সেই ধ্যান'ই যখন তার বিষয়মাত্র প্রকাশে স্বরূপ-শূন্য-মতো হয়, অর্থাৎ চিত্ত ধ্যেয়বস্তুতে বিলীন হয়- ধ্যানক্রিয়া, ধ্যেয়বস্তু, ও ধ্যানকর্তার মধ্যে কোনো ভেদ থাকে না। এটি অষ্টবিধ যোগাঙ্গের অন্তিম ও সর্বোচ্চ স্তর। অষ্টাঙ্গযোগান্তর্গত এই যোগ-সমাধি চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ সমাধি-যোগ থেকে পৃথক। সমাধি-যোগ হলো পুরুষের লক্ষ্য, কারণ এছলেই সাধকের মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। আর যোগ-সমাধি হলো লক্ষ্যলাভের উপায় বা পথ, যাকে অবলম্বন করে সমাধি-যোগ আয়ত্ত করা সম্ভব। তাই বলা যায়, চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ সমাধির (সমাধি-যোগের) জন্যই অষ্টাঙ্গিক যোগের (যোগ-সমাধির) প্রয়োজন হয়।

যোগশাস্ত্র মতে 'সমাধি-যোগ' দুই প্রকার- ধ্যানসমাধি বা **সম্প্রজ্ঞাত সমাধি** এবং পূর্ণসমাধি বা **অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি**। 'সম্প্রজ্ঞাত' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো প্রকৃষ্ট বা সম্যকরূপে জ্ঞাত। এইরূপ অবস্থায় ধ্যেয়বস্তুকে সম্যক্ ভাবে জানা যায় বলে এই সমাধিকে 'সম্প্রজ্ঞাত' বলা হয়। ধ্যানসমাধির ক্ষেত্রে কেবল বিষয়টিতেই চিত্ত সম্পূর্ণরূপে মগ্ন থাকে। এক্ষেত্রে বিষয়াকার অতিসূক্ষ্মরূপে থাকে বলে চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে নিরোধ হয় না। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চার প্রকার- সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সান্মিত। সাধারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য-শূন্য-বিষয়ে চিত্তের ধ্যান-নিবিষ্ট হওয়াকে বলে 'সবিতর্ক সমাধি'। যেমন, দেবদেবীর মূর্তিতে চিত্ত নিবিষ্ট করা বা ধ্যানস্থ হওয়া। এই সমাধির দ্বারা পঞ্চভূতসমূহের জ্ঞান হয়। বাহ্য-শূন্য বিষয়ে চিত্তনিবেশ আয়ত্ত হলে যোগীগণ বিচার বিশেষের দ্বারা তন্মাত্রাদি বাহ্য-সূক্ষ্ম বিষয়ে সম্প্রজ্ঞান হওয়াকে বলে 'সবিচার সমাধি'। বাহ্য-সূক্ষ্ম-বিষয়ে চিত্তনিবেশ আয়ত্ত হলে যোগীগণ ইন্দ্রিয়াদি আধ্যাত্মিক শূন্য বিষয়ে চিত্তের-ধ্যান-নিবিষ্ট হওয়াকে 'সানন্দ সমাধি' বলে। এক্ষেত্রে যোগীর সর্বশরীরে এক আনন্দময় সাত্ত্বিক ভাবের অনুভব হয়। আধ্যাত্মিক শূন্যবিষয়ে চিত্ত নিবেশ আয়ত্ত হলে যোগীগণ বুদ্ধিতত্ত্ব এবং অহংকারতত্ত্বকে ধ্যানের বিষয় করেন, এখানে অহংবোধ বা অস্মিতা ধ্যানের বিষয় হওয়ায় একে বলে 'সান্মিত সমাধি'। বুদ্ধিতে প্রতিবিস্তিত পুরুষ বা আত্মাই ধ্যানের বিষয় হওয়ায় সান্মিত সমাধিতে পুরুষ (আত্মা) স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই সান্মিত অবস্থাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সর্বোচ্চাবস্থা। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের বিষয়াকার বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয় না, অর্থাৎ বিষয়-বীজ থাকে বলে একে 'সবীজ সমাধি'ও বলা হয়।

'অসম্প্রজ্ঞাত' শব্দের অর্থ হলো, যে অবস্থায় বিষয়ের কোনরূপ অস্তিত্ব থাকে না। 'অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি'তে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা যোগীর চিত্তবৃত্তি একে একে সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়। এক্ষেত্রে চিত্তে কোনো বাহ্য বিষয় এবং আধ্যাত্মিক বিষয় না থাকায় তা সম্পূর্ণভাবে নিরালম্ব, এজন্য এই সমাধিকে 'নিরালম্ব সমাধি' বা 'নিবীজ সমাধি' বলা হয়। এই পূর্ণ-সমাধিতে আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ চিত্ত নিরুদ্ধ হয় এবং অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন হয়। এখানে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় পুরুষ অর্থাৎ

আত্মা চৈতন্যস্বরূপে অবস্থান করে। এই অবস্থাই হলো পরম পুরুষার্থ বা কৈবল্যাবস্থা বা মুক্তাবস্থা বা আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির অবস্থা।

একটি ধরাবাঁধা ছকে ফেলে দর্শন বা দার্শনিককে সাধারণত আমরা যেভাবে বুঝি, শ্রীঅরবিন্দ সেই জাতীয় নকশায় তাঁর দর্শনচিন্তার পদ্ধতিকে রুদ্ধ রাখার পরিপন্থী। তবে ভারতীয় দর্শনের আদর্শেই তিনি দার্শনিক ছিলেন, তাই এক্ষেত্রে দর্শনচর্চায় নিরত থেকে চর্যার বিসর্জন দিয়েছেন এমন বলা যাবে না। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিক চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটিয়ে তত্ত্বসমৃদ্ধ যে নব্য স্রোত ভারতীয় দর্শন চিন্তার গোড়াপত্তন ঘটিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ তাতে দেহ, মন, প্রাণ ও আত্মার এবং অপরদিকে ব্যক্তি এবং সমষ্টির প্রতিও গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের এই দর্শনচর্চা, জীবনচর্যার মধ্য দিয়েই রূপায়িত হবে, এই পার্থিব জীবনেই ফুটবে দ্যুলোকের দীপ্তি, মর্ত্য আধারেই সার্থক হবে অমৃতের প্রৈতি।'<sup>6</sup>

সাংখ্য-যোগশাস্ত্রে প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের যে ভ্রমাত্মক একাত্মতা স্থাপিত হয়েছিল তার থেকে পুরুষ সচেতন হয়েছে এবং প্রকৃতি থেকে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, প্রকৃতির প্রতি বন্ধনজাত দুঃখ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে। এই ধরনের দ্বৈতবাদ এর কথা এবং তজ্জনিত দুঃখ অতিক্রমের হেতু অভ্যাস-বৈরাগের কথাও বলা হয়েছে এই দুই শাস্ত্রে। কিন্তু, এই ধরনের দ্বৈতবাদকে শ্রীঅরবিন্দ 'অসম্পূর্ণ' (a half-way house) বলে অভিহিত করেছেন।<sup>7</sup> প্রকৃতি ও পুরুষ দুটি পরস্পর বিরোধী ও পরস্পর নিরপেক্ষ সত্তা বলে মনে করা হয়, তবে সেই সত্তা দ্বয় কেমন করে সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সমন্বিত থাকে তা সাধারণ বুদ্ধির কাছে স্পষ্ট হয় না। এই প্রকারের আধিবিদ্যক দ্বৈতবাদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রয়াসে নানান ধরনের আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। বিচারের দিক থেকে এইরকম মতবাদকে স্বীকার করা কঠিন বলেও শ্রীঅরবিন্দ মন্তব্য করেছেন।

ব্রহ্ম থেকে জগৎ সৃষ্টি রহস্যের সমাধানকল্পে বেদোপনিষদ, গীতাাদি শাস্ত্রে কিছু সহায়ক আভাস দেওয়া হয়েছে। ঋষি অরবিন্দ এইসব উৎসের ভিত্তিতেই তাঁর নিজস্ব সংশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি রেখেছেন। তাঁর মতে, পরমসত্তা ব্রহ্ম কেবলমাত্র নির্বিশেষ এবং জগৎ-অতিশায়ী<sup>8</sup>ই নয়, স্ব-সীমাকরণ ও স্ব-বিশেষীকরণের মাধ্যমে নিজেকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টিশীল প্রকাশে ব্যক্ত করতেও সক্ষম। তাই শ্রীঅরবিন্দের মতে- ব্রহ্ম এই অর্থে নির্বিশেষ যে, ব্রহ্মকে কোনো বিশেষণ দ্বারা সীমিত করা যায় না। কিন্তু ব্রহ্ম এই অর্থে নির্বিশেষ নয় যে, তিনি নিজেকে বিশেষিত করতেই সমর্থ নন।<sup>8</sup> কোনো শক্তি বা গুণ দিয়ে ব্রহ্মের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না সেটা এজন্য নয় যে, এইসব শক্তি বা গুণ ব্রহ্মে নিহিত নেই; বরং এজন্য যে এইসব শক্তি বা গুণ দিয়ে ব্রহ্মকে পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করা যায় না। সম্ভাব্য সকল গুণ ও শক্তিই ব্রহ্মে নিহিত, তবুও ব্রহ্ম এইসব গুণ ও শক্তির অতিরিক্ত আরো কিছু। ব্রহ্ম জগতে অন্তলীন এবং একইসঙ্গে জগৎ-অতিশায়ী।

<sup>6</sup> দিব্যজীবন, অনির্বাণ (অনু.), শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী, ২০০১, পৃষ্ঠা-৬।

<sup>7</sup> ঘোষ. পীযুষকান্তি ও মিত্র. কুমার, সমকালীন দর্শন, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২, পৃষ্ঠা ৫৬।

<sup>8</sup> Sri Aurobindo, *Commentary on Ishavasya Upanishad*, p. 284; এটি প্রথম 'Arya' পত্রিকায় (1914-15) প্রকাশিত হয়, পরে বই আকারে Aurobindo Ashram, Pondicherry থেকে প্রকাশিত হয়। এখানে এটির চতুর্থ সংস্করণের (1945) উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দের দর্শনতত্ত্বের সমগ্র কাঠামো যে মূল ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা হলো- 'আত্মা' ও 'জড়' উভয়ই সত্য, এই দুই তত্ত্বের প্রকৃত সমন্বয়সাধনের মধ্য দিয়ে যথার্থ দার্শনিক উপলব্ধি সম্ভব হবে। 'আধ্যাত্মবাদ' ও 'জড়বাদ', এই দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্ব এই জগৎকে নিজের নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে। জড়বাদীরা 'আত্মা'কে মনের কল্পনামাত্র বলে তা অবজ্ঞা করেছেন, তেমনি আধ্যাত্মবাদীরা বাহ্য-জগৎকে কল্পনামাত্র বলে অবজ্ঞা করেছেন। সেইদিক থেকে শ্রীঅরবিন্দের দর্শন এই দুই মূল তত্ত্বের সমন্বয়সাধন করেছে। 'দিব্য-জীবন' গ্রন্থে তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন: এই ধরণীতে দিব্য-জীবনের উপলব্ধি ততক্ষণই সম্ভব হবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি যে জড়-দেহাভ্যন্তরে শাস্বত অধ্যাত্ম-শক্তির আবাসস্থল। অরবিন্দের অধিবিদ্যার প্রধান চালিকা শক্তি হলো চৈতন্যশক্তি বা চিৎশক্তি। সত্যতাকে তিনি চরম আধ্যাত্মিকরূপে মানলেও, তার মধ্যে তিনি জড়কে সংস্থাপন করেছেন। 'সত্য' যদি আধ্যাত্মিক হয়, তবে জড়ের মধ্যেও আধ্যাত্মিকতা বিদ্যমান। তাই জড়কে পরিপূর্ণরূপে বর্জন করাও ভ্রমাত্মক হবে। 'জড়' এবং 'চিৎ'- এরা একই বিষয়ের দুটি ভিন্ন দিকমাত্র। যদি জড় থেকে চৈতন্যে উন্নীত হওয়া যায়, তবে নিশ্চিতরূপে চৈতন্য থেকে জড়ে অবতরণ করা যাবে। তাই জড়জগৎ সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা কখনোই হতে পারে না।

অরবিন্দের উপলব্ধি অনুযায়ী সত্যতার প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্য সচ্চিদানন্দ বা সৎ (Being)-এর স্তরসমূহ বা তল্লীগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে একথা মনে রাখতে হবে, তিনি সৎ-এর বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ করলেও 'সত্যতা প্রকৃতিতে বহু' এভাবে বলেননি। সত্যতা অপরিহার্যভাবে এক, কিন্তু সৃষ্টি নির্ভর করে 'একত্ব' ও 'বহুত্ব'- এই দ্বিমুখী তত্ত্বের ওপর। শ্রীঅরবিন্দ এক্ষেত্রে সত্তার আটটি তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি যথাক্রমে- শুদ্ধ সত্তা, চিৎশক্তি, পরম সুখ, অতিমানস, মানস, মন (psyche), জীবন বা প্রাণ এবং জড়। প্রথম চারটির স্তর উচ্চ গোলার্ধে এবং শেষের চারটি স্তর নিম্ন গোলার্ধে অবস্থান করে।<sup>৯</sup> এখানে চরম সত্তাকে তিনি বলেছেন 'সচ্চিদানন্দ', যা সবকিছুর উৎস। অস্তিত্ব, চৈতন্যশক্তি এবং পরম সুখ- এই ত্রয়ীর নামই সচ্চিদানন্দ। এই সচ্চিদানন্দই নিশ্চেতনার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে স্বরূপে যাওয়ার জন্য ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেন। 'প্রাণ' তাঁরই চিৎ শক্তির নিম্নাংশিক প্রকাশ, এবং 'মন' তাঁরই সৃজনী শক্তি অতিমানসের প্রতিকৃতি। কাজেই, সচ্চিদানন্দ থেকেই যে জড়ের উদ্ভব হয়েছে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না।

সৃষ্টির প্রকৃতি সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ দুটি পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হলো, স্বরূপে অবস্থিত 'সত্তা'র জাগতিক আকার, যাকে 'অবরোহন' (Descent) বলা হয়। এই পর্বে বিশ্বের গতি সর্বদা অধোমুখী। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে আবার বিকাশ সর্বদা উর্ধ্বমুখী, তখন তা স্বরূপে অবস্থিত সত্তার অভিমুখে অগ্রসর হয়, এই পর্বকে বলা হয় 'আরোহন' (Ascent)। প্রথম পদ্ধতিটি হল 'সংকোচন' (involution), এবং পরের পদ্ধতিটি হল 'বিবর্তন' (evolution)। শ্রীঅরবিন্দের মতে, বিবর্তনের প্রাগবস্থা হলো 'কুণ্ডলীকরণ' বা সংকোচন (involution)। প্রকৃতপক্ষে বিবর্তন (evolution) সম্ভব হয় তার কারণ হলো কুণ্ডলীকরণ প্রক্রিয়াটি ইতিপূর্বে ঘটে গেছে। উক্ত দুই পদ্ধতির মধ্যে যুক্ত রয়েছে সত্তার আটটি স্তর। আধ্যাত্মশক্তি প্রথমে জড়াদি নিম্নস্তরে অবরোহন করে, তারপর আবার শুদ্ধ সত্তাদি উচ্চস্তরে আরোহন করবে। জড় থেকেই প্রাণের উদ্ভব হয়েছে

<sup>৯</sup> বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলেশ, বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন, সদেশ, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৯০।

কেননা প্রাণ জড়ের মধ্যেই সুপ্ত অবস্থায় ছিল, আবার প্রাণ মনের স্তরে উন্নীত হয়েছে কেননা প্রাণের মধ্যই মন সুপ্ত অবস্থায় ছিল।

শ্রীঅরবিন্দের বর্ণনে বিবর্তনের যে চিত্র পরিস্ফুট, তার সাথে জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় নিযুক্ত চিন্তাবিদ্যাণের বিবর্তন ভাবনার সাথে কোনো মিল পরিলক্ষিত হয় না। কেউ 'যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের' কথা বলেন, এখানে সবকিছুকে ব্যাখ্যা করা হয় পূর্ববর্তী শর্তের ওপর ভিত্তি করে। কেউ 'উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তনবাদের' কথা বলেন, এক্ষেত্রে বিবর্তনের সব ক্ষেত্রেই একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। আবার কেউ 'পুনরাবৃত্তিমূলক বিবর্তনবাদের' কথা বলেন, যেখানে বলা হয় বিবর্তন হলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় একই আকৃতি ও বিষয়ের পুনঃসংগঠনমাত্র, অর্থাৎ সত্তার পুনরাবৃত্তিমাত্র। কেউ কেউ আবার 'উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদের' কথা বলেন, যা পুনরাবৃত্তিমূলক বিবর্তনবাদের বিপরীত মতবাদ। এই জাতীয় বিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশ্বাস করা হয় যে, বিবর্তনের প্রত্যেক স্তরেই নতুন কিছু উদ্ভব ঘটে। কিন্তু, এক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের বিবর্তনমূলক তত্ত্ব হলো 'অখণ্ড বিবর্তনবাদ' (Integral Evolution)। এই বিবর্তনবাদের বৃদ্ধি ঘটে ত্রিবিধ পদ্ধতির মাধ্যমে। প্রথম পদ্ধতিটি হলো 'প্রশস্তকরণ' (widening), এখানে নতুন তত্ত্বের জন্য আরও সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলো 'উন্নতিবিধান করা' (lightening), যার অর্থ হলো এক ধাপ থেকে অপর এক উন্নত ধাপে আরোহন। তৃতীয় পদ্ধতিটি হলো 'অখণ্ড সমন্বয়করণ' (integration), এই অখণ্ডতাই হলো বিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর।<sup>10</sup>

শ্রীঅরবিন্দের মতে, 'অতিমানস' (Supermind) স্তর হলো স্বতঃই সত্যের অধিকারী, কেবল মানসিক জ্ঞানের মতো চিত্র বা চিহ্ন নয়। 'সাধারণ মন' ও অতিমানসের মধ্যে আরও কয়েকটি স্তর স্বীকার করা হয়েছে, যাদের মধ্য দিয়ে অতিমানস সাধারণ মনের স্তরে নেমে আসতে পারে, আবার সাধারণ মনও ক্রমশঃ অতিমানসের স্তরে আরোহন করতে পারে। প্রখরতা বা তীব্রতার প্রভেদ হেতু স্তরগুলি নিম্ন বা উচ্চ। সাধারণ মানস চেতনার উর্ধ্বস্তরে আছে 'উত্তর মানস' (Higher mind)। এই স্তরে সাধারণ মনের মতো সত্যান্বেষণ করতে হয় না, চিন্তার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি সাক্ষাৎ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সত্যকে প্রত্যক্ষ করে, যাকে সত্য-চিন্তন বা দিব্য-মননও বলা হয়। এই স্তরের চেয়ে অধিক দীপ্ত চেতনা হলো 'দীপ্ত মন' বা 'প্রবুদ্ধ মানস' (Illumined mind)। এই স্তরের শক্তি ও প্রখরতা তুলনামূলক অনেক বেশি এবং এই স্তরকে সত্য ও প্রাণ বলা হয়। এই স্তরের উর্ধ্ব সত্যশক্তির আরও মহত্তর শক্তি রয়েছে, একে বোধি বা প্রজ্ঞা বলা হয়। শ্রীঅরবিন্দ যাকে 'বোধি মন' (Intuitive mind) বলে অভিহিত করেছেন। এই বোধি'ই হলো নিবিড় ও নির্ভুল, সত্যদৃষ্টি, সত্যানুভূতি, সত্যচিন্তন ও সত্যক্রিয়া। এই প্রজ্ঞার উৎসস্থলে রয়েছে 'অধিমানস' (Overmind), যা অতিমানস 'ঋত' চেতনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু, এই স্তরেও অধিমানসের 'হিরন্ময় পাত্র' দ্বারা ঋত চেতনার মুখাচ্ছাদিত থাকে, এবং অধিমানস পরার্থ ও অপরার্থের সংযোগসূত্র এবং অবিদ্যা ও অজ্ঞানের মধ্যে অতিমানস চেতনার প্রতিভূ। অতিমানসের চেতনা অখণ্ড; সেখানে পুরুষ, প্রকৃতি, চিৎ, শক্ত্যাদি- এক সমগ্র সত্য। আর অধিমানস চেতনায় অখণ্ডতা নেই, এরা প্রত্যেকে পৃথক, এবং নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এরা জ্ঞানকে বিকশিত করে।<sup>11</sup>

<sup>10</sup> বন্দ্যোপাধ্যায়. নিখিলেশ, বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন, সদেশ, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৯৬।

<sup>11</sup> বন্দ্যোপাধ্যায়. নিখিলেশ, বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন, সদেশ, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ১০৪-১০৫।



'দিব্য-জীবন' (Divine Life) হলো বিবর্তনের পরম ও চরম লক্ষ্য। শ্রীঅরবিন্দ অনুভব করেছেন, এই জগতের বুকে দিব্য-জীবন একদিন নেমে আসবেই, হয় দ্রুত নতুবা বিলম্বিত। তবে আধ্যাত্মিক কার্যক্রম এই অবতরণকে সত্বর কার্যকরী করতে সক্ষম। কিন্তু কিভাবে, কত নির্দিষ্ট এবং কত দ্রুততার সাথে এটা সম্ভব হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন,- এটা করা সম্ভব হবে শুধুমাত্র 'যোগ'-এর মাধ্যমে। তিনি *The Life Divine, The Synthesis of Yoga, Letters of Yoga, Records on Yoga* প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে যেভাবে যোগের প্রকৃতিকে বুঝিয়েছেন তার পূর্ণাঙ্গ ও সবিস্তার বর্ণন এই স্থলে সম্ভব নয়। তার প্রথম কারণ হলো, এই বর্ণনা হবে বিশালকায়; এবং দ্বিতীয় কারণ হলো, এই যোগ অনিবার্যরূপে 'তন্ত্রে'র ওপর নির্ভরশীল, যা দর্শনালোচনার ব্যাপ্তি বহির্ভূত। তাই এই স্থলে কেবল শ্রীঅরবিন্দের 'অখণ্ড যোগ' (Integral Yoga)-এর দার্শনিক তত্ত্বালোলোচনা করা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ যোগের প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছেন, 'যোগ'-এর অর্থ হলো 'ঐশ্বরিক সত্তার সাথে অস্থিত হওয়া'। এই সংযুক্তিকরণ হতে পারে একক-ব্যক্তিগত কিংবা জাগতিক কিংবা অতিজাগতিক, কিংবা তিনটি একসাথেই। এইসব সঙ্গত করণের জন্যই তাঁর যোগকে বলা হয় 'অখণ্ড যোগ' (Integral Yoga)। আমরা শ্রীঅরবিন্দের 'অখণ্ড যোগ' সম্পর্কে অল্প-বিস্তার অবহিত হলাম, এবং প্রবন্ধের প্রথমাংশে মহর্ষি পতঞ্জলের সমাধি-যোগ সম্পর্কে সবিস্তার অবগত হয়েছি। পর্যায়েক্রমে আলোচনার ভিত্তিতে বোঝা যায় 'সমাধি-যোগ' ও 'অখণ্ড যোগ' নানান দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। সেই পার্থক্যগুলো যথাক্রমে:

- 1) মহর্ষি পতঞ্জলের যোগ সমন্বয় হলো 'পদ্ধতির সমন্বয়'। অপরপক্ষে, শ্রীঅরবিন্দের যোগ সমন্বয় হলো 'ফলের সমন্বয়'। পতঞ্জল যোগে হঠযোগ, আসন ও প্রাণায়ামের জটিল শ্বাস-প্রশ্বাস ও দেহের নানান অঙ্গবিন্যাস সংক্রান্ত বিষয় নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে এই বিষয়সমূহ শ্রীঅরবিন্দ বিশেষ গুরুত্ব দেননি (যদিও শ্রীঅরবিন্দ হঠযোগের অভ্যাস বাধ্যতামূলক করেননি তাঁর পদ্ধতিতে, তবুও এর ফলাফল পাওয়া যায় তাঁর পদ্ধতিতে)। এমনকি প্রার্থনা মন্ত্রোচ্চারণকেও তিনি সমর্থন করেননি। শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ-যোগ হলো অন্তরের যোগ, যেখানে কিছু নিয়মশৃঙ্খলা, পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতাবোধের প্রয়োজন। যোগের এই সারল্যের রূপরেখা সকলেই সহজভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- 2) পতঞ্জল যোগে আত্মোপলব্ধিতে তুরীয় অবস্থায় কোনো বিষয়েরই চেতনা থাকে না। এই অবস্থা চেতনার অপর তিনটি নিম্নাবস্থা যথাক্রমে জাগ্রত, স্বপ্নময় ও স্বপ্নহীন অবস্থা থেকে স্বতন্ত্র। কোনো ব্যক্তিবিশেষ যখন চেতনার তুরীয় অবস্থা থেকে জেগে ওঠে এবং জাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসে, তখন তার সমাধি ভেঙে যায়। এই পরিস্থিতিতে আত্মা মানসিক অবস্থার দ্বারা নিজেেকে চিহ্নিত করে। তাই আত্মোপলব্ধি কেবলমাত্র সমাধি অবস্থাতেই সম্ভব। কিন্তু, শ্রীঅরবিন্দের মতে চরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সমাধি অপরিহার্য নয়, যেটা অপরিহার্য সেটা হলো 'জাগ্রত চেতন্যের রূপান্তর'। এতদ্ব্যতীত যোগ কোনভাবেই চরম ফল প্রদান করতে পারে না।
- 3) মহর্ষি পতঞ্জলের মতে, শুদ্ধ চেতনার অবস্থায় উত্তরণই যোগের লক্ষ্য। ঈশ্বরোপলব্ধির একমাত্র উপায় আত্মোপলব্ধি,- এটাই চরম লক্ষ্য, অর্থাৎ যোগের লক্ষ্য একক ব্যক্তির মুক্তি। শ্রীঅরবিন্দের মতে, ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি বিশ্বচেতনার উপলব্ধির থেকে নিম্নমানের। আমিত্বকে সম্পূর্ণ বর্জন করলেই এই পৃথিবীতে অতিমানসের অবতরণ ঘটবে। যোগের চরম লক্ষ্যের একটা দিক হলো একক ব্যক্তির

মোক্ষ, কিন্তু চরম লক্ষ্য এই যে- সমগ্র মানব জাতির পুনরুদ্ধার এবং পৃথিবীতে দিব্য-জীবনের উন্মেষ ঘটানো।

- 4) পতঞ্জল যোগের লক্ষ্য বিবেকজ্ঞান অর্জন করা, যার মাধ্যমে কেবল আত্মা থেকে অনাত্মাকে অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে পুরুষকে পৃথক করা যায়। কিন্তু, শ্রীঅরবিন্দের যোগের লক্ষ্য জ্ঞানের মধ্যে পৃথকীকরণ নয়, বরং জড় ও চিৎ-এর সমন্বয়সাধন অর্থাৎ অনাত্মাকে আধ্যাত্মিকতায় উন্নীত করা।<sup>12</sup>

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বোঝা যায়, যোগের আলোচনা প্রসঙ্গে মহর্ষি পতঞ্জল এবং শ্রীঅরবিন্দ উভয়েই অনন্য ও সুসংহতভাবে তাঁদের স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মহর্ষি পতঞ্জল চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই যোগ বলেছেন। এক্ষেত্রে কিভাবে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হলে যোগী বিবেকজ্ঞানের উদয়ের মাধ্যমে সমাধি-যোগে পদার্পণ করবেন, তার চমকপ্রদ ব্যাখ্যাও তিনি প্রদান করেছেন। আবার, শ্রীঅরবিন্দের অখণ্ড-যোগে চিৎ এবং অচিৎ-এর সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে কিভাবে অবরোহন ও আরোহন পদ্ধতির দ্বারা দিব্য-জীবনের উন্মেষ ঘটানো যায়, তার অপরূপ বর্ণনা রয়েছে। এই স্থলে পাতঞ্জল-যোগ ও শ্রীঅরবিন্দের যোগের তুলনামূলক আলোচনা থাকলেও, এক্ষেত্রে বিষয় গাভীরে দুই দর্শনই নিজস্ব গরিমায় সমুজ্জ্বল। যোগের ব্যাখ্যায় তারা প্রত্যেকেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পরমার্থ সাধনের কথা বলেছে। তাই ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের রত্নভাণ্ডারে এই দুই যোগশাস্ত্র চিরকাল স্বমহিমায় দীপ্তিমান থাকবে।

---

<sup>12</sup> বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলেশ, বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন, সদেশ, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ১১৫-১১৮।

**গ্রন্থপঞ্জি:**

1. কয়াল, রাজর্ষি, 'যোগশিক্ষা', ক্লাসিক বুকস্, কলকাতা, ২০২২।
2. ঘোষ, পীযুষকান্তি ও মিত্র, কুমার, 'সমকালীন দর্শন', ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২।
3. দিব্যজীবন, অনির্বাণ (অনু.), 'শ্রী অরবিন্দ আশ্রম', পন্ডিচেরী, ২০০১।
4. প্রেমেশানন্দ, স্বামী (ব্যাক্যা), 'পাতঞ্জল-যোগসূত্র', উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৭।
5. বন্দ্যোপাধ্যায়, কনকপ্রভা, 'সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শন', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৯৯।
6. বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলেশ, 'বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন', সদেশ, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৫।
7. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী অশোককুমার (সম্পা.), 'পাতঞ্জলদর্শন', শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৪।
8. ভর্গানন্দ, স্বামী (অনু.), 'পাতঞ্জল যোগদর্শন', উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৬।
9. ভট্টাচার্য, কুস্তলা, 'শ্রী অরবিন্দ, বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় দর্শনচর্চা', নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী (সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০২৩।
10. মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার, 'ভারতীয় দর্শন', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৮।
11. রায়, সুনীল, 'শ্রী অরবিন্দের দর্শন মন্ত্রনে', বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ২০০৭।
12. সান্যাল, ইন্দ্রানী, 'দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর পূর্ণাঙ্গদ্বৈতবাদ', আধুনিক ভারতীয় দর্শন, সেবন্তী ভট্টাচার্য (সম্পা.), এবং মুসায়েরা, কলকাতা, ২০১৮।
13. সেনগুপ্ত, কল্যাণ, 'পাতঞ্জল-যোগসূত্র', পাণ্ডুলিপি, কলকাতা, ২০২৩।
14. *The Life Divine*, Sri Aurobindo, Volume 21 and 22, The Complete Works of Sri Aurobindo, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 2005.



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 797-804

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.070



## সাংখ্যমতে জগতের ক্রমাভিব্যক্তিবাদ বা উৎপত্তিবাদ : একটি সমীক্ষা

রাজিবুল খান, সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ওন্দা থানা মহাবিদ্যালয়, ওন্দা, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 28.12.2024; Accepted: 22.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*According to Sāṅkhya philosophy, the cause of the world is Prakṛti. The world exists in Prakṛti before its creation in an unexpressed form. The world is the result of Prakṛti. Prakṛti becomes the world. The world is indeed expressed by Prakṛti, but this expression does not occur unless Prakṛti is connected to Puruṣa. The connection between Prakṛti and Puruṣa is absolutely necessary for the expression of the world. The expression of the world cannot be for Prakṛti alone, because Prakṛti is senseless and unconscious. It is not possible for it to work without the control of a conscious being. Again, the expression of the world cannot be for Puruṣa alone. Because Puruṣa is exclusively silent, passive, and a witness. Puruṣa has intelligence but no power to act. When Prakṛti's power to act and Puruṣa's intelligence come together, the process of expression begins. But here the question arises - how can Puruṣa and Prakṛti, who are opposites, come together? In answer to this question, the Sāṅkhya sect says that just as the cripple (paṅgu) and the blind (andha) can seek each other's help to get out of the forest, similarly, unconscious Prakṛti and passive Puruṣa can come together to help each other to achieve their goals. As a result of this mutual proximity, the needs of both are fulfilled. Puruṣa's needs Prakṛti for the knowledge, enjoyment, and power of a different beings. Again, Prakṛti also needs Puruṣa to be seen and enjoyed, because without a seer and a consumer, there is no sight and enjoyment. Puruṣa's vision, enjoyment, and power are the essence of Prakṛti. In this way, the connection between Prakṛti and Puruṣa leads to the creation or expression process of the world, which is the subject of my article.*

**Keywords:** Abhivyakti, Prakṛti, Puruṣa, Sanyōga Sākṣisvarūpa, Acētana, Nirbikāra.

মহর্ষি কপিল প্রবর্তিত সাংখ্য দর্শন ভারতীয় আস্তিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ইহা সবথেকে প্রাচীনতম দর্শন। মহাভারতে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, কঠোপনিষদ, প্রশ্নোপনিষদ, ছান্দোগ্যোপনিষদ, ভগবদ্গীতা, স্মৃতিশাস্ত্রে, পুরাণে, সাংখ্য মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাংখ্যদর্শনে দুটি মূল তত্ত্ব স্বীকার করা হয়েছে প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকরোতি এই বুৎপত্তি প্র - কৃ

+ জিন যোগে প্রকৃতি শব্দটি নিষ্পন্ন। শত অমিল থাকা সত্ত্বেও প্রচলিত সাংখ্য দর্শনের যে অব্যক্ত প্রকৃতি তাঁর খোঁজ পাওয়া যায় ঋকবেদে নাসদীয় সূক্তের মধ্য থেকেই।<sup>১</sup> জগতের মূল উপাদান কারণ হলো এই প্রকৃতি। সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতির মধ্যে জগৎ অব্যক্ত রূপে বর্তমান থাকে। প্রকৃতির কোনো কারণ থাকে না বলে, প্রকৃতিকে অজা বলা হয়। প্রকৃতির অপর নাম প্রধান। আর পুরুষ হলো অপ্রধান ও নির্গুণ। অতএব সাংখ্যমতানুসারে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে কিভাবে জগৎ সৃষ্টি বা অভিব্যক্তি ঘটে তা নিম্নে আলোচনা করা হল-

সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতিকে ‘প্রসবধর্মী’ বা ‘পরিণামশীলা’ বলে অভিহিত করা হয়।। এমন কি এই প্রকৃতির তিনটি গুণ সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ ক্ষণমাত্রও পরিণামগ্রস্ত না হয়ে থাকতে পারে না।<sup>২</sup> প্রকৃতি নিজের স্বভাবহেতু নিয়মিত সৃষ্টি করতে থাকে। অর্থাৎ প্রকৃতি সর্বদা পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন বা পরিণাম দুই প্রকার সদৃশ বা স্বরূপ পরিণাম ও বৈসাদৃশ বা বিরূপ পরিণাম। প্রলয়কালে যে পরিণাম হয় তাকে স্বরূপ পরিণাম এবং সৃষ্টি দশায় যে পরিণাম ঘটে তাকে বিরূপ পরিণাম বলে। প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ বা উপাদান। প্রকৃতিতেই জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে এবং পরে এই প্রকৃতি থেকেই ক্রমান্বয়ে জগতের অভিব্যক্তি ঘটে অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে জগতের অভিব্যক্তি হয় বটে কিন্তু এই প্রকৃতি জড়, অচেতন ও অবিবেকী হওয়ায় তার একার পক্ষে জগতের অভিব্যক্তি হতে পারে না। তবে পুরুষের সঙ্গে সংযোগবশতঃ প্রকৃতিতে গুণবিক্ষোভ দেখা যায়। এবং প্রকৃতির বিরূপ পরিণাম ঘটে। আবার শুধু পুরুষের বা আত্মার দ্বারা জগতের অভিব্যক্তি হয় না। কারণ পুরুষ চেতন হলেও নিক্রিয়, দ্রষ্টা এবং নির্বিকার। তাঁর বুদ্ধি আছে কিন্তু কর্মদক্ষতা নেই। অতএব প্রকৃতির কর্মদক্ষতা ও পুরুষের বুদ্ধি যখন মিলিত হয় তখনই অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। প্রকৃতি সক্রিয় হলেও অচেতন। যদিও আমরা জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিনা তথাপি নিরুপায় হয়ে সাংখ্যগণ প্রকৃতি বা গুণত্রয়কেই কর্তা বলেছেন। আবার যদি পুরুষকে কর্তা ধরা হয় তাহলে পুরুষের স্বরূপও ব্যাহত হবে তাই সাংখ্যকারিকায় বলা হয়েছে -

তন্মাত্তৎসংযোগাদচেতং চেতনাবদিবলিঙ্গম (সা.কা.- ২০)

আবার জড়রূপ বুদ্ধির স্বাভাবিক চেতনা থাকে না তাই সেই কারণে আরোপিত চেতনার দ্বারা বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়। অতএব সৃষ্টিকার্যে উভয়ের সংযোগ প্রয়োজন। এই সংযোগের অর্থ সান্নিধ্য (তৎসংযোগ তৎসান্নিধানম - সা.ত.কৌ, পৃ -৯৪)।

কিন্তু প্রশ্ন হল বিরুদ্ধ স্বভাব প্রকৃতি ও পুরুষের একত্র হবে কিভাবে ? এর উত্তর দিতে গিয়ে সাংখ্যকর্তরা বলেছেন পঙ্গু এবং অন্ধ ব্যক্তি উভয়ে পরস্পরের সংযোগিতায় যেমন পথ দেখে চলতে পারে, তেমনি সক্রিয় অচেতন প্রকৃতি এবং নিক্রিয় সচেতন পুরুষ নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একত্র হয়ে পরস্পরের সাহায্য করতে থাকে।<sup>৩</sup> প্রকৃতির পক্ষে পুরুষের সান্নিধ্য ‘দর্শনার্থে’ প্রয়োজন। পুরুষ যদি অচেতন প্রকৃতিকে দর্শন না করে, তাহলে সুখ দুঃখাদি ভোগ সম্ভব নয়। আবার পুরুষের কৈবল্য বা মুক্তিলাভের জন্য একান্তভাবে প্রকৃতির দরকার হয়। পুরুষ যখন দেখে নেয় প্রকৃতি তাঁর থেকে ভিন্ন তখন পুরুষ তাঁর নিজস্বরূপ উপলব্ধি করে এবং সে মুক্তি লাভ করে। অর্থাৎ প্রকৃতিকে না দেখা পর্যন্ত পুরুষ প্রকৃতির সুখ দুঃখাদিকে নিজের সুখ দুঃখ বলে মনে করে। অতএব পুরুষ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায় উভয়ের কোন সম্বন্ধ হতে পারে না যদি নিজ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য অপেক্ষা না থাকে।

“ন চ ভিন্নয়োঃ সংযোগাহপেক্ষাং বিনা”-(বাচস্পতি মিশ্র -১১.৭২)

যে উপকারের অপেক্ষায় প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধযুক্ত হয় তা বললেন কারিকাকার-

“ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতো মহাদাদিবেশেষভূতপর্যন্তঃ।

প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ” ॥ (সা.কা. ৫৬)

সত্ত্ব, রজ, ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থাই হল প্রকৃতি। সাংখ্যীয় প্রকৃতির সম্বন্ধে মহাভারতের প্রথম উপস্থাপন হল এই যে, মহাদাদি সমস্ত তত্ত্বের মধ্যে সর্বপ্রধান হল প্রকৃতি।<sup>৪</sup> পুরুষের মুক্তির জন্য প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রকৃতির কোন স্বার্থ থাকে না। প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্যে এলেই প্রকৃতির তিনটি গুণের সাম্যাবস্থা বিদ্বিত হয়। প্রথমে রজোগুণের চাঞ্চল্য দেখা যায়। পরে অপর দুটি গুণেও বিক্ষিপ দেখা যায়। গুণবিক্ষোভের ফলে প্রকৃতির মধ্যে এক প্রবল আলোড়ন দেখা দেয় এবং প্রতিটি গুণ অপরগুণকে অভিভূত করার জন্য চেষ্টা করে। বিভিন্ন পরিমাণে এই গুণগুলির সংযোগ থেকে বিভিন্ন জাগতিক বস্তু উৎপন্ন হয়। প্রকৃতি থেকে জগতের ক্রমাভিব্যক্তি নিম্নক্রম অনুসারে ঘটে থাকে যা সাংখ্যকারিকায় দেখা যায়।<sup>৫</sup> এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির পরিণামবশতঃ প্রথমে মহত্ত্ব বা বুদ্ধি প্রকাশিত হয়। বুদ্ধির পরিণামবশতঃ আসে অহংকার। অহংকার থেকে আসে একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র, আবার পঞ্চতন্মাত্র থেকে সৃষ্টি হয় পঞ্চমহাভূত।<sup>৬</sup> এই মহৎ ইত্যাদি তত্ত্বের প্রসবের পরেও প্রকৃতি অবিকৃতিই থাকে তা আমরা মহাভারত থেকে জানতে পারি।<sup>৭</sup> মহাভারতে বলা হয়েছে- একটি দ্বীপ থেকে যেমন সহস্র সহস্র দীপ উৎপন্ন হয় এবং প্রকৃতির যেহেতু কোনো অপচয় ঘটে না, তাই সে অবিকৃতিই থাকে। এই অব্যক্ত প্রকৃতি থেকেই যে ব্যক্ত তত্ত্বগুলি উৎপন্ন হয় তা ভগবদীতা থেকেও জানতে পারি।<sup>৮</sup> মনুসংহিতাতেও অব্যক্ত থেকে ব্যক্তের উৎপত্তি সম্বন্ধে জানতে পারি।<sup>৯</sup>

প্রকৃতি ও তার পরিণাম রূপে মোট ২৪ টি তত্ত্ব স্বীকার করা হয়েছে। এর সঙ্গে পুরুষের তত্ত্বটি যোগ হলে মোট তত্ত্বের সংখ্যা হয় ২৫ টি। মহাভারতের মনু বৃহস্পতি সংবাদে এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব একটি শ্লোকে ব্যাখ্যাত হয়েছে।<sup>১০</sup> প্রকৃতি থেকে পঞ্চমহাভূত এই ২৪ টি তত্ত্বকে দুটি সর্গে বিভক্ত করা যায় - ১। বুদ্ধিসর্গ বা প্রত্যয় সর্গ ২। তন্মাত্রসর্গ বা ভৌতিক সর্গ।

১। **বুদ্ধিসর্গ বা প্রত্যয় সর্গ:** এখানে মহৎ বা বুদ্ধি, অহংকার, একাদশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক) (পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) ও মন অন্তর্গত।

২। **তন্মাত্র সর্গ বা ভৌতিকসর্গ:** পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) পঞ্চমহাভূত (পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ) এবং এই পঞ্চমহাভূত থেকে উৎপন্ন হয় যাবতীয় ভৌতিক বস্তুরাজিসমূহ।

ঈশ্বরক্ಷেত্র সাংখ্যকারিকার শ্লোকে তত্ত্বসর্গের ব্যাখ্যা এবং তারও পরবর্তী সময়ে এই শ্লোকের টীকায় বাচস্পতি মিশ্র প্রত্যয় সর্গ ও তন্মাত্রসর্গের কথা বলে সৃষ্টিতত্ত্বগুলিকে এমন অভিনব পন্থায় ব্যাখ্যা করেছেন, যেটাকে আমরা ঠিক অভিনব বলতে পারি না। কেননা বহুপূর্বে মহাভারতের মনু বৃহস্পতি সংবাদের একটি শ্লোকের মধ্যে আমরা ঠিক একই ভাবে না হলেও অন্যভাবে তত্ত্বসর্গের কথা এবং প্রত্যয়সর্গের বিভাগও আমরা দেখতে পাই।<sup>১১</sup>

প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তির নাম মহৎ বা বুদ্ধি।<sup>১২</sup> মহাভারতে প্রকৃতি থেকে মহানের উৎপত্তির ব্যাখ্যা আছে।<sup>১৩</sup> উৎপন্ন অসংখ্য জাগতিক শক্তির মধ্যে এটি মহাপরিমানযুক্ত। তাই একে মহান্ বলা হয়। মহত্ত্ব

জগতের সববস্তুই বীজ। এই মহৎকে বুদ্ধি বলা হয় কারণ জীবের মধ্যে বুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হয়। অধ্যাবসাই হল বুদ্ধির লক্ষণ। ‘এই আমার কর্তব্য’- এরূপ নিশ্চয় অধ্যাবসায়, অর্থাৎ অধ্যাবসায় বলতে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানকে বোঝায়। বুদ্ধির সাহায্যে জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে, এবং ভোক্তা ও ভোগ্যবস্তুর মধ্যে পার্থক্য জানা যায়। এছাড়াও সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ, কর্তব্য-অকর্তব্য, প্রভৃতি বুদ্ধির সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। বুদ্ধির কাজ হল নিজেকে এবং অপরকে প্রকাশ করা। আবার বুদ্ধি আছে বলেই ইন্দ্রিয়, মন ও অহংকার ক্রিয়া করতে পারে। প্রকৃতি যেহেতু সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা, সেহেতু প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন প্রথম তত্ত্ব বুদ্ধি বা মহৎ ত্রিগুণাত্মকই। মহৎ বা বুদ্ধির সাত্ত্বিক ধর্ম হল অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সহেতু ধর্ম, বিবেকজ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য। বুদ্ধির তামস ধর্ম হল অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য।<sup>১৪</sup> আর এই বুদ্ধি হল সাধারণ বুদ্ধি, বিশেষ কোনো জীবের নয়। বুদ্ধি প্রকৃতির পরিণাম হওয়ায় জড়ধর্মী, কাজেই বুদ্ধি চেতন পুরুষ থেকে ভিন্ন। কিন্তু সত্ত্বপ্রধান হওয়ায় বুদ্ধি দর্পনের ন্যায় স্বচ্ছ এবং বুদ্ধি পুরুষ থেকে ভিন্ন হলেও বুদ্ধিতেই পুরুষের চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয়। আর বুদ্ধির সাহায্য নিয়েই আত্মা নিজেকে প্রকৃতি থেকে ভিন্ন বলে উপলব্ধি করতে পারে।<sup>১৫</sup>

অহংকার মহৎ হতে উৎপন্ন একটি তত্ত্ব। এই অহংকার প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম। অভিমানই হল অহংকারের লক্ষণ। বুদ্ধির সঙ্গে আমি বা আমার এই অহংসংযুক্ত ভাব হল অহংকার। এই অহংকারের অহম বা আমি হল জীবাত্মা। এই অভিমান ও মমত্ববোধ হল অহংকারের বৈশিষ্ট্য। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের তারতম্য এবং প্রাধান্য অনুযায়ী অহংকার তিন প্রকার। সত্ত্বগুণের আধিক্য ঘটলে বৈকারিক বা সাত্ত্বিক অহংকার, রজোগুণের প্রাধান্য ঘটলে তৈজস বা রাজস অহংকার এবং তমোগুণের প্রাধান্য ঘটলে ভূতাদি বা তামস অহংকারের উদ্ভব হয়। সাত্ত্বিক অহংকার থেকে একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।<sup>১৬</sup> এই একাদশ ইন্দ্রিয় ভৌতিক নয়, অহংকার তত্ত্বের বিকার।<sup>১৭</sup> মন হল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় উভয়ই, কেননা মন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় উভয়ের কার্যের সহায়ক হয়। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বা পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয় হল চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। এই ইন্দ্রিয়গুলি ক্রমানুসারে-রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ প্রত্যক্ষ করে। পুরুষের ভোগের ইচ্ছা থেকেই বস্তু এবং এই ইন্দ্রিয়গুলি সৃষ্টি হয়। পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় হল বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এরা যথাক্রমে বচন, গ্রহণ, গমন, উৎসর্গ বা ত্যাগ, এবং জনন এই বৃত্তি সম্পাদন করে।<sup>১৮</sup> পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় - এই দশটিকে বাহ্যকরণ এবং মহৎ, অহংকার ও মন এই তিনটিকে অন্তঃকরণ বলা হয়। এদের একত্রে সাংখ্য দর্শনে ‘ত্রয়োদশ করণ’ বলা হয়। বাহ্যকরণ বর্তমান বিষয়ে সীমাবদ্ধ, কিন্তু অন্তঃকরণ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সর্ববিষয়েই প্রসারিত।<sup>১৯</sup> তম প্রধান অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চতন্মাত্র হলো- শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। এই তন্মাত্রগুলি অবিমেষ,<sup>২০</sup> কেননা এগুলি সূক্ষ্ম বা অতীন্দ্রিয় বলে উপভোগ্য যোগ্য নয়। পাঁচটি তন্মাত্র থেকে পঞ্চভূত সৃষ্টি হয়। শব্দ থেকে আকাশ; শব্দ ও স্পর্শ থেকে বায়ু; শব্দ, স্পর্শ ও রূপ থেকে তেজ বা অগ্নি; শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস থেকে জল; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি তন্মাত্র থেকে পৃথিবী উৎপন্ন হয়।<sup>২১</sup> আর রজঃপ্রধান অহংকার সাত্ত্বিক ও রাজসিক উভয়েরই উৎপত্তিতে সাহায্য করে।<sup>২২</sup> কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্যে বলেছেন- মনই সাত্ত্বিক অহংকারের সৃষ্টি। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় রাজস্ অহংকারের সৃষ্টি। পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি তামস্ অহংকার থেকে হয়েছে।<sup>২৩</sup>

আর পঞ্চভূতকে বিশেষ বলা হয় যেহেতু এগুলি উপভোগযোগ্য। বিশেষ তিনপ্রকার - সূক্ষ্মদেহ, স্থূলদেহ ও পঞ্চভূত।<sup>২৪</sup> পিতা মাতা জাত স্থূল দেহ পঞ্চভূতের দ্বারা নির্মিত হয় এবং মৃত্যুর পর এই

মাতৃপিতৃজ স্থূল শরীর পঞ্চভূতেই বিলীন হয়ে যায়। তাই এটি পঞ্চভূতের অবান্তর বিশেষ। মহৎ, অহংকার, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এই ১৮ টি তত্ত্বের দ্বারা সূক্ষ্মশরীর গঠিত।<sup>২৫</sup> সূক্ষ্মশরীর সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন হয় এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত বর্তমান থাকে। সূক্ষ্মশরীরকে লিঙ্গ শরীর বলা হয়।<sup>২৬</sup> বাচস্পতি মিশ্রের মতে শরীর দুই প্রকার সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর এবং মাতৃপিতৃজ বা স্থূল শরীর। বিজ্ঞানভিক্ষু তৃতীয় একপ্রকার শরীরের কথা বলেছেন তাঁর নাম অধিষ্ঠান শরীর। সূক্ষ্মশরীর যখন এক স্থূল শরীর থেকে অন্য স্থূল শরীরে যায় তখন এই অধিষ্ঠান শরীরই সূক্ষ্ম শরীরের আশ্রয়ের কাজ করে।<sup>২৭</sup>

পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি থেকে জগৎ অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে পুরুষকে জগতের কারণ বলা হয়নি। এখানে তাহলে প্রশ্ন করা হয় যে, কোন চেতনকর্তার পরিচালনা ছাড়া অচেতন প্রকৃতি কি করে জগৎ সৃষ্টি করে? এর উত্তর সাংখ্য কারিকার বলেছেন-

“বৎসবিবৃদ্ধি নিমিত্তং ক্ষরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্জস্য।

পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য” ॥ (সা.কা .৫৭)

বৎসের পুষ্টি বা পালনের জন্য যেমন অচেতন দুধ গাভীর স্তন থেকে স্বতঃই ক্ষরিত হয় সেরূপ পুরুষের কৈবল্য বা মুক্তির জন্যই অচেতন প্রকৃতি স্বতঃই কার্যে প্রবৃত্ত হয়।

সাংখ্য দার্শনিকেরা বলেন, নিষ্ক্রিয় চুম্বক কেবলমাত্র নিকটে অবস্থিত হলেই যেমন লৌহ তার দিকে চালিত হয় বা ক্রিয়া যুক্ত হয়। সেরূপ নিষ্ক্রিয় পুরুষের সান্নিধ্যমাত্রই প্রকৃতির অভিব্যক্তি শুরু হয়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, সাংখ্য সম্মত জগতের অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া যান্ত্রিক না উদ্দেশ্যমূলক? এই প্রসঙ্গে সাংখ্যাচার্যগণ বলেন পরের ভোগের জন্য যেমন উষ্ট্র কুম্ভুম (জাফরান) বহন করে, তেমনই পুরুষের ভোগের জন্যই প্রকৃতি সৃষ্টিশীল হয়।<sup>২৮</sup> যদিও প্রকৃতির স্বকীয় কোন উদ্দেশ্য নেই তথাপি পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্যই প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করে। তাই সাংখ্যাচার্যগণ বলেন এই অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া যান্ত্রিক নয়, এটি উদ্দেশ্যে মূলক বলা যায়। কিন্তু হিরিয়ান্না প্রভৃতি কোনো কোনো দার্শনিকদের মতে এই অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক নয়। কারণ জড় প্রকৃতির নিজস্ব কোন উদ্দেশ্য থাকে না। তাই একে আংশিক উদ্দেশ্যমূলক বলা হয়।<sup>২৯</sup>

জগৎ সৃষ্টি হয় প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের ফলে। এখন প্রশ্ন ওঠে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই নিত্য হওয়ায় তাঁদের উভয়ের সংযোগও নিত্য হবে। এর ফলে সর্বদা সৃষ্টি প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। প্রলয় বলে আর কিছু থাকবে না। এর উত্তরে সাংখ্যগণ বলছেন এরূপ অনর্থের সম্ভাবনা নেই। কারণ নর্তকী যেমন রঙ্গাগারে স্থিত দর্শকগণকে নৃত্য প্রদর্শন করে নৃত্য হতে নিবৃত্ত হয়, তেমনি প্রকৃতিও পুরুষের নিকট নিজস্বরূপ প্রকাশিত করে নিবৃত্ত হয়। সুতরাং সর্বদা সৃষ্টি প্রক্রিয়া চলতে পারে না। এই ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় বলেছেন-

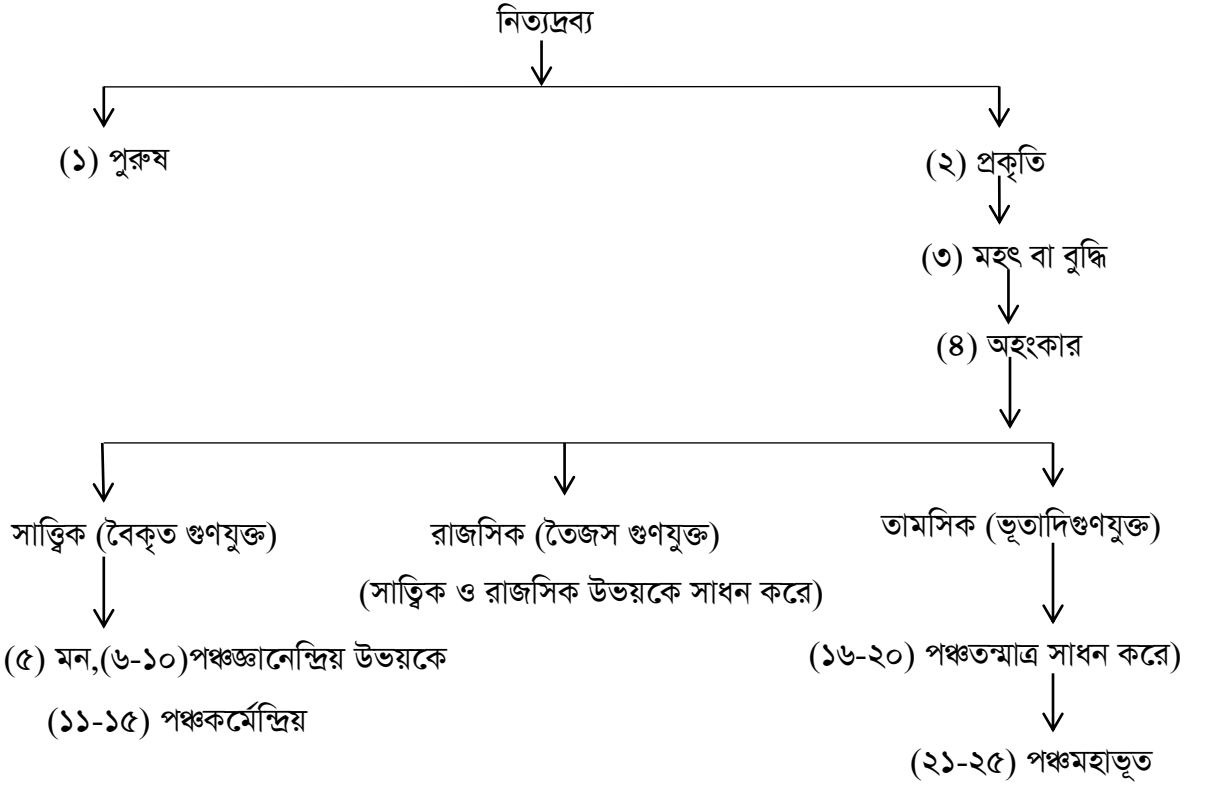
“ রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ততে নর্তকী যথা নৃত্যাৎ।

পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য বিনিবর্ততে প্রকৃতিঃ” ॥ (সা.কা. - ৫৯)

সাংখ্যসম্মত এই অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া চক্রাকারে চলে। অর্থাৎ অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া নয়। সৃষ্টির পর ধ্বংস, আবার সৃষ্টি, আবার ধ্বংস- এভাবে চক্রাকারে চলে।<sup>৩০</sup>

পুরুষ ও প্রকৃতির সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি হতে যে জগতের সৃষ্টি তা এইভাবে দেখানো যায়।





অতএব বলা যায় এই অভিব্যক্তির স্তরভেদ থাকলেও এর মধ্যে একটা অন্তঃসূতা ধারাবাহিকতা আছে, প্রত্যেক পূর্ববর্তী স্তর পরবর্তী স্তরে নষ্ট না হয়ে সক্রিয় আছে। বিভিন্নতা সত্ত্বেও একই মূলপ্রকৃতির পরিণাম হিসাবে অভিব্যক্তির সমস্ত স্তরেই আন্তর ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকটি স্তরই প্রকৃতির তিনগুণের প্রকাশ। অবশ্য এক একটি স্তরে এক একটি গুণের প্রাধান্য। অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার সমস্ত স্তরেই এই ঐক্য বর্তমান আছে বলেই আমরা এদের একই মূল তত্ত্ব থেকে অনুসৃত বলতে পারি। আবার এই সাংখ্য অভিব্যক্তিবাদ অন্যান্য দর্শনে সমালোচিত হলেও আমরা বলতে পারি যে জগতের উৎপত্তি সম্পর্কিত সাংখ্যসম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব প্রচলিত মতবাদগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মতবাদ।

**তথ্যসূত্র:**

১. ‘নাসাদাসীম্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোম পরোযৎ’। ঋগ্বেদ, ১২৯.১০.১।  
অপিচ  
‘ন মৃত্যুরাসীদৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহু আসীৎ প্রকেতঃ’। ঋগ্বেদ, ১২৯.১০.২।
২. “পরিণামস্বভাবা হি গুণা নাপরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তে”। (বাচস্পতি মিশ্র, তত্ত্বকৌমুদী)
৩. “পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।  
পশ্চুন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তকৃতঃ সর্গঃ”। সাংখ্যকারিকা - ২১।
৪. “বিদ্যা প্রকৃতিরব্যক্তং তত্ত্বাণং পরমেশ্বরী”। মহাভারত, ১২.২৯৯, ৭ হরিদাশ সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত  
খন্ড ৩৬ , পৃঃ ৩১৬৩।
৫. “মূলপ্রকৃতিরবিকৃতি মহাদায়াঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।  
ষোড়শকস্ত বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ” ॥ সাংখ্যকারিকা - ৩।
৬. “প্রকৃতের্মহাংস্ততোহহংকারস্তস্মাদ্গণশ ষোড়শকঃ।  
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি” ॥ -সাংখ্যকারিকা - ২২।
৭. “দীপাদন্যে যথা দীপাঃ প্রবর্তন্তে সহস্রশঃ।  
প্রকৃতি সূয়তে তদ্বদ আনন্ত্যানাপচীয়তে”। মহাভারত হরিদাশ সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত,  
১২.২০৮.২৬,  
খন্ড ৩৫, পৃঃ ২০৪৯
৮. “অব্যক্তাদ ব্যক্তয় সর্বাঃ প্রভাবন্ত্যত্রাগমে।  
রাত্রাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞাকে ”। শ্রীমদ্ভগবদগতা, ৮.১৮
৯. “যদা স দেবো জাগতি তদেদং জগৎ।  
যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্বং নিমীলতি ”। মনুসংহিতা, ১.৫২
১০. “পুরুষঃ প্রকৃতিবুদ্ধিবিশয়াশ্চেন্দ্রিয়াণি চ।  
অহঙ্কারোহভিমানশ্চ সমূহো ভূতসংজ্ঞক ”। মহাভারত, ১২.১৯৮.২৪, খণ্ড ৩৫, পৃঃ ১৯০।
১১. “এতস্যাদ্যা প্রবৃত্তিস্ত প্রধানাৎ সংপ্রবর্ততে।  
দ্বিতীয়া মিথুনব্যক্তিম বিশেষান্নিযচ্ছতি”। মহাভারত, ১২.১৯৮.২৫, খণ্ড ৩৫, পৃঃ ১৯৩৬।
১২. ‘মহাদাখ্যমাদ্যং কার্যং।’ সাংখ্যসূত্র- ১/৭১, ‘ প্রকৃতেমহান্ ’ - সাংখ্যকারিকা ২২।
১৩. “অব্যক্তং বীজধর্মাণং মহাগ্রাহমচেতনম্।  
তস্মাদেকগুণো জজ্ঞে তদ্ব্যক্তং তত্ত্বমীশ্বরঃ।।”  
মহাভারত, ১২.৩১১.৩১ হরিদাশ সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত, খণ্ড ৩৭, পৃঃ  
৩৩৫০।
১৪. “অধ্যবসায়ো বুদ্ধিধর্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্যম্।  
সাত্ত্বিকমেতদ্রপং তামসমস্মদ্বিপর্যস্তম্।।” সাংখ্যকারিকা - ২৩।
১৫. সাংখ্যসূত্র, ২/৪০ - ৪৩।
১৬. “বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃ শ্রোত্রঘ্রাণরসনত্বগাখ্যানি।  
বাক্পাণিপাদপায়ুপস্থান্ কর্মেন্দ্রিয়াণ্যাছঃ।।” সাংখ্যকারিকা - ২৬।

১৭. “ন ভূতপ্রকৃতিতুমিन्द्रিয়াণামাহ্কারিকতুশ্রতেঃ।”—সাংখ্যপ্রবচন, ৫/৮৪।
১৮. “শব্দাদিষু পঞ্চণনামালোচনমাত্রমিষ্যতে বৃত্তিঃ।  
বচনাদানবিহরণেৎসর্গানন্দাশ্চ পঞ্চণনাম্” ॥ সাংখ্যকারিকা - ২৮।
১৯. সাংখ্যসূত্র, ২/২৬ - ৩২, ২/৩৮, ৫/৭১।
২০. “অবিশেষাদ্বিশেষারম্ভঃ”। সাংখ্যপ্রবচনসূত্র ৩/১।
২১. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদি, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃঃ ২৭০।
২২. “সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।  
ভূতাদেস্তুমাত্রঃ সঃ তামসস্তৈজসাদুভয়ম্ ” সাংখ্যকারিকা - ২৫।
২৩. “একাদশানাং পূরণমেকাদশকং মনঃ ষোড়শাত্মগণমধ্যে সাত্ত্বিকম্। অতন্তদৈকৃতাং সাত্ত্বিকাহঙ্কারাজ্জয়ত  
ইত্যর্থঃ। অতশ্চ রাজসাহঙ্কারাদ দশেন্দ্রিয়াণি তামসাহঙ্কারাচ্চ তান্মাত্রাণীত্যবগন্তব্যম্।” সাংখ্য প্রবচন  
ভাষ্যম্ ২/১৮)
২৪. “সূক্ষ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহ প্রভৃতৈজ্জিধা বিশেষাঃ স্যুঃ। সূক্ষ্মান্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্তন্তে॥”  
সাংখ্যকারিকা - ৩৯।
২৫. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদি, নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃঃ ২৭৭।
২৬. পূর্ববৎ, পৃঃ ২৭৯।
২৭. কারিকা ও কৌমুদী, ৩৮-৪১, সাংখ্যসূত্র, ৩,১-১৭, প্রবচন ভাষ্য, ৮/১১।
২৮. “প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতোহপ্যভোক্ত্বাদুষ্ট্রকঙ্কমবহনবৎ” —সাংখ্যসূত্র ৩/৫৮।
২৯. Outlines of Indian Philosophy M. Hiriyanna, ১৯৬৮, পৃঃ ২৭৩।
৩০. পূর্ববৎ, পৃঃ ২৭৩ - ২৭৪।

#### সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

- ১। চক্রবর্তী, ডঃ নীরদবরণ, ‘ভারতীয় দর্শন’, দ্য ঢাকা স্টুডেন্ট লাইব্রেরী, ২০১৫, মুদ্রিত।
- ৩। বসু, ডঃ সুমিতা, ‘ভারতীয় দর্শন সমীক্ষা’, সদেশ, কলকাতা, ২০১১, মুদ্রিত।
- ৪। বাগচী, দীপক কুমার, ‘ভারতীয় দর্শন’, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০১৫, মুদ্রিত।
- ৫। ভট্টাচার্য, ডঃ সমরেন্দ্র, ‘ভারতীয় দর্শন’, বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৭, মুদ্রিত।
- ৬। মুখার্জী, তাপসী, ‘মহাভারত পুরাণে সাংখ্যদর্শনের উত্তরাধিকার’, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা,  
২০১২, মুদ্রিত।
- ৭। সেনগুপ্তা, আচার্য্য জ্যোতি, ‘ভারতীয় দর্শন সমগ্র’, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০১৭, মুদ্রিত।
- ৮। ঘোষ, গোবিন্দ চরণ, ‘ভারতীয় দর্শন’, মিত্রম্, কলকাতা, ২০১২, মুদ্রিত।
- ৯। সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু, ‘ভারতীয় দর্শন’ (প্রথম খণ্ড), ব্যানার্জি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০-১১, মুদ্রিত।
- ১০। পাল, অধ্যাপক শ্রীবিপদভঞ্জন, সাংখ্যকারিকা, সদেশ, কলকাতা, অক্ষয় তৃতীয়া ১৪১৭, মুদ্রিত।
- ১১। গোস্বামী, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র, ‘সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী’, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ,  
মহালয়া, ১৪০৬, মুদ্রিত।



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 805-811

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.071



## বিবরণপ্রস্থানে শব্দাপরোক্ষবাদ

সম্ভ ঘোষ, গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 15.01.2025; Accepted: 28.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*Śabda is an indirect source of valid cognition. It produces an indirect valid cognition. Almost all the Indian Philosopher admit this view. Even Advaita Vedāntins do not refuse that śabda gives rise to indirect cognition. There are three schools in Advaita Vedānta, they are Vivaraṇa school, Bhāmatī school and Maṇḍana school. In this paper I have mentioned two schools Vivaraṇa and Bhāmatī. These schools are not unanimous about many subjects including śābdāparokṣavāda. According to śābdāparokṣavāda, sentence gives rise to immediate cognition. Though Vivaraṇa School says that in ordinary cases accept like daśmastvamasi (you are the tenth person), sentence produces indirect cognition, but Vedic sentences like tattvamasi (you are that) etc. gives rise to immediate cognition of Brāhmaṇa. All the Advaita Vedāntins such as Śaṅkara, Prakāśātmajati, Citasukhācārya who belong to Vivaraṇa school are the supporters of śābdāparokṣavāda, on the other hand the Advaitins like Maṇḍana Miśra, Vācaspti Miśra who belong to Bhāmatī refuse to accept śābdāparokṣavāda. In this paper I have discussed both the views on basis of their respective books. Following authentic books of the Bhāmatī school I have tried my best to analyse in this paper the criticism raised by the Bhāmatī school about śābdāparokṣavāda. After that refuting all these criticisms, I have given the reasons of the Vivaraṇa school in favour of śābdāparokṣavāda.*

**Keywords:** Daśmastvamasi, Tattvamasi, Śābdāparokṣavāda, Śraḅaṇ, Maṇḍana, Nididhyāsana, Vivaraṇa school, Bhāmatī school.

ভারতীয় দর্শনের মূল উদ্দেশ্য হল জীবের মোক্ষ প্রাপ্তি। আন্তিক দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম হল অদ্বৈত বেদান্ত। অদ্বৈত বেদান্তেও বলা হয়েছে, ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান বা শুদ্ধচেতনের জ্ঞান থেকে জীবের মুক্তি হয়। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে অদ্বৈত বেদান্তের আধিবৈদ্যক আলোচনা যেমন গুরুত্ব লাভ করেছে, তেমনি জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ দর্শন শাস্ত্রে একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার প্রমাণগুলি ছাড়া ভারতীয় দর্শনে শ্রুতি প্রমাণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আচার্য শংকরের মতে শ্রুতি প্রমাণ সর্বাপেক্ষা বলবত। ‘তং

ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি'- এই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে উপনিষদগম্য বলা হয়েছে। শ্রুতানুকূল যুক্তির দ্বারা ব্রহ্মাত্মকত্ব বা ব্রহ্মের অপরোক্ষত্ব বিচার ব্যবস্থাপিত হয়।

'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' ও 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'- এই চারটিকে মহাবাক্য বলা হয়। মহাবাক্য গুলি ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ববেদের অন্তর্গত। শুদ্ধচৈতন্য পদার্থই মহাবাক্য সমূহের প্রতিপাদ্য। মহাবাক্য গুলির দ্বারা ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান বা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়। বেদান্তবাক্যরূপ শব্দ হতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সম্ভাবিত হয় বলে এই জ্ঞানকে শব্দজন্য অপরোক্ষ জ্ঞান বলা হয়। শব্দজন্য অপরোক্ষজ্ঞান স্বীকার করা হয় বলে এই মতবাদের নাম শাব্দাপরোক্ষবাদ। শাব্দাপরোক্ষবাদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার পূর্বে অদ্বৈত বেদান্তের কিছু বিষয় আলোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শঙ্করাদ্বৈতবাদের দুটি ধারা- বিবরণ প্রস্থান ও ভামতী প্রস্থান। ভামতী সম্প্রদায় শাব্দাপরোক্ষবাদ স্বীকার করেন না, তাদের মতে শব্দ পরোক্ষজ্ঞানের জনক। বিবরণ সম্প্রদায় শাব্দাপরোক্ষবাদ স্বীকার করেন, তাদের মতে শব্দই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের হেতু। বিবরণপন্থী দার্শনিকগণ শ্রবণকে প্রধান বা অঙ্গী এবং মনন ও নিদিধ্যাসনকে তার অঙ্গ বলেছেন। কিন্তু ভামতীপন্থী দার্শনিকগণ নিদিধ্যাসনকে অঙ্গী এবং শ্রবণ ও মনন তার অঙ্গ বলেছেন।

এছাড়াও বিবরণ প্রস্থানের বিভিন্ন দার্শনিকগণ শঙ্করভাষ্যের উপর টীকা গ্রন্থ লিখেছেন, যার মাধ্যমে শাব্দাপরোক্ষবাদ স্বীকার করেছেন। বিবরণ প্রস্থানের প্রায় সব দার্শনিকই শব্দ থেকে ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয় তা স্বীকার করেন। বিবরণ সম্প্রদায় দার্শনিকগণ আচার্য পদ্মপাদ, প্রকাশাত্মযতি, চিৎসুখাচার্য, মধুসূদনসরস্বতী, প্রকাশানন্দ, রামাছয়াচার্য, আনন্দানুভব, সর্বজ্ঞাত্মমুনি প্রভৃতি বৈদান্তিক আচার্যগণ 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' এই চারটি মহাবাক্যজন্য অপরোক্ষনিশ্চয় স্বীকার করেছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য রামানুজ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নির্ঝাক এবং দ্বৈতবাদী মাধ্বসম্প্রদায় শাব্দাপরোক্ষ স্বীকার করেন না। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিকগণ শব্দজন্য অপরোক্ষজ্ঞান স্বীকার করেন নাই। এইসব দার্শনিক সম্প্রদায় বলেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ থেকেই একমাত্র অপরোক্ষজ্ঞান হয়। শব্দ কখনোই অপরোক্ষজ্ঞানের জনক হয় না।

সমস্ত প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ ব্যতীত অপর সকল প্রমাণকেই পরোক্ষ বলে স্বীকার করা হয়। শব্দও পরোক্ষ প্রমাণ বলে গণ্য হয়েছে। অথচ শাব্দাপরোক্ষবাদ স্বীকৃতিদের মতে শব্দকে অপরোক্ষজ্ঞানের জনক বলে বর্ণনা করা হয়। সুতরাং শাব্দাপরোক্ষবাদের বিচার্য বিষয় হল যারা শব্দ হতে অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করেন না, তাদের মত খণ্ডনপূর্বক শব্দকেই অপরোক্ষজ্ঞানের জনকরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। অদ্বৈতমতালম্বী সকল দার্শনিক শাব্দাপরোক্ষবাদের খণ্ডনে ও স্থাপনে নানাবিধ যুক্তির সাহায্যে লৌকিক দৃষ্টান্ত 'দশমস্তুমসি' এবং শ্রোতদৃষ্টান্ত 'তত্ত্বমসি' ও অন্যান্য শ্রুতিবাক্যকে অবলম্বন করে বিচার করেছেন।

ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের জন্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধির অনুষ্ঠান প্রয়োজন। শ্রবণাদির অভ্যাসের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়।<sup>১</sup> যে বাক্য থেকে ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয় তাকে মহাবাক্য বলে। ফলে প্রথমে মহাবাক্য শ্রবণ ও তারপর তার মনন ও নিদিধ্যাসন করলে যদি ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান না হয়, তবে মহাবাক্যের আর কোন সার্থকতা থাকে না।

**শ্রবণ:** প্রকাশাত্মযতি 'পঞ্চপাদিকা' গ্রন্থে বলেন শ্রবণের অর্থ হল বেদান্ত বাক্যার্থের বিচার। ছয়টি লিঙ্গের দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিষয়ে সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্য অবধারণ।<sup>২</sup> ছয়টি লিঙ্গ হল- উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস,

অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি। ব্রহ্মজ্ঞান শ্রবণই প্রধান, যেহেতু এর প্রমাণরূপে শ্রুতিবাক্য অবস্থিত আছে।

**মনন:** এই ছয়টি লিঙ্গের তাৎপর্য অনুধাবন করে অদ্বৈতবস্তুর নিরন্তরভাবে অনুচিন্তনকে মনন বলে।<sup>১</sup> মধুসূদন সরস্বতীর মতে, ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ে উক্ত অসত্ত্ব শঙ্কার নিবর্তক যুক্তিকে মনন বলে।

**নিদিধ্যাসন:** নিদিধ্যাসন শব্দের অর্থ হল ধ্যান। ব্রহ্মানন্দ বলেন, নিদিধ্যাসন হল অপারোক্ষত্বনিশ্চয়সম্পাদক তর্ক।

**মহাবাক্য চতুষ্টয়ের অর্থ:** ‘প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম’, ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’, ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’ ও ‘তত্ত্বমসি’ এই চারিটি মহাবাক্য। প্রতিটি মহাবাক্যই অখণ্ডার্থের বোধক। ‘প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম’ প্রজ্ঞান শব্দের বাচ্যার্থ জীব এবং ব্রহ্ম শব্দের বাচ্যার্থ ঈশ্বর, লক্ষণার দ্বারা শুদ্ধচৈতন্য বোধিত হয়। ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ এই শ্রুতিবাক্যে প্রত্যগাত্মা বা জীব ‘অহম্’ শব্দের দ্বারা সূচিত হয়। ‘ব্রহ্ম’ শব্দের দ্বারা ঈশ্বরকে জ্ঞাপন করা হয়। লক্ষণার দ্বারা শুদ্ধচৈতন্য বোধিত হয়ে থাকে। ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’ এই শ্রুতিতে ‘আত্মা’ শব্দের বাচ্যার্থ জীব। ‘ব্রহ্ম’ পদের অর্থ ঈশ্বর (পরব্রহ্ম নয়)। এইস্থলে লক্ষণা করা হয়। ইহা পরোক্ষ নয়, তাহা ‘অয়ম্’ শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়ে থাকে। মহাবাক্যের হবে যে, সমস্ত বস্তুর মধ্যে অনুসৃত স্বপ্রকাশ আত্মা। ‘তত্ত্বমসি’ বাক্যে ‘তৎ’ পদের দ্বারা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্যস্বভাব অপারোক্ষত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্যরূপ ধর্মী উপস্থাপিত হয়। ‘ত্বম্’ পদের দ্বারা অশুদ্ধ, অসর্বজ্ঞ, পরোক্ষত্বাদি বিশিষ্টাংশপরিত্যাগপূর্বক অবিরুদ্ধ অখণ্ড চৈতন্যই প্রতিপাদিত হয়ে থাকে। অখণ্ডার্থবোধের অর্থনির্ধারণে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। ব্রহ্মের সঙ্গে বিষয়ের অভেদ হলে অপারোক্ষ বা প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। ‘যৎ সাক্ষাদপারোক্ষাদ ব্রহ্ম’ এই শ্রুতিতে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই সাক্ষাৎ বা অপারোক্ষ তত্ত্ব। তেমনি ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি মহাবাক্য হতে অপারোক্ষ জ্ঞান হয়ে থাকে। বিবরণ প্রস্থানের মূল বক্তব্য হল শব্দ থেকেও কোন কোন সময় অপারোক্ষ জ্ঞান হয়ে থাকে। বেদান্তদর্শনে একটি আখ্যায়িকা প্রসিদ্ধ আছে: দশটি ব্যক্তি নৌকা পারাপার হওয়ার সময় কোন একজন ব্যক্তি যদি নিজেকে গণনা না করে অপর সকলকে গণনা করেন এবং ঐরূপ ভ্রান্তিবশতঃ দশমব্যক্তির অনুসন্ধান করেন, তবে তাঁর ভ্রমের নিবৃত্তির জন্য উপর কেউ বলতে পারেন ‘দশমস্ত্বমসি’। এই বাক্য শ্রবণের ফলে তাঁর যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় সে জ্ঞানকে অবশ্যই অপারোক্ষ জ্ঞানই বলতে হবে। কারণ ঐ জ্ঞান যদি অপারোক্ষ না হত তাহলে তার দ্বারা অপারোক্ষ ভ্রমের নিবৃত্তি সম্ভব হত না। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাক্য শ্রবণের ফলে দশম ব্যক্তির অনুসন্ধানরূপ অপারোক্ষ ভ্রমের নিবৃত্তি হয়ে থাকে। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে যে বাক্য শ্রবণের ফলেই এস্থলে অপারোক্ষপ্রমার উৎপত্তি হয়ে থাকে। ‘তুমি দশম’ এই বাক্য শুনে ‘আমি দশম’ এই প্রকার জ্ঞান হয়, তাকে ইন্দ্রিয়জন্য বলা যায় না। কারণ গণনাকারী ব্যক্তি নিজেকে দশম বলে প্রত্যক্ষ অনুভব তো হয়নি। তাছাড়া যখন প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় তখন ইন্দ্রিয়দের শব্দ সহকারীত্ব থাকে- এমন কথা তো কোন সম্প্রদায়ই বলেন না। এই কারণেই ‘তুমি দশম’ এইজ্ঞানে যেহেতু ‘শব্দসহকৃত ইন্দ্রিয়জন্যত্ব’ রয়েছে, তাই এই জ্ঞানে অপারোক্ষত্ব আছে- এমনটা বলা যায় না। এবং একইসঙ্গে এই জ্ঞানে ইন্দ্রিয়জন্যত্ব না থাকায় জ্ঞানটি যে পরোক্ষ জ্ঞানই- এমন কথা বলা যায় না। তবু যদি পরোক্ষ জ্ঞান বলি তাহলে ‘দশম রয়েছে’ এই পরোক্ষ জ্ঞান, ‘দশম নেই’ এই অপারোক্ষ অধ্যাসের নিবৃত্তি করতে পারে না। এই জন্য ‘তুমি দশম’ কিংবা ‘তুমি ব্রহ্ম’ ইত্যাদি অপারোক্ষ বিষয়ক বাক্য দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাকে

‘অপরোক্ষ’ বলেই মানতে হবে। সুতরাং শব্দ থেকে এরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানের উৎপত্তিকে ‘শাব্দাপরোক্ষবাদ’ বলে।

মণ্ডন মিশ্র ও বাচস্পতি মিশ্র শাব্দাপরোক্ষবাদ খণ্ডন করেছেন। মণ্ডন মিশ্র তাঁর ‘ব্রহ্মসিদ্ধি’ গ্রন্থে বলেন ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি উপনিষদ বাক্যসমূহ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন করে। ঐ বাক্যসমূহ হতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তা পরোক্ষ, অপরোক্ষ নয়। তেমনি ভামতী প্রস্থানের প্রতিস্থাপক বাচস্পতি মিশ্র শব্দ থেকে অপরোক্ষজ্ঞান হয় তা অস্বীকার করেন। তিনি তাঁর ‘ভামতী’ গ্রন্থে শাব্দাপরোক্ষবাদের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন বেদান্তবাক্যজন্য যে জ্ঞান হয় তা ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞান, অপরোক্ষজ্ঞান নয়। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ মাধ্যমে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কারণ ইন্দ্রিয়। সুতরাং বেদান্তবাক্যজন্যজ্ঞান শাব্দবোধাত্মক বলে উহা অপরোক্ষ পদবাচ্য হতে পারে না। উক্ত বিষয় আরো ভালোভাবে বুঝতে হলে বাচস্পতি মিশ্রের প্রত্যক্ষের লক্ষণটি নিয়ে আলোচনা করতে পারি। প্রত্যক্ষের লক্ষণটি হল— ‘স্ববিষয়বিষয়কস্বসমানাধিকরণজ্ঞানাজন্যজ্ঞানত্ব’। ‘জ্ঞানাজন্যজ্ঞানত্ব’ লক্ষণে জ্ঞানাংশে ‘স্বসমানাধিকরণ’ এই বিশেষণ প্রযুক্ত হবে।<sup>৪</sup> ঈশ্বরীয় জ্ঞান প্রমাতার স্বসমানাধিকরণ জ্ঞান নয়। ভামতী পত্নী কল্পতরুপরিমলকারের মতে স্ববিষয়বিষয়কজ্ঞানজন্যজ্ঞানত্বই জ্ঞানগত অপরোক্ষত্ব রূপে বিবক্ষিত হয়েছে। এইভাবে জ্ঞানগত অপরোক্ষত্ব নির্ধারিত হলে এরূপ জ্ঞানাজন্যব্যবহারযোগ্যত্বই অর্থগত অপরোক্ষত্ব রূপে নির্ধারণ করা চলবে।<sup>৫</sup> জ্ঞানগত ও বিষয়গত অপরোক্ষত্ব নির্ধারিত হওয়ার ফলে ভামতী সম্প্রদায়ের মতে শব্দজন্যজ্ঞান কখনোই অপরোক্ষ নামে অভিহিত হতে পারবে না। কারণ শব্দজন্যজ্ঞান স্ববিষয়বিষয়কজ্ঞানজন্যই হবে, জ্ঞানাজন্য হবে না।<sup>৬</sup>

ভামতীপত্নীগণ বলেন, ‘দশমস্তুমসি’ প্রভৃতিস্থলে যে অপরোক্ষজ্ঞান জন্মে তা শব্দজন্য নয়, শব্দশ্রবণান্তর তদ্বিষয়ে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধির্ষ ঘটে এবং তার ফলস্বরূপ প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। ‘দশমস্তুমসি’ বাক্য হতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তার দ্বারা মনের অনবধানতা দূরীভূত হয়। মন বিষয়ের সাথে সম্বন্ধির্ষ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হয়ে দশমত্বরূপে প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন করে। মন নিরপেক্ষভাবে প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না। ‘দশমস্তুমসি’ এই শাব্দজ্ঞানটি মননিরপেক্ষ ভাবে উৎপন্ন হতে পারে না। সুতরাং ইহা বলা যায় বেদান্তবাক্যজন্য যে প্রমাণ তা পরোক্ষ প্রমাণ। তাহলে বেদান্তবাক্যজন্য যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তা পরোক্ষস্বরূপ, প্রত্যক্ষস্বরূপ হতে পারে না। সুতরাং বেদান্তবাক্যরূপ প্রমাণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জনক হবে এরূপ মত সিদ্ধ হয় না। শব্দজন্য অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করলে ‘দশমস্তুমসি’ ইত্যাদি বাক্য শ্রবণান্তর অন্ধেরও অপরোক্ষজ্ঞান উদিত হতে পারত, কিন্তু অন্ধের পরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হয়।<sup>৭</sup> এক ব্যক্তি রূপের প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করেছে এবং নীল, পীত প্রভৃতি শব্দের শক্তিও অবগত হয়েছে, কোন কারণবশতঃ সে অন্ধ হলে তার নীল, পীত প্রভৃতি শব্দ শ্রবণ করলে কি তার রূপবিষয়ক জ্ঞানটিকে প্রত্যক্ষ বলা যাবে? তা কখনই হয় না, অতএব পরোক্ষ প্রমাণ হতে অপরোক্ষ জ্ঞানের উদ্ভব সম্ভব নয়।

ভামতীমতের তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জনক বেদান্তবাক্য নয়। বেদান্তবাক্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ নয়। এর প্রমাণ অন্তঃকরণ। সংগীত-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের জ্ঞানলাভের অনন্তর, ঐ জ্ঞানের অভ্যাসের ফলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের একপ্রকার সংস্কার উৎপন্ন হয়। ঐ সংস্কার সহকৃত শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারাই স্বরগ্রামের মূর্ছনা প্রভৃতির ভেদ সকলের প্রত্যক্ষগোচর হয়ে থাকে, কিন্তু সংগীতশাস্ত্রের দ্বারা ঐপ্রকার প্রত্যক্ষ হয় না। তদ্রূপ এই অন্তঃকরণ বেদান্তবাক্যজন্য পরোক্ষজ্ঞানে অভ্যাসরূপ নিদিধ্যাসনের দ্বারা উৎপন্ন সংস্কারে

সংস্কৃত হয়ে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করা হয়।<sup>৮</sup> সুতরাং শব্দজন্য অপরোক্ষজ্ঞান স্বীকার করার কোনই আবশ্যিকতা নেই। অতএব ভামতীসম্প্রদায়ের মতানুসারে শব্দ পরোক্ষ প্রমাণ এবং তজ্জন্য জ্ঞান কখনই অপরোক্ষ হবে না।

বিবরণ প্রস্থানে দার্শনিকগণ শাব্দাপরোক্ষবাদ স্বীকার করেছেন। পদ্মপাদ তাঁর ‘পঞ্চপাদিকা’ গ্রন্থে শাব্দাপরোক্ষবাদ স্বীকার করেন। তিনি বলেন, ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য উদিত হলে মনের অসম্ভবনা ও বিপরীতভাবনা দূরীভূত হয়। বিদ্যারণ্যমুণি ‘বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ’ গ্রন্থে বিবরণ মতকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিবরণকার বিদ্যারণ্যমুনি বলেন, ‘যৎ সাক্ষাদপরোদ্ ব্রহ্ম’ এই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে অপরোক্ষস্বভাব বলা হয়েছে। তিনি বলেন, “তত্র ব্রহ্ম এব সর্বসংবিদ্যুপাদানত্বাৎ ব্রহ্মকোরশব্দপ্রমাণসংবেদনেহপি তদভিন্নতয়া বা তজ্জনকতা বা ব্রহ্মাপি প্রথমমেবাপরোক্ষতয়া অবভাসতে”।<sup>৯</sup>

বিবরণ প্রস্থানে উল্লেখযোগ্য দার্শনিক হলেন চিৎসুখাচার্য ও মধুসূদন সরস্বতী। এই দার্শনিক যুগলদ্বয় শাব্দাপরোক্ষবাদকে দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। চিৎসুখাচার্য তাঁর ‘তত্ত্বপ্রদীপিকা’ গ্রন্থে শাব্দাপরোক্ষবাদ স্থাপনের জন্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বলেন, শব্দজন্যজ্ঞান থেকে ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়ে থাকে। চিৎসুখাচার্য বলেন, পূর্বপক্ষী দাবি করে বলেন, ‘দশমস্তুমসি’ প্রভৃতি স্থলে ঐরূপ বাক্যজন্যজ্ঞানই অপরোক্ষজ্ঞান নয়। সেখানেও বাক্যশ্রবণান্তর দশমরূপে নির্দিষ্ট ব্যক্তির সহিত ইন্দ্রিয়সম্মিকর্ষাদি বিদ্যমান থাকায় অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সুতরাং এটি শাব্দাপরোক্ষবাদের দৃষ্টান্ত হতে পারে না। যদিও বলা যেতে পারে যে, ঐস্থলে শব্দশ্রবণের পূর্বেও ইন্দ্রিয়সম্মিকর্ষ বিদ্যমান থাকায় তাদৃশ শব্দ শ্রবণের পূর্বে ঐরূপ প্রত্যক্ষ হয় না, পক্ষান্তরে শব্দ শ্রবণের পরেই ঐ প্রত্যক্ষ উদিত হয়। সুতরাং ঐ জ্ঞান ইন্দ্রিয়সম্মিকর্ষজন্য নয়, পরন্তু তাদৃশ বাক্যজন্য।<sup>১০</sup>

শাব্দাপরোক্ষবাদী বলেন, শব্দজন্য অপরোক্ষজ্ঞান সর্বানুভবসিদ্ধ হওয়ায় শব্দের অপরোক্ষজ্ঞানজনকত্ব প্রসিদ্ধই আছে। পূর্বপক্ষীরা বলতে পারে যে, ‘দশমস্তুমসি’ অনুভবসিদ্ধ অপরোক্ষজ্ঞানের জনক শব্দ নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়ই তাদৃশ অপরোক্ষজ্ঞানের জনক, শব্দ সহকারী কারণমাত্র। এর উত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন, বাক্যজন্য অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও যদি বাক্যের অপরোক্ষজ্ঞানের সাক্ষাৎজনকতা স্বীকৃত না হয়, তা হলে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানস্থলেও ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎজনকত্ব সিদ্ধ হওয়ায় অনুকূলে কোন যুক্তি থাকবে না। কারণ ইন্দ্রিয়সংযোগ হলেই অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। কিন্তু মনঃসংযোগও সেখানে আবশ্যিক। সুতরাং ‘দশমস্তুমসি’ প্রভৃতিস্থলে শব্দশ্রবণান্তর যে অপরোক্ষানুভব সেখানে শব্দকে সহকারী কারণরূপে কল্পনা করার অনুকূলে কোন যুক্তিই নেই। পক্ষান্তরে শব্দজন্য অপরোক্ষজ্ঞানের প্রতি শব্দই সাক্ষাৎ করণ, ইন্দ্রিয় সহকারী কারণ বিনিগমনাবিরহপ্রযুক্ত এইরূপ সিদ্ধান্ত করার পক্ষে কোন বাঁধা নেই।

পূর্বে প্রদত্ত পূর্বপক্ষীর আপত্তির উত্তরে শাব্দাপরোক্ষবাদী বলেন, ‘দশমস্তুমসি’ প্রভৃতিস্থলে ইন্দ্রিয়সম্মিকর্ষ ব্যতীতও কেবলমাত্র শব্দশ্রবণজন্য অপরোক্ষনিশ্চয় হয়। অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে অথবা স্থলবিশেষে দৃষ্টিশূন্যব্যক্তিরও তাদৃশবাক্যশ্রবণজন্য ‘আমি দশমব্যক্তি’ এরূপ অপরোক্ষনিশ্চয় উৎপন্ন হয় এটা অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং ঐ সমস্তস্থলে ইন্দ্রিয়সম্মিকর্ষ নিরপেক্ষভাবে কেবলমাত্র শব্দশ্রবণজন্য অপরোক্ষ উপলব্ধি উৎপন্ন হয়। অতএব ‘দশমস্তুমসি’ প্রভৃতিস্থলে তাদৃশ শব্দকেই অপরোক্ষজ্ঞানের করণ বলে স্বীকার করতে হবে।



মধুসূদন সরস্বতী তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে শাব্দাপরোক্ষবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য তিনটি গ্রন্থে শাব্দাপরোক্ষবাদ প্রতিস্থাপিত করেছেন। সেগুলি হল- (ক) অদ্বৈতসিদ্ধি, (খ) বেদান্তকল্পলতিকা, (গ) গীতাভাষ্য গূঢ়ার্থদীপিকা।

মধুসূদন সরস্বতী বলেন, শব্দ থেকে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়ে থাকে। তিনি বলেন, শাব্দাপরোক্ষবাদ শ্রুতিসম্মত। ছান্দোগ্যোপনিষদ ‘তদ্বাস্য বিজজ্ঞৌ’, ‘তমসঃ পারং দর্শয়তি’ এই শ্রুতি পরিদৃষ্ট হয়। আর ‘বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ’ ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারাও শাব্দাপরোক্ষবাদ প্রমাণিত হয়। প্রথমোক্ত শ্রুতির তাৎপর্য অনুসন্ধান করলে বোঝা যায় যে, ‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদি উপদেশবাক্য হতে শ্বেতকেতু আত্মাকে জানিয়েছিলেন। দ্বিতীয় শ্রুতি হতে ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমার উপদেশের দ্বারা নারদকে অজ্ঞানের পরপার দেখিয়েছিলেন অর্থাৎ আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়েছিলেন।” ‘বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ’ এই শ্রুতিতে ‘বি’ এই শব্দের উপসর্গযুক্ত বিজ্ঞান পদের সাহায্যে শাব্দজ্ঞান যে বিশেষবিষয়ক তা প্রতিপাদিত হয়েছে। ‘সুনিশ্চিত’ শব্দে ‘সু’ উপসর্গের দ্বারা ঐ জ্ঞান যে অপরোক্ষস্বরূপ তা বর্ণিত হয়েছে। এবং ‘সুনিশ্চিতার্থ’ এই পদের ‘অর্থ’ শব্দের দ্বারা বলা হয়েছে, যা মুখ্যার্থ এছলে নিশ্চয়রূপে জ্ঞানের বিষয় হয়। বেদান্তবাক্যের মুখ্যার্থ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। সুতরাং ঐরূপ মুখ্যার্থবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানের কথাই বলা হয়েছে।<sup>২২</sup>

পূর্বপক্ষী ভামতী সম্প্রদায়ের প্রশ্ন হল, শব্দ অপরোক্ষজ্ঞানের জনক তা কী প্রমাণসিদ্ধ? এর উত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেন, ‘বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ’, ‘তত্ত্বমসি’, ‘তদ্বাস্য বিজজ্ঞৌ’ এই সকল শ্রুতি শাব্দাপরোক্ষবাদের প্রমাণ রূপে গৃহীত হয়েছে। এছাড়াও তিনি অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্রুতিপ্রমাণ ছাড়াও শাব্দাপরোক্ষবাদে প্রমাণরূপে অনুমান প্রমাণের কথা বলেছেন। অনুমানের আকারটি হল- ‘অপরোক্ষত্বং, তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যজ্ঞানবৃত্তিঃ, অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বাৎ জ্ঞানত্ববৎ’। এই অনুমানের পক্ষ হল ‘অপরোক্ষত্ব’, তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যজন্য জ্ঞানের বৃত্তি হচ্ছে সাধ্য, আর হেতু হল ‘অপরোক্ষজ্ঞাননিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব’। উদাহরণ হল ‘জ্ঞানত্ব’।

পূর্বপক্ষী ভামতী সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ আরও বলেন, শাব্দাপরোক্ষবাদ যদি স্বীকার করি তাহলে ‘মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্’ এই শ্রুতিতে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে বিরোধ হবে। কারণ এই শ্রুতিতে বলা হয়েছে ব্রহ্মকে শুধুই মনের দ্বারা জানা যায়। সুতরাং শব্দজন্য ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয়- এরূপ বলা অসঙ্গত। এর উত্তরে শাব্দাপরোক্ষবাদীরা বলেন, ‘মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্’ শ্রুতির তাৎপর্য অন্যভাবে বুঝতে হবে। বিক্ষিপ্ত মন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে উপযোগী নয়। সমাধিশুদ্ধ মনই উপযোগী, তা বোঝানোর জন্যই ‘মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্’ ইত্যাদি শ্রুতির উল্লেখ করা হয়েছে। চিত্ত একাগ্র না হলে শব্দজন্য অপরোক্ষজ্ঞান হতে পারে না। তাই অপরোক্ষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতি শ্রবণ অঙ্গী এবং মনন ও নিদিধ্যাসন হল শ্রবণের অঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে মনের অপরোক্ষজ্ঞানকরণত্ব প্রমাণ সিদ্ধই নয়। কারণ সুখ-দুঃখাদি সাক্ষীবেদ্য এবং আত্মা স্বয়ং প্রকাশ বলে মন কোন বিষয়েরই সাক্ষাৎকারের হেতু নয়।<sup>২৩</sup> অতএব মনকে সহকারী কারণ ভিন্ন কল্পনা করার উপায় নেই। এই অবস্থায় ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি মহাবাক্য ব্যতীত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাধক অন্য কিছুই কল্পনা করা অসম্ভব।

পরিশেষে বলা যায়, শ্রুতি ও যুক্তি অনুসারে অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিপাদনই শাব্দাপরোক্ষবাদের মূল উদ্দেশ্য। শঙ্করাচার্য যে অখণ্ডব্রহ্মস্বরূপের কথা বলেছেন তা শ্রীতপ্রমাণের অন্তর্গত। বেদান্তবাক্য শ্রবণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের বীজ। মনন ও নিদিধ্যাসন তার সহকারী। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হলে সমস্ত রকমের অজ্ঞান দূরীভূত হয়। উপনিষদে বলা হয়েছে, ‘তত্ত্বমসি’ ইত্যাদি মহাবাক্য গুলি দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়ে থাকে।

সুতরাং শ্রুতবেদান্ত ব্যক্তির যথাবিহিত সাধনের ফলে শব্দ হতে অপরোক্ষজ্ঞান জন্মে এবং তার ফলে মুক্তি বা মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।

### তথ্যসূত্র:

১. শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।  
মত্না চ সততং ধ্যেয়ঃ এতে দর্শনহেতবঃ।।  
—বিবরণগ্রহেয়সংগ্রহ. বিদ্যারণ্যমুনি, শ্রযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ অনুদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির হতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, পৃ. ৭
২. শ্রবণং নাম ষড়বিধলিঙ্গৈরশেষবেদান্তানমদ্বিতীয়ে বস্তুনি তাৎপর্যাবধারণম।  
—বেদান্তসার. সদানন্দ যোগীন্দ্র, ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য সম্পাদিত, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৩৮, পৃ. ১৮২
৩. মননন্ত শ্রুতস্যাদ্বিতীয়বস্তুনো বেদান্তার্থানুগুণযুক্তিভিরনবরতমনুচিন্তনম।  
—বেদান্তসার. সদানন্দ যোগীন্দ্র, ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য সম্পাদিত, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৩৮, পৃ. ১৮৯
৪. মননন্ত শ্রুতস্যাদ্বিতীয়বস্তুনো বেদান্তার্থানুগুণযুক্তিভিরনবরতমনুচিন্তনম।  
—কল্পতরুপরিমল. অগ্নয়দীক্ষিত, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩৮, পৃ. ৫৬
৫. এবমপরোক্ষজ্ঞানলক্ষণব্যবস্থিতৌ তজ্জন্য ব্যবহারযোগ্যত্বমর্থাপারোক্ষ্যমিতি তন্নির্বাচনদ্রষ্টব্যম।  
—কল্পতরুপরিমল. অগ্নয়দীক্ষিত, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩৮, পৃ. ৫৬
৬. এবঞ্চ শব্দপ্রমাণং স্বাবিষয়বিষয়কজ্ঞানজন্যাং পরোক্ষপ্রমামেব জনয়তীতি নাপরোক্ষপ্রমাহেতুরিতি ভাবঃ।  
—কল্পতরুপরিমল. অগ্নয়দীক্ষিত, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩৮, পৃ. ৫৬
৭. দশমস্তমসীত্যাত্রাপি তৎসচিবাদেব সাক্ষাৎকারঃ অক্লাদেস্ত পরোক্ষধীরেব।  
—বেদান্তকল্পতরু. অমলানন্দ সরস্বতী, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩৮, পৃ. ৫৬
৮. তস্মাৎ যথা গাঙ্কর্বশান্ত্রার্থজ্ঞানাভ্যাসাহিত-সংস্কারসচিবঃ শ্রৌত্রেন্দ্রিয়েণ ষড়জাদিস্বরগ্রামমূর্ছনাভেদম্ অধ্যক্ষম্ অনুভবতি,  
এবং বেদান্তার্থজ্ঞানাভ্যাসাহিতসংস্কারো জীবস্য ব্রহ্মভাবম্ অন্তঃকরণেন ইতি।  
—ভামতী. বাচস্পতি মিশ্র, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৩৮, পৃঃ ৫৮
৯. বিবরণগ্রহেয়সংগ্রহ. বিদ্যারণ্যমুনি, শ্রযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ অনুদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির হতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, পৃ. ৪০৬-৪০৭
১০. ন চ দশমস্তমসীতি বাক্যমুদাহরণম। তত্রাপি কেবলশব্দস্যাপরোক্ষজ্ঞানাজনকত্বাদি- দ্বিগয়সম্বিকর্ষস্যাপি দশমশরীরগোচরস্য তত্র ভাবাৎ।  
—তত্ত্বপ্রদীপিকা. চিত্‌সুখাচার্য, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯১৫, পৃ. ৩৩৩
১১. পূর্ববাক্যে তজ্জনকাপরোক্ষজ্ঞানস্যোপদেশমাত্রসাধ্যত্বোক্তেঃ, দ্বিতীয় শ্রুতৌ শাঙ্গজ্ঞানসা বিপদেন বিশেষবিষয়ত্বস্য লাভাৎ সুপদেন অপরোক্ষত্বোক্তেঃ।  
—অদ্বৈতসিদ্ধি, মধুসূদন সরস্বতী, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯১৭, পৃ. ৮৭৫
১২. নাপি বেদান্তবোধস্য ব্রহ্মাতিরিক্তস্যাপ্যেবমাপরোক্ষ্যপত্তিঃ। অর্থপদস্য মুখ্যতন্তাত্পর্যবিষয়পরত্বাৎ, বেদান্তবোধ্যতয়া ব্রহ্মমাত্রপর্যবসন্নত্বাচ্চ।  
—তদেব, পৃ. ৮৭৫
১৩. সুখাদীনাং সাক্ষিবেদ্যত্বাদানশ স্বয়ংপ্রকাশত্বাৎ মনসঃ কৃচিদপিসাক্ষাৎকারহেতুত্বা- সম্প্রতিপত্তেঃ।  
—তত্ত্বপ্রদীপিকা. চিত্‌সুখাচার্য, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯১৫, পৃ. ৩৩৬



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 812-818

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.072



## মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও তৎকালীন কোচবিহারের সাহিত্যচর্চা

কালিপদ বসুনিয়া, গবেষক, বাংলা বিভাগ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 13.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*The Koch dynasty was founded in the sixteenth century by Maharaja Biswa Singha. The literary practice began in this region in the fourteenth-fifteenth century. From the reign of Maharaja Biswa Singha to that of Harendranarayan various works such as translated literature, Mangal Kavya, narrative poetry, Leela and Bhajan songs, Nat, Panchali and folklore etc were found. Literary works which flourished in the Cooch Behar Raj Sabha during the Sixteenth-seventeenth centuries came to a halt in the eighteenth centuries. It flourished again from the time of Maharaja Harendranarayan in the nineteenth century. The reign of Maharaja Harendranarayan is a bright chapter in the literary history of Cooch Behar State. He ascended the throne at a very young age when the state was in turmoil. To restore the situation, Queen Mother Kamteshwari Devi managed the kingdom with the support of the British government. Once Maharaja Harendranarayan reached maturity, he assumed full responsibility for governance. Maharaja Harendranarayan was proficient in Literature, art, music, and painting. He translated the Ramayana, Mahabharata, and the Puranas. Alongside his own literary creations, his patronage attracted many talented individuals to his court, transforming it into a hub of literary activity. During his reign, the royal court became the center of literary pursuits, including studies of the Ramayana, Mahabharata, Puranas, Mangal Kavya, history, philosophy, scriptures, and music. Through Maharaja Harendranarayan's initiatives, the Cooch Behar royal court contributed immensely to Bengali literature, leaving a lasting legacy.*

**Keywords:** Harendranarayan, Coochbehar, literature, Madhyayoug, Rajsava.

কামতায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকের গৌড়ের হোসেন শাহের আক্রমণে (আনুমানিক ১৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে) 'খেন' বংশের শেষ রাজা নীলাম্বর পরাজিত হলে 'খেন' বংশের অবসান ঘটে ও মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় কিছুটা অরাজক অবস্থা দেখা দিলে ভুঁইয়ারা স্বাধীন হয়ে নিজেদের মধ্যেই আত্মকলহে লিপ্ত হন। সেই সুযোগে গোয়ালপাড়ার জেলার অন্তর্গত চিকনায় মেচ বংশের হরিদাস 'মন্ডল' নির্বাচিত হয়। হরিদাস মণ্ডলের এই চার পুত্র কোচ রাজ্যে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে

প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বিশ্বসিংহ (বিশু) কোচ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। বিশ্বসিংহের রাজত্বের কাল নির্ণয়ে সংশয় রয়েছে তবে খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ ১৪৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ ধরেছেন। বিশ্বসিংহ ক্রমে সৌমার রাজ্য, বিজনী, বিদ্যাগ্রাম, বিজয়পুর, ভোটরাজ্য আক্রমণ করে জয়লাভ করেন। তিনি চিকনা পর্বত থেকে রাজধানী কামতায় নিয়ে আসেন। কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠিতা হিসেবে বিশ্বসিংহের নামটি প্রতিষ্ঠিত। এরপর রাজা হন বিশ্বসিংহের পুত্র নরসিংহ কিন্তু পারিবারিক অন্তঃকলহের কারণে তাকে সিংহাসন ছাড়াতে হয়। নরসিংহের পর রাজা হয় তারই ভাই নরনারায়ণ। মহারাজা নরনারায়ণের ভাই শুরুধ্বজ (চিলারায়) প্রবল পরাক্রমশালী বীর ছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় একের পর এক রাজ্য নরনারায়ণের অধিকৃত হয়। মহারাজা বিশ্বসিংহ থেকে মহারাজা জগদীপেন্দ্রনারায়ণ পর্যন্ত ২২ জন রাজা প্রায় সাড়ে-চারশো বছর কোচবিহার রাজ্যে রাজত্ব করেন। প্রাচীনকালে রাজ্যটি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল যেমন- ‘প্রাগজ্যোতিষ’, ‘লৌহিত্য’, ‘কামরূপ’, ‘কামতা’, ‘কামতাবিহার’ ইত্যাদি। সময়ের সাথে রাজ্যের নাম ও সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ‘কোচবিহার’ নামটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কামরূপের চারটি পীঠের মধ্যে কোচবিহার রত্নপীঠের অন্তর্গত। খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ তাঁর ‘কোচবিহারের ইতিহাস’ গ্রন্থে কোচবিহার নামের উৎপত্তি সম্পর্কে লিখেছেন “কোচ জাতির বাসস্থান বা বিহারক্ষেত্র হইতে কোচবিহার নামের উৎপত্তি; কোচকুমারী এবং মহাদেবের বিহারক্ষেত্র হইতে কোচবিহার নামের উৎপত্তি।”<sup>১</sup>

কোচবিহার রাজবংশে ১৭৮৩ থেকে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ রাজত্ব করেন। তিনি শৈশব অবস্থায় মাত্র তিন বছর বয়সে সিংহাসন লাভ করেন। সেসময় রাজ্যের সিংহাসন দখল নিয়ে চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি চলছিল। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ যেহেতু শিশু অবস্থায় ছিলেন তাই নাজির খগেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনের লোভে রাজমাতা ও শিশু মহারাজকে বন্দিকরে রাখে। এই অবস্থায় পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য রাজমাতা কামতেশ্বরী দেবী ইংরেজ সরকারকে সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখে পাঠান। ইংরেজ সরকারের সহায়তায় রাজমাতা কামতেশ্বরী দেবী রাজ্যের শাসন ফিরে পেলে নাবালক পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে রাজ্যে পরিচালনা করেন। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ সাবালক হয়ে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাজ্যের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে আনার চেষ্টা করেন।

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ছোটবেলা থেকেই বাংলা, সংস্কৃত, পার্সী সহ অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। মুন্সি জয়নাথ ঘোষ তাঁর গৃহশিক্ষক হিসাবে ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সাহিত্য শাস্ত্র, সঙ্গীত চর্চায় বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করেন। তিনি নিজে যেমন সাহিত্য রচনা করেছিলেন তেমনি তাঁর রাজসভায় তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ও অনুগ্রহে বহু গুণী জ্ঞানী মানুষের সমাগম হয়েছিল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মঙ্গলকাব্য, ইতিহাস, দর্শন, শাস্ত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের চর্চা হয়েছিল সেখানে। মহারাজা নিজে শাস্ত্রসংগীত রচনা করেছিলেন। হরেন্দ্রনারায়ণ ধর্মপরায়ণ মানুষ ছিলেন। তিনি নিজ হাতে বিভিন্ন মঠ-মন্দির নির্মাণ করেন যেমন কোচবিহার সাগরদীঘির পশ্চিমে হিরণ্যগর্ভ শিবমন্দির, আনন্দময়ী কালী মন্দির স্থাপন ইত্যাদি এছাড়াও তিনি কাশীতে করুণাময়ী কালী মন্দিরের সূচনা করেন। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ যে গ্রন্থগুলি রচনা করেন সেগুলি হল-

## মৌলিক রচনা:

### ১. রাজপুত্র উপাখ্যান

## ২. উপকথা ৩. গীতাবলী

## অনুবাদ মূলক রচনা:

১. রামায়ণের সুন্দরকাণ্ড
২. মহাভারতের ঐশিকপর্ব, সভাপর্ব, শল্যপর্ব, শান্তিপর্বের প্রেত উপাখ্যান
৩. ক্রিয়াযোগসার (পদ্মপুরাণের অনুবাদ)
৪. স্কন্ধপুরাণের ব্রহ্মোত্তরখণ্ড
৫. বৃহদ্রমপুরাণের মধ্যখণ্ড ও উত্তরখণ্ড

মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক দেব-দেবী মাহাত্ম্যমূলক সাহিত্যের বিপরীতে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার উদ্ভব ঘটে। নর-নারীর প্রেম সেখানে মুখ্য হয়ে উঠল। সামাজিক বিধি নিষেধের পরিবর্তে মানবহৃদয়বৃত্তি, প্রেমসম্ভোগ, অকাজ্জার জয়গান গাইতে লাগল কবিরা। এই ভাবধারায় রচিত হরেন্দ্রনারায়ণের ‘রাজপুত্র উপাখ্যান’ ও ‘উপকথা’ গ্রন্থদুটি। ‘রাজপুত্র উপাখ্যান’, গ্রন্থটিতে চীন দেশের রাজা মদনসুন্দরের স্বপ্নে দেখা সুন্দরী নায়িকার রূপে মোহিত হয়ে রাজমন্ত্রী কর্তৃক সেই নায়িকার খোঁজা করা, মন্ত্রীর বুদ্ধিতে চিত্রকরের মাধ্যমে নায়িকার মনে মদনসুন্দরের প্রতি প্রেমের উদ্ভাবন ও মিলন বর্ণিত হয়েছে। কাহিনির পরবর্তী অংশে রাণীর জন্য চিত্রকরের দ্বারা গৃহের চিত্র নির্মাণ করতে এলে চিত্রকরের কন্যার সহিত রাজকুমারের হেয়ালি গল্পের মাধ্যমে প্রেমের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। রাজার সহিত দুই কন্যার প্রেম গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রন্থটি শুরু করেছেন মঙ্গলাচারণ, শিববন্দনা ও গ্রন্থাকারের পরিচয়ের মাধ্যমে। গ্রন্থের কাহিনি বর্ণনায়, চরিত্র সৃষ্টিতে, সহজ সরল ভাষায় কাহিনীটি বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। মন্ত্রীর চাতুর্যে কন্মোজ রাজকুমারীর মনে রাজার প্রতি প্রেম সৃষ্টির যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা উল্লেখযোগ্য। গল্পের কাহিনিতে বিবাহের আয়োজন থেকে রাজপ্রাসাদের বর্ণনায় বাঙালি ঘরের চিরপরিচিত ছবি আমাদের সামনে ফুটে ওঠে।

‘উপকথা’ গ্রন্থের বিষয় হল কলিঙ্গ দেশের রাজপুত্র আনন্দমোহন ও মন্ত্রীপুত্র আনন্দবিহারী একে অপরের খুব ভালো বন্ধু। দুই বন্ধুর বিয়ে হয় সৈন্ধবদেশের রাজকন্যা রাকামুখীর সঙ্গে আনন্দমোহনের ও মন্ত্রীকন্যা সুশীলার সঙ্গে অনন্দবিহারীর। স্ত্রী রাকামুখীর হাতে রাজপুত্রের মৃত্যু হলেও বন্ধু ও বন্ধুর স্ত্রীর সাহায্যে প্রাণ ফিরে পায়। পরবর্তী অংশে অম্পরার দ্বারা রাজপুত্রের স্বপ্নে স্বপ্নাবতীর রূপদর্শন ও রাজপুত্রের নানা পরীক্ষার মাধ্যমে মিলন বর্ণিত হয়েছে। গল্পের কাহিনি, নায়িকার রূপ বর্ণনায়, ছন্দের ব্যবহারে গ্রন্থ দুটিতে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ দেবদেবীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনি শক্তির সাধনা করতেন ও শাক্তসংগীত রচনা করেছিলেন। প্রাপ্ত পুথিতে তাঁর গানের সংখ্যা ১৭৮ টি। পুথিটি শরচ্চন্দ্র ঘোষালের সম্পাদনায় কোচবিহার সাহিত্যসভা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। যার মধ্যে আগমনী গানের সংখ্যা ১৩ টি আর বাকি সবগুলোই কালী বিষয়ক গান। এই গানগুলি হল- জগজ্জননীর রূপ, মাতৃস্বরূপ, নাম মহিমা, মনোদীক্ষা, ভক্তের আকৃতি, ইত্যাদি। তাঁর আগমনী বিষয়ক পদগুলিতে কন্যা উমার জন্য মায়ের দুশ্চিন্তা, স্বপ্নদর্শন, মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতায় চিরন্তন বাঙালি মা যের চিত্র ফুটে উঠেছে। মা মেনকা ব্যাকুল হৃদয়ে স্বামী হিমালয়কে জানাচ্ছেন-

‘নগেন্দ্র চরণ করিয়া বন্দন মেনকা রাণী

কান্দিয়া কহিছে নয়ন বহিছে পরাণ দহিছে স্মর্যা নন্দিনী

শুন নগেন্দ্র নিবেদি তোমারে

আন যাইয়া আমার উমা মারে, দেখিতে চাই তারে।<sup>২</sup>

তাঁর কালী বিষয়ক পদগুলিতে মায়ের প্রতি খেদ প্রকাশ পেয়েছে। সংসারের সুখ দুঃখ থেকে মুক্তির ব্যাকুলতায় কালী নাম জপ করতে করতে দেহত্যাগ করার বাসনা প্রকাশ করেছেন-

‘বল সুখে তারা মুখে জপ হৃদে কালী নাম।

এহি সে পরম তপ অন্য তাপে কিবা কাম।

এদিন কি এভাবে যাবে এ তনু পঞ্চতু পাবে।

এ বিভাব কোথা রবে মন যাইতে হবে যমধাম।<sup>৩</sup>

ভক্তের আকৃতি পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ কমলাকান্তের সমসাময়িক ছিলেন। হরেন্দ্রনারায়ণ ভক্তের আকৃতি পর্যায়ের ৬৬ টি পদ রচনা করেছেন। কবির আবেগ, অনুভূতি, ব্যক্তিগত জীবনে ভোগ ঐশ্বর্যের অন্তরালে হতাশা সবই শ্যামা মায়ের কাছে খেদ করে জানিয়েছেন। হরেন্দ্রনারায়ণের পদগুলিতে শব্দালংকার, উপমা, রূপকের ব্যবহারে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের কবিত্ব প্রতিভার উৎকৃষ্ট নিদর্শন তাঁর রচিত শাক্ত পদগুলি।

হরেন্দ্রনারায়ণের পুরাণের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। সংস্কৃত পুরাণকে সর্বজন বোধগম্য করে তোলার জন্য রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের অনুবাদ করতেন। তিনি রামায়ণের সুন্দরকাণ্ড অনুবাদ করেন। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের এই গ্রন্থটি শরচ্চন্দ্র ঘোষালের সম্পাদনায় কোচবিহার সাহিত্যসভা থেকে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলত বাঙ্মিকি রামায়ণকে অনুসরণ করলেও কিছু ক্ষেত্রে কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আকারে কৃত্তিবাসের তুলনায় হরেন্দ্রনারায়ণের সুন্দরকাণ্ড বৃহৎ। গ্রন্থের শুরু দিকের তিনি কোচবিহার রাজবংশের পূর্বপুরুষ ও নিজের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে-

‘কামতা বনিতা পতি বিশ্বসিংহ খিতিপতি

শিবশুত হীরাগর্ভে জাত।

অরি-করি-বিদারন ঘোর রন-পঞ্চগনন

জশ জার জগত বিক্ষাত।।

সে অংশে মম জাত শ্রীহরেন্দ্র নামে ক্ষাত

দুরিত পুরিত জার মতি।...’<sup>৪</sup>

হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থে বিভীষণ রাবণের কাছ থেকে কুবের ও মহাদেবের নিকট গমন করলে তাঁদের উপদেশ অনুযায়ী রামের স্মরণ নেওয়ার ঘটনা বাঙ্মিকি রামায়ণে পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাসের রামায়ণে আমরা এই ঘটনার উল্লেখ পাই। এছাড়াও কিছু অংশে কৃত্তিবাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মূল রামায়ণে থেকে সরে এসে কাহিনীতে নতুনত্ব সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ মহাভারতের চারটি পর্বের অনুবাদ করেন এই অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মহাভারতকে অনুসরণ করেছেন। তবে আক্ষরিক অনুবাদের পরিবর্তে সারানুবাদকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বৃহদ্রম পুরাণের মধ্যখণ্ড ও উত্তরখণ্ড এবং পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসার অংশটির আনুবাদ করেন। তিনি মূলত সংস্কৃত থেকেই অনুবাদ করেছেন। কোচবিহার রাজবংশের দীর্ঘ ইতিহাসে আর কোন মহারাজা এত বিপুল সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না।

কোচবিহার রাজ্যে সেসময় মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের রাজসভা ছিল সাহিত্য চর্চার কেন্দ্রভূমি। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মঙ্গলকাব্য, ইতিহাস, দর্শন, শাস্ত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের চর্চা হয়েছিল সেখানে। বাংলার আর কোনো রাজসভায় এত বিপুল পরিমাণ সাহিত্যচর্চা দেখা যায় না। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে তাঁর রাজসভার কবিদের দিয়ে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের অনুবাদ করিয়ে নিয়েছিলেন। হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে যে রচয়িতাদের রচনার সন্ধান পাওয়া যায় তা মৌলিক ও অনুবাদ সাহিত্য এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। মৌলিক গ্রন্থগুলি হল- রাম নারায়ণের ‘নলদময়ন্তী উপাখ্যান’, জগৎদুর্লভ বিশ্বাসের ‘সঙ্গীত শঙ্কর’, দ্বিজ ভূতনাথের ‘ষড়ঋতু বর্ণনা’, দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদের ‘গীতাবলী’, নরসিংহদাসের ‘হংসদূত’, দ্বিজ ভগীরথের ‘তুলসীমাহাত্ম্য’, গোপালদাস ‘কামশাস্ত্র’, জয়নাথ ঘোষের ‘রাজোপাখ্যান’, রাখাক্ষ দাস বৈরাগীর ‘গোসানীমঙ্গল’।

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের অনুপ্রেরণায় মুন্সী জয়নাথ ঘোষ ‘রাজোপাখ্যান’ গ্রন্থটি রচনা করেন। গদ্যে রচিত গ্রন্থটিতে কোচবিহার রাজবংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। গ্রন্থটিকে বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার প্রথম গ্রন্থ বলা যেতে পারে। গ্রন্থটিকে তিনটি খণ্ডে বিন্যস্ত করে একমুদ্রিত অধ্যায়ে সমাপ্ত করেছেন। প্রথম খণ্ডের নাম দিয়েছেন ‘দেবখণ্ড’। এই খণ্ডে হীরাদেবীর জন্ম থেকে মহারাজা বিশ্বসিংহের রাজ্য শাসন পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ‘নরখণ্ডে’ নরনারায়ণ থেকে ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ পর্যন্ত কোচবিহারের রাজাদের শাসনকাল বর্ণনা করেছেন। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সময়ে যেহেতু জয়নাথ ঘোষ বর্তমান ছিলেন তাই ‘প্রত্যক্ষ খণ্ড’ নাম দিয়ে হরেন্দ্রনারায়ণের ব্যক্তিজীবন, সাহিত্যকর্ম, রাজত্বকাল থেকে শিবেন্দ্রনারায়ণ পর্যন্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটি শুধু ইতিহাস চর্চায় নয় বাংলা গদ্যচর্চায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র রাজসভার মধ্যেই নয় রাজসভার বাইরেও বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। রাজসভার বাইরে রাখাক্ষ দাসবৈরাগী ‘গোসানীমঙ্গল’ কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি কোচবিহারের অন্তর্গত গোসানীমারী অঞ্চলে রাজা কান্তেশ্বরের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই কাব্যে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, রাজনৈতিক অবস্থান ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়াও অন্যান্য যেসকল মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেগুলিতে রচয়িতাদের কৃতিত্বের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

অনুবাদমূলক গ্রন্থের মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও পুরাণের অনুবাদ পাওয়া যায়। কোচবিহার রাজসভায় রামায়ণের চর্চা শুরু হয় ষোড়শ শতকে। এরপর প্রায় দুশ বছর রামায়ণের চর্চা দেখতে পাই না। উনিশ শতক থেকে পুনরায় চর্চা শুরু হয়। রামায়ণের আদিকাণ্ড বাদে বাকি ৬টি কাণ্ডের অনুবাদ পাওয়া যায়। রামায়ণের অনুবাদ করেন দেবীনন্দন ‘কিঙ্কিন্যাকাণ্ড’, সারদানন্দ ‘উত্তরকাণ্ড’, শতানন্দ ‘উত্তরকাণ্ড’, দ্বিজ ব্রজসুন্দর ‘লঙ্কাকাণ্ড’, দ্বিজ রঘুরাম ‘উত্তরকাণ্ড’, ‘অযোধ্যাকাণ্ড’, ‘কিঙ্কিন্যাকাণ্ড’, শ্রীনাথ দ্বিজ ‘কিঙ্কিন্যাকাণ্ড’, রুদ্ররামশর্মা ‘আরণ্যাকাণ্ড’। সারানুবাদ ও ভাবানুবাদের ক্ষেত্রে রচয়িতারা মূলের প্রতি জোর দিয়েছেন। কাহিনীর নিসর্গ বর্ণনায় কবিরাজ কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়েছেন।

রামায়ণের তুলনায় সে সময়ে বিপুল পরিমাণ মহাভারত ও পুরাণের অনুবাদ হয়। মহাভারতের মোট ১৩ টি পর্বের অনুবাদ পাওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারত উভয় ক্ষেত্রেই একই কবি যেমন বিভিন্ন পর্বের অনুবাদ করেছেন তেমনি একই পর্ব অনুবাদে একাধিক কবি যুক্ত ছিলেন। কোনো একজন অনুবাদকের দ্বারা সম্পূর্ণ পর্ব অনুবাদ করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। মহাভারতের যে অনুবাদগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হল- দ্বিজ মনোহর ‘বনপর্ব’, দ্বিজ বলরাম ‘বনপর্ব’, দ্বিজ রুদ্রদেব ‘আদিপর্ব’, পণ্ডিত মাধবানন্দ ‘বনপর্ব’, সারদানন্দ

‘কাশীখণ্ড’, সতানন্দ ‘কাশীখণ্ড’, দ্বিজ ব্রজসুন্দর ‘সভাপর্ব’, দ্বিজ রঘুরাম ‘বনপর্ব’, ‘ভীষ্মপর্ব’, ‘সভাপর্ব’, ‘শান্তিপর্ব’, দ্বিজ লক্ষ্মীরাম ‘কর্ণপর্ব’, ‘শল্যপর্ব’, দ্বিজ বৈদ্যনাথ ‘বনপর্ব’, ‘মৌষলপর্ব’, ‘শান্তিপর্ব’, দ্বিজ মহীনাথ ‘বনপর্ব’, ‘অশ্বমেধপর্ব’, ‘প্রস্থানিকপর্ব’, মাধবচন্দ্র শর্মা ‘স্বর্গারোহণপর্ব’, দ্বিজ রামনন্দন ‘গদাপর্ব’, ‘শল্যপর্ব’, জয়দেব দ্বিজ ‘সভাপর্ব’। কোচবিহার রাজসভায় যে পরিমাণ মহাভারতে অনুবাদ হয়েছিল আর কোনো রাজসভায় এত বিপুল পরিমাণ মহাভারতের অনুবাদ দেখা যায় না।

এছাড়াও ভাগবত ও পুরাণের যে অনুবাদ পাওয়া যায় সেগুলি হল- দ্বিজ জগন্নাথ ‘ভাগবত ষষ্ঠ স্কন্ধ’, সারদানন্দ ‘ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ’, সতানন্দ ‘ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ’, দ্বিজ ব্রজসুন্দর ‘নৃসিংহপুরাণ’, ‘কালিকাপুরাণ’, দ্বিজ রঘুরাম ‘ক্রিয়াযোগসার’, দ্বিজ বৈদ্যনাথ ‘কালিকাপুরাণ’, ‘শিবপুরাণ’, ‘পদ্মপুরাণ’, ‘ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড’, দ্বিজ রামনন্দন ‘কালিকাপুরাণ’, ‘ধর্মপুরাণ’, ‘নৃসিংহপুরাণ’, দ্বিজ কীর্ত্তিচন্দ্র ‘কালিকাপুরাণ’, দ্বিজ রামচন্দ্র ‘কালিকাপুরাণ’ রিপুঞ্জয় দাস ‘ক্রিয়াযোগসার’ প্রভৃতি।

মধ্যযুগের শেষ ও আধুনিক যুগের সূচনাপর্বে দাড়িয়ে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের উদ্যোগে ও উৎসাহে কোচবিহার রাজসভায় যে বিপুল পরিমাণ সাহিত্যের চর্চা হয়েছিল তাঁর অবদান বাংলা সাহিত্যে অপরিসীম।

### তথ্যসূত্র:

- ১। আহমদ, খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা, ‘কোচবিহারের ইতিহাস’ (প্রথম খণ্ড), মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, ২০১৯, পৃ-৪।
- ২। পাল, ড. নৃপেন্দ্রনাথ (সম্পা.), ‘মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও শিবেন্দ্রনারায়ণের ভক্তিগীতি-সংগ্রহ’, অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ-৫৭।
- ৩। পাল, ড. নৃপেন্দ্রনাথ (সম্পা.), ‘মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও শিবেন্দ্রনারায়ণের ভক্তিগীতি-সংগ্রহ’, অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ-৮১।
- ৪। শরচ্চন্দ্র ঘোষাল (সম্পা.), ‘কোচবিহার সাহিত্যসভা গ্রন্থাবলী’, ‘মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী’ (পঞ্চম খণ্ড), ‘সুন্দরকান্ড রামায়ণ’, কোচবিহার সাহিত্যসভা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃ-২

### গ্রন্থপঞ্জি:

- ১। ঘোষাল শরচ্চন্দ্র (সম্পা.), ‘কোচবিহার সাহিত্যসভা গ্রন্থাবলী সংখ্যা-১’, ‘মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী’ (প্রথম খণ্ড), গীতাবলী, কোচবিহার সাহিত্যসভা, প্রথম সংস্করণ, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ।
- ২। ঘোষাল শরচ্চন্দ্র (সম্পা.), ‘কোচবিহার সাহিত্যসভা গ্রন্থাবলী’ সংখ্যা-২, ‘মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী’ (দ্বিতীয় খণ্ড), ক্রিয়াযোগসার, কোচবিহার সাহিত্যসভা, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ।



- ৩। ঘোষাল শরচ্চন্দ্র (সম্পা.), ‘কোচবিহার সাহিত্যসভা গ্রন্থাবলী’-৪, ‘মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী’ (তৃতীয় খণ্ড), উপকথা, কোচবিহার সাহিত্যসভা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।
- ৪। ঘোষাল শরচ্চন্দ্র (সম্পা.), ‘কোচবিহার সাহিত্যসভা গ্রন্থাবলী’ সংখ্যা-৫, ‘মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী’ (চতুর্থ খণ্ড), উপকথা, কোচবিহার সাহিত্যসভা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।
- ৫। ঘোষাল শরচ্চন্দ্র (সম্পা.), ‘কোচবিহার সাহিত্যসভা গ্রন্থাবলী’, ‘মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী’ (পঞ্চম খণ্ড), সুন্দরকাণ্ড রামায়ণ, কোচবিহার সাহিত্যসভা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ।
- ৬। দাস বৈরাগী রাধাকৃষ্ণ, ‘গোসানী মঙ্গল’ (শ্রীহরিশ্চন্দ্র পাল সম্পাদিত), ত্রিবৃত্ত প্রকাশন, ত্রিবৃত্ত সরণি, কোচবিহার, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ।
- ৮। ঘোষ মুন্সী জয়নাথ, ‘রাজোপাখ্যান’ (বিশ্বনাথ দাস সম্পাদিত), দি সী বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৪২৮ (২০২১ খ্রিঃ)।

#### সহায়ক গ্রন্থ:

- ১। বন্দ্যোপাধ্যায় ভগবতীচরণ, ‘কোচবিহারের ইতিহাস’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, নভেম্বর ২০২১।
- ২। রায় ড. শচীন্দ্র নাথ, ‘সাহিত্য সাধনায় রাজন্য শাসিত কোচবিহার’, এন.এল পাবলিশার্স শিবমন্দির, শিলিগুড়ি, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।
- ৩। রায় স্বপনকুমার, ‘কোচবিহার রাজদরবারের সাহিত্যচর্চা’, বুকস ওয়ে, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১।
- ৪। রায় দীপক কুমার (সম্পা.), ‘মধ্যযুগের সাহিত্য কোচবিহার রাজদরবার’, ছায়া পাবলিকেশন, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০১৫।
- ৫। দেব রণজিৎ, ‘সাহিত্যের ইতিহাসে কোচ-রাজদরবার’, তুহিনা প্রকাশনী, কলকাতা-০৬, অক্টোবর ২০২২।
- ৬। পাল ড. নৃপেন্দ্রনাথ (সম্পা.), বিষয় কোচবিহার, অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, বৈশাখ ১৪০১ বঙ্গাব্দ।
- ৭। সেন সুকুমার, ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ (তৃতীয় খণ্ড), আনন্দ, কলকাতা-০৯, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।
- ৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত’ (ষষ্ঠ খণ্ড), মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, ২০১০-২০১১।
- ৯। রায় দীপক কুমার (সম্পা.), ‘কোচবিহার রাজদরবারের পুঁথি পরিচয়’, ছায়া পাবলিকেশন, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৪২১ বঙ্গাব্দ।
- ১০। পাল ড. নৃপেন্দ্রনাথ (অনুবাদ), ‘রাজ্য কোচবিহারের রাজকাহিনী’ (দ্বিতীয় খণ্ড) লেখক: হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ ১৪২০ বঙ্গাব্দ।
- ১২। দাস বিশ্বনাথ, ‘কোচবিহারের পুরাকীর্তি’, দি সী বুক এজেন্সী, কলকাতা-০৭, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০২২।



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal  
ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 819-826

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.073



## শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চায় ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরীকারা

দেবরূপা সেন, সহকারী আধ্যাপক, বিবোধানন্দ সরস্বতী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, বারাসাত, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 15.01.2025; Accepted: 24.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*In the 19th century, when the dawn of the Renaissance was gradually becoming brighter in the inner palace of the JorasankoThakurbari, not only men but also women participated in the new changes in society and culture. They simultaneously managed the inner palace by following traditional customs and developed their talents and practiced art, culture and literature. Not only that, they also participated equally in various social and political issues. And later, when they sat down to write their memoirs about this family history and the scope of cultural practice, the writing captured a fascinating analysis of the times. There, they painted a unique picture of not only themselves but also the women's awakening of the entire society.*

**Keywords:** Thakurbari, Renaissance, Equal Rights, Women's Education, Women's Liberation, Paradise, Holidays, Women's Awards.

বিশ্ব আজ একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও এগিয়ে চলতে শিখিয়েছে। কিন্তু চিত্রটা এমন ছিল না। শতাব্দীর পাতা উল্টিয়ে যদি পেছনের দিকে চোখ রাখা যায় তবে দেখা যাবে অতীতে নারী ছিল অবহেলিতা শোষিতা। অতীত সমাজ নারীকে দিয়েছিল সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ নানান সামাজিক বাধা-নিষেধের বেড়া জাল। সময়ের সাথে সাথে সমাজের বিকাশ ঘটেছে তাই আজ নারীরা সেই শৃঙ্খলের বন্ধন চূর্ণ করে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। পুরোপুরি না হলেও অনেকটা বুঝে নিতে শিখেছে নিজেদের অধিকার। সমাজের সাথে পাল্লা দিয়ে তারা নিজেকে অবহেলা করা ছেড়ে দিয়েছে। তাই নিজেকে বিকশিত করার ক্ষেত্রেও তাদের প্রচেষ্টার অন্ত ছিলনা।

পুরুষের 'ছায়ানুগতা' জীবন থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে নানান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সমাজ জীবনে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে। নারীরা কেউই যদিও বা নারী মুক্তির আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেনি। তবুও আন্দোলন হয়েছিল আর তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল নারী জীবনে। তবে পুরনো সংস্থান ছেড়ে নতুন সংস্কার গ্রহণ করা সেদিন নারীর পক্ষে খুব সহজ হয়নি। দ্বিধা দ্বন্দ্বের আঘাত খেতে খেতে তার বিকাশ ঘটেছে। তবে একথাও ঠিক ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাদের প্রেরণা জুগিয়েছিল নবজাগরণ। ফলে

পুরুষের ছায়ায়, পর্দার আড়ালে নিজেকে গুটিয়ে রাখা নারী সমাজকে এ শতাব্দী কাছে টেনে নিল। বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে নানান কুসংস্কারও অশিক্ষার অন্ধকারে আবদ্ধ থাকা নারীকে আলোর পথ দেখালেন রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগরের মতো মনিষীরা।

নারীদের সমাজ সংস্কারের বিধি-নিষেধের বেড়া জাল থেকে মুক্ত করার জন্য তারা শিক্ষার আলোয় নারীকে আলোকিত করে তুলতে প্রয়াসী হলেন। নারী শিক্ষার সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর অর্ধদশক পরে সূচনা পর্ব থেকে নারীগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই শিক্ষাকে গ্রহণ করেছেন। তাই অন্তঃপুর বাসিনীরা কলম তুলে নিজেদের কথা নিজেরাই বলতে পেরেছেন।

তবে এই অবস্থার পরিবর্তনও এত সহজে আসেনি। কারণ সমাজ সংস্করণের পাশাপাশি একদল রক্ষণশীল মানুষও সমাজে ছিল। যারা স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারকে সহজে মেনে নিতে পারেনি। তখন বহু যুগে উন্মোচন করে নারীরা স্বরবে বলে -

“পুরুষগণ কেন আমাদেরকে এরূপ নিকৃষ্টাবস্থায় রাখিয়েছেন? আমরা কি পরম পিতার সন্তান নই? পুরুষেরা নানারূপ বিদ্যাভাস করিয়া পরমজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ইহকালেই পরমাত্মার রসস্বাদনে অনুপম সুখানুভব করিতে পারেন। আমরা কি উক্ত সুখের কনা মাত্র প্রাপ্ত হইবো না? - আর কতদিন আমরা এই শৃঙ্খলরূপ গৃহরুদ্ধা থাকিব?”<sup>১</sup>

অর্থাৎ এই সময়পর্ব থেকেই মেয়েরাও অন্যান্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদিনী হল। পরিবার জীবনে তো বটেই সমাজ জীবনেও তারা পুরুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন। অবশ্যই এর জন্য তাদের মহৎ স্বামীদের অবদানও কম ছিল না। এদিক থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন ঐতিহ্যশালী ঠাকুরপরিবার।

ঠাকুরবাড়ি ছিল তৎকালীন সময়ের থেকে ঢের এগিয়ে থাকা একটি পরিবার। পুরুষদের সাথে সমান পদক্ষেপ ফেলে এ বাড়ির মেয়ে বৌরাও বাড়ির সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনকে আলোকিত করে তুলেছিল। যার ফলে শুধু সাহিত্য সংস্কৃতি নয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছিল আধুনিকতার আলো। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি সমগ্র বাঙালি জাতিকে তথা নারীজাতিকে উজ্জীবিত-উদ্দীপিত করে তুলেছিল। গতানুগতিকতার বেড়া জাল ভেঙে তারা নিজেদের সাথে সমাজকে উদার মুক্ত হতে দীক্ষা দিয়েছিল। পরিবার জীবনে শিক্ষার মাধ্যমে মুক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ি অন্তঃচারিণীরা। সেই শিক্ষা গ্রহণের ফলেই তারা সাহিত্য- সংস্কৃতি- শিল্প সর্বক্ষেত্রে নিজেদের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

সেই স্বতন্ত্রতাকে কীভাবে তারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন সে বিষয়েই আমরা এখন বিশদে আলোচনা করব-

ঊনবিংশ শতাব্দীর সোনালী সফল পর্বে ঠাকুরবাড়ি মেয়েরা আবছা পর্দার আড়ালে অস্পষ্ট হয়ে না থেকে নবযুগের ভিত গড়বার কাজে হাত লাগিয়ে ছিলেন। কখনও প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনও পরোক্ষ। পুরুষের প্রতিভার প্রদীপে তেল সলতে যোগানোর দায়িত্ব নিয়ে। সমাজের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা সে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে পুরুষের পাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস অর্জন করেছিল তা কিন্তু কম গৌরবের কথা নয়। স্মৃতি- বিস্মৃতির অন্তরালে লুকিয়ে থাকা হারিয়ে যাওয়া সেই মেয়েদের নিয়েই এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করে দেখা যায় হিন্দুসমাজের বাধা নিষেধ ও তার কড়াকড়ি, ঠাকুরবাড়ি মেয়েদের বিশেষ অসুবিধায় ফেলতে পারেনি। ঠাকুরবাড়ি তৎকালীন ব্রাহ্মণদের কাছে ছিল ‘পিরালী’। খানিকটা একঘরের মতো স্বতন্ত্র। তারপরে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করার পর শাসনের গিট আপনি শিথিল হয়ে এসেছিল।

সাহিত্য সঙ্গীত বা শিল্পের দিক থেকে নতুন কিছু পাবার আগে প্রকৃতপক্ষে বাঙালি মেয়েরা ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের কাছে পেল আত্মবিশ্বাসের শক্তি আর এগিয়ে যাওয়ার একটি প্রশস্তপথ। তাই তাদের কাছে ময়দানে ঘোড়া ছোটানো, কালাপানি পেরিয়ে বিলেতে যাওয়া, লাটভবনে নিমন্ত্রণ রাখা, আমেরিকায় বক্তৃতা দেওয়া, স্কুলে পড়া, ছবি আঁকা, গান গাওয়া, অভিনয় করা, বই লেখা, আত্মজীবনী প্রকাশ, স্বদেশ সেবা সমিতি প্রতিষ্ঠা সবই অর্থবহ হয়ে উঠলো। সমাজের ধীর-স্থীর বুকে নানা আকারে আন্দোলন তুলে বাঙালি মেয়েদের লজ্জা ভীর্ণ মনে সাহস জোগাবার জন্যও এর দরকার ছিল। এরজন্য ঠাকুরবাড়ি মেয়েদের ভূমিকা কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এভাবে তারা নিজেদের সাথে সাথে নারী সমাজের আত্মবিকাশের পথকে প্রশস্ত করে। তাই এই কথা বলা যায়- “কিশোর রবীন্দ্রনাথের জন্য বাড়ির মধ্যে একটা সাহিত্যিক আবহাওয়া গড়ে তুলতে তাঁর দিদি বৌদিদের ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। আবার পরিণত বয়সে নৃত্য-গীত-অভিনয় সংক্রান্ত নিজস্ব ভাবনাকে রূপায়িত করবার সময়েও তিনি বারবার ডাক দিয়েছেন বাড়ির মেয়েদের।”<sup>২</sup>

তবে এই দিনগুলি সমাজের সর্বত্র সমানভাবে আসেনি। কারণ একটিমাত্র বাড়ির মেয়েদের পক্ষে সার্বিক জাগরণ ঘটানো সম্ভব হয়ে উঠছিল না। ধীরে ধীরে সলতে পাকাবার আয়োজন চলছিল। তারপর ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা এনে দিলেন নবজাগরণের প্রদীপ শিখাটিকে। আর তা এনে দিলেন শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে। অবশ্য এর জন্য ঠাকুরবাড়ির কর্তা ব্যক্তিদের অবদানও অনস্বীকার্য। কারণ তাঁরা খুবই উদার মনস্ক ছিলেন। মেয়ে-বৌদের লেখাপড়া শেখায় তাঁরা কোনও বাধা তো দেনইনি, উপরন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। দ্বারকানাথের পিতার আমল থেকেই তাই এবাড়ির মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেছিলেন বৈষ্ণবীর কাছে। যার ফলস্বরূপ এবাড়ির পুরুষদের মত মেয়েরাও স্মরণীয় হয়ে রইলেন চিরকালের মতো।

দ্বারকানাথের পিতার আমল থেকে যে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন শুরু হয়েছিল তার ধারা বয়ে চলল প্রজন্মের পর প্রজন্মের হাত ধরে। দ্বারকানাথের স্ত্রী ছিলেন দিগম্বরী। রূপে-গুণে, গৃহকর্মে, শিল্পকর্মে সর্বদিক দিয়ে তিনি ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিতা। শাশুড়ি অলকাসুন্দরী দেবী পর্যন্ত তাঁকে সমীহ করে চলতেন তাঁর দৃঢ় ব্যক্তিত্বের জন্য। আর এরকম দৃঢ় ব্যক্তিত্বময়ী পূর্বসূরীর প্রভাব তাঁর উত্তরসূরীদের জীবনে থাকবে একথা বলাই বাহুল্য।

দিগম্বরীর দুই পুত্রবধু তাই অনিবার্যভাবে লেখাপড়া শিখেছিলেন। তাঁর পুত্রবধু সারদা ও যোগমায়া। মাইনে করে বৈষ্ণবী এসে তাদের ‘শিশু বোধক’, ‘চাণক্য-শ্লোক’, ‘রামায়ণ’, ‘মহাভারত’ পড়াতেন। আর কলাপাতায় চিঠি মকস করানো শেখাতেন। সারদা, যোগমায়া ছাড়াও বাড়ির সব মেয়েই লেখাপড়া শিখতেন। কারণ তৎকালীন সমাজ মেয়েদের মধ্যে যে ভীতি ঢুকিয়ে দিয়েছিল - যে বই পড়লে বিধবা হবে, এই ভীতিকে কোনও দিন প্রশয় দেয়নি ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরীকারা।

আরও জানা যায়- “সারদা অবসর সময়ে প্রায়ই একটা না একটা বই খুলে বসতেন। সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত পড়ে শোনাবার জন্য মাঝে মাঝে ডাক পড়তো ছেলেদের। হাতের কাছে অন্য কোনও বই না থাকলে অভিধানখানাই খুলে বসতেন। যোগমায়াও নানা রকম বই পড়তেন। মালিনী আসত বটতলা থেকে ছাপা বইয়ের পসরা নিয়ে। সেখান থেকে বেছে বেছে বই কিনতেন মেয়েরা। ‘নরনারী’, ‘লায়লা-মজনু’, ‘হাতিমতাই’, ‘আরব্য-রজনী’, ‘লাম্বস টেল’, ‘পাল ও বর্জিনিয়া’ - সবই জোগাড় করেছিলেন যোগমায়া। তাঁর সব লেখা কাব্যোপন্যাস ‘কামিনীকুমার’ও থাকত মালিনীর পসরায়। আর থাকতো ‘মানভঞ্জন’, ‘প্রভাস-মিলন’, ‘কোকিল দূত’, ‘অন্নদামঙ্গল’, ‘রতিবিলাপ’, ‘বঙ্গহরণ’, ‘গীতগোবিন্দ’, ‘বাসবদত্তার’ মতো কিছু বই। যোগমায়া বেশ ভালোই বাংলা জানতেন। তাই সত্যেন্দ্রনাথ বলতেন যোগমায়া ছেলেবেলায় তাদের শিক্ষায়ত্রী ছিলেন।”<sup>৩</sup>

এরপর মহির্ষিকন্যা সৌদামিনীর কথায় আসা যাক। বাংলাদেশের স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে তার একটি বিশেষ অবদান আছে। কারণ দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে পাঁচ বছর বয়সেই পেশোয়াজ পরিণয়ে স্কুলে পাঠাতেন। এই কাজটি তিনি করেছিলেন একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়, অনেক বাঙালি পিতা তাঁর দেখাদেখি মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে শুরু করলেন। সৌদামিনী সুশিক্ষিত হয়ে দু-একটি ব্রাহ্ম সংগীত ও ‘পিতৃস্মৃতি’ গ্রন্থটি লিখেছিলেন।

সৌদামিনীর বোন চতুর্থ মহির্ষিকন্যা স্বর্ণকুমারী বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক লেখিকা। তাঁর সাফল্য ও কৃতিত্ব সবার থেকে বেশি। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মহিলা উপন্যাসিকও হন তিনি ‘দ্বীপ নির্বাণ’ উপন্যাসটি লিখে। সবথেকে বড় কৃতিত্বের কথা তিনি ‘কাহাকে’ উপন্যাসটি অনুবাদ করেন ‘এ্যন আনফিনিষ্টসঙ’ নামে। এছাড়া ‘ভারতী’ পত্রিকার সম্পাদনাও করেন দীর্ঘদিন ধরে। তার বৈজ্ঞানিক বিষয়ক প্রবন্ধ ‘পৃথিবী’ যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করে। ছোটদের জন্য তিনি পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেন।

এছাড়া দুঃস্থ আশ্রয়হীন মেয়েরা লেখাপড়া শিখে যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এই উদ্দেশ্যে তিনি ‘সখিসমিতি’ প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বপ্রথম মহিলা হিসেবে ‘জগত্তারিনী’ স্বর্ণপদক পান তিনি। এত বিপুলভাবে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে উত্তরণ করেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী।

স্বর্ণকুমারী সাফল্য ও কৃতিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে আর একজন মহিলা। তিনি ঠাকুর পরিবারের মেজ বউ জ্ঞানদানন্দিনী। ঠাকুরবাড়ি শিক্ষা দীক্ষা আধুনিক চিন্তা চেতনা যার সাহায্যে প্রবর্তিত হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, জ্ঞানদানন্দিনীই সবার আগে সব রকম বাধা-নিষেধের বেড়া টপকে বৃহত্তম জগতে এসে মেয়েদের মুক্তির পথ খুলে দিয়েছেন। তারপরে আর বিধিনিষেধের পর্দা আঁক ঘোচাতে মেয়েদের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। দেবেন্দ্রনাথের মেজ বৌমা অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী জাগরণের অন্যতম নেত্রী। ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান অফিসারের স্ত্রী তিনি। তাই সত্যেন্দ্রনাথ অন্তঃপুরের বাঁধন ভেঙ্গে স্ত্রীকে অন্তঃপুরের অন্ধকার থেকে নিজের পাশে স্থান দেবেন এটাই স্বাভাবিক। তাই তিনি নিজেই নববিবাহিতা আট বছরে স্ত্রীকে অর্থাৎ তাঁর আদরের ‘জ্ঞেণুমনিকে’ গড়ে নেওয়ার সাধনে মত্ত হলেন।

তাঁর পড়াশোনা শুরু হলো সেজ দেওর হেমেন্দ্রনাথের কাছে। আন্তে আন্তে ‘মেঘনাদবধ’ কাব্য পর্যন্ত পড়া এগোলো। অন্যদিকে স্বামী ‘জ্ঞেণুমণির’ অন্তরের অজ্ঞতা নিরসনের কাজে ব্যস্ত হয়ে রইলেন।

দেবেন্দ্রনাথ বৌমার শিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ সমাজের নবীন আচার্য অযোধ্যানাথ পাকড়াশীকে গৃহ শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেন। এই প্রথম একজন অনাত্মীয় পুরুষ এসে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে বাড়ির মেয়ে-বৌদের স্কুলপাঠ্য বইগুলি যত্ন করে পড়াতে শুরু করলেন।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লেখেন -

“বিয়ের পর আমার সেজো দেবর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইচ্ছে করে আমাদের পড়াতে। তাঁর শেখাবার দিকে খুব ঝোঁক ছিল। নিজের সব মেয়েদের ও লেখাপড়া শিখিয়ে ছিলেন। আমরা মাথায় কাপড় দিয়ে তাঁর কাছে বসতুম আর এক একবার ধমক দিলে চমকে উঠতুম। আমি বিয়ের আগেই লিখতে পড়তে পারতুম আর আমার হাতের অক্ষরের খুব প্রশংসা ছিল। আমাদের গুরুঠাকুর বাবামশায়কে বলেছিলে যে বিদ্যা দানের উপর দান নেই। তাই তিনি একটা পাঠশালা খুলে ছিলেন। সেখানে মুসলমান বড়বড় ছেলেরা পর্যন্ত যেত। কেবল আমি একলা ছোট মেয়ে ছিলাম। প্রথমে তালপাতার উপর বড় বড় অক্ষর শেখাতো। তারপর আট ভাঁজের কাগজ তারপর ষোলভাঁজের কাগজে লিখতে পারলে শেষ হত। আমার যা বাংলা বিদ্যা তা হয়েছিল সেজঠাকুরপোর কাছে পড়ে।”<sup>৪</sup>

সত্যেন্দ্রনাথ এসময় সবথেকে দুঃসাহসের কাজটি করে ফেললেন। ঠাকুর পরিবারের সন্তান হয় ঠাকুরবাড়ির বউকে অন্দরমহল থেকে বাইরে নিজের কর্মস্থলে নিয়ে গিয়ে ছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী স্বামীর সাথে স্বামীর কর্মস্থল মুম্বাই গিয়ে ঠাকুরবাড়ির চিরপরিচিত আবহাওয়ার ছন্দপতন ঘটিয়ে দিলেন।

তবে এত সহজে একদিনে এটি সংঘটিত হয়নি। এই প্রগতিশীলতার দাম তাকে দিতে হয়েছিল। মহর্ষিপত্নীর সাথে তাঁর সম্পর্ক তিক্ত হয় এবং তিনি জ্ঞানদানন্দিনীর সাথে কথা বলা বন্ধ করেন।

তবে তাও তিনি স্বামীর সঙ্গে স্বামীর কর্মস্থলে গিয়ে গৃহবিপ্লব ঘটান। এরপর স্বামীর সাথে তিনি বহুস্থানে যান, ইংল্যান্ড অন্দি গিয়েছিলেন। অভিনয়, সংগীত, সাহিত্যচর্চায় জ্ঞানদানন্দিনী সর্বদা স্বামীর উৎসাহ পান। ছোটদের জন্য ‘বালক’ পত্রিকা প্রকাশ করেন তিনি। ‘ভারতী’ পত্রিকার সাথেও যুক্ত ছিলেন তিনি।

তাঁর স্মৃতিকথা ‘পুরাতনী’ বৃদ্ধ বয়সে মুখে মুখে তার সুযোগ্য কন্যা ইন্দিরাদেবীকে বলে। সে অনুলিখনের কাজ করে। এই ‘পুরাতনী’তেই জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্রগুলিও পাওয়া যায়।

তবে জ্ঞানদানন্দিনী যে শুধু মেয়েদের পথের কাঁটা ঘুচিয়ে ছিলেন তা নয়। পুরুষের মনের বাধাও অনেকটা দূর করে। যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। যিনি প্রথমে রক্ষণশীল ছিলেন। পরে মেজদা ও মেজ বৌঠানের সাহচর্যে তিনি নব্যপন্থী হয়ে স্ত্রী কাদম্বরীকে ও সে পথে চালনা করে।

ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে যা কিছু দান। তার সাথে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ে কাদম্বরী অবদান। অথচ বাজার সরকারের মেয়ে বলে খানিকটা হলেও অবজ্ঞা তার প্রাপ্য হয়েছিল। তাই কোনও কিছুতেই তিনি অংশ গ্রহণ করতেন না। শুধু অপরের প্রেরণার প্রদীপকে উজ্জীবিত করা ছিল তার জীবনের ব্রত। কারণ রোমান্টিক সৌন্দর্যবোধ কাদম্বরীর চিরকালই ছিল। শুধু ঠাকুরবাড়িতে এসে অনুকূল পরিবেশে পেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল তার গভীর চেতনার মানসলোক। তাই কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনোগঠনে কাদম্বরীর অবদান অসামান্য। তাই তার অকাল মৃত্যুর ছাপ রবীন্দ্রমানসে আজীবন গভীর প্রভাব রেখে দিয়ে গেছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে খানিটা রক্ষণশীলতার পরিচয় দিলেও সত্যেন্দ্র-জ্ঞানদানদান্দিনীর প্রভাবে নব্য ভাবের নেশায় মেতে উঠলেন। সত্যেন্দ্রনাথ যেমন জ্ঞানদানদান্দিনীকে নিয়ে সব ছেড়ে প্রথম বাইরে পা রেখেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও ঠিক তেমনি সাবেকি সংস্কার ত্যাগ করে কাদম্বরীকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়েছিলেন। গঙ্গার ধারে নির্জনে শিক্ষা পর্ব শেষ হলে কাদম্বরী প্রতিদিনের স্বামীর সঙ্গে গড়ের মাঠে হওয়া খেতে যেতেন। কাদম্বরী অশ্বারোহনে তৎকালীন সমাজে বেশ আলোড়ন তুলেছিল।

কাদম্বরী শুধু অশ্বারোহিনী হয়ে আলোড়ন তুলেছিল তা নয়। এছাড়াও সাধারণ নারীদের চোখে ঐকে দিয়েছিলেন দুঃসহ স্পর্ধায় মায়াজ্ঞান। অসাধারণ সাহিত্য প্রেমিকা ছিলেন তিনি। মাত্র দু বছরের ছোট ঠাকুরপো রবির সাথেই তার সাহিত্য আড্ডা খোরাক পেত। তাই ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনি-

“সাহিত্যে বউঠাকুরানীর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি যে পড়তেন কেবল সময় কাটানোর জন্য তাহা নহে - তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাহার সাহিত্য চর্চায় আমি অংশী ছিলাম।”<sup>৫</sup>

এছাড়া গৃহসজ্জার দিকেও ছিল তার বিশেষ দৃষ্টি। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের প্রতিটি কোনকে সুন্দর করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। ছাদে তিনি গড়ে তুলেছিলেন ফুলের বাগান। যার নাম রাখে ‘নন্দনকানন’। সেই নন্দনকাননে সন্ধ্যাবেলা বসত গান ও সাহিত্য পাঠের আসর। আসরে যোগ দিতেন অনেকে। বাইরে থেকে আসতেন অক্ষয় চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী শরৎকুমারী, জানকীনাথ ও মাঝে মাঝে আসতেন, আর আসতেন কাদম্বরীর প্রিয় কবি বিহারীলাল।

মাদুরের উপর তাকিয়া দিয়ে রূপোর রেকাবে ভিজে রুমালের উপর দিত বেল ফুলের গোড়ের মালা। এক গ্লাস বরফ জল, বাটা ভর্তি ছাঁচি পান দিয়ে সাজিয়ে রাখতেন নিজের হাতে কাদম্বরী। আসর আরম্ভ হওয়ার আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সে আসরে বেহালা বাজাতেন আর রবীন্দ্রনাথ ধরতেন চড়া সুরে গান। স্বর্ণকুমারীও এসে এই আসরে তাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। কিশোর রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক সৌন্দর্য চেতনাকে জাগাবার জন্য এই পরিবেশ, এই সৌন্দর্য দৃষ্টি ও কল্পনার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

রবীন্দ্রনাথের মানসপটে কাদম্বরী বুনে দিয়েছিলেন সেই সৌন্দর্যবোধের বীজ। কাদম্বরীর নান্দনিক রুচিশীলতায় সমৃদ্ধ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রমানস গঠনে তাই এই অসামান্য নারীর অবদান চিরস্মরণীয়। এমনকি তার কবি হয়ে ওঠার পেছনেও আছে তার নতুন বৌঠানেরই প্রেরণা। এছাড়া তিনি ছিলেন সুঅভিনেত্রী ও সুগায়িকা। কবির জীবনে তার অবদান কবি কোনদিনও ভোলেননি। তাই চিত্রা দেব ‘ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল’ গ্রন্থে বলেন-

“প্রতিভার প্রদীপে তেল-সলতে যোগানো সারা। আলো জ্বালার কাজ শেষ। কবির কথায় তাই বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে কাদম্বরীর কথা-

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই

নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই।”<sup>৬</sup>

এরপর আমরা আসবো কবির ‘ছুটি’র কথায়। অর্থাৎ রবীন্দ্র-পত্নী ভবতারিণী। ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশ করে নয় বছরের মৃগালিনীতে পরিণত হলো ভবতারিণী। মহর্ষির নির্দেশে ঠাকুরবাড়ি আদব-কায়দা বাচনভঙ্গির

ঘরোয়া তালিম নিলেন মহর্ষি পুত্রবধূ নৃপময়ীর কাছে। নৃপময়ী মেয়েদের সাথে তাকেও নিয়ে যেতেন লরেটো হাউসে। তারপর চলল তার ইংরেজি শেখা, পিয়ানো বাজানো, ঠাকুরবাড়ি আদব-কায়দা, বাচন ভঙ্গি শেখা, এভাবে ফুলতলির ভবতারিণী পরিণত হলেন আধুনিকা মৃগালিনীতে। কিন্তু প্রথমদিন তিনি আদৌও তা ছিলেন না, সে আমরা জানতে পারি মহর্ষি পৌত্র দীপেন্দ্র পত্নী হেমলতা দেবীর লেখনী থেকে -

“বিয়ের সময় কাকীমা ছিলেন খুব রোগা। গ্রামের বালিকা, শহুরে হাবভাব কিছুই জানতেন না। কী মানুষের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হচ্ছে - সে যে কত বড় আশ্চর্য মানুষ, কাকে তিনি পেলেন এর কোন ধারণাই তাঁর ছিল না। কনে এনে সাত পাক ঘুরানো হল - শেষে বরকনে দালানে চললেন সম্প্রদান স্থলে।”<sup>৭</sup>

তবে তখন না বুঝলেও ক্রমে বুঝতে পারে তার কত উদার মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। তিনি নিজেও ক্রমে কবির যোগ্য সহধর্মিনী হয়ে উঠেছিলেন। তাই শান্তিনিকেতন আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনে নিজের গায়ের গয়না খুলে দিয়েছিলেন স্বামীর মহৎ আদর্শকে কাজে পরিণত করার জন্য। আশ্রমে ছাত্রদের জন্য মাতৃময়ী মৃগালিনী নিজের হাতে রান্না করতেন।

লেখাপড়া শেখা শেষ করে সুশিক্ষিত মৃগালিনী কবির নির্দেশে রামায়ণের সহজ ও সংক্ষিপ্ত অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি মহাভারতের কিছু শ্লোক, মনুসংহিতা, উপনিষদে শ্লোকের অনুবাদ করেন। এছাড়া কবির নির্দেশে তিনি বাংলাদেশের রূপকথা সংগ্রহের কাজে হাত দেয়। অবনীন্দ্রনাথ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে জানায় তার থেকেই পেয়েছিলেন ‘ক্ষীরেরপুতুল’ গল্পটি।

এরপরে আসা যাক পরবর্তী প্রজন্মের কথায়। এই প্রজন্মে যে পূর্বসূরীদের থেকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে থাকবে একথা বলাই বাহুল্য। সত্যেন্দ্র-জ্ঞানদার কন্যা ইন্দ্রিমা দেবী। যার উপস্থিতি চারিদিকে যেন আলোকিত করে তুলতো। সৌভাগ্য বশত দীর্ঘ জীবনে অধিকারিনী হওয়ায় ঠাকুরবাড়ি অন্দরমহলে আর একটি রত্নকে আমরা পেয়েছিলাম। ছোটবেলা থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত ‘ছিন্নপত্রাবলী’র প্রাপক। অন্য কোনও ক্ষেত্রে যদি তার কিছুমাত্র দান নাও থাকতো তাহলেও ক্ষতি ছিল না। কারণ রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে যিনি এই অসাধারণ চিঠিগুলি লিখিয়ে নিতে পেরেছিলেন তার সামান্যতা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ জাগতেই পারে না। ইন্দ্রিরার পরিচয় এখানে শেষ নয় বরং শুরু।

১৮৭৩ সালে তার জন্ম। ১৮৮৭ সালে এন্ট্রান্স এবং ১৮৯২ সালে বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইংরেজি পত্রে সর্বাধিক নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে ‘পদ্মাবতী’ স্বর্ণপাদক লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত স্নেহের ছিলেন ইন্দ্রিমা। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে আত্মস্মৃতি মূলক রচনা - সংগীত স্মৃতি, নাটক স্মৃতি, সাহিত্য স্মৃতি, পারিবারিক স্মৃতি প্রভৃতি - ছয়টি অধ্যায়ে এই স্মৃতিকথা গ্রন্থিত। এছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে ছিল তার বিশেষ অবদান। তার ব্যক্তিতে ছিল কমল হীরের দীপ্তি। যার ছাপ সাজসাজ্জা বাক্য বিন্যাস ঘর সাজানো থেকে শুরু করে শান্তিনিকেতনে আশ্রম কুটির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

এছাড়া খুব ভালো ফরাসি জানত। ভাগ্যক্রমে তার স্বামী প্রমথ চৌধুরীও ছিলেন ফরাসি ভাষায় সুপণ্ডিত। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিক্ষায় আদর্শ জীবন গড়ে তুলেছিলেন ইন্দ্রিমা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দিয়েছিল ‘দেশিকোত্তম’ উপাধি। রবীন্দ্রভারতী সমিতি থেকে তাঁকে প্রথম ‘রবীন্দ্র পুরস্কার’ দেয়া হয়। বিশ্বভারতী থেকে উপাচার্যের পদ তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। তাঁর আত্মজীবনী ‘শ্রুতি ও স্মৃতি’ পান্ডুলিপি আকারে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।



এবার আসা যাক এ প্রজন্মে আরেক অন্যতম ব্যক্তিত্বময়ী নারী প্রতিমা ঠাকুরের কথায়। যে রবীন্দ্র পুত্র রথীন্দ্রনাথের স্ত্রী। ঠাকুরবাড়ির বিধবা প্রতিমার সাথে নিজের পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিয়ে দিয়েছিলেন রথীন্দ্রনাথ নানা সামাজিক বাধাকে উপেক্ষা করে। তারপর দীর্ঘ বত্রিশ বছর রবীন্দ্র সান্নিধ্যে থেকে তাঁর সেবা করেন প্রতিমা।

শিল্প ক্ষেত্রে তাঁর অনেক অবদান ছিল। তাঁর যা কিছু শিক্ষা রথীন্দ্রনাথের কাছেই। সেই শিক্ষা তার প্রতিভার স্পর্শে নতুন হয়ে উঠেছিল। কবির মত গভীরভাবে প্রতিমাকে তার স্বামীও বুঝতেন না। তাই কবির শেষ জীবনের অনুপুঞ্জ ঘটনার পুনর্নিমাণ প্রতিমার হাতে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

শান্তিনিকেতনে গিয়ে নানা কাজে জড়িয়ে পড়ে প্রতিমা। নানা রকমের কারুশিল্প প্রবর্তনে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য পরিকল্পনায় সহযোগিতা করেন, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। কারণ সে সময় বাঙালি মেয়েদের মধ্যে নাচ শেখাবার খুব একটা ব্যবস্থা ছিল না। তিনি নিজে কখনও নাচ শেখেননি বা নৃত্য শিল্পীও ছিলেন না। তবুও তিনি নিজের সহজাত প্রতিভা দ্বারা নৃত্য শিখনে উৎসাহ দেন শান্তিনিকেতনের মেয়েদের।

সংস্কৃতি প্রেমি প্রতিমা সাহিত্যের প্রতিও অনুরক্ত ছিল। তাই কবির ঠিক করে দেওয়া ‘কল্পিতা দেবী’ ছদ্মনামে প্রবাসী পত্রিকায় অনেক কবিতা লেখেন তিনি।

এভাবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য শিক্ষায় নিজেদের স্থান উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতম করে তুলেছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে হয়তো আরও অনেক নামই অগোচরে রয়ে গেল। কিন্তু তাদের সকলের মিলিত প্রয়াসেই তাদের শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য চর্চার ভাণ্ডারটি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কারণ তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের গুণে ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে ঠাকুরবাড়ির সুখ্যাতির প্রদীপকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

### তথ্যসূত্র:

১. বিশ্বাস, কৃষ্ণকলি, ‘উনিশ শতকের বামা লেখনী’, কলকাতা, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২, পৃ- ৫০।
২. দেব, চিত্রা, ‘ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল’, কলকাতা, আনন্দ, ডিসেম্বর, ২০১৬, পৃ-৬।
৩. তদেব, পৃ- ১৪।
৪. দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী, ‘পুরাতনী’, কলকাতা, আনন্দ, এপ্রিল, ২০১৭, পৃ-২৩।
৫. ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ, ‘সাহিত্যের সঙ্গী’, ‘জীবনস্মৃতি’, কলকাতা, বিশ্বভারতী, শ্রাবণ, ১৪১৮, পৃ- ৭২।
৬. দেব, চিত্রা, ‘ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল’, কলকাতা, আনন্দ, ডিসেম্বর, ২০১৬, পৃ-৭৪।
৭. গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থজিৎ, ‘স্মৃতিকথায় জোড়াসাঁকো’, কলকাতা, পত্রলেখা, মার্চ, ২০১৯, পৃ-৭৯।



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 827-842

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.074



## সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মকথায় কলুটোলা-সেনবাড়ির অন্তঃপুরচিত্র

সৌমী বসু, গবেষক, বাংলা বিভাগ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 18.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*In this present article, we are attempting to understand the inner quarters of the Sen family of Kolutola, Kolkata (former Calcutta) within the backdrop of 19<sup>th</sup> Century Bengal, through the autobiographical narrative of Saradasundari Devi (1819-1907). Saradasundari Devi was the wife of Pyarimohan, the second son of renowned wealthy Dewan Ramkamal Sen of colonial Bengal's newly emerging city Calcutta, and the mother of Brahmananda Keshab Chandra Sen. Through the life story of Saradasundari Devi, we will explore the inner world of the Sen household and the lives of its women, as well as the family ethos of the household and the cohabitation of people with faith in both Hinduism and Brahmoism. We will read her autobiographical narrative in conjunction with social history and analyse why this memoir of a women from inner quarters of the Sen household has become an essential document for understanding the family and social history of 19<sup>th</sup> century Bengal.*

**Keywords:** Nineteenth Century, Colonial Bengal, Kolutala Sen household, Inner world of Family, Memoir of Women, Hinduism & Brahmoism, Family & Social History.

অগ্রহায়ণ ১৩১৪-র ‘মহিলা’ পত্রিকা থেকে জানা যায় ‘গত ২৮শে অগ্রহায়ণ শনিবার পূর্বাহ্ন ৭টার সময় পরম ভক্তিভাজন আচার্য্য কেশব সেন মহাশয়ের বন্দনীয়া মাতৃদেবী ন্যূনাধিক ৯০ বৎসর বয়সে’ স্বর্গগত হয়েছেন এবং ‘অতিশয় সেবাপরায়ণা মধুরপ্রকৃতি ধর্ম্মানুরাগিণী ভক্তিমতী পরম দয়াময়ী’ মাতার ‘পবিত্র জীবন কাহিনী’ আগামীতে প্রকাশের জন্য পত্রিকাটি যত্নবান হবে। এই প্রতিশ্রুতি মতই উক্ত পত্রিকাটির ১৩১৪ বঙ্গাব্দের পৌষ, মাঘ, চৈত্র সংখ্যায় ও ১৩১৫-র বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, মাঘ সংখ্যায় এবং ১৩১৬-র ভাদ্র, আশ্বিন সংখ্যায়; সর্বমোট বারোটি কিস্তিতে ‘কেশবজননী সাধ্বী সারদাদেবী’ প্রকাশ পায়। পরবর্তীতে তা ঢাকার ভারত মহিলা প্রেস থেকে ১৯১৩-র ৩১ ডিসেম্বর ‘কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বইটির সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর; যিনি পারিবারিক সম্পর্কে ছিলেন সারদাসুন্দরী দেবীর নাতজামাই (সারদাসুন্দরী এবং প্যারীমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণবিহারীর জ্যেষ্ঠ কন্যা সরলাসুন্দরীর স্বামী)। গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের ‘নববিধান’ প্রচারক প্রিয়নাথ মল্লিক

তথা সেবক শ্রীব্রহ্মানন্দ দাস। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সারদাসুন্দরীর মুখে বলে যাওয়া জীবনকথাকে তাঁর সামনেই অনুলিখন করতেন যোগেন্দ্রলাল এবং সেই লেখাকে সারদাসুন্দরীর নাতনী তথা যোগেন্দ্রপত্নী সরলাসুন্দরী পরিশ্রম সহকারে প্রতিলিখন করে ‘মহিলা’ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে ১৩৯০ বঙ্গাব্দের ‘এক্ষণ’ শারদীয় সংখ্যায় উক্ত আত্মকথাটি ‘কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা’ শীর্ষকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

আত্মকথার প্রথম বাক্যটি জানান দেয় যোগেন্দ্রলালকে সারদাসুন্দরী যখন তাঁর জীবনকথা বলতে শুরু করছেন, তখন সময় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ। ১৮১৯-এ জন্মগ্রহণ করা সারদা দেবীর বয়স তখন ৭৩ বছর। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে কেন সত্তরোর্থ সারদাসুন্দরী উত্তরপ্রজন্মকে নিজের কথা শোনাতে, জানাতে আগ্রহী হলেন? উত্তর মেলে গ্রন্থের ‘নিবেদন’ অংশে যেখানে যোগেন্দ্রলাল জানান ‘ভক্তিভাজন পরম ভক্ত কোনও প্রচারকের বিশেষ অনুরোধে’ তিনি এই জীবনী লিখতে প্রবৃত্ত হন এবং সেই প্রচারক তাঁকে আচার্য্যমাতার জীবনী লিখে নিজে ধন্য হতে এবং জগতের উপকার করতে উপদেশ দেন। এই উপদেশ তাঁর মনঃপুত হলে তিনি সারদাসুন্দরীকে তাঁর জীবনী বলার জন্য অনুরোধ করেন। নাতজামাইয়ের দ্বারা অনুরোধ সারদাসুন্দরী ‘আমার আবার জীবন-চরিত কি’ বলে সেই অনুরোধ ‘উড়াইয়া দিতে চেষ্টা’ করলে যোগেন্দ্রলাল এবং অন্যান্য আরও অনেকে কেশবমাতাকে বুঝিয়ে সম্মত করেন এই বলে- ‘...আপনার জীবনী আপনার সম্পত্তি নয়, সহস্র বৎসর পরে জগতের লোক যখন আপনাকে খুঁজবে, এবং আপনার সম্বন্ধে নানারূপ সত্য মিথ্যা কল্পনা করিবে, তখন আপনি এই জন্য ভগবানের নিকট এবং জগতের লোকের নিকট দায়ী হইবেন।’<sup>(১)</sup> প্রশ্ন জাগতে পারে কেন সারদা দেবীর নিজের জীবনী তাঁর নিজের নয় এবং সহস্র বৎসর পরে জগতের লোক কেনইবা তাঁকে খুঁজবে? এই দুই প্রশ্নের উত্তর আমরা এই নিবন্ধের অন্তিমে বোঝার চেষ্টা করবো, কিন্তু তার আগে প্রাথমিকভাবে আমরা আত্মকথাটির মধ্যে প্রবেশ করবো।

সুদক্ষিণা ঘোষ লিখছেন, ‘অল্প কিছুদিন হল আমরা মাতা-মাতামহী-পিতামহীদের সলজ্জ সঞ্চয়ের বৈভব উদ্ধারে মনোযোগী হয়েছি- খুঁজতে শুরু করেছি তাঁদের কলমের এলোমেলো আঁচড়, ঘোমটার আড়ালে আবছা মুখের ছবি।’<sup>(২)</sup> এমনই এক আবছা মুখের ছবি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে সারদাসুন্দরীর আত্মকথা পড়তে পড়তে। অন্তঃপুরিকার লেখায় ধরা দেয় সমকাল, প্রসিদ্ধ সেনবাড়ির অন্তঃপুর, সাদায়-কালোয় পারিবারিক ছবি, আচার-অনুষ্ঠান, পারিবারিক সম্পর্কের ঘূর্ণাবর্ত আর সর্বোপরি অন্তরালবর্তিনী নারীর গণ্ডি-বন্ধনে আবদ্ধ চড়াই-উৎরাইভরা জীবন; যেখানে এসে ধাক্কা দিয়েছে চলমান সময়স্রোত। কে ছিলেন সারদাসুন্দরী? সামাজিক পরিচয় সূত্রে বলা যায়, ঔপনিবেশিক বঙ্গদেশে গড়ে ওঠা নতুন শহর-কলকাতার প্রসিদ্ধ ধনী দেওয়ান রামকমল সেনের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন সেনের পত্নী ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মাতা ছিলেন সারদাসুন্দরী দেবী।

সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মকথার মধ্য দিয়ে কলুটোলার সেনবাড়ির অন্তঃপুরকে বোঝার জন্য আমাদের সংক্ষিপ্তভাবে বুঝে নিতে হবে তাঁর শ্বশুরমশাই বিখ্যাত ধনী দেওয়ান রামকমল সেনকে কেননা তাঁর মাধ্যমেই কলুটোলার সেনবাড়ির গরিমার সূচনা। ভাগীরথী-তীরবর্তী গরিফা গ্রামে ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করা রামকমল গ্রামে থাকতে সংস্কৃতও শিখলেও পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইংরেজি ভাষাই যে তাঁর উচ্চাশা পূরণের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে তা বুঝে নিয়েছিলেন সহজেই। তাই তিনি গ্রামে পাদ্রীর স্কুলে এবং পরে কলকাতায় এসে ইংরেজি শিখেছিলেন রামজয় দত্তর স্কুলে। সতের বছর বয়স (সাল ১৮০০) থেকে

কর্মজগতের সঙ্গে যুক্ত রামকমলের কাজের জীবন শুরু হয়েছিল কলকাতার চিফ ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার নেমীর অধীনে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী রামকমল নিজের বুদ্ধিমত্তা ও কর্মদক্ষতার গুণে ১৮৩২ সালে অর্জন করেন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ানীর পদ এবং আমৃত্যু তিনি ছিলেন এই পদে অধিষ্ঠিত। শুধু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নয়, রামকমলের আজীবন যুক্ত ছিলেন উনিশ শতকের প্রথম পাদে গড়ে ওঠা প্রায় সবরকমের স্বদেশীয় উন্নতিকল্পে। হিন্দু কলেজ, স্কুল-বুক সোসাইটি, সংস্কৃত কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, গৌড়ীয় সমাজ, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ছিলেন ওতোপ্রতো ভাবে যুক্ত।<sup>(৩)</sup> আট টাকা মাসিক বেতনে হিন্দুস্থানী প্রেসে কর্মে নিযুক্ত রামকমল তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধিমত্তা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্মদক্ষতার বলে নিজের অবস্থাকে সেই জায়গায় নিয়ে যান যেখানে তিনি তাঁর অবর্তমানে নিজের উত্তরাধিকারীদের জন্য ৮/১০ লক্ষ টাকার বিষয় রেখে গেছিলেন। চার ছেলের প্রত্যেককে দিয়েছিলেন ৮০,০০০ টাকা নগদ, অজস্র সোনা-রূপার বাসন, সোনা-মুক্তা-জড়োয়ার আনুমানিক ৫০,০০০ টাকার গহনা এবং কলকাতার উপর প্রায় সতের খানা বাড়ি।<sup>(৪)</sup> বিদেশী শাসকের অধীনে কর্মজীবন ব্যতীত করা এবং তাঁদের সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্কের পরিনতিতেই যে রামকমলের এরূপ সুবিপুল আর্থিক সমৃদ্ধি তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমাদের আলোচনায় রামকমল সম্পর্কে এইগুলি তথ্য পেশের কারণ হল, আমরা দেখে নিতে চাইবো এ-হেন রামকমল; কলুটোলার সেনবাড়ির নীতি-নির্ধারক, নিজের পরিবারের ক্ষেত্রে, অস্তঃপুরের ক্ষেত্রে কী ধরণের ভাবনাচিন্তা করেছিলেন?

রামকমল সেন বিবাহ করেছিলেন ১৮০৩-এ অর্থাৎ কুড়ি বছর বয়সে। পাত্রীর বয়স সম্পর্কে বিশদ জানা না গেলেও এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না পাত্রী নিতান্ত বালিকাই ছিলেন। কেননা ১৮২৮-এ যখন তিনি তাঁর দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহনের বিবাহের বন্দোবস্ত করছেন তখন পাত্রী সারদাসুন্দরী নয় বছরের বালিকা। সুতরাং সেন পরিবারের প্রধান যে হিন্দুধর্মের শাস্ত্র-নির্দেশিত বাল্যবিবাহের সপক্ষেই ছিলেন তা স্পষ্ট বোঝা যায়। ‘হিন্দুর নিয়মমত এক বৎসর বাপের বাড়ী’ থাকার পর শাস্ত্র পরিবারের কন্যা সারদা দশ বছর বয়সে চলে আসেন বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী শ্বশুরবাড়িতে। নিজের ঘর-পরিবার-স্বজন ছেড়ে চিরতরে স্বামীগৃহে চলে আসার সময়টা বড় সহজ ছিল না ছোট সারদার জন্য। তাঁকে বলতে শুনি- ‘শ্বশুরবাড়ী আসিবার পূর্বে আমার বড় ভয় হইত, মনে হইত, কোথায় যাইব। ভাবিতাম যেন আমায় কয়েদ করিবে, কিম্বা ফাঁসি দিবে। এই ভাবিয়া একমাস পর্যন্ত কাঁদিয়াছিলাম। শেষে আমার বাবা জোর করিয়া যখন শ্বশুরবাড়ী রাখিয়া গেলেন তখন মনে হইল যেন আমায় জলে ফেলিয়া দিলেন।’<sup>(৫)</sup> সারদাসুন্দরীর এই আতঙ্কিত স্বর মনে পড়ায় অপর একটি দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকাকে; তিনি বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম আত্মজীবনীকার রাসসুন্দরী। ১৮৭৬ সালে প্রকাশ পাওয়া ‘আমার জীবন’-এ তিনি লিখেছেন কী ভাবে আকুল কান্নায় তাঁর ‘গলা শুকিয়ে গেল এবং ক্রন্দন-শক্তিও রহিত হইয়া গেল।’ ভীতি, আশঙ্কায় একাকার রাসসুন্দরী সেসময়ে নিজের মনের অবস্থাকে পূজায় বলিপ্রদত্ত পশুর সঙ্গে তুলনা করেছেন।<sup>(৬)</sup> বিবাহ বিষয়ে প্রাথমিক অনুভবে দুই কন্যারই মানসিক সাদৃশ্য আমাদের ভাবায়, আমাদের বোঝায় ব্রাহ্মণ্যবাদী আদর্শে আদর্শায়িত ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘পারিবারিক প্রবন্ধ’-এ বাল্যবিবাহকে যতই ‘গুণ’যুক্ত তকমা দিন না কেন<sup>(৭)</sup> বাস্তব অবস্থাটা ঠিক তা ছিল না বরং বাল্যবিবাহের বিষয় ফলাফল ঠিক কীরূপ ছিল তার ভূরিভূরি নিদর্শন তৎকালীন সংবাদ-সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠা জুড়ে পাওয়া যায়। বিবাহ বোঝার আগেই বিবাহসম্পন্ন হয়ে যাওয়া ও চিরকালের নিজের ঘরদোর ছেড়ে নতুন গৃহ-পরিবারে এসে পড়া; এ যেন ‘কোন গাছের বাকল কোন গাছে’ লাগা! বোঝা যায় সেকারণেই সারদা বলেন- ‘যদিও বহুদিন হইতে মনে করিতাম, আমাদের এই সব হিন্দু নিয়ম

খুব ভাল, কিন্তু এখন দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, বেশ বড় হইয়া বিবাহ হইলেই ভাল; কেন-না তাহা হইলে আর এই সব কষ্ট সহ্য করিতে হয় না।<sup>(৮)</sup>

দশ বছরের সারদার স্বামী-ঘর করতে আসার দিনগুলো তাঁর জন্য বড় সহজ ছিল না। একজন বালিকার যে স্নেহ-যত্ন-উষ্ণতার প্রয়োজন শ্বশুরবাড়ি তা দিতে খুব সমর্থ হয়েছিল বলে বোধ হয় না। বালিকাবধূর সঙ্গে বালিকাসুলভ আচরণের প্রমাণ বিশেষ মেলে না সারদাসুন্দরীর আত্মকথায়। শ্বশুর রামকমল সেন সারদাকে স্নেহ করলেও গৃহকত্রী শ্বশ্রুমাতার খুব স্নেহভাজন তিনি হয়েছিলেন এমন তথ্য আত্মকথা মেলে না। বরং বালিকাবধূর ‘একটু দোষ দেখিলেই’ শ্বশুরকে বলে বকুনি খাওয়ানোর ছবিই সামনে আসে। ঘর-গেরস্থালির মধ্যের দমবন্ধ অবস্থা, ভয়ের অনুভব আসলে সমকালের প্রায় কমবেশি প্রতি ঘরের কাহিনি। তাঁর নিজের কথায়- ‘প্রথম শ্বশুরবাড়ি আসিয়া যখন এক একজনের মুখপানে চাইতাম আমার এক এক পোয়া করিয়া রক্ত শুকাইয়া যাইত। ভয় হইত, কে কি বলিবেন। আমি তিন সন্তানের মা হইলাম, তখন পর্যন্ত আমার ভয় ছিল।’<sup>(৯)</sup> আমরা যদি একটু তলিয়ে ভাবার চেষ্টা করি কী কারণে এমন ‘রক্ত শুকাইয়া’ যাওয়ার মতো ভয় তাঁকে গ্রাস করেছিল? সরাসরি কোন ঘটনাবলীর উল্লেখ তো মেলে না কিন্তু কয়েকটি বিষয় আমাদের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে, ভাবায়। রীতিমতো সম্পন্ন পরিবারের বধু হওয়ার পরেও শ্বশুরবাড়ির জীবন যে অক্লান্ত পরিশ্রমেরই ছিল তা রাসসুন্দরী, সারদাসুন্দরী উভয়ের কথাতেই ব্যক্ত হয়েছে। বাড়িতে ‘অনেক দাসদাসী’ থাকলেও সারদার শাশুড়ি ‘দাসীকে ঘরে আসতে দিতেন না’ এবং বড়-বড় ঘরগুলো দশ বছরের সারদা ও তাঁর দ্বাদশ বছর বয়সী বড় জা কেই ধুতে-মুছতে হোত। ‘কোন রকমে কষ্টে সৃষ্টে’ যদিবা ধোয়া হত ছোট ছোট হাতে বড়-বড় ঘর মোছার ন্যাকড়া ধরতে ও মুছতে ভীষণ কষ্ট হোত। সারাদিন এমন পরিশ্রম করতে করতে যদি কখনো জা-ননদ এমন দু-চার জন সমবয়সী একত্রে বসে খেলা করতেন তাতে শাশুড়ি রাগান্বিত হতেন এবং বালিকাবধূদের কপালে জুটতো বকুনি।<sup>(১০)</sup> আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি সারদাসুন্দরীর বিবাহ হয়েছিল সেকালের কলকাতার বিখ্যাত ধনী দেওয়ান রামকমল সেনের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন সেনের সঙ্গে। অর্থ, সমৃদ্ধি, সম্ভ্রান্ততা কোথাও কোন কমতি ছিল না যে পরিবারে সেই পরিবারের বধূর কঠে যখন এমন বেদনা প্রকাশ পায়, তখন পাঠক হিসাবে বিষণ্ণ লাগে বইকি! আর সঙ্গে আমরা খুঁজতে থাকি, বুঝতে চেষ্টা করি কী ছিল সেই কারণ যে কারণে বালিকাবধু শ্বশুরবাড়িতে ভয়ে কাঁপতেন, তটস্থ হয়ে থাকতেন? এ কি কেবল নতুন স্থানে, নতুন পরিবারের মধ্যে এসে পড়ে অক্লান্ত পরিশ্রম ও রাগত শাশুড়ির স্নেহভাজন না হতে পারার কারণে? না কি এই ভয়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে নারীমনের অপর কোন ভাবনা, সঙ্কোচ? প্রসঙ্গত আমাদের মনে আসে বেগম রোকেয়ার ‘গৃহ’ প্রবন্ধটি, যেখানে তিনি বড় সহজ সুরে গভীর কথাটি বলে দেন- ‘আবাস বিশ্লেষণ করিলে দুই অংশ দেখা যায়- এক অংশ আশ্রয়স্থান, অপর অংশ পারিবারিক জীবন।’ তিনি আরও বলেন, সামাজিক অবস্থার দিকে যদি নজর দিলে দেখা যাবে এদেশীয় অধিকাংশ নারী গৃহসুখে বঞ্চিত হয়ে আছেন। অপরের অধীনে থাকা নারীগণ যে বাটীতে থাকেন, তা বৈষয়িক ভাবেও যেমন তাঁর নিজের নয়, সঙ্গে সেই বাড়িকে আপন ভবন মনে করার অধিকারও তাঁদের নেই, এমতাবস্থায় সেই বাটী, সেই গৃহ কী করে নারীর আপন হতে পারে এপ্রশ্ন তো এসেই যায়! সে তো নিজেকে পরিবারের একজন বলে মনে করতেও সাহস আনতে পারে না। কুমারী, সধবা, বিধবা সকল নারীই এই-একই অবস্থার মধ্যেই দাঁড়িয়ে। রোকেয়া তাঁর প্রবন্ধের অন্তিমে বলেন- ‘ইংরাজিতে Home বলিলে যাহা বুঝায়, “গৃহ” শব্দ দ্বারা আমি তাহাই বুঝাইতে চাই।...গৃহ বলিতে আমাদেরই একটি পর্ণকুটীর নাই। প্রাণি-জগতে কোন জন্তুই আমাদের মত নিরাশ্রয়া নহে। সকলেরই গৃহ আছে- নাই কেবল আমাদের।’<sup>(১১)</sup> দশ বছরের বালিকা

সারদাকে যখন তাঁর পিতা ‘জোর করিয়া শ্বশুরবাড়ী রাখিয়া’ কাশীধামে যান তখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমরা বুঝতে পারি সেই বালিকার মনে কী অবস্থা তৈরি হতে পারে, তাঁর অবচেতন মন তাঁকে এটা খুব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয়, ‘শ্বশুরবাড়ী ও বাপের বাড়ী এ পাড়া ও পাড়া’ হলেও, এতবড় পৃথিবীতে শ্বশুরবাড়ী ব্যতিরেকে তাঁর আর অদ্বিতীয় কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। এরই সঙ্গে যুক্ত হয় শ্বশুরবাড়ীতে এসে ক্লাস্তিকর উদয়াস্ত পরিশ্রম আর কোথাও এতটুকু চ্যুতি হলে বকুনি। নিজের গৃহের অধিকার এসবের মধ্যে কোথায়ে? এরই সঙ্গে অতীব ধনী পরিবারে বিবাহও যে সারদার ভীতির কারণ তাও আমরা আলোচ্য আত্মকথাটির মনোযোগী পাঠে বুঝতে পারি।

রামকমল সেনের পরিবারে যে প্রথম থেকে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর চল ছিল না, সারদা আত্মকথাতেই তার প্রমাণ মেলে। ১৮৯২ সালে তিনি যখন নিজের জীবনকাহিনী যোগেন্দ্রলালকে শোনাচ্ছেন তখন বলছেন-‘এখন যেমন মেয়েরা স্বচ্ছন্দে লেখাপড়া করিতে পারে, এবং কত ভাল ভাল বিষয় শিক্ষা পায়, আমাদের এ সকল কিছুই ছিল না।’<sup>(১২)</sup> পরম বৈষ্ণব রামকমল স্বপাকে অন্নগ্রহণ করতেন, কেবল তাঁর চৌদ্দ বছরের বাল্যবিধবা মেয়ে বিন্দুবাসিনীর ‘মন ভাল রাখার’ উপায় হিসাবে একমাত্র তাঁর সেবা ব্যতীত আর কারোর সেবা গ্রহণ করতেন না। গৃহ কর্তা রামকমল সেন ‘কুঠীতে যাইবার সময়’ মেয়ের হাতে টাকা দিয়ে ‘তোমাতে ও তোমাদের বৌ’য়েতে মিলে আমার জন্য খাবার করো’ বলে চলে গেলে পরে অন্তঃপুরিকাগণ ‘সমস্ত দিন এই আমোদে’ থাকতেন এবং সারাটা দিন বসে খাবার তৈরি করতেন; যা বিকালে গৃহস্বামী রামকমল সেন কর্মক্ষেত্র থেকে ফেরার পর বড় বড় রুপোর থালায় সাজিয়ে তাঁর কাছে পাঠানো হত এবং যা দেখে ‘তিনি অতি আশ্লাদ করিতেন। কিন্তু বিশেষ কিছুই খাইতেন না; কেবল একটু আধটু আশ্লাদ করিয়া খাইতেন।’ কেবল সুনিপুণ রন্ধনকলা নয়, ‘ধর্মীয় সংশিক্ষা’ও পেতে শুরু করেছিলেন সারদাসুন্দরী তাঁর শ্বশুরমশায়ের কাছ থেকে। বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী রামকমল সেন তাঁর পরিবারের নারীদের কেবল হরিনাম জপের মালা প্রদান, ধর্মীয় উপদেশ দান নয়, ঠাকুরঘরে গিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কী বলে প্রণাম করা হবে সে বিষয়েও পথ প্রদর্শন করতেন। নিজের স্ত্রী এবং অন্যান্য অন্তঃপুরিকাদের উৎসাহিত করতেন ভাগবত পাঠ শুনতে। সেন বাড়ির অন্তঃপুরে মেয়ে-বধূদের জীবন এভাবেই রন্ধন, ঘরের কাজ আর ধর্মশিক্ষাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। আমরা বুঝতে পারি রামকমল সেন তাঁর নিজের ঘর-পরিবারকে যে ভাবে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই গড়ে তুলছিলেন তাঁর নিজের কন্যা ও বালিকা বধূমাতাকে। এহেন রাঁধাবাড়া-ধম্মকম্বের দৈনন্দিনতায় পরিপূর্ণ একান্নবর্তী সেন বাড়ির গেরস্থালির মধ্যে সারদার জীবনে লেখাপড়ার আলো এনেছিলেন তাঁর স্বামী প্যারীমোহন। কয়েকটি বাক্যে তাঁর আলোর পথে হাঁটতে শেখানোর দিনগুলোকে তুলে ধরেছেন সারদা- ‘তখনকার মেয়েদের আজ কালের মেয়েদের মতন লেখাপড়া শিখিবার এমন সুবিধা ছিল না, শিখিতে চাহিতও না। কিন্তু আমার স্বামীর মত এই বিষয়ে সকল অপেক্ষা উন্নত ছিল। তিনি একান্ত ইচ্ছা করিতেন যে, আমি লেখাপড়া করি। অন্যত্র শিখিবার কোন সুবিধা ছিল না বলিয়া তিনি নিজেই আমায় রাত্রিতে পড়াইতেন। তাঁহার হাতের অক্ষর অত্যন্ত সুন্দর ছিল, তিনি নিজে লিখিয়া আমায় সেই রকম করিয়া লিখিতে বলিতেন।’<sup>(১৩)</sup> এই কয়েকটি বাক্যে সারদাসুন্দরী ও প্যারীমোহনের দাম্পত্যে যৌথতার যে ছবি মেলে, তা কর্মক্লান্ত বালিকাবধূর ভীতিপূর্ণ মনোদশার মাঝে অনুভূত হওয়া অনাবিল আনন্দের আনন্দকেই অভিব্যক্ত করে।

হিন্দু কলেজের ‘মেডেল পাওয়া’ ছাত্র; ‘ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ও ফার্সিতে অতি পণ্ডিত’, সঙ্গীত ও নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী, সুন্দর ছবি আঁকতে পারা, ‘ধর্ম্মে অতিশয় মন’, ‘দানশক্তি অত্যন্ত অধিক’, ‘গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি’, ‘বড় কম কথা বলা’, সুদর্শন প্যারীমোহন ছিলেন উনিশ শতকের সেই নব্যশিক্ষিত যুবাদের প্রতিভূ যাঁরা পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে ঘর, ঘরগী, দাম্পত্যসম্পর্ক নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছিলেন। তাঁরা নিজের বিবাহিতা পত্নীদের কেবলমাত্র গৃহের বধু আর সন্তানের মাতা হিসাবে নয়, পেতে চাইছিলেন নিজের সহধর্ম্মিণী ও মর্মসঙ্গিনীরূপেও। আর সে কারণেই নিজের মনোমত করে পত্নীদের গড়ে তোলার প্রচেষ্টা দেখা গেছিল তাঁদের মধ্যে। পত্নীকে লেখাপড়া শেখানো, তাঁকে দেওয়া বিবিধ উপদেশও আসলে সেই চেষ্টারই একটা অংশ বটে। প্যারীমোহন-পত্নী বলছেন,-‘তিনি সব সময় আমায় উপদেশ দিতেন। বলিতেন, “যাতে ভাল হও তার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিবে, কখনও খুব চেষ্টায়ে হাসিও না, কাহারও সঙ্গে চেষ্টায়ে কথা কহিও না”, ইত্যাদি। তিনি কখনও বেআব্রু ভালবাসিতেন না, এবং যাহাতে সর্বদা আব্রুতে থাকি সেই জন্য চেষ্টা করিতে উপদেশ দিতেন।’<sup>(১৪)</sup> একথা অনস্বীকার্য যে, উনিশ শতকের নব্য শিক্ষিত যুবাদল ঘরের মেয়েদের তথা নিজের স্ত্রীকে ঠিক যেভাবে নির্মিত করতে চেয়েছিলেন, যেভাবে তাঁদের দেখতে চেয়েছিলেন উপরোক্ত উপদেশ সেই ছাঁচেই গড়া কিন্তু একথাও বিস্মৃত হলে চলবে না যে, ১৮১৯-এ জন্মগ্রহণ করা ও নয় বছর বয়সে বিবাহ হওয়া সারদাসুন্দরী সংসার করতে শ্বশুরবাড়ী আসেন দশ বছর বয়সে এবং হঠাৎ অসুস্থতায় তাঁর স্বামীর যখন দেহান্ত হয় তখন সারদার বয়স মাত্র উনত্রিশ বছর; তারিখ ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ২২ অক্টোবর অর্থাৎ সময়টা হল উনিশ শতকের চারের দশক। বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাসের দিকে চোখ রাখলে দেখা যাবে তখন খ্রিষ্টান মিশনারিদের উদ্যোগে কিছু-কিছু স্ত্রী-শিক্ষার কর্মসূচী গৃহীত হলেছে, বঙ্গদেশের বিবিধ পত্র-পত্রিকা-সভা-সমিতিতে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে, ১৮৪৮-এর এপ্রিলে ডিব্রুগড়ার বেথুন বড়লাটের আইন পরিষদের সদস্য হিসাবে সদ্য এদেশে এসেছেন। অর্থাৎ ‘ভদ্রঘরের মেয়েদের’ কাছে শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার মতো ঘটনা তথা ৭মে ১৮৪৯-এ ‘ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল’-এর পথচলা শুরু হতে, আরও কিছুটা সময় বাকি আছে। এইসময়ে দাঁড়িয়ে রক্ষণশীল পিতার পুত্র প্যারীমোহন তাঁর স্বল্প জীবনে স্ত্রী সারদার জন্য যেটুকু খোলা বাতাস আনতে পেরেছিলেন তা সমকালের প্রেক্ষিতে নেহাৎ কম নয়। স্বামী প্যারীমোহন যখন স্ত্রী সারদাকে বলেন ‘যখন কোথাও যাই, তাহারা যখন তোমার সুখ্যাৎ করে শুনে বড় আশ্লাদ হয়।’<sup>(১৫)</sup> অপরের মুখে স্ত্রী’র সুখ্যাতি শোনা এবং তা শুনে আশ্লাদিত হওয়া; উনবিংশ শতকের দাম্পত্যের সংজ্ঞায় এটি নতুন কথা বইকি! কিংবা জীবনের অন্তিমক্ষণে যখন প্যারীমোহন স্ত্রী সারদাসুন্দরীর পিঠে হাত দিয়ে বলে ওঠেন “তুমি আমার কাছ থেকে যেও না। তোমাকে আমি বড় ভাল বাসিতাম, এখন তুমিই বা কোথায় রইলে, আর আমিই বা কোথায় চলিলাম।” তখন মননসমৃদ্ধ পাঠক বোঝে এই যন্ত্রণা, এই কাতরতা ‘স্বামী দেবতার’ নয়, বরং তা সেই স্বামীর যে প্রেমিকও। আর তাই-ই তিয়াত্তর বছরে উত্তীর্ণ সারদাসুন্দরী চুয়াল্লিশ বছর আগের বিচ্ছেদমুহূর্তের শেষ কথাগুলি সারাটি জীবনধরে হৃদয়ের উষ্ণতায় মুড়ে আপন অন্তরের অন্তঃস্থলে সযতনে রেখে দিয়েছেন।

প্যারীমোহনের সঙ্গে সারদাসুন্দরীর উনিশ বছরের যৌথ জীবনে একটা নিবিড় দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে উঠছিল বটে কিন্তু অধ্যাপক সুদক্ষিণা ঘোষের গভীর অভিনিবেশ যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিকে উত্থাপিত করেছে তা হোল- ‘দশ বছর বয়স থেকে অনেক শ্রমে, অনেক ভালোবাসায় যে ঘর গড়ে তুলেছিলেন তিনি- সে ঘর কি সারদাসুন্দরীর নিজের ঘর? এই নিজের ঘরে কোথাও কি স্বীকৃতি আছে স্বামী আর স্ত্রীর যৌথ সম্পদের,

কিংবা আছে কি স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর অধিকারবোধের ন্যূনতম চেতনা?’<sup>(১৬)</sup> আমরা পূর্বে বেগম রোকেয়া লেখা ‘গৃহ’ প্রবন্ধটির উল্লেখ করেছিলাম এই অধিকারবোধের প্রসঙ্গেই। অতীব ধনী পরিবারে বিবাহ হওয়া সারদা দেবীর মনে কোথাও অনেকখানি সঙ্কোচ ছিল। যেহেতু তাঁর পিতৃগৃহ আর্থিকভাবে শ্বশুরকুলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না, এবং পাছে তাঁর কোন আচরণ সেই অসামঞ্জস্যকেই প্রকট করে এই বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সঙ্কুচিত এবং সচেতন থাকতেন। আর সেকারণেই স্বামীর উপার্জনের ‘বাক্সপূর্ণ টাকা’ বা ‘কোম্পানির কাগজ’ কোন বিষয়েই তাঁর নিজের অধিকার আছে বলে মনে করতে আমরা দেখি না। প্যারীমোহন স্ত্রীর হাতে ‘থলে থলে নূতন পয়সা, সিকি, দুয়ানি’ এনে দিয়ে সারদার হাতে তুলে দিলেও সঙ্কুচিত সারদা কখনোই তা থেকে কিছু চাইতেন না কেননা পাছে ‘তিনি মনে করেন, গরিবের মেয়ে, কখনও টাকা দেখি নাই, তাই টাকা চাইতেছি। এই ভয়ে আমার টাকা লইতে ইচ্ছা হইত না।’<sup>(১৭)</sup> এই নিবন্ধের শুরু দিকে বালিকাবধু সারদার ভয় পাওয়ার প্রসঙ্গে আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম, কী কারণে ‘রক্ত শুকাইয়া’ যাওয়ার মতো ভয় তাঁকে গ্রাস করেছিল? এবং সেখানে একটি কারণ হিসাবে আমরা উল্লেখ করেছিলাম প্রসিদ্ধ ধনী পরিবারে বিবাহও তাঁর ভয় পাওয়ার একটি অন্যতম কারণ ছিল। জাতীয় চিকিৎসায় যুক্ত সারদাসুন্দরীর পিতা আর্থিক ভাবে যে খুব সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না তা জানা গেছে সারদার কথা থেকেই। আর আত্মকথা থেকে জানতে পারা আরও দু-একটি ঘটনা যা সারদার ‘ভয়’ কিংবা সঙ্কোচের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বলেই মনে করি- এক, বিবাহের পর সারদাসুন্দরী যখন এক বছর পিতৃগৃহে ছিলেন তখন তখন শ্বশুর রামকমল সেন প্রতি রবিবার তাঁর বধুমাতাকে দেখতে যেতেন এবং বালিকাবধুমাতার জন্য নিয়ে যেতেন ‘টাকা ও ট্যাঁকশাল হইতে নূতন রাঙা পয়সা’।<sup>(১৮)</sup>

দুই, সারদার অনেকদিনের সাধ ছিল ত্রিবেণীতে যাওয়ার যেহেতু তাঁর জন্ম হয়েছিল ত্রিবেণীতে তাঁর মামারবাড়িতে। তিনি বারবার স্বামী প্যারীমোহনকে এই ইচ্ছেপূরণের জন্য ‘বিরক্ত করতেন’। যদিও প্যারীমোহন এই ‘সাধ পূর্ণ’ করেছিলেন এবং ‘ত্রিবেণীতে খরচ করিবার জন্য যথেষ্ট টাকা’ এবং নন্দ ও অন্যান্য লোকজন সঙ্গে দিয়েছিলেন কিন্তু বারবার সারদাসুন্দরীর আদ্যর শুনে তিনি বলতেন- ‘তোমায় আমি অনেকগুলি কড়ি আনিয়া গুণিতে দিব, তাহা হইলে তুমি ও কথা ভুলিয়া যাইবে।’<sup>(১৯)</sup> বোধহয় খানিক মজা করেই কথাটি বলতেন, কিংবা ভাবতে ভালো লাগে সারদা ত্রিবেণীতে গেলে স্ত্রীকে অদর্শন জনিত যে বিরহের সম্মুখীন হতে হবে স্বামী প্যারীমোহনের প্রেমিক মন সেই বেদনা স্বীকার করতে চায়নি। তাই হয়ত তিনি এই বিষয়ে খুব উদ্যোগী হচ্ছিলেন না। খানিক মজার ছলে বলা হলেও বাক্যটিতে নিহিত অর্থের এবং পৌরুষের প্রহ্ন অহং কিন্তু পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায় না।

তিন, সারদাপুত্র কেশবচন্দ্র সন্দেশ ও রসগোল্লা অত্যন্ত পছন্দ করতেন। ছোটবেলায় কেশব মায়ের কাছে চারটি সন্দেশের জন্য আদ্যর করায় মা সারদা দেবী দ্বারা প্রহৃত হন। কেশবের কাম্মার শব্দে দাদু রামকমল সেন সেই স্থানে এসে প্রহার ও ক্রন্দনের কারণ শুনে বড়বাজার থেকে বারো ঝুড়ি সন্দেশ আনিয়েছিলেন এবং সঙ্গে এও জানিয়েছিলেন তিনি প্রতিদিন যথেষ্ট উপার্জন করে আনছেন তাই পৌত্ররা যা খেতে চাইবে তাই যেন দেওয়া হয়।<sup>(২০)</sup> উপরোল্লিখিত তিনটি ঘটনার মধ্যে যে বিষয়ের সাদৃশ্য আছে তা হোল অর্থ। স্নেহের চিহ্ন স্বরূপ অর্থ দান, পরিহাসের চিহ্ন স্বরূপ অর্থের উল্লেখ এবং স্নেহের প্রদর্শনস্বরূপ প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থের ব্যয়। অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের মেয়ে সারদাসুন্দরীর কাছে অর্থের এমন বিপুল



প্রদর্শন এবং অকাতরে ব্যয় যে ভীতি তৈরি করবে তা আর অস্বাভাবিক কী, যেখানে পিতৃগৃহ আর শ্বশুরগৃহের মাঝে জীবন কাটিয়ে ফেলা নারীর নিজেই, একদম নিজস্ব বলে কোথাও কোন অধিকার নেই।

সারদাসুন্দরীর ‘ভয়’খানি যে অমূলক ছিল না সারদার জীবনের কঠিনতম সময় ভীষণ ক্রুরভাবে তা প্রমাণ করে দিয়েছিল। প্যারীমোহনের দেহান্তের পনের দিন পরেই সারদার সেজ দেবর তাঁর উপর অমানুষিক মানসিক অত্যাচার শুরু করেন। ঘরের কপাট ভেঙে প্যারীমোহনের শোয়ার খাট, সিন্দুক খুলে প্যারীমোহনের ব্যবহৃত সমস্ত শাল বের করে নিয়ে চলে যান। পিতৃহারা সন্তানদের নিয়ে শঙ্কিত সারদাসুন্দরী ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকতে বাধ্য হতেন মনের মধ্যে এই আশঙ্কায় নিয়ে যে মাথার ওপরের ছাদটুকু তাঁর এবং তাঁর সন্তানদের থাকবে কি না। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও সেকালের প্রসিদ্ধ সেনবাড়ীর বধূর জীবনে তাঁর স্বামী গত হওয়ার পরে-পরেই পারিবারিকভাবে এই পীড়ন ও আশ্রয়হীনতার ভয়ও পরিলক্ষিত হতে দেখা গেছে। আমরা বিস্মিত হই একথা জেনে যে সামাজিকভাবে এতখানি প্রতিপত্তি সম্পন্ন পরিবারের বধূকে তাঁর বৈধব্যদশায় কী চূড়ান্ত আপমান, অপদস্ততা ও অসহায়ত্বের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। ক্ষুব্ধ হই একথা পড়ে যে বিধবা বধূমাতার উপর পীড়ন দেখে তাঁর শ্বশ্রুমাতা মাথা খুঁড়ে কাঁদতে থাকেন কিন্তু সেই পরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্র হরিমোহন সেন; যিনি পিতা রামকমল সেনের অবর্তমানে সেসময় পরিবারের কর্তা, তিনি এই অন্যায়ে কোন প্রতিবাদ বা প্রতিকার করেন না। মনে হয় দেবর বংশীধরের ন্যায় পরিবারের তৎকালীন কর্তা হরিমোহনও মনে করতেন জীবনের সকল সুবিধার পরিহারই বৈধব্যের যোগ্য কর্তব্য। আর তাই হিন্দু-বিধবার বৈধব্য-জীবনচর্যার অঙ্গ হিসাবে পালঙ্ক পরিত্যাগ বাঞ্ছনীয় মনে করেই তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। এই সকল ঘটনা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরে আমরা বুঝতে পারি কেন প্যারীমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর একজন বিশ্বস্ত খানসামা কাগজপত্রের বাস্তব ও প্যারীমোহনের সর্বস্বত্বের ব্যবহৃত হীরের আংটি দেওয়ালের গায়ে লুকিয়ে রেখেছিল এবং পরে সারদাসুন্দরীর জ্যেষ্ঠপুত্র নবীনকে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে গেছিল।<sup>(২১)</sup> আমাদের মনে হয় শ্বশুর রামকমল সেন জীবিত থাকলে এমন মর্যাদাহীন দিন হয়তবা সারদাসুন্দরীকে দেখতে হোত না। এহেন কলুটোলা সেন বাড়ির অভ্যন্তর চিত্রের সঙ্গে, অষ্টাদশ-উনিশ শতকের বঙ্গীয় মনুবাদী সমাজের হিন্দু পরিবারগুলির বিধবা নারীগণের তলানীতে গিয়ে দাঁড়ানো অবস্থার তফাৎ যে বিশেষ কিছু ছিল না, তা সমকালীন পত্র-পত্রিকাগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়- ‘আমাদিগের বিধবাগণের একটা নামই দুর্ভাগা, সুতরাং তাহাদের ভাগ্য যে কেবল দুর্ভাগ্যপূর্ণ, তাহা বলা বাহুল্য। যাহা কিছু সুখ তাহা হইতে বঞ্চিত না হইলে তাহাদিগের পাপ এবং যাহা কিছু দুঃখ, তাহা অকাতরে বহন করাই তাহাদিগের ধর্ম। বস্তুতঃ অনুসন্ধান করিলে মনুষ্যজাতির মধ্যে হিন্দু বিধবাদিগের মত চিরদুর্ভাগ্য, উপেক্ষিত, প্রতারিত এবং অত্যাচারিত জীব আর কেহই নাই।’<sup>(২২)</sup> সেকালের প্রেক্ষিতে উক্ত কথাগুলি যে কতখানি সত্য, স্বামী বিয়োগের পর সারদাসুন্দরীর অসহায় অবস্থা ও পরিজনের হাতে লাঞ্ছনা তারই প্রমাণ দেয়। প্যারীমোহন চলে যাওয়ার এক বছর পরে গত হয় তাঁর বড় মেয়ে ব্রজেশ্বরী, তার পর শাশুড়ি মা, এরপর বন্ধুসম প্রিয়তমা ননদ বিন্দু- উপর্যুপরি শোকে অস্থির-উন্মত্ত হয়ে আর গৃহে থাকতে পারলেন না সারদা। বেরিয়ে পড়লেন তীর্থের উদ্দেশ্যে। এই সময় থেকে সারদাসুন্দরীর জীবনে একটি ভিন্ন পর্বের সূচনা হয় বলেই আমাদের অভিমত।

‘...আমার মা আমার বাপের বাড়ী গৌরিভা হইতে গঙ্গাসাগর যাত্রা করিবেন বলিয়া আমাকে দেখিতে আমাদের বাড়ী আসিলেন। তিনি গঙ্গাসাগর যাইবেন শুনিয়া আমিও তাঁহার সঙ্গে যাইব স্থির করিলাম।

সকলে নিষেধ করিতে লাগিল। আমি শুনিলাম না। পাছে আমার ভাঙ্গুর যাইতে না দেন এই ভয়ে তাঁহাকে জানাইব না মনে করিলাম। চুপি চুপি আমার পায়ের মল বিক্রী করিলাম, শেষে কিন্তু তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি প্রথম বারণ করিলেন, শেষে যখন দেখিলেন যে আমি নিতান্তই যাইব স্থির করিয়াছি, তখন নবীনকে ডাকিয়া বলিলেন, “যদি তোর মা নিশ্চয়ই যান তবে সঙ্গে দারোয়ান এবং লোকজন দিস, যেন একলা না যান।” আমি শুধু একজন দারোয়ান ও খানসামাকে সঙ্গে লইলাম, এবং কোলের কৃষ্ণবিহারীকে লইয়া মার সঙ্গে যাত্রা করিলাম।<sup>(২৩)</sup> --- উদ্ধৃত অংশটি সারদাসুন্দরীকে ও সেনবাড়ির অভ্যন্তরকে বোঝার জন্য খুব প্রয়োজনীয় বলেই আমরা মনে করি। স্বামী প্যারীমোহন, প্রথম সন্তান, শাশুড়ি ও ননদকে হারানোর পর সারদাসুন্দরীর জীবনে যে তীর্থদর্শন শুরু হয়েছিল, তা চলে প্রায় চুয়াল্লিশ বছর। প্রথমে তাঁর মায়ের সঙ্গে গঙ্গাসাগর, তারপর শ্রীক্ষেত্র। ক্রমশ কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, বিষ্ণ্যচল, গয়া, জয়পুর, নৈনিতাল, মুসৌরি, লাহোর, লখনৌ, অমৃতসর, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, দেৱাদুন প্রমুখ স্থান সারা জীবনধরে দর্শন করেছিলেন তিনি। এই তীর্থদর্শনের সূচনাটা যে সেনবাড়ির অন্তঃপুরিকার জন্য বড় সহজ ছিল না উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি তার প্রমাণ। দশ বছর বয়সী যে বালিকাবধূ সারদা শ্বশুরবাড়িতে এসে ভয় পেতে আরম্ভ করেছিলেন, তিন সন্তানের মা হওয়ার পরেও যাঁর ভীতি কাটেনি, যিনি স্বামীর মৃত্যুর পর দেবরের অমানুষিক ব্যবহারের কোন প্রতিবাদ করতে পারেননি, শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি বন্টনে তাঁর পিতৃহীন পুত্রদের প্রতি আর্থিক বঞ্চনা ও অসাম্য হচ্ছে দেখেও কিছু বলতে সমর্থ হননি, স্বামী ও কন্যার মৃত্যুর ভীষণ শোকের পর যখন তিনি ‘উঠিতে পর্যন্ত অক্ষম’ সেই সময় তাঁর মতামতের মূল্য না দিয়ে বড় ছেলে নবীনের বিবাহ স্থির করা হলে যিনি নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি; সেই সারদাসুন্দরীকেই আমরা তীর্থযাত্রার ক্ষেত্রে নিজের দৃঢ় মতামত ও সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে দেখি। শুধু তাই নয়, ভাঙ্গুর খরচবহন করতে অরাজি হলে নিজেই নিজের খরচে গঙ্গাসাগর যাবেন এই নির্ণয়ে, মনের মধ্যে ভীতি নিয়েই পায়ের মল বিক্রি করেন তিনি। আত্মকথার মাধ্যমে এপর্যন্ত জানা সারদার সঙ্গে এই সারদাসুন্দরীর কেমন যেন আন্তর প্রভেদ অনুভূত হয়। এরই সঙ্গে চোখে পড়ে তাঁর বলা বাক্যের ‘...আমিও তাঁহার সঙ্গে যাইব স্থির করিলাম’ কিংবা ‘আমি নিতান্তই যাইব স্থির করিয়াছি...’ এই অংশগুলি। এই ‘স্থির’ করাটুকুই যে অন্তঃপুরিকার পক্ষে নিতান্ত কঠিন। উনিশ শতকের রক্ষণশীল পারিবারিক-ভূমিতে দাঁড়িয়ে, পরিবারতন্ত্রের গোঁড়ামিকে পেরিয়ে, স্বামীহীন নারীর পুরোপুরিভাবে শ্বশুরকুলের ওপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল থাকা অবস্থায় এই কাঠিন্য যে আরও শতগুণ বেড়ে যায়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই কাঠিন্যকে পেরিয়ে যেতে পারার ক্ষণই অন্তরালবর্তিনী সারদার বৃহত্তর জীবনবোধের সূচনাবিন্দু বলে আমরা মনে করি। কেননা এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে, নারী মুক্তির পথে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা নারীর দেশ-বিদেশ ভ্রমণের সূচনা হবে আরও কিছুটা পরে, ১৮৬৯-৭০ সাল নাগাদ। আর সারদাসুন্দরী তীর্থদর্শনে বেরছেন কিন্তু আরও বেশ খানিকটা, অন্তত আরও প্রায় দু’দশক আগে।

পরপর পাওয়া শোকের আঘাত থেকে সান্ত্বনা পেতে সারদাসুন্দরী ‘পাগলের মত হইয়া বাহির’ হয়েছিলেন তীর্থের পথে। মায়া কাটাতে শুরু করা তীর্থযাত্রা কখন ‘প্রাণে যে কি এক অপূর্ব আহ্লাদ’-এর সঞ্চরণ করেছিল সারদাদেবী বোধহয় বুঝতেও পারেননি। যখন নিজের ভিতরে উঁকি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছেন তখন বলেছেন তিনি তীর্থ করেন পুণ্যলাভ হবে বলে নয়, বরং ‘ভালবাসার উপর তীর্থ দর্শন’ করেন। তিনি যেমন ছেলেপুলে এবং আপনার লোকদের ভালোবাসেন, সেইরকম ভাবে তীর্থ, ব্রত ইত্যাদিকে ভালোবাসেন। এগার বছর বয়সে শ্বশুরমশাই রামকমল সেনের মাধ্যমে পাওয়া হরিনামের মালা

গ্রহণ করা কলুটোলা সেনবাড়ির পুত্রবধু সারদাকে এই প্রতীতিতে উন্নীত হতে পার করতে হয়েছে জীবনের অনেকটা কঠিন পথ। যেপথে আচারবতী হিন্দু-বিধবা নিজের সকল ধর্মীয় আচরণ নিষ্ঠাভরে পালন করলেও কাটিয়ে উঠেছেন ধর্মীয় সংকীর্ণতা। সে কারণেই পুত্র কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম হওয়ার কারণে তিনি পারিবারিক নানাবিধ ক্লেশ সহ্য করলেও পুত্রকে কখনোই তাঁর নিজের বিশ্বাস ও ধর্মের পথ থেকে নিবৃত্ত হতে বলেননি। বরং কেশবচন্দ্রের দেওয়া ধর্মীয় বই ও কাগজপত্র পাঠ করে তা সম্পূর্ণরূপে বোঝার জন্য গুরু শরণাপন্ন হয়েছিলেন। গুরু আশ্বস্ত করার জননীর মন সন্তোষ লাভ করে। কেশব চরিতকার বলেন- ‘কেশবের প্রথম জীবনে জননী একজন তদীয় ধর্মপথের উত্তরসাধিকা ছিলেন।...কেশবচন্দ্র সেই বৃহৎ হিন্দুপরিবারের মধ্যে তখন কেবল জননীকে ধর্মপথের এক মাত্র সহায় প্রাপ্ত হন।’<sup>(২৪)</sup> কেশবচন্দ্র যখন সঙ্গীক দেবেন্দ্রনাথের গৃহে যান তখন পরিবারের অন্যান্যরা কেশবকে ত্যাগ করলেও মাতা সারদাসুন্দরী তা করেননি। এমনকি কেশবচন্দ্র যখন তাঁর প্রথম পুত্র করুণাচন্দ্রের জাতকর্ম অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম অনুসারে কলুটোলার বাড়িতেই সম্পন্ন করার জন্য সংকল্প করলেন সেই অনুষ্ঠানের দিন ‘বহুজন-পূর্ণ কলুটোলার ভবন একেবারে শূণ্য হইয়া’ গেলেও ‘কেশব জননী অনুষ্ঠানক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন’। কেশব চরিতকার লেখেন-‘এমন উদারচরিত্র হিন্দুধর্মপরায়ণা নারী অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। লোকের গঞ্জনা সহ্য করিয়া তিনি চিরদিনই পুত্রের সদানুষ্ঠানে যোগ দিয়া আসিয়াছেন।...অথচ তিনি এক জন হিন্দুধর্মাবলম্বিনী।’<sup>(২৫)</sup> একদিকে পুত্র কেশবের সকল অনুষ্ঠানে ভক্তিপূর্ণভাবে যোগদান ও অপরদিকে নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী নিজধর্মের ব্রত, পূজা, তীর্থদর্শন প্রমুখ আচরণাদি পালন; পরস্পর সমান্তরালে এমন দ্বৈত ধর্মসম্বন্ধের জীবনই যাপন করছিলেন কেশবজননী। ধর্মের সার বুঝেছিলেন বলেই হয়ত ধর্মীয় জীবন তাঁকে সংস্কারাচ্ছন্ন না করে কখনো ‘আমোদে মত্ত’, কখনোবা ‘আহ্লাদিত’ রেখেছিল। এগার বছরের বালিকাবধুর হাতে কূলধর্মের পালনহেতু যে হরিনামের মালা উঠেছিল, শোকসন্তপ্ত নারীর দেবদর্শনের উদ্দেশ্যে ঘরের বাইরে পা রাখার মাধ্যমে সেই ধর্মের প্রকৃত স্বরূপকে বোঝা শুরু হয়েছিল। আর সেই পথে চলতে-চলতে তিয়াত্তর বছরের মহিলা এই উপলক্ষিতে এসে পৌঁছান যে- ‘আমার প্রাণের বিশ্বাস এই যে, এক ঈশ্বর এবং তাঁহার উপাসনা ভিন্ন আমার মুক্তি নাই। মানুষ যে সাকার উপাসনার দ্বারা মুক্তি পায় না, এই কথা আমি ঠিক বলিতে পারি না। নিরাকারের দ্বারা মানুষের মুক্তি হয়-ইহা আমি জানি এবং আমার নিজের মুক্তিও নিরাকারের উপর নির্ভর করিতেছে।’ তিনি তীর্থ, ব্রত ইত্যাদি পালন করেন ঠিকই কিন্তু এর মাধ্যমে যে তাঁর পরিত্রাণ হবে তা তিনি মনে করেন না। কেননা তিনি বিশ্বাস করেন ‘মন ঠিক এবং খাঁটি না করিতে পারিলে মানুষের পরিত্রাণ হয় না। পরিত্রাণের জন্য জীবন ভাল চাই।’<sup>(২৬)</sup> আমাদের মনে হয় সাকার এবং নিরাকারের সম্মিলনেই তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসের উপলক্ষি এবং এই তাঁর একেবারে নিজস্ব ধর্মমত।

সময় এগোয়। যে বালিকাবধু সারদাসুন্দরী আত্মকথার সূচনায় পাঠকের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তিনি মিলিয়ে যেতে থাকেন আর সেস্থানে এসে দাঁড়ান একজন পরিণত রমণী; কন্যা-জামাতা-পুত্র-পুত্রবধু-পৌত্র-পৌত্রী-দৌহিত্র-দৌহিত্রী প্রভৃতি নিয়ে যাঁর পরিপূর্ণ সংসার। প্রশ্ন জাগে, কলুটোলা সেন বাড়ী, সে বাড়ির অন্তঃপুরে কি সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে কোন পরিবর্তনের রঙ লেগেছিল? ব্রজেশ্বরী, নবীন, ফুলেশ্বরী, চুণী কোন বিবাহেই কি পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে, কি বিবাহ বিষয়ে কোথাওই জননী সারদা দেবীর মতামতের কোন স্থান দেখা যায় নি। কিন্তু ছোট মেয়ে পান্নার বিবাহে সর্বপ্রথম তাঁর মতামত অনুযায়ী বিবাহ হয়। তাঁর নিজের কথায়- ‘...এই বিবাহ আমি নিজেই দিয়াছিলাম। টাকাকড়ি অবশ্য ভাঙুরের হাতে ছিল, তিনিই সব খরচ পত্তর করিয়াছিলেন, কিন্তু পছন্দ করিয়াছিলাম আমি।...এই বিবাহে খরচপত্রের কোনও

অভাব হয় নাই।<sup>(২৭)</sup> কিন্তু কেশবের বিবাহ সারদার মনোমতো হয়নি। পাত্রীর রূপ ও শারীরিক গঠন সম্বন্ধে মনোমতো খবর না পেয়ে এতটাই মনখারাপ হয়েছিল তাঁর যে তিনি বিবাহের পর বধূমাতার মুখ দেখার আগেই কেঁদে ফেলেছিলেন। আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে চিরকাল নারীর প্রাথমিক বিচার হয়েছে তার রূপ দিয়ে। আর সেকালে যে তা-ই হবে, এতো সর্বজ্ঞাত। কূল, রূপ, গড়ন এই ছিল মেয়েদের প্রাথমিক বিচারের মাপকাঠি। আর তাই সুন্দরের যে মান সমাজ নির্দিষ্ট করেছে ছেলের বৌ যদি সেই মানে উত্তীর্ণ হতে না-ই পারলো তাহলে আর কী হোল! কেশবের বিবাহ ও বিবাহকালে কেশবপত্নীর রূপহীনতা বিষয়ে তিনি বলেন-‘...বৌ এত রোগা ও ছোট ছিলেন যে, কেশব যদি মন্দ ছেলে হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বভাব নিশ্চয়ই মন্দ হইয়া যাইত...’।<sup>(২৮)</sup> অস্বীকার করার জায়গা নেই এই বাক্য যে চিন্তাপ্রসূত তা আসলে অত্যন্তভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ। যুগ-যুগ ধরে ঘরে-পরিবারে অসংখ্য নারীর মধ্যেই এই চিন্তা লালিত হয়ে এসেছে এবং এরূপ ভাবনাকে লালন করতে দেখা সারদার মননও এই চিন্তাকেই বহন করতে শিখেছিল। সারদাসুন্দরীর ছোট ছেলে কৃষ্ণবিহারী নিজের পছন্দমত মেয়েকে বিবাহ করতে চাইলে প্রাথমিকভাবে সারদার অমত ছিল, কেননা পাত্রীর পরিবার ছিল কুলের দিক থেকে সেন পরিবারের থেকে নিম্ন। কিন্তু কৃষ্ণবিহারীর কারণে সারদা এই বিবাহে মত দেন এবং ভাঙুরকেও ‘অনেক সাধ্য সাধনা’ করে রাজী করান। সারদার কাছে এটা ছিল একটা নতুন রকম বিয়ে। কিন্তু বিবাহের পর বৌ-এর অপরূপ সৌন্দর্যে সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেলে যে বিয়েতে অসমকুল একটি সমস্যাজনক বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল, তা আর রইলো না। কৃষ্ণবিহারীর বিবাহ প্রসঙ্গে আমরা দুটি বিষয় লক্ষ্য করবো- (১) রক্ষণশীল কলুটোলা সেন বাড়িতে অনুলোম বিবাহ সম্পন্ন হোল। (২) এই বিবাহের পর হিন্দুধর্মাবলম্বী সারদা তাঁর বৌমাকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে কেশবচন্দ্রের কাছে দীক্ষিত করালেন। বলাই বাহুল্য, এই মন্দির ব্রাহ্মমন্দির এবং এই দীক্ষা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা। আমরা বুঝতে পারি কী ভাবে কেশব ও কৃষ্ণবিহারীর কারণে তাঁদের জননীর অন্তরের ধর্মীয় ভাবনায় ধর্মসমন্বয়ের রঙ পাকা হয়ে ধরেছিল।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কলুটোলার অন্তঃপুরেও যে অনেক পরিবর্তন আসছিল সারদাসুন্দরীর আত্মকথায় তার টুকরো-টুকরো ছবি ধরা পড়েছে। যে পরিবারে নারীশিক্ষার কোন চল ছিল না, এমনকি পরমবৈষ্ণব হয়েও বাড়ির প্রধান রামকমল সেন বৈষ্ণবীদের দিয়ে অন্তঃপুর শিক্ষার প্রচলন করেছিলেন বলে কোন তথ্য মেলে না; যার চল সেকালে অনেক বাড়িতেই (জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি) ছিল, যে পরিবারের নারীর পড়াশোনার কথা জানা যায় হিন্দুকলেজের ছাত্র প্যারীমোহনের রাতে নিজের ঘরে স্ত্রী সারদাসুন্দরীকে পড়ানোর তথ্যে, সেই পরিবারের সন্তান সারদাসুন্দরীর কনিষ্ঠপুত্র কৃষ্ণবিহারীকে দেখা যায় বাড়ির বারাণ্ডার স্কুল করে বাড়ির বৌদের পড়াতে। জীবনে অনেক কষ্ট নীরবে সহ্য করা কৃষ্ণবিহারী রক্ষণশীল সেন পরিবারের অন্তঃপুরিকাদের জন্য শিক্ষার আলো জ্বালানোর প্রয়াস করেছিলেন। এবং তাঁর এই প্রচেষ্টা যে সকল বয়সের পুরনারীদের জন্যই ছিল তার প্রমাণ মেলে কৃষ্ণবিহারী-জননীর কথায়- ‘বৌরা এক এক সময় ঠাট্টা করিতেন যে, “তোমাকে আমরা হাতে করে মানুষ করিলাম, আবার তোমার কাছে পড়িবা!” আবার বৌরা তাঁকে মাষ্টার মাষ্টার বলিয়া ডাকিতেন।’<sup>(২৯)</sup> সেনবাড়িতে মেয়েদের লেখাপড়া শুরু হয়। কেশব কন্যা সুনীতি সম্পর্কে আমরা জানি তিনি প্রথমে তাঁর পিতার কাছে, পরে ‘ভারত আশ্রম’-এর বিদ্যালয়ে ও কিছুসময় বেথুন কলেজে এবং তারপর বাড়িতেই ইউরোপীয় শিক্ষিকার কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন। যদিও ব্রাহ্মধর্মী কেশবচন্দ্র অনেকটা আগে থেকেই কলুটোলা ছেড়ে অন্যস্থানে সপরিবারে থাকতে শুরু করেছিলেন কিন্তু তাও কলুটোলাই যে তাঁর শিকড় এবং তা যে তিনি বিস্মৃত হননি তা কন্যা সুনীতির বিবাহের সময়

কোচবিহার থেকে কলুটোলার বাড়িতে ‘জুড়ুনি’ (জুড়নী- বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হলে বরের বাড়ি থেকে কন্যার বাড়িতে প্রেরিত বস্ত্র অলংকার প্রভৃতি উপহার। সূত্র: বঙ্গীয় শব্দকোষ, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) আসা বিষয়ে কেশবচন্দ্রের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গেই বোঝা যায়। বিবাহের ক্ষেত্রেও ক্রমশ জাতপাতের কড়াকড়ি আলগা হতে দেখা যায় সেনবাড়ীতে। কৃষ্ণবিহারী সেনের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমুদবিহারী সেন বিবাহ করেন সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্তের দাদা যোগেশচন্দ্র দত্তের মেজ মেয়ে সরযুবালাকে এবং কেশবচন্দ্র সেনের সেজ ছেলে ব্যারিস্টার প্রফুল্লচন্দ্র সেন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন মিস্ রাইসের সঙ্গে। এই দুই বিবাহ প্রসঙ্গেই সারদাসুন্দরী বলেছেন প্রথমে তাঁর মনে বড় কষ্ট হয়েছিল কিন্তু বিবাহের পরে ‘ক্রমে ক্রমে বৌদের গুণ দেখিয়া’ তিনি মোহিত হয়ে গেছিলেন। লক্ষ্যণীয়, এবার কিন্তু সারদাসুন্দরী উল্লেখ করলেন কেবলমাত্র ‘গুণ’-এর, রূপের নয়। প্রসঙ্গত আমরা দেখে নেবো সারদাসুন্দরী তাঁর পুত্রবধূদের বিষয়ে কী বলছেন- ‘বৌরা সব ভাল। আমার সন্তানেরা সব ভাল ছিলেন, বৌরা পরের মেয়ে, আমার ছেলেদের সঙ্গে একত্র হইয়া তাহাঁদের গুণে সমস্ত ভাল হইয়া গেলেন...।’<sup>(৩০)</sup> লক্ষ্যণীয়, তিনি কিন্তু বলছেন তাঁর সন্তানদের গুণে তাঁদের স্ত্রীগণ গুণান্বিত হয়েছেন। যেহেতু ছেলেরা ভালো, তাই সেই ভালোর সঙ্গে একত্র হয়ে বৌমাদের ভালোত্ব প্রকাশ পেয়েছে। বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না, সন্তান গরবে গরবিত বাৎসল্যময়ী জননীর কণ্ঠস্বর এটি যার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছে সমাজের মৌলিক পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাপ্রক্রিয়া। কিন্তু আমরা এও দেখি আবার তিনিই মুক্তকণ্ঠে পৌত্রবধূদের গুণের প্রশংসা করেন এবং সেই গুণে পৌত্রদের কোন অবদান আছে এমন কথা কিন্তু তাঁর মুখে শোনা যায়না। আসলে দীর্ঘজীবন লাভ করা সারদাসুন্দরীর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল একেবারে বাল্যকালে ও মায়ের কাছে ব্রত-পার্বণ করতে শিখে শ্বশুরবাড়ি আসা সারদা তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী যা যা শিখেছেন সেসবেরই সূচনা হয়েছে স্বামীর কাছ থেকে বা স্বামীগৃহে এসে। তাঁর পুত্রবধূদের ক্ষেত্রেও সবারই বাল্যে বিবাহ এবং বাকি শেখা-জানার ক্ষেত্রেও সারদার থেকে খুব বিপ্রতীপ কিছু ঘটেনি। কিন্তু সময়ের বদলের রেশ এসে পড়েছিল তাঁর পৌত্রবধূদের ক্ষেত্রে। আট-নয় বছরে বিবাহ তাঁদের ঘটেনি, তাঁরা লেখাপড়া শিখতে শুরু করেছিলেন পিতৃগৃহেই আর সঙ্গে সমাজ নির্ধারিত নানাবিধ ‘স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা’য়ও হয়ে উঠেছিলেন নিপুণ। ফলতঃ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ক্রমশ বঙ্গদেশ জুড়ে নারীর শিক্ষা ও নারীপ্রগতি বিষয়ে নবতর চিন্তাভাবনার সূচনা এবং তার ফলাফলে ‘নতুন নারী’দের গড়ে ওঠা; সারদাসুন্দরীর আত্মকথায় সেই সামাজিক ইতিহাসেরই রূপই দৃষ্ট হয়েছে পারিবারিক ছাঁচে। নাতবৌ প্রসঙ্গে তিনি বলেন কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র করুণাচন্দ্র সেনের বিবাহের কথা। করুণার সঙ্গে বিবাহ হয় ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীরের দ্বিতীয় কন্যা মোহিনীর। তিনি জানান, মোহিনী বয়সে করুণাচন্দ্রের থেকে বড় হওয়ায় কেশবপত্নীর এই বিবাহে মত ছিল না কিন্তু সারদাসুন্দরীর প্রথম থেকেই মত ছিল। খেয়াল রাখতে হবে বিবাহে স্বামীর থেকে স্ত্রী বয়সে বড়, এই ঘটনা ঘটেছে কলুটোলা সেন পরিবারের মতো রক্ষণশীল পরিবারে এবং তার সময়কাল উনিশ শতক; যে সময় বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র এবং কন্যার বয়সের ব্যবধান বিষয়ে কন্যার তুলনায় পাত্রের বয়সের ব্যবধান চতুর্গুণও খুব স্বাভাবিক বলেই মনে করা হতো। শুধু বয়সের ক্ষেত্রে নয়, এই বিবাহে আমরা দেখি পাত্রীর মতামতও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মোহিনীর অন্যত্র সম্বন্ধ এসেছিল যেখানে বিবাহ করলে ‘সে রাজসুখে থাকিতে পারিত’ কিন্তু মোহিনী তাঁর বাবার অমতেই কেশবপুত্রকে বিবাহ করে। বিবাহের ক্ষেত্রে বাড়ির বধূর পাত্র নির্বাচন এবং মতদান এই পরিবারের প্রেক্ষিতে একান্ত নতুন ঘটনা। এছাড়াও কেশবজননীর আত্মকথায় উল্লেখিত হয়েছে কুচবিহার বিবাহপ্রসঙ্গ। তিনি উপস্থিত ছিলেন সেই বহু আলোচিত বিবাহে এবং এমন বিতর্কিত বিষয়ে যেটুকু বর্ণনা তিনি দিয়েছেন সেখানে তাঁর সত্যনিষ্ঠা অবিসংবাদিত- ‘...গায়ে হলুদ

হইয়া গেল। তখন মহারাণীর বয়স তের বৎসর ছয় মাস।...কেশবের মত কেশব উপাসনা করিয়া রাজারাণীর বিবাহ দিলেন। রাজাকে এনে ওরা আবার হোম ইত্যাদি করিয়াছিল, যদি রাজা হোমটী না করিতেন, তবে এইটীকে খাঁটী ব্রাহ্মবিবাহ বলা যাইত। ব্রাহ্মমতে বিবাহ হইয়া যাইবার পরেই রাণীকে তুলিয়া আনা হইয়াছিল। বিবাহের পর রাজা যে হোম করিয়াছিলেন, রাণী তাহাতে একেবারে যোগ দেন নাই। আমরা বিয়ের দুই দিন পরেই রাণীকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসি।...আমরা যে দিন এখানে আসি, তার পরদিনই মহারাজা বিলাত চলে গেলেন। রানীর সঙ্গে আর দেখা হয় নাই।<sup>(৩১)</sup> কোচবিহার বিবাহের প্রসঙ্গে সুনীতি দেবীর বোন ময়ূরভঞ্জের মহারাণী কেশবকন্যা সুচারু দেবীর তথ্যানুযায়ী নতুন বিবাহ আইন (Act III of 1872) অনুযায়ী পাত্র ও পাত্রীর বয়স কম থাকায় কেশবচন্দ্রের শর্ত অনুযায়ী বিবাহ হলেও তাঁরা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া অবধি এই বিবাহকে বাগদানের মতো ধরা হবে বলেই স্থির হয়েছিল এবং এই শর্তে তাঁদের পৃথক থাকার ব্যবস্থা হয়। মহারাণী চলে আসেন কলিকাতায় এবং মহারাজা উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাতে গমন করেন। ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে নৃপেন্দ্রনারায়ণ বিলাত থেকে ফিরে আসেন এবং ১৮৮০ তে ‘দুর্জনেই প্রাপ্ত বয়স্ক হলে, কলিকাতায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে তাঁদের বিবাহ-পরিপূরক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ও তাঁরা একত্রে কুচবিহার যান।’<sup>(৩২)</sup> আগস্ট ১৯০০ তে সারদাসুন্দরী তাঁর জীবনকথা বলতে গিয়ে যখন উক্ত বিবাহ প্রসঙ্গে কথা বলেছেন তখন ‘বাগদান’ বা ‘বিবাহ-পরিপূরক অনুষ্ঠান’ সম্পর্কে কোন তথ্য না দিলেও ‘রাত্রে বিয়েতে বড় গোল’ হয়েছিল তা জানাতে দ্বিধা করেননি এবং ‘এই বিবাহের জন্য কেশব যাহা সহ্য করিয়াছেন, লোকে তাহা পারে না। যে উদ্দেশ্যে কেশব এত সহ্য করিলেন, কুচবিহার রাজ্যে তাহা পূর্ণ হোক।’- একথা বলে কুচবিহার বিবাহ প্রসঙ্গে তাঁকে নিশ্চুপ হতে দেখা যায়।

এই নিবন্ধের সূচনায় আমরা দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম আত্মকথার অণুলিখনকার যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীরের কেন বলেছিলেন সারদা দেবীর নিজের জীবনী তাঁর নিজের সম্পত্তি নয় এবং সহস্র বৎসর পরে জগতের লোক কেনইবা তাঁকে খুঁজবে? রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সারদাসুন্দরীকে বলেছিলেন- “দ্যাখ্ মা, তোর যত নাড়িভুঁড়ি নিয়ে পৃথিবীর লোকে এর পরে নাচবে। তোর ঐ ভাণ্ড থেকে এই ছেলে বেরিয়েছে।”<sup>(৩৩)</sup> কেশব অনুগামী নববিধান প্রচারকগণের মতামত অনুযায়ী কেশবজননী সারদাসুন্দরী সতী, সাধ্বী, পরসেবানুরক্তা, স্নেহ মধুর প্রকৃতি, ভগবদ্ভক্তিপূর্ণ, বৈরাগ্য, নিষ্ঠা, সেবানুরাগ, লজ্জা, ভয়, সরলতা, বিশ্বাস, দয়া, দাক্ষিণ্য, সেবা প্রভৃতি ‘আদর্শ মহিলা’র বিবিধগুণে পরিপূর্ণ ছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ মনে করেছিলেন বিবিধ সদগুণে পরিপূর্ণ আচার্য্যমাতার জীবনী সকল বঙ্গীয় মহিলাকুলের জীবন গঠনে, বিকাশে ও উন্নত জীবন গড়ে তুলতে বিশেষ সহায়ক হবে। এবং কেশবচন্দ্র সেন মুক্তকণ্ঠে একথা ঘোষণা করেছিলেন তাঁর যা কিছু ভালো তা তাঁর মায়ের গুণে। প্রচারকগণ বিশ্বাস করতেন ‘আচার্য্য কেশবচন্দ্রের উন্নত জীবনের মূলে তাঁহার সাধ্বী জননী সারদা দেবী বিদ্যমান’ এবং তাঁদের কাছে ঈসা-মাতা মেরী এবং গৌরাজ্জ-মাতা শচী দেবীর সঙ্গে সমাসনে আসীন ছিলেন কেশব-মাতা সারদাসুন্দরী। কেশবজননীর আশীর্বাদ স্বয়ং ‘পরম মাতার আশীর্বাদ বলেই মনে করতেন নববিধানের প্রচারকগণ। সুতরাং আচার্য্য জননীর জীবনী আচার্য্যদেবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কেননা ব্রাহ্মদের মতে, ‘আদর্শ জননী’ ব্যতীত সুসন্তান গড়ে ওঠে না।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গদেশে সমাজ সংস্কারকদের দ্বারা ‘আদর্শ পরিবার’ গঠনের যে প্রকল্প নেওয়া হয় তার কেন্দ্রে ছিল নারী ও শিশু এবং সেই পরিবার তৈরি হবে জাতীয়তাবাদী আদর্শে। এই

পরিবারে সন্দর্ভে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল নারী কী ভাবে ‘আদর্শ জননী’ হয়ে উঠবে, কীভাবে সে তার সন্তানকে পালন করবে, কীভাবে তাকে ভবিষ্যৎ-এ দেশের উপযোগী করে তুলবে প্রভৃতি বিষয়গুলি। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ব্রাহ্মধর্মীদের দ্বারা সম্পাদিত, প্রচারিত ও নিয়ন্ত্রিত পত্রিকাগুলিতে লেখালিখি করা হয়। কেননা বঙ্গদেশে তখন নতুন জাতীয়তার উষাকাল এবং এই কালে জননীকেই হয়ে উঠতে হবে নতুন জাতীয়তার প্রতিনিধি, যাঁর মাধ্যমে ‘ঘরে ঘরে সুসন্তান হইতে পারে এবং তাহা হইলেই সমাজের ও দেশের মুখোজ্জ্বল হইতে পারে।’ কেশবজননী সারদাসুন্দরী ছিলেন তেমনই একজন ‘আদর্শ মাতা’ যাঁর ‘সুদৃষ্টান্তে সত্যনিষ্ঠা ভক্তি প্রেম বিশ্বাস পবিত্রতা আত্মস্থ করিয়া উন্নত ধর্মজীবন লাভ’ করেছেন কেশবচন্দ্র এবং দেবত্ব লাভ করে ধর্মজীবনে বর্ধিত হয়েছেন। মায়ের সাহায্যেই তিনি তাঁর নতুন সমাজকে জাতীয় ভাব এবং নতুন জাতীয়তার শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন। নববিধানের সকল জাতীয় অনুষ্ঠান পালনে ও নবধর্মের সকল অনুষ্ঠানে হিন্দুধর্মে নিষ্ঠাবান ও হিন্দুআচারসম্পন্না সারদাদেবীর সংশয়শূণ্য উপস্থিতি ‘নতুন জাতীয়তায়’ জননীর ভূমিকাকে আরও প্রোজ্জ্বল করেছিল। এহেন মাতার জীবনকে কী ভাবে তাঁর নিজের সম্পত্তি রাখতে দিতে পারেন কেশব অনুগামী ও ভক্তগণ! যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর গ্রন্থের ‘নিবেদন’-এ জানিয়েছেন- ‘সারদাদেবী যখন এ জীবনী বলিতেন এবং আমি যখন ইহা লিখিতাম, তখন আমি ইহাকে একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বলিয়া মনে করিতাম, এবং সমসাময়িক সমুদায় লোককে ভুলিয়া সহস্র বৎসর পরে নববিধানাশ্রিত লোকের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া লিখিতাম; সারদাসুন্দরীকে ঠাকুরমা না মনে করিয়া কেশবজননীরূপে দেখিতাম, আমি নিজেকে সহস্র বৎসর পরের কেশবপত্নী বলিয়া মনে করিতাম।’<sup>(৩৪)</sup> সুতরাং আমরা বুঝতে পারি, কেন কেশবজননীর ‘যত নাড়িভুঁড়ি নিয়ে পৃথিবীর লোকে এর পরে নাচবে’ কিংবা কেন সারদা দেবীর নিজের জীবনী তাঁর নিজের নয় এবং সহস্র বৎসর পরে জগতের লোক কেনইবা তাঁকে খুঁজবে। আচার্যজননীর আত্মকথা কেবল ‘বঙ্গমহিলার হিতার্থে নয়’ উপরন্তু নববিধান প্রণেতা আচার্য কেশবচন্দ্র সেনকে জানতে, তাঁর ধর্ম ও ধর্মপথের যাত্রাকে বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানস্বরূপ। আচার্য দেবের ‘বড্ড ভাল মা’র জীবনীপাঠে যাতে একদিকে বঙ্গমহিলাগণ ও জগজ্জন ‘ব্রহ্মানন্দ রত্ন-প্রসবিনী দেবী মা সারদার’ দেবত্বের সম্যক পরিচয় পান এবং অপরদিকে ব্রহ্মানন্দ জীবন নিজের জীবনে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হন, সেকারণেই নববিধান প্রচারকগণের সক্রিয় আগ্রহে ও উৎসাহে এই আত্মজীবনী লিপিবদ্ধ ও প্রকাশ করা হয়েছিল।

১৮১৯ থেকে ১৯০৭- দীর্ঘ অষ্টাশি বছরের জীবন সারদাসুন্দরীর। দীর্ঘ জীবনে যেমন তিনি পরিপূর্ণ পরিবার পেয়েছেন তেমনই হারিয়েছেন প্রায় সকল প্রিয়জনকেই। স্বামী-সাত সন্তান একে-একে চলে গেছিল তাঁর চোখের সামনেই। পরমেশ্বররের কাছে ‘মুক্তি’ চেয়েছিলেন সারদা আর সেই মুক্তি পাওয়ার পথে তাঁকে ‘মায়া’ কাটাতে হয়েছিল সকল প্রিয়জনদের হারিয়ে। তবে নানাবিধ জীবনযন্ত্রণায় এই দীর্ঘজীবন পথে চিরকালই তিনি থেকেছেন জীবনের প্রতি আস্থাশীল। সহজ ধর্মজীবন যাপনের মধ্যে দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ধর্মের সত্যস্বরূপ। আর তাই যে কলুটোলার সেন বাড়িতে কেশবপুত্রের ব্রাহ্মমতে জাতকর্ম অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে লোকে পরিপূর্ণ বাড়ি শূণ্য হয়ে গেছিল, সেই বাড়ির পুত্রবধূ হিন্দু আচারসম্পন্না সারদাসুন্দরীর দেহান্তের পরে তাঁর নশ্বর শরীর তাঁরই ব্রাহ্ম ও হিন্দু আত্মীয়গণের দ্বারা বাহিত হয়ে শাশানভূমিতে যায় এবং হিন্দু পৌত্রগণ হিন্দুমতে এবং ব্রাহ্ম পৌত্রগণ নবসংহিতা মতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেন। সমন্বয়ের এমন রূপ স্থাপনই যেন ছিল সারদাসুন্দরীর জীবনের বীজমন্ত্র; যা তিনি জপে গেছেন তাঁর সমস্ত জীবনজুড়ে করা যাপনের মাধ্যমে এবং মৃত্যুতেও সেই যাপনেরই স্বীকৃতি তিনি

পেয়েছেন সসম্মানে। কলুটোলা সেনবাড়ীর একান্নবর্তী পরিবারের অন্তিম চিহ্নবাহী সেনবাড়ীর এহেন পুত্রবধূ সারদাসুন্দরীই তাই বলতে পারেন- ‘আমার শ্বশুর দেওয়ান রামকমল সেনের পরিবার শুদ্ধ একত্র করলে সমুদায় পরিবারে প্রায় ২০০ শতেরও অধিক লোক হইবে। আমার নিজের পরিবারও প্রায় ১০০ শত। এই বৃহৎ পরিবারে প্রতিদিন কোন স্থানে শোক দুঃখ, কোনও স্থানে বা আনন্দোৎসব হইতেছে। এই সমস্ত শোক, দুঃখ, আনন্দোৎসবের খবর প্রায় রোজই আমার নিকট আসিতেছে। ভগবান আমাকে একেবারে আনন্দে কিম্বা একেবারে দুঃখে থাকিতে দিতেছেন না। সুখে এবং দুঃখে তিনি আমায় পোড়াইতে পোড়াইতে সুখ দুঃখের বাহিরে লইয়া যাইতেছেন। আমার এক অংশ যেমন রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী, আর এক অংশ গৃহশূণ্য-অর্থহীন, প্রায় পথের ভিখারী, সুতরাং সুখ সংবাদেও আমি উতলা হই না এবং দুঃখের সংবাদেও আমাকে কাতর করিতে পারে না। এই সমস্ত লীলাময় হরির খেলা মনে করি, এখন আমি এই প্রকাণ্ড পরিবারের মধ্যে বসিয়া, ভাই, এক চোখে হাসি আর এক চোখে কাঁদি।’<sup>(৩৫)</sup> - এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির অবতারণা তিয়াত্তর বছরের সারদাসুন্দরীর যাপনে এরূপ সমন্বয়ের অনুভূতি ও তাকে অতিক্রম করে তাঁর নির্লিপ্তিতে উত্তরণকে উপলব্ধি করার জন্য। কেশবঅনুগামীদের কাছে সারদাসুন্দরীর আত্মকথা লিখনের উদ্দেশ্য আচার্য্যমাতার ‘সুন্দর চরিত্র জগৎ সমক্ষে উপস্থিত করা’ হলেও এই আত্মকথার ভিতর থেকে প্রকাশ পাওয়া সারদাদেবী আমাদের কাছে কেবলমাত্র কেশবজননী নন। বিবাহসূত্রে সেন পরিবারের সঙ্গে আবদ্ধ হওয়া সারদা দেবীর দীর্ঘজীবন সাক্ষ্য থেকেছে ঘরে-বাইরে সময়ের পালাবদলের। রামকমল সেন থেকে শুরু করে করুণাচন্দ্র সেন অবধি ঘরের কথা, ঘরের বিবর্তনের কথা চিত্রায়িত হয়েছে তাঁর আত্মকথার আখরে এবং কলুটোলার সেনবাড়ীর অন্তঃপুরচিহ্ন ও তার পটপরিবর্তনের ঐতিহাসিক দলিল তথা উনিশ শতকের পারিবারিক ইতিহাসকে বুঝতে অপরিহার্য অভিজ্ঞান হয়ে উঠেছে সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মকথাটি।

### উল্লেখপঞ্জি:

- ১) খাস্তগীর, যোগেন্দ্রলাল, কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ২৫।
- ২) তদেব, পৃ. ৫।
- ৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও বাগল, যোগেশচন্দ্র. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা(ষষ্ঠ খণ্ড), কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রথম একত্রিত সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৩৭৫-৩৮৭।
- ৪) খাস্তগীর, যোগেন্দ্রলাল, কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ৫৩।
- ৫) তদেব, পৃ. ৩০।



- ৬) ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পা), রাসসুন্দরী দাসী আমার জীবন, নয়াদিল্লি: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, ২০১১, পৃ. ১৯।
- ৭) সান্যাল, মনস্বিতা এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন(সম্পা), প্রবন্ধ সমগ্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কলকাতা: চর্চাপদ, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, পৃ. ৭।
- ৮) খাস্তগীর, যোগেন্দ্রলাল, কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ৩০।
- ৯) তদেব, পৃ. ৩০ || ১০) তদেব, পৃ. ৩০-৩১।
- ১১) কাদির, আবদুর(সম্পা), রোকেয়া রচনাবলী, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৭১, পৃ. ৪৫-৫৩।
- ১২) খাস্তগীর, যোগেন্দ্রলাল, কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ৩১।
- ১৩) তদেব, পৃ. ৩৫ || ১৪) তদেব, পৃ. ৩৪ || ১৫) তদেব, পৃ. ৩৪ || ১৬) তদেব, পৃ. ৮ || ১৭) তদেব, পৃ. ৩৪।
- ১৮) তদেব, পৃ. ৩৩ || ১৯) তদেব, পৃ. ৩৫ || ২০) তদেব, পৃ. ৫৬ || ২১) তদেব, পৃ. ৩৮।
- ২২) বসু, স্বপন(স), সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ (২য় খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০০৩, পৃ. ৯১।
- ২৩) খাস্তগীর, যোগেন্দ্রলাল, কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ৪৩।
- ২৪) শর্মা, চিরঞ্জীব, কেশবচরিত, কলিকাতা: ভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মাঘ ১৮০৬ শকাব্দ, পৃ. ১৮।
- ২৫) তদেব, পৃ. ২৯।
- ২৬) খাস্তগীর, যোগেন্দ্রলাল, কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ৪২।
- ২৭) তদেব, পৃ. ৪৭ || ২৮) তদেব, পৃ. ৪৭ || ২৯) তদেব, পৃ. ৬২ || ৩০) তদেব, পৃ. ৬৭।
- ৩১) তদেব, পৃ. ৬৬-৬৭।
- ৩২) চট্টোপাধ্যায় সতীকুমার, সমন্বয় মার্গ, কলকাতা: এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স, মাঘ ১৩৬৭, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ২৪৫।
- ৩৩) খাস্তগীর, যোগেন্দ্রলাল, কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ৬৯।
- ৩৪) তদেব, পৃ. ২৫ || ৩৫) তদেব, পৃ. ৭০।



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 843-850

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.075



## ভিটগেনস্টাইনের চিত্রতত্ত্ব : একটি পর্যালোচনা

ইন্দ্রজ্যোতি কর্মকার, গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 13.01.2025; Accepted: 18.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*Wittgenstein is a renowned philosopher of language. Philosophers of language believe that humans speak about the world and worldly objects through the use of language. Therefore, the only way to understand the structure of thoughts or experiences related to the world and its objects is to understand the structure of language. The way to understand this structure is through the analysis of language. However, the key question here is: What is the relationship between language and the world? In addressing this relationship, Wittgenstein presents a theory of meaning known as the "Picture Theory" in his work Tractatus Logico-Philosophicus. According to him, "The proposition only asserts something, in so far as it is a picture." In other words, since a proposition is a kind of picture, it is possible to describe something through a proposition. This paper attempts to clarify, as precisely as possible, the conditions under which a proposition can be a picture of a state of affairs or an event.*

**Keywords:** Atomic facts, Elementary propositions, Structure of pictures, Relation of pictorial representation, Logical form.

### ভূমিকা:

"... the most apostolic and the ablest person I have come across since Moore."<sup>1</sup>

এরূপ বাক্যবিন্যাসের দ্বারাই দার্শনিক বাস্ট্রাউড রাসেল তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর থেকে বয়ঃকনিষ্ঠ ভিটগেনস্টাইনের কর্মদক্ষতা ও দার্শনিক মনোভাবের নির্দেশ করেছিলেন। রাসেল ও জর্জ এডওয়ার্ড ম্যুরের সমকালীন অথবা পরবর্তী একজন সুযোগ্য ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাষা দার্শনিক হলেন ভিটগেনস্টাইন। তিনি তাঁর দার্শনিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দার্শনিক আলোচনায় ভাষার গুরুত্বের দিকটি দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'the method of formulating these problems rests on the misunderstanding of the logic of our

<sup>1</sup> Russell. B, Autobiography (Unwin Paperbacks. London. 1987) Pg-213

language.’<sup>2</sup>। এই বাক্যাংশ থেকে একটি বিষয় সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় যে, ভাষার যুক্তিকে ভুলভাবে অনুধাবনের ফলেই দার্শনিক সমস্যাগুলি দেখা দেয়। এই সূত্র ধরেই বলতে হয় যে, যদি এই ভাষার যুক্তিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায়, তাহলে দার্শনিক সমস্যাগুলির সমাধান করা যেতে পারে। তবে, ভাষার স্বরূপকে না অনুধাবন করতে পারলে, ভাষার যুক্তিকে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। কেননা, ভাষায় অন্তর্নিহিত যুক্তি ভাষার স্বরূপের মধ্যেই নিহিত। ফলে ভাষার যুক্তিকে অনুধাবন করতে হলে ভাষার স্বরূপকে অনুধাবন করতে হবে। এই ভাষার স্বরূপকে অনুধাবন কার্যের দার্শনিক প্রয়াসরূপেই ভিটগেনস্টাইন কলমের খোঁচায় *Tractatus: Logico Philosophicus* ও *Philosophical Investigation* নামক দুটি যুগান্তরকারী গ্রন্থ নিঃসৃত হয়েছে। তিনি তাঁর *Tractatus* নামক গ্রন্থে তিনি দাবি করেন যে, ভাষার মাধ্যমেই জগতের যথার্থ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব। এই বর্ণনার যথার্থতা প্রতিপাদিত হয়, যখন ভাষা ও জগতের মধ্যকার সম্বন্ধকে যথাযথভাবে জানা যায়। এই সম্বন্ধকে জানতে হলে, অবশ্যস্বীকারে জগত ও ভাষার স্বরূপ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী জানা প্রয়োজন।

**জগত ও ভাষা:** ভিটগেনস্টাইন তাঁর *Tractatus* নামক গ্রন্থে জগতের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, ‘World is the totality of facts, not of things.’<sup>3</sup> তবে এর অর্থ এই নয় যে, বাস্তব জগতে বস্তু নেই, কেবল ব্যাপারই আছে। বস্তুত, বাস্তব জগতে ব্যাপার যেমন আছে, তেমনি বস্তুও আছে। এর অর্থ হল — জগতের (বাস্তব জগতের) যথার্থ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব ব্যাপারসমূহের সমন্বয়রূপে, বস্তুসমূহের সমষ্টিরূপে নয়। ব্যাপার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ব্যাপার হল পরিস্থিতি বা আণবিক ব্যাপারের (Atomic fact) অস্তিত্ব।<sup>4</sup> মূলত তিনি বলেন, জগতের কম-বেশি অধিকাংশ ব্যাপারই যৌগিক ব্যাপার। এই সকল যৌগিক ব্যাপারগুলিকে বিশ্লেষণ করলে এমন কিছু ব্যাপারকে পাওয়া যায়, যে ব্যাপারগুলিকে আর বিশ্লেষণ করে কোন ব্যাপার পাওয়া যায় না; সেই সকল ব্যাপারকেই আণবিক ব্যাপার বলা হয়ে থাকে। আণবিক ব্যাপার সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘An atomic fact is a combination of objects (entitis, things)’।<sup>5</sup> ভিটগেনস্টাইন আণবিক ব্যাপারকে ব্যাপার হিসেবে সরল বললেও তাদের গঠনকারী অংশ হিসাবে বস্তুর (Object) কথা উল্লেখ করেন। তিনি ‘বস্তু’ বলতে বুঝিয়েছেন সরল এমন বিষয় যার আর বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এই বস্তুগুলি কেবলমাত্র সরলই নয়, এরা বর্ণহীন।<sup>6</sup> তবে তিনি ‘বর্ণ’ বলতে কেবল রূপের কথাই বোঝাননি। তাঁর মতে, ‘বর্ণ’ শব্দের অর্থ হল যে কোন প্রত্যক্ষগ্রাহ্য গুণ, যেমন আকৃতি, আয়তন ইত্যাদি। অর্থাৎ এই বস্তু নিছক ব্যক্তিগতদার্থ মাত্র, যার কোন জাগতিক ধর্ম নেই<sup>7</sup>।

<sup>2</sup> Preface, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, P-23

<sup>3</sup> 1.1, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, P-25

<sup>4</sup> “What is the case, the fact, is the existence of atomic fact.” *Tractatus*, 2, P-25

<sup>5</sup> 2.01, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, P-25

<sup>6</sup> “Objects are colourless.” *Tractatus* 2.0232, P-27

<sup>7</sup> “It is obvious that in the analysis of propositions we must come to elementary propositions, which consist of names in immediate combination”. Quoted by Passmore – *Hundred Years of Philosophy*. Penguin Books. 1984. P. 353

ভিটগেনস্টাইন তাঁর গ্রন্থে ভাষার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘The totality of propositions is the language.’<sup>8</sup> অর্থাৎ ভাষা হল বচনের সমগ্র বা সমষ্টি। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষার বচনগুলির মধ্যে অধিকাংশ বচনই যৌগিক বচন। তাঁর মতে, এই যৌগিক বচনকে ক্রমান্বয়ে সরল থেকে সরলতম বচনে বিশ্লেষণ করতে থাকি, তাহলে শেষ পর্যন্ত সেই বিশ্লেষণ একটি পর্যায়ে এসে সমাপ্ত হতে হয়, যে পর্যায়ে বচনকে আর বচনে বিশ্লেষণ করা যায় না। বচনের জগতে এরূপ অবিশ্লেষণযোগ্য, সরল বচনকেই মৌলিক বচন (Elementary Proposition) বলা হয়। এগুলিই বচনের পরিমন্ডলে সর্বাপেক্ষা সরলতম একক। তবে এর অর্থ এই নয় যে, এই বচনগুলির কোন অংশ নেই। মৌলিক বচনগুলির অংশ কোন বচন না হলেও, এগুলির অংশ হিসাবে তিনি নামের (Name) কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায়, ‘An elementary proposition consists of names. It is a nexus, a concatenation of names.’<sup>9</sup> তবে তিনি ‘নাম’ শব্দটি তিনি সাধারণ অর্থে গ্রহণ না করে এক বিশেষ পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, যে সকল পদের ভাষাগত সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব, সেই সকল পদ কখনও নাম হতে পারে না। নামের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘A name cannot be dissected any further: it is a primitive sign’<sup>10</sup> এর থেকে একথা বলা যায় যে, নাম হল ভাষার জগতে সরলতম প্রতীক। তিনি তাদের একক বর্ণ (‘x’, ‘y’, ‘z’) দিয়ে নির্দেশ করেছেন<sup>11</sup>।

**জগত ও ভাষার সম্বন্ধ বা চিত্রতত্ত্ব:** ভিটগেনস্টাইনের মতে, বচন হল কতকগুলি নামের সমাহার। কোন বচনে ব্যবহৃত সব শব্দের অর্থ জানা থাকলে অপরের সাহায্য ছাড়াই বচনটির অর্থ বোধগম্য হয়। বচনের অর্থ তার অঙ্গীভূত নামগুলোর অর্থের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নির্ধারণ যোগ্য। এই কারণে ভাষা হয় নমনীয় এবং একই নামসমূহের ভিন্ন ভিন্ন রূপবিন্যাস ভিন্ন ভিন্ন বাক্যার্থ উৎপাদন করতে পারে। ভাষায় নতুন নতুন বাক্য সর্বদাই পরিলক্ষিত হয়, তবে এই বাক্যগুলিকে সচেষ্ট উদ্ভাবন বলা যায় না। কিন্তু কোন বচন নতুন অর্থ গ্রহণ করতে পারে, তবে কিছু প্রকাশ করতে পারে না। কেননা, তা প্রকাশ করার জন্য ‘Propositional Sign’ প্রয়োজন। তাই ভিটগেনস্টাইন সঠিকভাবেই বলেছেন, যদি না কোন প্রতীকতন্ত্রে বিন্যস্ত করার কোন রীতি (Syntax) এবং বিভিন্নভাবে বিন্যাসযোগ্য উপাদান থাকে, তবে তা ভাষা বলে গণ্য হতে পারে না। তাঁর মতে, ‘A sign is what can be perceived of a symbol.’<sup>12</sup> বাক্যে ব্যবহৃত নাম হল প্রতীক (Symbol), কারণ নাম মাত্রই কোন বিষয়কে নির্দেশ করে। যা কিছু নিজেকে গোঁণ করে অপর কিছুকে নির্দেশ করে বা প্রধান করে তোলে, তাই প্রতীক। প্রতীক সমন্বয়ের রীতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতীক বিন্যস্ত হয়ে ভাষা গঠন করে।

<sup>8</sup> 4.001, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

<sup>9</sup> 4.22, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

<sup>10</sup> 3.26, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

<sup>11</sup> ‘The names are the simple symbols, I indicate them by single letters ( x, y, z ). *Tractatus*.4.24

<sup>12</sup> 3.26, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

পশু-পাখির বহু শব্দ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু সমন্বয়ের রীতির অভাবে তারা ভাষা গঠন করতে পারে না। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, কোন একটি নাম কেবলমাত্র একটি বস্তুকে নির্দেশিত করে থাকে। তাই তিনি বলেন, ‘A name means an object.’<sup>13</sup> অতএব নাম কোন কিছুর বর্ণনা না করতে পারলেও বস্তুকে নির্দেশ করতে পারে।

নাম কোন কিছুকে বর্ণনা করতে না পারলেও নামের সমন্বয়ে গঠিত বচন কিন্তু কোন না কোন ব্যাপারের বর্ণনা করে থাকে। কোন ব্যাপার বাস্তব নাকি অবাস্তব, তা একটি বচনের মাধ্যমে জানা সম্ভব। কোন বচনের তাৎপর্য বোঝার অর্থ হল ওই বচন দ্বারা বর্ণিত ব্যাপারটিকে জানা। আমরা কোন বচনকে দেখেই বলতে পারি বচনটি কোন ব্যাপারের বর্ণনা করছে। তবে ভিটগেনস্টাইনের মতে, এটি আমরা করতে পারি তখনই, যখন বচন বর্ণিত ব্যাপারের চিত্র হয়ে থাকে। বচন হল ভাষার অংশ, আর ব্যাপার হল জগতের অংশ। বচন যদি কোনভাবে ব্যাপারকে চিত্রিত করতে না পারে তবে ভাষার জগতের সঙ্গে ব্যাপারের জগতের জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যবধান (epistemological gap) হবে প্রকৃতই অলঙ্ঘনীয়। এই প্রসঙ্গেই তিনি তাঁর চিত্রতত্ত্বের অবতারণা করেন এবং বলেন, ‘A proposition is a picture of reality.’<sup>14</sup> তবে এখানে তিনি ‘Picture’ শব্দটির দ্বারা কোন সাধারণ চিত্রকে বোঝাতে চাননি, তিনি এই শব্দ দ্বারা ‘Logical Picture’ বা যৌক্তিক চিত্রকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতানুসারে, কোন একটি বচনকে কোন একটি ব্যাপারের যৌক্তিক চিত্র হতে হলে তাদের মধ্যে তিনটি শর্তের থাকা প্রয়োজন। এই শর্তগুলি হল -

১. চিত্রের উপাদানগুলির সঙ্গে চিত্রিত ব্যাপারের বস্তুগুলির চিত্রতার সম্বন্ধ বা চিত্র-চিত্রিত সম্বন্ধ (Pictorial Relation) থাকতে হবে।
২. চিত্রের উপাদানগুলির মধ্যে এমন সম্বন্ধ থাকতে হবে যাতে একটি সুনির্দিষ্ট সংস্থান গঠিত হয়। যাকে তিনি চিত্রের আকার (Pictorial Form) বলেন।
৩. চিত্র ও চিত্রিতের মধ্যে একপ্রকার সাদৃশ্য থাকতে হবে, যাকে তিনি যৌক্তিক আকার (Logical Form) বলেছেন।

**চিত্রতার সম্বন্ধ বা চিত্র-চিত্রিত সম্বন্ধ:** কোন ব্যাপারকে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত করতে হলে ব্যাপারটিতে যেসমস্ত বস্তু রয়েছে সেগুলিকে উপস্থাপিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান বা অংশ চিত্রটিতে থাকতে হবে। শুধু তাই নয়, চিত্রের উপাদান বা অংশের সংখ্যা চিত্রিতের উপাদানের তুলনায় বেশি বা কম হওয়া চলবে না। অর্থাৎ চিত্র ও চিত্রিতের উপাদান সংখ্যা সমান হতে হবে। চিত্রের প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে চিত্রিতের কেবলমাত্র একটি অংশেরই অনুরূপতার সম্বন্ধ থাকবে এবং চিত্রে এমন কোন উপাদান থাকবে না যার সাথে চিত্রিতের কোন অংশেরই অনুরূপতা সম্বন্ধ নেই। সেটতত্ত্বের পরিভাষায় এইরূপ সম্বন্ধকেই ‘ওয়ান-টু-ওয়ান-করেসপন্ডেন্স’ (One-to-one-Correspondence) বলা হয়ে থাকে। মূলকথা হল এই যে, যতক্ষণ না একটি বিষয়ের উপাদানগুলিকে অপর বিষয়ের উপাদানের সূচকরূপে উপস্থাপিত করা হচ্ছে ততক্ষণ একটি অপরটির চিত্র হয়ে উঠতে পারে না। অর্থাৎ চিত্রের উপাদানের সঙ্গে চিত্রিতের উপাদানের

<sup>13</sup> 3.203, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

<sup>14</sup> 4.021, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

মধ্যে এক সূচ্য-সূচক বা উপস্থাপক-উপস্থাপ্য সম্বন্ধ থাকবে, যাকে তিনি ‘চিত্রতার সম্বন্ধ’ (Pictorial Relation) বলে উল্লেখ করেছেন। চিত্রের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে এই সম্বন্ধের গুরুত্ব বোঝাতে তিনি বলেন, ‘The pictorial relationship consists of the correlations of the picture’s elements with things.’<sup>15</sup>

**চিত্রের আকার:** একটি চিত্রের উপাদানগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত না সুনির্দিষ্ট সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত উপাদানগুলির সন্নিবেশটিকে ‘চিত্র’ পদবাচ্য বলা যায় না। এই কারণেই একটি দেশের মানচিত্র হিসাবে ওই দেশের নদী, পাহাড়, শহর প্রভৃতির নামের তালিকা প্রদান করলেই চলে না। বরং যদি ওই নদী, পাহাড়, শহর ইত্যাদির অবস্থানগত সম্বন্ধকে চিহ্নিত করতে পারি, তবে ওই দেশের মানচিত্র পাওয়া সম্ভব হয়। তাঁর মতে, চিত্রের উপাদানগুলি নির্দিষ্ট সম্বন্ধযুক্ত হলে চিত্রের সংস্থান তৈরি হয়। চিত্রের সংস্থান চিত্রিতের সংস্থানকে উপস্থাপিত করে। তবে একটি ব্যাপারকে নানান মাধ্যমে ব্যবহার করে চিত্রিত করা যায়। একটি মোটর বাইক ও একটি সাইকেলেই দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে মাধ্যম ভেদে চিত্রের উপাদান বিন্যাস ভিন্ন ভিন্ন হবে। অর্থাৎ মাধ্যম ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমেও একই বিষয়কে চিত্রিত করা সম্ভব হতে পারে। সুতরাং ভিন্ন মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও উপাদানগুলি একই বিষয়গত সংস্থানটিকে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়। চিত্রের সংস্থানকে উপস্থাপনা করার এই সম্ভবনাকেই তিনি ‘চিত্রগত আকার’ (Pictorial Form) বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, ‘What the picture must have in common with reality in order to be able to represent it after its manner – rightly or falsely – is its form of representation.’<sup>16</sup> এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ‘The picture can represent every reality whose form it has’<sup>17</sup> তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, যে কোন দৈশিক চিত্র দৈশিকতা যুক্ত বাস্তব সত্তাকে চিত্রিত করতে পারে, বর্ণযুক্ত চিত্র বর্ণযুক্ত বাস্তব সত্তাকে চিত্রিত করতে পারে। অতএব, চিত্র ও চিত্রিত ব্যাপারের মধ্যে কোন না কোন প্রকার চিত্রগত আকারজনিত সাদৃশ্য থাকতেই হবে।

**যৌক্তিক আকার:** চিত্র ও চিত্রিত ব্যাপারের মধ্যে যে সাদৃশ্যের কথা বলা হয়ে থাকে, সেই সাদৃশ্য কমও হতে পারে বেশিও হতে পারে। কিন্তু তাঁর মতে, যতটুকু সাদৃশ্য না থাকলে একটি ব্যাপার অপর একটি ব্যাপারের চিত্র হতে পারে না, চিত্র ও চিত্রিত ব্যাপারের মধ্যে সেইটুকু সাদৃশ্য থাকতেই হবে। যাকে চিত্রের যৌক্তিক আকার (Logical Form) বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ, বাস্তব ব্যাপারের সঙ্গে যে সাদৃশ্য থাকার জন্য বিভিন্ন চিত্রগত আকারের চিত্র একই বাস্তব ব্যাপারকে উপস্থাপিত করে, সেই সাদৃশ্যটিকেই চিত্রের যৌক্তিক আকার বলা হয়। যে কোন চিত্রের সঙ্গেই চিত্রিত ব্যাপারের যৌক্তিক আকার সমান হয়ে থাকে। এই জন্যই যৌক্তিক আকার হল চিত্রের আকারের অংশবিশেষ। যে কোন চিত্রই যৌক্তিক আকারের মাধ্যমেই ব্যাপারের

<sup>15</sup> 2.1514, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

<sup>16</sup> 2.17, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

<sup>17</sup> 2.171, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

বর্ণনা করে থাকে। এজন্য যৌক্তিক আকারের বর্ণনা করা চিত্রের দ্বারা সম্ভব নয় এবং চিত্রের আকারও চিত্রের দ্বারা চিত্রিত করা সম্ভব নয়।

ভিটগেনস্টাইনের মতে, একটি বচনকে একটি ব্যাপারের চিত্র হতে হলে উপরিউক্ত তিনটি শর্তের প্রয়োজন। বচন ও ব্যাপারের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের মাধ্যম প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘...the proposition as a projection of the possible state of affairs.’<sup>18</sup> সাধারণত তিনি বাচনিক চিহ্নকে সম্ভাব্য ব্যাপারের অভিক্ষেপণ বলতে চেয়েছেন। বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝা যেতে পারে এভাবে, স্বরলিপির ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ লিপি বা চিহ্ন বিশেষ বিশেষ ধ্বনি নির্দেশ করে, ঠিক একইভাবে বচনের ক্ষেত্রে বচনের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ নাম বিশেষ বিশেষ বস্তুকে নির্দেশ করে থাকে। যেমনভাবে স্বরলিপি থাকা সত্ত্বেও বিশেষ একটি গান কখনও প্রকাশিত নাও হতে পারে, তেমনভাবেই বচনপ্রতীক থাকা সত্ত্বেও বচন দ্বারা উত্থাপিত ব্যাপারটি নাও থাকতে পারে অর্থাৎ মিথ্যা হতে পারে। আবার যেমন স্বরলিপির দিকে তাকিয়ে সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি বুঝতে পারেন সংশ্লিষ্ট গানটি কেমন শোনাবে, তেমনি বচনের দিকে তাকিয়ে একজন সাক্ষর ব্যক্তি বুঝতে পারেন বাক্যটি সত্য হলে বর্ণিত ব্যাপারটি কিরূপ হবে। এই যে স্বরলিপির ক্ষেত্রে যে নিয়মকে জানলে একজন সঙ্গীতজ্ঞ কোন স্বরলিপির পর কোন স্বরলিপি কিভাবে সাজালে তার থেকে কোন ধ্বনি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে গানের আকার ধারণ করবে, সেই নিয়মই হল অভিক্ষেপনের নিয়ম। আবার বচনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, যে নিয়মের প্রেক্ষিতে একজন সাক্ষর ব্যক্তি কোন নামের পর কোন নামকে কিভাবে বসালে তা একটি অস্তিত্বসম্পন্ন ব্যাপারকে প্রকাশ করবে তা বোঝে, সেই নিয়মকেই অভিক্ষেপনের নিয়ম বলতে হবে। এই নিয়মই চিত্র ও চিত্রিত ব্যাপারের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং একটি নির্দিষ্ট চিত্র একটি নির্দিষ্ট ব্যাপারকে চিত্রিত করে থাকে।

ভাষা ও জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে ভিটগেনস্টাইনের বক্তব্য ছিল এই যে, ভাষার মাধ্যমে জগতের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব। তার এরূপ বক্তব্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে আমরা জগত ও ভাষার বিশ্লেষণ করে এই বিষয়টি বুঝতে পারি যে, ভাষা ও জগতের মধ্যে এক অনুরূপতার সম্বন্ধ অবশ্যই বিদ্যমান। কেননা, জগতের অধিকাংশ ব্যাপার যেমন যৌগিক, তেমনি আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষা ব্যবহার করি সেই ভাষার মধ্যেও অধিকাংশ বচনও যৌগিক। যৌগিক ব্যাপারকে বিশ্লেষণ করতে করতে ধাপে ধাপে অস্তিত্ব পর্যায়ে যেমন সরলতম অবিশ্লেষণযোগ্য ব্যাপাররূপে মৌলিক ব্যাপার পাওয়া যায়, যাকে আর অন্য কোনো ব্যাপারে বিশ্লেষণ করা যায় না; তেমনি যৌগিক বচনকেও বিশ্লেষণ করতে করতে ধাপে ধাপে সর্বশেষ পর্যায়ে সরলতম ও অবিশ্লেষণযোগ্য বচনরূপে মৌলিক বচনকে পাওয়া যায়, যাকে আর অন্য কোন বচনে বিশ্লেষণ করা যায় না। মৌলিক ব্যাপারগুলি যেমন জগতের আদিমতম ও সরলতম একক বস্তুর দ্বারা গঠিত, একইভাবে মৌলিক বচনগুলিও ভাষার আদিমতম ও সরলতম প্রতীক নাম দ্বারা গঠিত। ভাষা ও জগতের মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ থাকায় ভাষার সঙ্গে জগতের অভিক্ষেপণের ভাবটিও স্বীকার করতে হয়। তবে এই অভিক্ষেপণের ভাবটি সরলতম বচনের সঙ্গে সরলতম ব্যাপারের ক্ষেত্রে প্রকটিত হয়ে থাকে। কেননা, ভিটগেনস্টাইন মনে করেন, মৌলিক বচনগুলিই মৌলিক ব্যাপারকে বর্ণনা করতে পারে। বর্ণনার ক্ষেত্রটিতেই অভিক্ষেপণের নিয়মটি কার্যকর হওয়ায় চিত্রতার সম্বন্ধটি প্রতিষ্ঠিত হয়, ফলে একটি মৌলিক

<sup>18</sup> 3.11, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

বচন একটি মৌলিক ব্যাপারের চিত্ররূপে বর্ণিত হয়ে থাকে। তিনি বচন ও ব্যাপারের সম্পর্ক বিষয়ে চিত্রতত্ত্বের উপস্থাপনে একথাই প্রতিপাদন করতে সর্বাগ্রে প্রয়াসী হয়েছেন যে, বচন সর্বাংশেই একধরণের চিত্র। তাঁর মতে, ‘The proposition only asserts somethings, in so far as it is a picture.’<sup>19</sup> অর্থাৎ বচন একধরণের চিত্র হওয়ায় বচনের দ্বারা কোন কিছুকে বর্ণনা করা সম্ভব হয়ে থাকে। যে কোনো চিত্রের ক্ষেত্রে একথা সত্য যে, চিত্রটিকে যদি চিত্র রূপে বোঝা যায় তাহলে সেই চিত্রের দ্বারা কোন ব্যাপার বর্ণিত হয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। অনুরূপভাবে, যদি একটি নামের সমষ্টিকে বচন বলে বোঝা হয়, তাহলে সেই বচন দ্বারা কোন ব্যাপার বর্ণিত হয়েছে তাও বোঝা যায়। কেননা, একটি বচন যে ব্যাপারকে উপস্থাপিত করে, সেই বচনের সঙ্গে সেই ব্যাপারের একটি স্বরূপগত সম্বন্ধ থাকে।<sup>20</sup> একটি বচন একটি ব্যাপারের চিত্র হয় বলেই একটি বচনের সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকে। তাই তিনি বলেন, ‘The proposition shows its sense.’<sup>21</sup>

তবে, ভিটগেনস্টাইনের মতে, বস্তু হল জগতের ভিত্তিস্বরূপ এবং নাম হল ভাষার ভিত্তিস্বরূপ। তাই নাম ও বস্তুর সম্বন্ধ হল ভাষা ও জগতের সম্বন্ধের মূল ভিত্তি। এইজন্যই নামগুলির দ্বারা বস্তুগুলি নির্দেশিত হয়। তাই বস্তু হল নামের অর্থ। এ প্রসঙ্গে ভিটগেনস্টাইন বলেছেন, ‘A name means an object. The object is its meaning.’<sup>22</sup> কিন্তু ভাষায় এমন অনেক নাম আছে, যারা কোনো নির্দিষ্ট বস্তুকে নির্দিষ্ট ভাবে নির্দেশ করতে পারে না এবং তাদের অনুরূপ বস্তুও জগতে থাকে না। যেমন, ভাষায় ব্যবহৃত ‘পাঁচ’, ‘ত্রিভুজ’ প্রভৃতি নাম হিসাবে ব্যবহৃত হলেও তাদের দ্বারা কোনো বস্তু নির্দেশিত হয় না। আবার দৈনন্দিন ভাষায় এমন অনেক পদ বা শব্দ আছে যেগুলির ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বিধি প্রণয়ন করা যায় না। যেমন, ‘সময়’, ‘পরিমাণ’ প্রভৃতি। তিনি বলেন যে, এই সমস্ত নামের ব্যবহার ব্যাখ্যার জন্য যখনই কোন অনুগত নিয়ম প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়, তখনই দার্শনিক সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে।<sup>23</sup> এই সকল সমস্যার কথা চিন্তা করেই তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, সমস্ত নামের সঙ্গে তাদের অর্থের সম্বন্ধ কোনভাবেই নাম ও বস্তুর সম্বন্ধের অনুরূপ নয়।

নাম ও বস্তুর সম্বন্ধ যদি ভাষা ও জগতের সম্বন্ধের মূল ভিত্তি না হয় তাহলে নাম দ্বারা গঠিত মৌলিক বচনের মাধ্যমে বস্তু দ্বারা গঠিত মৌলিক ব্যাপারের বর্ণনা সম্ভব হবে না। ফলে মৌলিক বচনের নির্দিষ্ট অর্থ

<sup>19</sup> 4.03, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

<sup>20</sup> ‘The proposition communicates to us a state of affairs; therefore, it must be essentially connected with state of affairs. *Tractatus*, 4.03

<sup>21</sup> 4.022, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

<sup>22</sup> 3.203, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

<sup>23</sup> ‘What causes most trouble in philosophy is that we are tempted to describe the use of important ‘odd-job’ words as though they were words with regular functions. *The Blue and Brown Books*. P-44



নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না। কেননা, বাস্তব জগতে এমন অনেক নাম আমরা ব্যবহার করি যে নামগুলি কোন বস্তুকে নির্দেশ করে না। যেমন - ‘পাঁচটি আপেল’। এখানে ‘পাঁচ’ নামটি কোন বস্তুকে নির্দেশ করে না, তা সত্ত্বেও এই বচনটি একটি ব্যাপারকে নির্দেশ করে থাকে। তাই নাম মাত্রই কি তা সর্বদা বস্তুকে নির্দেশ করবে? - সেই বিষয়ে একটা সন্দেহের অবকাশ থাকেই যায়।

### সহায়ক গ্রন্থাবলী:

- 1) Wittgenstein, Ludwig, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.
- 2) Wittgenstein, Ludwig, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Trans by D.F. Pears & B.F. McGuinness, Routledge & Kegan Paul Limited, 1961.
- 3) Black, Max, *A Companion to Wittgenstein's Tractatus*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1964
- 4) Copi, Ivring M. & R. W. Beard (eds), *Essays on Wittgenstein's Tractatus*, Macmillan Publishing Co, Inc. New York, 1966
- 5) Hacker, P. M. S & G. P. Baker, *Wittgenstein: Understanding and Meaning*, Basil Blackwell, Oxford, 1980.
- 6) Hintikka, Merrill B. Hintikka & Jaakko Hintikka, *Investigating Wittgenstein*, Basil Blackwell, Orford, 1989
- 7) Pitcher, George, *The Philosophy of Wittgenstein*, Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi, 1985
- 8) Moore, G. E., ‘Wittgenstein’s Lectures in 1930-33’ in *Philosophical Papers*, Allen & Unwin, London, 1959
- 9) Wittgenstein, Ludwig, *Philosophical Investigation*, Trans by G. E. M. Anscombe, Blackwell, Oxford, 1963
- 10) Griffin, James., *Wittgenstein's Logical Atomism*, Oxford University Press, Oxford, 1964
- 11) সরকার, প্রহ্লাদ কুমার ও সোমনাথ চক্রবর্তী (সম্পাদনা), ভিটগেনস্টাইনের দর্শন, দর্শন ও সমাজ ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৯৯০
- 12) সরকার, তুষারকান্তি ও শেফালী মৈত্র ও ইন্দ্রাণী সান্যাল (সম্পাদনা), ভিটগেনস্টাইন (জগৎ, ভাষা ও চিন্তন), এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, যাদবপুর, কলিকাতা, ১৯৯৮



# ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume- I, Issue- III, January, 2025, Page No. 851- 858

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.076



## বাঙালির হিমালয়-প্রবক্তা : ভারতাত্মার সন্ধান

(নির্বাচিত ভ্রমণকাহিনি অবলম্বনে)

সুমিত্রা দে, অতিথি অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 15.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*Bengalis are a travel-loving people, and Bengali literature reflects this passion. From ancient to medieval and modern periods, travel literature in Bengali has left its mark. This travel, however, is not merely driven by the urge for self-satisfaction; it extends further to embrace the distant with an aesthetic fondness. It represents a journey from the small to the expansive, an embrace of the greater world. This personal consciousness, transformed into a collective sentiment, is vividly expressed in Bengali travel literature.*

*Since the dawn of civilization, the Himalayas have been deeply intertwined with our existence, not just for spiritual reasons but also for the grandeur of their natural beauty. The Himalayas have become synonymous with the Indian soul, woven into Indian philosophy, literature, and culture. References to the Himalayas can be found in works like the Mahabharata, Kumarasambhavam, and Meghadutam. Situated in the northern part of India, the Himalayas form the backbone of numerous sacred sites, rivers, and other mountain ranges. For instance, in Kedarkhand, the Himalayas are divided into five distinct sections, which are discussed in greater detail elsewhere.*

*Bengali travellers have endeavoured to comprehend the existence of the Himalayas through their own experiences. Notable figures such as Jaladhar Sen, Umaprasad Mukhopadhyay, and Probodh Kumar Sanyal have contributed significantly to this tradition. However, these adventurers did not seek to envision an abstract divine realm or attain metaphysical realization of the infinite cosmos. Instead, their journeys were fuelled by an unspoken, sublime longing, a euphoric thirst for the majestic, whose true source is known only to the Himalayas themselves.*

**Keywords:** Himalaya, Bhraman, Sahitya, Anubhab, Bhrtiyo.

হ-য-ব-র-ল-এর 'গেছোদাদা'-কে আশা করি সকলেরই মনে আছে। 'কোথায় গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়?' - এই প্রশ্নের উত্তরে বেড়াল বলেছিল, '...মনে করো তুমি যখন যাবে উলুবেড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা

করতে, তখন তিনি থাকবেন মতিহারি। যদি মতিহারি যাও, তাহলে শুনবে তিনি আছেন রামকেষ্টপুর। আবার সেখানে গেলে দেখবে তিনি গেছেন কাশিমবাজার। কিছুতেই দেখা হওয়ার জো নেই।” গেছোদা-র এই ‘ধাত’ যেন প্রত্যেক বাঙালির মধ্যেই যুগ যুগ ধরে ভ্রমণের নেশা বা পিপাসা হয়ে বাস করছে। সমাজ, অর্থনীতি এবং অধ্যাত্মবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তার এই ভ্রমণপিপাসা বার বার নানা ছাঁদে দেখা দিয়েছে কখনো ‘হাওয়াবদল’-এর চঙে, কখনো ‘ফ্যামিলি ট্রিপ’-এর আদলে আবার কখনও ‘তীর্থযাত্রা’ বা ‘প্রব্রজ্যা’-র মোড়কে। বর্তমান প্রবন্ধে ভ্রমণপিপাসার সেই বিবিধ বহিঃপ্রকাশকে একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যের নিরিখে বিচার করার চেষ্টা করা হয়েছে। এমন এক স্থান, যেখানে গিয়ে ভ্রমণ শুধুমাত্র শখের ‘বিলাস’ হয়ে থাকেনি, হয়ে উঠেছে ‘এষণা’। সেই স্থান হল ‘ভারতাত্মা হিমালয়’। যুগ যুগ ধরে মানুষ এই হিমালয়ের পরিসরে এসে বৃহত্তর ভারতবর্ষের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম অনুভব করেছেন। গৃহের ক্ষুদ্র গঞ্জী থেকে বেরিয়ে মহাশ্ববির হিমালয়ের কোলে প্রত্যেকেই যেন নিজের বৃহত্তর স্বরূপ খুঁজে পেয়েছেন। ফলে শুধু প্রকৃতিই নয় ভারতবর্ষও তাঁদের কাছে নতুন রূপে ধরা দিয়েছে। সে ভারতবর্ষ নিছক দেশ নয় দেশের আত্মা, যার বিস্তার কোনও রাজনৈতিক সীমানায় আবদ্ধ নয় বরং বৃহত্তর অর্থে এ যেন রূপান্তরিত মানবাত্মারই বহিঃপ্রকাশ।

বাঙালি জীবনে এবং বাংলা সাহিত্যে ‘ভ্রমণ’ একটি দ্বিমুখী ভাবসংবাহক বিষয়। অন্তর্মুখী দশায় এই ভ্রমণের বিস্তার কখনও ইড়া-পিঙ্গলায় (চর্যাপদ) শ্বাসবায়ুর গমনাগমনে; কখনও রাধার কৃষ্ণবিমুখতা থেকে কৃষ্ণমুখীনতায় (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) কিংবা দীর্ঘ বিরহের অমানিশার মধ্য দিয়েই বিনোদিনীর জ্যোৎস্নাভিসারে (বৈষ্ণবপদাবলী)। আবার এর বহির্মুখী দশায় কখনও শ্রীচৈতন্যের নীলাচল গমন (চৈতন্যচরিত সাহিত্য) বা শ্রীরামের বনবাস (শ্রীরাম পাঁচালী) অথবা পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান (কাশীদাসী মহাভারত) থেকে আরম্ভ করে চাঁদবনের বৈদেশিক বাণিজ্য (মনসামঙ্গল), ধনপতির সিংহলযাত্রা (চণ্ডীমঙ্গল) হয়ে হুমরাবেদের সবাক্বব ভাসমান জীবনযাত্রা (মহুয়া পালা) পর্যন্ত। উল্লিখিত উদাহরণ অনুযায়ী ভ্রমণ বিষয়টি দ্বিমুখী হলেও এর প্রভাব এবং প্রতিফল একমুখী - স্ববৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে মিশে যাওয়া। বাঙালি জীবনে ভ্রমণকে কেন্দ্র করে এই ধরণের অনুভূতি দেখা গিয়েছে সাধারণত তীর্থযাত্রা বা প্রব্রজ্যাকে কেন্দ্র করে। আবার সেই যাত্রা যখন হিমালয়ের অভিমুখে হয়েছে তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই বৃহত্তর পরিবেশের সঙ্গে মানুষ নিজের উপলব্ধি এবং অভীপ্সাকে একাত্ম করে ফেলে এক নতুনতর জগতের সন্ধান পেয়েছে। তাঁদের সেই ব্যক্তিনিষ্ঠ অনুভূতিই কালান্তরে ধরা দিয়েছে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে। বর্তমান প্রবন্ধেও হিমালয়-ভ্রমণের নেপথ্যে-থাকা যাত্রীদের ভারতাত্মা সন্ধানের স্বরূপকে, ভ্রমণসাহিত্যের সাহায্যেই নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে।

হিমালয় ভ্রমণকে কেন্দ্র করে ভ্রামণিকের অন্তর্জগতে যে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন দেখা দেয়, তার উৎস শুধুমাত্র পার্বত্য অঞ্চলের সৌন্দর্য নয় বরং তার চেয়েও আরও বেশি কিছু। এমন কিছু যা সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। মহাভারত-পরবর্তীকালে কালিদাসের ‘কুমারসম্ভবম্’ এবং ‘মেঘদূতম্’ ছাড়া কোনও সাহিত্যে সেই অর্থে হিমালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এরপর কালক্রমে আঠারো শতক থেকে উনিশ শতকের মধ্যে হিমালয় পুনরায় যেন মানুষের প্রকৃতিকেন্দ্রিক আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এই সময় থেকেই বেশকিছু তীর্থযাত্রী হিমালয় ভ্রমণ করে তাঁদের যাত্রাপথের বিবরণ এবং হিমালয়-দর্শনে তাঁদের ব্যক্তিনিষ্ঠ অনুভূতি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। ফলে আমাদের অন্তঃস্থল থেকে যেন হিমালয়ের পুনরুত্থান ঘটে -

...দেবতাদের অধিষ্ঠানক্ষেত্র রূপে কল্পিত হিমালয় শেষে ভারতীয় আধ্যাত্মিকের কাছে প্রায় একটি তত্ত্ব হয়ে উঠেছে। যোগীর জন্য নির্জন নিভৃত এবং তপস্বীর জন্য সুমহিম মৌন কন্দরে কন্দরে ধারণ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে পবিত্র হিমালয়। এই হিমালয় হলো বৈরাগ্যের আশ্রয়, জীবন্মুক্তির নীড়। সংসারের ভোগ আর কামনার কোলাহল থেকে স'রে গিয়ে শান্তরসাম্পদ কোন আশ্রয় যদি পেতে ইচ্ছা করে, তবে পাওয়া যাবে ঐ শুভ্র সমুন্নত হিমালয়েরই কোন নিভৃতে। হিমালয়ের নিসর্গরূপের মধ্যেই যেন এমন কিছু রয়েছে, যার প্রসাদে তত্ত্বাশ্রয়ী আধ্যাত্মিক তাঁর অন্তরের অতি নিকটেই এক বিরাতের সান্নিধ্য সহজেই অনুভব করতে পারেন।<sup>২</sup>

ভারতীয়রা যুগ যুগ ধরে এই অনুভূতি নিয়ে হিমালয়-দর্শন করেছেন এবং এই অনুভূতিই অবশেষে আত্মিক সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। পাশ্চাত্যের পর্যটকদের মনেও হিমালয় তার আত্মিক আবেদন জাগিয়ে তুলেছে। হিমালয়ের সঙ্গে ইউরোপীয় অভিযাত্রীদের পরিচিতি খুব বেশি দিনের না হলেও হিমালয়-বিশেষজ্ঞ অভিযাত্রিক ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যান্ডের উক্তি থেকে জানা যায় যে, হিমালয়ের নৈসর্গিক এবং আধ্যাত্মিক সম্পদের প্রতি ভারতীয় এবং ইউরোপীয়দের উপলব্ধি অনেকটা একই রকম। তবে ভারতীয়দের মধ্যে হিমালয়ের প্রতি যে শ্রদ্ধা রয়েছে, তা কেবলমাত্র এর উত্তুঙ্গ শিখরের জন্য নয় বরং তার চেয়েও বেশি কিছু। ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতির বিপুল অংশে হিমালয় পর্বতের উল্লেখ এবং প্রভাব একে ভারতীয়দের কাছে নিছক একটি 'ভঙ্গিল পর্বত' করে রাখেনি বরং করে তুলেছে 'ভারতাত্মা'। ভারতীয় তথা বাঙালি জীবনে ভারতাত্মা হিমালয়ের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে হিমালয়ের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়।

ভারতবর্ষের উত্তরে অবস্থিত যাবতীয় তীর্থ, নদনদী তথা অন্যান্য বিভিন্ন পর্বতশ্রেণির মেরুদণ্ড হল হিমালয় পর্বত। কেদারখণ্ডে হিমালয়কে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা - ১. নেপালখণ্ড ২. মানসখণ্ড ৩. কেদারখণ্ড ৪. জলন্ধরখণ্ড ৫. কাশ্মীরখণ্ড। হিমালয় উপত্যকায় প্রবাহিত কালী নদীর উল্লেখ কেদারখণ্ডের ৪২তম অধ্যায়ের ৬৬ সংখ্যক শ্লোকে রয়েছে। এই নদীর পূর্বভাগে রয়েছে নেপালখণ্ড। পশ্চিমোত্তর ভাগে রামগঙ্গা এবং নন্দকোট পর্যন্ত বিস্তৃত মানসখণ্ড, যাকে কূর্মাঞ্চল বা কুমায়ুন বলা হয়। কুমায়ুনের নৈনীতাল, আলমোড়া এবং পিথোরগড় জনপদ অবস্থিত। কুমায়ুনের পশ্চিম সীমা থেকে গঙ্গা, যমুনা এবং তমসা নদীর প্রবাহ পর্যন্ত কেদারখণ্ড। এই ভূখণ্ডে পৌড়ীগড়োয়াল, টিহরীগড়োয়াল, দেহ্রাদুন, উত্তরকাশী এবং চমেলী জনপদ অবস্থিত। কেদারখণ্ড থেকে পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলেই পড়বে জলন্ধরখণ্ড। তারও পশ্চিমোত্তর সীমানায় অবস্থিত কাশ্মীরখণ্ড। ভৌগোলিক দিক থেকে কেদার, অন্যান্য খণ্ডগুলির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। কেদারখণ্ডের পূর্বোত্তর দিকে রয়েছে নেপাল এবং কুমায়ুনখণ্ড। পশ্চিমোত্তর দিকে রয়েছে জলন্ধর বা হিমাচল প্রদেশ এবং কাশ্মীরখণ্ড। কেদারখণ্ডে এই বৃহত্তর হিমালয়কেন্দ্রিক অঞ্চলের ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, ধার্মিক এবং ঐতিহাসিক সম্পদের বর্ণনা করা হয়েছে।<sup>৩</sup> প্রায় সব পুরাণ এবং কুমারসম্ভবম্-এর মতো কাব্যে হিমালয়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতের উত্তরে অবস্থিত হিমালয় অন্যান্য সমস্ত পর্বতের চেয়ে আকারে বড়ো, তাই একে পর্বতরাজ বলা হয়। ভারতীয় সংস্কৃতিতে হিমালয় শুধুমাত্র একটি স্থাবর পর্বত নয়, এ যেন জিতধি সাধক। শিবমহাপুরাণে হিমালয়ের বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, হিমালয় স্বয়ং রত্নাকর। যেন কোনও ঋষি পূর্ব এবং পশ্চিমের মহাসমুদ্রে অবগাহন করছেন। ফলে তাঁর আবক্ষ স্বরূপটি হিমালয় শিখর

রূপে জেগে রয়েছে।<sup>৪</sup> হিমাচ্ছাদিত পর্বত হওয়ার কারণে একে হিমালয় বলা হয়েছে। মহাকবি কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভবম্-এ হিমালয়কে ‘দেবাত্মা’ বলে সম্বোধন করেছেন।<sup>৫</sup>

এহেন স্থান যে যুগ যুগ ধরে স্বরূপসন্ধানী অভিযাত্রীকে নিজের দিকে আকর্ষণ করবে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। উপরোক্ত স্থানমহাত্ম্যকে পাথেয় করে যে বাঙালি ভ্রামণিকগণ হিমালয়ের অস্তিত্বকে নিজের অস্তিত্ব দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য - জলধর সেন, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, শঙ্কু মহারাজ। এঁদের ভ্রমণ-কেন্দ্রিক রচনায় হিমালয়-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অনেকাংশেই মূর্ত হয়ে উঠেছে। ফলে হিমালয় তখন আর ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের অংশ হয়ে থাকেনি, পরিণত হয়েছে ভারতাত্মায়। তবে আত্মার আধার যেমন আপাদমস্তক গোটা একটি শরীর, তেমনই উল্লিখিত লেখকদের রচনায় হিমালয়ের ভারতাত্মাস্বরূপ, তার বহিরঙ্গের অবয়বের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ, এই লেখকেরা হিমালয়-যাত্রাকে আধ্যাত্মিক প্রবক্তার স্তর থেকে বাঙালির সুদূর-পিয়াসের গন্তব্যে পরিণত করেছেন। তাঁদের লেখায় যেমন তাঁদের নিজেদের অনুভূতির কথা রয়েছে তেমনই যাত্রাপথের সাধারণ বিবরণ, যাত্রীগণের পথকষ্ট, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যাত্রীদের অনুভূতির কথা স্থান পেয়েছে। আবার এইসব বিবরণের মর্মমূলে রয়েছে সেই ভারতাত্মা হিমালয়। এই অর্থে হিমালয়ের অভিমুখে যাত্রা যেন বহিরঙ্গ থেকে অন্তরঙ্গের পথে যাত্রা বা কেন্দ্রাতিগ থেকে কেন্দ্রাভিমুখে যাত্রা।

কোনো অদৃশ্য ভূমার কল্পনা বা অনন্ত ব্রহ্মের দর্শনলাভ এই উল্লিখিত অভিযাত্রীদের মধ্যে দেখা যায়নি। তাঁদের হিমালয়-পর্যটনের নেপথ্যে রয়েছে এক অকথিত সুদূর-পিয়াসী পুলক যার উৎস সম্পর্কে জানে একমাত্র হিমালয় স্বয়ং। অপার কৌতূহলকে সঙ্গী করে তাঁদের যাত্রা এক ভূখণ্ড থেকে অন্য ভূখণ্ডে। কারোর ভ্রমণ কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলকে কেন্দ্র করে, কেউ-বা পৌঁছে গিয়েছেন হিমালয়ের অন্তর্লোকে। হিমালয়বেষ্টিত অঞ্চলের আবহাওয়া, রক্ষতা, দীপ্তি, প্রাকৃতিক শোভা - সবকিছু একে একে তাঁদের ভ্রমণ-কাহিনীর পাতা থেকে পাঠক চিত্তে প্রবেশ করেছে এবং তাকেও সেই দুর্গমের ডাক শুনিয়ে ঘর-ছাড়া করেছে। এই ধরনের লেখা পাঠ করতে করতে পাঠকও নিজেদের অজান্তেই কখন যেন তাঁদের সঙ্গী হয়ে পড়ে।

এই ধারার লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রবোধকুমার সান্যাল। তাঁর ‘দেবাত্মা হিমালয়’ বইটি উপন্যাসের মতোই পাঠকের মনকে হিমালয়ের গভীর সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম। একাধারে কৌতূহল, বিস্ময় এবং মমত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে লেখক ভ্রমণ করেছেন হিমালয়বৃত্ত। শারীরিক ভ্রমণ কখনও কখনও পরিণত হয়েছে মানস-ভ্রমণে যেখানে গন্তব্যে পৌঁছানোর চেয়ে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষাই প্রধান হয়ে উঠেছে। ফলে ব্যাপক-বিস্তৃত হিমাচলের ভয়ংকর এবং বিশুদ্ধ সৌন্দর্য লেখকের এষণা-শুদ্ধ অভিনিবেশে ধরা দিয়েছে। হিমালয়-ভ্রমণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে প্রবোধকুমার লিখছেন -

হিমালয় পর্যটক বলেই যে আমি সঠিক তীর্থযাত্রী- একথা সত্য নয়। তীর্থযাত্রাটা গৌণ, হিমালয় পর্যটন হলো মুখ্য। লক্ষ্যটা আনন্দের, উপলক্ষ্যটা তীর্থের।...হিমালয়ের সকল তীর্থদেবতা দর্শন মোটামুটি দশ বছরেই শেষ হয়, কিন্তু বত্রিশ বছরেও আমার কাছে হিমালয় শেষ হয়নি। আমি ভক্তিভাসমান নই যে, মন্দিরে ঢুকে ঠাকুর দেখামাত্র ভাবাপ্ত চক্ষে অসাড় হয়ে যাবো। কিন্তু দুর্গম পাহাড়ে কোথাও অধ্যাত্মসাধনার কেন্দ্র

দেখলে আমি আনন্দ পাই। ওর মধ্যে মানুষেরই মহিমাকে দেখতে পাই - যে-মানুষ  
দুঃসাধ্য পথে গিয়ে দেবস্থান বানিয়েছে।<sup>৬</sup>

এই গ্রন্থে লেখক তাঁর অর্ধ শতাব্দীকাল ব্যাপ্ত প্রবক্তাজীবনের হিমালয়কেন্দ্রিক অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সে হিমালয় দেবভূমি বা দেবাত্মার চেয়েও অনেক মহৎ, অনেক তীব্র তার আকর্ষণ। হিমালয়ের যাত্রাপথের বর্ণনা করতে করতে লেখক দেবভূমি থেকে মনোভূমিতে বিচরণ করেছেন। তাঁর ভাষার সুললিত বন্ধনে ভ্রমণকাহিনি অনেক বেশি বর্ণাঢ্য এবং সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে। তাঁর নিবিড় অনুভূতি যেন অসহনীয় যন্ত্রণার মতোই প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থটির দুই খণ্ডে দেবতাত্মা হিমালয়ের মহিমা ও বিচিত্র রূপের বর্ণনা রয়েছে। লেখক কতটা আকুল হয়ে হিমালয়ের উপত্যকায় বিচরণ করেছেন, তা এই গ্রন্থের প্রতিটি ছন্দে সহজেই বোঝা গিয়েছে। হিমালয়ের বিচিত্র উপত্যকা এবং তার বৈশিষ্ট্য লেখক অত্যন্ত আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করেছেন। এর অন্যতম কারণ হল - পদব্রজের মাধ্যমে হিমালয়ের নৈসর্গিক রূপদর্শন। ফলে তাঁর লেখায় পথ কখনও কখনও গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। ব্যক্তিগত নিবিড় অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে হিমালয়ে লেখকের কাছে নিজের স্বরূপ কে ব্যক্ত করেছে। ফলে ভারতের ভৌগোলিক বৈচিত্র্য পেরিয়ে হিমালয় হয় উঠেছে ভারতাত্মা। যাত্রাপথের প্রতিটি স্থানের নিজস্ব রূপ-বৈচিত্র্য লেখকের সুখপাঠ্য গদ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শব্দের পর্যটক যে-সব পথে সাধারণত যায় না বা তাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়, লেখক সেইসব পথ ধরে গিয়েছেন উপত্যকার দুর্গমতম অন্দরমহলে।

উপরোক্ত লেখকের মতোই, হিমালয়কেন্দ্রিক ভ্রমণ-সাহিত্যের অপর একজন উল্লেখযোগ্য রচয়িতা সমর গুহ। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে পরিচিত সমর গুহ একজন ভ্রামণিক হিসাবেও সুপরিচিত, বিশেষ করে তাঁর হিমালয়কেন্দ্রিক ভ্রমণবৃত্তান্ত *উত্তরাপথ* বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনার অপেক্ষা রাখে। গ্রন্থের প্রথমেই লেখক হিমালয়ের ঐতিহাসিক অস্তিত্বকে একাধিক বার স্বীকার করেছেন -

শিলামন্ডনের অনন্ত তরঙ্গ: ঘন নীল সমান্তরাল বিলম্বিত হয়ে গেছে উত্তর আকাশে।  
নীচে জল। সপ্ত ধারায় নেমে আসছে সমতল ভূমিতে। তারপর বিস্তীর্ণ হয়ে ছুটে  
চলছে দুরন্ত প্রবাহে। হিমালয় নিঃসৃত গঙ্গা, - ভারত-ইতিহাসের চিরন্তনী প্রাণধারা।  
... এ দুয়ার দিয়ে গঙ্গা নামছে। তারই পাশ দিয়ে ঐক্যবৈক্যে উঠে গেছে একটি  
বিসার্পল পথ। হিমালয়ের বুকে যাওয়ার যুগযুগান্তরের ঐতিহাসিক সরণী।<sup>৭</sup>

লেখকের উত্তরাপথ ভ্রমণের ভৌগোলিক সীমা কেদার-বদ্রীনাথ থেকে শুরু হয়ে প্রকৃতিময় তীর্থভূমি সত্‌পল্ল-এ এসে শেষ হয়েছে। উত্তরাপথ গ্রন্থে যাত্রাপথের পুঞ্জানুপুঞ্জ বিবরণ, পথের ভয়াবহতা, প্রতিকূলতা এবং প্রকৃতির অপার ঐশ্বর্যময়ী রূপ বাঙময় হয়ে উঠেছে। হিমালয়বাসী সন্ন্যাসীদের সঙ্গলাভ করে লেখকের হিমালয়প্রীতি আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে পরিণত হয়েছে। সত্‌পল্ল যাত্রাপথের ভয়ংকর দুর্গমতা শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছে এবং সত্‌পল্ল দর্শনে অপরূপ প্রশান্তিতে পর্যবসিত হয়েছে।

ভ্রমণের সুবিধার জন্য সঠিক পথনির্দেশ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। উত্তরাপথ গ্রন্থে লেখকের অপূর্ব বর্ণনায় সামগ্রিক ভ্রমণ কাহিনিটিই যেন রেখাচিহ্ন-সহ প্রথাগত পথ নির্দেশে পরিণত হয়েছে। হিমালয় উপত্যকার

পুঞ্জানুপুঞ্জ বিবরণ, কোমল-কঠোর রূপ এবং ভ্রমণপিপাসুদের কাছে মূল্যবান কিছু অনুভূতির কথা রয়েছে। লেখক হয়তো কখনও কখনও পথের প্রতিকূলতায় শারীরিকভাবে জর্জরিত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর সেই যাতনা তাঁকে কখনোই হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্যের প্রতি বিমুগ্ধ করেননি। কারণ লেখকের কোনও এক পরিস্থিতিতে এসে মনে হয়েছে এই সমস্ত প্রতিকূলতা হিমালয়ের সৌন্দর্য-সুষমার কাছে তুচ্ছ। লেখক সমর গুহ, হিমালয়ের উদার ঐশ্বর্যে অবগাহন করতে করতে এক সময় জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন। আবার অচিরেই হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে সেই প্রশ্নের উত্তর প্রগাঢ় প্রশান্তির স্তরে নিয়ে গিয়েছে।

এই পর্বের পরবর্তী লেখক হিসেবে সাহিত্যিক *চিত্তরঞ্জন মাইতির* কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর লেখা *শৈলপুরী কুমায়ুন* এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুমায়ুন পার্বত্য এলাকার কয়েকটি শৈল-শহরকে কেন্দ্র করে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। গ্রন্থ সম্পর্কে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন -

“ভ্রমণ কাহিনীতে পায়ের চলাটাই ত সব নয়, মনের চলাটাই আসল। শুধু ঘর ছেড়ে বার হওয়া নয়, বাইরেকে ঘর করবার মত অন্তরের ঐশ্বর্য ও অনুভূতির তীক্ষ্ণতাও চাই। প্রতি মুহূর্তে বাইরের সবকিছু রঙ ও রস ধরবার মত সজাগ মনের চোখ মেলে রাখতে না পারলে বিশ্বভুবন ঘুরেও কিছুই মেলবার নয়।...সেই মন যতখানি সজাগ, সজীব, সত্যশ্রয়ী ও গভীর, ভ্রমণকাহিনীও ততখানি সার্থক। ‘শৈলপুরী কুমায়ুন’ এমনি একটি সার্থক ভ্রমণকাহিনী”।<sup>৮</sup>

লেখকের অনবদ্য দৃষ্টিভঙ্গিতে নৈনীতাল, রাণীক্ষেত, আলমোড়া এবং কৌসানি পাঠকের কাছে স্পষ্ট ও জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে। গ্রন্থে কুমায়ুন উপত্যকার প্রকৃতি ও মানুষ একাকার হয়ে উঠেছে। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে পরিশীলিত বুদ্ধিবৃত্তির সংযোগ ঘটেছে।

গ্রন্থে লেখকের গভীর উপলব্ধির কথা বা ইতিহাস ও ভূগোল্যের বিবৃতি নেই ঠিকই তবে মানুষ ও প্রকৃতির মেলবন্ধনের চিত্র সেখানে ষোলো আনা স্পষ্ট। গ্রন্থে ভ্রমণের চেয়ে মানুষের কথাই বেশি। লেখক নিজের সজীব, সত্যশ্রয়ী ও গভীর মনের সহায়তায় মানুষের হৃদয়ের সংবাদই পরিবেশন করেছেন।

হিমালয়-ভ্রমণকে কেন্দ্র করে পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক কাহিনির মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন লেখক *শঙ্কু মহারাজ বা জ্যোতির্ময় ঘোষদস্তিদার*। হিমালয় প্রদেশের পাঁচটি প্রয়াগের বর্ণনায় রচিত তাঁর *পঞ্চ প্রয়াগ* গ্রন্থটি বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। এই পাঁচটি প্রয়াগের মধ্যে দেবপ্রয়াগের বর্ণনায় শঙ্কু মহারাজ বলেছেন -

“আমাকে কিন্তু এখনও আকর্ষণ করে দেবপ্রয়াগ। শুধু পুণ্যভূমি বলে নয়, দেবানুগ্রহের জন্য নয়, এর অপরূপ সৌন্দর্য ও অনাবিল শান্তির জন্য ! সুযোগ পেলেই আমি এখানে আসি। মুসৌরী না গিয়ে দেবপ্রয়াগে আসি। এই পাহাড়ী জনপদটির দেবোপম রূপের ছটায় বাসে বসেই আমার দুচোখ জুড়িয়ে যায়”।<sup>৯</sup>

সহজ-সরল-সুবোধ্য ভাষায় শঙ্কু মহারাজ তাঁর ভ্রমণ কাহিনি রচনা করেছেন। তবে অনেকের মতে পাঁচটি তীর্থের পৃথক বর্ণনায় গদ্যের গঠনশৈলীতে হয়তো কোথাও ছন্দপতন ঘটেছে। গ্রন্থের শিরোনামের মধ্যে পাঁচটি প্রয়াগের বর্ণনা স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে হলেও পৃথকভাবে এই বর্ণনা অনেকেই সম্পূর্ণ হয়ে

ওঠেনি। কিন্তু এর ফলে হিমালয়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য এবং গুরুত্ব শঙ্কু মহারাজের রচনায় বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি।

গ্রন্থে সুবিখ্যাত পাঁচটি প্রয়াগের কথা রয়েছে। প্রত্যেকটি প্রয়াগের বর্ণনায় লেখক পৃথক শিরোনাম ব্যবহার করেছেন। শিরোনামের ক্ষেত্রে Alliteration-এর ব্যবহারও লক্ষ্য করার মতো। লেখক কখনও ইতিহাস, কখনও পৌরাণিক কাহিনির সমন্বয়ে উল্লিখিত স্থানগুলির বর্ণনা করেছেন। তত্ত্ব এবং তথ্যের অপূর্ব মিশেল, *পঞ্চ প্রয়াগ* গ্রন্থের গুরুত্ব পাঠকের কাছে দ্বিগুণ করে তুলেছে। এর সঙ্গে গ্রন্থের শেষে কেদার-বদ্রী যাত্রার দিনপঞ্জী, কেদারনাথ-গোমুখী পদ-যাত্রার পথনির্দেশ এবং পথের নানা স্থানের পরিচয় গ্রন্থটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, প্রত্যেক ভ্রমণীকের কাছেই হিমালয় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এই স্থানের যাত্রাপথ, নদীবিধৌত উপত্যকা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তীর্থস্থান বারংবার ভ্রামণিকদের শুধুমাত্র বহির্মুখী যাত্রায় সীমাবদ্ধ না রেখে, তাঁদের ক্রমে অন্তর্মুখের অভিমুখে টেনে নিয়ে গিয়েছে। এরপর তাঁরা যে হিমালয়কে দর্শন করেছেন তা কোনো ভৌগোলিক স্থান নয়, তাঁর অস্তিত্ব পূর্বেও ছিল আজও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এই হিমালয় পাঠকদের কাছেও নতুন রূপে ধরা দিয়েছে। হিমালয়ের যাত্রাপথের প্রান্তরে যেন এক অতিলৌকিক মাধুরী ছড়িয়ে রয়েছে।

উপরোক্ত প্রত্যেক লেখকের বর্ণনাভঙ্গি, পরিবেশন, সাহিত্যিক গুণাগুণ একেবারেই আলাদা। কিন্তু এই বিবিধের মাঝেও মিলনের সুরকে বেঁধে রেখেছে - হিমালয়। এখানেই হিমালয়-কেন্দ্রিক রচনা আর পাঁচ রকমের ভ্রমণকাহিনি থেকে স্বতন্ত্র। এই প্রবন্ধে উল্লেখিত প্রত্যেক লেখকের মধ্যে হিমালয়যাত্রার পৃথক পৃথক কারণ ও উপলব্ধি দেখা গিয়েছে। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের উপলব্ধির মূলে রয়েছে কখনও হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আবার কখনও তার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য। তবে হিমালয়কে অতিক্রম করে কোনও লেখকই উপলব্ধির কোনো নতুন স্তরে পৌঁছাতে পারেননি। এবার যদি তাঁদের উপলব্ধির কথা বলা হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে কখনো হিমালয়ের প্রাকৃতিক মহিমা আবার কখনও তার অপ্রাকৃত মহিমা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে, বাঙালি লেখকদের এই বর্ণনার মধ্যে কিন্তু প্রত্যেকবারই হিমালয়ের যেন নবকলেবরে ধরা দিয়েছে। এই নবকলেবর হল হিমালয়ে স্বরূপ। সমগ্র ভারতের শীর্ষমুকুট স্বরূপ হিমালয় যুগ যুগ ধরে ভারতের অধ্যাত্মবাদ, সংস্কৃতি এবং সভ্যতাকে লালন-পালন করেছে, তাকে পরিপুষ্ট করেছে। ভারতের সনাতন ধর্মের আদিগুরু রূপে হিমালয় কখনো দেবভূমি আবার কখনো কর্মভূমি হয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত হয়েছে। তাই ভারতীয় ভাবনায় হিমালয় শুধুমাত্র শৈলস্তম্ভ নয়, সে ধ্যানমগ্ন, স্থিতপ্রজ্ঞ, সমাধিস্থ ঋষি। এমন ঋষি যিনি বহু মন্বন্তর দেখেছেন অথচ তাঁর সাক্ষীতাব কখনো ক্ষুণ্ণ হয়নি। ভারতের সনাতন সভ্যতার সমস্ত রহস্য তিনি জানেন কিন্তু তাঁর মধ্যে বিরাজ করছে এক পবিত্র, অখণ্ড মৌনতা। তাই সেই রহস্য উদ্ঘাটন করার জন্য বহুদিন ব্যাপী চলছে হিমালয় অভিযান। এই অভিযান ইউরোপীয়দের ক্ষেত্রে শৃঙ্গজয় কিন্তু ভারতীয়দের ক্ষেত্রে অসীমের রহস্য উন্মোচন। এই রহস্যের সন্ধানই উল্লিখিত লেখকগণ হিমালয় যাত্রা করেছেন এবং তাঁদের অনুভূতির পরিসরে যথাসাধ্য হিমালয়ের ভারতাত্মা স্বরূপকে আবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। এই অর্থে তাঁদের অভিযান স্বল্পপাদঘাটনের সাধনায় পরিণত হয়েছে।



**তথ্যসূত্র:**

১. রায়, সুকুমার, *হযবরল*, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং. প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ১১।
২. ঘোষ, সুবোধ, *হিমালয় অভিযান ও শেরপা তেনজিং*, ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৬০, পৃ. ২ - ৩।
৩. অগ্রে মানস প্রস্তাবং তথা নেপাল কে মুনে। কশ্মীরে চৈব প্রস্তাবে জালন্ধ্রে চ তথা পুনঃ।। / তথা কেদারপ্রস্তাবে কথিতানি ময়াদ্য তে। (কেদারখণ্ড ২০৪/৫৬ - ৫৭)
৪. অস্তুত্তরস্যাং দিশি বৈ গিরীশো হিমবান্মহান্। পর্বতো হি মুনিশ্রেষ্ঠ মহাতেজাঃ সমৃদ্ধিতাক্।। (শিবমহাপুরাণ, পার্বতীখণ্ড ১/১৪)।
৫. অস্তুত্তরস্য দিশি দেবাত্মা হিমালয়ো নামও নগাধিরাজঃ। পূর্বাপরো তোয়নিধি বগাহ্য স্থিতঃ পৃথীব্যা ইব মানদণ্ড।। (কুমারসম্ভবম্ ১/১)
৬. সান্যাল, প্রবোধকুমার, *দেবতাত্মা হিমালয়*, জি. এ. ই. পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৬২, পূর্বভাষণ [প্রথম খণ্ড]।
৭. গুহ, সমর, *উত্তরাপথ*, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৬২, পৃ. ১।
৮. মাইতি, চিত্তরঞ্জন, *শৈলপুরী কুমায়ুন*, রূপা অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ভূমিকা।
৯. মহারাজ, শঙ্কু, *পঞ্চ প্রয়াগ*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৬৭, পৃ. ৫।

**গ্রন্থপঞ্জি:**

১. রায়, সুকুমার, *হযবরল*
২. ঘোষ, সুবোধ, *হিমালয় অভিযান ও শেরপা তেনজিং*
৩. সান্যাল, প্রবোধকুমার, *দেবতাত্মা হিমালয়*
৪. গুহ, সমর, *উত্তরাপথ*
৫. মাইতি, চিত্তরঞ্জন, *শৈলপুরী কুমায়ুন*
৬. মহারাজ, শঙ্কু, *পঞ্চ প্রয়াগ*

**সহায়ক পত্রপত্রিকা (বৈদ্যুতিন):**

১. আনন্দবাজার, *পায়ে হেঁটে গাড়েয়াল হিমালয়ের বাগিনি হিমবাহের অন্দরে* (<https://www.anandabazar.com/travel/holiday-trips/holiday-trip-to-garhwal-himalaya-dgtl-1.712202>)
২. বর্তমান, *মোহিনী হিমালয়* ([https://www.bartamanpatrika.com/detailNews.php?cID=69&nID=206743P=1&nPID=20200109#google\\_vignette](https://www.bartamanpatrika.com/detailNews.php?cID=69&nID=206743P=1&nPID=20200109#google_vignette))



# ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume- I, Issue- III, January, 2025, Page No. 859- 865

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.077



## শ্রী শ্রী সারদা মায়ের ব্যবহারিক বেদান্ত: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

ড.অমিত কুমার বটব্যাল, রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজের শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ (স্বায়ত্তশাসিত)

Received: 14.01.2024; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*Sri Sarada Devi (1853-1920) is affectionately called “Holy Mother” by millions of people around the world. Sarada Devi was Ramakrishna’s wife, spiritual counterpart and spiritual giant in her own right. Holy Mother lived a simple, unassuming and extraordinarily modest life, yet her life and teachings rang with the truth of the highest spiritual realization. As Swami Vivekananda’s great disciple Sister Nivedita wrote: “In her one sees realized that wisdom and sweetness to which simplest of women may attain. And yet, to myself the stateliness of her courtesy and her great open mind are almost as wonderful as her sainthood. Her life is one long stillness of prayer.” The philosophy of Sri Sarada is the same as that of the Master, Sri Ramakrishna. This is the ancient philosophy of Vedāntic non-dualism. It is a way of life, an ideal belief in the light of which man can always correct his behaviour. It is a religion for the devotee, a philosophy for the intellectual, an ethical code for the atheist. Hence Sri Ramakrishna showed how this philosophy of non-dualism can be the guiding principle of every man’s life irrespective of his religion, creed, or country. The purpose of both philosophy and religion is the same, the only difference between them being in their methods of approach. The philosophy of Sri Sarada Devi is a combination of these two approaches and is drastically practical.*

**Keywords:** Vedānta, Religion, Practical, Philosophy, Non-dualism, Ethical, Devotee.

পৃথিবীর ধর্মের ইতিহাসে শ্রীশ্রী মা সারদা দেবী প্রথম নারী যিনি সংঘ জননীরূপে সন্ন্যাসী, গৃহী ভক্তদের দ্বারা পূজিত ও মানিত হয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমার সমগ্র জীবনটি একটি নীরব সঙ্গীতের মত, যা আমাদের আপ্ত করে, শিক্ষিত করে, বিস্মিত করে না। কারণ তা মানবীর জীবন নয়। আমরা সিদ্ধান্তের উপনীত হই এটিই তাঁর স্বরূপ-ঐরূপ জীবন চর্চা দেবীরই পক্ষে সম্ভব, মানবীর নয়। তাঁর বিশ্ব বন্দিত অবতার বরিষ্ঠ স্বামীর ন্যায় সুবিশাল অমৃত কথা তাঁর নিকট হতে আমরা পাই নি। বলেছেন কমই যা বলেছেন তা কিন্তু স্বর্গের গঙ্গা থেকে নিঃসৃত ধারার মত অমৃতময়ী সুষমামণ্ডিত, প্রাণস্পর্শী। তাঁর জীবনে অলৌকিক বা অস্বাভাবিক ঘটনাকে তিনি প্রাধান্য দেন নি, এমন কোন বাণী দেন নি, যা মানবকে উত্তেজিত করতে পারে, যদিও তাঁর

কৃপা স্পর্শে অনেকেই ঈশ্বর দর্শন করেছেন অনেকের পরমপদ লাভ হয়েছে। তিনি যা করেছিলেন তা তাঁর জীবনের মধ্য দিয়েই করেছেন যা ধীরে ধীরে আমাদের অন্তলোককে আলোকিত করে এক অপূর্ব নতুন দিশা দিয়েছে এবং অনুভব করেছি যা নীরবে তিনি করেছিলেন তা এক বিপ্লব। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লব। একে ব্যাখ্যা দেওয়া যায় ‘মা’য়ের বেদান্ত চর্চা জীবনে ও ব্যবহারে বলে।

আমরা যারা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ যুগে জন্মগ্রহণ করেছি, শিশুকাল থেকে গৃহে তিনটি আলোক চিত্র দেখে তাঁতে পূজা করে অভ্যস্ত হয়েছি তাঁদের অনেকেরই হয়ত আমার মত ধারণা থাকতে পারে। আমার ধারণা ছিল শ্রীমা সর্বদাই দীর্ঘ, কারণ আর কিছুই নয় ব্রাহ্মণটি ছিলেন এক গ্রাম্য পুরোহিত অথবা কুলগুরু জাতীয় কেউ। তাঁর বাহ্যিক আচার-আচরণে তাঁকে অত্যন্ত সাধারণ কেউ বলে মনে হত। সংসারের সবকিছুরই মধ্যে নিজেই এমনি ভাবে সম্পূর্ণ আড়লে তিনি ঢেকে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর সহজতার অবগুণ্ঠন তলে বিরাজিত ছিল রাজ-রাজেশ্বরীর মহিমা যা অতিভূত করত হৃদয়কে এবং নত করে দিত অপরকে তাঁর চরণ প্রান্তে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে। তাঁর অন্তরের দৈবী চেতনার আলোককে গোপন করার পক্ষে তাঁর মানবীয় বাহ্যিক আচরণটি ছিল নিতান্তই ক্ষীণ।

শ্রীমা সারদার প্রধান রূপটি হল মাতৃত্বের রূপ। তিনি স্বমুখে বলেছেন, “আমি সকলের মা, সৎ এর মা অসৎ এর মা, পাতানো মা নয় গুরুপত্নী নয়, নিজের মা”। তাঁকে আপন মা বলে বলে বোধ হয় এইজন্য যে তিনি কোন ঐশ্বর্য নিয়ে আসেন নি, যা সাধারণকে দূরে সরিয়ে রাখে। তিনি একখানি আটপৌড়ে বসন পরে কখনও জয়রামবাটির কুটির থেকে, কখনও-বা বাগবাজারের মায়ের বাড়ি থেকে, কখনও পুরী, কোঠার, বৃন্দাবন, ব্যাঙ্গালোর থেকে ভক্ত সন্তানদের কৃপা করেছেন। তাঁকে আপন মা বলে মনে হয়, কেননা তিনি মাতৃত্ব দিয়ে বিপ্লব এনেছেন। তিনি যে আপন মা বলে মনে হয়, কেননা তিনি মাতৃত্ব দিয়ে বিপ্লব এনেছেন। তিনি যে কারণে বর্তমানকালের নারীদের আদর্শ, সেই যথার্থ আধুনিকতা কেও প্রথম বাংলার মাটিতে এনেছেন মাতৃত্ব দিয়েই। তাঁর জীবন চর্চা যা ‘জীবনে ও ব্যবহারে বেদান্ত’ বলতে চাই, তাও; তাঁর এই সর্বাগ্রাসী মাতৃত্বের জন্যই সম্ভব হয়েছে।

বেদান্তের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্ম সত্য জীব ব্রহ্ম, সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করাই বেদান্তের লক্ষ্য। সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন হলে সর্বভূতে প্রেম হয়। এই বেদান্ত এতাবৎকাল গিরি গুহা কন্দরবাসী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের বিষয় ছিল অথবা পণ্ডিতকূলের অধ্যয়নের বিষয় ছিল। স্বামীজী এই বনের বেদান্তকে গৃহে আনার ডাক দিয়েছিলেন। তার পূর্বেই শ্রীশ্রী মা তাঁর অননুকরণীয় প্রকারে এর প্রয়োগ করেছিলেন।

তাঁর ভক্তদের স্মৃতিকথা থেকে লক্ষ্য করা যায় যে ভক্তরা তাঁর দর্শন মাত্র তাঁকে মা বলে স্বীকার করে নিতেন। মুহূর্তে তাঁদের সঙ্কোচ-ভয় ভাবনা দূর হত। গৃহীভক্ত, সন্ন্যাসী সন্তানদের স্মৃতিচারণ পাঠ করে একটি চিত্র মানস লোকে ফুটে ওঠে। রাত্রি হয়েছে - জয়রামবাটিতে মাটির দাওয়ায় লণ্ঠনের আলোতে মা পদযুগল ছড়িয়ে বসে আছেন, মন কোন্ লোকে - অপেক্ষা করছেন কখন সন্ন্যাসী সন্তান আসবেন, তাঁকে রাত্রির খাবার পরিবেশন করবেন। আবার কখনও ছবি ভেসে ওঠে - রাত্রির অন্ধকারে উঠানের ইটের টুকরোগুলি মা উঠে সন্তর্পণে সরাচ্ছেন, কলকাতার সন্তানগণ যাতে কষ্ট ব্যথা না পান।<sup>২</sup>

মায়ের জীবনচর্চাটি একটু পর্যালোচনা করা যাক। মায়ের পরিচারক গোবিন্দ। চর্মরোগ, খোস এ কষ্ট পাচ্ছিল - মা নিজে তাকে দেখিয়ে দিলেন। কীভাবে ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। মায়ের জয়রামবাটি

বাসকালের মূর্তি দশভূজা রূপে প্রতিভাত হয়। মা যেন দশ হাত নিয়ে প্রাতঃকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত গৃহমার্জনা, কূটনা কোটা, ভক্তদের জন্য গ্রাম হতে তরকারী, সজী, দুধ সংগ্রহ, রন্ধন, পরিবেশন, রাত্রির রুটি, ভক্ত অসুস্থ হলে তার পথ্য করছেন। আবার ভক্তের অসুস্থ কন্যার জন্য দুধ সংগ্রহে বেরিয়ে পড়েছেন। গৃহের মধ্যে হয়ত তখন চলছে পাগলী মামীর বিকার, রাধু দিদির অসুখ, মাকু দিদি, নলিনী দিদির অশান্তি, মামাদের বিষয় কলহ, অথচ এরই মধ্যে মা অক্লান্ত ভাবে দীক্ষা দিচ্ছেন গৃহী ও ত্যাগী সন্তানদের। তার কোনও সময় অসময় নেই, স্থান, কাল, বিচার নেই - ‘মা’ বলে এলেই হল। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত পরীক্ষা করে নিতেন আর মা জননী আমাদের জনসাধারণকে গ্রহণ করেছেন নির্বিকারে, নির্বিচারে। কেননা তিনি যে মা, তিনি যে সকলের মা, সকল জীব-জন্তু পশুপক্ষীরও মা। এই মাতৃত্ব তাঁকে যে উদারতার শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেটি এই একবিংশ শতকের পৃথিবীর স্পর্শও করতে পারে নি, সেইটি হল মায়ের অপার স্নেহ যা জাতি বর্ণ ধর্ম দোষ গুণ এর সীমা অতিক্রম করে গেছে। আজ একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে ধর্মের নামে হানাহানি অব্যাহত, মৌলবাদ প্রতিটি ধর্মে এখনও বিদ্যমান - আর সেই যুগে আজি হতে শতবর্ষ আগে ‘মা’ এই গণ্ডি ভেঙেছিলেন ছেলে আমজাদের জন্য, শিরোমণিপুরের মুসলিম সন্তানদের জন্য। শিরোমণিপুরের বাসিন্দা রসন আলি খাঁ ‘মায়ের কথা’য় বলেছেন যে, “এই শিরোমণিপুর ও পরমানন্দপুরের অনেক পুরুষ ও মহিলার সঙ্গেই শ্রীমার বিশেষ স্নেহের সম্পর্ক ছিল। শিরোমণিপুরের আমজাদ, আমজাদের স্ত্রী মতিজান বিবি ও আমজাদের মা ফতেমা বিবিকে মা খুব স্নেহ করতেন। মা-ই তো প্রায় ওদের সংসার চালিয়ে দিতেন। আমজাদ প্রায়ই গাঁয়ে থাকত না। আমজাদ মাঝে মধ্যে কারাবাস ও করে আসত - চৌর্য অপবাদে। মা তাও জানতেন, তবু কৃপা। তখন সংসারে অভাব অনটন পড়লে আমজাদের মা ও তার বউ জয়রামবাটিতে মায়ের বাড়িতে হাজির হত। মা ওদের দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। ওদের পেট ভরে গুড় মুড়ি খেতে তো দিতেনই, সেই সঙ্গে মাথার তেল, চাল, কাপড়, জিনিসপত্র অনেক কিছু দিতেন”<sup>৩</sup>।

মা তো আমজাদকে রামকৃষ্ণ - সারদা ভক্তমণ্ডলীতে অমর করে দিয়েছেন তাঁর বিখ্যাত উক্তি “আমার শরণ যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে”। মাতা-পুত্রে সুখ দুঃখের কথাও হত। আবার পুত্রও লাউ, কলা প্রভৃতি সজী নিয়ে মাকে দর্শন করতে এসে প্রসাদ পেয়ে যেত। মা তার উচ্ছিষ্ট স্থান স্বয়ং পরিষ্কার করতেন। আজ এই ঘটনা হয়ত অনেকের আশ্চর্যজনক কিছু নাও মনে হতে পারে কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে হবে আজ থেকে দেড়শ বছর - একশ বছর আগের ভারতবর্ষ তথা বাংলার পরিবেশে একজন গ্রামের তথাকথিত অর্থে নিরক্ষর [মা ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য পর্যন্ত পড়েছেন - তারপর আবার হৃদয় বই কেড়ে নিয়েছিলেন] মহিলা, উপরন্তু তৎকালীন গ্রামের কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশ। অবশ্য এজন্য তাঁকে অনেক কষ্ট ভোগও করতে হয়েছিল। একবার ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ ইত্যাদি জাতিগত কোনও কারণে মাকে গ্রামের ক্ষমতাশীল ব্যক্তির ২৫ টাকা জরিমানা করেছিল। সে অন্য প্রসঙ্গ, কিন্তু কোন ঘটনাই কোন বাধাই মা-কে তাঁর স্নেহ বিতরণ থেকে বিরত করতে পারেনি। ঐ নম্র করুণাময়ী শান্তমায়ের একটি বজ্র কঠিন ব্যক্তিত্ব এবং ইম্পাত সম দৃঢ় মনের পরিচয় তাঁর জীবন, বাণী, কর্ম ও ধর্মাচরণেই পরিলক্ষিত হয়। রসন আলি খাঁ আরও বলেছেন - “মায়ের নতুন বাড়ি শিরোমণিপুর ও পরমানন্দপুরের মুসলিম মানুষদের সাহায্যে নির্মিত হয়েছিল। তখন জাতপাত নিয়ে খুব সঙ্কীর্ণতা ছিল ঐ অঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যে। মায়ের নতুন বাড়ি হওয়ার সময় মুসলমান মানুষদের কাজে লাগানোর জন্য জয়রামবাটির গোঁড়া বামনেরা অনেক কথা বলেছিল। ওরা মা’কে স্নেহ বলতেও দ্বিধা করেনি। মায়ের আত্মীয়রাও মাকে বাড়ি তৈরির কাজে আমাদের লাগাতে নিষেধ করেছিল। মা লোকের সামনে মাথার কাপড় ঢাকা না দিয়ে বেরোতেন না। খুবই আন্তে আন্তে কথা

বলতেন, কিন্তু যা অন্যায় তার বিরুদ্ধে নির্ভয়ে প্রতিবাদ করতেন। এ ব্যাপারে কোন আপসের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। গ্রামের লোকেদের চাপে দু'একদিন মায়ের ঘরের কাজ বন্ধ ছিল। পরে শুনেছি - মা বলেছিলেন, কেবল আমাদের দিয়েই কাজ করাবেন। শেষ পর্যন্ত মায়ের জেদ ও সঙ্কল্পের কাছে গ্রামের গৌড়াদের নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। তারপর থেকে মায়ের বাড়িতে আমাদের খুব যাতায়াত হতে লাগল। সর্বধর্ম সমন্বয়কারী অবতার স্বামীর শক্তি শ্রীমা সারদা শিরোমণিপুরের পীরের দরগায় ঘোড়া ও সিন্ধি মানত করতেন। মা বলেছিলেন, “বাবা ঠাকুর কি আলাদা হয়? সবই এক। তোমরা তো জান বাবা, তোমাদের ঠাকুর ইসলাম ধর্মও সাধনা করেছিলেন। সে সময় নামাজ পড়তেন মুসলমানদের মতোই। সবই এক বাবা। নামেই শুধু ভিন্ন”<sup>৪</sup>।

মা হওয়া নয় মুখের কথা। শ্রীশ্রীমা কথার কথা ‘মা’ নন সত্যকার মা। তাঁর অপূর্ব আচরণ তাই প্রকাশ করে। বাঁকুড়ার ময়নাপুর গ্রামে থাকতেন শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পুঁথিকার শ্রী অক্ষয় সেন। তিনি একসময়ে অসুস্থ ছিলেন, মাকে নিয়মিত দেখতে আসতে পারতেন না জয়রামবাটিতে। কিন্তু মাঝে মাঝে মায়ের সেবার জন্য কিছু কিছু পাঠাতেন। একটি নিম্ন শ্রেণির শ্রমজীবী মহিলার হাতে তিনি মায়ের জন্য কিছু পাঠিয়েছেন। মা তাঁকে সমাদর করে বিশ্রাম ও স্নান আহ্বার করে বাড়ি ফিরে যেতে বললেন। সেই মেয়েটি স্নান করে আহ্বার করে পরম আনন্দিত হল। এদিকে বেলা যায়। মা তখন তাঁকে সেদিন যেতে নিষেধ করে রাত্রে থাকতে বললেন। মেয়েটির শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল মায়ের ঘরের বারান্দায়। মেয়েটি বয়স্কা, তার ওপ ম্যালেরিয়া রোগী। ক্লান্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। মা ভোর রাত্রেই দরজা খুলে দেখেন মেয়েটি অজান্তে বিছানা অপরিষ্কার করে ফেলেছে। মায়ের সঙ্গে যাঁরা থাকতেন তাঁরা ছিলেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও প্রচণ্ড রক্ষণশীল। তাঁরা ঘুম থেকে উঠলে বেচারি মেয়েটির দুঃখের অপমানের শেষ থাকবে না মা তাঁকে চুপি চুপি উঠিয়ে, মুড়ি গুড় হাতে দিয়ে রওনা করে দিলেন। এবং তার অপরিষ্কার শয্যা নিজের হাতে পরিষ্কার করলেন<sup>৫</sup>। সর্বভূতে সমদর্শন না হলে এ কি সম্ভব?

মা কোলে টেনে আদর করে নিয়েছিলেন তাঁর আদরের খুকি নিবেদিতাকে। তার সঙ্গে নিয়েছিলেন মিসেস ওলি বুল ও মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডকেও। শ্রীমা ইংরেজি ভাষা, ইংরেজি রীতিনীতি আদব-কায়দায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। শিক্ষিতা আধুনিকা এ তিন নারীর সঙ্গে তাঁর দুষ্টর ব্যবধান। কিন্তু, মহত্ব ও বিশ্বপ্রেম - “সব যে আমার, ছত্রিশ কোথা”। এই ভাবেই কোন বাধাই হয়নি। তিনি তাঁদের আদরেই গ্রহণ করেন। তাঁদের সঙ্গে খাবারও খেলেন। নিবেদিতা এসে প্রথমে মায়ের বাড়িতেই একটি পৃথক ঘরে কিছুকাল ছিলেন (১০/২, বোস পাড়া লেন)। শ্রীমা ঐ বিদেশিনী কন্যাদের কাছ থেকে প্রভু যীশুর উপাসনা কেমনভাবে হয় সেটি জানতেও উৎসুক ছিলেন। নিবেদিতার স্কুলে মা অনেকবার উপস্থিত হয়ে সবার আনন্দ বর্ধন করেছিলেন। বিরটের সঙ্গী ও সাক্ষী হবার যোগ্য মহিমাকে তিনি প্রতি মুহূর্তেই অসেচতনে বহন করতেন। কিন্তু সেই গরিমা সর্বাধিক বাজায় হয়ে ওঠে যখন তিনি মুহূর্তে মধ্যে কোন নতুন ধর্ম চেতনা বা ভাবের মর্মভেদ অব্যর্থ ভাবে করে ফেলেন<sup>৬</sup>।

মাতা ঠাকুরাণীর এই ক্ষমতার পরিচয় প্রথম ভালোভাবে উপলব্ধি করি কিছুদিন আগে। এক ইষ্টার দিবসে যখন তিনি আমাদের আবাসে এসে দর্শন দেন, এই বিশেষ ক্ষেত্রটিকে শ্রীমা ও তাঁর সঙ্গীরা সমস্ত বাড়িটি ঘুরে দেখার পরে প্রার্থনা কক্ষে বসে খ্রিস্টীয় ধর্মানুষ্ঠানের তাৎপর্য শুনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন আমাদের ছোট ফরাসী অর্গান যোগে ঈশ্বরের গীতবাদ্য করা হলো। খ্রিস্টের পুনরুত্থান স্তোত্র শ্রীমার

কাছে অপরিচিত ও বিদেশীয় হলেও যে রকম দ্রুত তার মর্মানুভাব করে সুগভীর ভাবাত্মীয়তা প্রকাশ করলেন, তাতেই আমাদের কাছে সর্বপ্রথম অনন্দিত ভাবে উন্মোচিত হল - সারদা দেবীর বিরাট ধর্ম সংস্কৃতির এক অনন্য দিক”<sup>১</sup>।

এই মাতৃত্বের আনন্দ অনুভব করেছিলেন বলেই মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড নিবেদিতাকে শিখিয়েছিলেন শ্রীমাকে ‘মা’ বলে ডাকতে। মনে রাখতে হবে প্রায় একশ বছর আগেও রক্ষণশীলতা কুসংস্কার তাঁর ছিলনা। একবার নিবেদিতা ভোগ রান্না করে ঠাকুরকে নিবেদন করে তার প্রসাদ শ্রীমাকে খেতে দেন। মা পরমানন্দে তা গ্রহণ করেন। মায়ের সঙ্গে যে সব মহিলারা বাস করতেন তাঁদের মধ্যেও এই বিষয় নিয়ে চাঞ্চল্য প্রকাশ করলে তিনি উত্তর দেন “নিবেদিতা আমার মেয়ে, ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করার অধিকার তার আছে। তার দেওয়া প্রসাদ পরমানন্দে কোন দ্বিধা না রেখে আমি নেব; যদি তাতে কারও আপত্তি থাকে, সে নিজেই নিয়েই থাক। এই তেজ এই দৃষ্ট ভাব তার জীবনে আবাল্য দেখা যায়। এই মাতৃত্বের দ্বারা সর্বভূতে সমদর্শন এর প্রমাণ শ্রীশ্রী ঠাকুরও পেয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে মা তখন নহবতে থাকেন। মা যখন একদিন শ্রীশ্রী ঠাকুরের খাবার থালা নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন এক মহিলা মায়ের কাছ থেকে ঐ অল্পব্যঞ্জনের থালা শ্রীশ্রী ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কারণ তা অতি দুর্লভ সৌভাগ্য। শ্রীশ্রী ঠাকুর যার তার স্পষ্ট খাদ্যগ্রহণ করতেন না। ঐ মহিলা থালা নিয়ে আসায় তিনি অসন্তুষ্ট হন এবং শ্রীমাকে বলেন, ভবিষ্যতে যেন এরূপ না হয়। শ্রীমা উত্তর দিলেন তা তিনি বলতে পারবেন না। মা বলে কেউ যদি তাঁকে ডাকে তাহলে তিনি ফেরাতে পারবে না। মা বলে কেউ যদি তাঁকে ডাকে তাহলে তিনি ফেরাতে পারবেন না। তিনি আরও বলেছিলেন, শ্রীশ্রী ঠাকুরতো সকলের ঠাকুর”।

বাগদী যুবক শ্রীভূষণ চন্দ্র পুইল্যা তাঁর দুজন আত্মীয়সহ একদিন জয়রামবাটী যান এবং মায়ের নিকট দীক্ষার জন্য অনুনয় করেন। ঐ যুবক বাগবাজারের মায়ের বাড়িতে এলে হয়তো মা এককথায় সম্মত হতেন। কিন্তু জয়রামবাটীতে তৎকালীন লোকাচার ও দেশাচার তাঁকে মানতে হতো। হয়তো মামাদের সামাজিক দিকের কথা ভেবেও মা প্রথমে সম্মত হননি। আবেগ ভরে যুবকটি বলেন, “তোমার তো একজন বাগদীবাবা ছিল, বাগদী ছেলে কেন হবে না?” মা তাঁকে প্রসাদ খেতে বলায় উত্তর দিলেন - “যদি আমাদের মন্ত্র না দাও, আমরা খাব না”<sup>২</sup>। রাত্রে সন্তানরাও উপবাসী, মাও উপবাসী থাকলেন। পরদিন সকালে মা খবর দিলেন ছেলেদের স্নান করে আসতে বল, তাঁদের মন্ত্র দেব। এ যদি সামাজিক বিপ্লব না হয় তাহলে কী? শ্রীশ্রীমা একধারে বিশ্বমাতা ও সরলা বালিকা। সরলা না হলে সমদর্শন সম্ভবই নয়। একবার একদল সাপুড়ে জয়রামবাটীর পথ দিয়ে যাচ্ছিল, মায়ের খুব ইচ্ছা হল ঐ সাপ খেলা দেখার। তাদের নিজেই ডকে খেলা দেখতে চাইলেন। ডুগডুগির শব্দে গ্রামের অন্যান্য লোকেরাও এল - খেলা দেখল। মা তাদের দুটি টাকা, একটা কাপড় আর মুড়ি গুড় খেতে দিলেন। মাতৃস্নেহ পেয়ে সাপুড়েরা আনন্দিত। বিদায়ের সময়ে ওদের দলপতি মায়ের পা স্পর্শ করে প্রণাম করল, মাও মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। মায়ের এক ভ্রাতৃবধু এ দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন সাপুড়েকে কাপড় দেওয়া হয়েছে, টাকা দেওয়া হয়েছে, আবার ছোঁয়া কেন? মায়ের মাতৃত্ব বলে ওঠে “কি করি বলো? লোকটা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে, আমি কি করে বারণ করি? প্রণামই যদি করলে আর আমি মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করবোনি? এ তোমাদের কেমন তরো কথা!”<sup>৩</sup>

সে সময়ে, থিয়েটার যাত্রায় যে সব মহিলারা অভিনয় করতেন সমাজে তাদের কোন স্থান ছিল না। কোনও কোনও সমাজে থিয়েটার যাত্রা দেখাও নিষেধ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম তাদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, শ্রীমাও ব্যতিক্রম ছিলেন না। থিয়েটার তিনি কয়েকবার দেখেছেন, অভিনেত্রীদের আদর ও করেছেন। কলকাতার তাঁর বাড়িতে অভিনেত্রী তারাসুন্দরী ও তিনকড়ি আসতেন। মাকে তারা গান শুনিয়েছেন। মায়ের কাছে ঠাকুরের প্রসাদ পেয়েছেন। এটি আজকের যুগের নয় সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে যখন এক যুবক এক বিশিষ্ট অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন “ষ্টার থিয়েটার কোন দিকে” অধ্যাপক প্রথমে বলেছিলেন “জানিনা” পরে সত্য রক্ষার্থে বলেছিলেন “জানি কিন্তু বলব না”<sup>১১</sup>। অধ্যাপকের সত্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এটিও প্রতীয়মান হয় যে, নাটক অভিনয় সে যুগে সম্মানের ছিল না। মা কিন্তু ধুলো মাখা ছেলেকে ধুলো ঝেড়েই কোলে তুলে নিয়েছিলেন। তার দৃষ্টিতে সবাই সমান ছিল। জয়রামবাটিতে একটি বালবিধবা যুবতী ভাগ্যদোষে বিপথ গামিনী হয়ে বিপদে পতিত হয়। সমাজপতিরা যাঁরা কোনও দিন মেয়েটির খোঁজ রাখেন নি, তাঁকে কোনও সাহায্য করেন নি, আজ তার পদস্বলনে তাঁকে শান্তি দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মা চিন্তিত হলে এবং তাঁকে রক্ষা করতে প্রয়াসী হলেন। তাঁর এক সন্তান যিনি ঐ অঞ্চলের জমিদার তাঁকে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে বললেন। এবং মেয়েটি বিপদমুক্ত হয়েছে শুনে আশ্বস্ত হলে<sup>১২</sup>। এই প্রকার অসহায় রমণীর সাহায্যের জন্য তিনি কতদূর যেতে পারতেন তার আরও উদাহরণ আছে। মায়ের বেদান্ত চর্চা জীবনের ঘটনাগুলি থেকেই বোঝা যায়। মায়ের বাড়ি বাগবাজারে একজন মহিলার ঘনঘন আগমনে অন্যান্য স্ত্রী ও পুরুষ ভক্তরা বিরক্ত হতেন। কারণ ঐ মহিলার দুর্নাম ছিল। এমন কি শ্রীশ্রী ঠাকুরের ভক্ত বলরাম বসুর স্ত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দেবী এবিষয়ে মায়ের কাছে অভিযোগ করেন। মা উত্তর দিয়েছিলেন, “আমি কি কেবল ভালটির মা - খারাপের নই?”<sup>১৩</sup> “ মায়ের এই ভালোবাসা মা বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব সন্তানদের জন্য দিয়ে গেছেন “যারা এসেছে, যারা আসেনি আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা, - আমার ভালবাসা আমার আশীর্বাদ সকলের উপর আছে”<sup>১৪</sup>।

ব্যবহারিক জীবনে বেদান্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশিত। শ্রীশ্রী ঠাকুর দিয়েছিলেন সূত্র। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ভাষ্যকার এবং সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে এর রূপকার। আর শ্রীশ্রীমা জীবনে বেদান্তচর্চার পরীক্ষাগার। সংসারী ছিলেন না তিনি। নিজের সংসার বলতে যা বোঝায় তা তাঁর ছিল না। কিন্তু সংসারীদের থেকে বেশি সংসারে জড়িয়ে পক্ষে পক্ষজ হয়ে জীবনে বেদান্ত পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন, ত্যাগ, তিতিক্ষা, ক্ষমা, ধৈর্য্য তেজ এর অপূর্ব দৃষ্টান্ত শ্রীশ্রী মা। মায়ের বেদান্ত চর্চা আরও এজন্যই বলা যে সাধারণ মানুষের, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, দয়া-গুণীর প্রতি উৎসাহিত হয়। মা যদি শুধু ত্যাগী সন্তানদের মা হতেন, যদি শুধু পবিত্র আধার গৃহীর মা হতেন, তাহলে সবার মা বলা চলত না। মা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গুচি, অগুচি, পবিত্র, অপবিত্র নির্বিশেষে সকলকে বুকে তুলে নিয়েছেন। আশ্রয় দিয়েছেন, আশ্বাস দিয়েছেন। এই ভাব মার ছিল তাই তিনিই বলতে পারেন, “আমি মা, জগতের মা, সকলের মা”।

**তথ্যসূত্র:**

১. পূর্ণাত্মনন্দ, স্বামী (সম্পাদক), 'শ্রী শ্রী মায়ের পদপ্রান্তে', উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯।
২. পূর্ণাত্মনন্দ, স্বামী (সম্পাদক), 'শ্রী শ্রী মায়ের পদপ্রান্তে', উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৫।
৩. পূর্ণাত্মনন্দ, স্বামী(সম্পাদক), 'শ্রী শ্রী মায়ের পদপ্রান্তে', উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৫৭।
৪. পূর্ণাত্মনন্দ, স্বামী(সম্পাদক), 'শ্রী শ্রী মায়ের পদপ্রান্তে', উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৫৯।
৫. অপূর্বানন্দ, স্বামী, 'জননী শ্রীসারদা দেবী', অদ্বৈত আশ্রম, কলকাতা, পৃঃ ৬৪- ৬৬।
৬. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী (সম্পাদক), 'শতরূপে সারদা', রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, কলকাতা, পৃঃ ৫৬৯।
৭. গন্তীরানন্দ, স্বামী, 'শ্রীমা সারদা দেবী', উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৃঃ ১২-১৪।
৮. বসু, শঙ্করী প্রসাদ, 'নিবেদিতা লোকমাতা', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃঃ ৫৪-৫৬।
৯. পূর্ণাত্মনন্দ, স্বামী (সম্পাদক), 'শ্রীশ্রী মায়ের পদপ্রান্তে', উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭২৮।
১০. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী (সম্পাদক), 'শতরূপে সারদা', রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, কলকাতা, পৃঃ ৫৭১।
১১. দেবী, শ্রী দুর্গাপুরী, 'সারদা-রামকৃষ্ণ', সারদেশ্বরী আশ্রম, কলকাতা, পৃঃ ৪২৪, ।
১২. পূর্ণাত্মনন্দ, স্বামী (সম্পাদক), 'শ্রীশ্রী মায়ের পদপ্রান্তে', উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৩১-৭৩২।
১৩. লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী (সম্পাদক), 'শতরূপে সারদা', রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, কলকাতা, পৃঃ ২৯৯।
১৪. বসু, শঙ্করী প্রসাদ, 'নিবেদিতা লোকমাতা', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা,, পৃঃ ৪২-৪৪.



## **Guidelines for Submission to Atmadeep:**

The Atmadeep is dedicated to publishing original works, including research papers, book reviews, article reviews, and abstracts of theses. Submission to this journal implies that the work has not been previously published elsewhere and is not under consideration for publication elsewhere.

## **Comprehensive Submission Guidance:**

- Authors, researchers, and writers interested in submitting their papers are encouraged to do so online.
- Submissions should be in Bengali and formatted in Avro Keyboard, using Bensen and font size 14.
- The journal accepts submissions exclusively in the Bengali language.

## **Details to include:**

- Title: Should be concise and informative.
- Authors' Names: Include names followed by designation, postal address (including email ID and phone number).
- Abstract: Abstracts should be in English and should not exceed 250 words.
- Bibliography: আচার্য দেবেশ কুমার, ব্যবহারিক বাংলা ও সাহিত্য গবেষণার পদ্ধতি বিজ্ঞান, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ২০১৯-২০।
- Email: editor@atmadeep.in

## **Plagiarism:**

Authors are urged to avoid plagiarism. Any detected instances of plagiarism will be the sole responsibility of the authors.

## **Review Process**

- All the manuscript will be preliminary examined by the Editor-in-Chief and then forwarded to the Reviewers & other Editors of the Journal.
- The papers shall only be published after recommendation of the Reviewers & Associate Editors.
- Information regarding the selection or rejection of articles/papers will be only through Email.
- The journal shall publish the article/papers only after completion of the formalities mentioned in selection letter.
- The journal will also not take the responsibility of returning the rejected articles.

At every stage preceding publication, the editors of the journal shall have the right to make corrections (if needed) in articles/papers to suit the requirement of the journal.

**N.B.:** Papers will be accepted only when accompanied with abstract (to be written in English only). Submission of papers without abstract (in English) or mere submission of an abstract without the paper would lead to non-acceptance of the same.

## **Publication Ethics**

Publication ethics are the principles and guidelines that govern the conduct of authors, reviewers, editors, and publishers in scholarly publishing. Ensuring ethical practices is crucial for maintaining the integrity and credibility of academic research. Here are some key aspects of publication ethics of our journal:

- **Authorship:** All authors should have made significant contributions to the research and agree to be listed as authors. Misrepresentation of authorship, such as ghost authorship or gift authorship, should be avoided.
- **Originality and Plagiarism:** Authors should ensure that their work is original and properly cited. Plagiarism, including self-plagiarism, is unethical and undermines the integrity of scholarly publishing.
- **Data Integrity:** Authors are responsible for the accuracy and integrity of their research data. Fabrication, falsification, and manipulation of data are serious ethical violations.
- **Conflict of Interest:** Authors should disclose any potential conflicts of interest that could influence their research or its interpretation. These may include financial interests, affiliations, or personal relationships that could bias the work.
- **Peer Review:** Peer review plays a critical role in ensuring the quality and validity of published research. Reviewers should conduct their evaluations objectively and provide constructive feedback.
- **Editorial Independence:** Editors should make decisions based on the merits of the research and without influence from commercial interests, personal biases, or other undue pressures.
- **Publication Ethics Policies:** Journals should have clear and accessible policies on publication ethics, including instructions for authors, ethical guidelines for reviewers and editors, and procedures for handling ethical issues or misconduct.
- **Responsibility of Publishers:** Publishers have a responsibility to support and enforce ethical standards in scholarly publishing. This includes providing resources for editors and reviewers, promoting transparency, and addressing allegations of misconduct.

### Publication Charge

The authors should note that there is no submission fee; however, there is a reasonable publication fee for each accepted article to meet the cost of manuscript handling, typesetting, office cum admin expenses, web-hosting charges, up-loading charges, internet expenses, website update and maintenance, electronic archiving and other recurring expenses. The publication fee is obligatory for publication.

- **Indian Authors:** The publication fee for single author per accepted paper is Rs. 1000.00 and Rs. 1200.00 for multiple authors.
- **Foreign Authors:** The publication fee of the accepted paper is \$25 for single authored paper and \$30 for multiple authored papers
- **Print copy:** Print Copy of the issue can be supplied on payment of Rs. 600.00 per copy. Annual subscription for the print copy is Rs. 3000.00 per Volume (inclusive of postal charges within India) Single print copy can be supplied outside India on payment of 25\$ (inclusive international shipping charge) per copy.



# ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly  
Bengali Research Journal

Volume-I, Issue-III, January, 2025

Website: <https://www.atmadeep.in/>

Email: [editor@atmadeep.in](mailto:editor@atmadeep.in)

## ABOUT UTTARSURI



Uttarsuri is a registered society under the Societies Registration Act XXI of 1860, bearing registration number RS/KARIM/258/L/09 OF 2022-23 dated 30.04.2022, located in Karimganj, Assam, India. The society is also registered with NGO Darpan, bearing the unique ID VO/NGO AS/2022/0314757.

Uttarsuri Publication is a branch of the registered society Uttarsuri. It is registered with the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises under registration number UDYAM-AS-18-0012611.



UTTARSURI

প্রকাশক:

উত্তরসূরি, শ্রীভূমি, আসাম



ISSN24541508